আহমদ শরীফ রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহমদ শরীফ রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড

আহমদ শরীফ

AMARBOI.COM

আগামী প্রকাশনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৯৫৯১১৮৫, ৭১১০০২১, ০১৭৯০৫৮৬৩৬২
প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরী
বর্ণ বিন্যাস কম্পিউটার মুদ্রণ শিল্প, ঢাকা
মুদ্রণ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা
মূল্য : ১০০০.০০ টাকা

Ahmed Sharif Rachanavali-8 : Collected works of Ahmed Sharif
Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka-1100 Bangladesh.
e-mail : info@agameeprakashani-bd.com
First Edition : February 2015

Price : Tk 1000.00 only

ISBN 978 984 04 1803 9

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসঙ্গ কথা

নির্মোহ চিন্তার ও মুক্তবুদ্ধির বিবেকী-কণ্ঠস্বর ড. আহমদ শরীফ, যিনি জীবৎকালেই বাঙলাদেশে এক কিংবদন্তী পুরুষ ছিলেন। আপোশহীন মৌলবাদবিরোধী, সাহসী অসাম্প্রদায়িক, অকৃত্রিম মানবতাবাদী এবং মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন সমাজতন্ত্রের অনুসারী। বাঙলাদেশের মুক্তচিন্তার প্রাগ্রসর এবং মধ্যযুগের সাহিত্য ও সামাজিক ইতিহাসের বিদগ্ধ পণ্ডিত ড. আহমদ শরীফ একগুচ্ছ অসামান্য তীব্র বৈশিষ্ট্য সম্বলিত একজন বিতর্কিত ব্যক্তি এবং একই সাথে তিনি ঐতিহ্য ও সংস্কারকে বিচার-বিশ্লেষণ করতেন সমকালীন জীবনদৃষ্টি থেকে, চিরাচরিত ধ্যান-ধারণার অচলায়তনকে ভেঙেছেন যুক্তি ও মননশীল পাণ্ডিত্য দিয়ে।

তিনি পঞ্চাশ দশক থেকে নিয়মিত লেখালেখি শুরু করেছিলেন এবং তা-মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চলমান ছিল। তাঁর রচিত মৌলিক রচনা সম্বলিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪৫টি, যার মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা হচ্ছে ১৩৮৪৪ অর্থাৎ ছাপাকৃত প্রতি পৃষ্ঠাকে হাতের লেখায় ২.৫ পৃষ্ঠা করে ধরলে তাতে ৩৪৬১২ পৃষ্ঠা হয়। অবশ্য এই সংখ্যাটি শুধুমাত্র তাঁর মৌলিক রচনার হিসেব এবং সম্পাদিত মৌলিক গবেষণার ওপর গ্রন্থগুলোর পৃষ্ঠার সংখ্যা সব মিলিয়ে লক্ষের অধিক হবে। নিজস্ব দর্শন, চিন্তা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে বোদ্ধা সমাজের কাছে তিনি ছিলেন বহুল আলোচিত, সমালোচিত ও বিতর্কিত এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও এ ধারা বহমান।

বাঙলাদেশের মতন একটি অনুন্নত দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে এখানে লেখাপড়া জানা মানুষের মাঝে না পড়া এবং না জানার প্রবণতা গড়ে উঠেছে। তাই কেউ নিজে থেকে কোন বইয়ের বা পত্রিকার পাতা উল্টিয়ে দেখার গরজ অনুভব করে না। আবার যে কোন ব্যক্তিকে বা বিষয়কে সমাজে পরিচিত করতে প্রচার হচ্ছে সবচেয়ে বড় মাধ্যম। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে বা বিভিন্ন জাতীয় পর্বদগুলোতে কিংবা জাতীয় স্থানীয় প্রচার মাধ্যমে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোতে যারা ঘুরেফিরে সব সময় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন তারাই কেবল দেশে শীর্ষস্থানীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করে থাকেন। সরকারি বা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের রচনাশৈলী যাই হোক না কেন তার গুণগত মান প্রশ্নসাপেক্ষ। তবে সঠিক মূল্যায়ন শুধুমাত্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-এর গবেষকগণই করতে পারবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলাদেশে ড. আহমদ শরীফ এর মতন হাতে গোনা চার থেকে পাঁচজন লিখিয়ে পাওয়া যাবে যাঁরা কোন অবস্থাতেই সরকারি বা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার বেড়াজালে নিজেদেরকে জড়ান নি, তাই তারা মননশীল লেখক হিসেবে বা তাঁদের চিন্তাসমৃদ্ধ গ্রন্থগুলো লেখাপড়া জানা মানুষের কাছে অদ্যাবধি অজ্ঞাত ও অপঠিত থেকে গেছে। একইভাবে ড. আহমদ শরীফ-তাঁর রচিত সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি-দর্শন এবং ইতিহাসের ওপর শতেরও অধিক মননশীল গ্রন্থগুলো শুধু অপঠিতই নয়, অগোচরেও থেকে গেছে।

ভাববাদ, মানবতাবাদ ও মার্কসবাদের মৌলিক সমন্বয় প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণে, বক্তব্যে ও লেখনীতে। তাঁর রচিত শতেরও অধিক গ্রন্থের প্রবন্ধে তিনি অত্যন্ত জোরালো যুক্তি দিয়ে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা-বিশ্বাস-সংস্কার পরিত্যাগ করেছিলেন এবং আন্তরিকভাবে আশা পোষণ করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য। পঞ্চাশ দশক থেকে নব্বই দশকের শেষ অবধি সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাসসহ প্রায় সব বিষয়ে অজস্র লিখেছেন তিনি। দ্রোহী সমাজ-পরিবর্তনকারীদের কাছে তাঁর পুস্তকরাশির জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয়। তাঁর রচিত পুস্তকরাশির মধ্যে বিচিত চিন্তা, স্বদেশ অন্বেষা, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, বাঙলার সূফী সাহিত্য, বাঙালির চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা, বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি, এ শতকে আমাদের জীবন ধারার রূপরেখা, প্রত্যয় ও প্রত্যাশা এবং বিশেষ করে দু'খণ্ডে রচিত বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য তাঁর অসামান্য কীর্তি। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, প্রখ্যাত গবেষক আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ-এর মানসপুত্র হিসেবে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে পাহাড়সম গবেষণাকর্ম তাঁকে কিংবদন্তী পণ্ডিত হিসেবে উভয় বঙ্গে ব্যপকভাবে পরিচিতি দিয়েছে। সমগ্র বঙ্গে এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, এবং অদ্যাবধি স্থানটি শূন্য রয়ে গেছে। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করে তিনি মধ্যযুগের সাহিত্য ও সামাজিক ইতিহাস রচনা করে গেছেন। বিশ্লেষণাত্মক তথ্য, তত্ত্ব ও যুক্তিসমৃদ্ধ দীর্ঘ ভূমিকার মাধ্যমে তিনি মধ্যযুগের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস বাঙলা ভাষা-ভাষী মানুষকে দিয়ে গেছেন, যা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অমর গাঁথা হয়ে থাকবে।

অত্র খণ্ডটি ড. আহমদ শরীফ রচনাবলীর অষ্টম খণ্ড। বর্তমান খণ্ডে মোট সাতটি গ্রন্থ সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রকাশকাল অনুযায়ী গ্রন্থগুলোকে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রতি সংযুক্তকৃত প্রথম গ্রন্থটি হচ্ছে 'মুক্তি নিহিত নতুন চেতনায় ও মুক্ত চিন্তায় (১৯৯৩)'। এ গ্রন্থে তিনি মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ে মোট তেত্রিশটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধগুলো নানা শিরোনামে হলেও মূলত: চিন্তার বিকাশ, মুক্তির প্রকাশ, রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নতির দিক নির্দেশনার কথাই বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থটি হচ্ছে "দেশ-কাল-জীবনের দাবী ও সাক্ষ্য (১৯৯৫): এতে মোট পঁচিশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলো মুক্ত চিন্তার বিকাশ, নারীবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, বঙ্গাব্দের উদ্ভব, মহামানব গৌতম বুদ্ধসহ লেখকের নিজস্ব চিন্তা ও দর্শনের প্রতিফলন। তৃতীয় গ্রন্থটি "জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা (১৯৯৭)", এতে ক্ষুধা-দারিদ্র্য, ফ্যাশন, যুক্তিবাদ, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ ও মানুষ নিয়ে মোট আটাশটি সুচিন্তিত ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা সংকলিত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ গ্রন্থটি "স্বদেশ চিন্তা (১৯৯৭)"-তে তেত্রিশটি ক্ষুদ্র অথচ অত্যন্ত চিন্তাশীল এবং নিজস্ব যুক্তি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখক তাঁর দর্শনের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এসব লেখায় গণতন্ত্র, বিশ্বায়ন, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অন্যান্য সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংকলিত হয়েছে।

পঞ্চম গ্রন্থটি "উজান স্রোতে কিছু আষাঢ়ে চিন্তা (১৯৯৮)" নামই বলে দেয় অত্র গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলোতে মূলত: দেশ-সমাজ-রাষ্ট্র, দারিদ্র্য, শিক্ষা ও মুক্তচিন্তা ইত্যাদি বিষয়ে মোট পঁয়ত্রিশটি লেখা আছে। লেখাগুলো লেখকের নিজস্ব রচনাশৈলী ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশ ঘটেছে।

ষষ্ঠ গ্রন্থটি "মানস মুকুরে বিম্বিত স্বদেশ (১৯৯৮)" মোট চৌত্রিশটি প্রবন্ধ নিয়ে। এখানে সমাজ-রাষ্ট্র-মানুষ নিয়ে লেখক তাঁর নিজস্ব চিন্তা, বিশ্লেষণ ও আশা-প্রত্যাশার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অত্র গ্রন্থে প্রবন্ধগুলো মূলত গণতন্ত্র, নারীমুক্তি, দুর্নীতি, সংস্কৃতিসহ ধর্মনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে লিখিত হয়েছে।

অত্র খণ্ডে সংকলিত শেষ গ্রন্থটি হচ্ছে "স্বদেশের স্বকালের সমাজ চালচিত্র (১৯৯৮)"। অত্র গ্রন্থে মোট বত্রিশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। বাঙলাদেশ, সংস্কৃতি, গণতন্ত্র, বিশ্বায়ন, মানবতাবাদসহ অন্যান্য সমাজ ও রাষ্ট্র বিষয়ক লেখা অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লেখিত যে, সংকলিত সব প্রবন্ধগুলোতে লেখকের নিজস্ব চিন্তা ও দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে।

উপসংহারে বলা যায় যে, বর্তমান খণ্ডটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আগামী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী জনাব ওসমান গনি ও কর্মাধ্যক্ষ জনাব কামরুল হাসান মেননের আগ্রহ ও সহযোগিতার জন্য বইমেলায় প্রকাশ করা গেল এবং এর সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. নেহাল করিমকে সহযোগিতার জন্য স্মরণ করছি।

AMARBOI.COM

ড. পৃথ্বিলা নাজনীন নীলিমা
অধ্যাপক, বাংলাবিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা

বইমেলা ফেব্রুয়ারি ২০১৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

মুক্তি নিহিত নতুন চেতনায় ও নতুন চিন্তায়

উনিশশতকী কোলকাতায় মুক্তিঅন্বেষা ১৫ মানবতা- উদারতা যুক্তিবাদিতা ২২ জ্ঞানই শক্তির, প্রগতির ও মনুষ্যমৈত্রীর উৎস ২৫ সংস্কৃতিমানের স্বরূপ ২৭ সংস্কৃতিচর্চা ২৯ জ্ঞানবাদ, বুদ্ধিবাদ, যুক্তিবাদ, প্রকৃতিবাদ ৩১ নতুন কথা বলতে মানা ৩৩ চিন্তক নিহত হয় : চিন্তা বেঁচে থাকে ৩৪ ঘটনা ও রটনা ৩৬ পৃথিবী মানুষে আকীর্ণ, মন্যুষত্বে রিক্ত ৩৮ অনুরাগই জীবনের পুঁজি-পাথেয় ৩৯ দ্বন্দ্বের উৎস ৪৩ রাজনীতিকের চোখে মানুষও কাজে লাগানোর প্রাণীমাত্র ৪৪ রাষ্ট্রিক জাতীয়তাববোধের বিস্তারই সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষেধক ৪৬ মানুষের ধর্মভাব দুষ্ট শাসকের হাতিয়ার ৪৯ বিজয়দিবসে প্রভাতচিন্তা ৫০ মুক্তি নিহিত নতুন চেতনায়, মুক্ত চিন্তায় ৫৩ জীবনে যুক্তির প্রয়োগ-অপ্রয়োগ ৫৫ মনোজগৎ ৫৬ লোভ ও দারিদ্র্যই বিপর্যয়ের মূলে ৫৯ বিপণ্ন মানুষ ৬১ লড়াকু চাই ৬২ মানবিকতা ক্ষয়িষ্ণু ৬৩ নতুন অঙ্গীকার চাই ৬৫ যন্ত্রযুগের সংকট ও সমাধান পন্থা ৬৭ বিপদ আসন্ন : প্রতিরোধ চাই ৬৯ আজকের আমরা ৭১ আজও নিশিদিন ভরসা রাখি ৭৪ ভোটতন্ত্রে দুর্দশা ঘুচবে না ৭৬ গণতন্ত্রে সেক্যুলার সরকার ও রাষ্ট্রের বিকল্প নেই ৭৭ 'আমাদের সুদিন আসবে আগামী প্রজন্মের কালে' ৮০ 'সমাজতন্ত্রের ও মার্কসবাদের কোন বিকল্প আজ অবধি নেই' ৮৭ বাঙলা ভাষা সংস্কার ৯৩ বাঙলা বর্ণমালা, বানানরীতি ও ব্যাকরণ সংস্কার ৯৪

দেশ-কাল-জীবনের দাবি ও সাক্ষ্য

নারীবাদ ও পুরুষবাদ নয় : বিশ্বমানববাদই কাম্য ৯৯ সমাজে ও রাষ্ট্রে বস্তুবাদের স্বীকৃতি ও সংক্রমণ ১০৫ ফ্রিথিঙ্কার্স সমাজ ১০৮ আজকের জীবনের দাবি ১১২ দেশে-বিদেশে সংখ্যালঘুর স্থিতি ১১৪ মানবতার অন্যনাম : অভিন্ন মানবসংস্কৃতি ১২২ নভঃতথ্যে মগজ ধোলাই ১২৫ বঙ্গাব্দের উদ্ভব কবে ও কোথায় ১২৭ দাঙ্গার ইতিহাস ১৩২ দাঙ্গা-লড়াই-যুদ্ধের কারণ ১৩৭ রাষ্ট্রীয় স্বার্থে সেক্যুলারিজম আবশ্যিক ১৩৯ আমাদের রাষ্ট্রিক জীবনে যা প্রয়োজন ১৪১ মাতৃভূমিপ্রীতি ও জাতীয় সঙ্গীত ১৪৩ গুণের মানুষ চাই ১৪৭ মহামানব বুদ্ধ-সম্পৃক্ত চিন্তা ১৫০ 'বুদ্ধ'কে স্মরণ করি সবাই, কিন্তু ১৫৩ নিঃস্ব বেকারে ও মুচিরাম গুড়ে দেশ আকীর্ণ ১৫৭ নন্দিত ও শ্রদ্ধেয় হয়ে বাঁচা ১৫৯ চিন্তার চাষ ১৬১ মৌলবাদ ১৬২ বর্গে বিভক্ত মনীষা তার রাজনীতিক আর্থিক ও সাংস্কৃতিক প্রকাশ ১৬৪ নিরুপদ্রুত সুন্দর জীবনের ও সমাজের অন্বেষা ১৬৭ বিশেষজ্ঞতা ও মনুষ্যত্ব চর্চা ১৭১ কলমবাজি বনাম নকলবাজি ১৭৩ একুশের চেতনা ও ভবিষ্যতের ভাবনা ১৭৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা

জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা ১৮১ প্রগতিশীলতার সংজ্ঞা ১৮৩ প্রগতি-প্রতিক্রিয়াশীলতার লড়াই ১৮৫ জীবনের কালিক প্রয়োজন চেতনার নাম প্রগতিশীলতা ১৮৭ ফ্যাশনও প্রগতিপ্রতীক ১৮৯ ফ্রিথিঙ্কার্সের প্রভাবে সমাজপরিবর্তন সম্ভব ১৯১ সংজ্ঞার্থে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তা ১৯৪ অস্থির-অশান্ত পৃথিবী ১৯৭ স্বদেশে-বিদেশে মানবমুক্তিপন্থা ১৯৯ ডিফেন্স বাজেট ২০১ তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের লাক্ষণিক রূপ ২০৩ হিংস্রতা ও নরহত্যা বৃদ্ধির কারণ অন্বেষা ২০৫ অবক্ষয়ের প্রতিষেধক হচ্ছে নৈতিক ও আদর্শিক চর্যা ২০৬ শিক্ষা-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্ব ২০৮ যুক্তিবাদের পক্ষে কিছু কথা ২০৯ মর্ত্যজীবনে যৌক্তিক দাবির গুরুত্ব ২১১ ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল চায় আমজনতা ২১২ বারোমেসে আকাল কবলিত মধ্যবিত্ত ২১৫ শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ কেন খাদ্যাভাবে মরে! ২১৬ দিশেহারা জনতার ক্লিষ্ট ও রুগ্ন সমাজ ২১৮ শিশু শ্রমিক ও দরিদ্রতম দেশের সমস্যা ২২০ শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে নতুন ষড়যন্ত্র ২২৩ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র রাষ্ট্রে রাজনীতি ২২৯ বর্বরতা নেই কোথায়? তবু ২৩১ শোষিত গণমানবমুক্তি ও বিশ্বপরিস্থিতি ২২৩ রাষ্ট্রের কল্যাণের কথা ২৩৫ রূপতী সেনের রচিত 'বিভূতিভূষণ' ২৩৮ প্রশ্নোত্তরে কিছু আত্মকথা ২৪১

AMARBOI.COM

স্বদেশ চিন্তা

মানুষ না প্রাণী : কোন পরিচয় মুখ্য! ২৬৩ বিরোধ-বিবাদের আদি অবিলুপ্ত কারণ ২৬৫ স্বাতন্ত্র্যচেতনা, দ্বেষণা ও দাঙ্গা-লড়াই ২৬৭ সাম্প্রদায়িকতা-জাতীয়তা ও বৈশ্বিকস্তরে আন্তর্জাতিকতা ২৭০ অর্থোডকসি ও মৌলবাদ বন্ধ্য ও গ্রহণবিমুখ ২৭২ অতীতমুখিতা বনাম জীবনের প্রয়োজনমুখিতা ২৭৬ রেলগাড়ির যাত্রী ও সমাজজীবন ২৭৭ দোজখ ২৭৯ বঞ্চনামুক্ত সমাজচিন্তা ২৮১ সংস্কৃতির রূপান্তর ২৮৩ মনুষ্য সত্তার বিকাশ দ্রুততর হচ্ছে ২৮৫ যৌক্তিক-বৌদ্ধিক চিন্তার সূচনাকাল ২৮৬ বৈশ্বিকস্তরে জীবন-জীবিকা পদ্ধতি ও সংস্কৃতি ২৮৮ কম্যুনিস্টরা ও আমরা ২৯১ নতুন আশার ও আশ্বাসের আলো ২৯৫ শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি ২৯৭ রাজনীতিও শিখতে হয় ৩০০ পুরাণ-ইতিহাসের আলোকে আমাদের অবস্থা ও অবস্থান ৩০২ শত বছর আগের কোলকাতা, শত বছর পরের ঢাকা ৩০৫ রাজনীতি ও গণমানবের স্বার্থ ৩০৮ জাতীয় সমস্যা-মুক্তির পন্থা ৩১০ গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব লক্ষ্যে ৩১২ স্বখাত সলিলে মজালে এ কনক বাঙলা ৩১৪ বাঁচার গরজেই মুক্ত চিন্তা-চেতনা আবশ্যিক ৩১৮ মর্ত্যজীবনের চাহিদা পূরণই সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৩১৯ অভাব আমাদের চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের ৩২১ শিক্ষা সমস্যা ৩২৩ বিশ্ব মুসলিমে-খ্রীস্টানে কূটনীতিক-রাজনীতিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব ৩২৬ বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণজাত বিপন্ন জীবন ৩৩৩ যে রূপের পিপাসায় প্রেম হল জীবন অধিক ৩৩৪ আত্মসেবী নাগরিকের নিরপেক্ষতা দোষ না গুণ ! ৩৩৯ মর্ত্যজীবন বিনোদন চায় ৩৪২ শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয়ই জাতীয় জীবনে সর্বপ্রকার বিকৃতির কারণ ৩৪৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উজান স্রোতে কিছু আষাঢ়ে চিন্তা

পাঁচুর মতো কেউ ধর্ম ছাড়েনি ৩৫১ মিথ্যা মাত্রই কি পরিহার্য? ৩৫২ মর্ত্যজীবনের দুঃখ-বিপদ কি জীবনবিরোধী উপসর্গ? ৩৫৬ মানবিক শক্তিই বল-ভরসার আকর ৩৫৮ প্রাণিজগতে আত্মার সন্ধানে ৩৬০ তরঙ্গিত চেতনা-প্রবাহের রূপ-স্বরূপ ৩৬২ অহং-এর উৎস ও ভিত্তি ৩৬৪ মুক্তজীবন উপভোগের উৎস ৩৬৬ প্রগতির ও প্রাগ্রসর চিন্তার শত্রু ৩৬৮ মনের মতো ৩৭১ কাঙাল চরিতম্ ৩৭৩ আড্ডা ৩৭৪ রাজার আদর্শ সিংহ ৩৭৬ 'জাতীয়' বিশেষণে সবিশেষ ৩৭৮ চৈতন্যের পরিচর্যা ৩৮০ আবারও শিক্ষার কথা ৩৮২ সাম্প্রদায়িকতার ও জাতীয়তার প্রভেদ ৩৮৪ বঞ্চিত মানুষের কথা ৩৮৬ নতুন আসে কালিক প্রয়োজনে ৩৮৮ যুগান্ত লক্ষণ সূচিত ৩৯২ একালে যোগ্য নেতৃত্বে বিপ্লব সম্ভব ও সহজ ৩৯৪ প্রেমের রঙে মন না রাঙিয়ে ৩৯৬ বিদেশী বিতাড়ন-চেতনার উন্মেষের কারণ ৩৯৯ ব্যাক গিয়ারের রাজনীতি ৪০১ একটি আষাঢ়ে প্রস্তাব ৪০৩ অনুবাদ না করেও ৪০৬ রহমত আলীর জিজ্ঞাসা ৪০৮ ঘৃণা করার অঙ্গীকার আবশ্যিক ৪০৯ আশায় ও আশ্বাসে বাঁচব ৪১০ রজতজয়ন্তী উৎসবে উৎসাহ কাদের ৪১২ 'ঐকমত্য' কি ও কেমন ৪১৫ আবর্তনে পরিবর্তন নেই ৪১৭ মুক্তিযুদ্ধের কিস্‌সা ও কাহিনী ৪১৯ 'পাছে লোকে কিছু বলে' ৪২২ শিক্ষা-কমিটি ও প্রাসঙ্গিক চিন্তা ৪২৪

AMARBOI.COM

মানস মুকুরে বিম্বিত স্বদেশ

ত্রি 'এ' তত্ত্ব Avoid, Adopt, Advance ৪২৯ শাস্ত্রী ও ধার্মিক অভিন্ন নয় ৪৩১ গণতন্ত্র ও প্রভুতন্ত্র ৪৩২ গণতন্ত্র ও ক্ষমতার রাজনীতি ৪৩৫ হুতোম প্যাঁচার ডাক ৪৩৭ শারীর প্রয়োজন ও মানসখাদ্য ৪৩৯ বিজ্ঞান বনাম বিশ্বাস ৪৪০ বিজ্ঞানসম্মত যৌক্তিক চেতনা চালিত জীবন ৪৪২ এ মুহূর্তের আমরা ৪৪৪ নিখাদ সুষ্ঠু রাষ্ট্রিক জাতীয়তা জরুরী ৪৪৬ গণকল্যাণে ও জাতিগঠনে রাষ্ট্র ৪৪৮ সংবাদপত্র: রাজার মন্ত্রী, প্রজার বন্ধু, সমাজের শিক্ষক ৪৫০ জীবনযাত্রায় আমাদের পুঁজি-পাথেয় ৪৫৩ জুয়া ৪৫৪ আমরা দুর্নীতিবাজ নই– নীতিশূন্য ৪৫৬ নারীমুক্তি কি আজো সুদূরে! ৪৫৮ আবেদনে সাড়া মিলবে কি? ৪৫৯ চিরকেলে পরামর্শ স্মরণ করুন ৪৬১ রজতজয়ন্তী কালে প্রাসঙ্গিক চিন্তা ৪৬৩ রজতজয়ন্তী কেন? ৪৬৬ দুর্নীতি বিলুপ্তি পন্থা ৪৬৮ মানী হওয়ার পন্থা ৪৭০ হাওয়াই মত-মন্তব্য-সিদ্ধান্ত ৪৭২ স্বাতন্ত্র্য চেতনা ও মৌলবাদ ৪৭৫ বরগুনায় তালেবান গেরিলা ৪৭৭ ধৈর্য চাই: এদিন যাবে ৪৭৮ রাজনীতিকের ও সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৪৮০ আমরা অবক্ষয়গ্রস্ত ৪৮১ নারীর স্বাধিকার আদায়ের পূর্বশর্ত ৪৮৩ সেক্যুলারিজম ও অভিন্ন বিশ্বসংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের ৪৮৮ সংখ্যালঘুর দীন-দুর্বলের বারো মাসে তেরো সমস্যা ৪৯০ সাক্ষাৎকারে, দেশ কাল সমাজ সম্বন্ধে মত, মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত ৪৯৫

স্বদেশের স্বকালের সমাজের চালচিত্র

বাঙলাদেশের বিগত পঞ্চান্ন বছরের রৈখিক চালচিত্র ৫১৯ অনক্ষর কিন্তু চৌকষ মাতব্বরের গোহারী ৫২৩ পৃথাচারের কারণ সন্ধানে ৫২৭ সংস্কৃতি সম্বন্ধে ৫৩০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রগতিশীলদের গণসংস্কৃতিচর্চা সম্বন্ধে ৫৩১ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নয়– নতুন চিন্তাই জিয়নকাঠি ৫৩২ রুচির-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের দেয়াল ভাঙছে ৫৩৪ প্রাণিত্ব বনাম মনুষ্যত্ব লক্ষণ ৫৩৭ কালের পুতুল ৫৩৯ নির্লক্ষ্য জীবন নেই ৫৪১ নিয়তি না নির্মিতি! ৫৪৩ মগজী অবদানে পৃথিবী ঋদ্ধ–হার্দিক অর্জনে ব্যর্থ ৫৪৫ নির্বিশেষ মানববাদই কাম্য ৫৪৯ মানুষের জন্যেও 'অভয়শরণ' চাই ৫৫২ কালিক জীবনের তাগিদে ৫৫৫ প্রগতিশীল কালিক জীবনের প্রয়োজনে ৫৫৮ স্বদেশে স্বকালে সমাজে বৈশ্বিক সমকালীনতা আবশ্যিক ৫৬০ গণমানস-মুক্তি কত দূরে! ৫৬৩ সংযম ও সহিষ্ণুতাই বাঞ্ছিত জীবনের পুঁজি ও পাথেয় ৫৬৭ সর্বদা সর্বত্র প্রবলমাত্রই পীড়নপ্রবণ ৫৬৯ শাক্ত ৫৭১ সুবিধাবাদীর, সুযোগ সন্ধানীর ও নগদজীবীর দেশ বাঙলাদেশ ৫৭৪ ত্রাস থেকে ত্রাণ চাই ৫৭৬ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়ুন, প্রতিযোগিতা করুন ৫৭৮ মরুতে মরূদ্যান ৫৮০ আত্মমর্যাদায় উন্নতশির হতে হলে ৫৮২ আমাদের ইতিহাসের স্রষ্টাও হতে হবে ৫৮৩ পৌরাণিক দৈবশক্তির মহিমা প্রচারের পরিণাম ৫৮৬ নিরুদ্যম কম্যুনিস্ট বনাম 'তৃণমূল সংগঠন' ৫৮৭ মৌলবাদীর শরিয়া শাসন ৫৮৯ প্রবল প্রতিবেশী রাষ্ট্রভীতি ৫৯১ কালে-কালান্তরে মূল্যায়নে হেরফের ৫৯৫

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তি নিহিত
নতুন চেতনায় ও নতুন চিন্তায়

AMARBOI.COM

আত্মীয়তার স্মারক রূপে দুই পৌত্র
আসিফ করিম অর্চিকে
ও
নাহিদ করিম পাস্থকে
দিলাম

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনিশশতকী কোলকাতায় মুক্তি অন্বেষা

মানুষের মন-মননের রুচির ও শ্রেয়স-চেতনার গতিপ্রকৃতি বিচিত্র। স্বমনের, মতের, মন্তব্যের, সিদ্ধান্তের ও মীমাংসার পক্ষে যুক্তির হয় না অভাব। তাই আজ অবধি কোনো বা কারো দর্শন যেমন সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি, কোনো বা কারো শস্ত্র যেমন সর্বজনমান্য হয়নি, প্রেয় ও শ্রেয় বুদ্ধিও তেমনি কখনো কারো বা কোনো নীতিনিয়মে বা প্রথা পদ্ধতিতে চালিত হয়নি। বৈচিত্র্যেই মনুষ্য মনের, মননের, মতের, পথের, মনীষার এবং জীবন-যীবিকার প্রকাশ ও বিকাশ,– এ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য স্বীকার করেই মানুষ বৈচিত্র্যের ঐক্য সন্ধান করে। প্রকৃতির জগতে যেমন Unity in diversity নামে একটা নিয়মের রাজত্ব আবিষ্কার করে মানুষ জিজ্ঞাসা মিটিয়ে তার আবর্তন, স্থিতি, গতি-প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আশ্বস্ত থাকতে চায়, তেমনি মনুষ্য স্বভাবেরও কিছু স্থূল-সূক্ষ্ম লক্ষণ জৈব বা প্রজাতিক সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে ধারণাগত করে তাকেই জ্ঞান-অভিজ্ঞতা কিংবা বিজ্ঞতারূপে পুঁজি-পাথেয় করে যৌথজীবনে পারিবারিক, সামাজিক, বৈষয়িক জীবনে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ-পণ্য-অর্থ-সম্পদ থেকে প্রেম-প্রীতি-স্নেহ, মমতা প্রভৃতির পারস্পরিক বিনিময়ে জীবন সুখের, স্বস্তির, নির্ভরতার, আস্থার ও ভরসার নিরাপত্তায় স্থিত রাখতে চায়।

প্রগতিশীল, প্রাগ্রসর, উদার মুক্তচিন্তার ও চেতনার, জিজ্ঞাসু মানুষের মনের গতি-প্রকৃতি স্থূল ও সাধারণভাবে দুই ধারার, দ্বিমুখী। সম্মুখমুখিতা ও পশ্চাৎমুখিতা, সম্মুখগতিশীলতা এবং অতীতাশ্রয়ী নিশ্চিতিপ্রবণতা। কেননা নতুনে অজ্ঞতা ও অদেখা জাত অনিশ্চয়তা তথা সফলতা-বিফলতার ঝুঁকি থাকে। অতীতমুখিতায় অতীতাশ্রয়িতায় সে আশঙ্কা থাকে না। সুখ-সমৃদ্ধির চমকপদ আশ্বাস না থাক, আকস্মিক বিপর্যয়ের আতঙ্ক থাকে না। এ জন্যেই আমরা জিজ্ঞাসু কিছু লোকের মধ্যে পুরোনো গতানুগতিশীলতায় বিরাগ, বিরক্তি, সন্দেহ, অবিশ্বাস, অনাস্থা, অনির্ভরতা, বর্জনস্পৃহা, উপযোগ অস্বীকৃতি দেখতে পাই। তাঁরা নতুন কিছু চিন্তায় চেতনায় উদ্যমে উদ্যোগে আবিষ্কারে উদ্ভাবনে সৃষ্টিতে সদা উৎসুক। তাঁদের মন-মনন কৌতূহলী পর্যটক সাহসী অভিযাত্রীর মতো। তাঁদের মধ্যে থাকে 'সৃষ্টি সুখের উল্লাস'। তাঁদের আমরা রেনেসাঁসপন্থী রেনেসাঁসপ্রবণ বলে অভিহিত করতে পারি। অতএব রেনেসাঁস বলতে আমরা উদারতা, মানবতা, সৃষ্টিশীলতা, নতুন চিন্তা-চেতনার অনুশীলন প্রবণতা, উদ্ভাবন ও আবিষ্কার স্পৃহা বুঝব। এরই আক্ষরিক অর্থ নবজন্ম বা নবজীবন প্রাপ্তি। আর একদল থাকেন, তাঁদেরও জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বিচার-বিবেচনা শক্তি থাকে। কিন্তু তাঁরা নিশ্চিত নিশ্চিন্ততা ছেড়ে অনিশ্চিতির পথে পা বাড়াতে নারাজ। তাঁরা অতীতাশ্রয়ী, ঐতিহ্যপ্রিয়, অতীতমুখী, রক্ষণশীল, গতানুগতিক কূর্মস্বভাবের ও মাণ্ডূক্যবুদ্ধির। তাঁদের পুরোনোপ্রীতি প্রবল, নতুন ভীতি অনতিক্রম্য, তাঁরা উচ্চাশী নন, আত্ততোষ। তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ আপ্তবাক্য হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো'। নতুনে অজ্ঞতার ঝুঁকি থাকে, পুরাতনে থাকে জ্ঞান-অভিজ্ঞতা-বিজ্ঞতার পুঁজিপাথেয়। তাঁরাও স্থবির নন, স্তম্ভিত নন, তাঁরাও সচল, গতিমান, এমনকি সৃষ্টিশীলও, পার্থক্য কেবল মূল্যায়নের, মূল্যবোধের, আত্মজ্ঞানের গুণ-মান-মাপ-মাত্রার। তাঁদের চঞ্চলতা, গতি, চলমানতা, আবর্তনমুখী, বন্ধ্যা, অবক্ষয়প্রবণ ও উৎকর্ষ বা বিকাশরিক্ত। অথচ তাঁরাও পরিমার্জন, সংশোধন, পরিবর্ধন, অনুশীলন ও পরিচর্যাপ্রবণ। এ জন্যেই তাঁরা হলেন পুনরুজ্জীবন বা পুনর্জাগরণ (Revivalism) তথা পূর্বাবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে সংস্কারবাদী (Reformer) তাঁরা মেরামত মাধ্যমে পুরোনোকে, পুরোনো বিশ্বাস সংস্কার-ধারণা-আচার-আচরণকে ও ভাব-চিন্তা-কর্মকে টিকিয়ে স্বস্ত সুপ্রতিষ্ঠা রাখার প্রয়াস। এ অতীত ও ঐতিহ্য আশ্রয়ীদের বলা হয় Revivalist.

সংস্কারবাদীরা [Reformer-রা] বাহ্যত গ্রহণে-বর্জনে উদার হলেও অন্তরে রক্ষণশীল, পুরোনোপ্রীতিই তাঁদের Reformer করে, নতুনের নির্মাতা বানায় না। তাই যেন-তেন প্রকারে পুরোনোকে মেরামতের, অদল-বদলের, সময়ের একান্ত দাবি পূরণ লক্ষ্যে জোড়াতালির মাধ্যমে টিকিয়ে রাখার, বাঁচিয়ে রাখার, চালু রাখার মমতা বশে সংস্কার করেন সংস্কারবাদীরা নতুনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আধুনিক হওয়ার ও থাকার তথা সময়োপযোগী জীবনযাত্রায় প্রগতিবাদীদের ও নতুন স্রষ্টাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়। এবং সে কারণেই উপযোগরিক্ত সংস্কারক পুনরুজ্জীবনবাদী Reformer-Revivalist-দের প্রয়াস-প্রযত্ন পরিচর্যা-আস্ফালন-প্রচার-প্রচারণা মাধ্যমে মহিমা-মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ সত্ত্বেও বৃথা ও ব্যর্থ প্রমাণিত হয়, কালের চাহিদা মেটাতে পারে না বলে Reformer ও Revival বিলুপ্তির শিকার হয়। যুগান্তরকে রোধ করা যায় না। শাস্ত্র ও সমাজ, আচার ও আচরণ, ভাব-চিন্তা তাই দেশ-দুনিয়ার সর্বত্র বারবার অদল-বদল হয়েছে, পরিবর্তন-বিবর্তন রোধ করা যায়নি।

AMARBOI.COM

এর মধ্যে Reformer-এর প্রয়োজন-চেতনা যুগে যুগে সব সমাজেই লঘু গুরুভাবে দেখা দেয়, সময়ের দাবি এড়ানো যায় না বলেই। তাই আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগেও নতুন চিন্তা-চেতনার, নতুন কথার, নতুন নীতিনিয়মের প্রবক্তা-প্রবর্তক পাচ্ছি। হাঁচি-কাশি যেমন চেপে রাখা যায় না, তেমনি নতুন চিন্তা-চেতনা-কথা-নীতি-নিয়ম-আদর্শ ও জান-মাল-গর্দান হারানোর ঝুঁকি নিয়েও উচ্চারণ না করে পারা যায় না। এভাবে আহত, নিহত, লাঞ্ছিত, বিড়াড়িত হয়েছেন নতুনের অনেক প্রবক্তা-প্রবর্তক। নতুন কথা, নতুন তত্ত্ব, নতুন তথ্য, নতুন সত্য মরে না, স্মৃতিরূপে হলেও বেঁচে থাকে চিরন্তনতার ও অবিস্মরণীয়তার রূপ নিয়ে। আমাদের ভারতবর্ষেও মধ্যযুগ অবধি বৃত্তাবদ্ধ ছকে বাঁধা শাস্ত্র-সমাজ-আচার দ্রোহিতা লঘু মাত্রায় স্থানিকভাবে কম হয়নি। এতেই বোঝা যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই লক্ষ কোটি মানুষের মধ্যে কেউ-না-কেউ নতুন চিন্তা করেই, নতুন চেতনায় প্রবুদ্ধ হয়ই, নতুন সত্য উপলব্ধি করেই, নতুন আবেগ অনুভব করেই নতুন সৃষ্টির উল্লাসে মাতে, নতুন কিছু উদ্ভাবন করে, নতুন কিছু আবিষ্কারের জ্ঞান ও বুদ্ধি-শ্রম ও সময় ব্যয় করেই স্বেচ্ছায় ও সানন্দে।

উনিশ শতকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে আমাদের পরিচয় ঘটে সর্ব প্রকারে উন্নততর প্রতীচ্য জ্ঞান বিজ্ঞান বুদ্ধি মন মনন মনীষা শিল্প সাহিত্য দর্শন ইতিহাস শিক্ষা স্বাস্থ্য সমাজ চিকিৎসা প্রভৃতির সঙ্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনিশ শতকে কোলকাতায় তথা গোটা ভারতে প্রতীচ্য বিদ্যায় ও মনীষায় অনন্য অতুল্য ছিলেন রামমোহন (১৭৭৪-১৮৩৩]। তিনি নাস্তিক না হলেও অজ্ঞেয়বাদী হয়েছিলেন। আর যুক্তিবাদী (Rational) যে ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর রচিত তোহফাতুল মুহয়াহিদীন (১৮০৩), বেদ, বাইবেল, কোরআন, পুরাণ, গীতা, উপনিষদ প্রভৃতি তাঁকে কোনো স্থির বিশ্বাসে কিংবা সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতে মহানির্বাণতন্ত্রই রামমোহনের ব্রাহ্ম মতবাদের উৎস। তবে হিন্দুর দেব মূর্তি ছেড়ে তিনি মনের ও বুদ্ধির মুক্তি লাভ করে অকুতোভয় হয়েছিলেন। কেননা তাঁর পার্থিব জীবন-জীবিকা তাঁর কোনো আদর্শনিষ্ঠার ও পারত্রিক জীবনভীতির পরিচয় দান করে না। রামমোহনকে আমরা বলতে পারি জাগতিক জীবনাসক্ত মুক্তপুরুষ। তাঁর অনুসারী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ব্রাহ্ম হয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বমুক্ত ছিলেন না। ব্রাহ্ম হয়েও তিনি ব্রাহ্মণ্য আচার-সংস্কার ত্যাগ করতে পারেননি। জাত-পাতের সংস্কারও তাঁর ছিল। অব্রাহ্মণে এমনকি সগোত্রে [বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবরে]| বৈবাহিক সম্বন্ধে তাঁর আপত্তি প্রবল ছিল, নারী অবরোধ প্রথায়ও ছিল তাঁর সমর্থন। কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের ও অন্য কিছু সাক্ষ্য প্রমাণে যদি আস্থা রাখি তা হলে মানতেই হবে জমিদার হিসাবেও তিনি প্রজাদরদী ছিলেন বলা যাবে না, তাঁর দানশীলতার খ্যাতিও নেই। তাঁর এক অদ্ভুত আচরণেরও মহৎ ব্যাখ্যা মেলে না, যে-স্ত্রী তাঁকে চোদ্দটি সন্তান উপহার দিয়ে প্রায় অপরিণত বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, তাঁর 'দাহ' কাল অবধি অপেক্ষা না করে সকালেই পর্যটনের জন্যে গৃহত্যাগ কেমন শোকের বেদনার কিংবা প্রেমের প্রতীক প্রতিম বা প্রতিভূ। সুদীর্ঘকাল ধরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩) প্রকাশনা আদি ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃত্ব আর অনেক সুসন্তানের পিতৃত্বই তাঁর অমরত্বের, কৃতিত্বের ও কীর্তির কারণ।

AMARBOI.COM

কেশবচন্দ্র সেনের [১৮৩৮-৮৪] বিদ্যার-চিন্তার, কর্মের ও দক্ষতার অনন্যতা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু তাঁর ইহজাগতিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠা অধ্যাত্মচিন্তা আর পারত্রিক জীবনচেতনায় সঙ্গতি-সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া নির্মোহ ব্যক্তির পক্ষেও মগজ মনন প্রয়োগে সুসাধ্য হয় না। আমরা এখানে ব্রাহ্ম সমাজের ত্রিধাবিভক্তির জন্যে কে বা কারা দায়ী সে বিষয়ে প্রশ্নই তুলব না। আমাদের তাতে কোনো প্রয়োজন নেই বলে। তবে বুদ্ধির মুক্তি ও সময়ের চাহিদা-চেতনা তাঁর ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে দুর্লক্ষ্য নয়। তবু বলতেই হবে যে কোরআন-বাইবেলের প্রভাব ব্রাহ্ম শাস্ত্রে ও সমাজে স্থিতি পায়নি, পরিণামে হিন্দুর শাস্ত্র ও আচার ঘেঁষা হয়ে পড়ে। আর এখন তো ব্রাহ্মে ও হিন্দুতে পার্থক্য মোটেই প্রকট নয়। এ দিক দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্র সেন এমন কি আদি ব্রাহ্মসমাজ নেতা রবীন্দ্রনাথও রক্ষণশীলতারই পরিচর্যা করেছেন, এঁদের মধ্যে সংস্কারের চেষ্টা দেখা যায় না।

আমাদের অবশ্য রামমোহনের পরেই ডিরোজিওর (১৮০৯-৩১) হিন্দু কলেজের আলোচনা করাই উচিত ছিল। কেননা সংশয় কিংবা অজ্ঞেয়বাদী ডিরোজিও এবং নাস্তিক নিরীশ্বর অথচ মানবতাবাদী ডেভিড হেয়ার–এ দুজনের সান্নিধ্য, সাহচর্য উপস্থিতিই হিন্দু কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাব-বিপ্লব ঘটিয়েছিল, প্রভাবিত কিংবা কৌতূহলী করেছিল আরো কিছু উদার চিন্তার পক্ষপাতী ব্যক্তিদের। এঁদের মধ্যে আমরা পাই অক্ষয়কুমার দত্তকে যিনি সেকালেই ছিলেন য়ুরোপীয় বহুভাষাবিদ, নিরীশ্বর। লোকে অবশ্য বলে মৃত্যুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বে তিনি ব্রাহ্মমত বরণ করেছিলেন। আর সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রের [১৮২০-৯১] চিন্তা-চেতনা-আচরণ তো ডিরোজিও বাঞ্ছিতই ছিল আক্ষরিকভাবে। যদিও ঈশ্বরচন্দ্র নারীমুক্তি আন্দোলনে কিংবা শিক্ষাবিস্তারে এজুদের অথবা ব্রাহ্মদের সাহায্য সহায়তা সমর্থন চাননি স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ব্যক্তিত্বাভিমানী ছিলেন বলেই হয়তো।

প্রথম যে তিনটি বিষয়ে কোলকাতার ব্রিটিশ সান্নিধ্যে আসা ও প্রতীচ্য সংস্কৃতি প্রভাবিত সমাজে অমানবিক কিংবা চরম বর্বরতা রূপে ঠেকল সেগুলি ছিল সতীদাহ, বালবৈধব্য ও বর্ণহিন্দুর বিশেষ করে ব্রাহ্মণের বহুবিবাহ। এসব নিয়ে হিন্দু কলেজের ছাত্ররাই ডিরোজিওর প্রভাবে প্রণোদনায় প্রবর্তনায় [১৮২৬-৩১] জিজ্ঞাসু, সন্ধিৎসু, সন্দেহ প্রবণ, যুক্তি প্রয়োগে উপযোগ যাচাই বাছাই প্রবণ হয়ে ওঠে। এঁরাই ডিরোজিওর মন্ত্রণালয় প্ররোচনায় কিংবা প্রেরণায় শাস্ত্র সমাজ আচার সম্পৃক্ত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা গতানুগতিক অভ্যাসে মেনে চলতে অস্বীকৃতি জানাল এবং দ্রোহটাও উচ্ছৃঙ্খলতার রূপ নিল। ডিরোজিও চাকরি হরালেন [১৮৩১]। ডিরোজিও গঠিত Academic Association (১৮২৭) এবং Society for the Acquisition of general knowledge (১৮৩৮), জ্ঞানান্বেষণ ও বেঙ্গল এসপেকটেটার এ সূত্রে স্মর্তব্য। হিন্দু কলেজে অনেক ছাত্রই পড়েছে। ডিরোজিও প্রভাবিত ছাত্ররাই কোলকাতার উচ্চবিত্তের, উচ্চবর্গের ও উচ্চবর্ণের সমাজের শাস্ত্রিক-সামাজিক-আচারিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার ক্ষেত্রে বিপ্লব-বিপর্যয় ঘটালেন। যে কয়জন প্রখ্যাত, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রসিক কৃষ্ণ মল্লিক (If I hate anything from the bottom of my heart, it is Hindusim) খ্রীস্টান কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় [1813-85]. মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় [1814-78] (ইনি উত্তর ভারতে জমিদারী পেয়ে সরকারানুগত হয়ে পড়েন) প্রমুখ। এঁরা লিখেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, পত্রিকা বের করেছেন, দ্রোহ করেছেন। বলতে গেলে ডিরোজিও পর্তুগীজ বংশীয় পিতার ও ব্রিটিশ বংশীয়া মাতার সন্তান হয়েও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীকে তথা ভারতকেই স্বদেশরূপে মনে-প্রাণে-মননে বরণ করেছিলেন। তিনি এবং কাশীপ্রসাদ মিত্র উভয়েই প্রথমে স্বদেশ প্রেমের কবিতা লেখেন ইংরেজীতে, রঙ্গলাল-মধুসূদন লেখেন এঁদের পরে। এজুরা তথা হিন্দু কলেজের ছাত্ররা মিথ্যা কথা বলে না। কেবল এ চালু ও শোনা তথ্য দিয়েই এঁদের নৈতিক, আদর্শিক ও চারিত্রিক গুণের, মানের, মাপের ও মাত্রার গাঢ়–গভীরতায় আস্থা রাখা চলে। তবু বলতেই হব এবং মানতেই হবে যে এ ছিল ক্ষণপ্রভা, কৈশোর-যৌবনের আবেগসঞ্জাত, কেননা, চল্লিশোত্তর বয়সে ওই দ্রোহী-বিপ্লবী সংস্কারকরাই নিষ্ঠ ব্রাহ্ম, খ্রীস্টান কিংবা হিন্দু হয়ে গেলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রই হয়ে গেলেন থিয়োসফিস্ট– নীতিবান অধ্যাত্মবাদী, শেষ বয়সে নাকি ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। অনেকেরই প্রত্যাশিত মিল [১৮০৬-৭৩] কোঁতে [১৭৯৭-১৮৫৭] বাদী নিরীশ্বর ও প্রত্যক্ষবাদী ইংরেজী শিক্ষিত লোক ক্রমে দুর্লভতায় বিরল হয়ে গেল। ফলে হিন্দুর শাস্ত্রিক-সামাজিক-আচরিক জীবনে বাঞ্ছিত কোনো পরিবর্তনই ঘটল না। এবং ব্রিটিশ কৃপা-দাক্ষিণ্য দুর্লভ হয়ে ওঠার ফলে ১৮৬৭ সালের হিন্দুমেলা হিন্দুসমাজে নতুন করে স্বধর্ম, স্বদেশ, স্বজাতি চেতনা প্রবল করে তোলে। নতুন রক্ষণশীলতার, স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধির, বিচ্ছিন্নতার ব্যবধানচেতনার উদ্ভব ঘটায়। কেননা, তখন ভারত আর কোলকাতায় নিবদ্ধ নয়, সত্যই গোটা ভারত ব্রিটিশ কবজায়, মুসলিমরাও তখন কৃপার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অংশপ্রার্থী যা কার্যত দৈশিক রাষ্ট্রিক জাতীয়তা গঠনের কংগ্রেসী প্রয়াস-প্রযত্নও ব্যর্থ করে দেয়। স্বধর্মীর ও স্ববর্ণের জাতীয়তাই বাস্তবে দৃঢ়ভিত্তিক হয়ে আজও আর্থ-বাণিজ্যিক-রাজনীতিক লাভ-লোভ-স্বার্থ সম্পৃক্ত হয়ে রক্তক্ষরা প্রাণহরা দাঙ্গা বাধায়– উনজনের জান-মাল-গর্দান অনিশ্চিতির মধ্যে রাখে, স্বভিটেয়, স্বঘরে, স্বগাঁয়ে, স্বদেশে মানসিকভাবে অসহায় প্রবাসী করে রাখে, দেহের-প্রাণের-মনের-মগজের-মননের-মনীষার শক্তি-সাহস বিনষ্ট করে।

তবু স্বীকার করতে হবে যে নিরীশ্বর অক্ষয়কুমার দত্ত, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, ব্রাহ্মমতবাদ, প্রত্যক্ষবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, সংশয়বাদ প্রভৃতি কোলকাতার সমাজকে পরোক্ষে পরমসহিষ্ণু, সহ ও সমস্বার্থে সংযমে, সহিষ্ণুতায় সৌজন্যে সহযোগিতায় সহাবস্থানে শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়েছিল, অভ্যস্ত করেছিল।

যাঁরা কিছু লিখিত কৃতি-কীর্তি কিংবা খ্যাতি রেখে গেছেন, আমরা কেবল তাঁদের নামই স্মরণে রেখেছি। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে শেষপাদ অবধি অনেক নাস্তিক, নিরীশ্বর, অজ্ঞেয়বাদী, সংশয়বাদী, প্রত্যক্ষবাদী উদারতায়, মানবতায়, পরমতসহিষ্ণুতায়, সমর্থনে, সহায়তায়, য়ুরোপীয় জীবনযাত্রার আদলে অনুসরণে অনুকরণে প্রকাশ্য আচার-আচরণ সহ্য করায় সংস্কৃতি-সভ্যতার একটা নতুন পরিবেশ-প্রতিবেশ তৈরি হয়েছিল। অনেক বিষয়েই এবং অনেকক্ষেত্রেই কোলকতা শহরে একটা ক্ষুদ্র কৃত্রিম লণ্ডন শহরও গড়ে উঠেছিল। রাজনারায়ণ বসুর [১৮২৬-৯৯] মতো ঋষিকল্প ধীর-স্থির শিক্ষকও ছিলেন মদ্যপ।

শোভাবাজারের জমিদারের নেতৃত্বে বিশেষ করে রাধাকান্তদেবের [১৭৮৪-১৮৬৭] মতো প্রভাবশালী নেতারা নামে, বক্তৃতায়, বিবৃতিতে রক্ষণশীল হলেও য়ুরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও কিছু আচার-আচরণকে বর্জনে উৎসাহ বোধ করেননি। কাজেই রক্ষণশীলেরাও বাহ্যত ও কার্যত আর মানসিকভাবেও নতুন যুগের হাওয়ায়ও আক্রান্ত হয়েছিলেন। রাধাকান্তদেব নাকি বাড়ি ফিরেই সবুট মন্দিরে দেবতা পদে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানাতেন [দেবীর সমীপে আছ জুতা দিয়া পায়ে। দেবী পূজা করি কেন টাকা ছাড় মদে]। মুক্ত চিন্তা-চেতনার রেনেসাঁসপন্থীরা নন কেবল, বদ্ধচিত্তের শাস্ত্র-সমাজ-আচারনিষ্ঠ Revivalist, Reformer-এরাও প্রতীচ্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসাদ যে পরিণামে আত্মোৎকর্ষের কারণ হবে, তা অনুভব-উপলব্ধি করেছিল। এখন যেমন সাধারণ লোকেরাও বিজ্ঞান-কৌশল-প্রকৌশল-প্রযুক্তির গুরুত্ব আত্মকল্যাণের গরজেই স্বীকার করে।

দ্রোহীর লক্ষণাক্রান্ত না হলেও আরো দুজন মুক্তবুদ্ধির, যুক্তিবাদিতার, স্বদেশের, স্বজাতির কল্যাণ চিন্তাকামী ব্যক্তির অনন্য-অসামান্য অবদান অবশ্য স্বীকার্য। এদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য নন, কেননা উনিশ শতকে মুখ্যত তিনি অতুল্য শক্তিধর সাহিত্যস্রষ্টা রূপেই সুপরিচিত। দেশ-সমাজ-মানুষ সম্বন্ধীয় তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ বের হয় ১৯০৮-১৭ সনের মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্র [১৮৩৮-৯৪] ছিলেন অনন্য-অসামান্য অতুল্য মন-মনন-মেধা-মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব। তাঁকে আজকাল কেউ কেউ বিদ্রূপার্থে হিন্দুয়ানীর সংস্কারক কিংবা নবসংস্করণ কর্তা হিসেবে চিহ্নিত করেন। আমরা তাঁকে যুক্তিবাদী, মুক্তবুদ্ধি, মানবপ্রেমী ও স্বদেশপ্রাণ হিতবাদী বলেই জানি। জীবনের প্রায় প্রথম পঁয়তাল্লিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছর অবধি ছিলেন তিনি শাস্ত্রে উদাসীন নাস্তিক, নিরীশ্বর। শেষ বয়সে হলেন গীতাগতপ্রাণ নিষ্ঠ হিন্দু এবং তখন তিনি হিন্দুকে একটা আধুনিক জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার পথের সন্ধান গিতে প্রয়াসী হয়ে একটা হিন্দুজীবন বিধি রচনা করেন। Hindu Code of Life-কৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যায়, অনুশীলনে ধর্মতত্ত্বে দেবীচৌধুরানীতে, সীতারামে, গীতার ব্যাখ্যায় হিন্দু-হিতৈষী ধর্ম-সমাজবেত্তা বঙ্কিমচন্দ্রের মন-মত-মনন-মনীষা-সিদ্ধান্ত-মীমাংসা এসব গ্রন্থে সুপরিব্যক্ত। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলোতে বাঙলার ও বাঙালীর তেরো থেকে উনিশ শতক অবধি কালের ইতিবৃত্তান্ত রয়েছে। আর তাঁর নতুন চিন্তা-চেতনা-মেধা-মনীষা আর জীবনদৃষ্টি ও জগৎচেতনার পরিচয় রয়েছে তাঁর কমলাকান্তে ও বিবিধ প্রবন্ধে, অনুশীলনে-ধর্মতত্ত্বে। তাঁর সব চিন্তা-চেতনার উৎস হচ্ছে নিখাত-নিখুঁত মানবপ্রেম, মানবতা, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিচার-বিবেচনা। এ মানুষই অবলীলায় বলতে পারেন, 'আমি চিরকাল আপনার রহিলাম পরের হইলাম না, এই জন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই।' 'যদি আত্মপরিবারকে ভালবাসিয়া, তাবৎ মানুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে সংসারে ধনে মানে বিবাহে সুখ নাই।.... মনুষ্য জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।.... যাহার চিত্ত শুদ্ধ আছে, তাহার আর কোন ধর্মেই প্রয়োজন নাই। চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম। .... (কৃষকদের) এই নয়শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে, আমি কাহারও জয়গান করিব না। মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই।.... সকল ধর্মের উপর স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না। (ধর্মতত্ত্ব).... যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফলা হউক। [দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, জমিদার পৃঃ ১২৯২] এ বঙ্কিমচন্দ্রকে Revivalist Reformer বলে বাদ দেয়া যাবে না, বরং এর মধ্যেই রেনেসাঁসের শাঁস মেলে। বঙ্কিমচন্দ্রেরই কেবল উনিশশতকী অশিক্ষাদুষ্ট অনুন্নত বাঙলায় সর্বাত্মক ও সর্বার্থক জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা ছিল।

অধ্যাত্মবাদী গেরুয়াপরা স্বামী হলেও বিবেকানন্দ ওর্ফে নরেন্দ্রনাথ দত্ত [১৮৬৩-১৯০২] ছিলেন একজন সমকালীন বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক জীবন ও জগৎ, সমাজ ও সংস্কৃতি, রাজনীতি ও রাষ্ট্র, অর্থসম্পদ ও বাণিজ্য সচেতন ব্যক্তি; তাই তিনি কেবল ব্রহ্মচারী-সন্ন্যাসী ছিলেন না, উদাসীন ছিলেন না দেশ-দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে। তিনি আস্তিক ছিলেন, তবে কূর্মস্বভাবের গোঁড়া রক্ষণশীল ছিলেন না। তিনি জানতেন, বুঝতেন ও মানতেন যে বহুভাষী ও বহু বিচিত্র মতবাদী সম্প্রদায় অধ্যুষিত ভারতে মানুষে মানুষে মিলন-ময়দান তৈরি না হলে ভারতের রাজনীতিক ভবিষ্যৎ থাকবে অনিশ্চিত। তিনি এ-ও জানতেন, এক সময়ে ব্রাহ্মণ মগজ-মনীষা দিয়ে মানুষের উপর রাজত্ব করেছে, পরে পেশীশক্তি দিয়ে শাসন-শোষণ-পীড়ন করেছে ক্ষত্রিয় তথা শক্তি-সাহস সম্পন্ন শ্রেণী। তারপরে আর্থ-বাণিজ্যিক শক্তিই হয়েছিল প্রবল, যাকে আমরা বলি বৈশ্যশক্তি বা ধনবল। এখন শূদ্রের আধিক্যশক্তিই প্রবল। এ জন্যে শুরু হবে শূদ্র রাজত্ব। অর্থাৎ নিঃস্ব, নিরন্ন, দরিদ্র, অজ্ঞ-অনক্ষর কৃষক-শ্রমিক-ক্ষেতমজুর-ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পেশাজীবী চিরবঞ্চিত-শোষিত-দলিত-প্রতারিতরাই স্বাধিকারে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠ হওয়ার আন্দোলনে নামবে। তিনি নাকি ১৯০১ সনে ঢাকা শহরে বলেছিলেন শূদ্রের অভ্যুত্থান প্রথমে ঘটবে রাশিয়ায় এবং পরে চীনে। তার ইতিহাস-চেতনা ও অনুমান বৃথা হয়নি। রাশিয়ায় জনগণমুক্তি ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, চীনেও হয়েছে। হিন্দুর মনন-মনীষার, শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতির সুপ্রাচীনতার গৌরব-গর্ব জগৎময় প্রচারই ছিল তার জীবনের লক্ষ্য। এতে স্বজাতির হীনমন্যতা ঘুচেছে, শিক্ষিত ব্যক্তি আত্মপ্রত্যয়ী হয়েছে। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য হলেও তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল নির্বিশেষে মানবসেবা। তাঁরই উক্তি হচ্ছে 'জীবে দয়া করে যেইজন/সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। জগদ্ব্যাপী 'রামকৃষ্ণ মিশন' হচ্ছে বিবেকানন্দেরই মানবতার, মানববাদিতার ও জনসেবার সাক্ষ্য প্রমাণ। এ জন্যে বিবেকানন্দকেও Revivalist ও Reformer রূপে চিহ্নিত করে রেনেসাঁস তথা নতুন মুক্ত চিন্তা-চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা চলে না। কেননা তাঁর নিজ কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়েছিল! 'আমি একজন সমাজতন্ত্রী তার মানে এই নয় যে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ, এর কারণ উপোস করার চেয়ে আধ পেটা খাওয়া ভাল [আস্তিক সুলভ উক্তি]।' তিনি এও জানতেন, বুঝতেন ও মানতেন যে, জনগণের সাহায্যেই জনগণের মুক্তি ঘটাতে হবে। তিনি হিন্দু সমাজের বর্ণভেদের অবসানও চেয়েছিলেন, বলেছিলেন—বল মুচি-মেথর আমার ভাই। স্মর্তব্য গান্ধী ওদের 'হরিজন' বলে দয়া দেখিয়েছিলেন মাত্র। বিবেকানন্দের ভক্তরা তাঁর অনেক অসামান্য শক্তির ও উক্তির কথা বলে থাকেন, আমাদের অবশ্য তাতে কাজ নেই। আমরা বলি বিবেকানন্দও রেনেসাঁস প্রসূন। এখানে উল্লেখ্য ও স্বীকার্য যে রেনেসাঁস কোনো জাতিগত গুণ নয়, নিতান্ত ব্যক্তিক উদ্যম-উদ্যোগ-মন-মনন-মেধা-মনীষার ফল ও ফসল। এ কোনো যৌথ সামাজিক প্রয়াস-প্রযত্ন প্রসূনও নয়। এর প্রভাবে কিংবা পরিচর্যায় অজ্ঞ-অনক্ষর নিঃস্ব দরিদ্র তুচ্ছ বৃত্তিজীবীর, মজুরের, ভূমিদাসের কোনো আর্থিক-শারীরিক-মানসিক-সাংস্কৃতিক-আচারিক উন্নতিও হয়নি—য়ুরোপে কিংবা বাঙলায় বা ভারতে। এ হচ্ছে শাহ-সামন্ত-বুর্জোয়ার মনন-মনীষার চমক জাগানো বিকাশ ও প্রকাশ মাত্র। এর মধ্যে অবশ্য ভাববাদপ্রসূত মানবতার নির্যাস রয়েইছে।

www.amarboi.com

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাঙলা গদ্যের চর্চা শুরু হলে তার অনুকরণে, অনুসরণে কিংবা প্রভাবে কোলকাতার শিক্ষিত লোকের মধ্যে যেমন বই লেখার, পত্র-পত্রিকা বের করার, ছাপাখানা স্থাপনের আগ্রহ দ্রুত প্রসার লাভ করে, তেমনি কোলকাতার স্বল্প শিক্ষিত মুসলিম বাঙালী সমাজে দোভাষী শায়েরের এবং বিশুদ্ধ বাঙলায় সাহিত্যসৃষ্টি ও অন্যান্য বিষয় আলোচনার লক্ষ্যে পত্র-পত্রিকা প্রকাশনায় উৎসাহ জাগে। যদিও শিক্ষা-সাক্ষরতার স্বল্পতার দরুন প্রতিবেশ ছিল বিশেষ প্রতিকূল। ইংরেজী শিক্ষার অভাবে এঁরা শাহ ওয়ালী উল্লাহ [১৭০২-৬৩], সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী [১৭৮৬-১৮৩১], জামাল উদ্দীন আফগানী [১৮৩৯-৯৭] প্রমুখের প্রভাব স্বীকার করেছিলেন। এঁদের দৃঢ়মূল ধারণা ছিল যে শাস্ত্রানুসরণে শৈথিল্যের পরিণামেই মুঘল তথা মুসলিম জাতির রাজশক্তির পতনের মুখ্য কারণ। এরা মধ্যযুগীয় পন্থায় সংস্কারক ও মুসলিম পুনরুজ্জীবনবাদী। এক হিসেবে ওয়াহাবীরা Revivalist Reformer সংস্কারক মাত্র। হাজী শরীয়তউল্লাহ [১৮২৬-৭০] ছিলেন সাহসী আত্মপ্রত্যয় দ্রোহী, তাই তিনি কেবল ফরজ মানতেন অর্থাৎ কোরআনের অনুরাগী, অনুগামী তথা অনুগত। এ ক্ষেত্রে এও উল্লেখ্য যে হেস্টিংসের কাছে আবেদন করে যারা কোলকাতা মাদ্রাসা [১৭৮১] স্থাপিত করিয়েছিল, তারা ছিল রইস [অভিজাত] উর্দুভাষী। ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে গোড়ায় কোনো বাঙালীই ছিল না এবং গোড়া থেকে নওয়াব আবদুল লতিফ [১৮২৮-৯৭], সৈয়দ আমীর আলী [১৮৪৯-১৯২৮], আমির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোসেন প্রমুখ। প্রায় সব ইংরেজী শিক্ষিত লোকই ছিলেন উর্দুভাষী পরিবারের। স্যার সৈয়দ আহমদই [১৮১৭-৯৮] মুসলিমদের ইংরেজ প্রীতির ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের প্রবর্তনা দেন। উনিশ শতকের তৃতীয় পাদ অবধি ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী ছিলেন বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। বস্তুত ১৮৮০ সনের পরেই আমরা বাঙালী স্নাতক বা স্নাতকোত্তর লোকের সন্ধান পাই।

উর্দুভাষীদের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী সমাজের কোনো সামাজিক-বৈবাহিক-সাংস্কৃতিক-ভাষিক-সাহিত্যিক সম্পর্ক সম্বন্ধ পরিচয় ছিলই না। অথচ ১৯৪৭ সন অবধি ওই রইস উর্দুভাষীরাই ছিলেন তাঁদেরঅচেনা-অজানা বাঙলাভাষীর আশা-আকাঙ্ক্ষা-প্রয়োজন-চাহিদা-দাবি সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যা-বিত্ত বলে বাঙালীর রাজনীতিক নেতা, বাঙলার স্বার্থের প্রতিনিধি, বাঙলাভাষীর অভিভাবক। এ বিড়ম্বনার ইতিবৃত্তান্ত এখন আর দুর্লভ নয়। উনিশ শতকে আবদুর রহিম দাহরি [আনু ১৭৮৫-১৮৫৩] নামের এক নিরীশ্বর উদার উর্দুভাষী লক্ষ্ণৌ থেকে এসে ১৮১০ সন থেকে কোলকাতায় বাস করতেন। তাঁর একটি আত্মচরিত আছে। দেলওয়ার হোসেন আহমদ [১৮৪০-১৯১৩] নামের এক উদার ও মুক্তবুদ্ধি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম স্নাতক ইংরেজী প্রবন্ধে মুসলিমদের অন্ধতার ও দুর্দশার কথা ভাবতেন ও লিখতেন ইংরেজীতে। এঁদের সঙ্গে সামাজিক-ভাষিক-সাংস্কৃতিক যোগ ছিল না বলে এঁদের চিন্তাচেতনায় বাঙালী মুসলিমরা উপকৃত কিংবা প্রভাবিত হয়নি। আবদুর রহিম ও দেলওয়ার হোসেনের মুক্ত চিন্তা-চেতনা অবশ্যই ছিল, এঁরা রেনেসাঁসবাদী বটে। আর কেবল বিশ শতকেই রোকেয়াকে ও আবুল হোসেনকে [১৮৯৭-১৯৩৮] পাই মুক্তিবুদ্ধির দ্রোহীরূপে। উর্দুভাষী জমিদারকন্যা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন [১৮৮০-১৯৩২] যদিও স্কুল চালাতেন উর্দুভাষী মেয়েদেরই, তবু বাঙলাভাষায় লিখে লিখে এ অগ্নিকন্যা অনেকের মনেই দ্রোহ জাগিয়েছিলেন তাঁর অবরোধবাসিনী, মতিচূর প্রভৃতি গ্রন্থের মাধ্যমে। যদিও তখন মুসলিম সমাজে বাঙলা ও ইংরেজী শিক্ষা ছিল স্বল্প লোকে সীমিত।

WWW.AMARBOI.COM

মানবতা-উদারতা-যুক্তিবাদিতা

আদর্শ-উদ্দেশ্য-লক্ষ্য-দায়িত্ব-কর্তব্য-কর্ম-বৃত্তি যদি অপরিবর্তনীয় ও অভিন্ন হয়, তা হলে অনেক ভাব-চিন্তা-কর্ম-কথা-আচরণ আবর্তিত ও পুনরুক্ত হয়ই। একে পুনরুক্তি বা পুনরাবৃত্তি দোষ বলা যাবে না। আমাদের অনেক লেখা ও কথা এ কারণেই বার বার বিভিন্ন প্রবন্ধে ও গ্রন্থে পারম্পর্য রক্ষার, প্রসঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার, যুক্তির, তত্ত্বের, তথ্যের ও সত্যের সূত্র স্মরণ করিয়ে দেয়ার গরজে পুনরুক্ত হয়। আমরা এসব সচেতনভাবে বাদ দিয়ে বাঞ্ছিত বক্তব্য শ্রোতার বা পাঠকের বোধগম্য করে হৃদয়বেদ্য করে, মর্মভেদ্য করে, মগজগম্য করে বলতে পারিনে। আমাদের মতো দুর্বল মনের, নিম্নমানের মননের ও স্বল্প

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মগজ-মেধা-মনীষার লেখকের এ দোষ তাই ক্ষমা করতেই হয়, অন্তত সহ্য করতেই হয়। ঐ কৈফিয়তের পর কথা শুরু করছি।

নিতান্ত প্রাণিত্বের, অরণ্যতার, হিংস্রতার, জাঙ্গলিক বর্বরতার, অসভ্যতার ও অসংস্কৃতির লক্ষণ হচ্ছে সাধারণভাবে জৈব বৃত্তি-প্রবৃত্তি তাড়িত কর্মে-আচরণে জীবন যাপন। ভব্যতার, সভ্যতার নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি, শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতি, শাসন-প্রশাসন, রুচি-সৌন্দর্য-বিবেক-বিবেচনা প্রভৃতি অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত মানুষ সচেতনভাবে সর্তকতার সঙ্গে সযত্ন অনুশীলনে ও প্রয়াসে জৈবজীবনের বৃত্তি-প্রবৃত্তি সংযত, পরিমিত, পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও পরিশোধিত করে। মানবপ্রজাতির প্রাণী থেকে জীবজগতের জল-স্থল-আকাশচারী প্রাণীর মুখ্য পার্থক্য এক্ষেত্রেই ঘটে—এ শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের ফলেই।

আমরা ভব্য সভ্য নীতিনিষ্ঠ, শাস্ত্রশাসিত শিক্ষিত সংস্কৃতিমান রুচিপুষ্ট ন্যায়বান বিবেকী মানুষে ধীরবুদ্ধি, সংযত, পরমত ও পরআচরণ সহিষ্ণুতা এবং যথাকালে যথাস্থানে যথাপ্রয়োজনে ও যথাপাত্রে যথেষ্ট গুণের, মানের, মাপের ও মাত্রার সৌজন্য ও শোভন আচরণ প্রত্যাশা করি।

যে-ব্যক্তির, যে-পরিবারের, যে-দলের, যে-সমাজের, যে-শাসক-প্রশাসকের, যে-সরকারের, যে-রাষ্ট্রের কিংবা দেশের অঞ্চলের যে সব গাইয়ে-বাজিয়ে-নাচিয়ে-আঁকিয়ে-লিখিয়ে, সঙে-শিল্পীতে-স্রষ্টায়-চিন্তকে-বিজ্ঞানীতে-দার্শনিক-শাস্ত্রীতে-সরদারে ক্ষোভে-ক্রোধে-জ্বালার-যন্ত্রণায়-মগজে-আবেগে [intellect-এ ও emotion-এ] কথায়-কাজে-আচরণে বাঞ্ছিতমাত্রার সংযম নেই, পরমতে ও পরআচরণে সহিষ্ণুতা বা নানা বিবেচনায় সহ্য করার ধৈর্য নেই, অবৌদ্ধিক-অযৌক্তিক সামান্য কিংবা লঘু বা তুচ্ছ বলে তথা ক্ষতির আশঙ্কারিক্ত বলে কান-মন-গুরুত্ব না দেয়ার মতো উদারতা কিংবা সৌজন্য নেই, তাকে বা তাদের কোনো সংজ্ঞায় বা সংজ্ঞার্থেই পরিশীলিত রুচি-বুদ্ধি-যুক্তির শিক্ষিত রুচিমান সংস্কৃতিমান বিবেক-বিবেচনা সম্পন্ন শিক্ষক-উকিল-ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-সাংবাদিক শাস্ত্রী, সমাজপতি, দলনেতা, শিল্পী-স্রষ্টা-বিজ্ঞানী-দার্শনিক-ঐতিহাসিক বলা যাবে না। আশৈশবলব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-আচার-আচরণ-ধারণা ও শাস্ত্রে আস্থা চালিত জিজ্ঞাসারিক্ত মানুষের চৈতন্যে মার্কসবাদের প্রয়োগ-প্রয়োজনীয়তা আপাতত ঢোকানো সহজে সম্ভব না হলেও একালে য়ুরোপে অনুশীলিত ও বিকশিত Humanism, Liberalism and Rationalism-এর অনুশীলন-পরিশীলন সচেতন হয়ে সতর্কভাবে সযত্নপ্রয়াসে করতে হবে নতুবা সমকালীন যন্ত্রযুগে, যন্ত্রজগতে ও যন্ত্রনির্ভর স্বাতন্ত্র্য-ব্যবধান-বিচ্ছিন্নতাবিনাশী যন্ত্র-প্রকৌশল-প্রযুক্তি ও জীবন-জীবিকা পদ্ধতিচালিত বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক জীবনে অন্যদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভব হবে না। মধ্যযুগের অবসান হবে না আমাদের মনে-মননে-মনীষায়-রুচিতে-সংস্কৃতিতে। বিবেকে-বিবেচনায় মিলবে না বাঞ্ছিত মাত্রার সংযম, পরমত সহিষ্ণুতা ও আচারিক সৌজন্য। উল্লেখ্য যে চিরকালই এক প্রকারের কৌমী, গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক, দালিক, সাম্প্রদায়িক জাতিক, শাস্ত্রিক, রাষ্ট্রিক মানবিকতা, মানবতা, উদারতা, গ্রহণশীলতা এবং বিশ্বাস সংস্কারানুগ যুক্তিশীলতা চালু ছিলই। কিন্তু তাতে মনের, মননের, বুদ্ধির, যুক্তির, মনীষার, বিবেকের, ন্যায্যতার অবাধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও মুক্ত চিন্তা-চেতনা ছিল না, কতকগুলো ধরা-বাঁধা নীতি-নিয়মের, রক্তের, ভাষার, অতীতের, ঐতিহ্যের স্বাতন্ত্র্য সম্পৃক্ত সংকীর্ণ সীমিত পরিসরের বেষ্টনী ছিল। তাই সে-সব নীতি-নিয়ম মানবিক উদারতা ও যুক্তিবাদিতা স্বদলের, স্বকৌমের, স্বগোষ্ঠীর, স্বগোত্রের, স্বসম্প্রদায়ের, স্বজাতির ক্ষেত্রেই ছিল প্রযোজ্য। অন্যরা ছিল শত্রু কিংবা শত্রুকল্প অথবা সম্ভাব্য শত্রু। এ কালের উদার য়ুরোপীয় মনের মননের মনীষার ফল ও ফসল শিল্প-সাহিত্য, দর্শন। আর জীবন-জীবিকাচেতনা, সমাজবোধ, রাষ্ট্রচিন্তা, দেশপ্রেম, মানবসেবা, ব্যক্তিসত্তার মূল্য ও মর্যাদাজ্ঞান, ব্যক্তি-সমাজ-প্রশাসন-সরকার ও রাষ্ট্র প্রভৃতির পারস্পরিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারগত সম্বন্ধ ও সম্পর্কও আধুনিকতম চেতনার ফল। গণতন্ত্র, জনগণতন্ত্র, গণমুক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে চিন্তা-চেতনা মত-মন্তব্য-সিদ্ধান্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে শোনা-জানা-বোঝা জাত ধারণা ও সযত্নলব্ধ-জ্ঞান এবং মানুষ, মনুষ্যত্ব, মানব মর্যাদা, ব্যক্তিজীবনের দায়িত্ব-কর্তব্য, অধিকার সম্বন্ধে শিল্প সাহিত্য দর্শন পাঠই কেবল একালের দিগন্তহীন উদারতা, সীমান্তহীন মানবতা এবং অশেষ অবাধ যুক্তিবাদিতা বোধগম্য করে। য়ুরোপীয় ফরাসী ইংরেজী জার্মান ভাষার কোনো একটি ভাষায় বই-পত্র না পড়লে কেউ একালোপযোগী মানবতা, উদারতা ও যুক্তিবাদিতা প্রত্যাশিত মাত্রায় আয়ত্ত করতেই পারে না।

অশৈশবপ্রাপ্ত বিশ্বাস-সংস্কার-ভয়-ভক্তি-ভরসা-ধারণা-আস্থা কূপমণ্ডূক্য ও রক্ষণশীলতা পরিহার সচেতন ও সযত্ন প্রয়াসে সম্ভব কেবল একালের য়ুরোপীয় লিবারেল শিক্ষাব্যবস্থায় ও জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে। মানুষকে কালো-ধলো, পণ্ডিত-মূর্খ-পাগল,-পঙ্গু, নারী-পুরুষ অবিশেষে কেবল মানুষ হিসেবে জানা-বোঝা-মানাও সম্ভব কেবল এ যুগের দার্শনিক রাষ্ট্রিক আধুনিকম দায়িত্ব-কর্তব্য-অধিকার সম্পৃক্ত মানব সত্তার মূল্য-মর্যাদা গুরুত্বের স্বীকৃতির ভিত্তিতেই। এ-ও আজকের য়ুরোপীয় মনীষাপ্রসূন। তাই এ অবিশেষ নিখাদ নিখুঁত মানবতায় শিক্ষা ও দীক্ষাও য়ুরোপীয় বিদ্যালয়ে লভ্য। আর আমরা জানি এবং বুঝিও যে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি ধীরবিবেচনায় স্থির লক্ষ্যে সচেতনভাবে সতর্কতার সঙ্গে সযত্ন প্রয়াসে সাহসের সঙ্গে শক্তির যোগে, অঙ্গীকারের সঙ্গে উদ্যাগের ও আয়োজনের সমতা রেখে জীবন-জীবিকাক্ষেত্রে যথাপ্রয়োজনে, যথাকালে, যথাস্থানে ও যথাপাত্রে স্বাধিকারের সীমা লঙ্ঘন না করে প্রয়োগ করলেই ব্যক্তির নৈতিক সামাজিক জীবন সমাজে শ্রদ্ধার ও সম্মানের না হয়েই পারে না। এ একান্তভাবেই একালে যুক্তিনিষ্ঠার ও যুক্তিবাদিতার প্রসাদ। বলতে গেলে Rationalism-ই মনুষ্যত্বের বীজ-বৃক্ষ ও ফল। একালে মানুষের ভরসা হচ্ছে প্রতীচ্য উদার চিন্তা-চেতনালব্ধ উদারতা, মানবতা ও যুক্তিবাদিতা। এর ফলেই সম্ভব হয়েছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বীকৃতি। এর ফলেই সম্ভব হয়েছে আধুনিকতম গণতন্ত্রের সেক্যুলারিজম। জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-শিক্ষা-সম্পদ-ভাষা-নিবাস নির্বিশেষে আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষের সম ও সহ নাগরিকত্ব। স্বয়ং গণতন্ত্রও এ অবিশেষ মানব চৈতন্যের দান। একালের গণতন্ত্রের তথা মানবতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে ব্যক্তির যথেচ্ছ চিন্তা করার, চিন্তা উচ্চ কণ্ঠে কিংবা লিখিত-মুদ্রিত ভাবে ঘোষণার-প্রচারের-প্রচারণার এবং নির্বিঘ্নে-রাষ্ট্রে বাসের, কাজের, বলার ও ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতার স্বীকৃতি ও জন্মগত স্বাধিকারের স্বীকৃতি। য়ুরোপীয় মনন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনীষার প্রভাব ব্যতীত এ মানবতা, এ উদারতা, এ যুক্তিবাদিতা যে সম্ভব নয়, তার প্রমাণ ফ্রান্সের প্রাক্তন উপনিবেশে মৌলবাদী-ঠেকানো সম্ভব হয়েছে ফরাসী জানা লোকের আধিক্যে, মৌলবাদ-ঠেকানো অসম্ভব হয়েছে প্রতীচ্য শিক্ষা-বিরল আফগানিস্তানে, মোসাদ্দেকের ইরানে খোমেনির কর্তৃত্বের দরুন।

জ্ঞানই শক্তির, প্রগতির ও মনুষ্যমৈত্রীর উৎস

সীমিত স্থানে নির্বাসিত, সীমিত শক্তির ও সময়ের মানুষের পক্ষে জীবনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব হয় না। কেননা জানানোর, শোনানোর ও বোঝানোর লোকও বিরল বলেই খুঁজলেও সহজে মেলে না। তা ছাড়া সে-যুগে পরীক্ষণের, পর্যবেক্ষণের, নিরীক্ষণের ও সমীক্ষণের যান্ত্রিক সুব্যবস্থা ছিল না বলে মানুষ-বুদ্ধি-যুক্তি ও অনুমান প্রয়োগে প্রাপ্ত বা লব্ধ ধারণাকেই 'জ্ঞান' বলে জানত, বুঝত ও মানত। এতে ভুল-ভ্রান্তির পরিমাণও তাই বেশি থাকত। সাক্ষরতা হচ্ছে একজন জিজ্ঞাসু ব্যক্তির তার পছন্দমতো, ইচ্ছেমতো, সাধ্যমতো, সময়মতো এবং প্রয়োজনমতো জ্ঞান বুঝে না-বুঝে সংগ্রহ করার, আয়ত্ত করার, সঞ্চয় করার কুঞ্জি বা চাবি-কাঠি। এ জন্যে একালে সাক্ষরতার-শিক্ষার গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। এর মানে 'জ্ঞানই শক্তি'। এ স্বীকৃতি বিঘোষিত উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত আপ্তবাক্যের বাস্তবায়নের আগ্রহ জেগেছে জগদ্ব্যাপী সরকারে ও জনগণের মনে। এ ক্ষেত্রে আর্থিক ও ব্যবস্থাপনার বাধা যেমন প্রায় দুর্লঙ্ঘবৎ প্রবল, তেমনি প্রাণী হিসেবে মানব প্রজাতির প্রত্যেকেরই প্রায় মন-মননের রুচি-প্রবৃত্তির গতি-প্রকৃতিও বিচিত্র। তাই মন-মনন-মেধা-আগ্রহের মান-মাপ-মাত্রার পার্থক্যে এবং শ্রমের ও সময়ের প্রয়োগ বৈচিত্র্যে জ্ঞান ও মানুষের মন-বুদ্ধি-যুক্তির অনুশীলনের যাহা জাগায় না বাল্য-কৈশোরে শ্রুত, প্রাপ্ত ও অভ্যস্ত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-জ্ঞান-অভিজ্ঞতা নীতি নিয়ম রীতিরেওয়াজ প্রথাপদ্ধতি তাদের উপযোগরিক্ত গতানুগতিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের অনুসারী, অনুরাগী, আনুগামী ও অনুগত রাখে। তবু সাক্ষরতা, স্বল্পশিক্ষা, উচ্চশিক্ষা এবং একালের রেডিও-টিভি-ক্যাসেট রাজনীতিক আন্দোলন প্রভৃতি মানুষকে মানুষের মনকে বিশ্বাস-সংস্কারের দুর্গে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব-নিরাপদ স্বাতন্ত্র্যে আশ্রিত থাকতে দিচ্ছে না। ভূমিকম্পের মতো মনের নিগড় ছিঁড়ছে, দুর্গের দেয়ালও ফাটছে, ফুটো হচ্ছে, ভাঙছে। এর ফলেই পৃথিবীর উচ্চবিদ্যার, উচ্চবিত্তের, উচ্চপদের ও উচ্চবাণিজ্যের লোকদের একটা অভিন্ন বৈশ্বিক রুচির, রীতির, সংস্কৃতির, নীতিনিয়মের প্রথাপদ্ধতির সমাজ গড়ে উঠেছে, উঠছে এবং দ্রুত প্রসারও লাভ করছে। ইংরেজী ভাষার য়ুরোপীয় পোশাকের ও পাঁচতারা হোটেলের খাদ্য-পানীয় মাধ্যমে এমনকি মেঠো ও ক্লাবীয় খেলাধুলার অভিন্নতায়ও বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক একটি অভিন্ন সমাজ গড়ে উঠছে দ্রুত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একালে বাঁচার প্রয়োজনেই আর্থ-বাণিজ্যিক সাচ্ছল্য স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের জন্যেই, উৎপাদিত ও নির্মিত পণ্যের বাজার সন্ধানের ও দখলের জন্যেই আমাদের সাক্ষরতা-শিক্ষা, বিজ্ঞান, কারখানার যন্ত্র, প্রযুক্তি, প্রকৌশল-প্রযুক্তি আয়ত্ত করতেই হবে। আনাড়ির ও আনাড়িপনার দিন অপগত। আগে আমরা 'জ্ঞান' এর বনামে 'ধারণা'চালিত ছিলাম। সেজন্যেই আমরা মনে করতাম ইহজাগতিক সবকিছু মানুষের প্রয়োজনে মানুষের ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগের আর ব্যবহারের জন্যে সৃষ্ট। আর প্রাণিজগৎ মানে প্রকৃতিদত্ত প্রবৃত্তিচালিত ব্যতিক্রমবিহীন আবর্তিত জীবনে খাদ্যে আচরণে আবদ্ধ। এখন নতুন ভাবনা-চিন্তা জাগছে প্রাণী-উদ্ভিদ জগৎ সম্বন্ধে। ওরাও জ্ঞান-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতা-চালিত। ওরাও ভয়-ভরসাবিহীন নয়। ওদেরও আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রসারের গরজ আছে। ওরাও শত্রুর ভয় থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আশ্রয় ও প্রশ্রয় খোঁজে। শত্রু-মিত্র বোধ যে ওদেরও রয়েছে, তা খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ-সম্পর্কের বাইরেও অহি-নকুলের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতের মধ্যেই প্রমাণিত। সাপও কেবল অখাদ্য মানুষকেই আক্রমণ ও দংশন করে আত্মরক্ষণের আবশ্যিক অপরিহার্য গরজেই। সাপখেকো মানুষকে সাপই ভয় পায়।

আগেও মানুষ সীমিত জ্ঞানে-অভিজ্ঞতায় জানত, বুঝত ও মানত যে জলচর-স্থলচর-খেচর প্রাণীরা মানুষের করুণা-মৈত্রী-স্নেহ-মমতা-আদরকদর-বৈর-নিষ্ঠুরতা-মতলব-অনুমান-অনুভব-উপলব্ধি করে। শত্রু-মিত্র-আশ্রয়-প্রশ্রয় বোঝে। গৃহপোষ্য কুকুর-বিড়াল-পায়রা-বাজ-হাতি-ঘোড়া-গরু-ছাগল-ভেড়া-হাঁস-মোরগ প্রভৃতি তার প্রমাণ। একালে বিজ্ঞানীরা প্রাণিজগতের উদ্ভিদ জীবনেরও অনেক স্থূল-সূক্ষ্ম বিস্ময়কর সব তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য আবিষ্কার করেছেন। তা ছাড়া নানা পশু-পাখি-মাছকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মানুষের নানা কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ কেবল সার্কাসে-সিনেমার-নাটকে নয়। কুকুর-বানর-গরিলা-শিমপাজি-বাজ-পায়রা-ডলফিন-কাক-ইঁদুর-কুমীর-সিংহ-বাঘ-হাতি-ঘোড়া প্রভৃতিকেও ভাষাহীন আভাসে ইঙ্গিতে নানা প্রশিক্ষণ দিয়ে আশ্চর্য সব কাজে লাগাচ্ছে। প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উন্নতির বৈচিত্র্যে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে প্রাণিজগৎ ও উদ্ভিদজীবন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের সহায় হয়ে উঠবে। তখন হয়তো রোবটের দরকারই হবে না। তখন হয়তো আমাদেরও জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। পৃথিবীটা যে কেবল মানুষের জন্যে নয়, সব প্রাণীর বেঁচে বর্তে থাকার-সহাবস্থানের জায়গা, কারো একা দখল করে রাখার নয়, তাও উপলব্ধ হবে। মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানো—এ আবয়বিক কারণেই যে মানুষ মানসিক ও কায়িক শক্তিকে তথা সবুদ্ধি-সশস্ত্র হবার সুযোগ পেয়ে অন্য সব প্রাণীর উপর দৌরাত্ম্য করার অধিকার আয়ত্ত করেছে, তাও তখন স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবে না কেউ।

বিভিন্ন জলচর-স্থলচর-খেচর প্রাণীকে অর্থাৎ অরণ্য-পর্বত-সমুদ্রেও প্রাণীদের শক্তির ও স্বভাবের পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ-নিরীক্ষণ-সমীক্ষণজাত জ্ঞান-অভিজ্ঞতা প্রয়োগে আবিষ্কারক-উদ্ভাবক জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা তাদের কাজে লাগাতে পারবে। তাতে মানুষের জীবন-জীবিকাক্ষেত্রে নয় কেবল, জীবন যাপন পদ্ধতিতেও আসবে স্বাচ্ছন্দ্য-সৌকর্য-আরাম-আয়েশ। এমনি কল্পনা করা আজকের দিনে অসঙ্গত নয়। একে বাতুলের স্বপ্ন বলেও উপহাস-অবজ্ঞা করা ঠিক হবে না। আবার বলি 'জ্ঞানই যখন শক্তি', তখন জ্ঞানের-অভিজ্ঞতার-বিজ্ঞতার বৃদ্ধি অবশ্যই শক্তিরই বৃদ্ধি। অতএব জ্ঞানই শক্তির এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মনুষ্য মৈত্রীর, ঐক্যের ও মিলনের ভিত্তি দৃঢ় করবে। আন্দাজী ধারণায় নয়, প্রমাণসম্ভব জ্ঞানই মানুষের যতসব অযৌক্তিক-অবৌদ্ধিক অন্ধ ও বদ্ধ বিশ্বাস-সংস্কার, রক্ষণশীলতা, কূর্মস্বভাব কূপমণ্ডূকতা, অসংযম, অসহিষ্ণুতা, অসৌজন্য দূর করতে পারে। উপযোগ চেতনা নিয়ে কল্যাণকে গ্রহণের অকল্যাণকে বর্জনের মানসিক শক্তি বা মন-মনন-মনীষার যুক্তিও আসে জ্ঞান-অভিজ্ঞতা-বিজ্ঞতা-যুক্তিবাদিতা থেকেই। ইচ্ছে মতো নতুন চিন্তা প্রকাশের ও প্রচারের অধিকার বা স্বাধীনতা মেলে এমনি সমাজ সৃষ্ট হলেই। এ তাৎপর্যেই ভুক্তভোগী প্রাচীন জ্ঞানীজন বলেছেন 'মূর্খ নিয়ে স্বর্গে বাসের চেয়ে জ্ঞানী নিয়ে নরকবাস অনেক সুখের ও স্বস্তির'। কারণ এখানে অকারণ অসঙ্গত অযৌক্তিক উপদ্রব-বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

সংস্কৃতিমানের স্বরূপ

AMARBOI.COM

প্রতীচ্যদেশে সংস্কৃতির একশ চৌষট্টিটি সংজ্ঞা ও সংজ্ঞার্থ কিছুদিন আগে পর্যন্ত চালু ছিল, নতুন নতুন সংজ্ঞা তৈরি হচ্ছে, কাজেই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। পৃথিবীর সর্বত্রই এমনি সংজ্ঞা তৈরি হয়ে চলেছে। তবু মানুষের মন মানছে না, মন ভরছে না, কেবলই যেন অপূর্ণতার, ত্রুটির ও খাদের অংশ থেকে যাচ্ছে। মন খুঁত খুঁত করছে। এ যেন আপনি না বোঝে, বোঝাতে না পারে অবস্থা। সংস্কৃতিতত্ত্ব বুঝি বুঝি ভাবি, বুঝতে পারি না, সংস্কৃতির অর্থ ধরি ধরি করি, ধরতে পারি না। সংস্কৃতির সত্য মানি মানি করি, মানতে পারি না। কাজেই আজও সর্বজনগ্রাহ্য তো নয়ই, বহুজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা, সংজ্ঞার্থ মিলছে না দেশ-দুনিয়ার কোথাও, কাজেই আমরা বৃথা জেনেই সে-ব্যর্থ চেষ্টা করছি না, আমরা অন্যভাবে বুঝতে ও বোঝাতে প্রয়াসী হব। কেননা, সংস্কৃতির স্বরূপ অধরা, অবোঝা, অজানা-অনুভব করেও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে উদাসীন থাকতে পারি না। আমাদের বোধগত অলীক, আলৌকিক, অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির প্রভাবের মতো আমাদের প্রতি মুহূর্তের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে সংস্কৃতিমানতার ও সংস্কৃতিহীনতার একটা সুখ কিংবা বেদনা যথাক্রমে অনুভব করতে থাকি, না পারি এড়াতে, না পারি ভুলতে।

সংস্কৃতি আক্ষরিক অর্থে সংস্কার, পরিমার্জন, বিকৃতিবর্জন, ঔজ্জ্বল্যসাধন, সংশোধন, ক্ষয়, ম্লানিমাবিদূরণ, পূর্বপূর্ণতায় ও সৌন্দর্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করণ, মেরামত, উৎকর্ষসাধন, প্রভৃতি অভিধাজ্ঞাপক। যোগেশ বিদ্যানিধি আবিষ্কৃত সুনীতি চট্টোপাধ্যায় সমর্থিত পুরাণে পরিমার্জন অনুশীলন প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত একটি শব্দ রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন ও প্রয়োগক্রমে ইংরেজী Culture-এর এবং বাঙলা কৃষ্টির পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে থাকে বাঙলা ভাষায়। কর্ষণ জ্ঞাপক কৃষ্টি কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবহৃত অনুশীলন এবং সাধারণ্যে অপপ্রযুক্ত 'চর্যা' ও 'চর্চা' প্রভৃতি বাঙলা ভাষায় বিগত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে আর বিদ্বানেরা ব্যবহার করেন না বললেই চলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু 'সংস্কৃতি' যে স্বরূপে কি? এবং তার গুরুত্ব কি? সমাজে ও জীবনে তার প্রয়োজন কি? এ সব তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা পষ্ট নয়, এর কিছু বুঝি, কিছু অনুভব করি, এর অভাবটা তীব্রভাবে উপলব্ধি করি। এ যে ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, দলীয় তথা যৌথজীবনে পারস্পরিক সম্পর্কে-সম্বন্ধে-ব্যবহারে অপরিহার্য, আবশ্যিক। তাই বুঝে না-বুঝে, জেনে-না জেনে সচেতন কিংবা অবচেতনভাবে আমাদের কোনো না-কোন মানের, মাপের, মাত্রার সংস্কৃতির চর্চা ও চর্যা চালু রাখতেই হবে। আবার আদব কায়দা, তরিবৎ [তরবিয়ৎ], ভদ্রতা, সৌজন্য, বিনয়, সুআচরণ, ভদ্রব্যবহার প্রভৃতি নানা নামে আমাদের ব্যবহারিক বা সামাজিক আচরণ অভিহিত হয়। এ-ই সংস্কৃতি স্থূল অর্থে। কোনোক্রমেই যখন 'সংস্কৃতি' বোঝা-বোঝানো যাবে না, তখন আমরা অন্যভাবে সংস্কৃতির প্রায়োগিক রূপাঙ্কনে প্রয়াস পাচ্ছি। সংস্কৃতিমানই ধীর বুদ্ধির, স্থির মেজাজের ও যুক্তিবাদের বা যৌক্তিকতার ধারক। সংস্কৃতিমানই ন্যায়নিষ্ঠ ও সৎ মানুষের সহায়, সৎকর্মের সমর্থক।

সংস্কৃতিমান লাভে লোভে স্বার্থে কারো ক্ষতি করে না। সংস্কৃতিমান যা দেখতে শুনতে, করতে, বলতে, কুৎসিত, অশ্লীল, তা বর্জন করে, এড়িয়ে চলে। সংস্কৃতিমান সহজে আবেগবশে অযৌক্তিক অবৌদ্ধিকভাবে আত্মসংযম হারায় না। সংস্কৃতিমান পরমত, পরকর্ম অসহিষ্ণু হয় না, যদি না তা প্রত্যক্ষভাবে কোনো ব্যক্তির, সমাজের মানসিক কিংবা বৈষয়িক ক্ষতির কারণ হয়। সংস্কৃতিমান নীতিনিয়ম, আইন-কানুন মেনে চলে, 'রুল অব ল'-এর অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত থাকে। সংস্কৃতিমানের Dignity চেতনা থাকে প্রবল।

সংস্কৃতিমান মাত্রই সত্যসন্ধ, জিজ্ঞাসু ও যুক্তিপ্রবণ। সংস্কৃতিমান কখনো ধূর্ত সুযোগসন্ধানী চালবাজ, কপট ও প্রতারক হয় না। মিথ্যাভাষণে থাকে তার সীমাহীন ঘৃণা। ভীরুতায় অবজ্ঞা থাকে অশেষ। সংস্কৃতিমান সত্য বলারও সাহস রাখে। সংস্কৃতিমান কোনো অন্যায্য হুকুম দেয় না। অপপ্রয়োগ করে না ক্ষমতার। সংস্কৃতিমান কোথাও কখনো কেবল প্রভাব-প্রতিপত্তি, দর্প-দাপট, গৌরব-গর্ব, আড়ম্বর প্রকাশের জন্যে অন্যায্য হুমকি-হুঙ্কার-হামলা কথায়-কাজে-আচরণে পরিব্যক্ত করে না। স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ থাকার সংগ্রামে উৎসাহী হলেও সংস্কৃতিমান কখনো অনধিকার চর্চা করে না। তদবীরেও চায় না তকদীর বদলাতে। সংস্কৃতিমান মাত্রই হৃদবানও হয় অল্প-বিস্তর। সংস্কৃতিমান বিপন্নের নিঃস্বের, নিরন্নের, নিরাশ্রয়ের শরণ। সংস্কৃতিমান অসহায়ের, শোষিতের পীড়িতের বঞ্চিতের দলিতের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকে। সংস্কৃতিমান জ্ঞান-বুদ্ধির, সাহস-শক্তির, ধন-মান-প্রভাব-প্রতিপত্তির লোক হলে তার আশ্রয়ে নিরপরাধ বিপন্ন মানুষ নির্বিরোধে নিরুপদ্রবে নিরাপদে বাস করার সুযোগ পায়। সংস্কৃতিমান মানুষ পরিবারে সমাজে শাসনে-প্রশাসনের ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্পে-সাহিত্যে-দর্শনে-ইতিহাসে-সংস্কৃতিতে, প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠানে রাজনীতিতে রাষ্ট্র-নীতিতে যেখানে যা কিছু জনগণ স্বার্থবিরোধী, জনগণের মানসিক স্বাস্থ্য বিরোধী, মানবিকতা-মানবতা-কল্যাণবিরোধী দেখবে তার প্রতিকার চাইবে, প্রতিবাদ করবে, তার প্রতিরোধের জন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা করবে। সংস্কৃতিমান মাত্রই নতুন ভাব-চিন্তা-চেতনার প্রকাশের, ঘোষণার, প্রচারের, প্রসারের সমর্থক হবে। কেননা, নতুন চিন্তা-চেতনাই মন-মনন-মনীষা-শাস্ত্র, সমাজ, রুচি, সংস্কৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভৃতির প্রসার ও উৎকর্ষ সাধন করে। নতুন আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-চেতনায় ও সৃষ্টিতেই সংস্কৃতি-সভ্যতার, মানবিকগুণের, মানবতার, উদারতার এক কথায় মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। কাজেই সংস্কৃতিমানমাত্রই নতুন কিছু চিন্তা করার নতুন চিন্তা কণ্ঠে, লেখায় কিংবা মুদ্রিত আকারে ঘোষণার, প্রচারের এবং অবাধে নিঃশঙ্কচিত্তে দেহে-প্রাণে-মনে তথা জান-মাল-গর্দান নিয়ে নিরাপদে ঘুরে বেড়ানোর ব্যক্তিক স্বাধীনতা স্বীকার করে। নিজের মনের, মতের, পথের ও সিদ্ধান্তের প্রতিকূল হলেও সংস্কৃতিমান সংযমে সাহিষ্ণুতায় সৌজন্যে ও উদারতায় অন্যদের স্ব স্ব মত প্রকাশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা যে সংস্কৃতি-সভ্যতা বিকাশের জন্যে জরুরী, তা জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা যোগে উপলব্ধি করে। সংস্কৃতিমান এ-ও জানে স্বকালের সংস্কারবদ্ধ গতানুগতিক জীবনধারণায় ও জীবনাচারে অভ্যস্ত মানুষ নতুন চিন্তা-চেতনা-আচার-আচরণ-সৃষ্টি-সংস্কৃতি-রুচি সহ্য করতে চায় না অভ্যাস, অজ্ঞতা ও রক্ষণশীলতা বশে। ইতিহাসের সাক্ষ্যে বোঝা যায়–'নতুন' মানুষের অকল্যাণ আনে না, মানুষের মন-মনন-মনীষা-মনুষ্যত্ব কেবল এগিয়েই দেয়। সংস্কৃতিমান ব্যক্তি কখনো কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানি-দাঙ্গা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত পছন্দ করে না। এ সবকে সংস্কৃতিমান মানুষের মনুষ্যত্বের অবমাননা এবং অপকর্ষ ও অপহ্নতি বলেই জানে। ভদ্রলোক মাত্রই সংস্কৃতিমান নয়, কিন্তু ভালো মানুষ মাত্রই এক প্রকারের সংস্কৃতিমান অবশ্যই। যে অন্যায় করে না, মনে মনে অন্তত সয়ও না, সেই ভালো মানুষ, সেই সুজন। অতএব ভালত্ব ও সৌজন্যই সংস্কৃতি সংস্কৃতিমানতা। ভালোমানুষের এবং সুজনের আত্মমর্যাদাবোধ তীক্ষ্ণ ও তীব্র থাকে। তাই সংস্কৃতিমান কখনো তোয়াজে-তোষামুদে-চাটুকার-মতলববাজ হয় না। সংস্কৃতিমান কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য প্রয়োজনে বিলায়, কিন্তু কারুর কৃপা-করুণার পাত্র হওয়ার চেয়ে মৃত্যুকেও শ্রেয়স মনে করে। এ ক্ষেত্রে অন্তত সক্রেটিস স্মরণীয়। শেষকথা এই সংস্কৃতিমান মানুষকে তার জাত-জন্মা-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-কালো-ধলো-ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ-নিঃস্ব-নিরন্ন-স্বভাব-আচার-আচরণ-রুচি-সংস্কৃতি-শৈক্ষিক-নৈতিক, আর্থ-সামাজিক, রাজনীতিক, রাষ্ট্রিক অবস্থা ও অবস্থান নির্বিশেষে কেবল মানুষ বলেই জানে ও মানে। এবং মানুষ মাত্রেরই ভাত-কাপড়ে বাঁচার জন্মগত অধিকার আর রাষ্ট্র মাত্রেরই তাদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব স্বীকার করে।

সংস্কৃতিচর্চা

কালো-ধলো, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, নিঃস্ব-নিরন্ন মানুষ একা স্বয়ম্ভর ও স্বনির্ভর হয়ে বাঁচতে পারে না, তাকে দলে চলতে হয়, গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাঁচতে হয়। সমাজে নির্বিরোধে নির্বিবাদে, নিরুপদ্রবে ও নিরাপদে সামবায়িক সহযোগিতায় সহাবস্থানের গরজে তাকে আত্ম সংযমনের পরমত ও পরআচরণ সহিষ্ণুতার এবং শাস্ত্রিক, সামাজিক, দৈশিক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লৌকিক নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি যথাসম্ভব ধীরবুদ্ধি ও স্থিরযুক্তি যোগে মেনে চলার শিক্ষার দীক্ষার সচেতনভাবে সর্তকতার সঙ্গে সযত্ন প্রয়াসে অনুশীলনই হচ্ছে সমাজসদস্যের সংস্কৃতিচর্চার প্রাথমিক স্তর। আমরা প্রাজন্মক্রমিক অভ্যাস বশে অবচেতন মনেই, অসচেতন ভাবেই তা করে চলি। এ অনুশীলন বুনো-বর্বর সমাজেও রয়েছে। কেননা দালিক, গৌষ্ঠীক, সামাজিক ব্যবহারিক বৈষয়িক যৌথজীবনে তা আবশ্যিক ও জরুরী। অতএব, নীতিনিয়মের, রীতিরেওয়াজের প্রথাপদ্ধতির, অন্য কথায় শাস্ত্রিক ও সামাজিক বিধি-নিষেধ মেনে চলে প্রশ্নহীন বন্ধ্যা গতানুগতিক আচারিক ও পার্বণিক জীবন যাপনও অবশ্যই কৌম, গোষ্ঠী, গোত্র, সম্প্রদায়, জাতিহসত্তা, জাতি প্রভৃতির মানবপ্রজাতিক সংস্কৃতি। যে অর্থে জলের অপর নাম জীবন, এও হচ্ছে সে-তাৎপর্যই সংস্কৃতি। বহতা নদী, লোনাসাগর আর ক্ষুদ্র কূপ কিংবা বদ্ধ পুকুর প্রায় জলাশয় প্রভৃতির মধ্যে যে গুণ মান-মাপ-মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে, তেমনি বা তার চেয়ে বেশি কিছু পার্থক্য রয়েছে আধুনিক সংজ্ঞার ও সংজ্ঞার্থে সংস্কৃতির সঙ্গে ঐ চালু সংস্কৃতির। সংস্কৃতি হচ্ছে মন-মনন-মনীষা-রুচি-জিজ্ঞাসা-সৃষ্টি-উদ্ভাবন-আবিষ্কারপ্রজ। অন্যকথায় সংস্কৃতি সব সময় জায়মান অর্থাৎ নতুন চিন্তা-চেতনা, মত, পথ, সিদ্ধান্ত, সৃষ্টি, উদ্ভাবন, আবিষ্কার প্রসূ এবং সংযম, সহিষ্ণুতা, সৌজন্য, সততা ও সত্তার মূল্য-মর্যাদা বর্ধক। নতুন চেতনায় নতুন কথায়ইতো মানুষের মন-মনন-মনীষা-মগজ, রুচি-সংস্কৃতি-সভ্যতা-সংযম, সহিষ্ণুতা, সৌজন্য, বিবেক-জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি এগিয়েছে এগুচ্ছে, এগুবে। সর্বপ্রকারে মুক্ত মন-মনন-মত-মনীষা-ধারণা-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা সম্পন্ন গণহিত-কামীর, উপযোগচেতনা নিয়ে নিঃসঙ্কোচে যথাপ্রয়োজনে, যথাকালে, যথাস্থানে যথাকাজে ও যথাচিন্তায় যথানীতি নিয়মে যথারীতিরেওয়াজে ও যথাপ্রথাপদ্ধতিতে গ্রহণ-বর্জন সংযোজন-সংশোধন করার জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তি-সাহস-ঈহা-উদ্যম-উদ্যোগ যাঁর আছে, তিনিই হচ্ছেন আধুনিকতম সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে সংস্কৃতিমান। সংস্কৃতিচর্চা ও মনুষ্যত্বচর্যা অভিন্ন। বলা চলে মুনষ্যত্বই সংস্কৃতি, সংস্কৃতিই মনুষ্যত্ব। শ্রেয়সকে গ্রহণে সদা উন্মুখ, দায়িত্ব-কর্তব্য-অধিকারের সীমা অলঙ্ঘনের দরুন যে-ব্যক্তি উদারতার মানবতার ও যুক্তিবাদিতার প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ, সে-ব্যক্তিই সংস্কৃতিমান। এমনি মানুষের প্রভাবে ও আধিক্যেই হয় ব্যক্তির মন-মননের বিকাশ, চরিত্রে আসে সততা, সত্তায় জাগে মর্যাদাবোধ, সমাজস্বাস্থ্য হয় উন্নত, রাষ্ট্র হয় সুশাসিত, বাড়ে আত্মসংযম, পরমতে ও পরআচরণে সহিষ্ণুতা, জাগে স্বাধিকারের ও সৌজন্যের সীমায় স্বস্ত থাকার আগ্রহ। মানুষ অভ্যস্ত হয় আইনের শাসনকে মানতে ও সম্মান করতে, শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনামুক্ত সমাজ গড়তে, গণমুক্তিকামী হতে। এক্ষেত্রে মার্কসবাদের আজও বিকল্প নেই।

সংস্কৃতি তো মানস প্রসূন। কাজেই এর সার্থক অনুশীলনের জন্যেই একটা অন্তত মাঝারি মানের-মাপের-মাত্রার শৈক্ষিক, নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান আবশ্যিক। আমাদের সমাজে রয়েছে অজ্ঞ-অনক্ষর-নিঃস্ব-নিরন্ন-নিরাশ অসহায় লোকের আধিক্য। তাই আমাদের মানস-সংস্কৃতি নিতান্ত অপরিশীলিত ও নিম্নতম মানের। আমাদের ধনের ও মানের অধিকারী শহুরে শিক্ষিত Power Elit- রা অনুকৃত ও অনুসৃত ব্যবহারিক সংস্কৃতির সামগ্রিক ও আঙ্গিক বাস্তবায়নে ব্যস্ত ও অভ্যস্ত হয়ে উঠছে, মানস-অনুশীলনে এরা উদাস-অলস। তাই আমরা প্রত্যাশিত মানের, মাপের ও মাত্রার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতিমান হয়ে উঠতে পারছিনে। শিল্পে-সাহিত্যে-দর্শনে-সৃষ্টিতে-উদ্ভাবনে-আবিষ্কারে-আত্মসংযমনে, পরমত ও পরআচরণ সহিষ্ণুতায়, উদারতায়, মানবতায়, যুক্তিমানতায়, সৌজন্যে-সহৃদয়তায়।

জ্ঞানবাদ, বুদ্ধিবাদ, যুক্তিবাদ, প্রকৃতিবাদ

সত্যমাত্রই আপেক্ষিক। কেননা জীবনমাত্রই আপেক্ষিক। একালে জৈনদের মতো অনেকান্তবাদে দৃঢ় আস্থা না রেখে উপায় নেই। পৃথিবী রয়েছে প্রাকৃতিক নীতি-নিয়মের নিয়ন্ত্রণে। সূর্যের নৈকট্য ও দূরত্ব অনুসারে আঞ্চলিক আবহাওয়া হয় নিয়ন্ত্রিত। তাতেই জন্তু-মানুষের দেহের গঠন, রঙ, স্বভাব কেবল নয়, মাটির সৃষ্টিশীলতা, বন্ধ্যাত্বও নির্ভরশীল। সব স্থানে সব রকমের জীবন উদ্ভিদ জন্মায় না, সব রকমের ফল, ফসল, তরুলতাও মেলে না। কাজেই আঞ্চলিক ব্যবধানে পৃথিবীর আব আতস খাক বাতে জল-বায়ু-মাটি-তাপে পার্থক্যের মূলে রয়েছে সূর্যের নৈকট্যের ও দূরত্বের তারতম্য। অনপেক্ষ বিশুদ্ধ সত্য বলে কিছু নেই। জীবনসম্পৃক্ত বলেই তার মধ্যে রয়েছে বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য। সত্য মূলত প্রেয়সের ও শ্রেয়সের প্রসূন। নির্বিরোধ, নির্বিবাদ, নির্বিঘ্ন, নিরুপদ্রব্য নিরাপদ স্থিতি জীবন-জীবিকার জন্যে সব প্রাণীরই এমনকি উদ্ভিদের জন্যেও আবশ্যিক ও জরুরী। অন্য প্রাণী উদ্ভিদের সামর্থ্য স্বল্প। মানুষের সামর্থ্য, উদ্ভাবন-আবিষ্কার শক্তি অশেষ, ঋজু মেরুদণ্ডের ও দুহাতের বদৌলত। দলবদ্ধ জীবনে সামবায়িক সহযোগিতায় সহাবস্থানের জন্যে আবশ্যিক ছিল স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠা থাকার বা রাখার ন্যায্যতা, নীতি-নিয়ম। এর নামই ন্যায় বা সত্য বা সুবিচার। এ সত্য মানুষের মনের, বুদ্ধির, জ্ঞানের, প্রজ্ঞার, যুক্তিবোধের, মননের ও মনীষার বিকাশের ও উৎকর্ষের ফলে অঞ্চলে অঞ্চলে, গোত্রে গোত্রে, কালে কালে, স্থানিক-কালিক-জীবন-জীবিকার নতুন নতুন চাহিদা পূরণের নব নব সংসকট-সমস্যা সমাধানের গরজে ন্যায়-সত্য-সুবিচারের ধারণার বিবর্তন-পরিবর্তন হয়েছে। কাজেই 'সত্য' বলে সার্বকালিক, সার্বস্থানিক, সার্বমানবিক কিছুই আগেও ছিল না, এখনো নেই এদেশেই বেদে-পুরাণে-স্মৃতিতে-ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে সাংখ্যাযোগতন্ত্রে কিংবা মীমাংসায় আমরা তাই এককালের ন্যায়-সত্য-সুবিচার পরবর্তীকালে বারবার বিবর্তিত-পরিবর্তিত হতে দেখি। বিশেষ করে জৈন-বৌদ্ধ-চার্বাক দর্শন এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য। সত্য কি? প্রশ্নের জবাব দু'হাজার বছর আগে যিশু দিতে পারেননি, আজও কেউ পারে না। কেবল গৌত্রিক, গৌষ্ঠীক, জাতিক, শাস্ত্রিক, দৈশিক, সাম্প্রদায়িক ও রাষ্ট্রিক সত্য এখনো ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, প্রাশাসনিক, সরকারী, রাষ্ট্রিক, শাস্ত্রিক জীবন অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করে। তবে এ ন্যায্যতায়, সত্যে ও সুবিচারে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈপরীত্যই বেশি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ক্বচিৎ কেউ জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ভাবে, তার মনে জিজ্ঞাসা, সন্দেহ, অনাস্থা জাগে শোনা বৃত্তান্ত সম্বন্ধে। সে যাচাই-বাছাই করতে চায় সমীক্ষণ, পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ কিংবা নতুন যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান প্রয়োগে। এতেই মন্থরগতিতে পৃথিবীর মানুষেরও Concept-এর Conception-এর Knowledge ও Wisdom-এর, Prejudice-এর ও superstition-এর, belief-এর ও faith-এর, Reason সন্ধানের ও Rationalism-এর কিছু কিছু বিকাশ-উৎকর্ষ হচ্ছে কোথাও কোথাও। যেখানে আজও বিদ্যার আর বিদ্যুতের তথা যন্ত্রের উপযোগের অনুভব-উপলব্ধিরূপ আলো চিত্তগম্য ও চিত্তগত হয়নি, সেখানে Reason ও Rationalism আজও প্রকাশ পায় নি। জীবন যেখানে চক্রবৎ সচল, কিন্তু মন-মগজ-মনন-বুদ্ধি-যুক্তি-জ্ঞান-মনীষা নিষ্ক্রিয়তায় অচল বা স্তব্ধ কিংবা বদ্ধ।

এজন্যেই বদ্ধচিত্তের তথা আশৈশব শোনা সত্যের ধারক বিশ্বাস-সংস্কারচালিত মানুষের সত্য ধ্রুব, চিরঅচল ও অটল। এবং সত্য সম্বন্ধে তাদের শ্রদ্ধা-ভয়-ভক্তি-ভরসা-আস্থাও তাই অবিচল। এ মানুষ নতুন চিন্তা-চেতনার নতুন তত্ত্বের, তথ্যের সত্যের উচ্চারণ তথা শ্রবণ দর্শন মাত্রই চটে, মারমুখো হয়। এমনি সমাজে যথাপ্রয়োজনে, যথাকালে, যথাস্থানে, যথাকাজে, যথাপাত্রে নতুন চিন্তা-চেতনার উন্মেষ, নতুন সৃষ্টির প্রয়াস, নতুন উদ্ভাবনের আগ্রহ, নতুন আবিষ্কারের উৎসাহ পায় না মেধা-মগজ-মনীষা সম্পন্ন ভীরু ব্যক্তিরা।

এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগে যারা অনভ্যস্ত, তাদের মধ্যে শাস্ত্রিক বিশ্বাস প্রবল করে তাদেরকে রাজনীতিক দলের সমর্থক রূপে তৈরি করার প্রয়াস চলছে পৃথিবীর নানা অনুন্নত দেশে। এরা এখন আত্মসংযমরিক্ত পরমত অসহিষ্ণু এবং কাড়া-মারা-হানা প্রবণ হয়ে উঠেছে। এখন জীবন-জীবিকা-স্বাতন্ত্র্যেও বিচ্ছিন্নতায় বিভক্ত হয়। এখন সব কিছুই বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক। এ কালে বিজ্ঞান-কৌশল-প্রকৌশল-প্রযুক্তি-যন্ত্র-যুক্তি-ন্যায্যতা এবং সমকালীন জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের চেতনারিক্ত হয়ে বাস করা আর স্বেচ্ছায় জীবনবিমুখ হয়ে জীবনে-জীবিকায় মনের-মননে রুচিতে-সংস্কৃতিতে সৌন্দর্যে-কল্যাণে আত্মপ্রবঞ্চনা করারই নামান্তর মাত্র। মনে মুক্তির জন্যে, বুদ্ধির মুক্তির জন্যে, মননের মুক্তির জন্যে, মনীষার অবাধ প্রয়োগের জন্যে সমকালীন জগতে চিন্তার-চেতনার-সৃষ্টির-উদ্ভাবনের-আবিষ্কারের জন্যেই আমাদের পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণামুক্তি প্রয়োজন। ধারণা বস্তুগত নয় বলে প্রমাণ সম্ভব নয়, বস্তুগত জ্ঞান প্রমাণসম্ভব, প্রমাণলব্ধ বলেই জীবনে অভয় শরণ। যেমন চিকিৎসাবিজ্ঞানে, আগে আয়ুর্বেদ য়ুনানিতে যা অজ্ঞাত ছিল, এখন য়ুরোপীয়রা গবেষণা করে উদ্ভাবন-আবিষ্কার করেছে-রোগ নিরূপণ– সমীক্ষণ-পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ-নিরীক্ষণ এখন যন্ত্রযোগেই সম্ভব। যন্ত্রের ও ঔষধের প্রয়োগে রোগমুক্তিও সম্ভব। এ জন্যে প্রমাণিত সত্য হিসেবে এ সম্বন্ধে কারো মনে এখন ধারণাগত অবিশ্বাস-সন্দেহ-অনাস্থা নেই। জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে এখন জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োজন। এ যুগ জ্ঞানবাদের, বুদ্ধিবাদের, যুক্তিবাদের এবং প্রকৃতিবাদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন কথা বলতে মানা

মানুষ একই সময়ে জৈবিক-ব্যবহারিক জীবন যাপন করে বটে, কিন্তু মানবজীবনে তাদের সমকালীনতা থাকে না, তিন-চার-দুই-দেড় হাজার বছরের ব্যবধান থেকে যায় তাদের জীবনচেতনায় ও জগৎভাবনায়। ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, শ্রেয়স-প্রেয়স বোধে পার্থক্য, ব্যবধান ও স্বাতন্ত্র্যও থাকে প্রায় আসমান-জমিনের। মনে-মননে-মতে-সিদ্ধান্তে-রুচিতে শ্রেয়োবোধে মানে-মাপে-মাত্রায় এত পার্থক্য থাকে যে সমকালীন মানুষ নতুন মত, মনন, মন্তব্য সিদ্ধান্ত সহ্যই করতে চায় না, মারমুখো হয়ে ওঠে। চিন্তা-চেতনায় সমকালীন জীবন-জীবিকা-প্রতিবেশের প্রভাব, স্থানের, কালের, প্রয়োজনের ও পাত্রের দাবি পূরণের গরজবোধ অনুভূত-উপলব্ধ না হলে কেউ সমকালে সমকালীন জীবন যাপনের যোগ্য হয় না, এ সব গুণের ও চেতনার অভাবে লোক গতানুগতিক শাস্ত্রিক, দৈশিক, লৌকিক আচারের, বিশ্বাসের সংস্কারের অনুরাগ, অনুগামিতা ও আনুগত্য স্বীকার করেই নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত।

যে-কোনো ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ কিংবা তত্ত্ব, তথ্য ও সত্যরূপে কোনো নতুন ধারণার প্রকাশ ও প্রচার সাধারণভাবে ভীমরুলের চাকে ঢিল ছোঁড়ার মতোই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এক কাকের হত্যায় বিক্ষুব্ধ অন্য কাকেরা যেমন দ্রোহাত্মক চিৎকারে আকাশ বিদীর্ণ করে, তেমনি কৌম, গোষ্ঠী, গোত্র, সমাজ ও দলবদ্ধ মানুষেরা আক্রান্ত বা বিপন্ন হলে চাকের মৌমাছির মতো দিকবিদিকে দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করে আত্মরক্ষার গরজে। আমরা নতুন ভাব-চিন্তার প্রবক্তামাত্রকেই বিপন্ন দেখি, সক্রেটিসকে, যিশুকে, সিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীকে আর মুসা ইবনে মনসুর হল্লাজকে আমরা প্রাণ হারাতে দেখেছি, মুসাকে পালাতে দেখেছি, গেলিলিও-কোপার্নিকাস-ব্রুনোর জীবন বিপন্ন হয়েছিল। জোয়ান অব আর্ককে মরতে হয়েছে। গত শতকে আমাদের দেশেই রামমোহনকে, বিদ্যাসাগরকে নিন্দিত ও ধিকৃত হতে দেখেছি। আশ্চর্য তাঁরা বাঁচতে বা স্বস্তিতে টিকতে পারেননি বটে, কিন্তু তাঁদের বাণী, মতবাদ ও দর্শন শত্রুদের সন্তানেরাই শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ-বরণ করেছে। তাঁদের প্রচারিত মত, পথ, সিদ্ধান্ত অবিস্মরণীয় হয়ে চালু রয়েছে, অন্তত জ্ঞানী-গুণী-জিজ্ঞাসু-সন্ধিৎসুর কাছে। মার্কস পালিয়ে পালিয়ে জীবন কাটিয়েছেন, আজ মার্কসবাদ ঔষধির মতো আপাতলুপ্ত, কিন্তু বাসন্তী হাওয়াও ইতোমধ্যেই বইতে শুরু করেছে, লিথুনিয়ায়-তাজাকিস্তানে কম্যুনিস্টরা নির্বাচনে জয়ী হয়েছে।

নতুন চিন্তা-চেতনার উদ্ভব ঘটে স্থানিক ও কালিক জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে, এ জন্যেই কোনো নতুন চিন্তা-চেতনার সাধারণত মৃত্যু নেই, নতুন চিন্তা-চেতনা সহজে বর্জিত, গুপ্ত, লুপ্ত হয় না, সবচিন্তাই লঘু-গুরুভাবে সুপ্ত থাকে মাত্র। কোনো নতুন চিন্তা-চেতনাই মানুষের ক্ষতির কারণ হয় না, কেবল পরিবর্তনের ও বিবর্তনের কারণ হয় মাত্র। মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি, মানুষের মনের মননের মণীষার বিকাশ, মানুষের ভাব-চিন্তার নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য তো এভাবেই এগিয়েছে। তবু ইতিহাসের এসব অসংখ্য সাক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ রক্ষণশীল, পুরোনোপ্রীতি ও নতুনভীতি তাদের যেন রক্তের সংস্কারে মিশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে। তারা গতানুগতিকে স্বস্থ ও নিশ্চিন্ত ও অভ্যস্ত। তারা রক্ষণশীল, তারা নতুনকে সহ্যও করতে চায় না। এ জন্যেই পৃথিবীর মানুষ সর্বত্র প্রত্যাশিত গুণে মানে মাপে মাত্রায় এগোয়নি, রেনেসাঁসের সমান্তরাল চলেছে রক্ষণশীলতা য়ুরোপেও। চার্চের দোর্দণ্ড প্রতাপ-প্রভাব শাসন-অনুশাসন পীড়ন-নির্যাতন এ সূত্রে স্মর্তব্য। আমাদের দেশেই দেখেছি ঠাকুরবাড়ির পায়রা কবি বলে যাঁকে বিদ্রূপ করা হত, তাঁকে বিদ্রূপকারীর সন্তানেরাই গুরুদেব বলে স্তব করে। নজরুলকে তাঁর প্রথম যৌবনে যে-সব মুসলমান কাফের ফতোয়া দিতেন, তাঁদের সন্তানেরাই আজ তাঁর স্তুতিতে মুখর। এসব দেখে-শুনেও কেউ আজও নতুন চিন্তা-চেতনা-উক্তি-সৃষ্টি সম্বন্ধে অপছন্দ হলে সহিষ্ণু হতে পারে না। সমস্যা থেকেই গেছে আদি ও আদিম কালের মতোই।

চিন্তক নিহত হয় : চিন্তা বেঁচে থাকে

AMARBOI.COM

সব শস্ত্রীরাই দাবি করেন যে তাঁদের স্ব স্ব শাস্ত্র হচ্ছে সর্ব প্রকারে Complete Code of Life . পূর্ণাঙ্গ ইহ-পারত্রিক জীবনাচারের বিধি-নিষেধের নিখুঁত-নিখাদ স্থূল-সূক্ষ্ম, লঘু-গুরু, আবশ্যিক, জরুরী, ঐচ্ছিক, অতিরিক্ত, অধিকন্তু প্রভৃতি ভেদ-বিভেদ-গুণ-মান-মাপ-মাত্রা নির্দিষ্ট জীবনবেদ। এ ক্ষেত্রে হিন্দু তথা ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের তুলনা মেলে না, বলা চলে অনন্য, অতুল্য এবং অসামান্য। আচার-বিচারের এমন চুলচেরা তর্ক-বিতর্ক-বিধি-বিধান অন্যত্র সহজলভ্য নয়। পুরাণকারেরা নৈয়ায়িকরা, স্মার্তরা, এমনকি বৈয়াকরণ-আলকঙ্কারিকরাও ছিলেন এ বিষয়ে বিজ্ঞ ও সচেতন। আর জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সঙ্গে বৃত্তিজীবী হিসেবে জুটেছিলেন জ্যোতিষ [জোষী] গণকরা, কেবল গ্রহ-নক্ষত্র, রাশি-দিন-রাত-ক্ষণ-পল-লগ্ন প্রভৃতির প্রভাবজ শুভাশুভ নয়, হস্তরেখা, কপালরেখা, সামুদ্রিক গণনা, কোষ্ঠী বা জন্মপত্রিকা তৈরির মাধ্যমে আমৃত্যু গোটা জীবনে ঘটিতব্য সব কিছুর সাংকেতিক বয়ানও মেলে।

আবার কোন মাসে, কোন বারে, কোন বেলায়, কোন ক্ষণে, কোন পক্ষে মুলা, বেগুন, শিম থেকে কই, মাগুর খাওয়া চলবে, চলবে না, তাও তাদের কেতাবে লেখা থাকে। সমাজের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিকভাবে রয়েছেন ফকিহ ও মুফতি, তাঁরাই ফতোয়া দেন–এর নাম পংক্তি বা পাঁতি। সৌরমাসের হিসাবে ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবনে আর্তব বা মৌসুমী কৃষি কর্ম চললেও হিন্দুর শাস্ত্রিক-আচারিক জীবন চলে রাশিচক্রের অবস্থিতি ও আবর্তনজাত প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণে।

মহেনজোদারো, হরপ্পা, লাথাল প্রভৃতি প্রত্ন সামগ্রীর প্রমাণে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে-কৌম-গোষ্ঠী-গোত্র-জাতি-সমাজেরই হোক না কেন, ভারতবর্ষ নামের ভৌগোলিক অঞ্চলের কোথাও কোথাও মেসোপটেমিয়ার সুমেরীয় সংস্কৃতি-সভ্যতার সমতুল্য কিংবা প্রভাবজ সভ্যতা যে চালু ছিল, এ কালে তা নিয়ে তর্কমাত্রই নিরর্থক বলে মনে করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিডীয় ও হিস্ত্রীয় [লিডিয়া ও হিস্ট্রাইট] রাজ্য দুটোই যেমন লোহার আবিষ্কারক ও মুদ্রার উদ্ভাবক, তেমনি সুপ্রাচীন আনাতোলিয়া অঞ্চলের মিনোয়ান ও মিসেনীয় গোত্রের লোকেরাই মেসোপটেমিয়ার ও মিশরের সংস্কৃতি-সভ্যতার অনুকৃত ও অনুসৃত রূপের প্রবর্তক প্রাচীন গ্রীসে।

কাজেই ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতি-সভ্যতা-শাস্ত্র-লোকাচার-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-জ্ঞান-কল্পনা-বিস্ময়-ভয়-ভক্তি-ভরসা-আস্থা প্রভৃতিও জটাজটিল ও সুপ্রাচীন। কেননা এতে জাত-জন্ম-বর্ণ-রক্ত-বিশ্বাস-সংস্কার-আচার-আচরণ প্রভৃতির সাঙ্কর্য ঘটেছে। অলীক-অলৌকিক-লৌকিক-দৃশ্য-অদৃশ্য-কল্পিত-অনুমিত-যৌক্তিক-বৌদ্ধিক নানা তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য রূপে বহু কালের, বহু মনের, বহু মনীষার ফল ও ফসল জমেছে, তা-ই হয়ে উঠেছে শাস্ত্র, সংস্কার, বিশ্বাস, জ্ঞান, ঐতিহ্য সমেত জীবনচেতনার ভিত্তি।

তবু যেহেতু কোনো কোনো মানুষ আশৈশব শ্রুত, প্রাপ্ত, জ্ঞাত ধারণায় বিনা প্রশ্নে উপযোগরিক্ত গতানুগতিক জীবন যাপন করতে চায় না, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-জিজ্ঞাসা-কৌতূহল-সন্দেহ বশে কিছু কিছু শ্রুত, লব্ধ ও জ্ঞাত এবং শাস্ত্র-সমাজ আরোপিত বিধি-নিষেধ, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ প্রথা-পদ্ধতি সম্বন্ধে যাচাই-বাছাই করার সাহসের সঙ্গে শক্তির, বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের এবং ইচ্ছার সঙ্গে উদ্যমের ও উদ্যোগের সংযোগ ঘটে, তখন সে-লোক পিতৃপুরুষের বিশ্বাস-সংস্কার জ্ঞান-ধারণা, আচার-আচরণ সব পরীক্ষণে, পর্যবেক্ষণে, নিরীক্ষণে, সমীক্ষণে লেগে যান, জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-সাহস নিয়ে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত সুখ-শান্তি-আনন্দ-আরামের-জীবন স্বেচ্ছায় পরিহার করে স্বেচ্ছায় বুকের আবেগে ও মগজের মননে ঋদ্ধ হয়ে প্রাণ হারানোর ঝুঁকি নিয়ে প্রচলিত শাস্ত্র-সমাজ-দেশাচার-লোকাচার-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-জ্ঞান প্রভৃতি বর্জন করে নিজের ভাব-চিন্তালব্ধ তথা নিজের মন-মনন-মনীষা-জ্ঞান-যুক্তি অনুগ নতুন মত-পথ-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এবং শ্রেয়স বলেই, কালোপযোগী বলেই, জীবন-জীবিকার পক্ষে কল্যাণকর বলেই স্বজীবনের, স্বদেশের, স্বকালের জনগণেরও প্রয়োজনে শাস্ত্র-সমাজ-দেশাচার-লোকাচার বদলাতে হয়, পরিমার্জন করতে হয়, সংশোধন করতে হয়, গ্রহণে বর্জনে উপযোগ সৃষ্টি করতে হয়, পরিহার-পরিত্যাগও করতে হয়, এভাবেই এগিয়েছে পৃথিবীর মানুষের মন-মনন-মনীষা-শাস্ত্র-সমাজ-রুচি-সংস্কৃতি-সভ্যতা-আত্মসংযম-পরমতসহিষ্ণুতা ও বিবেকী সৌজন্য।

জিজ্ঞাসুর, উদ্ভাবকের, আবিষ্কারকের উদ্যমে উদ্যোগে আগ্রহে উৎসাহেই পৃথিবীর সর্বত্র বুনো-বর্বর-ভব্য-সভ্য সমাজে লঘু-গুরুভাবে আপাতদৃষ্ট আবর্তনের মধ্যেও বিবর্তন আসে। ভারতবর্ষের সনাতন সমাজেও এমনি বিবর্তন-পরিবর্তন-পরিহার এড়ানো যায়নি। বেদের মধ্যেও সংযোজন ঘটেছে বলে বিদ্বানদের ধারণা। উপনিষদ, পুরাণ, স্মৃতি, ন্যায়, দায়ভাগ-মিতাক্ষরা প্রভৃতি সর্বত্র মেলে পরিবর্তন পরিমার্জন-পরিবর্ধন। বৈষ্ণব অবতারবাদ আর শক্তি, শৈব, সৌর প্রভৃতি আপাত বিরোধী মতবাদেও কালিক ও স্থানিক প্রয়োজনে ঘটেছে সঙ্গতি-সামঞ্জস্য।

ইতিহাসের পাথুরে সাক্ষ্যে-প্রমাণেও দেখছি শঙ্কর রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভ, চৈতন্য, প্রমুখ ব্রাহ্মণ থেকে উত্তর ভারতের শূদ্র কবীর, রবিদাস, সেন, তুকারাম, ধর্মদাস, নামদেব, দাদু, সুন্দরদাস, বিমান, তিরুবল্লভ, রামানন্দ, রামদাস, একলব্য, একনাথ, রজব প্রমুখ সবাই ছিলেন পিতৃ ধর্মশাস্ত্র, সমাজ ও আচারদ্রোহী নতুন চিন্তা-চেতনার স্রষ্টা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন মত-পথ-সিদ্ধান্তদাতা, এঁরা কিন্তু প্রথম জীবনে নবমত প্রচার করতে গিয়ে লঘু-গুরুভাবে অবজ্ঞা, উপহাস, প্রতিরোধ ও লাঞ্ছনা পেয়েছেন। আমরা উনিশ শতকে রামমোহন রায়-বিদ্যাসাগরকেও এমনি প্রতিবাদের প্রতিরোধের মুখোমুখি দাঁড়াতে এবং ধিকৃত ও লাঞ্ছিত হতে দেখি। এর আগেও ইতিহাসের সাক্ষ্যে মুসাকে পালাতে, যিশুকে মরতে, যোয়ান অব আর্ককে দগ্ধ হতে, সিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীকে নিহত হতে, আবু মুসা ইবনে মনসুর হাল্লাজকে প্রাণ হারাতে দেখেছি। এ নতুন মত-পথ-সিদ্ধান্ত নতুন চিন্তা-চেতনা-বাণী সমকালের মানুষ সাধারণত সহ্য করে না। তাই সক্রেটিসের আগেও হয়তো পৃথিবীর নানা অঞ্চলে অনেক অনেক চিন্তক ও চিন্তানায়ককে প্রাণ দিতে হয়েছে, যাঁদের নাম-নিশানা-বাণী আমাদের কাছে পৌঁছুতে পারেনি। তবু কেউ কেউ নির্ভীক কণ্ঠে নতুন কথা উচ্চারণ করবেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। চিন্তার-চেতনার সংস্কৃতির-সভ্যতার প্রসার ঘটছে। একালে কোনো উচ্চারিত বাণীই গোপন করা যায় না, বিলোপও করা সম্ভব হয় না। কেবল নতুন চিন্তা-চেতনার স্বকণ্ঠে কিংবা লিখিত-মুদ্রিত আকারে ঘোষককেই প্রাণে মারা সম্ভব হয়। গ্যালেলিও, কোপার্নিকাস-ব্রুনো প্রমুখকে হুকুম-হুমকি-হুঙ্কারে-হামলায় কাবু ও লাঞ্ছিত করা, অনুগত রাখা সম্ভব হয় কিছু কালের জন্যে, কিন্তু উচ্চারিত, উদ্ভাবিত ও আবিস্কৃত সত্য থেকেই যায়—কালে প্রতিষ্ঠা পায়। পৃথিবীর সভ্যতা-সংস্কৃতি তো চিরকাল এভাবেই এগিয়েছে, এগুচ্ছে এবং এগুবে।

AMARBOI.COM

ঘটনা ও রটনা

মানুষের নিরীক্ষণের পর্যবেক্ষণের ও পরীক্ষণের চর্চা বা সচেতন অনুশীলন থাকে না বলে মানুষ আশৈশবের অভ্যাস বশে যা দেখে এবং সতর্ক-সচেতন মনোযোগে অভ্যস্ত না হয়ে যা শোনে তাতে বিস্তর ত্রুটি, খাদ এবং ভুল থেকে যায়। এজন্যেই একই ঘটনা উপস্থিত সবলোকেই যখন দেখে কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানি অথবা কথা কাটাকাটি, গালাগাল, বিতর্ক বা উত্তর-প্রত্যুত্তর, তখনো কোনো লোকই উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, তাকিয়ে থাকা সত্ত্বেও এবং দৃশ্যত মনোযোগী হওয়া সত্ত্বেও সবাই সবটা অভিন্নভাবে দেখে না, শোনে না এবং বোঝে না। এজন্যেই বুদ্ধিমান, বিবেচক ও অভিজ্ঞ মানুষের কাছে কোনো ঘটনারই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণও নিখাদ নিখুঁত তথ্য ও সত্য নয়—মোটামুটি ঘটনার একটা কাঠামো মাত্র। যেহেতু সবমানুষের বিদ্যা-বুদ্ধি এবং নৈপুণ্য সমান নয়—সেহেতু কারো বর্ণনা কল্পনা বহুল, কারো বর্ণনা মতের মন্তব্যের সিদ্ধান্তের কায়া বহুল এবং কারো বর্ণনা গোছানোর অসামর্থ্যজাত সঙ্গতিহীন হয়। এ জন্যেই ফুটবল-হকি প্রভৃতি খেলাতে রেফারীর বা দর্শকের দৃষ্টি বিভ্রমজাত ভুল বিতর্ক ও বিবাদ এড়ানোর জন্যে ক্যামেরাবদ্ধ ধীর গতির (স্লো মোশান) ছবি দেখানো হয়। আজকাল অবশ্য ভি.ডি. ও অডিও-ভিডিও যোগে ঘটনার নিখুঁত ও পূর্ণ দৃশ্য জানানো বোঝানো ও শোনানো সম্ভব। কিন্তু সম্ভব হলেই তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাভাবিক হয় না তাই এখনো মানুষ বিচিত্র বৃত্তি-প্রবৃত্তিবশে কারো পক্ষে বা বিপক্ষে ঘটনাকে বিকৃত করে বয়ান করে। শুধু রাজা-রাজড়াদের বৃত্তান্তে-ইতিহাসে নয়, ব্যক্তিক-পারিবারিক-সামাজিক-সরকারী-রাষ্ট্রিক, কৌম-গোষ্ঠীক-গৌত্রিক, দলীয়, সাম্প্রদায়িক ও জাতিক জীবনে ঘটনার স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতিতে-অপব্যাখ্যায়-অপপ্রচারে উত্তেজনা-হুজুগ-দ্রোহ, প্রেরণা-প্রণোদনার বা উসকানির ফলে ক্ষুদ্র-বৃহৎ-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-মামলা-মোকদ্দমা ষড়যন্ত্র দলে-দলে, গোত্রে-গোত্রে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, জাতিতে-জাতিতে এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ঘটে গেছে, যায় এবং যাবে।

আমাদের দেশে একটা কথা আছে, কাকে কান নিয়েছে শুনলে কান আছে কি-না হাতড়ে দেখে না, কান সত্যি কাকে নিয়েছে বিশ্বাস করে হৈ চৈ শুরু করে দেয়। অন্যত্র যেমন, আমাদের দেশেও মানুষ শুনে শুনেই জ্ঞানী হতে চায় ও বিশ্বাস করে। ফলে আমাদের দেশে ঘটনার চেয়ে রটনা বেশি। তত্ত্ব-তথ্য ও সত্য যাচাই-বাছাই করার ধৈর্য, গরজ কিংবা বিবেকী তাগিদ অনুভব করে না। ফলে এদেশে বানানো একেবারে ভিত্তিহীন রটনা ঘটনারূপে বিনা প্রশ্নেই বিশ্বাস্য, গ্রাহ্য আর সংগ্রাম কিংবা প্রতিকার, প্রতিবাদ প্রতিরোধ, এমন কি গণপ্রতিশোধযোগ্য বিষয় হয়ে ওঠে।

এতে ব্যক্তিক-পারিবারিক-গৌষ্ঠীক-গৌত্রিক-দালিক-সাম্প্রদায়িক স্তরে সর্বোপরি মানবতার ও মনুষ্যত্বের যে ক্ষয়-ক্ষতি হয় তা মানে-মাপে-মাত্রায় কেউ কখনো অনুমানও করতে চায়ওনি। এক্ষতির কোনোসীমা শেষ নেই। বস্তুত গোটা পৃথিবীতে যে প্রত্যাশিত মাত্রায় সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ বিস্তার ঘটেনি তার মূল কারণও মানুষের এই হুজুগে অবিমৃষ্যকারিতা। আশ্চর্য, যখন এক সময়ে মানুষ ঘটনা ভুলে যায় এবং রটনায়ও যখন আগ্রহ হারায় তখনও সমাজে জ্ঞানী-গুণী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষের ব্যক্তিক-পারিবারিক-সামাজিক-আর্থ-বাণিজ্যিক-নৈতিক-আত্মিক ও মানসিক জীবনে একটি গুপ্ত-সুপ্ত ক্ষত অদৃশ্য ও স্থায়িভাবে রেখে যায় এবং তা যে ভবিষ্যতেরও একটা সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতিরও কারণ হয়ে থাকে, তা নিষ্ঠার বা গুরুত্বের সঙ্গে কখনো প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে জানানো-বোঝানোর চেষ্টা করে না কেউ। ফলে আমাদের দেশে মুক্ত ও উদার চিন্তা-চেতনা প্রকাশের কোনো ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকে না, আমরা কখনো কখনো মুখে বলি বটে Freedom of thought. movement and expression হচ্ছে এ কালের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্বজনস্বীকৃত মৌল-মানবিক অধিকার। কিন্তু বাস্তবে কার্যত স্বীকৃত হতে দেখা যায় না। স্বাধীন মনের-মননের-মতের ও সিদ্ধান্তের প্রকাশ আজও কারো কারো পক্ষে প্রাণ হারানোর ঝুঁকি কিংবা কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আত্মসংযম পরমতসহিষ্ণুতা ও সৌজন্যই তো ভদ্রতা, সংস্কৃতি, সুরুচি ও মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

ব্যক্তির বা সমাজের এ মনোভাব এবং আচরণ সভ্যতা-সংস্কৃতির, আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ও নতুন চিন্তা-চেতনার ও মনীষার অভিব্যক্তির, নতুন সৃষ্টির বৈচিত্র্যে প্রভৃতির জন্যে জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা-বিবেক-বিচার-বিবেচনা আর ন্যায্যতা প্রকাশের স্বাধীনতা যে আবশ্যিক ঐতিহ্যের আস্ফালক অতীতমুখী গতানুগতিক জীবনে অভ্যস্ত বিশ্বাস-সংস্কার চালিত জীবনে জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলরিক্ত সনাতন আচার-আচরণের অনুরাগী-অনুগামী ও অনুগত ব্যক্তিরা তা বোঝে না। তারা সংস্কারচালিত জীবনে অভ্যস্ত থাকে। একটি হিন্দি আপ্তবাক্যে বলে 'দুধ ঘরে ঘরে পৌছাতে হয়, আর মদ শুঁড়ির ঘর থেকেই লোকে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়।' রটনা হচ্ছে সেই শুঁড়ির মদ। একজন দায়িত্বশীল মানুষ কখনো পাগলের মতো প্রলাপ বকে না। মানুষের প্রতি এ আস্থাটুকু থাকা বাঞ্ছনীয়। আর এওতো আমাদের জানা কথা যে, যা যেমনটি রটে তেমনটি ঘটে না। এবং আমাদের দেশে এ উপদেশ ও পরামর্শ তো লোকে এবং সরকারে দিয়েই থাকে যে গুজবে কান দিতে নেই। তারপরেও আমাদের দেশে রটনা ও গুজব প্রাধান্য পায়। আর দুর্ঘটনাও ঘটে তাতেই। ক্ষতি হয় মানুষের। প্রতিহত হয় মনুষ্যত্ব। বিষয়টা ভেবে দেখার মতো নয় কি!

পৃথিবী মানুষে আকীর্ণ, মনুষ্যত্বে রিক্ত

মানুষের প্রাত্যহিক কিংবা সামাজিক জীবনে সুস্থিতি বা সুখ নির্ভর করে একাধারে ও যুগপৎ তিনটে শর্তের উপর : মানসিক, শরীরিক ও আর্থিক সচ্ছলতার উপর। মানসিক স্বস্তি বা দুশ্চিন্তামুক্তি, শরীরিক স্বাস্থ্য এবং আর্থিক সাচ্ছল্য। এ তিনটের যে-কোনো একটিতে কোনো ঘাটতি, ত্রুটি, ক্ষত কিংবা কমতি থাকলে জীবনে স্বস্তি সুখ নিখাদ, নিখুঁত বা পুরো থাকে না, দুঃখ বেদনা যন্ত্রণা দুশ্চিন্তা সহ্য সীমার মধ্যে থাকে মাত্র। দুনিয়ার কোটি কোটি বুনো-বর্বর-ভব্য-সভ্য কোনো মানুষই সারা জীবন দেহে-মনে-অর্থে নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন নিরুপদ্রব নিরাপদ নির্বিরোধ নির্বিবাদ স্বস্তি সুখে থাকে না। যেমন নানা কারণে লঘু-গুরুমাত্রায় সাময়িকভাবে সর্দি-কাঁশি-ঘা-পাঁচড়া-চুলকানি শরীরিক সুখ স্বস্তি আরাম থেকে বঞ্চিত করে। তেমনি কাঙ্ক্ষার পূর্তি-অপূর্তির অনিশ্চয়তা, ঈর্ষা-অসূয়া-হিংসা-ঘৃণা-প্রতিহিংসা, জিগীষা, জিঘাংসা, রাগ-বিরাগ, কাম-প্রেম প্রভৃতি জাত নানা ভাব-চিন্তা-ক্ষোভ-ক্রোধ-অতৃপ্তি-অতুষ্টি-জ্বালা মন-মননের স্বস্তি-শান্তি-সুখ বিনষ্ট করে। আর জীব জগতে কে না জানে যে ক্ষুধায় খাদ্য, তৃষ্ণায় জল না জুটলে জীবনই রক্ষা পায় না।

একালে ক্ষুধার অন্ন-প্রতীক হচ্ছে অর্থ আর তৃষ্ণার তৃপ্তি প্রতীক হচ্ছে মদ্য বিলাসী বিত্তমানদের কাছে, আর এ-ও সত্য যে প্রাচীন কাল থেকেই পুরুষের বেপরওয়া ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ-সামগ্রী হচ্ছে মদ, জুয়া আর কাম। এরাই শাহ্-সামন্ত-শাসক-প্রশাসক, শোষক-বঞ্চক বেণে-বুর্জোয়া।খ্যাতি-ক্ষমতা-মান-যশ-দর্প-দাপট-প্রভাব-প্রতিপত্তি এদেরই আয়ত্তে এবং এরাই জীবন-উদ্ভিদ জগতের সবারই জান-মাল-গর্দানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অপ্রতিরোধ্য মালিক বটে। তবে এদের সংখ্যা বেশি নয়, শক্তি অশেষ, এরা তাই অপরাজেয়। অপ্রতিহত শক্তিই এদের গরু-ভেড়া-মোষের রাখালের মতোই এক এক জনকে একাই এক কোটি লোকের ভয়-শঙ্কা-ত্রাসের মালিক করে রাখে। রাখে এদের হুকুম-হুঙ্কার-হামলার শিকার করে। মানুষের সমাজও তাই ভেড়ার পালের মতো চলিত ও অনুগত হয় এদের আদেশে-নির্দেশে প্রয়োজনে ও স্বার্থে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের পাঁচ/সাত হাজার বছরের ইতিবৃত্তান্তেও শোনা যায় একই বয়ান, একই তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য। সেদিনও প্রবল দুর্বলকে বঞ্চিত করত, কাড়ত তার খাদ্য। অবশেষে এরা সব প্রতিবেশীকেই দাস বানিয়ে রাখল। এ ভাবে দাসপ্রথা চালু হল পৃথিবীব্যাপী। দাস, ভূমিদাস, প্রজা, রায়ত, ভৃত্য, মজুর রূপে সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারায় বিভিন্ন নামে আজও মানুষমাত্রই বিদ্যায়-বিত্তে-অর্থে-অস্ত্রে-ক্ষমতায়-অভিভাবকত্বে কিংবা শাসক-প্রশাসক রূপে যারা প্রধান, তাদেরই হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলার কবলিত জীবনই যাপন করে। শ্রেণীশাসিত-শোষিত-বঞ্চিত-দলিত-দমিত বলেই সাধারণ মানুষ আর্তিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও স্বস্থ্য জীবন যাপন করতে পারে না। অর্থে সম্পদে দীন বলেই মনে যেমন সে শক্তি সাহস পালন করতে পারে না, তেমনি পারে না দৈহিক রোগের ব্যয়বহুল চিকিৎসা, ফলে তার শারীরিক শক্তি হ্রাস পায়, আয়ু কমে, অকালে হয় তার জীবন অবসিত।

আজও মানুষে মানুষে জাতে-জন্মে-বর্ণে-ধর্মে-ভাষায়-নিবাসে-বিদ্যায়-বিত্তে-অধিকারে-ক্ষমতায় বৈষম্য জগদ্দল হয়ে রয়েছে। কাজেই পাঁচ/সাত হাজার বছরেও মানুষের– ব্যক্তিমানুষের দেহ-প্রাণ-মন-মননের মুক্তি মেলেনি। ক্ষুধার অন্নে, তৃষ্ণার জলেও রয়েছে গুণের মানের মাপের মাত্রার পর্বত প্রমাণ বাধা-ব্যবধান। দুনিয়ার ব্যক্তিমানুষ মাত্রই কবে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ থেকে দেহে-মনে-অর্থে পীড়ন-শোষণ-বঞ্চনা-ভয়-ত্রাসমুক্ত হয়ে শারীরিক মানসিক ও আর্থিকভাবে স্বস্থ ও সুস্থ নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের অধিকারী হবে? হবে কি কখনো? আজও নরের পৃথিবী নরক-প্রায় যন্ত্রণাবহুল, আজও মানুষের সমাজে মনুষ্যত্ব বিরলতায় দুর্লভ ও দুর্লক্ষ্য।

AMARBOI.COM

অনুরাগই জীবনের পুঁজি-পাথেয়

জীবন-জীবিকা জ্ঞান-অভিজ্ঞতা কৌশল-প্রকৌশল-প্রযুক্তি প্রয়োগ ও নৈপুণ্য নির্ভর, জ্ঞান-বুদ্ধি-দক্ষতা-পুঁজি যথাসময়ে যথাস্থানে, যথাপ্রয়োজনে যথাকাজে, যথাপাত্রে প্রয়োগ করতে জানলে ও পারলে সাফল্য সুনিশ্চিত। জ্ঞানের বৃদ্ধি জীবনযাত্রায় তথা বৈষয়িক ব্যবহারিক জীবনে ঋদ্ধিরও কারণ হয়। তবু মানুষের সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা নিতান্ত কম, বলতে গেলে জিজ্ঞাসু 'লাখে না মিলএ এক'। তাই তো স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েও কৃচিৎ কেউ পঠিতবিষয়ে পণ্ডিত বা প্রত্যাশিত মাপের মানের ও মাত্রার বিদ্বান হয়। অধিকাংশের মধ্যে বিজ্ঞতার চেয়ে অজ্ঞতাই বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। এ জন্যেই লোকচরিত্রে অভিজ্ঞজন বলেছেন, 'তাবচ্চ শোভতে মূর্খ, যাবৎ কিঞ্চিন্নভাষতে'।– মূর্খ ততক্ষণই শোভা বজায় রাখে, যতক্ষণ মুখ না খোলে। বাস্তব বাহ্যজীবন অর্থ-সম্পদ-সম্মান-খ্যাতি-ক্ষমতাযুক্ত হলেই পূর্ণতা পায়। মানুষ তাই ব্যবহারিক-সামাজিক জীবনে অর্থে-সম্পদে প্রভাবে-প্রতিপত্তিতে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠ হতে চায়। এর জন্যে বুদ্ধির সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্ঞানের, ধূর্ততার, কাপট্যের, বাকপটুতার, চাটুকারিতার, আশা-আশ্বাস দানের ফন্দি-ফিকিরও আয়ত্তে থাকা দরকার হয়, ব্যতিক্রম অবশ্য এ ক্ষেত্রে আলোচ্য নয়।

তবু বোধ হয়, ক্ষুৎ-পিপাসার, অর্থ-সম্পদের, খ্যাতি-ক্ষমতার ব্যবহারিক-বৈষয়িক-সামাজিক-প্রশাসনিক-রাজনীতিক-ব্যবসায়িক-রাষ্ট্রিক জীবনের চেয়ে মানুষের মানস জীবন-ভাবের, অনুভবের, আবেগের, উপলব্ধির, মননের জীবন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানসিক সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার কোনো দৃশ্য বা বস্তুগত লাভ-ক্ষতি নেই। কিন্তু ভোগের, উপভোগের ও উপলব্ধির-অনুভবের, আবেগের-মননের তথা চিন্তা-চেতনতার যে-জীবন, তা-ই হচ্ছে যথার্থ অর্থে জীবন। আর আমরা তো জানিই জীবন হচ্ছে কাঙ্ক্ষাও ও প্রয়াস পূর্তি-অপূর্তির, আনন্দ-বেদনার, সুখ-দুঃখের, লাভ-ক্ষতির নিত্যকার খণ্ড খণ্ড অনুভবের সামষ্টিক, সামূহিক ও সামগ্রিক অনুভূতির, স্মৃতির সমষ্টি বা সঞ্চয় মাত্র। এরই নাম জীবনানুভূতি, এরই সাধারণ নাম মর্ত্যজীবন। এ জীবন জন্ম-জীবন-মৃত্যু সীমায় থাকে নিবদ্ধ।

অতএব অনুভূতিই চেতনার-জীবন্তাবস্থার সাক্ষ্য ও প্রমাণ, এ অনুভূতিই জীবনের বীজ-বৃক্ষ-ফল। এর মধ্যে স্নেহ-প্রেম-অনুরাগ-আকর্ষণই কেবল সুখকর, সুখদায়ক। বেদনায়ও কাব্যের নাটকের ট্রাজিকরসের মতো উপভোগ্য-বেদনামধুর। অতীতের সুখস্মৃতি যেমন একদিন সত্য ছিল বলে সুখ ও আনন্দানুভূতি জাগায়, আবার নেই বলে দুঃখ-বেদনার দীর্ঘশ্বাস ছড়ায়। সুখ পেয়ে মানুষ তৃপ্ত, তুষ্ট ও হৃষ্ট হয়, আবার কোনো কোনো সুখ বারবার কাম্য হয়, নইলে অতৃপ্তির, অতুষ্টির, অহৃষ্টির চিত্তচাঞ্চল্যরূপ, অপূর্তবাঞ্ছার বেদনারূপ যন্ত্রণা জাগায়, বিচ্যুতিও ঘটায় আবেগপ্রবণ অসংযত অসহিষ্ণু, আত্মসত্তার মূল্য-মর্যাদা বোধহীন ভোগকামীর ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনে। এভাবে অনেক অবাঞ্ছিত বিপর্যয়ও নেমে আসে। সুপ্রাচীন মহাকাব্যগুলো ও রূপকথাগুলো তার চিরন্তন চিরস্মরণীয় সাক্ষ্য প্রমাণ হয়ে রয়েছে।

বিরাগী-বিবাগীরা যে-কোনো অনুরাগ-আকর্ষণকেই বলে মোহ, নেশা, অবিদ্যপ্রসূন, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তিহীনতা, আসলে এসব সাধু-সন্ত-শ্রমণ-শ্রাবক-ভিক্ষু-সন্ন্যাসী-যাজকরাই আধিগ্রস্ত-অস্বাভাবিক মন-মগজ-মনন-চেতনার মানুষ। প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির ব্যতিক্রম।

রূপ-তৃষ্ণাই বিশেষ বয়সে সবচেয়ে প্রবল থাকে A thing of beauty is a joy forever. বিহারী লালও তাই সৌন্দর্যদেবীকে বলেছিলেন : 'তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী। আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি। হোকগে বসুমতী যার খুশি তার।' এ অর্থেই Shakespere বলেছেন Love looks not with the eyes. but with the mind.। প্রতিটি নতুন মানুষের চোখেই এ পুরোনো পৃথিবী নতুন, সুন্দর, অনুরাগের ও আকর্ষণের। এ পৃথিবী মানুষের মন কাড়ে, দৃষ্টি কাড়ে, প্রাণে উল্লাস, দেহে রোমাঞ্চ, হৃদয়ে আকুলতা জাগায়, বয়ঃসন্ধিকালে কোনো না-কোনো কিছুর অনুরাগ, কোনো না-কোনো নর-নারীর জন্যে মন উদাস হয়, প্রাণ কাঁদে, বুক জ্বলে, তখন মন-প্রাণ-হৃদয়ের একমাত্র আকুতি ও আবেদন :

'বঁধু আগে দাঁড়াইও/দুই নয়নের সাধ গেলে/তবে তুমি যাইও।'

তখন অবচেতনভাবেই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পৃথিবীটা হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপার ভুবন, উদার গগন, শ্যামল কানন তল
বসন্ত অতি মুগ্ধ মুরতি, স্বচ্ছ নদীর জল
বিবিধবরণ সন্ধ্যানীরদ, গ্রহতারাময়ী নিশি,
বিচিত্র শোভা শস্যক্ষেত্র প্রসারিত দূরদিশি,
সুনীল গগনে ঘনতরনীল অতিদূর গিরিমালা,
তারিপরপারে রবির উদয় কনক কিরণ জ্বালা,
চকিত তরিৎ সঘন বরষা, পূর্ণ ইন্দ্র ধনু,
শরৎ-আকাশে অসীম বিকাশ জ্যোৎস্না শুভ্রতনু–...
ইহারা আমারে ভুলায় সতত, কোথা নিয়ে যায় টেনে;
মাধুরী মদিরা পান করে শেষে প্রাণ পথ নাহি চেনে...
আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে, ফুল মোরে ঘিরে বসে–
কেমনে না জানি জ্যোৎস্না প্রবাহ সর্ব শরীরে পশে;
ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে ভুবন মোহিনী মায়া,
যৌবন ভরা বাহু পাশে তার বেষ্টন করে কায়া।
[সুরদাসের প্রার্থনা]

এ সময়েই কল্পজগতের উর্বশীর আবির্ভাব ঘটে মনে, 'অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা' তখন 'মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল, তারি কটাক্ষ পাতেই যেন ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল, তারি 'মদির গন্ধে অন্ধ বায়ু বহে চারি ভিতে।' ছন্দে-ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু-মাঝে তরঙ্গের দল/শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল। এ বয়সেই–'রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর' হয়, এবং 'হিয়ার পরশ লাগি হিয়া কাঁদে' আর 'পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে'। বৈষ্ণবরা বিশেষ তাৎপর্যে, তত্ত্বে ও দার্শনিক তথ্যে রূপধর্মে আস্থা রাখে। তা হচ্ছে পৃথিবী ও প্রকৃতি সম্পৃক্ত। তাদের চেতনায়, 'রূপের পাথরে আঁখি ডুবিয়া রহিল/যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল/ ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান/অন্তরে অন্তর কাঁদে কিংবা করে প্রাণ। আবার এ তাৎপর্যেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি।' এভাবেই প্রিয় ও পৃথিবী একাকার বা অভিন্ন হয়ে ওঠে। তা ছাড়া, জনম অবধি রূপ দেখলেও নয়ন তৃপ্ত হয় না, বরং রূপ-তৃষ্ণা বাড়ে। রূপে ঘর যেমন বাঁধে, তেমনি ঘরও ভাঙে, ঘরও ছাড়ায়। কিন্তু সরল তত্ত্বে-তথ্যেও আবয়বিক রূপের আকর্ষণও অতি গুরুত্বপূর্ণ। আঙ্গিক রূপ অবহেলার নয়। তাই কবি বলেন :

১. চোখের নেশা মিটলে পরে তখন খোঁজে মন তাই তো প্রভু, সবার আগে রূপে আকিঞ্চন। ২. চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারী আমি রূপের পূজারী। ৩. রূপসীরে করে পূজা প্রেয়সীরে ভালোবাসে কবি। অবশ্য যৌন জীবনে রূপ-যৌবন আবশ্যিক। রূপ-যৌবনই কাম জাগায়, আর তা ব্যক্তি বিশেষে সীমিত-আবদ্ধ হলেই তাকে বলে প্রেম। এজন্যেই 'প্রেমৈক' অবস্থার ও অবস্থানের এতো মূল্য, মর্যাদা ও আদর-কদর। এমনি মুগ্ধ অবস্থায় অনুরাগের পাত্রকে মনে হয় 'এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না হেরি।' ইউসুফ-জুলেখা, লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ প্রভৃতি প্রণয়োপাখ্যান এমনি মোহ-সম্মোহন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাহিনীই। এমনি সম্পর্ক গড়ে উঠলে 'দেখিতে যে-সুখ উঠে কি বলিব তা/দরশ পরশ লাগি আওলাইছে গা/এমনি সম্পর্কের-সম্বন্ধের ক্রমিক গাঢ়তা-নিবিড়তা থেকেই অনুভবের দিগন্ত বিসারি অসীম অশেষ মনোজগৎ তৈরি হয়, তখনই কেবল জানা-বোঝা-বলা চলে; 'সখি, কি কহসি অনুভব মোই, সোই অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নতুন হোই।'

এমনি মানসিক অবস্থায় প্রিয়া ও পৃথিবী, ভূমি ও ভূমা, মর্ত্য জীবনের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপ-রস শব্দ-গন্ধ-স্পর্শও হয়ে ওঠে মানসোপভোগের অস্থূল, অদৃশ্য সূক্ষ্ম অনুভবে অপরূপ ও অনুপম, নিরুপম।

বিরহ-বিচ্ছেদ দণ্ড কেবল বিধুর করে না, বিরহ মধুরও হয়ে ওঠে স্মৃতির রোমন্থনে। তখনই বলা চলে : নয়ন সম্মুখে তুমি নাই/নয়নের মাঝখানে পেতেছ যে ঠাঁই/কিংবা 'আঁখ উপর তুহু রচলহি আসন'। আরো একটি তত্ত্বও আছে তা হচ্ছে :

নয়নের কাছে যবে রহ তুমি
মনোমাঝে তোমা নাহি পাই,
নয়ন হইতে দূরেতে রহিলে
মনোমাঝে তব ঠাঁই।
মন ও নয়ন—এ দুয়ের মাঝে
সার গণি তাই মনে
মিলনের চেয়ে বিরহে সতত
মিলায় প্রাণের ধনে [আলতাফ হোসেন আলী]

AMARBOI.COM

বৈষ্ণব তত্ত্বের বিরহই ভাব-সম্মিলন ঘটায়। অবশ্য তা এক উন্মনা, আনমনা, উম্মাদনা উন্মত্ততারই নামান্তর মাত্র। এ স্বাভাবিক অবস্থা নয়। এ হচ্ছে জাগর-স্বপ্নাবস্থা। জীবনে কাঙ্ক্ষা যদি হয় সুখ পাওয়া, তা হলে স্বীকার করতেই হবে এ অবস্থায়ও সুখানুভূতি থাকে। তাই 'সদায় ধ্যানে চাহে মেঘ পানে/না চলে নয়ন তারা।' সাপকে রজ্জু ভাবলে যেমন ভয়মুক্ত থাকা যায়, তেমনি রজ্জুকে সাপ ভাবলে ভয়ের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। জীবনটা যখন কাঙ্ক্ষার পূর্তি-অপূর্তির আনন্দ-বেদনার, লাভ-ক্ষতির খণ্ড খণ্ড অনুভবের, স্মৃতির ও সঞ্চয়ের ভাণ্ডার, তখন চাওয়া-পাওয়া-না-পাওয়ার সামষ্টিক, সামূহিক ও সামগ্রিক রোমন্থনই জীবন, কিংবা ভুলে যাওয়াই, ভুলে থাকাই জীবন। ভালো লাগলেই, ভালোবাসতেই হয়, ভালো লাগা থেকেই ভালোবাসার জন্ম। ভালোবাসার অনুরাগে, আকর্ষণে, তার উপর নির্ভর করে আস্থা ও ভরসা রেখেই মানুষ বেঁচে থাকে, এ-ই হচ্ছে মর্ত্যজীবনের পুঁজি ও পাথেয়। এ কারণেই পৃথিবী সুন্দর, জীবন প্রিয়। হায়রে জীবন, ফুল ফোটা, আর ফুল ঝরার ইতিবৃত্তান্ত মাত্র। এর মূল্য আছে মানলে, আছে, নেই বললে, নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বন্দ্বের উৎস

স্বজাতির প্রাণীমাত্রই প্রতিবেশী হিসেবে সুপ্ত, গুপ্ত কিংবা লুপ্ত ভাবে অথবা সক্রিয় নিষ্ক্রিয়ভাবে অর্থাৎ মানসিকভাবে পরস্পরের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী। ফলে ঈর্ষা-অসূয়া-হিং-সা-ঘৃণা-অবজ্ঞা-দ্বেষ-দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের অনুকূল পরিবেশ তৈরিই থাকে মনুষ্যসমাজে জীবনজীবিকার এবং মানযশ বিদ্যাবিত্তবৃত্তি, খ্যাতিক্ষমতা দর্পদাপট, প্রভাবপ্রতিপত্তি, গৌরবগর্ব প্রভৃতির প্রায় সবক্ষেত্রেই। এবং জাগ্রত অবস্থায় মানসিক এ আধি মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের যৌথ জীবনে ও সমাজে পারস্পরিক কৃপা করুণা মৈত্রী কিংবা রেষারেষি হচ্ছে ওই প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্বের তথা জিগীষআপ্রসূন। সাধারণভাবে প্রাত্যহিক জীবন ও জীবিকাক্ষেত্রে এসব ঈর্ষা অসূয়া হিংসা ঘৃণা অবজ্ঞা দ্বেষ দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ সংঘাত ব্যক্তিক, পারিবারিক, গৌত্রিক, গৌষ্ঠীক, দালিক, শ্রেণীক স্তরে কিংবা গাঁয়ে গঞ্জে পাড়ায় মহল্লায় নিবদ্ধ থাকে। সাময়িক উত্তেজনা প্ররোচনা স্তিমিত হয়ে গেলে তা থেমে যায়। জীবন জীবিকা ক্ষেত্রে-লেন-দেনও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এমনি বৈর-মিত্রতা আজকাল রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রেও সামরিক রূপ নিচ্ছে। এ সবগুলোর মধ্যে শত্রুতা বিরোধ বিবাদ সংঘর্ষ সংঘাত ঘটার একটা প্রত্যক্ষ স্বার্থ সম্পৃক্ত কারণ থাকে। অর্থাৎ অল্প বিস্তর কিছু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থ জড়িত থাকে।

কিন্তু ইহ-পরলোকে প্রসৃত জীবনসম্পৃক্ত মতবাদী জাতির বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে রক্তক্ষরা প্রাণহরা বিরোধ বিবাদ লড়াই দাঙ্গাহত্যা ঘটে, তা হচ্ছে একান্তভাবে একটা মানসিক সংহতি বা মৈত্রী কিংবা বৈরিতাপ্রসূত। এ হচ্ছে যথার্থ অর্থেই আক্ষরিক তাৎপর্যেই রামের অপরাধে শ্যামের ঘাড় ভাঙা বা গর্দান নেয়া। এরূপ পরোক্ষ প্রতিহিংসাপরায়ণতা সম্ভবত প্রাণিজগতের আর কোন প্রজাতির মধ্যে নেই। কেবল মানুষ নামের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশক্তিমান প্রাণীতেই এ অন্যায্য উত্তেজনা উসকানী প্ররোচনা দাবানলের মতো দেশে-রাষ্ট্রে-অঞ্চলে-বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এ হিংস্র প্রবৃত্তি থেকে আজও তথাকথিত সভ্য সংস্কৃতিমান দেশ সমাজ মানুষ রাষ্ট্র মুক্ত হতে পারেনি। সাধারণ গতরখাটা অজ্ঞ অনক্ষর এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। রাজনীতি ও সমাজ সচেতন খ্যাতি ক্ষমতা অর্থবিত্ত বিদ্যা যাদের আয়ত্ত, তারাই শ্রেণী শাসন শোষণ রক্ষার গরজে বাধায় দাঙ্গা। মতবাদীর ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্য, মিত্রতা ও বৈরিতা তাই পৃথিবীতে চিরকালই পৈশাচিক স্বার্থবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠনের লোভ জাগিয়ে লেলিয়ে দেয় অজ্ঞ অনক্ষর নিঃস্ব দরিদ্র কিন্তু লিপ্সু হিংস্র জনগণকে। ওরা পাশব উল্লাসে নরহত্যা উৎসবে মেতে ওঠে। অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে মানুষ কোন কোন দিকে কোন কোন গুণে শ্রেষ্ঠ তা আজও বস্তুগত প্রমাণসম্ভব উপায়ে নির্ণীত হয়নি বটে, তবে নরহত্যা উৎসবে মেতে ওঠার ক্ষেত্রে মানব প্রজাতির প্রাণীই যে অতুল্য অনন্য অসামান্য, তাতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। কেননা অজানা স্বধর্মীর প্রতি অন্যায় আচরণের কিংবা অচেনা স্বধর্মীর হত্যার খবর শোনামাত্র মত্তহস্তীর বিক্রম নিয়ে নরহত্যায় ও লুটে ঝাঁপিয়ে পড়া যে একটা অতুল্য মনুষ্য স্বভাব তা স্বীকার করতেই হবে। যেখানে মানুষ বাপ-ভাইকেও স্বার্থবশে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত এমনকি হত্যা করে, সে-মানুষই আবার অদেখা অজানা দেশের অচেনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বমতের লোকের জন্যে ক্ষোভে ক্রোধে উন্মত্তের উল্লাস ও বিক্রম নিয়ে নরহত্যায় রাস্তায় বের হয়– এ মনস্তত্ত্ব বোঝা মনোবিজ্ঞানীর পক্ষেও কি সহজ!

শাস্ত্র না থাকলে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় মতপার্থক্য বা মতবিরোধ না থাকলে সবাই কেবল স্রষ্টাবাদী ঈশ্বরবাদী হলে এ রক্তঝরা প্রাণহরা বিরোধ সংঘর্ষ সংঘাত জাতিগত বা সম্প্রদায়গত হয়ে দেখা দিতই না। বরং এ ক্ষেত্রে বিবাদ-বিরোধের কারণই ঘটত না। বাবরী মসজিদ ভাঙা রামমন্দির তৈরি একটা মতবাদপ্রসূত জিগীষা ও জিঘাংসা ছাড়া যে কিছু নয়, এতে বাস্তব লাভ-ক্ষতির কণাও যে নেই, তা কে না বোঝে? কোনো বুদ্ধি-যুক্তিরিক্ত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা ভিত্তিক গতানুগতিক অনুকৃত ও অনুসৃত জীবন কি মানুষ এমনিভাবেই কাটাবে? জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তি বিবেক বিবেচনা যাচাই বাছাই করে শ্রেয় গ্রহণ বরণ করবে না? জাতিক কিংবা সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব লড়াই দাঙ্গা যুদ্ধমাত্রই জেদাজেদির, জয়-পরাজয়ের, গ্লানি-গৌরবের, নিন্দা-গর্বের, শূন্যগর্ভ আবেগ-অনুভূতির ফল বা পরিণাম।

AMARBOI.COM

রাজনীতিকের চোখে মানুষও কাজে লাগানোর প্রাণীমাত্র

মনের, মতের, মতলবের, মননের, বিশ্বাসের, সংস্কারের, ধারণা, রুচির, আদর্শের, উদ্দেশ্যের, লক্ষ্যের, পথের, পদ্ধতির ও সিদ্ধান্তের পার্থক্য স্বাতন্ত্র্য ও বৈপরীত্য ব্যক্তিজীবনে পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে সুপ্ত ও লুপ্ত থাকে সাধারণত। কৃচিৎ কখনো কোনো গুরুতর কারণে তা পরিব্যক্ত হয়, হয়তো অবাঞ্ছিত ঘটনাও ঘটায়। মোটামুটিভাবে গতরখাটা, নিরন্ন, নিঃস্ব দরিদ্র চাষী-মজুরে, সাধারণ গৃহস্থে তা থাকে অপরিব্যক্ত ও নিষ্ক্রিয় এবং প্রায়ই অনালোচিত যদিও বা লঘু ঠাট্টায় মস্করায় পরিহাসে উপহাসে তা অভিব্যক্তি পায় নিতান্ত আনন্দিত লঘু মনের, মতির ও মর্জির প্রকটন রূপেই।

মানুষের ব্যক্তিক ও পারিবারিক জীবনে যেমন সব বিরোধ বিবাদ মামলা মোকদ্দমার উৎস হচ্ছে কোনো এক পক্ষের অলক্ষ্য লাভ-লোভ-স্বার্থ-চেতনার প্রসূন হিসাবে, তেমনি ধর্মীয়, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রিক, দালিক, গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক, জাতিক, আঞ্চলিক, ভাষিক, সাংস্কৃতিক, সাম্প্রদায়িক মত পথ পদ্ধতি, আদর্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও সিদ্ধান্তগত পার্থক্য, স্বাতন্ত্র্য ও বৈপরীত্য নিয়ে বিরোধ বিবাদ আন্দোলন মারামারি হানাহানি বাধে উচ্চবিত্তের, বিদ্যার, ব্যবসা-বাণিজ্যের, বিভিন্ন ধর্মমতবাদীর মধ্যে প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতাভিত্তিক রেষারেষি, জয়-পরাজয়, গ্লানি-গর্ব, নিন্দা-গৌরব, উত্তমন্যতা-হীনমন্যতা প্রভৃতি নানা রিপুজ বোধ-অনুভব-উপলব্ধি থেকেই। এতে আগের কালে ইন্ধন জোগাত শাহ-সামন্তরা। এ কালে অর্থে অস্ত্রে পরামর্শে প্ররোচনা জোগায় আর্থ-বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদী কূটনৈতিক বিদেশী মহাজন রাষ্ট্রগুলো, এ একান্তভাবেই ধনী, মানী, উচ্চাশী মানুষের শ্রেণী বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্প্রদায়গত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার, রক্ষার কিংবা প্রসারের অপরিহার্য আবশ্যিক জরুরী প্রয়োজনচেতনারই পরিণাম। মস্তান গুণ্ডা খুনী লেঠেল সৈন্য হিসাবে নিয়োজিত হিংস্র প্রতিহিংসামত্ত হন্তাদের লেলিয়ে নিরপরাধ মানুষের প্রাণ নিয়েই তাদের এ খেলা চলে। বিট্রিশশাসন, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ চেতনা-কিংবা রাষ্ট্রিক স্বার্থ দায়িত্ব ও কর্তব্য চিন্তা যেমন অজ্ঞ অনক্ষর নিঃস্ব নিরন্ন দরিদ্র চাষী মজুরের মনে জাগেনি, তেমনি বাবরী মসজিদ-রামমন্দির সমস্যাও পীড়িত করেনি উক্ত শ্রেণীর গণমন। শাহ-সামন্ত রাজনীতিক বেণে বুর্জোয়া শিক্ষিতদের মধ্যে মনুষ্যত্ব কমই থাকে। তারা হত্যাপ্রবণ। তাদের স্বার্থের তুলনায় মানুষের প্রাণের মূল্য হাঁস, মোরগ মাছের চেয়েও কম। ওয়াহাবী আন্দোলনে প্রসার ব্রিটিশের দেশীয় রাজ্যে দত্তক পুত্রের স্বত্ব বিলোপনীতি, প্রতারণার মাধ্যমে শিখে রাজ্যগ্রাস, সিপাহিদের গরু-শূকর চর্বি জড়িত টোটাদ্রোহ প্রভৃতি ১৮৫৬ সনের দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরকারকে ভাবী বিদ্রোহের আশঙ্কায় বিচলিত করেছিল। তার আগেই হিন্দু-মুসলিম যাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের অসন্তোষকে দ্রোহ ও ব্রিটিশ বিতাড়নে প্রয়োগ করতে না পারে, তার অপকৌশল কিংবা উপায় হিসেবে আর অযোধ্যা রাজ্য গ্রাসের লক্ষ্যে ১৮৫০-৫৫ সনে কোম্পানী রেসিডেন্ট উইলিয়াম শ্লীমান ভেদনীতির প্রয়োগে বাবরী মসজিদ যে রাজা দশরথের প্রসাদে রাম জন্ম স্থলেই নির্মিত, তা হিন্দুদের ডেকে বোঝাতে শুরু করে গোপনে। এব অর্থ, অস্ত্র ও পরামর্শ তথা উত্তেজনা উসকানি বা প্ররোচনা তিনভাবে দিয়ে তাদের লক্ষ্ণৌর নওয়াবের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। কিন্তু শাহ সামন্ত বিদ্বান বিত্তবান প্রায় অধিকাংশই মুসলিম ছিল বলে হিন্দুরা প্ররোচনা, অর্থ ও অস্ত্র পেয়েও ব্রিটিশ নির্দেশিত দ্রোহে সাহস পেল না। সামান্য সংঘর্ষের পর হিন্দু-মুসলিম নেতারা মন্দিরে পূজা এবং মসজিদে নামাজ বজায় রেখে সহিষ্ণু সহ-অবস্থানে রাজ রাজি হন ১৮৫৫ সনে। ওয়াজেদ আলী পদচ্যুত হন ১৮৫৬ সনে। ফলে ১৮৫৭ সনে ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ কোম্পানী প্রশাসনিক দায়িত্বে, কর্তব্যে, অবহেলার ও কথার খেলাপের অপরাধে তাদের নেতাদের জেল-ফাঁসি পর্যন্ত দিয়েছিল। শাহ সামন্ত শাসক প্রশাসক রাজনীতিকরা নামে মানুষের পালক পোষক লালক সেবক বটে, কার্যত মানুষ তাদের আধিপত্যের সামগ্রীসম প্রাণী। মানুষ তাদের কাছে প্রাণীমাত্র। স্বাধীনতা পেয়েই যেমন অন্তরে গোঁড়াহিন্দু প্যাটেল সোমনাথ মন্দির মেরামতে ও নির্মাণে উৎসাহী হয়ে ওঠেন ঠিক তেমনি ইতিবৃত্তান্তের শ্রুতিস্মৃতিধর ফয়েজাবাদী শিক্ষিত হিন্দুরাও ১৯৪৭ সনে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে ১৯৪৯ সনের বাইশে ডিসেম্বরে রাত্রে গোপনে বাবরী মসজিদকে মন্দিরে পরিণত করেছিল মসজিগের ভেতরে রাম-সীতার মূর্তি বসিয়ে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর প্রবল ব্যক্তিত্ব ছিল, পুরো অঞ্চলটাকেই প্রত্ন সম্পদ বা ঐতিহ্য রূপে ঘোষণা দিয়ে চারদিকে দেয়াল তুলে হিন্দু-মুসলিমের দাবি চিরকালের জন্য বাতিল করে দিতে পারতেন। তিনি বিষয়টি অমীমাংসিত রেখে জিইয়ে রাখলেন। বাবরী মসজিদ-রামমন্দির রইল ভোট জোগাড়ের ও ভোটহারানোর, উপমহাদেশব্যাপী দাঙ্গা বাধানোর, সাম্প্রদায়িকতা তরতাজা রাখার অবলম্বন হয়ে, উৎস হয়ে, নিঃস্ব, দরিদ্র অজ্ঞ অর্থবিত্ত লিপ্সু ব্যক্তিদের তথা মস্তান গুণ্ডা খুনীদের নরহত্যার ও মানুষের জান-মাল-গর্দান হারানোর কারণ হয়েই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধের বিস্তারই সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষেধক

কথায় বলে দুটো হাঁড়িও পাশাপাশি হলে ঠোকাঠুকি লাগে। প্রাণিজগতে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে রয়েছে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। উদ্ভিদ ও প্রাণী, কাজেই তাজা তৃণ ভোজী ও জীবন্ত লতা-পাতা-শাক-সবজী ভোজী নিরামিষ ভোজীও এ তাৎপর্যে খাদক, অনেক কিছুরই প্রাণের বৈরী। ভাববাদী বা বস্তুবাদী দার্শনিকের মতো বিজ্ঞতা নিয়ে বলা চলে পৃথিবীটা হিংসায় ও হিংস্রতায় আকীর্ণ। বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর মধ্যেকার এ খাদ্য-খাদক সম্পর্ক ছাড়াও একই প্রজাতির প্রাণীর মধ্যেই বিরোধ-বিবাদ-ঝগড়া-মারা-হানাও প্রায় সার্বক্ষণিক ভাবেই চলছে। প্রয়োজনীয় বস্তুর অজস্রতা, প্রাচুর্য না থাকলে, অর্থাৎ লভ্য বস্তুর স্বল্পতা, দুর্লভ্যতা, স্বপ্রজাতির প্রাণীর মধ্যেই প্রাপ্তির প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগায়, ফলে বৈরিতা, হিংসা-হিংস্রতা অপরিহার্য রূপে প্রশ্রয় পায় মনে। বাধা দিলে, বাধা পেলে বাধে লড়াই এবং মারতে গেলে মরতেও হয়। কাজেই স্বপ্রজাতি কিংবা বিপ্রজাতির মধ্যে সম্বন্ধটা পারস্পরিক দ্বেষ দ্বন্দ্বের-সংঘর্ষ-সংঘাতের। এর কারণ জীবে উদ্ভিদে রয়েছে ক্ষুধা-তৃষ্ণা। এ দুটো চাহিদা মেটাতেই হয় এ-ই হচ্ছে প্রাণিজগতে সর্ব প্রকার শ্রম ও কর্মপ্রেরণার উৎস। এজন্যেই প্রাণীর তিন স্থূল চাহিদা পূরণ করতেই হয়। আহার-নিদ্রা-মৈথুনই তাই প্রাণী জীবনের মৌল চাহিদা।

মানুষও প্রাণী, প্রাণী প্রজাতির মধ্যে মানব প্রজাতি আবয়বিক নানা সুবিধে সৌকর্যের কারণে প্রকৃতিকে দাস-বশ করে প্রকৃতির সঙ্গে আপোস করে স্বরচিত কৃত্রিম জীবন যাপন করে। রোদ-বৃষ্টি-শৈত্য থেকে আত্মরক্ষার, খাদ্যসংগ্রহের, তৈরির ও সঞ্চয়ের উপায়ও আবিষ্কার-উদ্ভাবন করে মানুষ হয়েছে আজ জল-স্থল-নভচারী। সমুদ্র পর্বত মরু অরণ্য আকাশ তার আয়ত্তে, তার বিচরণ ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন পূরণের সহায়ক শক্তি ও সামগ্রী। তবু প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা মৈথুন সম্পৃক্ত চাহিদা পূরণে সুযোগ সুবিধে অবাধ, অজস্র, অঢেল না হলেই স্বল্পতা, বিরলতা, দুর্লভতা স্বপ্রজাতির মধ্যেই দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-বিরোধ-বিবাদ-সংঘর্ষ-সংঘাত বাধানোর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষে মানুষে তাই প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সর্বত্রই জনস্ফীতির দরুন প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা তজ্জাত কাড়াকাড়ি মারামারি হানাহানি বেড়েই চলেছে। অন্যসব জীবেরই শক্তির সামর্থ্যের ও সাধ্যের সীমা আছে, কিন্তু মানুষের মগজী ও যন্ত্র শক্তির কোনো সীমা শেষ নেই। মানুষের হিংস্রতার নিষ্ঠুরতার স্বপ্নের সাধের ও সাধ্যেরও নেই কোনো সীমা। তাই ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ, মানুষ জীবন-জীবিকার অরি বা প্রতিকূল মনে করলেই জীবাণু আদি জলে স্থলে নভে দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য হোক, যে-কাউকে, যে-কিছুকে সমূলে সবংশে বিনাশ করতে দ্বিধা করে না। এমনকি মশা, মাছি কিংবা রোগজীবাণু প্রভৃতির মতোই ভিন্নগোষ্ঠীর গোত্রের অঞ্চলের ভাষার রক্তের বর্ণের মানুষকে গণহত্যায় নিঃশেষে নির্মূল নির্বংশ করতে বিবেকের দংশন অনুভব করে না। অন্য প্রাণীদের মারামারি প্রায়ই দুটোর দ্বন্দ্ব লড়াইয়ে থাকে সীমিত। ক্বচিৎ কোনো কোনো প্রাণীর মধ্যে দুই বিপক্ষ দলে যুদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা যায়। মানুষ কোনো কোনো প্রাণীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে লড়াই বাধিয়ে নিষ্ঠুর অমানবিক আনন্দ উপভোগ করে। যেমন মোরগের পায়রার কুকুরের ষাঁড়ের মোষের, প্রাচীন রোমকরা মানুষে সিংহে বাঘে ষাঁড়ে প্রাণঘাতী লড়াই দেখে আনন্দ পেত। এখনো ছিপে বিদ্ধ মাছকে খেলিয়ে বিড়ালের ধৃত ইঁদুর খেলানোর আনন্দ পায়। কাজেই সভ্যজগতের ও শিক্ষিত সমাজের মানুষ আজও মুখে মনুষ্যত্বের মানবতার কথা বললেও শত্রুর প্রতি আচরণে, প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি সংযত সহিষ্ণু আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। মানুষ ক্ষোভে ক্রোধে লাভে লোভে স্বার্থে সহজাত বৃত্তিপ্রবৃত্তিতাড়িত আদি অকৃত্রিম প্রাণীই রয়ে গেছে। গোটা পৃথিবীর সর্বত্রই গোষ্ঠীগত গোত্রগত, বর্ণগত ভাষাগত নিবাসগত, শাস্ত্রিক মতবাদগত পার্থক্যের বা স্বাতন্ত্র্যের দরুন অধিজনের শোষণের শাসনের পীড়নের পেষণের দলনের দমনের কাড়ার মারার হানার পাত্র হচ্ছে উনজনেরা। সংখ্যাগুরুর কাছে মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক পীড়ন লাঞ্ছনা পেয়ে পেয়ে বাঁচা হচ্ছে সংখ্যালঘুদলের, গোত্রের, গোষ্ঠীর, জাতির, সম্প্রদায়ের যেন চিরকেলে নিয়তি। এর মধ্যে পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ মানুষ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও বাস করেছে, সেখানেও নাকি ছিল প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা, উপহাস, ঈর্ষা অসূয়া অহম্মন্যতা ও হীনমন্যতা।

তাই মানতেই হয় সভ্যজগতে এবং সভ্য শিক্ষিত বহুল রাষ্ট্রেও মনুষ্যত্বের তথা মানবিক গুণের বিকাশ ঘটেছে নিতান্ত স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে। তাই লাভ-লোভ-স্বার্থের দ্বন্দ্বের কালে ব্যক্তির মতো রাষ্ট্রও হিংস্র শ্বাপদবৎ আচরণ করে। এ ক্ষেত্রে এমনি আচরণে জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা রক্ত নিবাস ভেদ দুর্লক্ষ্য। আফ্রিকায় গোত্রিক, আমেরিকায় বার্ণিক, এশিয়ায় ও য়ুরোপে ধর্ম শাস্ত্রিক কিংবা ভাষিক স্বাতন্ত্র্য সম্পৃক্ত মতবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বিবাদ পীড়ন দলন দমন অবজ্ঞা উপহাস বঞ্চনা চলছেই। মারা যাচ্ছে দেহে প্রাণে মনে মানে আর অর্থ-সম্পদে সংখ্যালঘু উনজনেরাই। হাজার হাজার বছর কেটে গেল, তবু আজও এ মুহূর্তেও তার কোনো প্রতিকার হল না, প্রতিরোধ করা গেল না।

সর্দার বা শাহ-সামন্তযুগের মতোই একালের তথাকথিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও বিশেষ করে আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার ও পূর্ব য়ুরোপের রাষ্ট্রে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর রক্তস্নাত করেই নির্বিঘ্ন করতে হয়। এ উপমহাদেশেও ক্ষমতার গদী দখলের জন্যে শাস্ত্রিক মতবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদনীতি প্রয়োগ করতে হয়। তাই মন্দির-মসজিদ নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছে ভারতের এক বুর্জোয়া রাজনীতিক দল স্বধর্মীর ভোটে গদী দখলের লক্ষ্যে। রাজনীতিকরা গণমানবকে কাজে লাগানোর প্রাণীই ভাবে, মানুষ হিসেবে গণ্য করে না। তাই মন্দির-মসজিদ-সমস্যা-সংকট অথবা বিবাদ বিরোধ সৃষ্টি করে সাধারণ শাস্ত্রমানা মানুষের বিশ্বাসগত আবেগ জাগ্রত করে জনগণকে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করে তুলেছে। জান-মাল-গর্দান বিপন্ন হয়েছে গোটা উপমহাদেশের উনজনদের। হৃত ও হত বহু বহু ব্যক্তি ও পরিবার। রাজনীতিকরা মনুষ্যত্বের মানবিকতার ও মানবতার মূল্য-মর্যাদা অন্তরে স্বীকারই করে না। তাই তাদের পক্ষে উত্তেজনা প্ররোচনা প্রেষণা প্রণোদনা দিয়ে কাড়া-মারা-হানায় প্রলুব্ধ করে অজ্ঞ নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ জনগণকে এমনি নির্বিঘ্ন লুটে হত্যায় ভাঙায় জ্বালানোয় এগিয়ে দেয়া, লেলিয়ে দেয়া সম্ভব হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা মুখে স্বীকার করি যে আমরা আধুনিক গণতন্ত্রে তথা মানবতন্ত্রে আস্থা রাখি অর্থাৎ ব্যক্তিমানুষ যোগ্যতা, সম্পদ, মর্যাদা, ভাষা, নিবাস, শাস্ত্রিক বিশ্বাস, গোষ্ঠী, গোত্র নির্বিশেষে আইনের সরকারের রাষ্ট্রের চোখে সমমানের ও সমগুরুত্বের। তা-ই যদি হয় তা হলে আমরা এ উপমহাদেশে মানুষ মাত্রকেই রাষ্ট্রিক পরিচয়ে পাকিস্তানী ভারতীয় বা বাঙালী বাঙলাদেশী বলে মানসিকভাবেও মেনে নিই না কেন? আমরা ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রমানা সম্প্রদায় বলে অভিহিত করি কেন? জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস শাস্ত্রিক মতবাদের পার্থক্য নির্বিশেষে কেবল নাগরিক ও মানুষ হিসেবে জানার বোঝার মানার চেষ্টা করি না কেন? সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি একটি আপেক্ষিক অভিধাজড়িত কথা। রাজনীতিক বুদ্ধিজীবী তথা শিক্ষিতমাত্রই যদি সম্প্রদায়চেতনা মনের মধ্যে সদাজাগ্রত না রাখেন, তা হলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার কথা উচ্চারণ করেন কেন? এতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিপরীতে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য-পার্থক্য জাত বৈরিতার স্বীকৃতি আশ্রয় ও প্রশ্রয় পায় মাত্র। যদি উপমহাদেশের রাজনীতিকরা ও শিক্ষিত জনেরা মানুষে মানুষে পার্থক্যচেতনা সযত্ন প্রয়াসে বর্জন করতে দায়বদ্ধতা অঙ্গীকার করে গণতন্ত্রমনস্ক ব্যক্তি হিসেবে, তা হলে সাম্প্রদায়িক তথা সংখ্যালঘু পীড়ন সহজেই বিলুপ্ত হবে সমাজ থেকে। পূর্বে যেমন গাঁয়ে লোক স্ব স্ব গ্রামে পাড়ায় ও মহল্লায় শাস্ত্রিক মত ও আচার পার্থক্য সত্ত্বেও সম ও সহ স্বার্থে সংযমে সহিষ্ণুতায় ও সৌজন্যে সহযোগিতায় সহাবস্থান করত, এখনো তেমন অবস্থা ও অবস্থান সৃষ্টি সম্ভব হবে। কিন্তু বুর্জোয়া শহুরে শিক্ষিত রাজনীতিক উকিল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষক সাংবাদিক ব্যবসায়ীরা কি মাটি ও মানুষপ্রেমী হয়ে সদ্বুদ্ধির সৎস্বভাবের অনুশীলনে রাজি হবে অকৃত্রিম আন্তরিকতায় ও আচরণে? তারা তো ব্যক্তিক ও শ্রেণীস্বার্থেই জিগীষু ও জিঘাংসু। এ আধিমুক্তির এ বর্বরতামুক্তির এ জাঙ্গলিক ও গাড্ডলিক স্বভাবের ও আচরণের বিলুপ্তির বা অবসান ঘটানোর একমাত্র উপায় বা পন্থা হচ্ছে : সম্প্রদায় চেতনার বর্জন ও রাষ্ট্রিক জাতিচেতনার নিষ্ঠ অনুশীলন। এ বর্জন ও অনুশীলন কোনো অলীক অসম্ভব কাজ নয়। প্রমাণ বনের হিংস্র বাঘ সিংহ হাতিকে প্রশিক্ষণ মাধ্যমে সংযত সহিষ্ণু ও অনুগত করে খেলোয়াড় করে তোলে সার্কাসের প্রশিক্ষকরা। মানুষই বা পারবে না কেন সম ও সহস্বার্থে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ থেকে, অনধিকার চর্চা থেকে বিরত থেকে আত্মসংযমের পরমতসহিষ্ণুতার পরের কর্মাচরণ সহ্য করবার জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তি অনুগনৈতিক সমাজিক নাগরিক জীবন যাপনের অভ্যাস আয়ত্ত করতে?

মানুষের সমাজে যাঁরা উচ্চাশী, তাঁরা যদি যোগ্যতারিক্ত জিগীষু এবং সামান্য কারণে ও ক্ষুদ্রস্বার্থে জিঘাংসু হয়ে ব্যক্তিক কিংবা শ্রেণীর অথবা দলীয় স্বার্থে বিত্ত-বেসাত বা রাজনীতিক মানযশ খ্যাতি ক্ষমতা দর্পদাপট প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের নীতি ও রীতি বর্জনের বিবেকী দেশনা মেনে চলেন, তা হলেও আমরা সংযত সহিষ্ণু সংস্কৃতিমান সুনাগরিক, সুজন এবং মানবতাবাদী মানুষ হয়ে উঠব। অভিন্ন রাষ্ট্রিক জাতিচেতনা তথা রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদই পারবে সাম্প্রদায়িকচেতনার ও দ্বন্দ্বের বিলুপ্তি ঘটাতে। আমাদের সেক্যুলার গণতান্ত্রিক হতেই হবে, সমাজতান্ত্রিক হওয়া সম্ভব না হলেও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের ধর্মভাব দুষ্ট শাসকের হাতিয়ার

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'এ যুগে বিজ্ঞান বাদ দিয়ে সাহিত্য লেখা অসম্ভব, তাতে শুধু শুধু পুরোনো কুসংস্কারকেই প্রশ্রয় দেয়া হবে।... বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সম্বন্ধ এ যুগের অতি প্রয়োজনীয় যুগধর্ম।' আর কোনো ধারণাই প্রমাণ সম্ভব বা প্রমাণ সাধ্য নয় বস্তুর মতো সমীক্ষণ, পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ যন্ত্রমাধ্যমে রাসায়নিক বিশ্লেষণে। তাই ধারনা নিয়ে দুই অজ্ঞের অভিজ্ঞের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চলতে পারে, মারামারি হানাহানিও ঘটতে পারে, কিন্তু কখনো মীমাংসা মেলে না, মিলবে না। এ জন্যেই ধারণা হচ্ছে শ্রুতি-স্মৃতি-অভ্যাসপ্রসূত বিশ্বাস-সংস্কার মাত্র, বিজ্ঞানের মতো প্রমাণসম্ভব প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়। মানবেন্দ্রনাথ রায়ও জানতেন যে ধারণা a body of superstitions prejudices social customs and irrational mode of living. তাই ধারণা মানুষের মনুষ্যত্বের বা মানবতার বিকাশ সাধন করতে পারে না। শরৎচন্দ্রের পথের দাবীর সব্যসাচীও বলেছে, 'সব শাস্ত্রই মিথ্যা'। উনিশ-বিশ শতকের য়ুরোপীয় মনীষীর অনেকেই ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী, সংশয়বাদী, প্রত্যক্ষবাদী প্রকৃতিবাদী নিরীশ্বর নাস্তিক। বিশ শতকের রবীন্দ্রনাথও জগমোহনের মতো নির্মোহ বিবেকবান জ্ঞানী মানববাদী প্রমূর্ত মনুষ্যত্ব নিরীশ্বর চরিত্র এঁকেছেন। জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে আগ্রহী আত্মপ্রত্যয়ী শক্তিতে সাহসে প্রবল উচ্চাশী ব্যক্তি মাত্রই চিরকাল বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণামুক্ত, মৌলিক নতুন চিন্তার, জিজ্ঞাসার উদ্ভাবনের, আবিষ্কারের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত। প্রাচীন মিশরীয়, ব্যাবিলোনীয়, গ্রীক, রোমান ইতিবৃত্তান্তই তার সাক্ষ্য প্রমাণ। আমাদের দেশেও বিভিন্ন স্মৃতি ও পাঁতি তার সাক্ষ্য ও স্বাক্ষর বহন করে। কেবল যাজ্ঞবল্ক্য-মনু-পরাশর নন, কৌটিল্যও তাঁর অর্থশাস্ত্রে অনেক নতুন চিন্তার, ভাবনার, যুক্তির ও মুক্তির তথা প্রয়োজন মতো আয়োজনের পাঁতি লিপিবদ্ধ করেছেন। শক্তিমানের লাভে লোভে স্বার্থে প্রযুক্ত কোনো উপায়, পন্থা বা ব্যবস্থাই অন্যায্য নয়। তাই দুনিয়ার কোনো শাস্ত্রেই রাজা-বাদশাহ-সামন্তের পররাজ্য জয়ে সৈন্যরূপ নরহন্তা নিয়োগে পাপ হয় বলে উল্লেখ নেই। কাড়া মারা-হানাই হচ্ছে শাসক-শোষকের শাস্ত্রসম্মত নীতিসম্মত নীতি-নিয়ম। শাহ সামন্তের যে-কোনো অপকর্মকেও বৈধ বলে পাঁতি-ফতোয়া দেয়ার লোকের অভাব ঘটেনি পৃথিবীর কোথাও এবং কখনো। রাজার হত্যা কিংবা গদীচ্যুতি হচ্ছে উচ্চাশীদের প্রাসাদষড়যন্ত্রের ফলমাত্র, পাপ নয়, অপকর্মও নয়। সেও এক প্রকার নিয়মের প্রয়োগ মাত্র। তৃতীয় বিশ্বের তথা আফ্রো-এশিয়ার-লাতিন আমেরিকার জঙ্গীরা ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ করে সরকারের শাসনের আনুগত্যের শপথ নিয়েই চাকরি শুরু করে, কিন্তু যথাসময়ে প্রলুব্ধ জঙ্গী ক্যু করে নায়ক-শাসক সর্বাধিকারী হয়ে যায়। এ কাজে তাদেরও পাপ নিন্দা-লজ্জা গ্লানিবোধ নেই। অতএব, সাধারণভাবে প্রবলের, ক্ষমতাবানের, ধনে জনে পেশীতে প্রবলতরের কখনো কোনো নির্দিষ্ট নীতি-নিয়মে অনুরাগ অনুগামিতা কিংবা আনুগত্য থাকে না। অতএব শাসন শোষণ নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি, পুলিস, আদালত, শাস্তি, কারাগার, ফাঁসী সবটাই হচ্ছে প্রাণী প্রজাতির মানুষ নামের সাধারণ জীবকে শাসনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পীড়নে পেষণে দমনে দলনে ধমকে ধমকিতে হুকুমে হুমকিতে হুঙ্কারে হামলায় ভীত এস্ত অনুগত রাখার প্রয়োজনেই তৈরি করেছে, পেশীবলে, জনবলে, ধনবলে সাহসী শক্তিমান বুদ্ধিমান প্রবলেরা তথা শাসক শোষকরা আর তাদের কৃপা-করুণাজীবী চাটুকার স্তাবক স্তুতিকাররা করেছে সমর্থন ও প্রয়োগ। পরের অর্জিত অর্থ-সম্পদ সাধারণে কাড়লে একাধারে ও যুগপৎ পাপ (Sin), সামাজিক অপকর্ম (vice) এবং সরকারী শাস্তিযোগ্য অপরাধ (crime) হয়। কিন্তু রাজা রাষ্ট্র কাড়লে বরং শক্তি-সাহসের গৌরব বৃদ্ধি পায়, প্রশংসা পায় সবারই। মানুষ আজো শক্তের ভক্ত নরমের যম, মানুষ আজো যোগ্যতমের উদ্বর্তনে আস্থাবান। মানুষ আজো 'জোর যার মুলুক তার' তত্ত্বে আস্থা রাখে, ন্যায় বলে স্বীকার করে নেয়।

সুযোগ সুবিধেবাদই হচ্ছে উচ্চাশী প্রবলের নীতি নিয়ম আদর্শ। এজন্যেই একালে প্রধান সমস্যা শ্রেণীদ্বন্দ্ব। একালেও প্রবলেরা কাড়া-মারা-হানা নীতি প্রয়োগেই দৃঢ় আস্থা রাখে। মস্তান, গুণ্ডা খুনীই নয় শুধু, রাজনীতিক দলগুলোও এ মত-পথ-পদ্ধতির পোষক। রোমান দার্শনিক সেনেকা [Seneca] কতকাল আগেই জেনেছিলেন, বুঝেছিলেন যে প্রবলের, লোভীর স্বার্থবাজের কোনো ধর্ম নেই, নীতিনিষ্ঠা নেই। আর ধর্মশাস্ত্রও যে জাগতিক প্রয়োজনেই তৈরি তাও উপলব্ধি করেছিলেন Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false and by the rulers as useful. আজো এটি নিখাদ নিখুঁত নিশ্চিত সত্য। সেনেকার আমলের মতোই আজো যুক্তি বুদ্ধি জ্ঞান প্রয়োগে অনীহ ও অজ্ঞ লোকে পৃথিবী বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্ব আকীর্ণ। তাই আজো অনুন্নত দেশ বিশেষ করে এর প্রয়োগেই রাজনীতি করতে হয়, যথাসময়ে সম্পদ লুটে আগুনে, নরহত্যায়, দাঙ্গায়, মন্দির-মসজিদ-গীর্জা-মঠ-সিনাগগ ভাঙা জরুরী হয়।

AMARBOI.COM

বিজয়দিবসে প্রভাতচিন্তা

১. পরনির্ভর পরমুখাপেক্ষী, পরবুদ্ধিচালিত পরের খাতক পরের সাহায্যে টিকে থাকা ব্যক্তি জাতি বা রাষ্ট্র কি স্বাধীন? স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বনির্ভর, স্বয়ম্ভর, সচ্ছল স্বচ্ছন্দ ব্যক্তি জাতি বা রাষ্ট্রই হচ্ছে স্বাধীন। অতএব স্বাধীন রাষ্ট্রকে স্বনির্ভর ও স্বয়ম্ভর হতেই হয়। বিদ্যায় বিত্তে বেসাতে উৎপাদিত ও নির্মিত পণ্যের দেশের ও বিদেশের বাজারে ও বিদেশে যারা প্রতিপত্তি বা প্রভাবশালী, তারাই কেবল স্বাধীনতার ও সার্বভৌমত্বের গৌরবের, গর্বের ও শক্তি-সম্মানের দাবিদার। অন্যদের উচ্চকণ্ঠের আস্ফালন শূন্যগর্ভ কলসের সঙ্গে তুলনীয় মাত্র। আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার প্রায় দেশে রাষ্ট্র যে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে দাবি করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে বিশ্বের দরবারে মান-মর্যাদা গুরুত্ব পায় বলে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণাও করে সগর্বে, সেতো কেবল ছাগলের প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে-যাওয়া মাতৃস্তন্যে ন্যায্য অংশ ও অধিকার বঞ্চিত নির্বোধ তৃতীয় বৎসের সানন্দ নাচনের মতোই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. আমাদের শতে পঁচানব্বইজন অজ্ঞ অকুশল নিঃস্ব নিরন্ন দরিদ্র প্রান্তিক বর্গাচারী স্বল্প আয়ের বৃত্তিজীবী, ক্ষেতমজুর কারখানা শ্রমিক কুলি, মিস্তি, ঠেলা-রিকশা কর্মী আর ভিখারী শ্রেণীর লোক। ওরা গাঁয়ে গঞ্জে শহরে বন্দরে পাড়ায় মহল্লায় ফুটপাতে কিংবা নালা-নর্দমার ধারে খুপরিঝুপড়ি বাসী। এ মানুষেরা সাধারণ ভাবে শতে সত্তরজন মানবেতর স্তরের জীবন যাপন করে। উনিশ শ' পঞ্চাশ সনের আগে অনেক রোগের-কলেরার, বসন্তের, যক্ষ্মার, সূতিকার, কালাজ্বরের, প্লীহা-ম্যালেরিয়া সান্নিপাত আর হৃৎ বা মস্তিষ্ক রোগের ভালো ও সহজলভ্য চিকিৎসা ছিল না, অজ্ঞাত ছিল অনেক রোগ ও রোগের কারণ। কাজেই তখনকার দিনে মানুষ যত জন্মাত তত বাঁচত না, শতে ত্রিশ/চল্লিশ জন বাঁচত এবং পঞ্চাশ থেকে পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যেই মারা যেত অপুষ্টি অচিকিৎসাজাত নানা কারণে। ওই বয়সই ছিল বার্ধক্যেরও শেষ সীমা। তাই হিন্দু শাস্ত্রে পঞ্চাশে 'বনং ব্রজেৎ' বলে বিধান রয়েছে। ১৯৫০ সনেরও পর থেকে প্রায় সব রোগের চিকিৎসা ও আরোগ্য সম্ভব হচ্ছে, হয়েছে। ফলে আগের মতো মৃত্যুর ছিদ্র পথগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। এখন জন্মিলেই মরিতে হয় না, আয়ুও বেড়েছে, এখন প্রায় শহরে শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী মানুষ মাত্রই আশি/নব্বই/একশ বছর বাঁচে। একালে শিশুরা ষড়ফোঁড়ে রোগ প্রতিরোধক শরীর স্বাস্থ্য লাভ করছে, ওরা হয়তো বাঁচবে একশ/দেড়শ বছর, যদি না অপমৃত্যুর অন্যান্য কারণ ঘটে। স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে, শাসক পরিবর্তনে বিদেশীর আর্থিক ঋণে, দানে অনুদানে ত্রাণে রাষ্ট্রের উন্নতি অবশ্যই হয়েছে সামগ্রিক সামূহিক ও সামষ্টিকভাবে। মৃত্যুর পথ রুদ্ধ হওয়ার ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় জনজীবনে দারিদ্র্য কেবল বেড়েই চলছে। দুর্ভিক্ষ, অজন্মা, খরা, বন্যা, মহামারী, অনাহার অর্ধাহার জনিত নানা কারণে আগে মানুষ ভিখিরী ছিল, দরিদ্র ছিল, অকালে অপমৃত্যুর শিকারও ছিল। এখন আবার ব্যক্তি মানুষেরও জীবন চেতনা জীবন যাপনের মান, ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ বাঞ্ছা ও দাবি বেড়ে গেছে, ফলে দারিদ্র্য-চেতনা, দারিদ্র্য-ক্ষোভ, তজ্জাত দারিদ্র্যের জন্য দায়ী শত্রুর বা শ্রেণীশত্রুর সন্ধানচেতনা ও তৎপরতাও বাড়ছে রাজনীতির ক্ষেত্রে; এসব কারণে সুপ্রাচীন ও মধ্যযুগীয় জীবনচেতনারও জীবন যাপনের প্রথা-পন্থ-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে তুর্কী-মুঘল ব্রিটিশ-পাকিস্তান আমলের চেয়েও এখনকার গ্রামীণ মানুষের মানস ও ব্যবহারিক চাহিদা অনেক অনেক বেড়েছে। তাই মানবেতর জীবনযাপনের গ্লানি, ক্ষোভ, ক্রোধ-যন্ত্রণা বেড়েই চলেছে। অথচ বিদেশীর ঋণে দানে-অনুদানে-ত্রাণে, পরামর্শে, নির্দেশে-হুকুমে-হুমকিতে চালিত ও হুঙ্কার-হামলা ভয়ে ভীত মুৎসুদ্দী সরকার এদের দাবি কিংবা জীবনের অপরিহার্য, আঞ্চলিক ও জরুরী চাহিদা মেটাতে অসমর্থ। কাজেই আজকের ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয় দিবস গণমানবমনে কোনো আশা-আশ্বাস-আনন্দ জাগায় না, এরা এর গুরুত্বও জানে না, বোঝে না, মানেও না। এদের অব্যক্ত অনুক্ত প্রশ্ন– এ বিজয়োৎসব কি, কেন, কার, কাদের? শহুরে শিক্ষিত সাংসদ আমলা মন্ত্রী বেণেও বিদ্যা-বিত্তবান, ধনবলে জনবলে রাজনীতিক খ্যাতি-ক্ষমতাবলে এবং আর্থ-বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে যারা সফল, সার্থক এবং ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ সামগ্রী যাদের আয়ত্তে, এ বিজয় উৎসব তাদেরই। এ আনন্দ এ উল্লাস তাদেরই।

৩. শাসন-শোষণ-পেষণ-পীড়ন-বঞ্চনা-প্রতারণা অশিক্ষা-অস্বাস্থ্য অনাহার অর্ধাহার কবলিত গণমানবমুক্তির লড়াই কবে শুরু হবে, শেষই বা হবে কবে? স্বাধীনতা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সার্বভৌমত্ব দেশের শতে পঁচানব্বই জনকে কি দিল? গণতন্ত্রই বা এদের কি দেয়, কি দেবে, কি দিতে পারে? কেননা গণতন্ত্রও তো ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ সুযোগ দেয় খ্যাতি-ক্ষমতা-বিদ্যা-বিত্ত-বেসাত জোগায় ওই শহুরে শিক্ষিত সাফকাপুড়ে শাসক-প্রশাসক-বুদ্ধিজীবী-পেশাজীবী আর আর্থ-বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে অর্থ-সম্পদ নিয়ন্ত্রকদেরই।

বিজ্ঞানকে শাস্ত্রিক তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য বিরোধী বলে তার চর্চা এড়িয়ে কেবল প্রাত্যহিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য উৎকর্ষ ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ করার জন্য যন্ত্রের ও প্রযুক্তির ধার করা প্রয়োগে জাতি স্বনির্ভর উন্নত হতে পারে না। বিজ্ঞানকে ভালোবাসতেই হবে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস, যে-বিজ্ঞানকে ভজে, বিজ্ঞান তাহাকে ভজিবে।' গতানুগতিক পথ-প্রথা-পদ্ধতি, মন-মত-মনন-সিদ্ধান্ত-মীমাংসাকে ধ্রুব বলে মেনে নিয়ে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে তা বাস্তবায়িত রাখার আগ্রহ ধরে থাকলে, ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সরকারী বা রাষ্ট্রিক জীবনে নতুন চিন্তা-চেতনা, জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, আগ্রহ, উদ্যম, উদ্যোগ প্রসূত আবিষ্কার উদ্ভাবনজাত নতুন নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, শ্রেয়স্কর উৎকৃষ্ট প্রথা-পদ্ধতি, প্রযুক্তি প্রয়োগে সভ্যতা-সংস্কৃতি, মনন-মনীষা দর্শন-বিজ্ঞান-সমাজ ব্যবস্থা, মনুষ্যত্ব, মানবকল্যাণ ও সংহতি চেতনা বিকাশ বিস্তার পাবে কি করে? তাজেই অবাধে নতুন চিন্তার, নতুন চেতনার, নতুন সন্দেহের, নতুন প্রশ্নের, নতুন জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজার স্বাধীনতা ব্যক্তিজীবনে অপরিহার্য, আবশ্যিক ও জরুরী এবং সে-সঙ্গে তা অবাধে ঘোষণার, প্রচারের ও জীবনাচারে প্রয়োগের স্বাধীনতাও আবশ্যিক ও জরুরী। এ হচ্ছে একালে মৌল মানবাধিকারেরও অপরিহার্য এবং বিশ্বনন্দিত স্বীকৃত তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য। নতুন চিন্তা-চেতনা-প্রশ্ন-সন্দেহ-উদ্ভাবন-আবিষ্কারই তো মানুষকে জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে এবং মন-মত-মনন-মনীষার বিকাশে এবং আচারে-আচরণে রুচিতে সংস্কৃতিতে সমাজকে আজকের এ মুহূর্তের বিকশিত ও উন্নত অবস্থা ও অবস্থান দান করেছে। অতএব নতুন চিন্তা, নতুন চেতনা, নতুন সময়োপযোগী জীবনের চাহিদানুগ আবিষ্কার-উদ্ভাবন-হাতিয়ার-প্রযুক্তি আচার-আচরণ সবারই কাম্য হওয়াই স্বাভাবিক। রক্ষণশীলতা তো বন্ধ্যাত্ব ও অনড়তা মাত্র। ইতিহাসের সাক্ষ্যে সুপ্রাচীনকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে উঠতি জাতিমাত্রই রুচি-সৌন্দর্যের চর্চায়, জীবনে যন্ত্রে হাতিয়ারে স্বাচ্ছন্দ্য-সৌকর্য সাধনে, সন্দেহে, উপযোগচেতনায় জিজ্ঞাসায় নতুন কিছু করার ও ভাবার আগ্রহে নতুন চিন্তায়-চেতনায়, নতুন কিছু আবিষ্কার-উদ্ভাবনের নেশায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-অভিজ্ঞতায় সংস্কৃতি-সভ্যতার বিকাশ-বিস্তার প্রয়াসে প্রযত্নে সদাসচেতন এবং সতর্কভাবে নিজেদের উদ্যম, উদ্যোগ ও অঙ্গীকার ধৈর্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের ও গবেষণার অন্তর্গত করে রেখেছিল। আর পড়তিকালের শুরু থেকেই ওরা বন্ধ্যা জীবন কাটিয়েছে নিষ্ক্রিয়ভাবে পূর্ব কৃতি-কীর্তির গৌরব-গর্ব-আস্ফালন করে। ফলে তাদের জীবন-জীবিকা ক্ষেত্র হয়েছে দারিদ্র্যে ম্লান, জরা-জড়তা-জীর্ণতা পেয়েছে তাদের মন ও মনন, রক্ষণশীলতায় গতানুগতিক হয়েছে তাদের জীবন ও সমাজ, গ্লানিযুক্ত হয়েছে তাদের রুচি-সমাজ-সংস্কৃতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তি নিহিত নতুন চেতনায়, মুক্ত চিন্তায়

গতানুগতিক আচারনিষ্ঠ জীবনে বৈচিত্র্য নেই, বৃদ্ধি নেই, উৎকর্ষ নেই। থাকে কেবল সনাতন নীতি-নিয়মের, রীতি-রেওয়াজের, প্রথা-পদ্ধতির, বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার এবং দেশাচার লোকাচারের অনুসৃতি। ব্যক্তির, পরিবারের, সমাজের, দেশের ও রাষ্ট্রের, এক কথায় মানুষ মাত্রেরই জীবনের উপমা হচ্ছে তৃণ-লতা-বৃক্ষ। বৃক্ষ জীবনের লক্ষণই হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে দিনে দিনে মাসে মাসে বছরে বছরে কেবলই বেড়ে ওঠা, জীবন্ত বৃক্ষের জীবনের অভিব্যক্তি হচ্ছে জীর্ণপত্র ঝরানো আর নতুন পত্র গজানো। মানুষকেও তেমনিভাবে জীবনানুভবের জন্য জীবনকে উপলব্ধি করবার জন্য, জীবনের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য সদা মানসিকভাবে সৃজনশীল থাকতে হয়। দেহে-মনে-প্রাণে-কর্মে সৃষ্টিশীল থাকা, যত্নবান থাকা, প্রতি মুহূর্তে আত্মোন্নয়নের বা আত্মোৎকর্ষের প্রয়াসে সযত্ন-সতর্ক থাকাই জীবন-চেতনার লক্ষণ, যেমন একজন গৃহস্থ সকাল থেকে রাত্রে ঘুমানোর পূর্বাবধি জাগ্রত মুহূর্তে তার চিন্তা-চেতনা নিয়োজিত রাখে– তার দায়িত্ব ও কর্তব্য আর লাভ-লোভ-স্বার্থ চিন্তায়। সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে তার সংকীর্ণ পরিসর জগৎভাবনায় ও জীবনচেতনায় তাকে অবশ্যই নিষ্ঠ দায়বদ্ধ জীবনবাদী বলে স্বীকার করতে হবে। অবশ্য সাধারণ ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষের জীবন মানে মানসিক দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকা, দেহে নিরোগ থাকা, অর্থসম্পদে সচ্ছল থাকা, পরিবার-পরিজন নিয়ে পারস্পরিক নির্ভরতায়, বিশ্বাসে ও ভরসায় নিশ্চিত নিশ্চিন্ত আশ্বস্ত থাকা, রোগে-শোকে-বিপদে-যন্ত্রণায়ও বেঁচে থাকার কাঙ্ক্ষা রাখা।

কিন্তু কোটিতে গুটিক থাকেন, যিনি স্বভাবেই শুভৈষী, নিজের ও পরের হিতৈষণাতেই যাঁর ভাব-চিন্তা-কর্ম নিয়োজিত। তিনি মানুষের, সমাজের, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের একঘেঁয়ে গতানুগতিক আবর্তন ও বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়ে নতুন চেতনার ও মুক্তচিন্তার প্রয়োগে কল্যাণকে, সুন্দরকে, বৈচিত্র্যকে, উৎকর্ষকে সংযোজিত করতে চান, পুরাতনের উপযোগরিক্ত বিশ্বাসকে সংস্কারকে ধারণাকে, অপূর্ণ জ্ঞানকে, আচার-আচরণকে, নীতি-রীতিকে নিয়ম-রেওয়াজকে মত-পথকে, প্রথা-পদ্ধতিকে বর্জন করে। এমনি মানুষই স্বশক্তির তথা মেধা-মনীষা-উদ্যমের প্রয়োগে নতুন চেতনার বিশাল বিস্তার ঘটান, জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে পূর্বলব্ধ সর্বপ্রকার বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-জ্ঞান পরিহার করে মুক্ত মন নিয়ে বৃক্ষের পল্লবের মতো নতুন চেতনার সম্পদে নতুন উপলব্ধ ও অনুভূত তত্ত্ব-তথ্য-সত্যগর্ভ শিল্পে-সাহিত্যে-স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে এক কথায় বিভিন্ন কলার নব সৃষ্টিতে উৎকর্ষ সাধন করেন, প্রকৃতির অশেষ তত্ত্ব, তথ্য, সত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রয়োগে সমুদ্র-পর্বত-অরণ্য আর অনন্ত নভঃজগতে গবেষণা চালিয়ে পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ-নিরীক্ষণ-সমীক্ষণ আর যন্ত্র প্রয়োগে আবিষ্কার উদ্ভাবন করে করেই মানুষ আজকের এ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসাদ-এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে যন্ত্র-কৌশল-প্রকৌশল-প্রযুক্তির ফল ও ফসল দেহে প্রাণে-মনে ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ করছে। আজ দূরকে নিকট, পরকে পরিচিত, কায়িক শ্রমকে যান্ত্রিক, মানসিক শ্রমকে লঘু, সময় সাপেক্ষ আজকে মৌহূর্তিক করে তুলেছে এ নতুন চেতনার ও মুক্তচিন্তার উদ্যমশীল সৃষ্টিশীল স্বল্প সংখ্যক মানুষেরাই, যে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষেরা আঠারো শতক অবধি মধ্যযুগীয় শাহ-সামন্ত-যাজকদের হাতে হত-লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়ে ছিল ভীত। উনিশ শতকের শেষার্ধ ওঁরা ইউরোপে মুক্তচিন্তার, নতুন কথা বলার, নতুন জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধানের অবাধ সুযোগ পেয়ে আজকের আমাদের ব্যবহারিক জীবনে আকাশে উড়ে বেড়ানোর, পাতালে ঘুরে বেড়ানোর, পর্বতে বিচরণের স্বপ্ন ও সাধ পূরণ করেছেন। যে-সুযোগ থেকে আজো আফ্রো-এশিয়ার অনেক রক্ষণশীল সমাজের লোক আজকের এ মুহূর্তেও বঞ্চিত। এসব দেশের কোনো কোনো সমাজে আজো নতুন কথা বলতে মানা, নতুন চেতনা, মুক্ত-চিন্তা দণ্ডযোগ্য অপরাধ। প্রাচীন ও মধ্যযুগ অবশ্য আজো সব দেশে অবসিত হয়নি। আফ্রিকায় আজো প্রাচীন যুগ মেলে, এশিয়ার অনেক সমাজে আজো মধ্যযুগ প্রতাপে প্রবল, যদিও ব্যবহারিক জীবনে সবাই অবশ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবদান যন্ত্র, প্রযুক্তি, চিকিৎসা প্রভৃতির প্রসাদে প্রাত্যহিক জীবন স্বাচ্ছন্দ্যে সাচ্ছল্যে ও সৌকর্যে ধন্য আর উপভোগ করছে, তৈরি করেছে ভূস্বর্গ। কিন্তু তবু বিশ্বাস সংস্কার-ধারণার দুর্গে তাদের জ্ঞান বুদ্ধি-যুক্তি প্রবেশ পথ পায় না বলে, এ সময়ে বাস করেও তারা মানসিক জীবনে বিচরণ করে সেই অজ্ঞতার দেড় দুই আড়াই তিন সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার ভুবনে ও সমাজে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান জাত সব বস্তুর ও যন্ত্রের ব্যবহারে আগ্রহী হলেও, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে তাদের অশ্রদ্ধা ও অনীহা কমে না। যুক্তি তাদের কাছে গ্রাহ্য নয়, যুক্তি তারা সহ্যও করে না।

AMARBOI.COM

নতুন চেতনা মানে নতুন প্রয়োজনচেতনা, জীবনের ও সমাজের কালানুগ চাহিদা চেতনা নতুন চিন্তা নতুন তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য উপলব্ধি, নতুন প্রয়াস মানেই জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য, সাচ্ছল্য ও সৌকর্য লক্ষ্যে নতুন কোনো বস্তুর সৃষ্টি, নতুন কোনো পথ পদ্ধতির উদ্ভব, নতুন কোনো যন্ত্রের নির্মাণ, নতুন কোনো শক্তির জ্ঞান, নতুন কোনো সুপ্ত ও গুপ্ত পদার্থের আবিষ্কার। মানবিক গুণের বিকাশ ও সভ্যতার বিস্তার ঘটেছে এভাবেই। সংস্কৃতিমানতাও তাই এক অর্থে সৃষ্টিশীলতাই।

মানুষের জ্ঞানের, অভিজ্ঞতার, বিজ্ঞতার, মনের, মননের, মনীষার বিকাশ, হাতিয়ারের ও রোগ প্রতিষেধকের আবিষ্কার প্রাত্যহিক গার্হস্থ্য জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের, সাচ্ছল্যের, সৌকর্যের, আনন্দের, সুখের ও আরামের জন্যে আবাস আসবাব তৈজস পোশাকের উদ্ভাবন প্রভৃতি ব্যবহারিক বস্তুর নির্মাণ, আর শিল্প সাহিত্য প্রভৃতি চৌষট্টি কলার চর্চা প্রভৃতি চিৎপ্রকর্ষের প্রসূনমাত্র। মানুষের এ অবাধ নতুন চেতনার ও নতুন মুক্ত মানুষের এ অবাধ নতুন চেতনার ও নতুন মুক্তচিন্তার ফল ও ফসলই হচ্ছে সভ্যতা। আর ব্যক্তি মানুষের প্রবহমান চেতনার ও চিন্তার সৃষ্টিশীলতাই হচ্ছে সংস্কৃতি। জীবন্ত বৃক্ষের ঝরাপাতা ও বর্ধিষ্ণু কাণ্ড তার অতীত কৃতি, মানুষের বেলায় যা সভ্যতা, আর বৃক্ষের কিশলয় নব পল্লব-প্রশাখাই তার সৃষ্টিশীলতা তার প্রাণময়তা। মানুষের বেলায় তার নব নব উন্মেষশীল সংস্কৃতি। জীবন শীতকালীন বৃক্ষে টিকে থাকা নয়, বাসন্তী হাওয়ায় পুষ্পে পল্লবে সৃষ্টিশীল আত্মবিস্তারমুখী প্রাণময়তারই প্রতিম ও প্রতীক। জাগতিক জীবনে অশনে বসনে নিবাসে স্বাস্থ্যে শিক্ষায় রোগপ্রতিরোধক চিকিৎসায় ঔষধে যন্ত্রে প্রকৌশলে প্রযুক্তিতে নয় কেবল, গণমানব মুক্তির মানুষকে শোষণ-শাসন-পীড়ন-পেষণ, বঞ্চনা-প্রতারণামুক্তির পদ্ধতিও নতুন চেতনার ও মুক্ত চিন্তার অবদান। অতীত ও ঐতিহ্যপ্রিয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতীতমুখী মানুষের অন্ধত্ব কিছুতেই ঘোচে না। তাই কবি জীবনানন্দ দাসের দেখা অর্ধশতক আগের পৃথিবীতে, দেশে, সমাজে ও রাষ্ট্রেই বাস করি আমরা আজো:

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সব চেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা,
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই, প্রীতি নেই, করুণার আলোড়ন নেই,
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।

জীবনে যুক্তির প্রয়োগ-অপ্রয়োগ

সবারই ধর্মশাস্ত্র আছে, প্রাত্যহিক জীবনে লোকব্যবহারে মেনে চলার নীতি-নিয়ম, বিধি-বিধান-রীতি-রেওয়াজ ও প্রথা-পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু তাৎপর্য বা উপযোগ চেতনারিক্ত নীতিনিয়ম, বিধিবিধান প্রভৃতির জীবনাচারে বাস্তবায়ন কেবল আচারের অনুরাগ, অনুগামিতা ও আনুগত্য হয়, ধর্ম পালন হয় না, এ ধারণাটি সাধারণের মধ্যে উন্মেষ পায় না, রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গের জগমোহন কিংবা যোগাযোগের বিপ্রদাস বুঝতেন। অন্যরা সাধারণভাবে ধর্মের নামে নিয়ম পালন করে। তাৎপর্য সচেতন হয়ে ধর্ম মানে না। জমিদারের প্রাপ্য খাজনা দিতে অস্বীকার করলেও যে অধর্ম হয় না, তা বুঝতেন প্রায়শ্চিত্যের ধনঞ্জয় বৈরাগী। রবিবার গল্পের অভীক জাত পাতের উর্ধ্বে। তা হলে জাগতিক জীবনে ন্যায়-অন্যায় বিচার-বিবেচনা করতে হয় নিয়মানুগত্যে নয়, জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগে। মুক্ত মন, মুক্ত মত, মুক্ত বুদ্ধি, মুক্ত যুক্তি, মুক্ত সিদ্ধান্তই হবে পুঁজি ও পাথেয়। বিজ্ঞানুরাগ, যুক্তির অনুগামিতা আর যথাপ্রয়োজনে যথাকালে, যথাস্থানে, যথাবস্তুর বা যথাপাত্রের ন্যায্য অপরিহার্য আবশ্যিক ও জরুরী চাহিদা পূরণ চেতনাজাত উদ্যম এবং বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক পটে সমকালীন চিন্তা-চেতনার আনুগত্যই হচ্ছে জাগতিক জীবন জীবিকা, সমাজ-রাষ্ট্র-সংস্কৃতি-সভ্যতা সচেতনতার পরিচায়ক। বিজ্ঞানে-দর্শনে-শিল্পে-সাহিত্যে সামাজিক আচারে আচরণে ঘটবে তারই অভিব্যক্তি। কিন্তু পরমত সহিষ্ণুতায় সহাবস্থানে শাহ সামন্ত শাস্ত্রী সমাজ-সর্দার নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কিংবা রক্ষার গরজে গণহত্যা করায় দরিদ্রদের নানাভাবে প্ররোচিত করে। প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ করে সচেতন জিজ্ঞাসু যাচাই বাছাই প্রিয় জ্ঞান যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক অনুরাগী অনুগামী ও অনুগত ব্যক্তির যৌক্তিক বৌদ্ধিক সিদ্ধান্ত ও মীমাংসা নির্ভর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা স্ব স্ব চেতনাই মূলত জাগতিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের নিয়ামক-নিয়ন্তা নিয়ন্ত্রক। তাই কবির ভাষায় :

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনী উঠল রাঙা হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'
সুন্দর হল সে।

আবার মানুষের প্রবৃত্তি-প্রকৃতিকে সংযমে, সহিষ্ণুতায় সৌজন্যে মানবিক গুণানুশীলনে পরিমার্জিত, পরিবর্তিত করতেই হয়, যেভাবেই হোক প্রকৃতিকোলে প্রাকৃতভাবে লালিত হওয়া চলে না যূথবদ্ধ সমাজবদ্ধ মানুষের, তার মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনাচার প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই বৈচিত্র্যেও সঙ্গতি সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যিক ব্যক্তির সম ও সহ স্বার্থে, সংযমে, সহিষ্ণুতায় সামবায়িক সহযোগিতায় নির্বিরোধে নির্বিবাদে নিরুপদ্রবে নিরাপদে সহাবস্থান করার গরজে। তবু মানুষের ব্যক্তিক নৈতিক শৈক্ষিক মগজী, আর্থিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক শাস্ত্রিক অবস্থার ও অবস্থানের গুণ মান মাপ ও মাত্রানুযায়ীই জগৎচেতনা ও জীবনভাবনা গড়ে ওঠে, নিয়ন্ত্রিত হয় এবং প্রাত্যহিক জীবনের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে অভিব্যক্ত হয়। এজন্যই সম্ভবত কোনো দুটো মানুষের মধ্যে মনের, মতের, মননের, মন্তব্যের সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য সমমাপের, মানের ও মাত্রার মেলে না, আর বৈপরীত্য, অমিলতো থাকেই। তাছাড়া লাভ লোভ স্বার্থ চেতনাই প্রায়ই বিবেক বিধ্বংসী প্রাকৃতিক শক্তি, নৈর্ব্যক্তিক চেতনা সাধারণত গার্হস্থ্য জীবনে হারই মানে। আত্মপ্রত্যয় আত্মসংযম ও শক্তি একই সময়ে একই পরিবারের হয়েও একই অতীত, ঐতিহ্য ও শাস্ত্রানুগত হয়েও প্রতিটি ব্যক্তি বিভিন্ন কালে বাস করে মানসিকভাবে, ক্বচিৎ কেউ থাকে সমকাল সচেতন ও সমকাল প্রভাবিত। তাছাড়া বিভিন্ন শিক্ষার, শাস্ত্রের ও সমাজের মানুষের মধ্যে মনে, মতে, পথে, লক্ষ্যে ও সিদ্ধান্তে পার্থক্য তো থাকেই। ফলে দেশে দেশে কালে কালে মনের, মতের, পথের, লক্ষ্যের, স্বার্থের পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যজাত বিরোধ বিবাদ দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত চলতেই থাকে। ফলে শাস্ত্রজ মতবাদগত স্বাতন্ত্র্য মানুষের মধ্যে রক্তক্ষরা প্রাণহরা ঈর্ষা-অসূয়া-হিংসা-ঘৃণা-অবজ্ঞা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব জিইয়ে রাখে, এবং সমাজসর্দারদের খ্যাতি-ক্ষমতা দর্প-দাপট, প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার ও প্রসারের প্রয়োজনে অজ্ঞ দীন অর্থবিত্ত লিপ্সু লোকদের প্ররোচিত করে দাঙ্গা-লড়াই-যুদ্ধ বাধায়। মানুষে মানুষে প্রীতি-মৈত্রীর পথে শাস্ত্রজ মতবাদ আর আচরিক স্বাতন্ত্র্যই সবচেয়ে বড় বাধা। মানুষকে তাই আমরা কেবল 'মানুষ' রূপে ভাবতে পারি না।

মনোজগৎ

বাস্তবজগতের মতো মনোজগতের অলিগলিও কম নয়, মনোজগতের পরিসর সামান্য নয়, বিচিত্রও। Concept ও Knowledge, Conception ও Wisdom, Belief ও Faith, Prejudice ও Superstition প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য সামুদ্রিক। এগুলো নিয়ে তর্ক চলে, মীমাংসা মেলে না। দ্বেষ-দ্বন্দ্ব বাড়ে, টিকেও থাকে সুপ্ত, গুপ্ত ও লুপ্তভাবে। এতে কালে কালে দেশে দেশে মানব প্রজাতির ক্ষতিই হচ্ছে, লাভ হয়নি কিছুই। কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাতন্ত্র্যচেতনা, বিচ্ছিন্নতাবোধ ও শত্রুতার তথা মিলন-মৈত্রীরিক্ততা গাঢ়, গভীর ও ব্যাপক হয়েছে মাত্র। কারণ ধারণা পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ ও সমক্ষীণ সাপেক্ষ নয়, অনেক শ্রুতি-স্মৃতিগত, প্রাজন্মক্রমিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার পরম্পরাসম্পৃক্ত। কাজেই স্থানিক, পারিবারিক, সামাজিক ও কালিক লৌকিক অলৌকিক অলীক লোকাচার-দেশাচারগত আচার ধারণা ও আস্থা চালিত অভ্যস্ত গতানুগতিক জীবনযাত্রাই জন্ম-জীবন-মৃত্যু পরিসরে নিবদ্ধ জীবন যাপিত হয় সাধারণ মানুষের।

যেমন তুমি ভূতে-প্রেতে-পিশাচে বিশ্বাস কর। কাজেই রাত্রে নিঃসঙ্গ পথে তুমি তেঁতুল অশথ বৃক্ষ অতিক্রমণে ভীত হবে। আমি বিশ্বাস করি না, কাজেই নিঃসঙ্গ রাত্রে ও পথে আমি থাকব নির্বিকার।

আবার আমি জীনে-পরীতে-দেও-এ আস্থা রাখি, কাজেই আমার ঘরের লোকের মানসিক কিংবা বিশেষ ধরনের দৈহিক রোগ দেখা দিলে আমি প্রথমেই জীন-পরী-দেও-র হামলার বা আসরের কথা ভাবব।

তুমি ঝাড়-ফুঁকে, তাগা-তাবিজে আস্থা রাখ, তাই ওগুলো ধারণ করে নির্ভয়ে থাক নিজেকে দুর্ঘটনাজাত বিপন্মুক্ত বলে বিশ্বাসের জোরে। আমি রাশি চক্রের প্রভাবে আস্থা রাখি না, মন্ত্র-মাদুলীও নেই আমার। কাজেই মুক্তমনেই চলি এবং যে-কোনো আকস্মিক ঘটনা-দুর্ঘটনাকেই কারণজাত বলেই মানি।

তুমি যদি কারণবাদী হও, তা হলে তুমি সব সময়েই অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির বা নিয়তির প্রভাবেরও লীলার নিয়ন্ত্রিত বলেই জানবে এ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে। যেমন তুমি যদি বর্ণে বিন্যস্ত সমাজকে ঈশ্বর নির্দিষ্ট বলে মান এবং জন্মান্তরে বিশ্বাস রাখ আর জীবনে যা কিছু ঘটে সবটাই পূর্বজন্মের পাপ-পুণ্যের ফল বলেই জান, তা হলে তুমি তদবীরে কখনো তকদীর বদলাতে পারবেই না। তোমার এ জন্মের ধ্যান-ধারণা-সাধনা-শ্রম, অধ্যবসায়, সৎকর্ম, সততা, কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি পরবর্তীকালের জন্মে ও জীবনেই মাত্র তোমাকে সুফল দান করতে পারবে।

আমি যদি নিয়তিবাদী হই, তথা সুনির্দিষ্ট জীবনপঞ্জী তথা কপাললিখন, যা অদেখা বলে অদৃষ্ট বলে অভিহিত হয়, তা হলেও আমিও নিয়তিবাদীরূপেই শ্রম-সময়-মগজ-মেধা-মনন-মনীষা-ধৈর্য, অধ্যবসায়, অঙ্গীকার, জ্ঞান, বুদ্ধি, যুক্তি, শক্তি, সাহস, উদ্যম, উদ্যোগ ও আয়োজন সহযোগে যে জীবনের গতি প্রকৃতি তথা কৃতি-কীর্তি বিদ্যা-বিত্ত, অর্থ-বাণিজ্য বদলাতে পারি, তাতে অন্তরের গভীরে আস্থা রাখা কখনো সম্ভব হবে না। আমরা কিছুই গুরুত্বসহকারে ভাবি না, করি না বলেই ভাসা ভাসাভাবে যখন যে যেমন পরামর্শ দেয়, তেমনই করতে, বুঝতে ও ভাবতে চাই। ফলে এতে আমাদের চিন্তা-চেতনার, বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার অদৃঢ়তার অস্থিরতার সাক্ষ্য প্রমাণ মেলে মাত্র।

জন্মে জীবনে মরণে কোনো স্তরেই কোনো ক্ষেত্রেই মানুষ যুক্তিনির্ভর সাহসী আত্মপ্রত্যয়ী হয় না, সাধারণত সর্বত্রই অদৃশ্যশক্তিকেই অদৃশ্য সূত্রধর বলে জানে ও মানে। কাজেই বিশেষ তাৎপর্যে জীবন হচ্ছে পুতুলনাচ-পুতুলনাট্য।

মানুষ তার অভাব, চাহিদা ও কাজ্ক্ষাপূর্তির লক্ষ্যে অর্থাৎ লাভে লোভে স্বার্থেই কেবল জীবনের চিন্তা-চেতনা সীমিত রাখে, মগজ চালনা করে বৈষয়িক-ব্যবহারিক বিষয়ে কিংবা ক্ষুধা-তৃষ্ণা-মৈথুন সম্পৃক্ত বিষয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে কিছু লোক তাত্ত্বিক-দার্শনিক চিন্তাভাবনা করেন, পরিবারের, দলের, গোষ্ঠীর, গোত্রের যৌথজীবনে সমাজের ব্যবহারিক বৈষয়িক প্রয়োজনে কিছু নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা পদ্ধতি তাঁরা নির্বিরোধে নির্বিবাদে নিরুপদ্রবে নিরাপদে সামবায়িক সহযোগিতায় সহাবস্থানের গরজে বেঁধে দিয়েছেন, সেগুলো সাধারণত মেনে চলা হয়, ক্বচিৎ কেউ কেউ রীতিনিয়ম ভাঙে, প্রথা-পদ্ধতি লঙ্ঘন করে ফলে ব্যক্তিক, স্থানিক, পারিবারিক কিংবা সামাজিক ক্ষেত্রে সাময়িক বিবাদ-বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা ঘটে। এভাবেই অরণ্যে উপজাতির মধ্যে, গাঁয়ের গণসমাজে, শহরে-বন্দরে সর্বত্র জীবনযাত্রা চলে।

মানুষ কেবল ইহজাগতিক বাস্তব চাক্ষুষ জীবনের মধ্যেই তাঁর তাত্ত্বিকচেতনা নিবদ্ধ রাখে না, কোথায় ছিল, কোত্থেকে এল, কে আনল, কেমন করে এল? এলতো এর আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য আর পরিণতিই বা কি? তাও ভাবল। ফলে জীবন হল জানায় অজানায় ইহ-পরলোকে দৃশ্যে অদৃশ্যে বিস্ময়-ভয়-ভক্তি-ভরসায় লৌকিকে অলৌকিকে অলীকে প্রসৃত। জীবন, সমাজ, নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ ও প্রথাপদ্ধতি সব কিছুরই উৎস হল অনাদি অদৃশ্য জগৎ, জীবন হচ্ছে সেই অদৃশ্য বীজের বৃক্ষ, মৃত্যুতে বৃক্ষ অবসিত হয়। কিন্তু ফল থেকে যায় অনন্তকাল অবধি অদৃশ্য অন্য এক জগতে।

অবশ্য এ বিষয়ে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সর্ব তত্ত্বেই, তথ্যেই, সত্যেই থাকে ক্ষুদ্র-বৃহৎ মতপার্থক্য। সর্বসম্মত কিছু সাধারণত মেলেই না। স্বর্গবাস, মোক্ষ, নির্বাণ প্রভৃতি অভিন্নাত্মক ও অভিন্নার্থক নয়। এমন কি মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণাও বিচিত্র। যেমন আত্মার ধারণাও বিবিধ।

তুমি মনে কর মা বাবা বুড়ো হয়ে গেছে, স্বাস্থ্য হারিয়েছে, অচল হয়েছে, কাজেই তাদের হঠাৎ হত্যা করে সমাজের লোকদের খাইয়ে দিলে দেহ-প্রাণ-আত্মা সবটাই কাজে লাগল, ফলে এর ঐহিক পারত্রিক মুক্তি ঘটল। আমি মনে করি বুড়ো মা-বাবা যখন অচল হয়ে পড়েছে, তখন বেঁচে থাকাটাই তাদের কাছে জীবনযন্ত্রণা বিশেষ। কাজেই হত্যা না করে হাতির পাল যেমন বৃদ্ধ, রুগ্ন মুমূর্ষু হাতিকে তাদের নির্দিষ্ট ভাগাড়ে সাদরে রেখে আসে, তেমনি আমিও আমার মা-বাবাকে হঠাৎ একদিন নিয়ে নির্জন অরণ্যে কিংবা তুষারাঞ্চলে রেখে এলাম, ভবযন্ত্রণা থেকে প্রিয়জনকে মুক্তি দেয়ার সুবিবেচনা বশে। তুমি যদি মনে কর এ মৃতদেহ অনর্থক নষ্ট হতে না দিয়ে পশু-পাখির খাদ্য করে দিলে ওদের তৃপ্ত, তুষ্ট ও হৃষ্ট মন-হৃদয় সঞ্জাত শুভেচ্ছা মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি-স্বস্তি-সুখ-আনন্দ-আরামের কারণ হতে পারে, তাতেও যুক্তি রয়েছে। আবার আমি যে মৃতদেহ পুড়িয়ে গাঁ-পাড়া-মহল্লাকে গন্ধ ও রোগজীবাণু মুক্ত রাখি, আগুন মৃতের আত্মাকে যথাস্থানে যে নিয়ে অভিবাসন দেয়, তাতেও আছে যুক্তি। মাটিতে পুঁতে ফেলার যুক্তিও প্রবল। অবশ্য এসব যুক্তি বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাসঞ্জাত যতটা, ততটা প্রয়োজনগত বিশুদ্ধ যুক্তিসিদ্ধ নয়।

বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার আদি নাম ধর্ম কিংবা শাস্ত্র অথবা মেনে নেয়া-নীতি রীতি নিয়ম প্রথা পদ্ধতি। এসব বিশ্বাসে সংস্কারে ধরণায় চালিত হয় সাধারণ ব্যক্তির ও সমাজের মানুষের ইহজাগতিক জীবন। তার ভাব-চিন্তা-আচার-আচরণ-পালা-পার্বণ প্রভৃতি তাকে অভ্যস্ত ও চালু পদ্ধতির করে ও রাখে। ধার্মিক আত্মসংযম পরমতসহিষ্ণুতা, উদারতা, কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য-ক্ষমা-মৈত্রী প্রভৃতিতে আস্থা রাখে। এজন্যে যথার্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তিনিষ্ঠ বিবেকবান ধার্মিক ধীর স্থির শান্ত সহিষ্ণু ও পরার্থপর হয়। পাপী তাপী ধনী নির্ধন পণ্ডিত মূর্খ প্রভৃতি সবাইকেই কেবল মানুষ রূপেই গ্রহণ করে, কৃপা করে, সহানুভূতি জানায়, দুঃখ বিপদ রোগ মুক্ত করার আধ্যাত্মিক পন্থায় প্রয়াসী হয় যেমন সাধু সন্ত সন্ন্যাসী ভিক্ষু ফকির দরবেশ সুফী শ্রমণ শ্রাবক প্রভৃতি পাপী বলে কোনো মানুষকে ঘৃণা অবজ্ঞা হিংসা করে না, কৃপা-করুণা-ক্ষমা-প্রীতি দিয়ে তাকে গ্রহণ করে, তার সেবা করে, তার প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করে। অতএব ধার্মিক উগ্র মারমুখো উন্মুক্ত উত্তেজিত হতেই পারে না। মনুষ্যত্বের অনুশীলন পরিশীলনরিক্ত রাজনীতিকদের মতো ধর্মীয় দলের লোকই কেবল ধর্মের নামে উত্তেজনা-উসকানী-প্রেরণা-প্ররোচনা পেয়ে নরহত্যায় পুণ্যের বীভৎস আনন্দ, উল্লাস, সুখ ও সন্তোষ লাভ করে।

লোভ ও দারিদ্র্যই বিপর্যয়ের মূল

পুরো আড়াই হাজার বছর আগে জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তি বিবেক বিবেচনা ও অনন্য মনীষা সম্পন্ন মহামানব গৌতমবুদ্ধ অসামান্য সমাজচেতনাবশে সামাজিক সঙ্কটের ও সমস্যার মূল আবিষ্কার করেছিলেন, যা আজকের অর্থবিজ্ঞানী সমাজতাত্ত্বিক কিংবা রাজনীতিকরাও সম্যক উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হচ্ছেন ও হয়েছেন। বলেছিলেন সমাজে দারিদ্র্যই হচ্ছে সর্বনাশের মূলে। ধনবণ্টনের বিঘ্ন ঘটলে সমাজে মানব জীবনের স্বাভাবিক গতি ও প্রকৃতি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সমাজে সর্বাত্মক ও সর্বার্থক বিকৃতি ও অবক্ষয় ঘটায়, সমাজ হয় রুগ্ন, দেহ-প্রাণ-মন-মননের ও রুচি-সংস্কৃতির লাবণ্য ও স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়। এখানে গৌতমবুদ্ধের মতের, মন্তব্যের সিদ্ধান্তের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ পেশ করছি। উল্লেখ্য যে এ উক্তি বা বাণী আড়াই হাজার বছর আগেকার জীবনভাবনা, জগৎচেতনা ও সামাজিক নীতিনিয়ম ভিত্তিক। তাই এখানে দানের কথা রয়েছে, গণদাবির কথা নেই, নেই ব্যক্তির জন্মগত অধিকারের ও ন্যায্য দাবির কথা। বিশৃঙ্খলবদ্ধ কারণ পরম্পরা আজকের দিনে স্বীকৃত। [তথগত বুদ্ধ বলেন] পৃথিবীর ধনী লোকেরা যে সম্পদ পেয়েছে তার থেকে [ন্যায্য অংশ] তারা দান করে না, প্রাপ্তধন তারা সঞ্চয় করে এবং সবটা ভোগ করতে চায় [মজ্জিম নিকায়, সুত্ত ২৪/মধ্যম নিকায় সূত্র ২৪]।

"এভাবে ভিক্ষুগণ ধনরিক্তকে ধনদানের অভাবে বিপুল দারিদ্র্যের উদ্ভব হয়, ফলে ব্যাপকভাবে চৌর্যের উপদ্রব হল, তার ফলে অত্যাচার বেড়ে গেল, তার ফলে চারদিকে হত্যাকাণ্ড বেড়ে গেল, বেড়ে গেল মিথ্যাভাষণ, তার ফলে ব্যভিচার দেখা দিল, তার ফলে বিবাদ ও গালাগালি ছড়িয়ে পড়ল, তার ফলে লোভের, দ্বেষের, দ্বন্দ্বের ও মিথ্যার বিস্তার ঘটল। ফলে অধর্মচারণে আসক্তি, বিষয়বাসনা, দুর্নীতি, [মিথ্যা ধর্ম] প্রভৃতি সমাজকে আচ্ছন্ন করল। পিতামাতার ও শ্রমণ-ব্রাহ্মণের ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেল। [চক্রবর্তী সিংহনাদসূত্র দীর্ঘ নিকায় ২৬-২৮]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৌতমবুদ্ধ প্রদত্ত আড়াই হাজার বছর আগেকার সমাজের এ বয়ান, আড়াই হাজার বছর পরেও আজকের আমাদের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গণচরিত্রের ও গণসমাজের প্রতি আক্ষরিকভাবে প্রযোজ্য। বোঝা যাচ্ছে এ আড়াই হাজার বছর পরেও এতো শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতা-সংস্কৃতি রুচি বুদ্ধি জ্ঞান যুক্তি বিজ্ঞান প্রযুক্তি প্রভৃতির এতো আবিষ্কার-উদ্ভাবন বিস্তার-বিকাশ-উৎকর্ষ হওয়া সত্ত্বেও, সাহিত্যে দর্শনে শাস্ত্রে ইতিহাসে মননে মনীষায় মানে-মাপে-মাত্রায় আর মানসিক অনুভব-উপলব্ধি ও সূক্ষ্মতর ও বৈচিত্র্যে ঋদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সমাজ অঙ্গে ও অন্তরে গুণগতভাবে একটু এগোয়নি। আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান লজ্জার, আমাদের নৈতিকচরিত্র নিন্দার, আমাদের ভাব-চিন্তা কর্ম-আচরণে সততার, কৃপা-করুণা-ন্যায় বোধের অল্পতা ধিক্কারের এবং আমাদের ভালো হওয়ার ভালো চাওয়ার ভালো করার অনীহা আফসোসের বিষয়, আমাদের প্রেয়-সচেতনতার প্রাবল্য ও শ্রেয়ো চেতনার স্বল্পতা আমাদের স্থায়ী দুর্দশার কারণ।

আমাদের জাতীয় স্বভাব হচ্ছে কালো পিঁপড়ের মতো। আমরা লাভে লোভে ও স্বার্থে একা-একা নিঃসঙ্গ চিন্তায় কর্মে ও প্রয়াসে ঘুরে বেড়াই। লাল পিঁপড়ের মতো আমাদের যৌথ প্রয়াস নেই, সংঘশক্তি নেই, সংহতির গুরুত্ব-চেতনা নেই, পারস্পরিক, সামাজিক এক কথায় যৌথ বা দলবদ্ধ সহযোগিতায়, সহায়তায় সমবেত প্রয়াস-প্রযত্ন যোগেই যে ব্যক্তির ও সমষ্টির কল্যাণ এবং জাতির সর্বাত্মক ও সবার্থক কল্যাণ সম্ভব এটি চিন্তায় চেতনায়, মনে মননে মনীষায় অনুভব-উপলব্ধি করলেও, কার্যে বাস্তবে তার রূপায়ণ প্রয়াস বাঙালীর থাকে না, এ যেন মন মেজাজ চরিত্র আদর্শ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিরোধী। এদেশে কোনো রাজনীতিক দলেও বেশি দিন সংহতি ঐক্য টেনে না, দলছুট রাজনীতিকের সংখ্যাই এদেশে অধিক। এরা মন বদলায়, মত বদলায়, বোল পালটায়, ভোল বদলায়, রং বদলায়, ঢং বদলায়, এদের লজ্জা-সংকোচ-শরম নেই, এরা লজ্জায়, নিন্দায় ধিক্কারে কাবু হয় না। এদেশের মানুষে আত্মমর্যাদাবোধ, চারিত্রিক দাঢ্য, আদর্শিক নিষ্ঠতা, বিবেকানুগত্য, কোনো অঙ্গীকারের অনুরাগী থাকা, অনুগামী হওয়া কিংবা অনেকদিন অনুগত থাকা যেন এদের রুচি-সংস্কৃতি-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক বিরোধী।

স্থিরবিশ্বাস ও ধীরবুদ্ধি নিয়ে এ দেশে কোনো লোকেই দেশ, মানুষ, জাতি, রাষ্ট্র, সমাজ, দৈশিক বা জাতীয় অর্থসম্পদ বাণিজ্য-পণ্য উৎপাদন, নির্মাণ, বিপণন বিষয়ে সামগ্রিক, সামষ্টিক ও সামূহিক স্বার্থচেতনা ও দৃষ্টি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা কিংবা কাজকর্ম করে না, ব্যক্তির খণ্ড ও ক্ষুদ্র প্রয়াসে কেবল শোষণ-প্রতারণা-প্রবঞ্চনা-ভেজাল-চোরাচালান আর কাড়া-মারা-হানা নীতি-নিয়মের, রীতি-রেওয়াজের ও প্রথা-পদ্ধতির বিস্তার ঘটায়।

এ জাতীয় বিপর্যয় থেকে আমাদের মুক্তি আবশ্যিক ও জরুরী। আমাদের আজকের সমাজে চরিত্রবান আদর্শনিষ্ঠ জনসেবী জনকল্যাণকামী লোকের সংখ্যাবৃদ্ধি পাওয়া জরুরী, এদের মধ্য থেকেই মিলবে নেতা– যাঁরা বা যাঁদের মধ্যে থাকবে যুগপৎ ও একাধারে তিনটে অত্যন্ত আবশ্যিক গুণভ– মনীষা, সততা, [ন্যায়বুদ্ধি] ও সাহস Intellect, Integrity and Courage. শহুরে রাজনীতিতে ও আমলাজগতে এমনি লোকের সংখ্যাধিক্যেই আমাদের দৈশিক, রাষ্ট্রিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দুঃখ দুর্দশা ঘুচবে–আমাদের উন্নতি হবে ত্বরান্বিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপন্ন মানুষ

বুনো বর্বর সভ্য ভব্য প্রায় সব মানুষই একা বা একাধিক বা বহু বহু অদৃশ্যশক্তির প্রতি ভয়-ভক্তি-ভরসা রেখে স্বারোপিত বিধি-নিষেধ মেনে নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত জীবন যাপনের অঙ্গীকারবদ্ধ হয় বা থাকে প্রায় শৈশব থেকেই। তবু দেখা গেছে যায় ও যাবে যে প্রলোভন প্রবল হলেই প্রবৃত্তিচালিত প্রলুব্ধ ব্যক্তি ওই অদৃশ্য শক্তির প্রতি ভয়-ভক্তি-ভারসা সাময়িকভাবে বা ক্ষণিকের জন্যে পরিহার করে ওই অদৃশ্যশক্তির নামে তৈরি শাস্ত্র নামের বিধি-নিষেধ, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি মুহূর্তেই ভেঙে অপকর্ম-অপরাধ তথা পাপকর্ম করেই ফেলে। ওই অদৃশ্য আসমানী শক্তিগুলোকে অমোঘ শক্তি বলে জেনে বুঝে ও মেনেও প্রবৃত্তি পরবশ মানুষ নির্ভয়ে আনুগত্য পরিহার করে। এ শক্তি অদৃশ্য, অলীক, অলৌকিক এবং ইন্দ্রিয়াতীত ও কল্পনাপ্রসূত বলেই মানুষ একে অবহেলা করে–বার্ধক্যের জরা, জড়তা ও জীর্ণতাগ্রস্ত হওয়ার পূর্বাধি কিন্তু মানুষ সমাজকে ও শাসককে ভয় করে। তাই মানুষ যে-কোনো নিষিদ্ধ, অবৈধ, পরের স্বার্থহানিকর কাজ গোপনেই করে। কারণ সে নিন্দা ও শাস্তিভীরু। কাজেই মানতেই হবে মানুষ ঈশ্বরকে ও শাস্ত্রকে মানে বটে, কিন্তু কর্মজীবনে কর্মে ও আচরণে লাভে লোভে ও স্বার্থে মানে না। অতএব কর্মজীবনে মানুষ শাস্ত্রের অনুশাসন মানে না, মানে সমাজের প্রভাব নিন্দার ভয়ে, সরকারের তথা শাসকের শাসন শাস্তির ভয়ে। মানুষ যে সৎ হয়, ন্যায়বান হয়, আদর্শনিষ্ঠ হয়, চরিত্রবান হয়, পরার্থপর হয়, সংযমের, সহিষ্ণুতার ও সৌজন্যের অনুশীলন করে তা সমাজের প্রভাবে ও শাসকের তথা সরকারের শিষ্টের ও দুর্বলের পালন এবং দুষ্টের দুর্জনের দুর্বৃত্তের ও দুস্কৃতির কঠোর-কঠিন আইন প্রয়োগে দমননীতির নিষ্ঠ ও অমোঘ রূপায়ণে।

বুনো বর্বর সমাজে তো বটেই, এমন কি কোনো কোনো সভ্য-সংস্কৃতিমান সমাজেও দেখা যায় অধিকাংশ মানুষ সামাজিক নীতি-নিয়ম, প্রথা-পদ্ধতি, রীতি-রেওয়াজ নিষ্ঠার সঙ্গে মানে এবং সরকারী আইনও প্রকাশ্যে যথাসাধ্য মেনে চলে, বুনো-বর্বরেরা নীতিনিয়ম সহজে ভঙ্গ করে না, তারা অদৃশ্য অলীক, অলৌকিক বিবিধ অরি-মিত্র দেবতায় আস্থা-ভয়-ভক্তি-ভরসা রাখে বলেই ওই শক্তিকেই তারা জীবন-নিয়ন্তা নিয়তি বলে জানে ও মানে। আর শিক্ষিত লোকেরা সংযমের, সহিষ্ণুতার ও সৌজন্যের অনুশীলন করে ব্যক্তিত্বের প্রভায় ও প্রভাবে। সমাজে সসম্মানে স্বমর্যাদারক্ষায় সতর্ক ব্যক্তি মাত্রই ওই একই কারণেই সরকারের প্রশাসনিক আইন-কানুন প্রকাশ্যে অন্তত মেনে চলে। এভাবেই সম্ভব হয় নিজ নিজ স্বার্থে সংযমে সহিষ্ণুতায় সৌজন্যে সাময়িক সহযোগিতায় নির্বিবাদে, নির্বিরোধে নিরুপদ্রবে নিরাপদে যৌথ জীবনে আবশ্যিক সহাবস্থান।

আজ বাংলাদেশের সামগ্রিক সামষ্ট্রিক ও সামূহিক রূপ কি? গোটা দেশে শতে নব্বইজন মানুষের দেহ-প্রাণ-মন-মনন গভীর, ব্যাপক ও অবিমোচ্যভাবে দারিদ্র্যে আক্রান্ত, বিক্ষত ও বিকৃত। প্রত্যেকটা ব্যক্তির বড়-ছোট-মাঝারি নির্বিশেষে আর্থিক জীবন অনিশ্চিত। ব্যবসায়-বাণিজ্যে-ব্যাংকে শাসকে প্রশাসকে সরকারে কোথাও আস্থা-ভরসা-নির্ভরতা রেখে নিশ্চিন্ত থাকার অবস্থা ব্যবস্থা নেই। ক্রমবর্ধমান জীবিকার ও ধনসম্পদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থিতির অনিশ্চয়তার দরুন মানুষের স্বভাব বিনষ্ট। অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতেও এমনি ধরনের রাজনীতিক নেতৃত্বে, শাসনে প্রশাসনে উন্নয়ন কর্মে মানুষের জীবন-জীবিকায় ন্যূনতম স্বস্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও নিশ্চয়তা আসবে এমন আশা-আশ্বাস মেলে না কোথাও। গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে-মহল্লায় কোথাও পুলিশ পাত্তা পায় না ধনী-গুণ্ডা-মস্তান-খুনীর কাছে, পুলিশও আমল দেয় না নির্ধন জনগণকে। গোটা দেশে চলছে সর্বপ্রকারে নৈরাজ্য, মানুষেরা এখন যেন অরণ্য জীবনে জঙ্গল।

লড়াকু চাই

সৎ মানুষ কিছু বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত থাকে। হয়তো আত্মমর্যাদা বোধে নয়, কিন্তু পারত্রিক শাস্তির ভয়ে অন্তত এ ধরনের মানুষ ন্যায়নিষ্ঠ ও শাস্ত্রিক নির্দেশমানা হয়। আর সৎ থাকার আন্তরিক চেষ্টা করে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেকবান ও আত্মসত্তার সম্মানচেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিরা। কিন্তু বিরুদ্ধ সামাজিক, প্রাশসনিক ও রাষ্ট্রিক প্রতিবেশে সৎ থাকার জন্যে ত্যাগ-তিতিক্ষা-ধৈর্য-অধ্যবসায় দরকার, ক্ষতি স্বীকারের মতো আর্থিক সাচ্ছল্য ও মানসিক সহিষ্ণুতা আবশ্যিক। অতএব, কেবল সাহস থাকলেই সততা ও আদর্শ রক্ষা করে চলা যায় না, তার সঙ্গে ধন-জনরূপ প্রতিরোধ শক্তির সমর্থনও হয় প্রয়োজন। এ রাজনীতিক দলের ছাড়া ব্যক্তির বা কোনো ক্ষুদ্রশ্রেণীর বা পেশাজীবীর পক্ষে সম্ভব হয় না, তাই এদের প্রতিবাদ, প্রতিকার-প্রয়াস কিংবা প্রতিরোধ-ঈহা বেশিক্ষণ বা বেশিদিন টিকিয়ে রাখা যায় না। শোষক-পীড়ক-প্রতারক-প্রবঞ্চক-তালিম শেষাবধি দলনে-দমনে সফল হয়েছে সাধারণভাবে। ইতিহাসের সাক্ষ্যে দেখা যায় প্রবল শাহ-সামন্ত-শাসক-শোষক-পীড়ক-প্রতারক-প্রবঞ্চক কৃচিৎ উৎখাত হয়েছে সাময়িকভাবে। জয় হয়েছে শোষিতের-শাসিতের-পীড়িতের-প্রবঞ্চিতের, কিন্তু সে বিজয় ধরে রাখা যায়নি বিরুদ্ধ নীতি-নিয়মের রীতি-রেওয়াজের ও প্রথা-পদ্ধতির চাপে ও প্রভাবে। আবার নতুন করে শাহ-সামন্ত-শোষক-পীড়ক-দলক-প্রবঞ্চক প্রভৃতি শূন্যস্থান পূরণ করেছে। জোর যার মুল্লুক তার, যোগ্যতমের উর্ধ্বতন নীতিরই হয়েছে প্রতিষ্ঠা, দুষ্টের, দুর্জনের, দুর্বৃত্তের দুস্কৃতির শক্তির, সাহসের, সংকল্পের, উদ্যমের, উদ্যোগের ও সুষ্ঠু আয়োজনের জয় হয়েছে বারবার, আজও হচ্ছে চারদিকে ব্যক্তির, সমাজের ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে।

অধিকাংশ মানুষ যে বিবেকবান হচ্ছে না শুধু তা-ই নয়, যুক্তিনিষ্ঠ ও ন্যায্যতাপ্রবণও যে হচ্ছে না– লেখাপড়ার এত বিকাশ-বিস্তার সত্ত্বেও। তাই মানুষের দুস্থ গণমানবের আর্থ-সামাজিক সুবিচার পাওয়ার আশা-আশ্বাসও বারবার শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। তবু হতাশার হাল ছেড়ে দিলে চলবে না, আদিকাল থেকেই প্রবল-কবলিত গণমানবসমাজ এভাবেই মাথা তুলে তুলে মার খেয়ে খেয়ে, মরে মরে বারবার বেঁচে ওঠার, জেগে ওঠার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে দাঁড়াবার, রুখে দাঁড়াবার অদম্য প্রয়াস পেয়েছে দুনিয়াব্যাপী সর্বত্র। এ সংগ্রামের শেষ নেই, মানবযাত্রার নিত্যকার অপরিহার্য প্রয়াস-প্রযত্ন হিসেবে এ চলতেই থাকবে, নইলে প্রশ্রয়প্রাপ্ত প্রবল তার শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনার সূক্ষ্ম-তীব্র-তীক্ষ্ণ-অমোঘ কৌশল কেবল বাড়িয়েই চলবে, বিচিত্র করে তুলবে। অতএব, আজকের দিনে গণমানবসমাজের ঘরে ঘরে লড়াকু তৈরি করাই, তৈরি রাখাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ রূপে গৃহীত বা স্বীকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। গাইয়ে, বাজিয়ে, নাচিয়ে, আঁকিয়ে, লিখিয়ে সব মন-মননজীবী নয় কেবল, বঞ্চিত শোষিত সচেতন মানুষমাত্রই মনে মনে মানসশৃঙ্খল তৈরি করে মুক্তির লক্ষ্যে মুক্তির অন্বেষায় সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে স্বাধিকার অর্জনের ও প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র। ধীরবুদ্ধি ও স্থিরপ্রত্যয় নিয়ে আমরা মানব মুক্তির প্রতীক্ষায় থাকব।

মানবিকতা ক্ষয়িষ্ণু

AMARBOI.COM

বিশশতকের নিঃস্ব নিরন্ন শোষিত পীড়িত দলিত দমিত বঞ্চিত গণমানব তাদের ভাতে-কাপড়ে ন্যূনতম মানবিক অধিকারপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আশান্বিত ও আশ্বস্ত হয়েছিল, সোভিয়েট রাশিয়া-চীন দেখে পরে প্রত্যাশা পূরণ সম্বন্ধে প্রত্যয়ী হয়েও উঠেছিল। মনে করেছিল এ কেবল সময়ের ব্যাপার। শোষিত বঞ্চিত মানবের-মানবতার বিশ্বময় মুক্তি ঘটবেই।

আকস্মিকভাবে পূর্বয়ুরোপে-সোভিয়েট রাশিয়ায় [এবং চীনেও কিছুটা] সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে গেল। শুনে শেখা, শুনে আশ্বস্ত হওয়া, শুনে সমাজবাদী হওয়া গুরুবাদী অজ্ঞ উৎসাহী কম্যুনিস্টরা এ বিপর্যয়ে বিশ্বব্যাপী সর্বত্র যেন নিরাশ-হতাশ নয় কেবল, ভুল মতাদর্শ সমর্থনের অনুসরণের জন্যে লজ্জিত এবং অনুশোচনায়ও যেন মর্মাহত। কাস্তে-হাতুড়ি অঙ্কিত পতাকা বর্জনে নয় শুধু, সঙ্ঘ-সমিতি-সংস্থাগুলোর নাম বদলেও হতে চাইল স্বস্থ, যেন তাদের কুমতলব-অপকর্ম হঠাৎ ধরা পড়ে গেছে, অপরাধের নিন্দা-লজ্জা-শাস্তি এড়ানোর অপপ্রয়াসে সমাজবাদীদের অধিকাংশই দলছুট হয়ে অন্য বুর্জোয়া দলে ও মতে আশ্রিত হবার জন্যে ছুটোছুটি করতে থাকে। যেন পূর্ব য়ুরোপে রাশিয়ায় কিংবা দিকভ্রান্ত চীনে যেন মার্কসবাদের ব্যর্থতা ও অলীকতাই প্রমাণিত হয়ে গেল। তারা কিছু শিশু-বৃদ্ধ-অন্ধ-পঙ্গু-পাগল নির্বিশেষে মানুষমাত্রেরই বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার এবং বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব ও কর্তব্য যে সরকারের তথা রাষ্ট্রের—এ তত্ত্বের ও তথ্যের ন্যায্যতা অস্বীকার করছে না, তবে মার্কসবাদসম্ভূত এ তত্ত্বের বাস্তবায়নের জন্য কি বিকল্প পন্থা রয়েছে, সে-সম্বন্ধেও তারা কিছু বলছে না।

ফলে এ শতকের আশ্বস্ত গণমানব সমাজতন্ত্রের এ বিপর্যয়ে নিরাশ, হতাশ ও দিশেহারা হয়ে আশা-ভরসার নোঙর অন্য কোনো উপায় বা পন্থালগ্ন করবার জন্যে ছুটোছুটি করছে। সনাতন-বিশ্বাস-সংস্কার চালিত অজ্ঞ অসহায় মানুষ আবার ভূত-প্রেত-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিশাচ-জীব-পরী-ড্রাগন-ভগবান-দেবতা-উপ ও অপদেবতা প্রভৃতি অরি-মিত্র শক্তির উপর আস্থা-ভয়-ভক্তি-ভরসা-নির্ভরতা দৃঢ়প্রত্যয়ে গ্রহণ-বরণ করে তুক-তাক, ঝাড়-ফুঁক, বাণ-উচ্চাটন, যন্ত্র-মাদুলী, তাবিজ-কবজ, মন্ত্রপূত ধূলি-তেল-পানি-সূতাপড়া কিংবা পাথুরে-ধাতব আঙটি নির্ভর হয়ে উঠেছে। দিন-ক্ষণ-তিথি-নক্ষত্র ও মনুষ্যজীবন নিয়ন্ত্রক রাশিচক্র তাই যুক্তিবিরহী অজ্ঞ মানুষের জীবনজীবিকা নিয়ন্তারূপে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে দ্রুত। গণক-নজুম-জ্যোতিষ নতুনভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, রোগীদের চিকিৎসকের মতোই।

এ সঙ্গে লেখাপড়া জানা কিন্তু জ্ঞানে-প্রজ্ঞায়-যুক্তিবাদে স্বশিক্ষিত নয়, এমন লোকে তাদের আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাষ্ট্রিক জীবনের স্থবিরতা, অবক্ষয় অনুন্নতির কারণ খুঁজে বেড়াচ্ছে বিপথে। তাদের কেউ কল্যাণ খুঁজে পাচ্ছে বিপথে। তাদের কেউ কল্যাণ খুঁজে পাচ্ছে অতীতমুখিতায়, রক্ষণশীলতায়, বিজ্ঞানবিমুখতায়, যুক্তিবাদ পরিহারে, অতীতে, ঐতিহ্যে ও বিশ্বাস-সংস্কারের পরম্পরায়।

কেউ স্বস্তি খুঁজছে বিজাতি-বিধর্মী-বিদেশী-বিবর্ণ-বিভাষী বিদ্বেষে ও বিতাড়নে, কেউ আশ্রিত হচ্ছে ধর্মভাবে ও ধর্মাচারে, কেউ বা উৎসাহ পাচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াতে ও নিজেদের দুর্ভোগ ভুলে থাকতে, কেউ বা ক্ষোভ-জ্বালা-ক্রোধ উপশমের উপায় সন্ধান করছে বাঁচার গরজে আত্মরতিবশে বেপরোয়া কাড়ায় মারায় ও হানায়। এভাবে মানুষ নীতি-নিয়মের বাঁধনমুক্ত হচ্ছে, অথচ যৌথ জীবনে প্রয়োজনীয় কোনো নতুন নীতি-নিয়মের অঙ্গীকারও নেই। মানুষ হচ্ছে অধিক পরিমাণে প্রবৃত্তিচালিত, ফলে মানুষ দ্রুত মানবিকগুণ হারাচ্ছে, মানবতা ক্রমে দুর্লভ ও দুর্লক্ষ্য হয়ে উঠছে, মানুষ নামের গৌরব-গর্ব করবার যেন কিছু থাকছে না। মানুষ অবশ্য বিজ্ঞানী-কৌশলী-প্রকৌশলী-প্রযুক্তিবিদরূপে, মননশীল মনীষীরূপে আরো অভাবিত অনেক উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভ করবে, আত্মপ্রকাশ করবে বহু, বিবিধ ও বিচিত্রভাবে। কিন্তু মানবিকতা, মনুষ্যত্ব, মানবতা প্রভৃতি আমরা এতোকাল যে আকাশচুম্বী তাৎপর্যে উচ্চারণ করেছি, আজও করছি, তা কি বজায় থাকবে, অনুভব-উপলব্ধির সূক্ষ্মতায় মাধুর্যে উদারতায়, ক্ষমায়, ভালোবাসায়, কৃপায়, করুণায় ব্যক্তি সত্তার মূল্য ও মর্যাদা দানে মানব চৈতন্য বাঞ্ছিত ও প্রত্যাশিত মাত্রা পাবে কি এ অবস্থায় ও অবস্থানে?

আপাতত বিশ্বময় জীবনযাত্রায় আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন, বেকারত্বের অসহ্য যন্ত্রণার দরুন, অর্থ-সম্পদের স্থিতি সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার আতঙ্কের দরুন জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে নীতি-নিয়মহীন অসম প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সঙ্কুল অবস্থা বিরাজ করছে। তাতে সবার জীবনে-জীবিকায় নেমে এসেছে অবিমোচ্য অনিশ্চয়তা অনিশ্চিন্ততা, তারপর পৃথিবীব্যাপী শাহ-সামন্তযুগের অবসানে এখন বলতে গেলে শ্রেণী স্থূল মাপে মাত্রায় দুটো-মালিক ও বিভিন্ন স্তরের শ্রমজীবী। সে-মালিকও হয় ব্যক্তি অথবা সরকার। এখন আর চাষী-ক্ষেতমজুর, কৃষক-বেণে, কারখানা মালিক-শ্রমিক কিংবা কায়িক শ্রমজীবী ও মস্তিষ্ক শ্রমজীবীরূপে জীবিকা ক্ষেত্রে শ্রেণীভেদ করা নিরর্থক ও নিষ্ফল। এখন কেবল কাজ দেনেওয়ালা ও কাজ করনেওয়ালাই আছে, আর কেউ নেই, কিছু নেই। এ-ই একমাত্র তত্ত্ব, তথ্য ও এ তাৎপর্যে কাজে নিয়োগকর্তা আর কাজে নিযুক্ত কর্মজীবীই রয়েছে। দৈহিক শ্রমজীবী আর মগজীশ্রমজীবী–উভয়ই স্বরূপে কর্মজীবী মাত্র। এখন তাই কৃষক সঙ্ঘ, শ্রমিক ইউনিয়ন, কর্মজীবী সমিতি নামে আলাদা সঙ্ঘ-সমিতি-সংস্থা-প্রতিষ্ঠানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এখন দরদাম চুক্তি চলবে মালিক-কর্মজীবীর মধ্যে। মনে রাখতে হবে আজ মানুষের প্রাকৃতিক প্রতিবেশও প্রতিকূল, সামাজিক প্রতিবেশ বিকৃত। দুটোই বিপন্ন। যুক্তিমান প্রজ্ঞা ও বিবেকবান জ্ঞানী-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সে-বিপদ আসন্ন ও আপন্ন। বাঁচার-বাঁচানোর গরজেই আজ সতর্ক-সযত্ন প্রয়াসে ও বিবেচনায় তা এড়াতে হবেই।

নতুন অঙ্গীকার চাই

পারিবারিক জীবনে যেমন অর্থে-সম্পদে, গুণে-মানে-মর্যাদায়, খ্যাতিতে-ক্ষমতায়, প্রভাবে-প্রতিপত্তিতে দর্পে-দাপটে উঠতি-বৃদ্ধি-পড়তি ও বিনাশ-বিলয় আছে, রাজবংশের যেমন উঠতি-পড়তি বিলয় আছে, তেমনি একটা দেশের, সম্প্রদায়ের ও জাতিরও উত্থান-বিদ্যায়-বিত্তে উদ্ভাবনে-আবিষ্কারে সৃষ্টিতে-আত্মবিস্তারে খ্যাতি-ক্ষমতা-গৌরব-গর্ব যেমন থাকে কিছু কাল, আবার বন্ধ্যাত্ব, অবক্ষয়, পতনও ঘটে। সমকালের মানুষ এর সব কারণ ও লক্ষণ অনুমান-অনুভব-উপলব্ধি করতে পারে না। প্রমাণে-অনুমানে-কল্পনায়-তত্ত্বে-তথ্যে জোড়াতালি দিয়ে ইতিহাস লেখকরা, গবেষকরা একটা কারণ-কার্য প্রায় বিশ্বাস্য এবং গ্রহণযোগ্য করে তৈরি করেন বটে, তবে প্রায়ই সর্বজন সমর্থিত ও সর্বসম্মত হয় না, যখন যে-বিষয়ে সর্বসম্মত একটা সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা মেলে, তখনো মাপে-মানে-মাত্রায় পার্থক্য থেকেই যায়। এজন্যেই ইতিহাস ঘন ঘন বার বার লিখতে হয়, নতুন দৃষ্টিতে নতুন প্রাপ্ত তথ্যের ও সত্যের সংযোগে নতুন উপলব্ধ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ইতিহাসের কোনো কোনো ঘটনা নতুন তাৎপর্য লাভ করে। আবার স্বদেশীর, স্বধর্মীর, স্বভাষীর, স্বজাতির ইতিহাস লেখকদের মধ্যেও বিদ্যা, মেধা, মন-মনন-মনীষা, মানবতা, উদারতা, ন্যায্যতা, নিরপেক্ষতা, সম্বিৎসাগত তারতম্যের কারণে তথ্যের ও ঘটনার বয়ানে, মনে, মতে, মন্তব্যে, সিদ্ধান্তে ও মীমাংসায় পার্থক্য ঘটে, গুণ-মান-মাত্রাগত উৎকর্ষ-অপকর্ষও ঘটে।

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে ইতিহাস সম্পৃক্ত নয়, কেবল একটি তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য জানার, বোঝার ও মানার জন্যেই কথাগুলো বললাম। আমাদের আজকের বাংলাদেশেও প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধী প্রগতিবাদী, মার্কসবাদ সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত শহুরে শিক্ষিত সৃষ্টিশীল কলাকাররা, বুদ্ধিজীবী নামে পরিচিত স্বাধীন বৃত্তির উকিল-ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-সাংবাদিক-শিক্ষক-গবেষক, আর বিদ্বান নামে খ্যাত বিভিন্ন বিদ্যার বিশেষজ্ঞরা সবাই যেন, কোনো অদৃশ্য অলৌকিক-অলীক-লৌকিক আসন্ন-আপন্ন বিপদাশঙ্কায় ভীত, হয়তো কেউ কেউ ত্রস্তও। মোটামুটিভাবে ১৯৫৮ সন থেকে ১৯৯০ সন অবধি উদারতা, মানবতা, যুক্তিবাদিতা, উপযোগ ও কল্যাণবোধ প্রভৃতির মাপে গ্রহণশীলতা, নির্ভীকতা, নতুন চিন্তা-চেতনা প্রকাশে ও মুদ্রণে ও উচ্চারণে নিঃসঙ্কোচতা ছিল, তারপর বিএনপি ক্ষমতার গদীতে বসার জন্যে যেদিন থেকে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে আঁতাত করেছে, সেদিন থেকেই যেন মুখ খুলতে, লিখতে, মুদ্রিত করতে, উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করতে ভয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাচ্ছে। আজ সরকার হয়তো মার্কিন-সৌদি পরামর্শে শাসনে-প্রশাসনে-মেঠো বক্তৃতায়, কাগুজে বিবৃতিতে, কর্মসূচীর বিজ্ঞপ্তিতে এবং সরকারের পার্বণিক আচরণে মৌলবাদীর মতোই যেন আচরণ করছে। বিদেশের ও বিদেশীর অনুকরণে অনুসরণে ও অর্থে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নামে মুক্ত প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপনে, বেসরকারী ক্লিনিকের মতো বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায়, সকাল সাতটা থেকে দেড়টা অবধি সকলের সর্বপ্রকার কাজের সময়ে সিএনএন চালানোর ডিস অ্যানটেনা বসানোর পরেও চট্টগ্রামে রাজশাহীতে ব্যয়বহুল অপ্রয়োজনীয় টিভি কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি কি জনহিতকর কাজ?

অতএব, আমরা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মালিক, নাগরিক, বাসিন্দা, শাসক-প্রশাসক, আর্থ-বাণিজ্যিক বিষয়ের নিয়ন্ত্রক-নিয়ামক হওয়া সত্ত্বেও মনে হয় আমাদের উঠতির, বৃদ্ধির, উৎকর্ষের, উন্নতির, আত্মবিশ্বাসের, আত্মবিকাশের, আত্মবিস্তারের কোনো কারণ, লক্ষণ, আগ্রহ, সচেতন সতর্ক প্রয়াস-প্রযত্ন কিংবা স্থূল দৃষ্টিতে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি যোগে ব্যাহত, দৃশ্যত জানা-বোঝা-দেখা-শোনা যাচ্ছে না। উৎপাদিত কিংবা নির্মিত পণ্য দেশে, বিদেশে কোথাও বাজার দখল করতে পারছে না। কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। স্বয়ং আদমজী জুটমিল বলতে গেলে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ও অনিমিতিতে অচল। বেকারের সংখ্যা এখন প্রায় দুকোটি সাক্ষর অনক্ষর আনাড়ি কুশল সব মিলে। স্বাধীনতা অর্জনের একুশ বছরের মধ্যেই আমাদের আর্থ-বাণিজ্যিক পড়তি ঘাটতি জনগণমনে শঙ্কা-ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। তাই অর্থবিত্তবান শিক্ষিত শহুরেরা অর্থ সম্পদ ও পরিবার বিদেশে পাঠাতে উৎসুক আর এক শ্রেণীর লোকও জান-মাল-গর্দানের অনিশ্চিতির অমূলক কিবা সমূলক অনুমানে আশঙ্কায় অর্থসম্পদ দেশান্তরে সঞ্চিত রাখতে আগ্রহী আর যারা বাকি থাকে তারা তো নিঃস্ব নিরন্ন অজ্ঞ ভিখিরী কুলি মজুর কিংবা ভূমিহীন বর্গাচাষী অথবা স্বনির্ভর গ্রামবাসী। ওরাতো নিয়তিবাদী, ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক। ওরা তো প্রজন্মক্রমে জানেই বাঁচা অনিশ্চিত, শোষণ-পীড়নে-পেষণে-দলনে-বঞ্চনায় অভ্যস্ত এসব গণমানব মৃত্যুকেই নিশ্চিত পরিণাম বলে জানে। মুক্তি লভ্য বলে বোঝে না, কাজেই তাদের তো 'সাগরে শয়ান, অতএব শিশিরে কি ভয় আর!' এ অবস্থায় ঝড়-ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-মারী-মৃত্যু-আকাল কবলিত একটা রাষ্ট্র কিভাবে টিকবে! নতুন চিন্তা-চেতনা, উদ্যম-উদ্যোগ, আকাঙ্ক্ষা, জিজ্ঞাসা না জাগলে আবিষ্কার উদ্ভাবন না থাকলে হাজার হাজার বছরেও আবর্তিত জীবনে পরিবর্তন-উন্নতি-উৎকর্ষ ঘটে না। প্রমাণ আরণ্যমানব কিংবা উপজাতি। মানুষের ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কিংবা জাতিক জীবনের ট্রাজেডি হচ্ছে মানুষ যথাপ্রয়োজনে যথাকালে যথাস্থানে যথাকর্মটি কিংবা যথাচিন্তাটি অথবা যথাব্যবস্থাটি করার জন্যে সচেতনভাবে সতর্কতার সঙ্গে সযত্ন প্রয়াস ক্বচিৎ কখনো করে মাত্র। বিপদ-বিনাশ আসে জীবনে এভাবেই। ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি না করার অনুশোচনা আসে অতিক্রান্ত কালে। ইতিহাসে ঘটনার বয়ান কালে এসব ভুলের, ভুলপথ গ্রহণের, ভুল সিদ্ধান্ত নেয়ার কিংবা কোনো বিষয়ে ঔদাসীন্যের, নিষ্ক্রিয়তার গুরুত্বচেতনার অভাবের ইতিবৃত্তান্তই মেলে। এর থেকেই নিতে হিয় শিক্ষা। ইতিহাস পাঠ করা প্রয়োজন জ্ঞান ও শিক্ষা নেয়ার জন্যে, আস্ফালন-গৌরব-গর্ব করার জন্যে নয়। কেন না অতীতের সাফল্য, বর্তমানের দৈন্য, অগৌরব, সমস্যা, সঙ্কট, বিপদ ঘোচায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল সদাসচেতনতার, সতর্কতার, সযত্নপ্রয়াসের প্রেরণা, প্রণোদনা ও প্রবর্তনা দেয় মাত্র।

জনগণের স্বার্থে, নিজেদের সন্তানের স্বার্থে আশা আশ্বাস নিয়ে মানুষের মতো একালের বিশ্বে আন্তর্জাতিক সমাজে মাথা উঁচু করে অর্থে সম্পদে, শিল্পে সাহিত্যে, আবিষ্কারে উদ্ভাবনে, কৌশলে প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে, উৎপাদিত ও নির্মিত পণ্যের বাজারে সাধ্যমতো স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকার প্রয়াসে প্রযত্নে যোগ্যতার সঙ্গে দক্ষতার সঙ্গে-জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-অধ্যবসায় নিয়ে লেগে থাকার অঙ্গীকারে উদ্যমে উদ্যোগে আয়োজনে নিষ্ঠ থাকা আমাদের সব শ্রেণীর ও পেশার লোকের পক্ষে আবশ্যিক ও জরুরী হয়ে পড়েছে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আমরা আমাদের জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে আজও অপূর্ণ, অদক্ষ, দরিদ্র, অজ্ঞ। উদ্যম উদ্যোগক্ষেত্রেও উদাসীন আমরা। আমাদের ঋণে-দানে-অনুদানে-ত্রাণে বাঁচতে হয়। আমরা বিপন্ন এবং পর কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্যজীবী। অপরের হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলা মুক্তও নই আমরা। আমাদের আত্মসম্মানবোধ, উচ্চাশা ও কর্মদক্ষতা নিয়ে জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে নিজেরা বাঁচার জন্যে, দেশকে, মানুষকে এবং রাষ্ট্রকে উন্নত করার জন্যে। অতএব সুনির্দিষ্ট আদর্শে, উদ্দেশ্যে, লক্ষ্যে, জীবন-সংগ্রামের নতুন অঙ্গীকার আবশ্যিক ও জরুরী আমাদের জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে।

AMARBOI.COM

যন্ত্রযুগের সঙ্কট ও সমাধান পন্থা

গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে সর্বত্র ষাট-সত্তরোর্ধ্ব বয়স্ক লোকদের প্রায়ই আফসোস করে বলতে শোনা যায় যে একালে মানুষের মধ্যে আগের কালের মানুষের মতো আত্মীয়তাবোধ, হৃদ্যতা, সৌজন্য, প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ নেই। একালে মানুষ কেমন যেন স্বার্থপর ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আজকাল প্রতিটি মানুষ যেন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। তাই এখনো কুটুম্বিতা আছে, আত্মীয়তা নেই, লোকাচার আছে, লৌকিকতা নেই, তরল সৌজন্য আছে, গাঢ় সহানুভূতি নেই, বিরুদ্ধশক্তির প্রবলতার মুখে আপাত সংযত আছে, মানবিকতা হ্রাস পাচ্ছে, মানুষ আছে, কিন্তু মনুষ্যত্ব দুর্লভ হয়ে উঠছে। মানুষের মনোজগতে ভূতপ্রেত পিশাচ প্রভৃতি অদৃশ্য শক্তির প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ কমেছে বটে, তবে মানবে বাঞ্ছিত মনন-মনীষা প্রসূত জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনাজাত ন্যায়ন্যায্যতাবোধ, সম ও সহস্বার্তে, সংযম, সহিষ্ণুতা, সৌজন্য, সামবায়িক চেতনা, সহযোগিতার সহাবস্থানের আগ্রহ যেন ক্রমেই কমে যাচ্ছে। সংস্কৃতি-সভ্যতার বিকাশে মানবচরিত্রে স্থান-কাল-পাত্রগত যে-হায়া-শরম-সংকোচ-সৌজন্য, সামাজিকতা-লৌকিকতা ছিল, তা ক্রমেই ব্যক্তির ব্যবহারে আচারে আচরণে যেন দুর্লভ হয়ে উঠেছে। এখন দৃশ্যত লাভে লোভে স্বার্থে ব্যক্তিমাত্রই যেন বেপরোয়া ও ব্যাপকভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেদরদ, বেচশম, বেহায়া, বেশরম, বেলেহাজ, বেআদব, বেআক্কেল, বেল্লিক হয়ে উঠেছে। মানুষ সনাতন, পুরোনো ও শাস্ত্রিক মূল্যবোধ হারাচ্ছে, কিন্তু নতুন প্রত্যয়ে স্থিত হচ্ছে না। ফলে বিজ্ঞানের তত্ত্ব-তথ্য-সত্য চেতনায় ও প্রকৌশল-প্রযুক্তি শক্তিতে ঋদ্ধ এ কালের এ যন্ত্রযুগের ও যন্ত্রজগতের সংহত ছোট পৃথিবীতে জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্লিষ্ট-শঙ্কিত-অনিশ্চিতির ও অনিশ্চিন্তির শিকার হয়ে মানুষ 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' কিংবা 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' তত্ত্বে আস্থা রেখে একেই বাঁচার ও প্রিয়জনদের বাঁচানোর একমাত্র উপায় জেনে ও মেনে মানবিকগুণের অনুশীলন পরিহার করে প্রাণীর বৃত্তিপ্রবৃত্তি চালিত হয়ে আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রসারের সংগ্রামে, প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে। এ সংগ্রামে মহৎ ও বৃহৎ আদর্শ কার্যকারিতা হারিয়েছে, এমন জীবনসংগ্রামে বাঁচার লড়াইয়ে ঘৃণা লজ্জা ভয় ভক্তি বিবেক থাকলে চলে না। এখানে কেজোনীতি হচ্ছে 'মরি অরি পারি যে কৌশলে'। এখানে ধূর্ততায়, পেশীশক্তিতে, অস্ত্রবলে কিংবা অর্থসম্পদে যে শক্তিমান, জয় ও সাফল্য তারই। এ কালে প্রতিযোগিতায়-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকতে হলে মানুষকে কেবল মর্ত্যচেতনায় নিবদ্ধ ও নিয়োজিত করতে হয় দেহ-প্রাণ-মন-মনন। জীবন মানেই ইহজাগতিকতা। এতেই জীবনের শুরু এতেই জীবনের অবসান। প্রকৃতিবাদী, বস্তুবাদী মর্ত্যজীবনবাদী এ মানুষকে সমস্বার্থে, সংযমে, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও বৈশ্বিক জীবনে নির্বিরোধ, নির্বিবাদ, নির্বিঘ্ন, নিরুপদ্রব, নিরাপদ, সামবায়িক সহযোগিতায় সহিষ্ণুতায় সৌজন্যে সহাবস্থানে সম্মত করার জন্যে সেকেলে আধ্যাতিকতায় একালে ফলপ্রসূ হবে না।

নীতিকথা শোনার ও শোনানোর কালও অপগত। একালে যুক্তি-ন্যায্যতা সিদ্ধ নতুন প্রত্যয় ব্যক্তিক সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আন্তর্জাতিক আচারে ব্যবহারে নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি রূপে স্বীকৃত ও চালু করতে না পারলে আজকের এ বাঞ্ছিত নৈতিক সামাজিক রাষ্ট্রিক, আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব-মিলন ক্ষেত্রে রৌচিক-সাংস্কৃতিক বিকৃতি বিপর্যয় ও অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব হবে না। কারণ অন্নাভাব অর্থাভাব, বিদ্যাভাব কর্মাভাব ও জীবন-জীবিকার সামগ্রিক অনিশ্চয়তা মানুষকে প্রাণী পর্যায়ে নামিয়ে আনবেই, আগে যেমন মরু অঞ্চলের কিংবা যাযাবর মানুষকে বাঁচার গরজেই রক্তাক্ত বা প্রাণহরা প্রাণের ঝুঁকিপূর্ণ দস্যুবৃত্তিকেই জীবিকা রূপে গ্রহণ করতেই হত। দেবরাজ ইন্দ্রদেরও হতে হয়েছিল পুরন্দর দস্যু। শাহ-সমান্ততন্ত্র তো রূপে স্বরূপে দস্যুতন্ত্রই। কাড়া-মারা-হানাই ছিল আবশ্যিক নীতি ও নিয়ম। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবন প্রসূন যন্ত্র ও প্রযুক্তি মানুষকে আজ জলে স্থলে আকাশে যাতায়াতের সুযোগ সুবিধে দিয়েছে। হাজার লক্ষ শ্রমিকের কাজ কলের একটা সুইচ টিপলেই স্বল্প সময়ে হয়ে যায়। একটি রোবট একটা শ্রমিকের চেয়ে বেশি কাজ করে, একটা কম্প্যুটার হাজার শ্রমিকের ভাত মারে, অথচ জনসংখ্যা নানা ভাবে কেবল লঘু গুরুভাবে বাড়ছেই। কাজেই অনুর্বর অরণ্য পর্বত সমতলের অজ্ঞ অসহায় মানুষের আদিম অন্নাভাব ও জীবিকা-সমস্যা একালের প্রযুক্তি প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত প্রগতিশীল প্রাগ্রসর মন মত মনন মনীষার প্রসাদপুষ্ট সংস্কৃতিমান সমাজকেও বর্বরতায় নিষ্ঠুরতায় স্বার্থ ও আত্মরতিপরায়ণতায় আচ্ছন্ন করবে। একালে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক আনুগত্যে এবং সরকারী, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক নীতিনিয়ম মানার অঙ্গীকারেই রয়েছে এর সমাধান এবং শাস্ত্রানুগত্যে অবশ্যই নয়। কেননা পুরোনো শাস্ত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন কালের নতুন পরিবেশে নতুন মানুষের চাহিদা মেটাতে পাবেই না, আগেও কখনো পারেনি। এ-ও মনে রাখতে হবে যে প্রাণী প্রজাতি হিসেবে লুব্ধ ও ক্রুদ্ধ ব্যক্তি, সরকার ও রাষ্ট্র হিংস্রতায় প্রতিহিংসাপরায়ণতায় আজও আদি ও আদিম প্রায় আরণ্য প্রাণী ও শ্বাপদ। প্রমাণ হিরোশিমায় নাগাসাকিতে, মাইলাই ইরাকে মার্কিন হত্যাকাণ্ড। কাজেই রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক আইনের সুষ্ঠু ও অমোঘ প্রয়োগেই কেবল মানুষকে বাঞ্ছিত ও আবশ্যিক মাত্রায় সংযত সহিষ্ণু ও আইনানুগত সুজন রাখতে পারে। উল্লেখ্য যে, কালের ছকে ও চাকায় বাঁধা জীবনচেতনা ও জীবনাচার কালান্তরে পরিবর্তিত পরিবেশে প্রতিবেশে বদলাতেই হয়, বদলে যায়ই। স্থান কালের প্রয়োজনে সাড়া দিতেই হয়। জীবনকে স্থানের কালের দাবি অনুগ করে তৈরি করতে ও চালাতে হয়। কারণ আর্তব্য আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত ঔষধির মতো মানুষের ব্যক্তিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক আর মন-মনন-মনীষার সাংস্কৃতিক জীবনও অবক্ষয়ের, সুপ্তির, লুপ্তির শিকার হয় কিংবা বৃদ্ধির, বিকাশের, উন্নতির ও উৎকর্ষের পথ পেয়ে যায়। জীবনের যথাপ্রয়োজনে, যথাকালে যথাস্থানে যথাদায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উদ্যোগ আয়োজন করেই। জীবনের বাঁকে বাঁকে উদ্ভূত সমস্যা-সংকট-চাহিদা মিটিয়ে কালানুগ জীবন যাপনই কল্যাণপ্রসূ।

AMARBOI.COM

বিপদ আসন্ন : প্রতিরোধ চাই

ব্রিটিশ শাসিত শহরে রবীন্দ্রনাথ এঁদো গলিতে নিম্নবিত্তের মানুষের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে স্থিতি দেখেছিলেন : গলিটার কোণে কোণে/জমে ওঠে পচে ওঠে

আমের খোসা ও আঁটি, কাঁঠালের ভূতি, মাছের কানকা
মরা বিড়ালের ছানা/ছাইপাঁশ আরো কত কী যে,

এতেই বাসিন্দার 'দিনরাত মনে হয় কোন আধমরা জগতের সঙ্গে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি।' রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনরাষ্ট্রে স্বদেশী স্বজাতির শাসনামলে নালা-নর্দমার ধারে লক্ষ লক্ষ খুপরি-ঝুপড়িবাসী দেখেননি। দেখেননি কি ভয়ানক মারাত্মক বীভৎস পরিবেশে আজকের দরিদ্র মানুষ বাস করছে শহরে বন্দরে শহরতলীতে। তিনি এ-ও জানতে পারেননি যে 'চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি/ সকালে কলতলায়/ক্লান্ত গণিকরা কোলাহল করে।' এখানে লোকে সারাদিন অন্যের পা মাড়িয়ে জামা ছিঁড়ে ভীড়ের মধ্যে বাসে ওঠে। এখানে দিনের শহর মিস্তি-মজুরে টোকাই-ভিক্ষুকে গণকে বেকারে গুণ্ডা-মাস্তান রাহাজানে আকীর্ণ ঘাট-বাট-বাজার। এখানে আজও সবার কাছে হাত কচলে মেয়ের বিয়ের দাবি মেটাতে ধার-দেনা করে ফতুর হয় পিতা, আবার ছেলের চাকরির জন্যে ঘুষও জোগাড় করতে হয় অবনমিত কণ্ঠে ও অপমানিত হাতে। এখানে 'বাঁচার প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে করতে' একদিন ব্যক্তিটিই মারা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশের মানুষ অধিক সংখ্যায় শিক্ষিত হল, হচ্ছে। দেশ স্বাধীন হল, পেল তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারও। কিন্তু জনগণ হচ্ছে দিশেহারা ও দরিদ্রতর। কেবল রাজনীতিকরা, সাংসদরা, মন্ত্রীরা, আমলারা, আর বেণে-বেপারীরা হচ্ছে দেহে-প্রাণে-মনে শক্তিতে-সাহসে আর অর্থে বিত্তে স্ফীততর। ওদের দেহের গৌরবর্ণ হয় উচ্ছলতর আর কালোরঙ হয় চিক্কণ চকচকে। ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগের বাজারে ওদের অহমিকা স্পর্ধায় ঔদ্ধত্যে অবজ্ঞায় ঔদাসীন্যে স্থূলভাবে অভিব্যক্তি পায়। রাজনীতিকরা, সাংসদরা, মন্ত্রীরা, আমলারা, উকিল-ডাক্তার-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীরা কাগুজে বিবৃতিতে, মেঠো বক্তৃতায় গণমিছিলে গণজীবনের যন্ত্রণায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা পরিব্যক্ত করেন। তাদের মনে অভাব ও দুর্দশামুক্তির আশা ও আশ্বাস জাগান, কিন্তু কিছুতেই ওদের ভাগ্য ফেরে না, বরং ইংরেজ আমল থেকে পাকিস্তান আমল এবং পাকিস্তান আমল থেকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে কেবল মন্দতর হয়েছে জনগণের আর্থিক জীবন। জীবিকাক্ষেত্র হয়েছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা বহুল। ন্যায়-নীতি-বিবেক-বিবেচনা হয়েছে বিলুপ্ত। মানুষ অনিশ্চিত জীবনে হয়েছে স্বার্থপর আত্মরতিপ্রবণ দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও অর্থসম্পদ প্রাপ্তির ও রক্ষার অনিশ্চিতি মানুষকে করেছে বেপরোয়া। তাই আজ জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্র হয়েছে দুর্নীতিদুষ্ট। কাড়া-মারা-হানার শক্তি-সাহসই এখন বাঁচার পুঁজি-পাথেয় রূপে স্বীকৃত ও গৃহীত।

প্রতি বছর সরকার বার্ষিক উন্নয়ন খাতেও ঋণের বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করছে কিন্তু আমরা আমাদের উন্নতি দেখিও না, অনুভবও করি না। সরকার সর্বক্ষণ আমাদের সেবায় ও কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত। কিন্তু আমরা নিজেদের কোনো কল্যাণের সন্ধানও পাই না, সেবা পাওয়ার সুখ ও আনন্দও অনুভবে-উপলব্ধি করি না। থানা-পুলিশ দেখি নিষ্ক্রিয়, আদালতের বিচারে সাক্ষী-সাক্ষ্য মেলে না, দেশে যে সরকার-শাসন-প্রশাসন আছে, তা কার্যত দেখা যায় না। বাহ্যত বোঝাও যায় না। এর মধ্যেই সরকার ও আমরা অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সরকার ও গণতান্ত্রিক জনগণ জাঙ্গলিক ও গড্ডালিকা জীবনে বিশেষভাবে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি, তাই দেশের সর্বত্র এখন ছিনতাই, রাহাজানি, লুট, ডাকাতি দিবালোকে জনবহুল শহুরে রাস্তায় অবাধে নরহত্যা, ভেজাল, ঘুষ, কমিশন, দালালি, পাওন, নজর, বখশিশ, উপহার, উপঢৌকন, তোয়াজ তোষামোদ, স্তবস্তুতি, পদলেহন, চাটুকথন প্রভৃতি আত্মসম্মান রিক্ততার, চরিত্রভ্রষ্টতার, মানবিকগুণের স্বল্পতার, মানবিকতার অবক্ষয়ের সাক্ষ্য প্রমাণ রূপে দ্রুত প্রসারমান। তাই নেকমায়েশলোক দুর্লভ হয়ে উঠেছে, বদমায়েশে সমাজ আকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

জনগণের অভিভাবক এখন সরকার কি সাম্রাজ্যবাদী মহাজনদের অ্যাজেন্ট মুৎসুদ্দী প্রতিম প্রতীক প্রতিভূ এন-জি-ও সংস্থাগুলো তা যাচাই করার যুক্তি-বুদ্ধিও নেই আমাদের আমাদের ঋণ-দান-অনুদান-ত্রাণ দাতা মুরুব্বী বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল আর ধনী মহাজনরাষ্ট্রগুলো নাকি আমাদের বার্ষিক বাজেটও তৈরি করে দেয়। আমাদের পঞ্চবার্ষিক যোজনাও নাকি তৈরি হয় তাদেরই নির্দেশে নিয়ন্ত্রণে বা পরামর্শে। আমাদের দেশীগানের কলি মনে পড়ে যায় 'আমার আপন দেহ আপনার হয় না।' কিংবা 'আমার ঘরের ছবি পরের হাতে।' আমাদের সরকারের ও রাষ্ট্রের আজ অবস্থা এ-ই। তাই আমাদের জাতীয় বিশিষ্ট অনন্য কৃষিসম্পদ পাট চাষ পাটকল ও পাটপণ্য বিলুপ্তির সংকেত শোনা যাচ্ছে। নির্দেশনা এসেছে নাকি মহাজন মনিবদের থেকে। আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমদানী শুল্ক কমেছে। আমদানী পণ্য বাড়ছে, রফতানী কমছে, কমবে, কেননা চালু মিল ফ্যাক্টরী কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ও গেছে। সে-সংখ্যায় নতুন কল-কারখানা হচ্ছে না। বেকারের সংখ্যা দুকোটির মতো, তার মধ্যে শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত নিঃস্ব ও প্রায় হাভাতে বেকারের সংখ্যাও লক্ষাধিক। এরাই রাজনীতিক দল-পোষ্য যুবশক্তি, যারা মাস্তান গুণ্ডা খুনী রূপে গাঁয়ে গঞ্জে শহরে বন্দরে পাড়ায় মহল্লায় এখন ক্ষমতায় শক্তিতে সাহসে দর্পে দাপটে নরত্রাস নরদানব। বেকারসমস্যা সরকারকে বিচলিত করে না। পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থার শৈথিল্যে ও অকার্যকারিতায় বা নিষ্ফলতায় সরকার উদ্বিগ্ন নয়। মৌলবাদে আমাদের অনুরাগ নেই। কেননা এ মৌলবাদ আমাদের সম্মুখদৃষ্টি আচ্ছন্ন করবে, আমাদের অতীতমুখী করবে। আমাদের জীবনে সমকালীন চিন্তা-চেতনা-মনন-মনীষা বিলুপ্ত হবে। আমরা সমকালীন পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক মানের জীবনের চিন্তা-চেতনা-মনন-মনীষাঋদ্ধ হয়েই আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নির্ভর সচ্ছল জীবন যাপন করতে চাই। আমরা জানি আমরা এ মুহূর্তে বিপন্ন। তবু আমরা এ-ও জানি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ বা নিরাশ হতে নেই। যথাপ্রয়োজনে যথাসময়ে যথাস্থানে ও যথাপাত্রে মোকাবেলা করতে জানলে ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর বা জাতির বিলুপ্তি ঘটে না। বিপর্যয়ের পরেও পুনরুজ্জীবন ঘটে। কেননা কবির ভাষায় 'তবু জানি কালের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী/যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে।' বিপদ আসন্ন, অতএব, প্রতিরোধ চাই।

AMARBOI.COM

আজকের আমরা

আজকের বাংলাদেশে সমস্যা ও সঙ্কট অনেক এবং বহুবিধ। দারিদ্র্য ও অশিক্ষাই এ সব সমস্যা-সঙ্কটের উৎস। আর সমস্যা-সঙ্কটমাত্রই আর্থিক সামাজিক রাষ্ট্রিক জীবনে জটাজটিল প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মানুষের ব্যক্তিক সামাজিক সাংস্কৃতিক আর্থিক রাষ্ট্রিক জীবনাচারে সবকিছুই একের সঙ্গে অপরটি সম্পৃক্ত, কোনোটাই বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র নয়। কেননা বাইরের জাগতিক সব ঘটনা এবং কর্ম-আচরণই মানুষের মনে লাগে, মর্মে লাগে, লাগে মগজেও। কাজেই দারিদ্র্য, নিঃস্বতা, নিরন্নতা, জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে নিরাপত্তার নিশ্চয়তার অভাব মানুষকে স্বভাবে সুস্থিত থাকতে দেয় না। কথায় বলে 'অভাবে স্বভাব নষ্ট।'

আজ দেশে শতে পঁচানব্বইজন জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তায় ভোগেই আর্থিকভাবে, কেউ অভাব-অনটনের প্রান্ত সীমায়, কেউ তার নীচে, কেউ একেবারেই নিঃস্ব দিনমজুর, কেউ নিরন্ন এবং ভিক্ষাজীবী, এরা অজ্ঞ, অনরক্ষর এবং অসহায়, এ কারণেই এদের কাছে অন্নচিন্তাই মুখ্য এবং জাগ্রত মুহূর্তে এরা অন্ন জোগাড়েই থাকে নিরত। তাদের জাগ্রত জীবনে দেশ-মানুষ-সমাজ-রাষ্ট্র-আত্মীয়চেতনা ঠাঁই-ই পায় না। অর্থাভাব অন্নাভাবজাত দুশ্চিন্তাগ্রস্ততার দরুন। এ-মানুষে তাই মনুষ্যে প্রত্যাশিত চিন্তা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্ম-আচরণ দেখা যায় না। এরা আত্মরক্ষণে সদাসচেষ্ট বলেই এরা স্বার্থপর, আত্মরতিই এদের পুঁজি-পাথেয়। প্রাপ্তিপ্রয়োজনজাত প্রাপ্তি-লোভ এদের বেশি। তাই এদের মধ্যে সংযম নেই। এরা দায়ে ঠেকেই প্রাণে বাঁচার গরজেই দৈহিক শক্তি-সাহস থাকলে হয় চৌর্যপ্রবণ, শক্তি-সাহস না থাকলে হয় ভিক্ষাপ্রবণ এবং মিথ্যাচারই হয় প্রথম ও প্রধান পুঁজি ও পাথেয়। কাজেই সংযম, আদর্শনিষ্ঠা তথা চরিত্র রক্ষা করে জীবন যাপন করা এদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয় না।

যে-সহিষ্ণুতা সংযম শেখায়, সে-সহিষ্ণুতাও তাই এদের মধ্যে দুর্লভ। এদের রয়েছে অসহায়তাজাত, দুর্বলতাজাত, অসামর্থ্যজাত সহিষ্ণুতা। শক্তি-সাহস-বুদ্ধি প্রয়োগে সাফল্য সম্ভব জানলেই এরা অসহিষ্ণু ও ও অসংযত আচরণ করেই।

প্রাণে বাঁচানোর গরজতাড়িত মানুষ ককনো ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, নিন্দা-তারিফ, ঘৃণা-শ্রদ্ধা, ভয়-ভরসা, মান-লজ্জা পরখ করে, পরওয়া করে চলতে পারে না, চলা অসম্ভব বলেই সে-চেষ্টাও করে না শৈশব-বাল্য কৈশোর থেকেই। আবার অর্থ-সম্পদের ও শিক্ষার ক্ষেত্রে গোটা জাতিটাই ভুঁইফোঁড় হওয়ায় প্রথম সুযোগেই ধনে-মনে কাঙাল মানুষগুলো লোভ-লিপ্সা বশে লুটপ্রবণ হয়ে যায়। ফলে সর্বপ্রকার বঞ্চনার-প্রতারণার জোর-জুলুমের গোপন আঁতাতের আশ্রয় না নিয়ে পারে না। তাই আমাদের আজকের বাঙলার সর্বত্র ঠকাঠকি, চোরাকারবার, চোরাচালান, পাচার-ভেজালদারি, ঘুষ, ব্যাংকলুট, বখরা-কমিশন-পাওন-নজর-উপঢৌকন-বখশিশ-টিপস থেকে রাহাজানি অবধি সব চলে। এখন বাংলাদেশ হচ্ছে দুর্নীতির, দারিদ্র্যের, লুটের, দুঃশাসনের, আরণ্য জীবনের ও ভিক্ষাজীবিতার নামান্তর মাত্র।

আর দেশের শতে উননব্বই জন অজ্ঞ-অনক্ষর এবং দরিদ্র-নিঃস্ব-নিরন্ন বলেই এখানে ভোটতন্ত্র চলে। গণতন্ত্র কি, কেন তা ওরা বোঝে না, ওদের বোঝানো যায় না। কেননা, যতটুকু সত্তাচেতনা থাকলে, অর্থাৎ স্বসত্তার মূল্য-মর্যাদাবোধ এবং দেশে-সমাজে-রাষ্ট্রে দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার চেতনা থাকলে ভোট কি, কেন এবং গণপ্রতিনিধির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণা জন্মে, সেটুকু তাদের মধ্যে নেই। তাই তাদের ভোটে নির্বাচিত সদস্যকে (ইউনিয়ন পর্ষদে-পরিষদে-সমিতিতে সংস্থায়-সংসদে) তারা তাদের কাছে দায়বদ্ধ সেবক বা প্রতিনিধি বা কার্যনির্বাহক বলে ভাবতেও পারে না, তারা পর্ষদে-পরিষদে-সমিতিতে-সংস্থায়-সংসদে তাদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিকে তাদের প্রভু-শাসকরূপে মাননীয় বলেই জানে ও মানে। এ অবস্থায় সদস্য-সাংসদরা তাদের জবাবদিহিতার দায়িত্ব স্মরণেই রাখে না– হয় স্বৈর-স্বেচ্ছাচারী। পর্ষদে-সংসদে ও সরকারে ওরা অবাধে ও নির্ভয়ে মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্প-দাপট ও অর্থ-সম্পদ অর্জনে মাতে। আত্মরতি চালিত হয় সদস্যরা। জনগণ তখন তাদের লীলার নীরব দর্শকমাত্র। আজকের সাংসদ ও সরকারই এর সাক্ষ্য ও প্রমাণ। আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার সব সংসদের ও সরকারের ভূমিকা প্রায় অভিন্ন।

ভাষা-আন্দোলন হয়েছিল আর্থিক-রাজনীতিক-আঞ্চলিক স্বার্থ ও জাতিসত্তা সম্পৃক্ত সংগ্রাম বা সংগ্রামের অংশরূপে। কাজেই এ ছিল স্বাধিকার দাবির, আদায়ের ও স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আন্দোলন। অতএব ভাষা-আন্দোলন কোনো বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট দাবি নয়, গোড়াতেও এর মূলে ছিল জাতিসত্তার, সংস্কৃতির, আর্থিক-রাজনীতিক-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যচেতনার অপরিব্যক্ত দাবি। এটিই কালক্রমে মুক্তিযুদ্ধে ও স্বাধীনতা অর্জনে পরিণতি পায়। দূরের বিভাষীর শাসন-শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটল বটে, আমরা স্বদেশী-স্বধর্মী-স্বভাষী-স্বজাতি-স্বজনের শাসনে এলাম বটে, কিন্তু আমাদের জাতিগত কোনো ফল-ফসল মিলল না। নতুন পথ-পদ্ধতির প্রতারণায়, শোষণে-বঞ্চনায় আমরা হতাশ ও হতবাক হয়ে, স্তব্ধ হয়ে কেবল লুটেরার, জালিমের, শোষকের, দুর্নীতিবাজের অমানবিক কর্ম-আচরণ দেখলাম, শুনলাম ও বুঝলাম। কিন্তু প্রতিকারের, প্রতিবাদের, প্রতিরোধের শক্তি-সাহস-পন্থা খুঁজে পেলাম না। ফলে আমরা দেশের পঁচানব্বই জন মানুষ দুষ্টের, দুর্জনের, দুর্বত্তের, দুস্কৃতির এবং ঠিকেদার, ভেজালদার, দোকানদার, কারখানাদার, দফতরদার, সরকার প্রভৃতি যারা আমাদের রাষ্ট্রের অর্থসম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলার শিকার হয়ে জীবনে-জীবিকায়-অর্থে-সম্পদে, ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে, বিপন্ন, অনিশ্চিত-বিঘ্নিত-বঞ্চিত জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছি। এখন দেশ মস্তান-গুণ্ডা-খুনী কবলিত। কাড়া-মারা-হানা সার্বত্রিক ও সার্বক্ষণিক ঘটনা।

এদিকে আমরা যতটা অতীত কৃতি-কীর্তির রোমন্থন প্রিয় ও গৌরবগর্বী নিস্ক্রিয়প্রায় নিরাকাঙ্ক্ষী মানুষ। অতীত ও ঐতিহ্য যে কেবল ধরে রাখে, ভরে রাখে, পিছু টানে, অতীত ও ঐতিহ্য যে ফেলে আসা উপযোগরিক্ত স্মৃতিমাত্র, তা যে বন্ধ্যা, তা যে এগিয়ে দেয় না, উদ্যম-অঙ্গীকার-উদ্যোগ-আয়োজনের সহায়ক নয়, তা আমরা উপলব্ধি করি না। ইতিহাস পড়ি আমরা শেখার জন্যে, সতর্ক হওয়ার জন্যে, যাতে, স্বকালে সঙ্কটে-সমস্যায় ঠকে শিখতে-জানতে না হয়। যাতে ক্ষয়-ক্ষতি-পরাজয় এড়ানো যায়, আমরা এ তাৎপর্যে ইতিহাসে জ্ঞান অর্জন করি না। ইতিহাস আলোচনা করি আমরা গৌরবে গর্বে আস্ফালন করার জন্যে, বর্তমান নিস্ক্রিয়তার-বন্ধ্যাত্বের, শূন্যতার, অকৃতির, অকীর্তির গ্লানি ভুলে থাকার জন্যে। তাই আমরা আজ চল্লিশ বছর পরেও ভাষা-সংগ্রামের গৌরব অনুভবে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চাই, একবারও ভাবি না যে, যে-রাষ্ট্রে যে-শাসকের বিরুদ্ধে আমরা ভাষাসংগ্রাম করেছিলাম-সে-রাষ্ট্র, সে-শাসক, পীড়ক-শোষক-বঞ্চক সরকার এখন অনস্তিত্বে বিলীন। আমাদের বিজয়ের পরেও বিশ বছর কেটে গেছে, মুক্তিযুদ্ধ করার, জয়ী হওয়ার ও স্বাধীনতা অর্জনের একুশ বছর পরেও আমরা আজও ভাষাসংগ্রামকে এবং মুক্তিযুদ্ধকে সার্বক্ষণিক তর্কের, বিতর্কের, গৌরবের, গর্বের, কৃতির ও কীর্তির অবলম্বন করে লাটিমের মতো কিংবা গোলকধাঁধায় পড়ে ঘুরছি, অগ্রসর হচ্ছি না– মানসিক কিংবা বৈষয়িকভাবে এক তিলও, এক পা-ও। ফলে আমরা আজও কে কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, কে কে শহীদ হয়েছিলেন, কে কে সাহিত্যে-চিত্রে জাতীয় সংগ্রাম রূপায়িত করেছেন, কে বা কারা স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, দেশ-জাতিদ্রোহীই বা ছিল কারা, এসব নিয়ে মেতে রয়েছি। এর সঙ্গে বাঙালী ও বাংলাদেশী জাতীয়তার বিতর্কও রয়েছে তাজা।

দেশ-কাল-মানুষের প্রয়োজনে নতুন চিন্তা-চেতনার, মন-মত-পথ-পদ্ধতি তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণের, আর্থিক-নৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-জীবন উন্নয়নের প্রয়াস যে আবশ্যিক ও জরুরী, সে-সম্বন্ধে আমাদের কোনো চিন্তা-চেতনার প্রত্যাশিত মাপে-মাত্রায় আভাস মেলে না।

বরং আমরা দেশ-কাল-জীবন বিরোধী ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে উৎসাহী। আমাদের ইহজাগতিক বা ঐহিক জীবনে অশন-বসন-নিবাস-নিদান-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চিকিৎসার ব্যবস্থায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারো আগ্রহ নেই। সরকার, রাজনীতিক দল, শাস্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা আমাদের বেহেস্তী করার জন্যে আমাদের পারত্রিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। আমাদের কোটি কোটি জনগণকে ভাত-কাপড় দিয়ে নিশ্চিত-নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের সুযোগ দেয়ার চেষ্টা করেন না কেউ, কিন্তু শাস্ত্রানুগত রেখে আমাদের স্বর্গে পাঠানোকেই আমাদের শহুরে-শিক্ষিত ধনী-মানী-রাজনীতিক, শাস্ত্রী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিসেবী ও সাংবাদিকরা তাঁদের পবিত্র আবশ্যিক ও জরুরী দায়িত্ব-কর্তব্য রূপে বেছে নিয়েছেন।

আজ আমাদের প্রকৃত মানববাদী শিক্ষিত যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিদের আবশ্যিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে মন-মগজ-মনন-মনীষা প্রয়োগে জানা-বোঝা এবং বোঝানো ও প্রচার করা যে মানুষের জন্যেই ধর্ম, ধর্মের জন্যে মানুষ নয়, ইহজগৎ আছে বলেই, ইহজাগতিক জীবন আছে বলেই কি পারত্রিক জীবন রয়েছে, না-কি পারত্রিক জীবনে বেহেস্ত দোজখ ভর্তি করার জন্যেই ইহজগতে মানুষ জন্মে। এক কথায় জীবনের জন্যে ধর্ম, না ধর্মের জন্যে জীবন– এ তত্ত্বের মীমাংসার উপরই আমাদের আর্থিক-নৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাষ্ট্রিক জীবনের ক্ষতি-বৃদ্ধি, উৎকর্ষ-অপকর্ষ, স্থিতি-গতি, প্রগতি-প্রাগ্রসরতা নির্ভর করছে। আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের মন-মানসের সমকালীনতার ও আমাদের সম্মুখদৃষ্টির বিস্তারের উপরই নির্ভর করছে। ইহজাগতিক জীবন-জীবিকার ও চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে আমাদের সেক্যুলার হওয়া আবশ্যিক ও জরুরী। শেষকথা, মানুষকে ভালো না বাসলে মানুষের সেবা করার, মানুষের কল্যাণ করার যোগ্য হয় না কেউ। আমাদের মধ্যে সে-মানুষ আজও দুর্লভ। তাই আমাদের দুঃখ ঘোচে না।

AMARBOI.COM

আজও নিশিদিন ভরসা রাখি

মানব প্রজাতির প্রাণী ছাড়া দুনিয়ার প্রায় তাবৎ প্রাণীই স্থলচর, জলচর, খেচর নির্বিশেষে শ্রম ও সময় ব্যয় করে খাদ্য অন্বেষণের ও সংগ্রহের গরজে। মানুষ ব্যতীত খুব কম প্রাণীই খাদ্য সঞ্চয় করে রাখতে পারে। মানুষ খাদ্য প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ অর্থ বিত্ত বেসাত বিচিত্রভাবে চিরস্থায়ী করেও রাখতে জানে এবং পারে।

প্রাণীমাত্রই যতক্ষণ গতর খাটিয়ে উড়ে চলে-ফিরে ঘুরে বেড়াতে পারে অর্থাৎ সুস্থ থেকে শারীরিক শক্তি প্রয়োগে খাদ্য সন্ধানে সমর্থ থাকে, ততদিনই তার জীবনের পরিসর। স্বাস্থ্য হারালে পঙ্গু হলে জীবের জীবনের অবসান সুনিশ্চিত।

ভাবতে নিজেদের মনুষ্যত্বহীনতার জন্যে লজ্জা হয়। কেননা তৃতীয় বিশ্বের শতে নিরানব্বই জনই নিঃস্ব কিংবা নিতান্ত সামান্য জমির মালিক। বসে খাওয়ার মতো সচ্ছল ব্যক্তি শতে একজনও মেলে না। অসুস্থ হলে, কাজ না পেলে, অজন্মা হলে, ঝড় ঝঞ্ঝা বন্যা মারী আকাল হলে ওরা মরে লাখে লাখে। ওদের জীবনে জীবিকার কোনো নিশ্চয়তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। কথায় বলে 'সাগরে শয়ান যার/শিশিরে কি ভয় তার'। অন্য প্রাণীদের মতো তৃতীয় বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের দেহে প্রাণের স্থিতি এমনি অনিশ্চিতই।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই হৃদয়বান ভালো মানুষেরা মানবতার খাতিরে ক্ষুধার্তকে খাদ্য, তৃষ্ণার্তকে জল দেয়ার আবেদন জানিয়েছেন আসমানী কৃপার ও পারত্রিক পুণ্যের লোভ দেখিয়ে। মানুষ কেবল আসন্ন কিংবা আপন্ন বিপদ সম্ভাবনার শঙ্কায় কিংবা বাঞ্ছিত প্রত্যাশিত লাভ-লোভ-স্বার্থবশে, কাম্য বস্তু প্রাপ্তির লক্ষ্যে কিংবা কাঙ্ক্ষাপূর্তি সহজতর ভেবেই দীন-দরিদ্রের-কাঙাল-মিসকিনের খবরদারি করেছে, গ্রাম্য কথায় 'দেখভাল'-এর দায়িত্ব নিয়েছে। ফলাকাঙ্ক্ষা নিরপেক্ষ দুস্থমানব দরদী জগতে কৃচিৎ কোথাও আকস্মিকভাবে দেখা যায় মাত্র। হাজার হাজার বছর ধরে অজস্র অসহায় নিঃস্ব মানুষ ঝড় ঝঞ্ঝা খরা বন্যা মারী আকাল রোগ কবলিত হয়ে মরেছে হাজারে হাজারে লাখে লাখে দুনিয়ার সর্বত্র।

মহাপরুষ নামে পরিচিত কিংবা নবী-অবতারের মতো সমাজ সংগর্বকেরা দীন দুস্থ পঙ্গু পাগল রুগ্ন শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের ভাতে কাপড়ে কৃপা করুণা দয়া দাক্ষিণ্য দেখানোর কথা তাঁদের শাস্ত্রে আবশ্যিক জরুরী ও অপরিহার্য দায়িত্ব কর্তব্য বলে দেশনা রূপে উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু আর সব ভালো আপ্তবাক্য, প্রবচন, বাণী, মহৎকথার মতো এ-ও জানা ছিল সবারই, এখনো জানা আছে সবার কিন্তু সাধারণভাবে, মানা হয়নি, হয় না, হবেও না কখনো। কারণ মানুষ ব্যক্তিক জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে নিজের ধান্ধায় চলে, পরিবারের তথা স্ত্রী-সন্তানেরই কল্যাণ অনুধ্যানে অভ্যস্ত থাকে। ফলে শাস্ত্রিক পারত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডে এবং কোনো অভীষ্ট সিদ্ধি লক্ষ্যে পুণ্য কর্মের প্রেরণা ব্যতীত দুস্থ রুগ্ন হাভাতের সাহায্যে সেবায় কেউ কখনো আজও এগিয়ে আসে না। ইদানীংকালের কিছু প্রাতিষ্ঠানিক সেবা-সাহায্য ব্যবস্থা অবশ্যই ব্যতিক্রম, যেমন এতিমখানা, হাসপাতাল, অনাথআশ্রম, এগুলো মানবতা বা মনুষ্যত্ব প্রসূন হলেও অনেকটা সামাজিক ও সরকারী, কৃচিৎ ব্যক্তিক। লা-ওয়ারিশ ও অতিধনী ব্যক্তির পক্ষে গণকল্যাণ প্রতিষ্ঠান গড়ে দেয়া তেমন হৃদয়বানতা বা মানবিক মূল্যবোধের পরিচায়ক নয়। উটোপিয়ানদের কথা বাদ দিলে কিংবা কিছু দার্শনিকের ও মানবতাবাদীর নানা চিন্তা-চেতনার কথা স্মরণে রেখেও গতশতকের কার্লমার্কস-এঙ্গেলসকেই স্মরণ করতে হয় নির্বিশেষ মানবদরদী হিসেবে। এরাই বুঝেছিলেন এবং বলেছিলেন মানুষমাত্রেই বাঁচার জন্মগত অধিকার রয়েছে। এবং মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব হচ্ছে সমাজের সরকারের রাষ্ট্রের। আর সবলের-অবলের তথা প্রবলের দুর্বলের শোষক শোষিতের শ্রেণীগত দ্বান্দ্বিক অবস্থা ও অবস্থানই দুর্বল মানুষের বাঁচার জন্মগত অধিকার হৃত হবার বাস্তব ও প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কারণ। কান্ট, হেগেল হয়ে দ্বান্দ্বিক অবস্থানতত্ত্ব তথা এ আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্বতত্ত্ব মার্কস-এঙ্গেলসের হাতে পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পেল। আর পরে তা ম্যাটেরিয়াল ডাইলেকটিকস তথা দ্বান্দ্বিক 'বস্তুবাদ' তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে স্থিতি পায় বিদ্বান মানববাদীর চেতনায় ও চিন্তায়। এ শতকের পৃথিবীতে মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে বেঁচে থাকার নিশ্চিত অধিকার পেয়েছিল। আজ তা আপাতত যেন বিলুপ্তির পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তবু আমাদের ধারণা মার্কসবাদের বিকল্প নেই। ভিন্ন পথ-পদ্ধতি বরণ করে তা আবার গোটা পৃথিবীতেই প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের এ বিশ্বাস দিবা স্বপ্ন নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোটতন্ত্রে দুর্দশা ঘুচবে না

আমাদের মতো অজ্ঞ অনক্ষর নিঃস্ব নিরন্ন ও বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাদুর্গে নিশ্চিন্তে আশ্রিত সমাজে সমাজ-পরিবর্তন তথা আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রা পদ্ধতি পালটানো সহজ হবে না আরো বহুদিন। ইহ-পরলোকে প্রসৃত অনন্ত অমর আত্মার অবিনাশী অস্তিত্বের ধারণা বাল্য-কৈশোর থেকেই শ্রুতিস্মৃতি সূত্রে বদ্ধমূল ধারণাগত হওয়ার ফলেই হয়তো এ কালের বঞ্চিত শোষিত পীড়িত দলিত প্রতারিত নিঃস্ব নিরন্ন মানুষও স্রষ্টা ও শাস্ত্রদ্রোহী হয় না। ঈশ্বরের লীলার, কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য সুবিচারের ও শাস্তির ধারণা তাদের নিরুপায় ভীরু হৃদয়ে তাদের মগজে মননে স্থায়ী প্রভাব গাঢ় গভীর ও ব্যাপক হয়েই স্থিতি পায়। ফলে তারা স্রষ্টায় ও শাস্ত্রে আত্মসমর্পণ করে ভয়-ভক্তি-ভরসা নির্ভর জীবনযাপনে ব্যক্তিক ও সামাজিকভাবে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এ গতানুগতিক অভ্যাস সর্বত্র প্রাজন্মক্রমিক। এ কারণেই সাধারণভাবে ঈশ্বরে আস্থাবান, স্রষ্টা ও শাস্ত্রমান্য ব্যক্তিরা কম্যুনিজম সাম্যবাদ সমাজতন্ত্র প্রভৃতি শব্দ মাত্রেরই প্রতি বিরূপ বিরক্ত বিতৃষ্ণ। নিতান্ত মর্ত্যজীবনে ভাত-কাপড়ের সুব্যবস্থাজাত নিশ্চিত জীবনের বিনিময়ে ওরা আখের হারাতে রাজি নয়। তাই অজিজ্ঞাসু অকৌতূহলী এবং জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগে অনীহা শাস্ত্রমানা আস্তিকব্যক্তি মাত্রই কম্যুনিস্ট ও সমাজতন্ত্রবিরোধী। এরা যে যাচাই বাছাই করে বুঝে শুনে এ পার্থিব আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে অপছন্দ করে, তা নয়। পারত্রিকজীবনের ভয়াবহ পরিণাম চেতনাই তাদের অনীহা অসমর্থনের মূল কারণ। কাজেই আমাদের মতো অনুন্নত দেশে কেবল ভোটতন্ত্রে আমাদের আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক নৈতিক দুর্দশা ঘোচে না। তার কারণ সাধারণ মানুষ যে জেনে-বুঝে-মেনে কিছু করে না, মগজী বিবেচনায়ও যে তেমন কিছু করে না অর্থাৎ ইনটেলেক্ট বা মনন-মনীষা প্রয়োগে নয়, বুকের আবেগ তথা ইমোশান-তাড়িত হয়েই মন-মত-মন্তব্য-সিদ্ধান্ত করে তারা। একটা স্থূল প্রমাণ মেলে গণতান্ত্রিক মন-মেজাজের বলে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যেও গণতন্ত্র সমর্থক ব্যক্তিরাও যে মনের গভীরে শাহ-সামন্ত ভক্ত ও শাহ-সামন্ত আড়ম্বরের ও জৌলুসের অনুরাগী, শাহ-সামন্তের প্রতি অন্তরের গভীরে শ্রদ্ধাবানও, তার প্রমাণ কয়েকজন শাহ-সামন্তের স্মারক ডাকটিকেট তৈরিতেই সীমিত নয়, জাহাঙ্গীরনগর নামেও নয়, একটা বড় মহল্লার সবরাস্তার তুর্কী-মুঘল বাদশাহর নাম অঙ্কিত করার মধ্যেই প্রকট। অধিকাংশ শহুরে শিক্ষিত ঘরে রাজা রানী নাম রাখার প্রবণতাতেও তা বিশেষ ভাবে আভাসিত হয়।

এক কথায় আমাদের গণতন্ত্রপ্রীতি মুখের উচ্চারণেই নিবদ্ধ রয়েছে, আজও বুকের সত্যে স্থিতি পায়নি। আমাদের মগজে মননেও এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্যতা আবশ্যিকতা ও জরুরীত্ব অনুভূত উপলব্ধ ও স্বীকৃত নয়। তাই যদিও বা আমরা শুনে শুনে তোতা পাখির মতো উচ্চারণ করি উচ্চকণ্ঠে যে গণতন্ত্র প্রজাতন্ত্র কিংবা জনগণতন্ত্র যে Government of the people, by the people and for the people. আসলে আমরা হলাম ভোটতান্ত্রিক। ভোটের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ও বজায় রেখে আধুনিক পদ্ধতির স্বৈর ও স্বেচ্ছাচারী শাহ-সামন্ত-দেওয়ান-গোমস্তা-আমলা-কোতোয়াল রূপে মান যশ খ্যাতি ক্ষমতা অর্থবিত্ত দর্পদাপট, প্রভাবপ্রতিপত্তি প্রভৃতির অধিকারী হতে চাই মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই আমাদের ভোট জোগাড় কালে ও ভোট দান কালে মারামারি ও হানাহানি করি। ভোট জালও করি। দেশ, রাষ্ট্র প্রশাসন কিংবা জনগণ প্রভৃতির কল্যাণচিন্তা আমাদের মনে ঠাঁই পায় না। কেবল ভবিষ্যৎ ভেবে নিজের অঞ্চলের ভোটারদের চোখধাঁধানো ও মনজোগানো কিছু কাজেই এমনি জনপ্রতিনিধিরা নিষ্ঠ থাকে। এর ফলেই দেহে প্রাণে মনে মানে ও অর্থে বিত্তে সপরিবার সপরিজন পর্ষদ পরিষদ সংসদ সদস্যরা পুষ্ট, হৃষ্ট, তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকে। অন্যদের গাঁয়ে গঞ্জে শহরে বন্দরে পাড়ায় মহল্লায় আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও চারিত্রিক অবনতি ঘটে দারিদ্র্যবৃদ্ধির, বেকারত্বের এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ শঙ্কায়। তা ছাড়া Government of the people, by the people, for the people তত্ত্বে কেবল মানুষের কথাই আছে। জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-পেশা-নিবাস-বিদ্যা-বিত্তের কথা নেই, তবু আমাদের পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই স্বধর্মীর, স্বভাষীর, কালোর বা ধলোর অধিজনের, অভিজাতের, ধনীর, মানীর, শিক্ষিতের কিংবা সংখ্যাগুরুশ্রেণীর এমন কি মাস্তান গুণ্ডা খুনীবহুল দলেরই গণতন্ত্র পৃথিবীর নানা রাষ্ট্রে চালু দেখতে পাই। এমনকি আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকায় জবর-দখলকার জঙ্গীনায়করাও এক রকমের তথাকথিত গণতন্ত্র চালু করে গণনায়ক হয়ে একনায়কতন্ত্র পাকা করে রাখে বহু বহু বছর ধরে অর্থাৎ আর একটা ক্যু না ঘটা অবধি। এমনকি গণতন্ত্রে কি মানুষের মনের মননের মনীষার বিকাশের, মনুষ্যত্বের মানবিকতার মানবতার, মুক্তবুদ্ধির স্বাধীনতা, অবাধে অকুতোভয়ে নতুন চিন্তা-চেতনা প্রকাশের উপযোগরিক্ত পুরোনো বিশ্বাস সংস্কার ধারণা, অভ্যাস, আচার বর্জনের স্বাধীনতা প্রাপ্তি সম্ভব না স্বাভাবিক? মানবিক গুণের রুচি-সংস্কৃতির বিকাশ বিস্তারইতো মূল লক্ষ্য। ব্যবহারিক বৈষয়িক জীবনের আর্থ-বাণিজ্যিক প্রাশাসনিক সাচ্ছল্য স্বাচ্ছন্দ্য তো সে-লক্ষ্যে পৌঁছার উপায় কিংবা পুঁজি-পাথেয়মাত্র সর্বপক্রারে ও সর্বক্ষেত্রে উদার ও সেক্যুলার নীতি-নিয়ম প্রবর্তিত ও অনুসৃত না হলে গণতন্ত্র গণকল্যাণে আসে না এবং ঘটে না গণমুক্তি।

AMARBOI.COM

গণতন্ত্রে সেক্যুলার সরকার ও রাষ্ট্রের বিকল্প নেই

ধারণা ও জ্ঞান দুটো আলাদা বিষয়। ধারণা হচ্ছে কনসেপ্ট এবং কনসেপ্টশন। আর জ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণসম্ভব নলেজ। ধারণা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলতে পারে, মারামারি, হানাহানিও হতে পারে, কিন্তু যেহেতু বস্তুগত ভাবে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ-সমীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ কিংবা যান্ত্রিক রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রমাণসম্ভব নয়, সেহেতু ধারণায় কখনও মীমাংসা মেলে না। আদিকাল থেকেই পারিবারিক-শাস্ত্রিক-সামাজিক ক্ষেত্রে এবং শৈশবকাল থেকেই একজন বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাবদ্ধ হয়ে জীবন-চেতনায় ও জগৎ-ভাবনায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তিযোগে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তার লব্ধ ধারণা সত্য-মিথ্যা কখনও যাচাই-বাছাই না করেই গতানুগতিক এবং পার্বণিক জীবনাচার মেনে চলে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেহেতু তার মনের মননের মতের পথের কোনো পরিবর্তন হয় না আমৃত্যু। জীবন এভাবেই চলে। এদের আস্তিক্য হচ্ছে জন্মসূত্র শ্রুতি-স্মৃতি নির্ভর। এর ফলে যে যে গোষ্ঠীতে-গোত্রে-অঞ্চলে ভাষিক পরিবেশে শাস্ত্রিকদলে জন্মগ্রহণ করে, সেটাই তার প্রিয় হয়ে থাকে।

সাধারণত মানুষের ক্ষেত্রে এ সব মত-পথের পার্থক্য নিয়ে বাস করতে কোনো অসুবিধা হয় না। কেননা নিজেদের শাস্ত্র-সমাজের এবং আচারের সত্যতা এবং উপযোগ সম্পর্কে আস্থা থাকলেও অন্য গোত্রের গোষ্ঠীর, জাতির, সমাজের, শাস্ত্রের প্রতি অনাস্থা-অবজ্ঞা থাকলেও, তা নিষ্ক্রিয়তায় সুপ্ত গুপ্ত ও লুপ্ত থাকার ফলে মাঠে-ঘাটে-হাটে সহযোগিতায় সহাবস্থানে কোনো বাধার সৃষ্টি হতো না এবং এখনও হয় না।

কিন্তু মানুষের ওপরে নেতৃত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী উচ্চাশী রাজাবাদশা-সামন্তরা খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্পদাপট, প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা ও প্রসারকামী শিক্ষিত এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মপ্রসারের প্রয়োজনে কিংবা শ্রেণী হিসেবে আর্থ-বাণিজ্যক ক্ষেত্রে পরধন আত্মসাতের লিপ্সায় শাস্ত্রিকভ্রাতৃত্বের, ভাষিক অভিন্নতার, আঞ্চলিক স্বার্থের দোহাই দিয়ে রাজনীতিক ফায়দা ওঠানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন রকমের প্রেরণা প্রণোদনা ও প্ররোচনা দিয়ে বিরোধে ও বিবাদে অজ্ঞ ও দরিদ্র জনগণকে হত্যার মাধ্যমে লুণ্ঠনে প্রলুব্ধ করে দাঙ্গা বাধায় এই দাঙ্গা কখনও দুই ভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে, কখনও বা দুই ভিন্ন মতবাদীদের মধ্যে বাধিয়ে দেয়। মধ্যযুগেও শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবে-জৈনে-বৌদ্ধে-রোমান ক্যাথলিক এবং প্রটেস্টান্ট প্রভৃতির মধ্যেও দাঙ্গা ও লড়াই চলত। একালেও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে শিয়া-সুন্নি-ওহাবী-সুফী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও রক্তঝরা বিবাদ-বিসংবাদের অবসান ঘটেনি।

একে এযুগের ভাষায় আমরা যদি দাঙ্গা-হাঙ্গামা বলে অভিহিত করি, তাহলে মানতেই হবে যে যারা বাস্তবে আগুনে-লুটে-হত্যায়, সমাজে-রাষ্ট্রে বিপর্যয় ঘটায় তারা নিতান্ত অজ্ঞ প্ররোচিত হুজুগে অর্থলিপ্সু মানুষ মাত্র। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার পেছনে থাকে রাজনীতি-অর্থনীতি সচেতন লাভ-লোভ-স্বার্থবাজ দেশী ব্যক্তিরা এবং আর্থ-বাণিজ্যিক স্বার্থবাজ বিদেশী রাজনীতিকরা। যেমন– বাবরী মসজিদ কি, রাম মন্দিরই বা কি, অযোধ্যাই বা কোথায়, তা উপমহাদেশের লাখে একজনও জানে না। আর সেজন্যেই এ অচেনা-অজানা-বোঝা বিষয় নিয়েই নিঃস্ব-অজ্ঞ লোক দ্বারা লুট, নরহত্যা ঘটাল উচ্চাশী রাজনীতিকরা। আর্থ-বাণিজ্যিক সম্পদ নিয়ন্ত্রকরা মানুষকে মানুষ বলে জানে না, কাজে লাগানোর জন্যে অন্য প্রাণীর মতোই জানে। তাই ক্ষমতার গদী দখলের জন্যে অথবা অর্থ সম্পদ বাড়ানোর জন্যে সহজেই এরা দাঙ্গা বাধায়। মানুষের জীবনের মূল্য-মর্যাদা নেই এদের কাছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা চালিত হয় না বলেই আশৈশব লব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা বশে চালিত জীবন যাপন করে বলেই লেখাপড়া জানা তথাকথিত শিক্ষিত মানুষরা সংস্কারবশে চিরকালই ইহুদী-বৌদ্ধ-হিন্দু-খ্রীস্টান-মুসলমান থেকে যায়। এরা মনুষ্যত্বের অনুশীলনে মানবতাবোধে মানুষ হতে চায় না, হয়ও না। একারণেই আস্তিক মানুষ আচারিক জীবনযাপন করে কখনো উদার মুক্ত যুক্তি-বুদ্ধির অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত হয় না। এ কারণেই তাদের মধ্যে স্ব-সম্প্রদায়, স্ব-দল প্রীতিই প্রবল থাকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন্যায়-অন্যায়ের মাপে স্বদেশী স্বজাতির অপকর্মের নিন্দা করে না। যখন করে তখন সেটা আসলে আন্তরিক নয়, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রয়োজনে কপটতারই পরিচয় দেয় মাত্র। এ জন্যেই বোধ হয় উনিশ-বিশ শতকে নিরীশ্বর য়ুরোপীয় মনীষীরা মনুষ্যত্বের বা মানবতার পূর্ণ বিকাশের জন্যে সর্বপ্রকার সংস্কারমুক্তির তথা যুক্তিবাদিতার ও নাস্তিকতার গুরুত্ব স্বীকার করে গেছেন। নাস্তিক না হলে মানুষের মানবিক গুণের পূর্ণ বিকাশ হয় না—এ-ই ছিল তাঁদের ধারণা।

আস্তিকেরা স্বদলের ও স্বধর্মীর অপকর্মের যখন নিন্দা করে, তখন তা যেমন আন্তরিক হয় না, তেমনি বিজাতির প্রতি সহানুভূতির প্রকাশও হয় কৃত্রিম।

একালে অর্থাৎ নতুন প্রজন্মের যারা সর্বপ্রকার শোষণ-শাসন-পেষণ-পীড়ন-বঞ্চনা-প্রতারণা থেকে গণমানুষের মুক্তিকামী— এককথায় সমাজ পরিবর্তনকামী তাদেরকে এ বিষয়ে সদা সচেতন থেকে সতর্ক সযত্ন প্রয়াসে গ্রামে-গঞ্জে পাড়ায়-মহল্লায় ঘুরে ঘুরে ধনী মানী বিদ্যা-বিত্ত-বেসাত ওয়ালাদের লাভ-লোভ-স্বার্থ সম্পৃক্ত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ-ভাষণ-হিতৈষণা সম্বন্ধে ঘন ঘন সচেতন করে দিতে হবে। তাদের এ মুহূর্তের কাজ হচ্ছে:

সংখ্যালঘুদের বোঝানো যে এক কোটি লোক দেশ ছেড়ে নানা কারণে কোথাও যেতে পারবে না। কাজেই দুস্থ-অসহায়-অসমর্থদের ফেলে অপেক্ষাকৃত বিদ্যা-বিত্ত-বেসাত ওয়ালাদের স্ব-স্ব স্বার্থে বা নিরাপত্তার দরুন স্বভিটে, স্বদেশ, স্বাধিকার ছেড়ে চলে যাওয়া হবে মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্যহীনতার, বিবেকহীনতার পরিচায়ক মাত্র। ভারতের সংখ্যালঘুদের মতো তাদেরও জ্ঞান-শক্তি-সাহস-অঙ্গীকার নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। স্বঘরে, স্বভিটেয়, স্বগাঁয়ে, স্বদেশে, স্বরাষ্ট্রে, স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ থাকার সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হবে। সংখ্যালঘুদের যারা বিদ্যায়-বিত্তে বেসাতে ছিল স্বপ্রতিষ্ঠ, তারা সময়-সুযোগ মতো পালিয়ে গিয়েই সংখ্যালঘুদের দিন দিন অসহায় ও ভীত করে তুলেছে। এ প্রজন্মের মানববাদী তরুণ-তরুণীদেরই দায়িত্ব হচ্ছে গাঁয়ে গাঁয়ে আগের মতো সংখ্যালঘু স্বার্থরক্ষার।

অভিযোগ, চাহিদা জানা-বোঝার জন্যে প্রয়োজনবোধে তাদের যুক্তি ও ন্যায়সম্মত দাবি ও চাহিদা মেটানোর জন্যে সর্বপ্রকার উপায়ে চেষ্টা-তদবির করা।

দেশের মানববাদী ডান-বাম বিরোধী দলগুলোরও এ মুহূর্তের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে গাঁয়ে গাঁয়ে পঞ্চায়েতের মতো হিন্দু-মুসলিম নিয়ে বোর্ড বা পর্ষদ গঠন করা যারা সংখ্যালঘুর প্রতি যে-কোনো অন্যায়, পীড়ন-শোষণ, হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলার খবর সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশময় প্রচার করবে, সরকারের দফতরে মন্ত্রণালয়ে প্রতিকারের আহবান জানাবে এবং প্রতিবাদ করবে। এমন কি প্রতিরোধের জন্যে জনমত তৈরি করার চেষ্টা করবে।

সংখ্যালঘুদের মনের ভয়-ভীতি-অনিশ্চয়তা দূর করার এবং তাদের মনে বল-ভরসা-আস্থা জাগানোর সহজ দুটো উপায় আছে বলে আমাদের ধারণা: একটি পুলিশ বিভাগে শতকরা ১২/১৪ জন করে সংখ্যালঘু নিয়োগ করা এবং সৈন্য বিভাগেও শতে দশজন করে সংখ্যালঘু নেয়া। এতে আমাদের নিখাদ-নিখুঁত-নিশ্ছিদ্র বাঙালী জাতীয়তা গড়ে উঠবে বলে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে। থানায় থানায় সংখ্যালঘুদের মনে আপদে বিপদে সুবিচারের আশা ও আশ্বাস জাগবে। তেমনি সৈন্য বিভাগেও সংখ্যালঘু থাকলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অখণ্ড ও অবিভক্ত বাঙালী জাতীয়তার আদর্শ ও আপ্তবাক্য বাস্তবরূপ পাবে এবং সংখ্যালঘুরা আস্থা-অভয়-আশা-আশ্বাস ও বল-ভরসা নিয়ে স্বদেশে নিশ্চিন্ত নির্ভীক নাগরিক হয়ে মাটিলগ্ন দেশপ্রেমী মানবসেবী বাঙালী হবে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত সেবক হবে।

একালে আধুনিক সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে সেকুলার সরকার ও রাষ্ট্র যেখানে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-বিদ্যা-বিত্ত-বেসাত-যোগ্যতা নির্বিশেষে মানুষ কেবল ব্যক্তি হিসেবেই, নাগরিক হিসেবেই যথাপ্রয়োজনে, যথাকালে যথাস্থানে, যথামাত্রায়, যথানিয়মে, যথাপ্রাপ্য সুবিচার পাবে।

এ মুহূর্তে বোধ হয় আরো একটা বিবেচ্য বিষয় রয়েছে, আমরা যেন নতুন করে রোহিঙ্গা-বাঙালীদের মতো কোনো পুশব্যাক-পুশইন-এর খপ্পরে পড়ে নতুন সঙ্কট-সমস্যায় জড়িয়ে না পড়ি।

বসবাসের জন্যে ভিটে দরকার। রাষ্ট্রও ভিটের মতোই। ভিটের মতো রাষ্ট্রেরও পরিচর্যা প্রয়োজন। নিজেদের ও নিজেদের সন্তানদের স্বার্থেই রাষ্ট্রের কল্যাণচিন্তা আজ আবশ্যিক ও জরুরী।

রাষ্ট্রের ও মানবতার স্বার্থেই পাঠকমাত্রই কথাগুলো ভেবে দেখবেন আশা করি।

AMARBOI.COM

'আমাদের সুদিন আসবে আগামী প্রজন্মের কালে'

[প্রতিবাদী, প্রথাবিরোধী, বিদ্রোহী, নির্ভীক বিবৃতিদাতা, পণ্ডিত–এই সব ডক্টর শরীফেরই অন্য অপর নাম। তাঁর জন্ম চট্টগ্রামের পটিয়ার সুচক্রদন্ডী গ্রামে ১৯২১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে। দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। মননশীল প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে একজন প্রধান অগ্রণীর দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশে মুক্তিবুদ্ধিচর্চার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব আহমদ শরীফের এই সাক্ষাৎকার দেশের বর্তমান ক্রান্তিকালের জন্য দরকারী বিশ্লেষণী মন্তব্য উচ্চারিত হয়েছে। সুন্দর ভবিষ্যতে উত্তরণের ভাবনা ও যথারীতি ব্যক্ত হয়েছে। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন: মারুফ রায়হান।]

প্রঃ আপনি দীর্ঘকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান শিক্ষার পরিবেশ নেই– এমন অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এর প্রধান কারণ দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা। এ রাজনৈতিক অস্থিরতা ছাড়াও কি আপনার মনে হয়েছে শিক্ষার এবং ছাত্র সমাজের মানসিকতার অবমূল্যায়ন ঘটেছে?

উঃ পৃথিবী ব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধির ও শিক্ষা প্রসারের ফলে প্রাচীনকালের আদর্শে শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক চালু থাকে নি। বিদ্যা দান-গ্রহণের পদ্ধতিও পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন বিচিত্র হয়েছে বিদ্যার বিষয়ও। এ কারণে পৃথিবীর সর্বত্রই স্কুলে-কলেজে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিদালয়ে শিক্ষার্থীদের অনুযোগ-অভিযোগের কারণ ঘটে এবং সেজন্যে লঘু গুরু আন্দোলনও হয় শিক্ষাঙ্গনে।

আর যেটাকে আমরা রাজনীতি বলি, তাও সমষ্টির জীবনের প্রয়োজনে জীবন থেকেই উৎসারিত। কাজেই রাজনীতিও জীবনবিচ্ছিন্ন কিছু নয়। যে-কোনো শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক, আর্থ-সামাজিক, প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রিক দাবী আদায়ের জন্যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সভা-মিছিল করে লঘু গুরু আন্দোলন করতে থাকে এবং তার নাম যদি রাজনৈতিক আন্দোলন হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের এ কালে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে বিরত রাখা যাবে না। তাদের এই অধিকার ও এই ভূমিকা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ ছাত্র যে-জাতীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে রাজনৈতিক দলের ছাত্রশাখার সদস্য রূপে, তা কিন্তু বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা, এই রাজনৈতিক ছাত্রদের কোনো মহৎ বা জনকল্যাণকর আদর্শ-উদ্দেশ্য-লক্ষ্য নেই। এরা স্ব স্ব রাজনৈতিক দলের পক্ষে শ্লোগানদাতা ও দাঙ্গাবাজ হিসেবে কাজ করে। তারা কাড়া মারা ও হানা প্রবণ, স্থূলভাবে বলতে গেলে তারা জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক দলগুলোর, যারা কেবল ক্ষমতার লড়াইয়ে মত্ত, তাদের লেঠেলরূপে দায়িত্ব পালন করে। এ কারণেই স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন এখন সন্ত্রাসী আকীর্ণ। স্কুলে-কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া এক প্রকার মাস্তান-গুণ্ডা ও খুনী রাজনীতিক দল থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই গাঁয়ে গঞ্জে শহরে বন্দরে পাড়ায় মহল্লায় গণত্রাসরূপে নিজেদের জোর-জুলুমের হুকুম, হুমকি, হুঙ্কার ও হামলা চালায়। তাই আজ গোটা দেশে পুলিশের ও আদালতের প্রশাসন বৃথা ও ব্যর্থ হয়ে গেছে। আমরা এখন জাঙ্গলিক ও গাড্ডলিক জীবন যাপনে হয়েছি বাধ্য। আমার মতে, এই ক্ষমতার রাজনীতিতে আসক্ত আমাদের বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলো যদি দেশের কল্যাণ লক্ষ্যে তাদের ছাত্রশাখা বিলুপ্ত করে এবং স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনমূলক সমিতি, পর্ষদ কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ করে দেয়, তাহলে শিক্ষাঙ্গনে মারামারির, দাঙ্গার ও হত্যার আর কোনো কারণ থাকবে না।

প্রঃ বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর সংস্কৃতির মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলে কি আপনি মনে করেন? যদি পার্থক্য থেকেই থাকে, তবে সে-পার্থক্য দেশ বিভাগের আগে থেকেই বিরাজিত ছিলো?

উঃ মানুষের নৈতিক চেতনা এবং আচারিক জীবনে যতটুকু শাস্ত্রের প্রভাব থাকে, ততটুকু হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীস্টানের মধ্যে পার্থক্য ছিলই, রয়েছে এবং আস্তিকের মধ্যে তা চিরকাল থাকবে। এ জন্যেই এখনো গ্রামীণ জীবনে এবং অধিকাংশ শহুরে জীবনেও অশিক্ষিতদের মধ্যে নামে, পোশাকে, খাদ্যে, আচারে, ভাষা প্রয়োগে সংস্কৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু, যেহেতু উভয় বাঙলাতেই একই আকাশের ও চন্দ্র-সূর্যের নীচে একই রোদ-বৃষ্টির এবং আবহাওয়ার পরিবেশে আমরা জীবন ধারণ করি, ঘাটে মাঠে এবং হাটে আমাদের কাজকর্ম এবং লক্ষ্য অভিন্ন, সেহেতু আমাদের জীবনানুভবে ও জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে অভিন্ন এবং রাষ্ট্রিক পরিচয়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতি। এক কথায়, আঞ্চলিক ভাষার ও আচারের বৈচিত্র্যের ও পার্থক্যের মতোই বিভিন্ন শাস্ত্রিক বাঙালীর পার্থক্যকে তুচ্ছ ও লঘু বলে মানতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে তথাকথিত গণতন্ত্র হচ্ছে শ্রাবণের মেঘভাঙা রোদের মতো স্বল্পকাল স্থায়ী। এই অশিক্ষা-আকীর্ণ ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট বাংলাদেশে জনগণের অবজ্ঞা ও অসামর্থ্যের সুযোগে শাসকমাত্রই স্বেচ্ছা ও স্বৈরাচারী হয়-ই। এ জন্যেই আমাদের বি, এন, পি সরকারকে গণতান্ত্রিক সরকার বলি না, বলি জনগণের ভোটে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভোটতান্ত্রিক সরকার।

প্রঃ বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলাদেশী সংস্কৃতি এবং বাঙালী এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এই সব বিতর্ক সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী?

উঃ উভয় বঙ্গেই রক্তে অবয়বে ও ভাষায় বাঙালীর সংখ্যা শতে সাতানব্বই। এবং এরা মূলত অস্ট্রিক-দ্রাবিড়। এবং ভাষায় বিবর্তিত আর্য-ভাষার ধারক। এই তাৎপর্যে বাঙলাভাষী মাত্রই জাতে বাঙালী। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের বাঙলাভাষীরা যেমন বাঙালী, বাংলাদেশের বাঙলাভাষী সেই অর্থে নিঃসংশয়ে বাঙালী। জঙ্গী নায়ক জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেই পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের থেকে বাংলাদেশের মুসলিমদের মানস পার্থক্য সৃষ্টির মতলবে তিনি দেশের নামানুসারে বাংলাদেশের বাঙালীদেরও বাঙলাদেশী পরিচয়ে আখ্যাত করার ব্যবস্থা করলেন। আর এ দিকে 'বাঙলাদেশী' পাকিস্তানীরই পরিভাষা রূপে গৃহীত অনুমান করে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের অধিবাসী মাত্রকেই 'বাঙালী' অভিধায় তথা নামে অভিহিত রাখায় প্রয়াসী হল। ফলে বাঙালী ও বাংলাদেশী দুটোই রাজনীতিক মত ও মতলবের, চালবাজির প্রতিম, প্রতীক ও প্রতিভূ হয়ে রয়েছে। আমাদের মতে, এই দ্বন্দ্ব যখন থিতিয়ে যাবে অর্থাৎ লোপ পাবে, তখন বাঙলাদেশের বাংলাভাষী মাত্রই পরিচিত হবে বাঙালী বলে আর গারো-চাকমা-সাঁওতাল-ত্রিপুর-মারমা প্রভৃতি প্রান্ত উপান্তবর্তী জনগণসহ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অধিবাসীমাত্রই রাষ্ট্রিক পরিচয়ে পাসপোর্টে-ভিসায় বাঙলাদেশী নামে পরিচিত হতে থাকবে।

প্রঃ বাঙালীকে বার বার বলা হয়েছে 'পরাধীন জাতি' আপনিও কি তাই বলবেন?

উঃ এখনকার বাঙলাভাষীর বাংলাদেশ কখনো কোনো বাঙালীর দ্বারা শাসিত হয়েছে বলে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ১৯৪৭ সাল অবধি ইতিহাসের সাক্ষ্যে মেলে না, তবে পালেরা বাঙালী বলে কথিত হলেও তাঁরা বাঙালী নন, তাঁদের উত্থান এবং পতন উত্তর বঙ্গঘেঁষা [পুণ্ড্র ঘেঁষা] পাটলিপুত্রে আর বগুড়ার কৈবর্ত্যরা [দিব্যক, রুদ্রক ও ভীম) নিতান্ত বিদ্রোহী হিসাবে অল্পকাল স্বাধীনতা ভোগ করেছিলেন। গৌড়ের গণেশ যদি ব্রাহ্মণ হন, তাহলেও তিনি স্বল্পকাল আগে বাংলাদেশে আসা বা আগত ব্রাহ্মণের বংশধর মাত্র। ঈসা খাঁ ছিলেন এলাহাবাদ অঞ্চলের লালা জাতীয় বেণে কালিদাস গাজদানীর ওরফে রাজা সোলেমানের পুত্র আর কুমিল্লার দেবেরা, পূর্ববঙ্গের বর্মণেরা কোচেরা কেউ বাঙালী ছিলেন না। এঁরা বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চলের মোঙ্গলগোষ্ঠীভুক্ত।

প্রঃ বাঙলা নতুন শতকের সূচনার প্রাক্কালে আপনার কাছে জানতে চাইছি বাঙালী জাতিসত্তার বিকাশ কতটুকু ঘটেছে এবং বাঙালীর ভবিষ্যৎ কী?

উঃ দু'হাজার বছর আগে থেকেই এখনকার অস্ট্রিক-দ্রাবিড়, বংশীয় লোকেরা পরাক্রান্ত বিদেশী শাসকের অধীনতা ও বশ্যতা স্বীকার করে শাসকগোষ্ঠীর প্রভাবে শাসকগোষ্ঠীর ধর্ম, দর্শন, ভাষা, জীবনযাপন পদ্ধতি গ্রহণ করে শাসকগোষ্ঠীর আদলেই নিজেদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক জীবন রচনা করেছে। সে কারণেই যারা বিদেশী শাসকের বশ্যতা স্বীকার না করে পালিয়ে গেছে অরণ্যে–সেই সাঁওতাল, হো, মুন্ডা, পাঙ্খা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভৃতি বাঙালীর জ্ঞাতিরা এখনো অনুন্নত বনমানুষ। কাজেই উত্তর-পশ্চিমের বাঙালীরা মৌর্য, সুঙ্গ, কণ্ব, গুপ্ত, পাল, সেন-দেরে প্রভাবে এবং দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের বাঙালীরা দেব, বর্মণ, চন্দ্র প্রভৃতি মোঙ্গল বংশীয়দের প্রভাবে, অবশেষে তুর্কী, মুঘল ও ইংরেজের প্রভাবে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে মনে-মননে-মনীষায় এবং সাহিত্যে, শিল্পে স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, দর্শনে বিজ্ঞানে আজকের দিনের সভ্যতার সংস্কৃতির স্তরে উন্নীত হয়েছে। এই দিক দিয়ে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ বাঙালীর অনুকৃত জীবনেও গৌরব-গর্ব করবার মতো কৃতি জ্ঞাপক অবদান রয়েছে। বাঙালীরা রক্তসঙ্কর মানুষ। আত্মীকৃত, আত্তীকৃত ও স্বীকৃত সংস্কৃতি-সভ্যতা-আচার-মননই তাদের এক প্রকারের মৌরসী সম্পদ।

প্রঃ বাংলা গদ্যের ইতিহাস বা বিকাশ কাল সম্পর্কে গবেষকদের ভেতর মতভেদ আছে। বাঙলা ভাষার একজন গবেষক হিসেবে আপনার কাছে আমরা এ ব্যাপারে স্পষ্ট অভিমত আশা করছি।

উঃ এ রকম প্রশ্নের কোনো মূল্য বা গুরুত্ব নেই। সহজেই ধরে নেয়া যায় যে মানুষ চিরকালই গদ্যে কথা বলেছে। কেবল আদিকালে পৃথিবীর সব ভাষায় সহিত্য রচনা শুরু হয়েছে ধাঁধায় এ ছড়ায়। পদ্যে রচিত কাব্য-কবিতা দিয়েই পৃথিবীর সর্বত্র সাহিত্যের শুরু। আমাদের দেশেও মানুষ যখন সাক্ষর হয়েছিল তার চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজ গদ্যের ভাষাতেই লিখত এবং তা স্বাভাবিক কারণেই কিছু আঞ্চলিকতা দুষ্ট থাকত। আর কিছু শাস্ত্রীয় নিবন্ধও গদ্যে লিখিত হয়েছিল। কেননা প্রশাসনের ও পত্রিকার ভাষারূপে বাঙলা গদ্য চালু হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রকাশিত গ্রন্থের অনুপ্রেরণায় ও অনুকরণে কোলকাতা শহরে বন্দরে অন্যান্য বাঙালীরাও পত্রিকায় ও গ্রন্থে বাঙলা গদ্য লিখতে থাকেন। ফোর্ট উইলিয়াম প্রতিষ্ঠিত হবার আগেও অবশ্য বাঙলা গদ্য শেখা বা শেখানোর এবং লেখার প্রাশাসনিক প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী'র হেলহেডের ব্যাকরণ লেখার প্রয়াস, জোনাথন ডানকানের আইন গ্রন্থ অনুবাদ প্রভৃতি এই সূত্রে স্মরণীয়। আমরা সাধারণভাবে উইলিয়াম কেরী, রামবসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখকেই বাঙালী গদ্যের কেজো কাঠামো তৈরীর কৃতিত্ব দিয়ে থাকি।

প্রঃ বর্তিমানে বাংলাদেশে বাঙলা ভাষা চর্চার অবস্থান কোথায়? এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন এমন ৫ জনের নাম বছর কয়েক আগে এক সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছিলেন। এই তালিকায় সংযোজিত হওয়ার মতো ভাষাবিদ কি আরো আমরা পেয়েছি? যাঁদের কথা আপনি বলেছিলেন তাঁরা তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে কতটুকু পারদর্শিতার স্বাক্ষর রাখছেন?

উঃ আমি ভাষা চর্চার কথা বলিনি। তখন যাঁরা গবেষণায় এবং মননশীলতায় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন কেবল তাঁদের কথাই বলেছিলাম। ভাষার ইতিহাস ও ভাষার গঠন প্রকৃতির চর্চা যাঁরা করেন তাঁদের এ কালে লিংগুইস্ট বা ভাষাবিজ্ঞানী বলা হয়। আমাদের দেশে সে-রকম ভাষাবিজ্ঞানী প্রায় আট দশ জন, তাঁরা সবাই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আর সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অনেকেই শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন, তাঁদের পাঠকের সংখ্যাও অনেক। লেখকদের মধ্যে মন্দ মাঝারিই বেশি। বাংলাদেশের বাইরেও নাম ছড়িয়ে পড়েছে তেমন লেখকের অর্থাৎ বাঙলা ভাষার নাট্যকার, গল্প-লেখক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঔপন্যাসিক, কবির নাম দুর্লভ ও দুর্লক্ষ্য, তবে শামসুর রাহমান, বদরুদ্দিন উমর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হাসান আজিজুল হক প্রমুখ কয়েকজনের নাম সগর্বে করা যায়।

প্রঃ গবেষণামূলক বাঙলা সাহিত্য চর্চা বর্তমান বাংলাদেশে কতটুকু হচ্ছে?

উঃ এখানে অনেকেই সাহিত্যের নানা বিষয়ে গবেষণা করে দেশে ও বিদেশে পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করছেন, কিন্তু সবাই সমমানের বিদ্বান নন। এবং অধিকাংশ অভিসন্দর্ভ প্রত্যাশিত মানের নয়।

প্রঃ বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদান অসামান্য। রবীন্দ্রনাথ অত্যাচারী জমিদার ছিলেন কি ছিলেন না এ বিতর্ক তুলে তাঁর অবদানকে খাটো করা কতটুকু যৌক্তিক? যে গদ্যে রবীন্দ্র বিরোধিতা করা হয় সেই গদ্যও কি তাঁর গদ্যেরই ভিন্নরূপ নয়? এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

উঃ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নির্মোহ তথ্যভিত্তিক আলোচনার দিন এখনো আসেনি। এক সময় কমিউনিস্টরা রাজনৈতিক মতলবে রবীন্দ্র সাহিত্যের মূল্যায়নের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এখনো রবীন্দ্রনাথের ভক্ত স্তাবক এতোবেশি যে রবীন্দ্র অবদানের ও চরিত্রের যথার্থ মূল্যায়ন সহ্য করবার লোক দেশে বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। আমাদের পক্ষে এ ক্ষেত্রে আগামী প্রজন্মের জন্যে অপেক্ষা করাই শ্রেয়।

প্রঃ বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানও অসামান্য। বলা হয়ে থাকে বঙ্কিম সাম্প্রদায়িক ছিলেন। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

উঃ আমার ধারণা বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত নাস্তিক ছিলেন। পরে অসুস্থ ও গীতাভক্ত বঙ্কিম ধার্মিক ও হিন্দু-পুনরুজ্জীবনবাদী হয়ে ওঠেন। আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণীতে 'মুসলমান' অভিধায় দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় অসমর্থ মুঘলদের নিন্দা আছে বটে, তা ক্ষোভ, ক্রোধ, ও হৃত-স্বাধীনতার জ্বালা-প্রসূত বলেই আমার মনে হয়। সাম্প্রদায়িক মনের প্রকাশ নয়। কেননা 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে 'রাজসিংহ' অবধি প্রত্যেক উপন্যাসেই অনেক অনিন্দ্য মুসলিম চরিত্র তৈরি হয়েছে এবং তাঁর প্রবন্ধাবলীতে হিন্দু-মুসলিম অবিশেষ বাঙালীর কথা আছে। আরো আছে পাঠান রাজত্বে বাঙালীর স্বাধীনতার স্বীকৃতি। তাঁর সম্বন্ধে লেখা এ বিষয়ে অন্যত্র আমার গ্রন্থভুক্ত সাত-আটটি প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

প্রঃ স্বৈরাচারী এরশাদের পতনের পর জনগণের প্রত্যাশা ছিলো দেশে গণতন্ত্র আসবে কিন্তু হতাশ হতে হয় পূর্বের সরকারের কার্যকলাপ বর্তমান সরকারের আমলেও ঘটতে দেখে। সমাজে যদি গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা না ঘটে, তাহলে ৩৩০ জন সংসদ সদস্যের পক্ষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা কি সম্ভব?

উঃ দেশের সব মানুষ স্বাক্ষর কিংবা অন্য প্রকারে স্বশিক্ষিত, দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সচেতন না হলে গণতন্ত্র শাসনতন্ত্র হিসাবে প্রত্যাশিত ফল দান করে না। আমরা উনিশ শতকের য়ুরোপে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে গণতান্ত্রিক দেশগুলোতেও নানা বিশৃঙ্খলা দেখেছি। দারিদ্র্যক্লিষ্ট নিরক্ষর জনগণের আধিক্য রয়েছে বলেই আফ্রো-এশিয়ার ও লাতিন আমেরিকার অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোতে তথাকথিত গণতন্ত্রের নামেও জঙ্গীনায়কের শাসন চলে। ভারত বিশাল বলে সেখানে কখনো জঙ্গীশাসন চলতে পারবে না। আর আমাদের দেশ অনুন্নত বলেই এখানে কার্যত ১৯৫৮ থেকেই জঙ্গীশাসন চলছে। আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে তথাকথিত গণতন্ত্র হচ্ছে শ্রাবণের মেঘভাঙা রোদের মতো স্বল্পকাল স্থায়ী। এই অশিক্ষা-আকীর্ণ ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট বাংলাদেশে জনগণের অজ্ঞতা ও অসামর্থ্যের সুযোগে শাসকমাত্রই স্বেচ্ছা ও স্বৈরাচারী হয়-ই। এ জন্যেই আমাদের বি,এন,পি সরকারকে গণতান্ত্রিক সরকার বলি না, বলি জনগণের ভোটে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভোটতান্ত্রিক সরকার। কাজেই এদের কাছে মাটি ও মানুষ প্রেমীর মতো নির্মোহ ও নিরপেক্ষ শাসন প্রত্যাশা করা যাবে না। এ কারণেই আমার কোনো ক্ষোভ নেই। আমাদের সুদিন আসবে আগামী প্রজন্মের কালে। যখন মানুষ সাক্ষর ও রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে স্ব-শিক্ষিত ও স্বাধিকার-সচেতন নাগরিক হয়ে উঠবে। তেমন অবস্থায়ই কেবল গণতন্ত্র প্রত্যাশিত ফল দিতে পারে।

প্রঃ সোভিয়েতে সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। মার্কসীয় দর্শনকে কি আপনি ব্যর্থ বলবেন? সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি?

উঃ মার্কসবাদের মূলতত্ত্ব হচ্ছে প্রত্যেক মানুষেরই রয়েছে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার এবং রাষ্ট্রবাসী মানুষমাত্রকেই খোর-পোশ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সরকারের। কাজেই এই মার্কসবাদের কোনো বিকল্প নেই। মার্কসবাদ হচ্ছে মানুষ নির্বিশেষের মুক্তি-সনদ। য়ুরোপে মার্কসীয় ব্যবস্থাবিপর্যয়ের কারণ অনেক। তার মধ্যে শাসকগোষ্ঠীর অযোগ্যতা ও কর্তব্যে অমনোযোগিতাই প্রধান। যেমন সোভিয়েত রাশিয়ার সরকার ছিল সাম্রাজ্যবাদী। ঘরের লোককে পালনই তার মুখ্য লক্ষ্য ছিল না। আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অস্ত্র বানানো, পূর্ব-য়ুরোপ দখলে রেখে বৈশ্বিক রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করা, অস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে বিপুল ব্যয়ে প্রতিযোগিতা এবং নভঃঅধিকারেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি করে দেশের মানুষকে সত্তর বছর ধরে অভাবদুষ্ট ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট করে রেখেছিল। পতন এলো ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ জনগণের হুজুগে দ্রোহের ধাক্কায়।

প্রঃ মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব কি?

উঃ শিল্পে কোনো মার্কসীয় পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। জীবনের প্রয়োজনেই সাহিত্য-শিল্প-দর্শন-জীবিকা ব্যবস্থা-প্রকৌশল-প্রযুক্তি প্রভৃতি সবই মানব উৎপাদিত, নির্মিত ও রচিত। কাজেই শোষিত পীড়িত নির্যাতিত অধিকারবঞ্চিত ক্লিষ্ট মানব-মুক্তির পথ-পদ্ধতি বিষয়ক রেখা ও লেখাই হচ্ছে সাহিত্য ও শিল্প, আর এ বিষয়ক তাত্ত্বিক চিন্তা ও চেতনাই হচ্ছে দর্শন। এই মানবিক বা মানবতাবাদীর প্রয়াসপ্রসূনকে মার্কসীয় বলার কোনো সার্থকতা নেই। গণমানবমুক্তিই তো সব কলাচর্চার লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রঃ একাত্তরের গোলাম আজম বিষয়ে গণআদালতের রায় কার্যকর করা কি সম্ভব? সরকার রায় কার্যকর না করলে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কিমিটির কাজ কী হবে?

উঃ গণআদালতীরা গোলাম আজমের অপরাধের গুরুত্ব এবং দেশে তার স্থিতির অশুভ পরিণামের কথা জনগণের দৃষ্টিতে এনেছে মাত্র। এর পরিণাম ফল দেশের জনগণের সামষ্টিক, সামূহিক ও সামগ্রিক অঙ্গীকারের ও নিষ্ঠ আন্দোলনের সাফল্যের ও ব্যর্থতার উপর নির্ভর করছে।

প্রঃ সারা পৃথিবীতে নাস্তিক্য দর্শন এখন কতটুকু প্রভাব বিস্তার করছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঃ মানুষের স্বভাব এই যে মানুষ কোনোটা জেনে-বুঝে বরণে আগ্রহী হয় না। শুনে শুনেই কেবল পছন্দসই মত পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করে। এ জন্যেই মানুষ আশৈশব শোনা পারিবারিক শাস্ত্রিক ধর্ম সারা জীবন না-জেনে না-বুঝেও সাধ্যমত ও সময়মত মেনে চলে। মার্কসবাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তা-ই ঘটেছে। বাহ্যত যারা মার্কসবাদ বরণ করেছিল কিংবা পছন্দ করেছিল তারা সবাই ছিল নাস্তিক। সেদিক দিয়ে একালের পৃথিবীর পাঁচ ভাগের দুই ভাগ লোকই ছিল নাস্তিক। এখন স্বদেশে ও বিদেশে অনেককেই পিতৃপুরুষের শাস্ত্রিক ধর্মের আনুগত্য স্বীকার করতে দেখা যাচ্ছে। ওরা শুনে শুনে মার্কসবাদী হয়েছিল। যারা জ্ঞান-যুক্তি প্রয়োগে কিংবা জেনে-বুঝে মার্কসবাদী হয়েছিল, তারা নাস্তিকই আছে। আর অমার্কসবাদীদের মধ্যেও যারা জ্ঞান-যুক্তি প্রয়োগে শাস্ত্র যাচাই করে নাস্তিক হয়েছে, তারাও সারাজীবন নাস্তিক থাকবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তির বিকাশে সারা পৃথিবীর মানুষের অধিকাংশ ক্রমে আস্তিক্য পরিহার করে নাস্তিক হবে। নাস্তিক হতে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তির সঙ্গে সাহসেরও প্রয়োজন।

প্রঃ প্রথার বিরোধিতা করতে গিয়ে, অন্যায়-অনাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয় কিনা?

উঃ মানুষ মূলত প্রাণী–প্রজাতির অংশ হিসাবে মুখ্যত বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত হয়। এজন্যেই লাখে নিরানব্বই হাজার নয়শ নিরানব্বই জনই লাভ-লোভ ও স্বার্থ সচেতন জীবন মাত্র অর্থাৎ জৈবধর্মের অনুগত। তাই মানুষের মধ্যে প্রায় সবাই ক্ষতিভীরু ও লাভ-লিপ্সু। দলে, তালে ও হুজুগে না পড়লে জান-মাল-গর্দান হারাবার ঝুঁকি সাধারণত কোনো ব্যক্তিবিশেষ নিতে চায় না, কাজেই জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তি-সাহস এবং শ্রেয়ো চেতনায় চালিত কোনো ব্যক্তি বেপরোয়া হয়ে প্রতিবাদে প্রতিকারে প্রতিরোধে এমনকি প্রতিশোধে কথায় কিংবা কাজে অগ্রসর হতে চায়, তার ডাকে অন্যরা সাড়া না দিলে সেও নিজেকে অসহায় ও ব্যর্থ বলে মনে করে। এজন্যে সাধারণ মানুষ জীবনকে 'স্ট্রাগল' মনে করলেও শ্রেয়স খোঁজে 'কম্প্রোমাইজে'– এরা কখনো জীবনকে 'রেজিস্ট্যান্স' মনে করে না। মানবিকগুণের একজন প্রাগ্রসর মানুষের চেতনায় জীবন হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স। তেমন মানুষ নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও আপোস করে না। লড়ে যায় প্রতিবাদে প্রতিকারে প্রতিরোধে। মৃত্যু বরণই শ্রেয়স মনে করে। তেমন মানুষ দুর্লভ ও দুর্লক্ষ্য বলেই মানবতার আদর্শ হয়ে রয়েছে।

প্রঃ সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেই সম্প্রতি আপনি অধিক সক্রিয়, এতে আপনার লেখালেখি ও গবেষণা কি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

উঃ প্রথম কথা ১৯৫৮ থেকেই আমি সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক সমকালীন চিন্তা-চেতনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছি। সে-প্রয়োজনে এ ধরনের আন্দোলনে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সাড়া দিয়েছি। আমার লেখায় ও বিভিন্ন সভা সেমিনারে আমার বক্তৃতায় এবং বিভিন্ন সংকট-সমস্যা ও দাবি সম্পৃক্ত বিবৃতিতে আমার অসংখ্য স্বাক্ষর রয়েছে। কাজেই সম্প্রতি আমি কোথাও নিজেকে নতুনভাবে জড়াইনি। কোনো আন্দোলনে আমার সংযোগ আমার লেখা-পড়ার ব্যাঘাত হয়ে দাঁড়ায়নি কখনো। এজন্যেই আমি বহু গবেষণা কার্যে নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পেরেছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটো গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য ঃ

মার্কসবাদ হচ্ছে মানুষ নির্বিশেষের মুক্তি-সনদ।

য়ুরোপে মার্কসীয় ব্যবস্থাবিপর্যয়ের কারণ অনেক। তার মধ্যে শাসকগোষ্ঠীর অযোগ্যতা ও কর্তব্যে অমনোযোগিতাই প্রধান।

বাঙালী ও বাঙলাদেশী দুটোই রাজনীতিক মতের ও মতলবের-চালবাজির প্রতিম, প্রতীক ও প্রতিভূ হয়ে রয়েছে। আমাদের মতে, এই দ্বন্দ্ব যখন থিতিয়ে যাবে অর্থাৎ লোপ পাবে, তখন বাংলাদেশের বাঙলাভাষী মাত্রই পরিচিত হবে বাঙালী বলে।

সহযোগিতা: হামিদ কায়সার

‘সমাজতন্ত্রের ও মার্কসবাদের কোন বিকল্প আজ অবধি নেই’

[সমকালীন সময়ের নির্ভীক, প্রতিবাদী এবং অগ্রণী বুদ্ধিজীবী পুরুষ আহমদ শরীফ। তাঁর ঋজু এবং ধারালো লেখা-বক্তৃতা-বিবৃতি যে কেবল দেশের ধর্মব্যবসায়ী মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে ভয়ের বস্তু, তা-ই নয়, তা দেশের বর্ণচোরা বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেকার মতলববাজ, দেশপ্রেমহীন, জনগণের প্রতি মমত্ববোধহীন তথা মনুষ্যত্ববোধহীন লোকদের কাছেও সমান অস্বস্তির।

তাঁর মানবতাবাদী ও বস্তুতান্ত্রিক দর্শন, সুগভীর বিজ্ঞানমনস্কতা, জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি ও মনীষার প্রতি প্রখর অনুরাগ ও অনুশীলন, গণমুক্তির লক্ষ্যে জনমত গঠনের জন্য নিবেদিত তাঁর ক্ষুরধার লেখনী, স্পষ্টবাদী ভাষণ, প্রত্যক্ষ গণ-সম্পৃক্ততা, আপোসহীন চিত্ত এবং দুর্লভ সারল্য দেশপ্রেমিকদের অনুকরণীয়। ১৯৫৮ সাল থেকেই তিনি দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সমকালীন চিন্তা-চেতনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন। সে-প্রয়োজনে যে-কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাড়াও দিয়ে আসছেন। এজন্য তিনি গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক শক্তি ও ব্যক্তিদের কাছে পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র।

আহমদ শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব শিক্ষক, পণ্ডিত ও গবেষক। জন্ম তাঁর চট্টগ্রামের পটিয়ার সুচক্রদণ্ডী গ্রামে, ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯২১ সালে। মননশীল প্রবন্ধ রচনা সাহিত্যের গবেষণা কর্মে তিনি এখনও সক্রিয়। এ পর্যন্ত তাঁর নবীবংশ, হযরত মুহম্মদ চরিত, কিফায়তুল মুসল্লিন, তোহফা, নসিয়তনামা, লায়লী মজনু, সিকান্দারনামা, বাঙলার সুফী সাহিত্য, বাউলতত্ত্ব প্রভৃতি সম্পাদিত ও স্বরচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৭০টি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: স্বদেশ অন্বেষা, বাঙলা ভাষার সংস্কার আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতা ও সময়ের নানাকথা, মানবতা ও গণমুক্তি, জাগতিক, চেতনার বিচিত্র প্রসূন, বিচিত চিন্তা, যুগ যন্ত্রণা, জীবনে-সমাজে-সাহিত্যে, প্রত্যয় ও প্রত্যাশা, কালিক ভাবনা, কালের দর্পণে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বদেশ, ইদানীং আমরা, বাঙালীর চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চালচিত্র।

অক্টোবরের (১৯৯২ সনের) গোড়াতে সেবা-প্রতিনিধিকে দেয়া তাঁর সাক্ষাৎকারটি এখানে পত্রস্থ করা হল।]

প্রশ্ন ঃ এদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রগতিশীল-প্রতিক্রিয়াশীল শব্দ দুটি বহুল উচ্চারিত। আপনার দৃষ্টিতে এটা বিচারের নিরিখটা কি?

আহমদ শরীফ ঃ প্রগতিশীল প্রতিক্রিয়াশীল নিরূপণের নিরিখ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কেননা আমরা জানি রেনেসাঁস ও রিভাইব্যালিজম বলে দুটো শব্দ আমাদের মধ্যে বহুকাল আগে থেকেই চালু রয়েছে। যারা উপযোগরিক্ত পুরাতন বর্জনে অর্থাৎ অতীতমুখিতা ও ঐতিহ্য প্রভৃতিকে সমকালীন মন-মননের পক্ষে কেবল বাধা স্বরূপই মনে করে এবং নতুন ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণকে ঠাঁই করে দেবার জন্য পুরাতনকে ছিন্নবস্ত্রের মত অনায়াসে বর্জনে উন্মুখ তাঁরাই প্রগতিশীল। প্রগতিশীলরা সাধারণভাবে স্বকালের ও সমকালের জগতের ও জীবনের চাহিদানুগ জীবন রচনায় উৎসুক। এরা জানে জীবনের গতি সম্মুখ দিকে, পশ্চাতে নয়, অতীতে নয়, ঐতিহ্যে নয়, অতীতমুখিতায় নয়। প্রাণী মাত্রেরই গতি সম্মুখ দিকে, মানুষেরও চোখ-হাত-পা সম্মুখ দিকে চলার জন্যই অঙ্গে সংলগ্ন। যাঁরা মনে-মননে রক্ষণশীল, অতীত ও ঐতিহ্য নয় কেবল, অতীতের নীতি-নিয়ম-নীতি-রেওয়াজ-প্রথা-পদ্ধতি-আচার-আচরণ প্রভৃতিও যাদের প্রিয়, যারা মানসিকভাবেও নতুন ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত নয় বরং বস্তুগত (যেমন প্রাত্যহিক জীবনের সহায়ক যন্ত্রাদি সামগ্রী) না হলে কিছুই গ্রহণ করতে চায় না, তারাই প্রতিক্রিয়াশীল। তারা বর্তমান সময়ে বাস করেও মানসিক দিক থেকে সমকালীন নয়। তারা অতীতমুখী, অতীতের ধ্যানধারণাই তাদের পুঁজি ও পাথেয়। পুরাতন-প্রীতি এবং নতুন-ভীতি তাদের স্বস্তির কারণ ও সম্বল। প্রতিক্রিয়াশীলরা সব সময়ই রিভাইব্যালিস্ট (পুনরুজ্জীবনবাদী), প্রগতিশীলরা সব সময়ে নবচেতনাবাদী।

প্রশ্ন ঃ সমাজের অগ্রগামী সচেতন অংশ হিসেবে সবদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের থাকে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। এদেশে বুদ্ধিজীবীদের হেয় করার উদ্দেশ্যে বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা নিয়ে নানা রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে আপনার নিজস্ব অভিমত কি?

আঃ শঃ ইংরেজীতে শব্দ আছে ইনটেলেকচ্যুয়াল এবং ইনটেলেজেন্টসিয়া। প্রথমটার সহজ অর্থ মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তি বা মনীষী। ইনটেলেজেন্টসিয়া হল যে-কোনো শিক্ষিত 'সাফকাপুড়ে' লোক। ইংরেজীতে বলা চলে 'এডুকেটেড হোয়াইট কালার পারসন।' এই সংজ্ঞা ও সংজ্ঞার্থ প্রয়োগে আমরা সহজেই বলতে পারি উচ্চমার্গের আবিষ্কারক, উদ্ভাবক ও সৃষ্টিশীল, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও সাহিত্যিক প্রমুখ অনন্য ও অসামান্য শক্তিধররাই মনীষী বা ইনটেলেকচ্যুয়াল। আর সাধারণ অর্থে বিশেষ মানের যেমন স্নাতক মানের শিক্ষিত মাত্রই ইনটেলেটেজন্টসিয়া বা বুদ্ধিজীবী। আমরা বাঙলাভাষায় সাধারণভাবে স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত অর্থাৎ সরকারী চাকুরে নয়, বাকস্বাধীনতা প্রয়োগে সমর্থ উকিল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, সাংবাদিক প্রভৃতিকে এবং রাজনীতিকদের ঢালাওভাবে 'বুদ্ধিজীবী' নামে অভিহিত করে থাকি। আসলে এঁদের মধ্যে যারা জীবন-সমাজ-সংস্কৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং আর্থ-রাজনীতিক, জীবন সম্পর্কে সচেতন এবং প্রয়োজন মতো কথা বলতে সমর্থ তাঁদেরকেই আমরা বুদ্ধিজীবীরূপে চিহ্নিত করি। আসলে এঁদেরকে মস্তিষ্কজীবী বা মগজজীবী বলাই বাঞ্ছনীয়। বুদ্ধিজীবী শব্দটার কোনো বিশেষ অর্থ নেই, কেননা প্রাণীমাত্রই বুদ্ধিকেই পুঁজিপাথেয় করে চলে।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে বাম ও ডান রাজনৈতিক অঙ্গনে বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিতদের (অল্পসংখ্যক ব্যতিক্রমীজন বাদে) অধিকাংশকেই দেখা যায় নানান ভণ্ডামী এবং ধান্দাবাজিতে তৎপর। এরা সহজেই প্রলোভনে সাড়া দেয়, ভয়ে বিচলিত হয় এবং সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করে। এদের এই মেরুদণ্ডহীনতার উৎস কোথায়?

আঃ শঃ কথায় বলে দারিদ্র্য দোষ মানুষের সব গুণ নষ্ট করে। আমাদের বাংলাদেশীরা দু'হাজার বছরের দরিদ্র লোকের বংশধর। শিক্ষায়-সংস্কৃতিতেও তারা ভুঁইফোঁড়। এদেশে শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষ এসেছে শহরে-বন্দরে আর্থ-সামাজিকভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে। যে-আর্থিক সাচ্ছল্য ও শৈক্ষিক ঐতিহ্য থাকলে মানুষের মধ্যে অপরিহার্যভাবে ন্যূনতম আত্মসত্তার মূল্য-মর্যাদাবোধ ও আত্মসম্মান চেতনা জাগে, তা আমাদের শ'তে ৯৯ জনের পারিবারিক পরিবেশে উপস্থিত ছিল না। ফলে আমরা ধনে-মনে কাঙাল ছিলাম। অনেকের ধনে কাঙালপনা ঘুচলেও মনে কাঙালপনা ঘোচার প্রতিবেশ সৃষ্টি হয়নি। ফলে ১৯৪৭ থেকে দুই পুরুষ ধরে আমাদের শিক্ষিত জনগণও বেচশম-বেহায়া-বেশরম-বেআদম-বেদানাই-বেলেহাজ-বেল্লিক রূপে কেবল লাভে-লোভে ও স্বার্থে প্রায় দিশেহারা হয়ে যুক্ত-বুদ্ধি-বিবেচনা বিসর্জন দিয়ে ছুটোছুটি করেছে। এ কারণেই এবং এর ফলেই আমাদের শ'তে ৯৯ জন শিল্পী-সাহিত্যিক-উকিল-ডাক্তার-শিক্ষক-সাংবাদিক-রাজনীতিক, এক কথায় প্রায় শহুরে শিক্ষিত লোকই মন বদলায়, ঢং বদলায়, রং বদলায়, মত বদলায়, পথ বদলায়, ভোল পাল্টায়, বোল বদলায়, ঘন ঘন দলছুট হয়। এজন্যেই আজও আমাদের জীবনে কোনো নীতি-আদর্শের প্রতি অনুরাগ-অনুগামিতা ও আনুগত্য দানা বেঁধে বাস্তবরূপ পাচ্ছে না। আমাদের অধিকাংশ মানুষ চৌর্যপ্রবণ, মিথ্যাশ্রয়ী। আমাদের সরকার ভিক্ষাজীবী ও দলীয়ভাবে লুণ্ঠপ্রবণ। এজন্যেই আমাদের এখানে চরিত্রবান, আদর্শবান রাজনীতিক নেতা, দল ও বুদ্ধিজীবী গড়ে উঠছে না, কিন্তু এই দু'পুরুষে অর্থবিত্তবান ধনী-মানী খ্যাতি-ক্ষমতাবান একটি শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে উঠেছে, তৃতীয়-চতুর্থ প্রজন্মে তাদের সন্তানই সত্তার মূল্য-মর্যাদাবোধে ঋদ্ধ হয়ে বিবেকবান, দেশপ্রেমিক ও জনসেবী, পরার্থপর, রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-সাহিত্যিক-দার্শনিক হবে। আমরা তাদের ভরসায় ও প্রতীক্ষায় থাকব। এমন মানুষের কাছে জ্ঞানের চেয়ে মান বড় থাকবে, তার চেয়ে বড় থাকবে বিবেকের স্বাধীনতা।

প্রশ্ন ঃ একজন প্রতিবাদী ও প্রথাবিরোধী বুদ্ধিজীবী হিসেবে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

আঃ শঃ আমি জীবিকা অর্জনে জীবনযাপনের মতলব নিয়েই জীবন শুরু করি। কাজেই আমি আমার পরিবারের সেবার ব্রতই গ্রহণ করেছি মাত্র। তবে একটা প্রাণী যেমন খাদ্য গ্রহণের ফাঁকে ফাঁকে আকাশের দিকে তাকায়, আমিও তেমনি সমাজের একজন সদস্য হিসেবে আমার প্রাত্যহিক জীবনের অবসর সময়ে মানুষের, সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রতি আমার সাধ্যমত দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বীকার করবার চেষ্টা করেছি। আমার সাধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকলেও অন্য কোনো সাধ্য ছিল না বলে আমি আমার জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগে লেখার মাধ্যমে গণকল্যাণ-চেতনা জাগানোর চেষ্টা করেছি। আমার বিদ্যা-বুদ্ধির মান উঁচু ছিল না বলে হয়তো লোকগ্রাহ্য কিছু লেখা সম্ভব হয়নি। তবে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি 'আকাশেতে আমি রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস, তবু উড়েছিনু এই মোর উল্লাস।' আমার তৃপ্তি হচ্ছে চেষ্টা করার তৃপ্তি।

প্রশ্ন ঃ মানবতাবাদের প্রবক্তা হিসেবে এদেশে উচ্চারিত আপনার নামটি। বুর্জোয়া মানবতাবাদের সঙ্গে আমরা পরিচিত। আপনার প্রচারিত মানবতাবাদের স্বরূপটি কেমন?

আঃ শঃ মানুষ যৌথজীবন যাপন করে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বাত্মক ও সর্বার্থভাবে সে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারে। তার দুটো হাত আছে। এই হাত দুটোই তার সর্বপ্রকার মানসিক ও ব্যবহারিক শক্তির উৎস। মানবতার উদ্ভবও এই মানসে-ই। মানুষের প্রতি অনুরাগ, দুঃস্থ মানবতার প্রতি কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য-সাহায্য-সহায়তা-সেবায় ও প্রীতিতে মানবতার প্রকাশ। কাজেই মানবতাবোধ মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। এর উদ্ভব ও বিকাশ, গভীর অনুভব, ব্যাপক উপলব্ধি এবং পরিশীলিত হৃদয়বৃত্তি থেকে। কাজেই হৃদয়বান মানুষ মাত্রই পরদুঃখকাতর সহানুভূতিশীল ও দরদী। এই মানবতাবোধের উৎসে অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও শ্রেণী সচেতন অহংসর্বস্ব বুর্জোয়ারা একে কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য রূপে দুঃস্থ মানবের প্রতি বর্ষণ করে এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করে এবং আসমানী পুণ্য প্রত্যাশা করে। এই কাজ তাদের পক্ষে দায়িত্বের ও কর্তব্যের অন্তর্গত নয়, প্রশংসাযোগ্য উদার হৃদয়বানতা মাত্র। এভাবে তারা কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য বর্ষণ করে দুঃস্থ মানুষের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা আদায় করে। এভাবে তারা মানবতাবোধের অবমূল্যায়ন করে।

আর মানুষকে না ভালবাসলে মানুষের দুঃখে ও দুঃস্থতায় বিচলিত না হলে কেউ মার্কসবাদী হতেই পারে না। মার্কসবাদী মাত্রই পরার্থপর মানবদরদী এবং মানবসেবী। মার্কসবাদই ব্যক্তি মানুষের সত্তার মূল্য ও মর্যাদা স্বীকার করে মানুষমাত্রকেই তার স্বাধিকারে স্বস্তিতে স্বপ্রতিষ্ঠ দেখতে চায়। কেন না মার্কসবাদী মানুষ নির্বিশেষে ব্যবহারিক জীবনের সাম্যে দৃঢ় আস্থা রাখে। অন্ধ পাগল পঙ্গু মানুষমাত্রেরই খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার স্বীকার করে এবং এঁদের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব ও কর্তব্য যে রাষ্ট্রের তা জানে, বোঝে ও মানে। এ জন্যেই তার মানবতা তার দায়িত্বের ও কর্তব্যের অন্তর্গত। এ তাৎপর্যে সে কাউকে অনুগ্রহ করে না বলে কৃতজ্ঞতা পাবার দাবিদার নয়। পক্ষান্তরে সমস্ত বুর্জোয়ারা দানধর্ম করে মানুষের উপকার করে সমাজের প্রশংসিত হবার জন্যে, সুনাম অর্জনের জন্যে এমনকি ভোট পাবার জন্যে এবং ফাউ হিসেবে পুণ্য অর্জনে স্বর্গসুখ প্রাপ্তির লক্ষ্যে। জাকাত, ফিতরা, সদকা, ভিক্ষা প্রভৃতি হচ্ছে মতলবী মানবতার প্রকাশ। কাজেই সমস্ত বুর্জোয়ার মানবতা নির্ভেজাল, অকৃত্রিম ও নির্দিষ্ট নয়। কিন্তু একজন মার্কসবাদীর মানবতা হচ্ছে তার অপরিহার্য দায়িত্বের কর্তব্যের আবশ্যিক অংশ।

প্রশ্ন ঃ বস্তুতান্ত্রিক দর্শন অবলম্বন করা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয়তা কেন?

আঃ শঃ নাস্তিক্য দর্শনের মূল কথা হল জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি। সাহসী মানুষই নাস্তিক হয়। কাজেই সব কিছুর উপর সে শুধু যুক্তিকেই স্থান দেয় এবং যুক্তিমানা মানুষ বিবেকবান হয়। সে-কারণে নাস্তিক্যবাদীরা আত্মসম্মান সম্পন্ন হয়। সে-আত্মঅবমাননা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে বলে নিন্দনীয় বা শাস্তিযোগ্য কোনো করে না। এই কারণে সে ন্যায়নিষ্ঠ, আদর্শবান তথা চরিত্রবান মানুষ হয়। সে দেখতে-শুনতে-করতে-বলতে যা কিছু কুৎসিত, নিজের বা অন্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তা পরিহার করে চলে। যে-ক্ষতি যে-অকল্যাণ যে-যন্ত্রণা সে নিজের জন্যে কামনা করে না, অন্যের জন্যে তা সে বাঞ্ছা করে না। এই জন্যে আদিকাল থেকে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-মাওসেতুং কিংবা বিশ শতকের রাসেল, বানার্ডশ, সাঁত্র প্রমুখ অবধি আমরা আদর্শ মানব দরদী মানুষের সন্ধান পাই।

আস্তিকতার সাধারণ উৎস হচ্ছে অজ্ঞতা, বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, ভরসাজাত জীবনের সহায় ও শক্তি অদৃশ্য অরি ও মিত্র শক্তির আনুগত্যে বেঁচে থাকার নীতিই হচ্ছে আস্তিকতা। যেহেতু জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে অনীহা, শৈশবে, বাল্যে লব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাচালিত শাস্ত্রিক ও সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি অনুসরণে আচারিক জীবন যাপনে আগ্রহী মানুষই আস্তিক। সেহেতু ভীরুতাই তথা ক্ষতি স্বীকারের অসামর্থ্যই তাকে আস্তিক রাখবে। এজন্যে পৃথিবীতে আস্তিক থাকবে। এ জন্যে পৃথিবীতে আস্তিকের সংখ্যা আরো বহুকাল অধিক থাকবে। নাস্তিক থাকবে স্বল্প সংখ্যায়।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশের বাম বা কমিউনিস্ট আন্দোলন সুদীর্ঘকালের হলেও তা আজও দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এখনো নির্ধারক ভূমিকায় আসতে পারেনি। বাম আন্দোলন বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়গুলো কি কি বলে আপনার ধারণা?

আঃ শঃ বাম আন্দোলন মানে মার্কসবাদী আন্দোলন। সমাজ কাঠামো ও আর্থিক জীবনে আমূল পরিবর্তনের আন্দোলন। যেহেতু কায়েমী স্বার্থবাদীর ধন ও মান কেড়েই কেবল সমাজ পরিবর্তন সম্ভব, সেহেতু প্রবলতম প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার পন্থাই হচ্ছে বামপন্থা। কাড়াকাড়ির এই পন্থা সহিংস না হয়েই পারে না। সেই গণমুক্তির লক্ষ্যে জান-মাল-গর্দান বাজি রেখে এই সংগ্রামে নামতে হয়, হতে হয় নির্ভীক লড়াকু, সেহেতু বিশেষ বয়সের লড়াকু হওয়ার যোগ্য। সেই অবস্থা বাংলাদেশী জনসমাজে এক হিসেবে সৃষ্টি হচ্ছে বা হয়েছে, সেজন্যেই আমাদের আরো কিছুকাল বামপন্থী আন্দোলনের সাফল্যের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এখন গাঁয়ে গঞ্জে শহরে কৃত্রিমভাবে শিক্ষিত অসংখ্য সাফকাপুড়ে বেকার সৃষ্টি হয়েছে। এরা জানে এদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এ মুহূর্তে এদের অনেকেই দিশেহারা ও বেপরোয়া। এরা বাঁচতে চায়। দেশে মার্কসীয় পদ্ধতিতে সমাজকাঠামো পরিবর্তনের জন্যে যোগ্য নেতৃত্বে এই সব কর্তব্যবিমূঢ় দিশেহারা বেপরোয়া যুবশক্তিকে যোগ্য নেতৃত্বে আহবান জানালে এরা আত্মকল্যাণে ও গণমানবের হিতে সামগ্রিক, সামূহিক ও সামষ্টিকভাবে সমাজ-পরিবর্তনের জন্যে লড়াই করতে রাজী হবে। আমাদের দেশে এ মুহূর্তে নেতার ও নেতৃত্বের বড়ো অভাব। অনন্যবুদ্ধি, সৎ ও সাহসী ব্যক্তিই কেবল নেতৃত্বের যোগ্য। কেননা গণমানবের বল, ভরসা ও আস্থার নিশ্চিত অবলম্বন না হলে কোনো মানুষের আহবানে কেউ সাড়া দেয় না। আমাদের দেশে তেমন বামপন্থী কয়েকজন নেতার আবির্ভাব হলে পথ-মতের ও সিদ্ধান্তের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সারাদেশে বিভিন্ন বামপন্থী লড়াকু জনবহুল দল গড়ে উঠবে এ-ই আমার ধারণা। আসলে বলতে গেলে বেকার হতাশ যুবশক্তি যোগ্য ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বের আহবানের প্রতীক্ষায় রয়েছে। ডাক দিতে জানলে নিশ্চয়ই সাড়া মিলবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন ঃ মার্কিনের সাথে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব-বিরোধ বর্তমানে প্রকট রূপ নিচ্ছে। এর চূড়ান্ত রূপ কি হবে বলে আপনি মনে করেন?

আঃ শঃ কার্ল মার্কস প্রায় নিঃসংশয় প্রত্যয় নিয়ে অনুমান করেছিলেন যে পুঁজিবাদের বিনাশ-বিলুপ্তি আসন্ন। বিজ্ঞানের এই আকস্মিক বিচিত্র বিকাশ ছিল তাঁর ধারণাতীত। তাই বিশ শতকেও তাঁর অনুমান বাস্তব রূপ পায়নি। তবে পুঁজিবাদের সঙ্কট ও মৃত্যুর আসন্নতা ক্রমেই আভাসিত হচ্ছে। আজ পশ্চিম য়ুরোপে যে আর্থ-বাণিজ্যিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তাতে তারা এক হিসেবে একক মুদ্রা চালুর মাধ্যমে একক রাষ্ট্রে অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়াসী হয়েছে। এটা মূলত পুঁজিবাদেরই সংকট। কার্যত এই সঙ্কটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দৈত্যও পড়েছে। এর প্রমাণ বড় বড় শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়াত্ব ও বিলুপ্তি এবং আপাতত জাপান-জার্মানের কাছে তাদের হার-মানা-নীতি গ্রহণ। এগুলোই হচ্ছে পুঁজিবাদ ও তৎসংলগ্ন বা উপজাত সামাজ্যবাদের বিলুপ্তির আপাত আভাস।

প্রশ্ন ঃ মার্কসীয় দর্শন এবং সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

আঃ শঃ মার্কস উদ্দিষ্ট মূলতত্ত্ব গোড়া থেকেই অপব্যবহৃত অপযুক্ত হয়ে অনেকখানি বিকৃতি পেয়েছিল। এর মানবিক আনুভূমিক দিক হয়েছিল প্রায় অস্বীকৃত। আমরা জানি এবং মানি যে মানুষের মনন-চিন্তন মানুষের দেহের সম্মুখগতির মতোই এগিয়ে চলে নতুন অনুভব-উপলব্ধির এবং আবিষ্কারের দিকে। সভ্যতা, সংস্কৃতি বিকাশ পেয়েছে এভাবেই, কোথাও কোথাও স্থানিক ও সাময়িকভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনা-মন-মনন বন্ধ্যা থাকে, অবক্ষয়গ্রস্তও হয়। কিন্তু সামগ্রিক, সামষ্টিক ও সামূহিকভাবে মানুষের প্রগতিশীলতা অগ্রগামিতা কখনো থেমে থাকে না। তথা বন্ধ্যারাও অবক্ষয়গ্রস্তরা ও অতীতাশ্রয়ী প্রতিক্রিয়াশীলরা অবশেষে মানব-অবদান গ্রহণে ঋদ্ধ হয়ে এগিয়ে যায়, অতীত ছেড়ে ভবিষ্যতে ভরসা রাখে, বরণ করে দেশকালের প্রয়োজনে বর্তমানের শ্রেয়সকে। তাই আমার দৃঢ় ধারণা মানুষের প্রতি ভালোবাসার প্রসূন প্রতিটি মানুষকে ভাতে-কাপড়ে বাঁচিয়ে রেখে জীবনকে নিজের মতো করে ভোগ-উপভোগের অধিকার দেয়ার যে দায়িত্ব মানবতাবাদী মানুষ অঙ্গীকার ও বাস্তবায়িত করেছে, তার থেকে মানুষ আর পিছু হঠতে পারবে না।

কোথাও না কোথাও, কেউ না কেউ, কোনো না কোনো রাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক-সাম্যবাদী সমাজ বজায় রাখবে। আরো অনেক দরিদ্র অনুন্নত দেশে সমাজ-বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, গড়ে উঠবে মানবাধিকার ও মানব-মর্যাদার স্বীকৃতি-ধন্য বহু রাষ্ট্র ভবিষ্যতে। কেননা মানবিক সমস্যা সমাধানের এ মুহূর্ত পর্যন্ত এ-ই একমাত্র উপায়। বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিতে গুণে, মানে, মাত্রায়, মানুষের অভাবিত-অসামান্য অধিকার বিস্তারের ফলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতে যে-সব সঙ্কট দেখা দেবে বলে কমিউনিস্ট চিন্তক-মনীষীরা প্রায় নিঃসন্দেহে অনুমান করেছিলেন, সেসব ঘটেনি বটে, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির যন্ত্রের ও প্রযুক্তির ক্রমোৎকর্ষের ফলে তা ঘটবে। সে-আলামত দুর্লক্ষ্য নয়। পৃথিবীতে যত বিপর্যয়ই সম্প্রতি ঘটুক না কেন প্রত্যয়দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করতেই হচ্ছে যে সমাজতন্ত্রের ও মার্কসবাদের কোনো বিকল্প আজ অবধি নেই।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ
মুহম্মদ শামসুজ্জোহা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলা ভাষা-সংস্কার

পৃথিবীতে বহু বহু ভাষা এবং বুলি চালু রয়েছে। এ হচ্ছে কালে কালে, স্থানে-স্থানে, জনে জনে উচ্চারণ বিকৃতির বা বিবর্তনের ফল। এ পরিবর্তন-বিবর্তন-বিকৃতি প্রাজন্মক্রমিক এবং অপ্রতিরোধ্য। এভাবেই একই আদি ভাষা বহুবিচিত্র হয়ে জনগোষ্ঠীর অবস্থান পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীময় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। যেমন ইন্দো-য়ুরোপীয় কিংবা ইন্দো-ইরানীয় ভাষার শাখা-প্রশাখা-উপশাখা অথবা আর্যভাষীর কারা কোথায় এ ভাষার উদ্ভাবক-উচ্চারক আজ তা গভীর গবেষণার বিষয়। হাজারো লোকের শ্রম-সময়-মগজ-মেধা-মনীষা-ধৈর্য-অধ্যবসায় নিরবচ্ছিন্ন ও নিরলসভাবে নিয়োগ করা হলেও যে সর্বসম্মত বা সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান বা সত্য-তথ্য মিলবে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।

পৃথিবীর সব মানুষের মৌখিক ও লিখিত ভাষা বাহ্যত আবর্তিত মনে হলেও কার্যত মৃদু-মন্থর গতিতে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত, বিকৃত, বর্ধিত হচ্ছে ও ভাবে-ভঙ্গিতে রূপান্তর পাচ্ছেই। এ তাৎপর্যে পৃথিবীর সব মৌখিক ও লিখিত বা লেখ্য ভাষাই প্রায় সর্বপ্রকারে তথা শব্দে, প্রকাশ-সামর্থ্যে, ভঙ্গির বৈচিত্র্যে, শব্দের ব্যঞ্জনা ও আসক্তি-অভিধা-তাৎপর্য বৃদ্ধিতে উন্নতি, উৎকর্ষ ও বিকাশ-বিস্তার লাভ করছে। অঙ্গে ও অন্তরের হয়েছে ঋদ্ধ।

আমরা অজ্ঞ। তাই যুক্তি-প্রমাণ কিংবা সাক্ষী-সাবুদ হাজির করতে পারব না, তবে ইংরেজীতে যেমন যে-কোনো একটি শব্দের বানান, উচ্চারণ ও অর্থ একরূপ থাকে না, বাঙলায় সংস্কৃতে সেরূপ বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। কেননা এখানে বর্ণমালা ধ্বনি-প্রতীক, ধ্বনির অবিকৃত প্রতিধ্বনি, প্রতিমূর্তি ও প্রতিভূ। ইংরেজীতে S=স, জ, C=চ, ক এমনি আরো বর্ণ উচ্চারিত ও অনুচ্চারিত থাকে। যেমন see, easy, city, can, tough-ফ, know-talk- ভিন্নভাবে উচ্চারিত কিংবা অনুচ্চারিত ইত্যাদি অনেক শব্দ মেলে। অর্থাৎ বানানে-উচ্চারণে বর্ণগুলো এবং লেখায়ও কোনো একক নিয়ম মেনে চলে না। লেখায় বর্ণগুলো capital, small এবং হস্তাক্ষরে বিভিন্ন। ইংরেজী ভাষার বানানেও কালিক পরিবর্তন এসেছে, ষোল-সতেরো-আঠারো শতকের বানানপদ্ধতি এখন অচল ও অপরিচিত। তবু লাতিন শব্দের, ফরাসী শব্দের, বিদেশী শব্দের বানানে ও উচ্চারণে পার্থক্য ঘোচেনি আজও। ওরাও সহজ করার কথা তেমন ভাবে না। আমেরিকা কয়েকটি শব্দ [যেমন– Labor, Program প্রভৃতি] বানান সংক্ষিপ্ত করেছে বটে, কিন্তু Know, Knowledge-এ K.D বাদ দেয়নি, বাদ পড়েনি Talk-এ Wak-এ L।

ইংরেজীতে জ বা 'য' উচ্চারণের জন্যে s.d. g. j. z [Easy, Immediate, Zoo, germ, Joy] রয়েছে আরবীতে জ বা 'য' উচ্চারণের জন্যে রয়েছে ডাল [রমজান], জাল, জে, জোয়াই, জিম প্রভৃতি। আমরা আমাদের দেশের মানুষের স্বার্থে এ সব বিদেশী ভাষার বানান বদলানোর অধিকার রাখি না। নিজেদের রাষ্ট্রের ভেতরে জনগণের সহজ শিক্ষার প্রয়োজনেও যে-কোনো এক 'জ' বর্ণের প্রয়োগে পাঠ্যবই রচনা করি না। ইংরেজরা-আরবেরা এতগুলো 'জ' উচ্চারণ যত্ন করে শেখে ও যথাস্থানে প্রয়োগ করে। আমরাও এ দুটো বিদেশী ভাষা সচেতন সযত্ন প্রয়োগে ও শ্রমে সতর্কভাবে আয়ত্ত করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজরা আরবেরা অসুবিধে সত্ত্বেও আজও সংস্কারে তথা বর্জনে কিংবা সুনির্দিষ্ট নীতি নিয়মে সহজ করার জন্যে বিশেষ আগ্রহী নয়।

আমরা বাঙালীরাই কেবল ঙ, ঞ, ণ, ন, শ, ষ, স, জ, য, ৎ ব, ব এবং ঈ, উ, ঋ, ঐ, ঔ নিয়ে সদা বিব্রতবোধ করি ও বদলানোর কথা বলি। অনেকেই বর্জন-বদলানোর পক্ষেও রয়েছেন, কেউ কেউ অতীত ও ঐতিহ্যভ্রষ্ট হবার আশঙ্কায় রক্ষণশীল তথা পরিবর্তন বিরোধী। ভাষার বির্তন-বিকৃতির ধারার ইতিহাস জানার ও রচনার জন্যে এবং একালের লিংগুইস্টিকস নামে ভাষাবিজ্ঞান বোঝার জন্যে ধারাবাহিকতার অবিচ্ছিন্নতার অপরিবর্তনেরও হয়তো প্রয়োজন রয়েছে। অবশ্য প্রবহমানতা বজায় থাকবে, যদি বর্তমান বর্ণমালায় বাঙলায় বা দেবনাগরীতে সংস্কৃত শেখার ব্যবস্থা বজায় থাকে, তবে পণ্ডিতদের সাহায্য মিলবে গোড়ার কথা জানার, ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের উৎপত্তি-ব্যুৎপত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে।

বাঙলা বর্ণমালা, বানানরীতি ও ব্যাকরণ সংস্কার
[একটি খসড়া প্রস্তাব]

AMARBOI.COM

আমরা জোড়াতালির গোঁজামিলে ও মেরামতে আস্থা রাখি না। নতুন করে তৈরির পক্ষপাতী। বর্ণ-বানান ও ব্যাকরণ সংস্কার করতেই যদি হয়, তা হলে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নেয়া বাঞ্ছনীয়। কোনো বিদ্বানের জ্ঞান, বুদ্ধি, কিংবা অকাট্য যুক্তি প্রয়োগে কোনো নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ কিংবা চালু প্রথা-পদ্ধতি রাতারাতি বদলানো যায় না। এটি যেমন দেশ, সমাজ, সম্প্রদায়, জাতি, গোত্র সম্বন্ধে সত্য, তেমনি সত্য ভাষা সম্বন্ধেও। কাজেই যদিও আমরা জানি-বুঝি, যে দুধ থেকে ঘি হয়, কিন্তু ঘি-কে দুধ করা চলে না। তেমনি সংস্কৃত থেকে বাঙলা ভাষার পার্থক্য কেবল বাড়তেই থাকবে। আমরা বাঙলা বর্ণমালা, বানানপদ্ধতি এবং ব্যাকরণ মৃতভাষা সংস্কৃতানুসারী বলে মানি এবং আমরা বাঙলাভাষার প্রায় শতে সত্তরটা শব্দকে সংস্কৃততম, সংস্কৃতজাত ও বিকৃত বা ভাঙা সংস্কৃত শব্দ বলে স্বীকার করি বলেই মন-মননের প্রবণতা ও যুক্তিনিষ্ঠাবশে আমরা আজও অকারণে সংস্কৃত ব্যাকরণ মেনে চলি। যদিও জানি শব্দই ভাষা নয়, অন্বিত ধ্বনিই ভাষা এবং বাঙলা ভাষা সংস্কৃত নয়, বাঙলা বর্ণের, বানানের, ব্যাকরণের ও উচ্চারণের ত্রুটি অনেক, তবু যে-কোনো পরিবর্তন গ্রহণ-বর্জন অদল-বদল সর্বজন সম্মতিক্রমে সর্বজনগ্রাহ্য হওয়া আবশ্যিক ও জরুরী। নইলে স্থানিক, দৈশিক, রাষ্ট্রিক, গৌষ্ঠীক পরিবর্তনে, পরিমার্জনে, পরিবর্ধনে উড়িয়া-অহোমি-বাঙলাভাষার মতো নানা ভাষাগোষ্ঠী সৃষ্টি হবে। আমাদের সবারই স্থানিক বুলি বা কথ্যভাষা বিবিধ ও বিচিত্র। লিখিত ও লেখ্য বাঙলাভাষার অভিন্নতা স্বীকার করে তার অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত থেকেই তো আমরা প্রায় বিশকোটি মানুষ ভাষিক বাঙালী নামে পরিচিত, যদিও আমাদের মধ্যে কেবল বুলির ব্যবধান নয়, রাষ্ট্রিক দৈশিক মহাদৈশিক বাধা-ব্যবধান অলজ্ঘ্য দুর্লজ্ঘ্য ভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যমান। অতএব ভাষার বর্ণমালা বানানরীতি ও ব্যাকরণ বদলানোর বা সংস্কারের জন্যে অন্ততপক্ষে ঢাকায় ও কোলকাতায় বিদ্বানদের মধ্যে সমিতি-কমিটি গঠিত করতে হবে। এবং ঢাকায় কোলকাতায় ঘন ঘন বৈঠক করতে হবে। দুই দেশের বাঙলা একাডেমী, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ আর লেখক-মনোনীত সদস্যদের এই বিদ্বান কমিটির সুপারিশ একাডেমীর, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর, কলেজের এবং লেখকদলের অধিকাংশের সমর্থন পেলেই কেবল সরকারকে দিয়ে সুপারিশের বাস্তবায়ন স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে-দফতরে-পত্রে-পত্রিকায় বাধ্যতামূলক করা সহজে সম্ভব হবে। শাস্ত্রের ভাষা বলে সংস্কৃতভাষা বাঙলা ও দেবনাগরীতে চালু থাকবে। পণ্ডিত দুর্লভ হবে না। কাজেই ভাষার উৎপত্তি ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ প্রাতিপদিক, ধাতু, প্রত্যয় উপসর্গ, সন্ধি, সমাস প্রভৃতির রূপ-স্বরূপ-উৎস সন্ধান কঠিন হবে না। ফিলোলজি বা লিংগুইস্টিকস চর্চায় অসুবিধে হবে না বিদ্বানদের।

আমি আপাতত কয়েকটা স্থূল প্রস্তাব পেশ করছি, বহু খুঁটিনাটি বিচার-বিবেচনারও প্রয়োজন হবে, নতুন নীতি নিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি চালু করতে হলে। সে সব করবেন বিদ্বানেরা।

এক. স্বরবর্ণ ঃ অ, আ, ই, উ, এ, ও–এ ছয়টিই থাকবে স্বরবর্ণ। বিদেশী শব্দের শুধু উচ্চারণের জন্যে 'অ্যা' সংযোজন যুক্তি সঙ্গত নয়। কেননা বিদেশী কোনো ভাষার শব্দই আমরা বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারব না। স্বরবর্ণের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ ভেদ রাখার প্রয়োজন নেই। ঋ হবে রি এবং ঐ হবে অই, আর ঔ হবে ওউ।

দুই. ব্যঞ্জনবর্ণ ঃ ঞ, ণ, শ, ষ, য, র, ড়, ঢ়, য়, ৎ থাকবে না। 'ঞ' এর পরিবর্তে 'ন' ব্যবহৃত হবে। যেমন, ঝনঝা, বানছা। অনুস্বর, বিসর্গ , চন্দ্রবিন্দু থাকবে না। 'ঙ' অনুস্বরের কাজ করবে, বিসর্গের প্রয়োগ বিলুপ্ত হবে। যেমন, পয়প্রণালী, পুনপৌনিক, দুকখ, দুস্থ, নিস্ব, চন্দ্রবিন্দুর স্থলে 'ন' বসবে। যথা, চানদ, বানধ, কানদে।

তিন. ব্যঞ্জনবর্ণের ও অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, ঘোষ, অঘোষ ধ্বনিচেতনার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই কোনটা কণ্ঠ্য, কোনটা তালব্য কিংবা দন্ত্য উচ্চারণ জানার। শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ থাকবে কেবল অভিধানে।

ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ। ট ঠ ড ঢ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। র ল স হ। অনুস্বার, বিসর্গ চন্দ্রবিন্দু বাদ যাবে। অতএব স্বরবর্ণ হবে ছয়টি, ব্যঞ্জনবর্ণ হবে সাতাশটি। বর্ণমালার মোট সংখ্যা হবে তেত্রিশটি।

চার. বাঙলায় সন্ধি নেই, ধ্বনিসঙ্গতি আছে। যেমন পাঁসসের, রাজশাহী।

পাঁচ. সংস্কৃত নিয়মের সন্ধি ও সমাস বাদ দিতে হবে। বাঙলা উচ্চারণ ধন, জন, ভাব, জল, কাজেই জন+এক=জনেক, ভাব+অর্থ+ভাবর্থ, জল+অভাব=জলভাব হওয়াই ব্যাকরণসম্মত। উপসর্গ যোগেও তা-ই হবে। যেমন, অভি+উত্থান=অভিউত্থান, উৎ+বাস্তু=উৎবাস্তু। উৎ=শ্বাস=উৎশ্বাস, তৎ+হিত= তৎহিত হবে।

ছয়. পুরুষ থাকবে না। উত্তমপুরুষ হবে বক্তা, মধ্যমপুরুষ হবে শ্রোতা, প্রথম বা নাম পুরুষ হবে আলোচ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত. কারক বিভক্তি, কর্মপ্রবচনীয় বা কারক অব্যয় থাকবে।

আট. উপসর্গও থাকবে।

নয়. লিঙ্গান্তরের বাঁধাবাঁধি নিয়ম মানার প্রয়োজন নেই।

দশ. কার ও ফলা তথা যুক্তবর্ণ বা যুক্তাক্ষর থাকবে না। যেমন, কে=কএ, কি=কই, কোথায়=কওথআএ, ঋণ=রইন, আত্মীয়=আততইঅ, বিস্ময়=বিসসয়। সূক্ষ্ম=সুকখ। শ্রাবণ=সরাবন লিখতে হবে। এতে আপাতত উচ্চারণ বিকৃতি কানে বাজবে, মনে লাগবে, মর্মে ঘা দেবে। কিন্তু একবার মেনে নিলেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাবে। নিজেদের বিকৃত উপভাষা বা বুলিতে যেমন অভ্যস্ত হয়েছি। তখন উচ্চারণ বিকৃত মনে হবে না, বরং স্বীকৃত মানের স্বাভাবিক উচ্চারণ বলেই মনে হবে। তাতেও থাকবে আঞ্চলিক বিকৃতি। শব্দের সর্বসম্মত উচ্চারণের দিশা ও দেশনা দেবে অভিধান বা শব্দকোষ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশ-কাল-জীবনের দাবি ও সাক্ষ্য

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনাব শাহ্ আলম শান্তির নাম
অঙ্কিত রাখলাম এ বইয়ের বুকে।
কেননা তাঁরই আগ্রহে, উদ্যোগে ও আয়োজনে
সম্ভব হল গ্রন্থটির প্রকাশনা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীবাদ ও পুরুষবাদ নয়: বিশ্বমানববাদই কাম্য

নারীবাদ ও পুরুষবাদ নিয়ে বিতর্কে কোনো লাভ নেই। তবে ছাত্র-ছাত্রী সুলভ তর্ক-বিতর্ক দেখতে ও শুনতে কারুর কারুর আমোদ-আনন্দ মিলতেও পারে। আমাদের যুগের দাবি হচ্ছে মানববাদ। কাজেই নারীবাদ-পুরুষবাদ এবং তাদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ববাদ ও হীনতাবাদ, তাদের মধ্যেকার রূপ-গুণ-ধৈর্য-অধ্যবসায়, মন-মগজ-মনন-মনীষাগত পার্থক্য কিংবা উৎকর্ষ-অপকর্ষ অথবা সামর্থ্যগত বৈষম্য নিয়ে একালে আলোচনা নিরর্থক। কেননা বিজ্ঞানের প্রসাদে, প্রকৌশল-প্রযুক্তির বিস্ময়কর উৎকর্ষে ও বৈচিত্র্যে, যানবাহনে তারে-বেতারে পৃথিবী এখন একটা জনবহুল জনপদ মাত্র।

আগেরকালের মানুষে মানুষে অপরিচয়ের, মানুষের অজ্ঞতার, পৃথিবী পরিক্রমার অসম্ভাব্যতা, অলঙ্ঘ্যতা প্রভৃতির বাধা এখন নেই। তাই এখন পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তের যে-কোনো মানুষের আবিষ্কার, উদ্ভাবন, নির্মাণ, উৎপাদন সর্বমানবিক অধিকার ও উত্তরাধিকাররূপে স্বীকৃত। কাজেই অনুকরণে অনুসরণে গ্রহণে-বরণে কোনো বাধা নেই। ফলে আজ যে-কোনো রাষ্ট্র অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসাদি সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের, নির্মাণের, সৃষ্টির ও জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে। এখন পৃথিবীর মানুষের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিতে ও সভ্যতায় সব গ্রহণশীল মানুষের রয়েছে সব অধিকার। একাল প্রতীচ্য সংস্কৃতি-সভ্যতার কাল।

আমাদের সব জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রকৌশল-প্রযুক্তি-তার-বেতার যন্ত্র কিংবা যানবাহন প্রভৃতির নয় কেবল, মন-মগজ-মনন-মনীষা প্রসূন চেতনা-চিন্তারও উৎস হচ্ছে প্রতীচ্যবিদ্যা। অতএব, আমাদের এখন নকলবাজ না হয়ে উপায় নেই– বাহ্য ব্যবহারিক জীবনে তো বটেই, মানস জগতেও ওদের বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্যই আমাদের সম্বল। সর্বার্থেই ওরা দাতা, আমরা গ্রহীতা। এ ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা আত্মবঞ্চনার নামান্তর মাত্র। আমাদের জানতে, বুঝতে, মানতে ও ভাবতে হবে যে আজকের এ দিনটি পৃথিবীতে সর্বপ্রকারে নতুন। চেতনায়-চিন্তায় আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-নির্মাণে-সৃষ্টিতে এ দিনটি পৃথিবীর কোনো এক ঘরে একটি নতুন কথার, একটি নতুন যন্ত্রের, একটি পুরোনো যন্ত্রের উৎকর্ষের, একটি নতুন কবিতার, একটি নতুন অস্ত্রের কিংবা একটি রোগের নিদানের অথবা প্রতিষেধকের উন্মেষ ঘটাচ্ছে। কাজেই পৃথিবী তরু-লতার মতোই নব নব কিশলয়যোগে এগুচ্ছে। পুরোনো পাতা ঝরে পড়ছে, নতুন শাখা পল্লব গজাচ্ছে, সংস্কৃতি-সভ্যতাও উভয়ত অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিকভাবে এগুচ্ছে পৃথিবীর কোথাও না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথাও, কারুর না কারুর মনে-মগজে-মননে-মনীষায়, আবিষ্কারে, উদ্ভাবনে-নির্মাণে-সৃষ্টিতে-উৎকর্ষ সাধনে।

ফলে আমাদের জীবনযাপন পদ্ধতি নিত্যই নানাক্ষেত্রে পরিবর্তমান। আমরা সচেতনভাবে তা অনুভব-উপলব্ধি করি না বলে, মনে হয় যেন প্রতিটি দিন কেবল সূর্যোদয়ে ও সূর্যাস্তে আবর্তিত হচ্ছে। আসলে আমাদের দাড়ি-গোঁফ-চুলের মতোই প্রতি পলকে-নিমেষে বাড়ছে, বাদলাচ্ছে, পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত ও সংশোধিত হচ্ছে চেতনা-চিন্তা, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি, আচার-আচরণ, পোশাকের আকার-প্রকার, খাদ্য তৈরির রূপ-রস। এ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য স্বীকার করে নিয়েই আমরা নারীবাদ ও পুরুষবাদ নিয়ে তর্কে-বিতর্কে আমাদের শক্তি ও সময় নষ্ট করব না। কারণ কালের গতি ও বিবর্তিত জীবনের দাবি রোধ করা যায় না।

পুরুষেরা চিরকাল নারীকে যৌনজীবনে সম্ভোগ্যপ্রাণী বলেই জেনেছে। নারীরও যে কোনো সম্ভোগ স্পৃহা আছে, তাও মানতে চায়নি পুরুষেরা, সেজন্যেই তাকে চিরকালই ধর্ষণ পাত্রীরূপেই জেনেছে বেশিরভাগ পুরুষ। সেমিটিক গোত্রের লোকেরা আজও পশ্চিম এশিয়ায় ও উত্তর আফ্রিকায় এবং তাদের প্রভাবে নিগ্রোরাও নারীর লিঙ্গোচ্ছেদ করে নারীর রমণানন্দ হ্রাস করার প্রয়াসী।

আমরা সবাই জানি নারীর অধিকার প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই পুরুষেরা হরণ করে আসছে। নারী পুরুষের পদসেবিকা দাসী মাত্র। রাজার রানী হয়েও তাই তাকে অন্য অনেক নারীর সঙ্গে সম্ভোগ্য প্রাণীরূপে বাস করতে হয়েছে রাজগৃহে, যার নাম প্রাসাদ। পুরুষ নারীর নিন্দাও রটিয়ে এসেছে চিরকাল, তার জননীও যে নারী, তা মনে রেখেই। যেমন নারী নরকের দ্বার, নারী বুদ্ধিতে খাটো, নারী আবেগচালিত চপলমতি, নারী হচ্ছে সম্ভোগ্য যন্ত্রবৎ প্রাণী বিশেষ, তার কোনো আত্মা নেই। 'নারী দিনকা মোহিনী, রাত কি বাঘিনী, স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম দেবা ন জানন্তি কুতঃ মনুষ্যা।'

কাজেই নারী কখনো মানুষের মর্যাদা পায়নি। শাহের বানু, ক্লিওপেট্রা, সত্যবতী, কুন্তী, সীতা কারুরই 'মানুষ' রূপে মর্যাদা ছিল না, ক্বচিৎ মাতৃরূপে মাননীয়া বা সম্মানিতা ছিল মাত্র সন্তানের কাছে। ইসলামে মায়ের পায়ের নিচেই স্বর্গ। অ্যারিস্টটল, সাত বা চৌদ্দ মনু কিংবা আব্রাহাম থেকে আধুনিক কালের দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার, সোপেনহওয়ার, এমনকি নারীর অধিকারের সমর্থক হয়েও রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ কেউ নারীকে পুরুষের সমকক্ষ ভাবতে পারেননি। বরং এ ক্ষেত্রে পৃথিবীতে প্রথম নারী সত্তার স্বাতন্ত্র্যের ও নারীর মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন সম্ভবত হজরত মুহম্মদ, যিনি নারীর 'সম্মতি' ব্যতীত দাম্পত্য নিষিদ্ধ করেছিলেন। যদিও মুসলিম সমাজে নাবালেগা বিয়ে চালু হওয়ায় এ নিষেধ লঙ্ঘনই করা হয়েছিল, হয়েছে। ইসলামও কিন্তু এ সত্ত্বেও পুরুষের যুগপৎ একাধিক নারী সম্ভোগ নিষিদ্ধ করেনি। একাধিক পত্নীগ্রহণ ও দাসী সম্ভোগ বৈধ থাকায় নারী পুরুষ-সম্ভোগ্য প্রাণীই রইল, সমঅধিকার প্রাপ্ত মানুষ রূপে স্বীকৃতা হল না। বরং এ ক্ষেত্রে খ্রীস্টীয় এক পত্নীত্ব সংসার দাবিদার। ইসলাম নারীকে পিতৃ সম্পত্তির, মোহরানার [শর্ত সম্বলিত] এবং তালাকের অধিকার দিয়েও তার মনুষ্যসত্তা স্বীকার করেছিল। অবশ্য ভারতীয় পুরাণে নারীর স্বয়ম্বরার গল্প আছে, কিন্তু হরণে বহনে বধূ করার এবং জোরে জুলুমে বিয়ের কাহিনীও রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ অবধি পুরুষেরা নারীকে শারীরিক-মানসিক সম্পদে-সামর্থ্যে নিজেদের সমকক্ষ ভাবতেই পারেনি। নারীর জননীত্বকেই কেবল মহিমান্বিত করে তাদের অন্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার ফন্দি এঁটেছে মাত্র। জায়া ও জাতা তথা স্ত্রী-কন্যা কৃপা-করুণা-প্রেম-স্নেহের পাত্রী মাত্র। এসব পেলে সে ভাগ্যবতী, না পেলে নালিশ করার কিছুই নেই, কারণ তাদের মতে নারী মাত্রই পুরুষের সম্ভোগ্যা ও পদসেবিকা গৃহভৃত্যা মাত্র। নারীকে আজো যারা বোরখা পরায়, তাদের কাছে নারী সম্ভোগ্যা প্রাণী মাত্রই থেকে গেছে আজো– সে-নারী বিদুষী চাকুরে এমনকি বিদ্যালয়ে কিংবা দফতরে 'বস' হলেও। যারা পণ বা যৌতুক নিয়ে বিয়ে করায় বা করে তারা বিদ্বান হলেও কি 'মানুষ' পদবাচ্য? আর পুরুষ মাত্রই কি বুদ্ধিমান, পুরুষমাত্রই কি দেহে-মনে-মনীষায় যে-কোনো কাজের যোগ্য?

অনেক আগে থেকেই স্টুয়ার্ট মিলের মতো ব্যক্তিগতভাবে অনেক পুরুষই বিভিন্ন কালে নারীকে 'মানুষের' মর্যাদা দেয়ার সুপারিশ করেছেন বটে, নারীমুক্তির কথা বলে তাঁরা 'ফেমিনিস্ট' নামে আখ্যাতও হয়েছেন, কিন্তু বিশশতকের দুই মহাযুদ্ধে বাধ্য হয়ে নারীকে শিক্ষিতা ও চাকুরে করতে হয়েছে 'আর্থিক' সমস্যা-সঙ্কটে পড়েই। এ উদারতা নয় মোটেই। যেমন আমাদের দেশে এমন রক্ষণশীল শিক্ষিত পরিবারেও আইবুড়ো নারী সারাজীবন অবিবাহিত জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে বর মিলছে না বলেই। এ সমস্যা এখন ব্যাপক হয়ে উঠেছে বলে শহরে শহরে শিক্ষিত পরিবারে এ এখন আর নিন্দা-গ্লানি-লজ্জার বিষয়ই নয়।

আমাদের বিদ্যাসাগরের বা ব্রাহ্মদের কথা বাদ দিলে নজরুল ইসলাম তাঁর 'নারী' কবিতায়, রবীন্দ্রনাথ 'স্ত্রীরপত্র', শরৎচন্দ্র 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে বলতে গেলে চরম উদারতার পরিচয় দিয়েছেন মাত্র। কিন্তু নারীর ও পুরুষের সমকক্ষতার কথা তাঁরা ভাবতেও পারেননি কখনো। অথচ আমাদের দেশেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাম্য গ্রন্থে নারীর অধিকারের ও যোগ্যতার কথা উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন উনিশ শতকেই। 'মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার বিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত। প্রথমতঃ স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত ইহা আমরা স্বীকার করি না। এ কথাটি সাম্যতত্ত্বের মূলোচ্ছেদক। দ্বিতীয়তঃ যে সকল বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষে অধিকার বৈষম্য দেখা যায়, সে সকল বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না। যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু কেবল সামাজিক নিয়মের দোষে। ... স্ত্রী ও পুরুষে সর্বপ্রকারে সাম্য থাকাই উচিত।' [পঞ্চম পরিচ্ছেদ, সাম্য]। জন স্টুয়ার্ট মিলও জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার দাবি করতেন, 'স্ত্রী পুরুষে সমান। সুশিক্ষায়, বিজ্ঞানে, রাজকার্যে, বিবিধ ব্যবসায়ে... নারী জাতিও এ সকলে অধিকারী। তাহারা যে পারিবে না, উপযুক্ত নহে, এ সকল চিরপ্রচলিত লৌকিক ভ্রান্তি মাত্র।' [সাম্য-এ উদ্ধৃত]

'যেখানে বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির স্বাভাবিক তারতম্য আছে, সেখানে অবশ্য অবস্থার তারতম্য ঘটিবে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তবে অধিকারের সাম্য আবশ্যক– কাহারও শক্তি থাকিলে অধিকার নাই বলিয়া বিমুখ না হয়। সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি' [সাম্য, উপসংহার] বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত 'এই সামাজিক বৈষম্য,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৈসর্গিক বৈষম্যের ফল, তাহার অতিরিক্ত বৈষম্য ন্যায় বিরুদ্ধ এবং মনুষ্য জাতির অনিষ্টকর।... সেই ব্যবস্থাগুলোর সংশোধন না হইলে, মনুষ্য জাতির প্রকৃত উন্নতি নাই' [সাম্য]। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে শত বছর পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত মহা আর্থ-সামাজিক সমস্যার কথা অনুভব করেছিলেন। তখনো জন্মনিয়ন্ত্রণ বটিকা বা অস্ত্রোপচার অনুদ্ভাবিত ছিল। তাই তিনি বলেছেন 'যদি কতকলোক অবিবাহিত থাকে, তবে প্রজাবৃদ্ধির লাঘব হয়।' এ সূত্রে জাতি সঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক 'কায়রো সম্মেলন' স্মর্তব্য। আজকাল গল্পে-উপন্যাসে-প্রবন্ধে রাজনীতিতে নারীর সমানাধিকারের প্রবক্তা অনেক। আমরা ১৭৭২ সালে মেরী ওলস্টোন ক্রাফ্‌ট রচিত 'ভিন্ডিকেশন অব দ্যা রাইটস অব ওমেন' লন্ডন থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবি উচ্চারিত হতে দেখি।

আমাদের দেশে নারীর মধ্যে প্রথম স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার জন্যে দ্রোহাত্মক যুক্তি উচ্চারণ করেন সম্ভবত [মোতিচুর, অবরোধবাসিনী] বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন [১৮৮০-১৯৩১] এ শতকের প্রথম দশক থেকেই। আর শেষ দশকে তসলিমা নাসরিন আর তাঁর প্রেরণা-প্রবর্তনায় এখন মল্লিকা সেনগুপ্ত প্রমুখ অনেকেই। আর আফ্রো-এশিয়ার অসংখ্য মহিলা সমিতি স্বাধিকারের সংগ্রামে সদা নিরত রয়েছে। কিন্তু শাস্ত্রমানাআস্তিক নারী স্বাধীনতা পেতেই পারে না, সুযোগ-সুবিধে আদায় করতে পারে মাত্র। কারণ কোনো শাস্ত্রই নারীর স্বাধীন সত্তা স্বীকার করে না। এটাকে এখন পুরুষ-দ্বেষণামূলক নারীবাদ বলে রক্ষণশীল পুরুষেরা নিন্দা করে থাকে। তারা বলে নারী কিছু সুযোগ-সুবিধে ও স্বাধীনতা পেতে পারে বটে, পুরুষের সমকক্ষতা দাবি তাদের অনুচিত আবদার মাত্র। এ মতের লোকদের আখ্যাত করা চলে পুরুষবাদী বলে। এ যুগে অর্থাৎ যন্ত্রনির্ভর ও যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত এ যুগে ও এ জগতে নারীবাদ ও পুরুষবাদ তত্ত্ব একালে দুনিয়ার কোথাও জীবন-জীবিকার, রাজনীতির, সমাজনীতির কোনো ক্ষেত্রেই কোনো কল্যাণপ্রসূ হয় না, হবে না।

পুরুষ বীজ বুনে, নারী ক্ষেত্ররূপে গর্ভে সন্তান পোষণ করে, কাজেই তার পক্ষে সে সময়ে সঙ্গত কারণেই শারীরিক পরিশ্রম করা সম্ভব হয় না। পুরুষের পক্ষে কয়েক হাজার সন্তানের জনক হওয়া সম্ভব কোনো শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি না নিয়েই, নারীর পক্ষে ক্বচিৎ ১২/১৫ সন্তান ধারণ সম্ভব হয় জীবনে। সবচেয়ে বড় বঞ্চনা হচ্ছে পিতৃপ্রধান সমাজে সন্তানের মালিক মা নয়, বাবা।

ইরান থেকে গৌত্রিক-বিরোধ বিবাদের ফলে বিতাড়িত এবং ভারতে আর্যভাষী নেতা ইন্দ্র-পুরন্দর মহেনজোদাড়ো-হরপ্পা সংস্কৃতি-সভ্যতার কেন্দ্র শহরগুলো ধ্বংস করে বিজয়ী হিসেবেই উত্তর ভারতে তথা আর্যাবর্তে ও ব্রহ্মাবর্তে সদল অভিবাসিত হন। পশুপালনই ছিল তাদের যাযাবর জীবনের সম্পদ ও সম্বল। তাদের চেতনায়-চিন্তায় ছিল আকাশচারিতা। তার ফলেই তারা যতটা চিন্তক, ততটা সম্ভোক্তা ছিল না। তাই তারা শাস্ত্র সৃষ্টি করেছে যত, সামগ্রী নির্মাণ করতে পারেনি সে-মাত্রায়। ভারতে নাস্তিক্য দর্শনই বেশি, জৈন-বৌদ্ধ শাস্ত্রও কার্যত নিরীশ্বর, যেমন নিরীশ্বর দর্শন হচ্ছে সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, ব্রাহস্পত্য, লোকায়তিক [চার্বাক-আজীবিক] প্রভৃতি মূলত নিরীশ্বর-নাস্তিক্য দর্শন, তবু তারা যত দেবতা সৃষ্টি করেছে, দ্রব্য তৈরি করেনি সে-হারে। মহৎ ও সূক্ষ্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিন্তায় গুরুত্ব দিয়েছে তারা কিন্তু ভোগ্য সামগ্রীতে বিলাসী জীবন চেতনায় ছিল উদাসীন। তাই ভারতে মানস-উৎকর্ষ যতটা ঘটেছে, ব্যবহারিক জীবনে সংস্কৃতি-সভ্যতার নিদর্শন ততটা মেলেই না। যা কিছু হয়েছে তা দ্রাবিড়ভেড্ডিড মহেনজোদাড়ো-হরপ্পাবাসীদের, ইরানীর, গ্রীকের, শকের, কুষাণের, হুনের ও পার্থিয়ানের অবদান। বৈদিক চিন্তা-চেতনার ও প্রাকৃতশক্তির যজ্ঞের বদলে দ্রাবিড়-অস্ট্রিক নারী, পশু, পাখি, যাদু বিশ্বাস, টোটেম ট্যাবু, সর্বপ্রাণবাদ, ধ্যান মূর্তি, মন্দির, উপাসনা প্রভৃতি গৃহীত হয়েছে। উপনিষদগুলোর তথ্য ও তত্ত্বও সবটা বেদানুগ নয় এবং অনার্যভাষীর অবদান বলেই কিছুটা প্রমাণে কিছুটা অনুমানে বিদ্বানেরা স্বীকার করেন। তবু হিন্দুর বিয়ে আজো অগ্নি-সাক্ষী করেই সপ্তপদী পরিক্রমায় সমাধা হয়। এটি শ্বেতকায় আর্যভাষীরই প্রভাব। এও উল্লেখ্য যে ঋষি উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতুই বিবাহ প্রথার প্রবর্তক বলে কথিত।

এবার অন্য কথা বলি, এক সময়ে প্রাণীর মানব প্রজাতির মধ্যে বিয়ের প্রথা চালু ছিল না, তাতে জন্ম-জীবনের কি কি ক্ষতি হয়েছিল? প্রাণিজগতেই বা আজো কি ক্ষতি হচ্ছে? কাক, পায়রা প্রভৃতি মাদী-মর্দাকে নিষ্ঠার সঙ্গেই নীড় তৈরিতে, ডিম পাহারা দিতে এবং শাবকের আহার্য জোগাতে দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করতে দেখা যায়। বিবাহ প্রথা চালু হওয়ার পরেও এ মুহূর্ত অবধি গণিকাবৃত্তি আদি ও আদিম কালের মতোই চালু রয়েছে। এতে সংস্কৃতি-সভ্যতা-আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃষ্টি, নির্মাণ-উৎপাদন-শিল্প-সাহিত্য-স্থাপত্য-ভাস্কর্য কিংবা বিজ্ঞানচর্চার কি ক্ষতি হয়েছে? আজো তো প্রেম মাত্রই পরকীয়া অর্থাৎ বিবাহপূর্বের রাগ।

আধুনিক প্রতীচ্য রিরংসা এবং দাম্পত্য সমস্যা নিয়ে আমরা বিজ্ঞ মত-মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে থাকি। আর আমাদের হাজার হাজার বছরের গতানুগতিক সুশৃঙ্খল অভ্যস্ত দাম্পত্য জীবন নিয়ে গর্ব করি। প্রতীচ্য লোকেরা কিন্তু দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের চরিত্রে যৌন সংযম আবশ্যিক বলে মানে। এজন্যে এক্ষেত্রে কারুর কেলেঙ্কারী ধরা পড়লে তাকে ক্ষমা করে না, পদচ্যুত করে। তা ছাড়া সাধারণ লোকেরাও যৌন অসংযমের দরুন দায়িত্বে-কর্তব্যে অবহেলার-ঔদাসীন্যের কোনো পরিচয় দেয় না। এরা যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধ করে, পড়ার সময়ে পড়ে, গবেষণা কার্যেও হয় না অমনোযোগী। সবাই যথাকালে যথাপ্রয়োজনে যথাস্থানে দায়িত্ব ও কর্তব্য করে যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে এবং সততায়ও তারা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাহলে আমাদের নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি আমাদের মানসিক কিংবা ব্যবহারিক জীবনে আমাদের কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে?

আফ্রো-এশিয়ার গোত্রীয় জীবনে গুরুত্ব এখনো প্রায় অটুট রয়েছে। গৌত্রিক স্বাতন্ত্র্য-চেতনা কাড়াকাড়ি, মারামারি ও হানাহানিভিত্তিক। আজো জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-আচার-আচরণ-যোগ্যতা প্রভৃতি কোথাও গুরুত্ব হারায়নি। প্রমাণ প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়ায় খ্রীস্টান-মুসলিম চেতনা, গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের উক্তি, 'I don't like to see a Muslim State in Europe.' এতেই বোঝা যায়, পৃথিবীর মনুষ্য সমাজে প্রাণীর সংখ্যাই লাখে নিরেনব্বই হাজার নয়শ নিরেনব্বই; প্রত্যাশিত গুণের মানুষ মিলবে কৃচিৎ লাখে একজন। কায়িক উৎকর্ষের অভাবে মানুষের মতো এমন প্রজন্মক্রমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুষে রাখা পারিবারিক, গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক জাতিক হিংস্রতা ও প্রতিহিংসা গ্রহণ বৃত্তির লালন এবং অসূয়া প্রবণতা অন্য প্রাণীদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

গোটা দুনিয়ায় প্রাণিজগতের রয়েছে প্রাকৃতিক নিয়মেই খাদ্য-খাদক সম্পর্ক, গরু-ঘোড়া-মোষ-ছাগলে ঘাস খায়, মানুষও প্রাণী হত্যা করবে না বলেই নিরামিষভোজী হয়েছিল, এখন জানা গেছে লালশাক-মূলা সবাই প্রাণী এবং নিরামিষভোজী জৈনও প্রাণীখাদক। প্রকৃতির জগতে মৌমাছিতন্ত্রে আমরা দাস প্রথাই লক্ষ করি। কেননা সবাই রানী মৌমাছির সেবক-ভৃত্য-আদেশাধীন, মাদী মাকড়সা নাকি মর্দা মাকড়সাকে সঙ্গমান্তে হত্যা করে খায়। আবার মাদী মাকড়সা নাকি বুকে বয়ে বেড়ানো ডিমজাত সন্তানদেরই প্রথম খাদ্য হয়।

মানুষতো প্রকৃতিকে দাস, বশ এবং প্রকৃতির সঙ্গে আপোস করে স্বরচিত কৃত্রিম জীবন-যাপন করে সর্বার্থক ও প্রায় সর্বাত্মকভাবেই। এ অবস্থায় প্রকৃতি থেকে দৃষ্টান্ত ও যুক্তি আবিষ্কার করে, কোনো নীতি-নিয়ম রীতি-রেওয়াজ প্রথা-পদ্ধতি চালু রাখা বা চালু করা বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। একালে তিন সপ্তাহের গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ পরিবর্তন সম্ভব এবং ছেলেমেয়ে হওয়ার কারণ নিতান্তই দম্পতির শারীরিক অবস্থানির্ভর। এ বিজ্ঞানীরাই আগে মগজের ওজনের পার্থক্য দেখাতেন নারী-পুরুষে। যার মধ্যে কোনো সত্য ছিল না। অসমর্থ মানুষের স্বপ্ন-সাধ যেমন যাদুশক্তি আশ্রিত হয়েছিল, মন্ত্রের জোরে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল আয়ত্তে এনেছিল মানসিকভাবে, তেমনি নারী সম্বন্ধে মানুষের চিন্তা-চেতনা স্বপ্ন-সাধ চিরকালই সক্রিয় ছিল। তাই আলেফ লায়লার শহেরবানু, হানিফার জৈগুন, মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা, এমনকি ময়মনসিংহগীতিকার সকিনা প্রভৃতির বীরত্ব ও পুরুষালি শক্তি-সাহস-বুদ্ধি আমাদের মুগ্ধ করে। এ সূত্রে আদ্যা শক্তি মা কালীর কথাও স্মর্তব্য। আমাদের কালে গোল্ডামেয়ার, বন্দরনায়েকে, ইন্দিরা গান্ধী থেকে আজকের কানাডা-তুরস্ক-পাকিস্তান-বাঙলাদেশ-শ্রীলঙ্কার শাসিকাদের যোগ্যতা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। এর পরে নারীবাদ ও পুরুষবাদ নিয়ে তর্ক নিরর্থক বলেই মনে হয়। যোগ্যতায় লিঙ্গভেদ নেই, আছে ব্যক্তিক যোগ্যতাভেদ এবং অনুকূল পরিবেশ প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি জাত শক্তি-সামর্থ্যের বিকাশ-বিস্তার কিংবা বাধা-বিঘ্ন। উল্লেখ্য শাস্ত্র মাত্রই কালিক প্রয়োজনে সৃষ্ট, মানুষই শাস্ত্র গড়েছে, শাস্ত্র মানুষ গড়েনি; তবে সে-শাস্ত্র প্রভাবিত-নিয়ন্ত্রিত করেছে জীবন-মনন, বন্ধনে করেছে বন্ধ্যা, প্রগতি করেছে রুদ্ধ।

আমরা নারী পুরুষে কোনো প্রভেদ দেখি না, জন্মমুহূর্ত থেকে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সর্বপ্রকার শাস্ত্রিক-সামাজিক-লৌকিক-অলীক-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আচার-আচরণমুক্ত পরিবেশ পেলে স্ব স্ব জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-যুক্তি-সাহস-উদ্যম-উদ্যোগ প্রয়োগে মানস প্রবণতানুসারে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে, আবিষ্কার-উদ্ভাবন-নির্মাণ-সৃষ্টির ক্ষেত্রে নারীতে-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ থাকবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া কায়রো সম্মেলনে সে-সব সমস্যা আলোচিত হয়েছে। সমর্থন-অসমর্থনের টানাপড়েনে আলোচনা বৃথা-ব্যর্থ হয়েছে বটে, তবে সেগুলো আগামী অর্ধশতকের মধ্যেই লোপ পাবে। কেননা প্রতীচ্য জগতের নাস্তিক্যতার ও সমকামিতার এবং অবাধ অবৈধ দাম্পত্যের সামাজিক আচারের ঝোঁক ঘরে ঘরে বাড়তেই থাকবে। প্রভাবিত করবে ভিন্নদেশীদেরও। বিজ্ঞানীরা বিস্ফোরণ তত্ত্ব, কালোগহ্বর, নভের সম্প্রসারণ, সংকোচন এবং সৃষ্টি-স্রষ্টাতত্ত্ব সম্বন্ধে যদি প্রমাণ সম্ভব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকগ্রাহ্য আরো তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য আবিষ্কারে সফল হত, তা হলে a-moral, moral, immoral সম্বন্ধে মানুষের ধারণাই বদলে যেত। সমাজ হত পরিবর্তিত; ফলে জীবনচেতনা ও জগৎভাবনাও পালটে যেত। আমাদের পক্ষে এখন থেকেই নারীবাদ ও পুরুষবাদ তত্ত্ব বর্জন করে বিশ্বময় মানববাদ চর্চা করাই শ্রেয় ও প্রেয়।

কারণ আমরা শুনেছি, জেনেছি এবং উপলব্ধিও করেছি যে শতে, হাজারে, লাখে ক্বচিৎ কোনো লোক জীবনকে নিশ্চিন্তে সানন্দ উপভোগে ধন্য ও সার্থক হয়েছে। প্রবলের দৌরাত্ম্যে দুর্বল চিরকাল নানাভাবে বঞ্চিত, পীড়িত ও প্রতারিত হয়েছে। দাস-ক্রীতদাস-ভূমিদাস কবেইবা কোথায়ইবা সুখে স্বচ্ছন্দে সাচ্ছল্যে নিশ্চিন্তে নিরাপদে নিরুপদ্রব জীবন যাপনের সুযোগ সুবিধে পেয়েছে? আজকের পৃথিবীতে নাকি জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচশ' কোটি। এদের মধ্যে কোটি খানেক লোকই নিশ্চিন্তে জীবন ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে ধন্য এবং সাড়ে চারশ' কোটি লোকই নিজের বা পোষ্যজনের অশন-বসন জোগাড়ের ধান্ধায় আবাল্য জীবন কাটিয়ে এক সময়ে মৃত্যুর কবলিত হয়। এদের জীবনে গানের সুরে কান পাতার কিংবা ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধদৃষ্টি দানের সময় জোটে না। এদের জীবন অন্নচিন্তায়, কাজের ধান্ধায় অভাবের তাড়নায় আচ্ছন্ন– অস্থির। এদের কাছে জীবন যন্ত্রণারই অপর নাম। এ যথার্থই আক্ষরিক অর্থেই গৌতমবুদ্ধ-উক্ত 'ভব যন্ত্রণা'। কাজেই মানুষের জীবনে এযাবৎকালে কখনো নারী-পুরুষের অধিকারের কিংবা পারস্পরিক সম্বন্ধ-সম্পর্কের সমস্যাই প্রধান ও প্রবল ছিল না এবং বাস্তবে প্রাত্যহিক নিস্তরঙ্গ আটপৌরে জীবনে নেইও। দারিদ্র্যই ঘরে ঘরে নারী নির্যাতনের প্রধান ও প্রথম কারণ। কারণ রাজা-বাদশাহ, শাহ-সামন্ত ধনী ঘরে নারী যৌনজীবনে বঞ্চিতা অবহেলিতা হলেও অন্যভাবে শোষণ-বঞ্চনা-প্রতারণার শিকার নয়। এ জন্যেই বলছি যে মানববাদেই রয়েছে নারী-পুরুষের সাম্যের, পারস্পরিক অধিকারের ও স্বাধীনতার কুঞ্জি বা উৎস। তাই মানববাদেই রয়েছে মানব সমস্যা-সঙ্কটের সমাধান। আমরা মানববাদী হলে লিঙ্গনির্বিশেষে সব মানুষ নাগরিকরূপে বেঁচেবর্তে থাকার ও যোগ্যতানুসারে আত্মবিকাশের অবাধ সুযোগ সুবিধে মৌল মানবিক অধিকার, জন্মগত অধিকাররূপেই পাবে। কাজেই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে মানুষকে মানববাদী হবার জন্যে প্রেরণা-প্রণোদনা-প্রবর্তনা দান করা। মনুষ্যত্বের বিকাশে মানবতার উন্মেষ-উৎকর্ষ ঘটে। আর নির্বিশেষে মানুষকে ভালোবাসাই হচ্ছে মানবতা।

সমাজে ও রাষ্ট্রে বস্তুবাদের স্বীকৃতি ও সংক্রমণ

বস্তুবাদী দর্শনের বিপরীতে যে সাধারণ দর্শনের নাম মনে জাগে তার নাম ভাববাদী দর্শন। ভাববাদী দর্শন কোনো বিশেষ একটি দর্শন নয়, তারও বিভিন্ন প্রকারের শাখা-প্রশাখা এবং ভিন্নতা আছে। ভাববাদী দর্শন স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে মানুষের মন-মগজ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনন ও মনীষার সাধ্যমত প্রয়োগে বিচিত্র হলেও মানুষকে সে-সব চিন্তা-চেতনা জন্ম-জীবন-মৃত্যুর পরিসরে সীমিত মানুষের মর্ত্যজীবনের সংকট-সমস্যার, প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব চাহিদার কোনো সমাধান দিতে পারেনি কখনো। ফলে মানুষের অদৃশ্য অরি ও মিত্র দেব-দানো-ভূত-প্রেত প্রভৃতির শক্তি এবং কর্মফল বা নিয়তিনির্ভর জীবনযাপনে প্রবোধ পাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল মাত্র। দাস-ক্রীতদাস-ভূমিদাস এবং নিঃস্ব-নিরন্ন-দুঃস্থ-দরিদ্র ও রুগ্ন মানুষের জীবন-সমস্যার সমাধান মার্কসবাদ প্রয়োগের আগে কখনও সম্ভব হয় নি, যদিও কিছু কিছু মানবতাবাদী মনীষী কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য-দান প্রভৃতির মহিমা মানব সমাজে প্রচার করে নিঃস্ব ও দুঃস্থ মানবতার কল্যাণ সাধনে প্রয়াসী ছিলেন চিরকাল। এজন্যে দুনিয়ার সব শাস্ত্রে দানধর্মের কথা আছে, দরিদ্রের প্রতি অনুগ্রহ-অনুকম্পার কথা আছে, কিন্তু বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে মানুষের যে জন্মগত অধিকার রয়েছে কিংবা নিঃস্বতা-নিরন্নতা-রুগ্নতা যে দৈবশক্তির লীলা নয়, প্রবলের জোর-জুলুমই যে দুর্বলের দুর্দশা-বঞ্চনার, শোষিত হওয়ার কারণ, তা মার্কস-পূর্বকালে কারো স্বীকৃতি পায়নি, এমনকি কারো চিন্তার বিষয়ও হয়নি। কাজেই শ্রেণী-শোষণ এবং শ্রেণী-দ্বন্দ্বের স্বরূপ এবং স্বল্প সংখ্যক প্রবলের হাতে লক্ষ-কোটি মানুষের শোষিত হওয়ার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ মার্কস-এঙ্গেলস প্রমুখ মনীষীর কাছে পেয়ে একালের মানুষ বস্তুবাদী দর্শনে আস্থাবান হয়ে উঠল।

আগের কালেও এ উপমহাদেশে আজ্ঞেয়বাদী ও নিরীশ্বরবাদীরা এ মর্ত্যজীবনকে বাস্তব বলে জানত। ওরাও ছিল বস্তুবাদী। কিন্তু সেকালে শিক্ষার বিস্তার ছিল না এবং জনসংখ্যার স্বল্পতার জন্যেও বটে এবং ভোগ-উপভোগে ও সম্ভোগ সম্পর্কে ধারণার বিকাশের-বৈচিত্র্যের অভাবেও বটে, তাঁদের জীবনে কোনো প্রকট সমস্যা-সঙ্কট দেখা দেয়নি। ফলে তাঁরাও শাহ-সামন্ত এবং প্রবল ধূর্ত লোকের শাসন-শোষণ-নির্যাতন-পীড়ন-বঞ্চনা-প্রতারণা সম্পর্কে সচেতন থাকলেও সমাজ-পরিবর্তনের কথা ভাবেননি, বিপ্লব ঘটানোর প্রয়োজন বোধ করেননি– যদিও আমরা গোষ্ঠী-গোত্র এবং সম্প্রদায়গতভাবে শোষণ-পীড়ন অসহ্য হলে অতি প্রাচীনকালেও স্থানিক ও কালিক দ্রোহের সংবাদ ইতিহাসে পাই। যেমন ভারতে জৈন-বৌদ্ধ-আজীবিক-লোকায়তিকদের মধ্যে দেব-দ্বিজ-বেদ দ্রোহিতা দেখি। কারণ উচ্চ বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বেদের নামে এবং দেবতার নামে জনসাধারণকে শোষিত-পীড়িত ও বঞ্চিত করত, তেমনি আমরা প্রাচীন মিশরে অথবা রোমে দাস বিদ্রোহ দেখেছি। অসহ্য হলেই লোকে বিদ্রোহ করে, পিঁপড়ের মতো মরিয়া হয়ে একবার মরণ কামড় দিয়ে মরে।

কার্ল মার্কসের সামনে প্যারী কমিউন বিপ্লব ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও শ্রেণীসংগ্রাম যে সমাজ পরিবর্তনের জন্যে একমাত্র অবিকল্প পন্থা, তা এ মুহূর্তের মানববাদীরাও অস্বীকার করতে পারছেন না। যদিও মানববাদীরা গোড়া থেকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-আর্থিক-শৈক্ষিক ও নৈতিকভাবে আজো মোটামুটিভাবে বিরুদ্ধ পরিবেশে বাস করছেন এবং ভাববাদ তাদেরকে ক্ষণে ক্ষণে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে; বস্তুবাদী দর্শন অপব্যাখ্যাত হচ্ছে, প্রয়োগে অসাফল্য দেখছে, তবু জানতেই হবে, স্বীকার করতেই হবে দর্শন হিসেবে প্রত্যক্ষবাদ যেমন তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য, তেমনি বহু জনহিতবাদ ও সুখবাদ অন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-কোনো নীতি-নিয়ম-আদর্শের চেয়েও যে শ্রেষ্ঠ, তা আমরা যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে উপলব্ধি করতে পারি।

বস্তুবাদকে কেবল দর্শন হিসেবে নয়, বাস্তব বুদ্ধি প্রয়োগে সাদা চোখে আমরা বাস্তব জীবনে তার প্রত্যক্ষ ফল দেখি, বুঝি এবং মানি। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলতে যা বোঝায়, তাও আজকাল বিদ্বানের কাছে জটিল কোনো তত্ত্ব নয়। আজকের পৃথিবীতে যাঁরা মুখে ভাববাদী সেইসব অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রপরিচালকরাও স্বীকার করেন যে একালে বিজ্ঞানের প্রসারে, যন্ত্র-প্রযুক্তি-প্রকৌশলের বদৌলত আজকাল প্রাচীন ও মধ্যযুগের মতো মানুষের শাস্ত্রিক-রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মন্থরগতিতে আবর্তিত হয় না। এখন বলতে গেলে প্রতি নতুন সূর্যের উদয়ে প্রতিদিনের মানুষের সমাজ ও জীবনযাত্রাপদ্ধতি পরিবর্তিত হচ্ছে, বিচিত্র হয়ে উঠছে, জীবনের ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ সামগ্রীর চাহিদাও হয়ে উঠেছে বিচিত্র ও বহুবিধ। ফলে ঐ শাস্ত্রে আস্থাবান বিশ্বমানবের কল্যাণে শাস্ত্রবিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ ও চালু করার জন্যে কায়রো সম্মেলন আহ্বান করতে বাধ্য হয়েছে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে জাতিসঙ্ঘ। এতেই বোঝা যায় ভূতে-ভগবানে তাদের আস্থা আর আগের মতো দৃঢ় নেই। এখন মানবিক সমস্যা সমাধানের জন্যে, অভিজ্ঞতা প্রয়োগে বাস্তব জীবনের সঙ্কট সমাধানের লক্ষ্যে আসমানী বিশ্বাস-সংস্কার-ধ্যান-ধারণা কার্যত পরিহার করে শাস্ত্র-সমাজ ও নীতিচেতনা বিরোধী বাস্তবপন্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বৈশ্বিক পর্যায়ে।

আজ বাঁচার গরজেই য়ুরোপ-আমেরিকা-জাপান ও গ্রেট-সেভেন-গ্রেট এইট সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। প্রাক্তন ন্যাটো জোট একক অর্থ-বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় একত্র হওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নিজ স্বার্থেই নাফতা, গ্যাট, বাজার অর্থনীতি প্রভৃতির ব্যবস্থা চালু করেছে এবং অন্যদের উপর তা চাপিয়ে দিচ্ছে। কাজেই ভাববাদীরা এখন বিজ্ঞান ও বাণিজ্যকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিচ্ছে। আর বস্তুবাদী দর্শন তো সমাজ-বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল এবং আজ অবধি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষিত হয়েছে সেভাবেই। কাজেই গোটা পৃথিবীর লোক প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বস্তুবাদী দর্শনে নয়, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদেও আস্থাবান হতে বাধ্য হচ্ছে। ইইসি, ম্যাসখিট চুক্তি, নাফতা, গ্যাট, আশিয়ান, সার্ক প্রভৃতি তো গঠিত হয়েইছে, এমনকি শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন বা উপেক্ষা করেও বিবাহপ্রথা তুলে দেয়া, অবাধ সহবাস, গর্ভপাত, জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ঐ শাস্ত্রবাদীদেরই কাম্য হয়ে উঠেছে আজ। এ অবস্থায় কার্ল মার্কস পরিকল্পিত সমাজবাদ-সাম্যবাদ আর্থিক সুবিচারবাদ প্রভৃতি মানুষের বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার স্বীকৃত হওয়ার ফলে গ্রহণ ও প্রয়োগ আজকের পৃথিবী আবশ্যিক বলে মানবে। এখন থেকে মানুষের স্বীকৃত দর্শন একটিই থাকবে, তা হল বস্তুবাদী দর্শন– বৈশ্বিক স্তরে, আন্তর্জাতিক স্তরে ও রাষ্ট্রিক স্তরে। কারণ এই দর্শনের প্রয়োগেই একমাত্র মানবিক সমস্যার সমাধান সম্ভব। এজন্যে মানুষ বাস্তব জীবনে মাটিলগ্ন হচ্ছে, কিন্তু প্রাজন্মক্রমিকভাবে শৈশব থেকে শোনা-পাওয়া লৌকিক-অলৌকিক-অলীক বিশ্বাস-সংস্কার প্রভৃতির আসমানলগ্ন ধারণা সহজে ছাড়তে পারছে না বলে মানুষ দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিজড়িত অসঙ্গত ও অসমঞ্জস জীবনযাপন করছে মানসিকভাবে এবং ব্যবহারিকভাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটবেলা থেকে পারিবারিক ও সামাজিক সূত্রে পাওয়া বিশ্বাস-সংস্কার-পালা-পার্বণ-আচার-আচরণ পরিহার বা ত্যাগ করা আমজনতার পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ তারা জীবিকার ধান্ধায় জাগ্রত মুহূর্তগুলো নিয়োজিত রাখে এবং সামাজিভাবে গতানুগতিক রীতি-রেওয়াজ-প্রথা-পদ্ধতি অনুসরণে অভ্যস্ত জীবন যাপন করে। তারা মুনাজাতে আস্থা রাখে– মগজের প্রয়োগে থাকে উদাসীন। মনের মধ্যে সন্দেহ, জিজ্ঞাসা এবং বিশ্বাস-সংস্কার বা কোনো কাজের উপযোগ সম্পর্কে প্রশ্ন না জাগলে মানুষ তার মন-মগজ-মনন-মনীষা প্রয়োগে যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার শক্তি বা সাহস পায় না। চালু নিয়ম-নীতি-বিশ্বাসে সন্দেহ লাখে একজনেরও মনে জাগে না। তাই সবাই গতানুগতিকভাবে প্রশ্নহীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত থাকে। এজন্যে সমাজে দ্রুত পরিবর্তন আগেও ঘটত না, এখনো ঘটে না। হাজার হাজার বছর আগে থেকেই এবং এখনো যাঁর মনে প্রচলিত শাস্ত্র সামাজিক নিয়ম ও চালু আচার-আচরণের উপযোগিতা বা সার্থকতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে তিনি সাহসী হলে বিদ্রোহ করেন। আমরা শুধু নবী-অবতারে নয়, সক্রেটিস থেকে আজকের মুরতাদ-নাস্তিক-নিরীশ্বরদের মধ্যে সেই বিদ্রোহই দেখতে পাই এবং এঁরা পিতৃপুরুষের শাস্ত্র-সমাজ ও নিয়ম-নীতির দ্রোহী। এজন্যে সমাজের লোক তাঁদের আগেও সহ্য করেনি, এখনও করে না। লোককল্যাণে যে নতুন চেতনার ও নতুন চিন্তার ফুল-ফল-ফসল রূপে নতুন কথা বলেন তাঁকেই সমাজের লোক নিন্দিত, লাঞ্ছিত ও কখনো বা নিহত করে। তবে নতুন কথা উচ্চারণ করে ঐসব ব্যক্তি নিন্দিত, লাঞ্ছিত ও নিহত হন বটে, কিন্তু তাঁদের উচ্চারিত সত্য পরবর্তীকালে গৃহীত-অনুকৃত-অনুসৃত ও প্রশংসিত হয়। সক্রেটিসকে মরতে হয়েছিল, মুসাকে পালাতে হয়েছিল, ঈসাকে মরতে হয়েছিল ক্রুশবিদ্ধ হয়ে, হযরত মুহম্মদকে হিজরত করতে হয়েছিল, বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস-ব্রুনো-গ্যালিলিওকে এদের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল, এমনকি যে-চার ব্যক্তিত্ব আধুনিক পৃথিবীতে মানুষের মানসিক জগতের খোল-নলচে বদলে দিলেন, সেই ডারউইন-মার্কস-ফ্রয়েড-আইনস্টাইন এবং হকিং প্রমুখ আজো অধিকাংশ মানুষের কাছে নিন্দিত এবং অস্বীকৃত। অধিকাংশ মানুষ যতদিন যৌক্তিক-বৌদ্ধিক এবং বিবেকী জীবন যাপনে আগ্রহী না হয় ততদিন পর্যন্ত গণমুক্তি বা মানব সঙ্কট- সমস্যার সমাধান সার্বত্রিক হবে না।

ফ্রিথিঙ্কার্স সমাজ

মানুষ সাধারণভাবে অভ্যস্ত শাস্ত্রিক, নৈতিক, আচারিক, ব্যবহারিক জীবনধারায় স্বস্থ, সুস্থ ও আশ্বস্ত থাকে। কারণ তাদের মনে আশৈশব শ্রুত, লব্ধ, দৃষ্ট ও অভ্যস্ত নীতি-নিয়মের, রীতি-রেওয়াজের ও প্রথা-পদ্ধতির কখনো উপযোগ ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন বা সন্দেহ, জিজ্ঞাসা জাগে না। স্থানগত, কালগত, জীবনের গতিগত নতুন প্রয়োজনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাও তাদের মনে ঠাঁই পায় না। তাদের মন-মগজ-মননও গতানুগতিক ও রক্ষণশীল ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। তাদের মগজের সৃষ্টির, উদ্ভাবনের ও আবিষ্কারের শক্তি অনুশীলনের অভাবে সুপ্ত ও গুপ্ত থাকে, কালে লুপ্তও হয়ে যায়। এ জন্যে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুন সৃষ্টির, নতুন উদ্ভাবনের, নতুন কিছু নির্মাণের, নতুন কিছু আবিষ্কারের, নতুন কিছু জীবনযাত্রায় যোগ করার কোনো নিদর্শন মেলে না তাদের প্রাত্যহিক জীবনের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের মধ্যে।

পুরোনো চিন্তায়, পুরোনো চেতনায়, পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণায়, পুরোনো আচারে-আচরণে কোটি কোটি মানুষ কোথাও কিছুর উপযোগহীনতা, তাৎপর্যহীনতা, পরিহারযোগ্যতা খুঁজে পায় না। তাই স্বকালের মানুষের চিন্তার, চেতনার, মননের, মনীষার গুরুত্ব তাদের সুপ্রাচীন শাস্ত্রিক বিধি-বিধানের মতো কখনো গুরুত্ব, মূল্য, মর্যাদা পায় না। কারণ শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধের প্রভাব ও পরিণাম ইহ-পরলোকে প্রসৃত। তা যে কেবল প্রশ্নাতীত সত্য তা নয়, তা ঐশ এবং অপার্থিবও, কোনো মর্ত্যমানবই সে-সত্য অস্বীকার করার যোগ্যতা রাখে না। কেবল উদ্ধত নির্বোধই বোঝে না বলেই সত্য অনুভব উপলব্ধি করতে পারে না– নাস্তিক্যের আস্ফালন করে– এ-ই হচ্ছে সাধারণের চিরন্তন ধারণা আজকের এ মুহূর্ত অবধি। এ ধারণার পরিবর্তন ভবিষ্যতেও অসম্ভব বলেই মনে হয়।

AMARBOI.COM

তবে বিজ্ঞানের নানা তত্ত্বের, তথ্যের ও সত্যের আবিষ্কারের ফলে, প্রকৌশল-প্রযুক্তির বিস্ময়কর বিকাশের, বিস্তারের ও উৎকর্ষের কারণে আজকের দিনে মানুষের বাস্তব মর্ত্যজীবন-ধারা ঘরে-বাইরে বদলে গেছে। আস্তিক-নাস্তিক কিংবা ইহুদী-জৈন-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান-হিন্দু-মুসলমান সবাই অনিচ্ছায় শাস্ত্রের নানা বিধি-নিষেধ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যান্ত্রিক জীবনে তথা যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জীবনে লঙ্ঘন ও উপেক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে, ধার্মিক-অধার্মিক সবার জীবনে একটা অস্বস্তিকর-অনভ্যস্ত জীবন-যাপন পদ্ধতি জবরদখল করে বসেছে। শাস্ত্রে যতকিছু নিষিদ্ধ ছিল, তার সবটাই প্রায় ঘরের ভেতরেই রেডিও, টিভি, ভিসিপি, ক্যাসেট, চিত্র, ভাস্কর্য মূর্তি, পরিচ্ছদ প্রভৃতির আকারে আসন গেড়ে বসেছে। এগুলোকে গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে-পাড়ায়-মহল্লায় ফতোয়াযোগে আর কখনো কেউ সরাতে পারবে না। এর সঙ্গে এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জীবনে সংহত পৃথিবীতে মনুষ্য সমাজে অন্য নানা জটিল সমস্যা-সঙ্কটেরও সৃষ্টি হয়েছে। এ সাম্রাজ্যবাদের-পুঁজিবাদের সঙ্কট নয়, মানব-সঙ্কট। এর জন্যেই অবশ্য আপাতত সবচেয়ে বেশি বিচলিত পুঁজিবাদী আর্থ-বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদী মহাজন রাষ্ট্রগুলোই নিজেদের স্বার্থেই। অন্যরা অসমর্থ বলেই নীরব-নিষ্ক্রিয় অসহায় দর্শক ও ভুক্তভোগী। কায়রো সম্মেলন আপাতত ব্যর্থ মনে হলেও মুক্তির বীজ মাটিতে প্রোথিত হয়ে গেছে, ছড়িয়ে গেছে চিন্তার ও চেতনার বীজ বিশ্বময়। তেমনি কোপেনহেগেনের সম্মেলনের আপাতরূপ কাপট্যকণ্টকযুক্ত হলেও পরিণামে তাও বিশ্বমানবের বাঁচা-মরার সমস্যা-সঙ্কটের হয়তো এক প্রকার সমাধান দেবে।

মানুষ নানা ঘটনায়-দুর্ঘটনায়-কোন্দলে-দাঙ্গায়-লড়াইয়ে-যুদ্ধে-সংগ্রামে-আন্দোলনে মরছে বটে, কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে অকালমৃত্যুর পথ রুদ্ধ হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছে বলেই অনুন্নত আরণ্য-পার্বত্য-দ্বৈপায়ন উপজাতি, জনজাতি ও আদিবাসী অবধি সবাই এ কালে দীর্ঘজীবী হচ্ছে, চিকিৎসায় হচ্ছে জটিল রোগ থেকেও মুক্ত। এ হচ্ছে উন্নত জীবনযাপন, সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক সমাজলগ্নতা প্রভৃতির অবশ্যম্ভাবী ফল। কালের দাবি ও জীবনের দাবি মানতেই হয়। যুগোপযোগী আধুনিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক, নৈতিক, যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবনযাপন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কালোপযোগী জীবনচেতনার ও জগৎভাবনার অনুশীলন করতেই হবে। যথাকালে যথাস্থানে যথাপ্রয়োজনে যথাকর্ম করতেই হয়। এ অবস্থায় কালোপযোগী মন-মগজ-মনন-মনীষা প্রভৃতির অনুশীলন করতে হলে উপযোগরিক্ত, তাৎপর্যহীন সেকেলে বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার পরিবর্তন, পরিমার্জন, বিবর্তন কিংবা বর্জন আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এ জন্যেও ব্যক্তিক এবং দলীয়ভাবে চিন্তার অনুশীলন আবশ্যিক ও জরুরি। আমাদের এ প্রয়াসের প্রথম শর্ত হচ্ছে Emancipation of Intellect– বদ্ধ চেতনার মনীষা থেকে মুক্তি। শিখা গোষ্ঠীর ভাষায় 'বুদ্ধির মুক্তি'। এ জন্যে আমাদের মনে এ কালের প্রতিবাদী তরুণ-তরুণীদের জন্যে An Association of Free Thinkers গড়ে তোলা– বাঙলায় যার নাম হতে পারে 'মুক্ত চিন্তক সমিতি'/সঙ্ঘ/আড্ডা/সংস্থা কিংবা Free Thinkers Society 'মুক্ত চিন্তক সমাজ বা সঙ্ঘ'। তাদের কাজ হবে যুক্তিবাদী হওয়া, Rational হওয়া। যা যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক মাপে ঠেকে না, তা বর্জন করা। যা ন্যায্যতা ও বিবেকানুগত নয়, তা পরিহার করে চলা। মনে রাখতে হবে সংস্কৃতিমানের ষড়গুণ থাকা আবশ্যিক: সংযম, পরমত-পরকর্ম ও পরআচরণ সহিষ্ণুতা, যুক্তিনিষ্ঠা, ন্যায্যতাবোধ, বিবেকানুগত্য ও সৌজন্য। মুক্ত চিন্তকসমাজ যত বেশি জনবহুল হবে, দেশের পক্ষে তা হবে তত বেশি কল্যাণকর। কেননা আমরা জানি, মানুষ ভালোও নয়; মন্দও নয়, কখনো ভালো কখনো মন্দ, কারো জন্যে, কারো কাছে ভালো, কারো পক্ষে মন্দ। লাভ-লোভ-স্বার্থ, ক্রোধ-অসূয়া বশে শত্রু-মিত্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সভ্য-অসভ্য নির্বিশেষে কেবল সৈনিক-পুলিশ হিসেবে নয়, মানুষ শ্বাপদের চেয়েও বেশি হিংস্র হয়ে প্রতিশোধলিপ্সু হয়ে ওঠে। তাই মানুষের এ স্বভাব সংযমনের ও প্রশমনের জন্যে বিবেকবান যুক্তিবাদী মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রয়োজন। মুক্ত চিন্তক সমিতি বা সংঘ বা আড্ডা তৈরি এ জন্যেই শ্রেয় বলেই সচেতন মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে আবশ্যিক ও জরুরি বলে বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রাণী হিসেবে মানুষের মধ্যে হিংসা-ঘৃণা-ঈর্ষা-রেষারেষি– প্রতিশোধ স্পৃহা প্রভৃতি থাকবেই। কিন্তু সভ্য মানুষে তা সম্পদ লুটের ও হত্যার রূপ নিলে তাদের প্রাণিত্ব প্রমাণিত হয় বটে, কিন্তু মনুষ্যত্ব যে তাদের নেই, সে-সম্বন্ধেও নিঃসংশয় হওয়া যায়। আমরা মানুষকে সংযত, সহিষ্ণু, বিবেচক, বিবেকী, যুক্তিনিষ্ঠ, ন্যায্যতাপ্রিয়, সংস্কৃতিমান মানুষ্যরূপে দেখতে চাই। যদি সরকারী আইনের বাধা থাকে কিংবা মৌলবাদীর হামলার আশঙ্কা থাকে, তা হলে সমিতি, সমাজ, সঙ্ঘ, সংস্থা না করে গাঁয়ে-গাঁয়ে, পাড়ায়-পাড়ায়, স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে, মহল্লায়-মহল্লায় পাঁচ/সাতজন সহ ও সমমনা তরুণ-তরুণীর আড্ডা গড়ে তুললেও ফ্রিথিঙ্কারদের প্রভাব দ্রুত প্রসার লাভ করবে।

প্রস্তাবিত ফ্রিথিঙ্কার্স ফোরাম/ক্লাব/সোসাইটি সঙ্ঘ/সমিতি/আড্ডা [খসড়া ম্যানিফেস্টো]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশৈশব দৃষ্ট, শ্রুত, লব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণায় চালিত হতে চায় না ফ্রিথিঙ্কার্স। তারা নিজেদের যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান প্রয়োগে জীবনের ও জগতের তথা মর্ত্যজীবনের তাৎপর্য সন্ধান করে।

১. ফ্রিথিঙ্কার্স-এর জীবনের পুঁজি-পাথেয় হচ্ছে Rationalism, Liberalism ও Science আর Technology। ফ্রিথিঙ্কার্স জানে ethnic, racial, religious, regional, linguistic স্বাতন্ত্র্য-চেতনাই মানুষে মানুষে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ-সংঘাত জিইয়ে রেখেছে।

২. ফ্রিথিঙ্কার্স মাত্রই স্বকালীন বা সমকালীন জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে যা-কিছু আবশ্যিক ও জরুরি, তা নির্বিচারে, নিঃসঙ্কোচে অনুকরণে অনুসরণে গ্রহণ ও অর্জন করে। এতে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-সংস্কৃতি-আচার-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। নিষ্ফল উপযোগরিক্ত তাৎপর্যশূন্য পুরোনো রীতি-নীতি বর্জন করে এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে যন্ত্রনির্ভর জীবনে প্রয়োজন ও উপযোগ সচেতন থাকাই ফ্রিথিঙ্কার্সের লক্ষ্য।

৩. ফ্রিথিঙ্কার্স মাত্রই হবে বিজ্ঞানমনস্ক, বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণায় আস্থাহীন এবং বিজ্ঞানের সত্যে, তত্ত্বে ও তথ্যে আস্থাবান এবং যন্ত্র-প্রকৌশল-প্রযুক্তির অবদানের গুরুত্ব সচেতন বলেই যন্ত্র-প্রকৌশল-প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক জীবন যাপনে আগ্রহী এবং উপযোগ ও তাৎপর্যহীন ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা নিষ্ফল বলে আবর্জনার মতো বর্জনে এবং আধুনিক বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক জীবন-যাপন পদ্ধতি গ্রহণে ও অর্জনে উৎসাহী। ফ্রিথিঙ্কার্স নিত্য নতুনের প্রত্যাশী ও প্রাগ্রসরতার সাধক। ফ্রিথিঙ্কার্সের ধারণা সবাই কেবল যদি স্রষ্টা মানে, কিন্তু শাস্ত্রবর্জন করে কিংবা নাস্তিক হয়, অথবা কম্যুনিস্ট হয় বা নিদেনপক্ষে সেক্যুলার হয়, তা হলেই কেবল মানুষের স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধিজাত রক্তক্ষরা প্রাণহরা হিংস্রতা কমবে।

৪. ফ্রিথিঙ্কার্স মাত্রই হয় প্রগতিবাদী। কাজেই ফ্রিথিঙ্কার্স মাত্রই হয় প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিপক্ষ। প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার এ দ্বন্দ্বে প্রগতিশীলরা অহিংসনীতি অনুসরণে জাতিসঙ্ঘ-স্বীকৃত মৌল মানবিক অধিকার প্রয়োগে স্বমত, মন্তব্য, সিদ্ধান্ত ও জীবন-যাপন পদ্ধতি গ্রহণের, প্রকাশের, মুদ্রিত আকারে প্রচারের অধিকার বাস্তবায়নের দাবির ভাষিক সংগ্রাম চালিয়ে যায় কথায়, লেখায়, আঁকায়, গানে, নাটকে– যাতে আমজনতার মন প্রগতি প্রভাবিত হয় এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা পরিহারে আগ্রহী হয়। প্রতিক্রিয়াশীলদের অস্তিত্ব তারা উপেক্ষা করে চলে। কারণ প্রতিক্রিয়াশীলেরা থাকে রক্ষণশীল, অভ্যস্ত জীবনের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত অর্থোডকস, মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক চেতনাদুষ্ট, বিজ্ঞানের তত্ত্বে তথ্যে সত্যে আস্থাহীন, শাস্ত্রের গোত্রের অঞ্চলের ভাষার স্বাতন্ত্র্য প্রিয় (Race, Religion, Region ও Language-এর)। প্রগতিবাদীরা যৌক্তিক, বৌদ্ধিক ও বিবেকী ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে রক্ষণশীলদের মন্থরগতিতে প্রভাবিত করে প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রতিরোধ করবে।

৫. প্রগতিশীল মাত্রই হবে সর্বসংস্কারমুক্ত, সংযত, পরমত-কর্ম-আচরণ-সহিষ্ণু যুক্তিনিষ্ঠ, ন্যায্যতাবাদী, বিবেকী সজ্জন। প্রগতিবাদী মাত্রই যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-ন্যায় ও বিবেক অনুগ জীবন যাপন করবে। যৌক্তিক-বৌদ্ধিক-বিবেকী জীবন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা-প্রতারণা বিমুখ হবেই। বণ্টনে বাঁচার নীতিতে হবে আস্থাবান।

৬. ফ্রিথিঙ্কার্স নিজেদের মধ্যে যে-কোনো বিষয়ে প্রশ্নোত্তরে, তর্কে-বিতর্কে স্বাধীনভাবে নিঃশঙ্ক নিঃসংকোচ আলোচনা করবে। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে আলাপে অপরিচিতির বাধা থাকলে তার সঙ্গে মতামত বিনিময়ে 'ask not, tell not' 'জিজ্ঞাসাও করো না, উত্তরও দিয়ো না'– এ নীতিই হবে অনুসৃত।

৭. ফ্রিথিঙ্কার্স মর্ত্যজীবনেই কেবল গুরুত্ব দেয়। মর্ত্যজীবনের আর্থ-বাণিজ্যিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে ও নীতিতে-রীতিতে গুরুত্ব দেয়। জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-গোত্র-নিবাস-যোগ্যতা-দক্ষতা নির্বিশেষে প্রাণীর প্রজাতি মানুষ মাত্রেরই প্রাণের মূল্য তাদের কাছে সমান।

৮. ফ্রিথিঙ্কার্সের প্রভাবে পরিণামে ব্যক্তিগতভাবে মানবিকগুণের বা মানবতার তথা মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব হবে এবং ফলে চাকমা, মার্মা, ত্রিপুর, গারো, নাগা, কুকি, সাঁওতাল, মুণ্ডা, পাঙ্খা, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান-মুসলিম নিয়ে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-গোত্র নির্বিশেষে দৈশিক বা রাষ্ট্রিক জাতি গড়ে উঠবে। জয় হবে মনুষ্যত্বের। ফ্রিথিঙ্কার ছাড়া কেউ আশৈশব শ্রুত, লব্ধ ও অভ্যস্ত-গৃহাবদ্ধ জীবনের চিন্তা-চেতনা নিয়ে আলোর জগতে আসতে পারে না।

AMARBOI.COM

আজকের জীবনের দাবি

কালস্রোতে ভেসে যায় পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-প্রাতিভাসিক জ্ঞান-দর্শন-নৈতিকচেতনা-আচার। আগেকার দিনে মানুষ সাহিত্যসৃষ্টিতেও দৈবপ্রেরণা অনুভব করতেন। আসলে অলৌকিকতার অলীকতায় আস্থা হচ্ছে মানবপ্রজাতির অবিকশিত শৈশব-বাল্য-কৈশোর চেতনার-চিন্তার, সাধ-স্বপ্ন-কল্পনার, মনের-মগজের-মননের অপরিণত স্তরের তথা যৌক্তিক-বৌদ্ধিক শক্তির রিক্ততার সাক্ষ্য মাত্র এবং মননের মনীষার অনুন্মেষ সঞ্জাত। সর্বক্ষেত্রে তার স্থূলবুদ্ধির এবং অসমর্থের আকঙ্ক্ষা পূর্তির আগ্রহই এমনি অলীকতায় ও অলৌকিকতায় আস্থার ও ভরসার উৎস।

দৈব প্রেরণা বলে কিছু নেই– মন তৈরি করার, মনে আগ্রহ ও স্পৃহা জাগানোর মতো আবেগ সৃষ্টি হওয়াই হচ্ছে প্রেরণা। দেখা যায় মন তৈরি না হলে অর্থাৎ মনে আবেগ-আগ্রহ না জাগলে তৃষ্ণার জল সংগ্রহের জন্যেও শয্যা ছেড়ে পাশের কক্ষে সহজে যাওয়া হয় না। আবার প্রতিভা বলেও কিছু নেই। মন-মগজ-মনন-মনীষার উৎকর্ষ ও অনুশীলন প্রসূত গুণ-মান-মাপ-মাত্রার আধিক্যই হচ্ছে প্রতিভা।

আগেকার যুগের অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, অসমর্থ মানুষ সাধ-স্বপ্ন-কল্পনার জগতে বাস করত, আন্দাজে-অনুমানে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে অলীক-অলৌকিক-অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির লীলা যুক্তি-বুদ্ধির ও কারণ-কার্য সম্পর্ক জ্ঞানের অভাবে জীবন-জীবিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বক্ষেত্রে অনুভব-উপলব্ধি করত এবং বিশ্বাসের-সংস্কারের ধারণার বশে তাকে প্রায় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মর্যাদায় ও নিঃসংশয় আস্থায় মেনে চলত। তাই তাদের জীবন-চেতনায় সব অজ্ঞাত-অসম্ভব-অস্বাভাবিক-অলীক বস্তুর আর ঘটনারও প্রভাব ছিল সম্ভব-স্বাভাবিক এবং প্রায় প্রত্যক্ষ বা অনুভূত-উপলব্ধ বাস্তব। রূপকথা, ইতিহাস, পুরাণ, মিথ-শাস্ত্র ছিল ষোলো-আনা সত্য। তাদের মানসজগতে শিলা ভাসে জলে, গন্ধমাদন পর্বত স্থানান্তরে নেয়া সহজ, সম্ভব অগস্ত্যমুনির সমুদ্রশোষণ, ভূত-প্রেত-জিন-পরী-দানব-দেবতা-উপদেবতা-অপদেবতা-পিশাচ-রাক্ষস-ড্রাগন প্রভৃতির ত্রিভুবনে বিচরণ সব ছিল সম্ভব, স্বাভাবিক, সত্য ও বাস্তব।

যদিও তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ছিল বাস্তবে শূন্যতার কোঠায়, জীবনযাপন পদ্ধতি ছিল ঋজু মেরুদণ্ডের ও দু'হাতের বদৌলত অন্য প্রাণী থেকে সামান্য গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় উঁচু, অর্থাৎ শিম্পাঞ্জি প্রভৃতির চেয়ে উঁচুমানের মাত্র। কিন্তু তাদের উচ্চাশা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল মানসিক স্তরে অনেক বেশি ও বিচিত্র। কবি মোহিতলাল মজুমদারের ভাষায় :

জীবন যাহার অতি দুর্বহ দীন দুর্বল সবি
রসাতলে বসি গড়িছে স্বর্গ সেইজন বটে কবি।

এবং *জীবনে যে-সাধ মিটাতে পারি না সে-সাধ জেগেছে গানে।*

AMARBOI.COM

এ কারণেই উনিশ এবং বিশ শতকের প্রথমপাদ অবধি সভ্যতম জাতিদের মধ্যেও রোমান্টিকতা ছিল আসক্তির ও আকর্ষণের বিষয়। বিজ্ঞানমনস্কতা এবং যুক্তিনিষ্ঠা ও মাটিলগ্ন জীবনচেতনা মানুষকে বাস্তব জীবনভাবনায় ও বাস্তব জগৎচেতনায় গুরুত্ব দিতে ও আস্থা রাখতে প্রণোদনা-প্রবর্তনা দিয়েছে এবং দিচ্ছে।

আমরা যদি স্বীকার করি যে, মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণমাত্রই জীবন রক্ষণ ও জীবনের উন্নয়ন-উৎকর্ষমুখী, তাহলে মানতেই হবে জীবন থেকেই এবং জীবনের বিকাশ লক্ষ্যেই মানুষের মানসিক ও কায়িক কর্মপ্রয়াস চালিত। অতএব মানুষের প্রয়াসের দুই রূপ: প্রেয়স ও শ্রেয়স; আত্মকল্যাণ ও সমাজকল্যাণ। একালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের-দর্শনের-চেতনার-চিন্তার প্রসারে মানুষ অজ্ঞতার যুগের বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভক্তি-ভরসা এবং আনুমানিক সত্য পরিহার করতে ক্রমশ অভ্যস্ত হচ্ছে। ফলে মানুষের জীবনচেতনা ও জগৎ-ভাবনা এখন মাটিলগ্ন বাস্তব জীবন সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে। এ জন্যেই একালের চিন্তা-চেতনা, শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি সর্বপ্রকার কলাচর্চার বিষয় হয়ে উঠছে রূঢ় বাস্তব জীবনের প্রতিম, প্রতীক ও প্রতিভূ। বাস্তব জীবনের যে-রূপ আছে এবং বাস্তব জীবনে যে-রূপ থাকা বাঞ্ছিত তার আলেখ্যদানই হচ্ছে চিন্তক, লেখক, কবি, চিত্রী, ভাস্কর প্রভৃতির দায়িত্ব ও কর্তব্য। মানুষের মন-মগজ-মনন-মনীষা মানব কল্যাণেই জীবনের প্রাত্যহিক প্রয়োজনেই জীবনের বাস্তব সমস্যা-সঙ্কটের সমাধানে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যিক ও জরুরি এবং এখানেই এ দায়িত্বের ও কর্তব্যের শেষ নয়। প্রাণিজগতে যেমন আকৃতি-প্রকৃতি ও স্থান-কাল নির্বিশেষে কুকুর, বানর, বাঘ, সিংহ, গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া এক নামেই পরিচিত, মানুষকেও তেমনি জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-নিবাস-যোগ্যতা-দক্ষতা-চরিত্র নির্বিশেষে কেবল 'মানুষ' বলেই জানতে, বুঝতে ও মানতে হবে। তাহলেই কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জগদ্ব্যাপী শোষিত-পীড়িত-দলিত-অবজ্ঞাত, নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ, দরিদ্র মানবের মুক্তি সম্ভব হবে। সামাজিক, শাস্ত্রিক, আচারিক নীতি-নিয়মে শুধু এ মনোভাবের প্রাবল্যে ও প্রভাবে আসবে পরিবর্তন।

মানুষের শিল্প-সাহিত্যাদি কলার চর্চার বিষয় যেমন হতে হবে মানুষের কাম-প্রেম, সাচ্ছল্য-অনটন, মিলন-বিরহ, বিচ্ছেদ-বিরোধ, সমস্যা-সঙ্কট, জয়-পরাজয়, সাফল্য-ব্যর্থতা সম্পৃক্ত আনন্দ-উল্লাস, বেদনা-যন্ত্রণা প্রভৃতির বাস্তব আলেখ্য এবং প্রতিকার পন্থার সন্ধিৎসা জাগানোর প্রেরণা-প্রণোদনা-প্রবর্তনা দান, তেমনি বাস্তবে মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, শৈক্ষিক, নৈতিক এবং রাজনৈতিক আর প্রাশাসনিক নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতিও হবে গণমানবের, আমজনতার স্বার্থের অনুকূল। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিক কিংবা শ্রেণীক, গৌত্রিক, গৌষ্ঠীক, আঞ্চলিক লাভ-লোভ-স্বার্থ চেতনা আর দেশপ্রেমহীন, মানব সেবাবিমুখ, ব্যক্তিক কিংবা দলীয় স্বার্থ বা ক্ষমতার রাজনীতি, গদি দখলে রাখার কিংবা গদির দখলচ্যুত করার রাজনীতিক জুয়া দেশের, জাতির, মানুষের, সরকারের ও রাষ্ট্রের পক্ষে সর্বপ্রকারে ক্ষতিকর– মনুষ্যত্ব উন্মেষের, সংস্কৃতি বিকাশের পরিপন্থী। এ কালে অর্থাৎ এ যন্ত্রনির্ভর বিজ্ঞানের প্রসাদপুষ্ট যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক চালিত সমাজমুখিতার কালে আগের দিনের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা ও মূল্যবোধ বদলাতেই হবে। নইলে পরিত্রাণ মিলবে না। সুখ দেওয়াও যাবে না, সুখ ভোগ করাও হবে না সম্ভব। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে ভাগে বণ্টনে বাঁচার দিন সমাগত।

AMARBOI.COM

দেশে-বিদেশে সংখ্যালঘুর স্থিতি

ছেলেবেলা থেকেই একটা আপ্তবাক্যরূপ পদ্য পড়েছি এবং আজো শুনে আসছি। কথাটি এই : 'সুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয়/ অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।' মানুষের ও অন্য প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় হঠাৎ আকস্মিক কোনো কারণে বিরোধ-বিবাদ দাঙ্গা-লড়াই যুদ্ধ বেধে যায় ব্যক্তিগতভাবে কিংবা দলীয়ভাবে। তখন আপনজনও চশমখোর স্বার্থপর হয়ে যায়। তখন সবারই এক কথা 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম।' এমন অবস্থায় মানুষ মনুষ্যত্ব বা মানবিক দায়িত্ববোধ হারায়– হারায় শক্তি-সাহসের অভাবে। আজো তাই কোথাও গোত্রদ্বেষণা, কোথাও বর্ণদ্বেষণা, কোথাও শ্রেণীদ্বেষণা, কোথাও ভাষাদ্বেষণা, কোথাও সংস্কৃতিদ্বেষণা, কোথাও বা বিশেষ বয়সে স্বার্থচেতনাবশে ভ্রাতৃদ্বেষণা মানুষকে কাড়াকাড়ি-মারামারি ও হানাহানি প্রবণ করে রেখেছে। গোটা পৃথিবীর কোথাও বিশেষ করে সংখ্যালঘু জাতের বর্ণের ধর্মের ভাষার নিবাসের সংস্কৃতির মানুষের নির্বিরোধ, নির্বিবাদ, নিরুপদ্রব, নিরাপদ স্বস্তি-শান্তির জীবন সুলভ নয়। অনেক রাষ্ট্রে জীবন-জীবিকার নিশ্চিতিও নেই, নেই স্বসমাজ ও সংস্কৃতি, আচার-আচরণ রক্ষণের ও নির্মিতির সুযোগ-সুবিধে। সভ্য-ভব্য, আদিবাসী উপজাতি জনজাতি নির্বিশেষে সর্বত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংখ্যালঘুমাত্রই নানা কারণে মানসিকভাবে লাঞ্ছিত জীবন যাপন করে এবং ফলে হীনম্মন্যতায় ভোগে। ভীরু সংখ্যালঘুরা একে অপরের সাহায্যে বিপদকালে এগিয়ে আসে না। প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই প্রবল গোত্রের হামলায় দুর্বল গোত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই ষোল শতক থেকে য়ুরোপীয়রা নতুন দেশ আমেরিকা, কালো আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি আবিষ্কার ও অধিকার করার কালে মানুষকে মশা-মাছি-পিঁপড়ের মতোই দমনের দলনের নামে অস্ত্রাঘাতে আর পায়ে ডলে মেরেছে হাজারে হাজারে লাখে লাখে। কলম্বাস প্রথম অভিযাত্রায় ও অভিযানে যেমন নররক্তে মাটি ভিজিয়েছেন, তেমনি আমাদের সভ্য-ভব্য ভারতেও প্রথম পৌঁছেই ভাস্কোদাগামা লোকহত্যায় দ্বিধা করেননি। এ বিষয়ে এঁদের কারো মধ্যেই পাপবোধ ছিল না, কেননা চিরকালই পরাক্রান্ত উচ্চাশী ব্যক্তি দাস, ক্রীতদাস ভূমিদাস কিংবা ভাড়াটে লড়াকু নিয়ে পরদেশ-রাজ্য-সম্পদ-নারী-পুরুষ প্রভৃতির মালিক হতেন এবং 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' নীতির অনুসরণে রাজাকে মেরে-হেনে-কেড়ে নেয় রাজ্য ও সম্পদ। এতে অন্যায় বা পাপ কিছু আছে বলে দুনিয়ার কোনো ধর্মের কোনো কেতাবে লেখে না। রাজার ও তাঁর সৈন্যদের হত্যাকাণ্ডে কোনো পাপ নেই, অন্যায় নেই। যে হারে তার সদল হত্যা অনেক সময়ে প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য ও আবশ্যিক কিংবা জরুরি বলে বিবেচিত হতো। যে জয়ী সেই স্রষ্টার কৃপা প্রাপ্ত, যোগ্য ব্যক্তি। কাজেই বিজয়মাত্রই গৌরবের, গর্বের কৃতি ও কীর্তি। ন্যায় ও নীতি তার চিন্তা-কর্ম-আচরণের সমর্থক। এ জন্যেই 'কিং ক্যান ডু নো রঙ'। শাস্ত্র, সমাজ, যুক্তি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিবেক-বিবেচনা এবং গণসমর্থন প্রবলেরই পক্ষেই। অদৃশ্য আসমানী শক্তির সাহায্য-সহায়তা-সমর্থন-কৃপা-করুণা-দাক্ষিণ্য না থাকলে কি কেউ জয়ী হয়? কর্মে সাফল্য লাভ করে? এ হচ্ছে বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভক্তি-বল-ভরসা নির্ভর অজ্ঞ-অসহায় মানুষের স্থূল চিন্তার-চেতনার, মগজের-মননের প্রসূন বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা। জগৎচেতনা ও জীবনভাবনা তাদের আবর্তিত হয় ওই বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাকে ভিত্তি করেই। তা তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা এবং আসমানী লীলার অনুভূতি-উপলব্ধিজাত প্রত্যয়প্রসূন বটে। মানুষ নিয়তি ও ঐশলীলাবাদী। কোনো সূক্ষ্ম যুক্তি প্রয়োগে কারণ-কার্য নিরূপণ, বিশ্লেষণ কেবল কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোটিতে গুটিকয়েকে সম্ভব হয় মাত্র। মানুষ প্রাণীরই একটা সহজাতবৃত্তি-প্রবৃত্তিচালিত প্রজাতিমাত্র। তার অপত্যস্নেহে-মাতৃপ্রীতিতে কোনো মানবিক কিছু নেই, তেমনি নেই তার ক্রোধে-ক্ষোভে-ঈর্ষায়-অবজ্ঞায়-শত্রুতায়-হিংস্রতায় সাধারণভাবে মানবিকগুণের, সংযমের, সহিষ্ণুতার, সৌজন্যের, ন্যায্যতার ও বিবেকানুগত্যের আভাস। প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে মানুষের গৌত্রিক বিরোধ-বিদ্বেষের এবং হানাহানির ও হিংস্রতার খবর আমাদের মধ্যে মুখে মুখে এবং লিখিতভাবে চালু রয়েছে। যেমন কেনানের ইউসুফ [যোসেফ] নবী দুর্ভিক্ষের সময়ে মিসরে গিয়েছিলেন স্বজাতিদের নিয়ে খেয়ে বাঁচার গরজে। এ সূত্রে ইউসুফ-জোলায়খার প্রণয় স্মর্তব্য। একসময়ে এদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। শাসক ফেরাউন বংশীয়রা সংখ্যাগুরুর হাতে পরাজিত ও রাজ্য হারানোর আশঙ্কায় ইউসুফ বংশীয়দের পুত্রসন্তান জন্মমাত্রই হত্যার আদেশ দেয়। নবী মুসার জন্ম ও রাজরানী হাজেরার কোলে লালিত হওয়ার কিস্‌সার শুরু হয় এভাবেই। শেষাবধি পরিণত বয়সে মুসা নবীকে মিসর ত্যাগ করতে হয় বংশ নিহত হওয়ার আশঙ্কায়। গৌত্রিক বিবাদ-সংঘর্ষ-সংঘাত কত প্রবল হয় এবং পরিণামে কিরূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিংস্রতার জন্ম দেয় তার অন্য প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণের যদুবংশ এবং গৌতম বুদ্ধের সাক্যবংশ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল প্রতিপক্ষ শত্রুর হাতে। বিদ্বানেরা বলেন কৌরব-পাণ্ডব মূলত দুই গোত্র। কুরুক্ষেত্রে এ গৌত্রিক যুদ্ধেই উভয়পক্ষ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। রাবণের বংশেও 'কেহ না রহিল বংশে দিতে বাতি।' আর য়ুরোপীয়দের পশ্চিমগোলার্ধ-অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড-কালো আফ্রিকা দখল তো হত্যায় আদিবাসী নিধনের ইতিবৃত্ত মাত্র।

ইসলামকে বলা হয় শান্তির ধর্ম। তার কারণ আরবে গৌত্রিক বিবাদ ও হানাহানি লেগেই থাকত। ওরা ছিল নির্ভীক ও হিংস্র। নবী মুহম্মদ আল্লাহর স্রষ্টাত্বে, প্রভুত্বে, অব্রাহামের পিতৃত্বে, আদি গোত্রপতিত্বে আস্থা এবং অব্রাহামের বংশধরদের ভ্রাতৃত্বের ধারণা আরব মনে দৃঢ়মূল করে এক সংহত সমাজ এবং ইহ-পরলোকে প্রসৃত জীবনের অভিন্ন লক্ষ্য সম্বন্ধে বিশ্বাস্য ঐশ আবেগ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। ফলে তারা আল্লাহর ইচ্ছার ওপর জীবন-জীবিকা ও মৃত্যু দৃঢ় প্রত্যয়ে সমর্পণ করে। আল্লাহর অভিপ্রায়ই জীবনে রূপায়িত হয়, এ ধারণায় আস্থাবান থেকে তারা নির্ভীক দিগ্বিজয়ী হতে পেরেছিল। আবার আব্বাসীয়রা রাষ্ট্রক্ষমতা পেয়েই নির্মূল করেছিল উম্মাইয়াদের। ভিন্নমতবাদী বলে অন্তত দু'আড়াই লাখ মুতাজিলাকে হত্যা করা হয় বাগদাদের শাসনকালেই হারুন-আর-রশীদ ও আল মামুনের রাজত্বের পরবর্তী সময়ে।

য়ুরোপীয়রা আঠারো শতকে কালো আফ্রিকার জঙ্গলে অনুপ্রবেশ করেই ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন শুরু করে, যদিও মনুষ্যাকৃতির কালো প্রাণীগুলোর তখনো শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধ নিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ মেলেনি। ফলে কৃত্রিমভাবে তারা উন্নততম রাষ্ট্রগুলোর শাসনে, শোষণে ও পীড়নে গৃহপোষ্য পশুর মতোই অনুগত থাকায় অভ্যস্ত হল বটে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিরোধ চালুই রাখে। আর য়ুরোপীয়দের শাসন-শোষণ-পীড়নের নমুনা দক্ষিণ আফ্রিকা ও প্রাক্তন রোডেশিয়া বা এখানকার জিম্বাবুয়ে বা কঙ্গো প্রভৃতি উপনিবেশের চিত্র স্মরণ করলেই কিছুই আর অপরিজ্ঞাত থাকে না। এ মুহূর্তেও রুয়াভায় বুরুন্ডিতে হুতু-তুস্‌সির গৌত্রিক হত্যাকাণ্ড কোনো মতে ১৯৯৪-৯৫ সালের মানবিক দ্বন্দ্ব লড়াই বলে অভিহিত করা যায় না। যানবাহনের, পথঘাটের, তার-বেতারের অভাবে আগের কালে মানুষ পৃথিবীর নানা দুর্গম-অগম্যস্থানে বিচ্ছিন্নতায় অজ্ঞাতবাস করত। পৃথিবীর পরিধি-পরিসরও কারো জানা ছিল না। সেজন্যে ঋজু মেরুদণ্ডে দেহ ও শির উঁচু করে দুপায়ে দাঁড়ানোর মতো বিবর্তিত অবস্থায় উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও সবাই মন-মগজ-মনন-মনীষা প্রয়োগে প্রয়োজনচেতনা ও উচ্চাশাজাত উদ্যম-উদ্যোগ-আয়োজন বাঞ্ছিতমাত্রায় করে উঠতে পারেনি এ বিশশতকের প্রান্তসীমায় এসেও। তাই আজো গোটা পৃথিবী প্রতীচ্য মানুষের আবিষ্কৃত, উদ্ভাবিত, সৃষ্ট, নির্মিত যন্ত্র-প্রকৌশল-প্রযুক্তির নয় কেবল, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি সব কিছুর অনুকরণে-অনুসরণে আত্মোন্নয়ন সম্ভব করছে। আমরা মানব-উত্তরাধিকারের দাবিদার, সেজন্যে গ্রহণে-বরণে-অনুসরণে আমাদের লজ্জা নেই।

কিন্তু যাদের আমরা বিগত চারশ' বছর ধরে নানাভাবে রেনেসাঁসের স্রষ্টা বলে নন্দিত করে সাহিত্যে, শিল্পে, প্রকৌশলে, স্থাপত্যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানে, রসায়নে, পদার্থবিজ্ঞানে, ভূ-বিজ্ঞানে এমনকি অর্থবিজ্ঞানে আর সমাজবিজ্ঞানেও, যাঁদের অবদানে আমরা মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ, তারা কি সামাজিকভাবে সবাই সভ্য ও সংস্কৃতিমান ছিল বা আছে? যিশুর বাণী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের চরিত্রে ও কর্মে-আচরণে কি শোভন সভ্যতা ও সংযম এনে দিতে পেরেছে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আজো বর্ণভেদ তথা কালো আদমির প্রতি নিন্দা-অবজ্ঞা রয়ে গেছে, এমন কি প্রোটেস্ট্যান্ট না হলে রাষ্ট্রপতি পদে ভোটও মেলে না। আর রেনেসাঁসের সমান্তরালভাবে য়ুরোপীয় সমাজে মানুষের, রাষ্ট্রশক্তির, ধর্মধ্বজীদের বর্বরতার ও অমানবিকতার শতবছরের, ত্রিশ বছরের যুদ্ধাদিই প্রমাণ। প্রমাণ যোয়ান অব আর্ককে জীবন্ত দহনেও মেলে। গত শতকে বিসমার্ক যে অস্ট্রিয়া ভেঙে জার্মানি রাষ্ট্র তৈরি করলেন, সেতো কেবল একই ভাষীর ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট হওয়ার কারণেই। উত্তর আয়ারল্যান্ডের সমস্যাও তো ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্টসম্পৃক্ত। বসনিয়ায় চলছে খ্রীস্টান-মুসলিম যুদ্ধ, পাঁচ লক্ষ মুসলিমকে হননে-দহনে-ধর্ষণে-লুণ্ঠনে স্বভূম থেকে উৎখাত করেছে খ্রীস্টান সার্বরা য়ুরোপীয় খ্রীস্টানদের প্রচ্ছন্ন সমর্থনে-সহায়তায়। বর্ণদাঙ্গার শুরু দেখছি লন্ডনে।

তাছাড়া গোটা য়ুরোপব্যাপী সংখ্যালঘু ইহুদীর বিশেষ করে মানসিক নির্যাতন-লাঞ্ছনা এবং সময়ে সময়ে নানাস্থানে জান-মাল-গর্দানের ওপর হামলা কোনো সভ্যতার বা সংস্কৃতির উদারতার বা মানবতার পরিচয় বহন করে না। ব্রিটেনে ইহুদীরা সাধারণভাবে নিরাপদ নিরুপদ্রব জীবন যাপন করেছে, ইহুদী ডিজরেলি সুয়েজ ক্রয় ও খনন করে ব্রিটিশ জাতির মহা উপকারই করেছিলেন। কিন্তু তিনি বা পরবর্তী ইহুদী মন্ত্রীরাও খ্রীস্টান সমাজে অবজ্ঞেয় ও উপহসিত হতেন। পোলান্ড রাশিয়া প্রভৃতির পরে শেষ ইহুদী নির্যাতন ও অমানবিক হিংস্র ইহুদীনিধন ঘটে হিটলারের হাতে। আজ অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীর ধনিক-বণিক-বিদ্বান বলে আদর-কদর বেশি। কিন্তু কাইজারের জার্মানির মতো কখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের আর্থিক জীবন বিপর্যস্ত হলে সেদিন কি ইহুদী বিতাড়ন রোধ করা যাবে? এসব অভিজ্ঞতা থেকেই তো 'জায়নিস্ট' আন্দোলনের শুরু ও ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা। কুর্দীরা শত শত বছর ধরে ইরাকে-ইরানে-তুরস্কে-সোভিয়েত রাশিয়ায় নির্যাতিত ও শোষিত হচ্ছে। কম্যুনিস্ট বিরোধী আফগান মুসলিমরা ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যেই সংগ্রাম করে যখন জয়ী হল তখন শিয়া, সুন্নী-মযহাবী-আহমদীয়া-পস্তুভাষী-ফারসীভাষীর মধ্যে আট বছর ধরে চলছে লড়াই। গোটা পৃথিবীব্যাপী জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-সবলতা-দুর্বলতা-দক্ষতা-অদক্ষতা-পেশাগত বিভিন্নতা-অর্থসম্পদ-শিক্ষা-ক্ষমতাগত প্রভেদ-পার্থক্য মানুষকে পরস্পরের প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু দলে বিভক্ত করে রেখেছে। কাজেই এ বৃত্তান্ত বয়ানে শেষ হবে না। তার প্রয়োজনও নেই।

তবে আমাদের উপমহাদেশের কথা বয়ান না করলে আলোচনা এবং প্রতিপাদ্য বিষয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ্য মনীষা এক অসামান্যতার স্বাক্ষর রেখেছে। ঐশ অভিপ্রায়ের ও নির্দেশের নামে মানুষকে অস্পৃশ্য-স্পৃশ্য দাসে, ক্রীতদাসে, ভূমিদাসে এবং প্রজন্ম পরম্পরায় ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, ঘৃণ্য পেশায় ও সীমিত উপার্জনে প্রজন্মক্রমে দরিদ্র থাকার মতো ঘরানা পেশায় নিবদ্ধ রেখেছে। শূদ্র ও সৎশূদ্র নামে কিছু লোককে কাছে-পাশে অনুগৃহীত রূপে তুষ্ট, তৃপ্ত, হৃষ্ট ও অর্থসম্পদে পুষ্ট রেখে ব্রাহ্মণেরা শূদ্রসেব্য দেবকল্প বা দেব প্রতিম, প্রতীক ও প্রতিভূরূপে মর্ত্যদেবতার আসন আজ অবধি প্রশ্নাতীতভাবে অটুট অনড় রেখেছে। এর নাম বর্ণে বিন্যস্ত বর্ণাশ্রম সমাজ। আজো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আস্তিক ব্রাহ্মণ্যবাদীর সাধ্য নেই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের ও পূজনীয়ত্বের দাবি অস্বীকার করার। একালে কেবল আর্থ-বাণিজ্যে পদপদবী ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধে দাবি করার সাহস পাচ্ছে অচ্ছুৎরা, ঘরানাবৃত্তি ত্যাগ করে, শিক্ষিত হয়ে যথাযোগ্য আর্থিক অবস্থা ও অবস্থান দাবি ও আদায় করছে মাত্র। মনে রাখতে হবে বর্ধমান মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ দেব-দ্বিজ-বেদদ্রোহী হয়েও সমাজবিপ্লব ঘটিয়ে নমঃশূদ্রের ও নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য দাপট খর্ব করতে পারেননি। পরবর্তীকালে নয় শতকে ইসলামের প্রভাবে দক্ষিণ ভারতে শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভ, চৈতন্য প্রমুখ ব্রাহ্মণ সন্তানও বিমূর্ত ব্রহ্মবাদ প্রচার করেও ব্রাহ্মণ্য শাসন-শোষণ-দাসত্ব এবং অস্পৃশ্যতা মুক্ত করতে পারেননি ভারতবর্ষের গণমানবকে। তারপরে তুর্কী-মুঘল বিজয়ের পরে উত্তর ভারতের অচ্ছুৎরা ইসলামি সাম্য দর্শনে নিজেদের মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘোচানোর লক্ষ্যে দ্রোহী-বিপ্লবী হয়ে ওঠে। এ হচ্ছে প্রজন্ম পরম্পরায় নিপীড়িত-লাঞ্ছিত মানবতার দ্রোহ বা বিপ্লব। উত্তর ভারতে এবার দেব-দ্বিজ-বেদদ্রোহী বঞ্চিত অবজ্ঞাত অবহেলিত অস্পৃশ্য নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র এবং দেবতারও ঘৃণ্য মানবগোষ্ঠী স্রষ্টার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক-সম্বন্ধ স্থাপন করল ভক্তির রজ্জুর বন্ধনে উপাস্যকে ও উপাসককে বেঁধে। এর নাম সন্তধর্ম। উত্তর ভারতে এ ভক্তিবাদীর প্রবর্তক ও প্রচারক ছিলেন তথাকথিত ছোটলোকেরা— মুদি, মুচি, মালী, সুতার, কুমার, নাপিত, মেথর বা ঝাড়ুদার শ্রেণীর লোক। যেমন কবীর ছিলেন তাঁতীর ছেলে (বৌদ্ধজ), রবিদাস মুচি, সেন নাপিত, তুকারাম শূদ্র, ধর্মদাস মুদি, নামদেব স্পৃশ্য হলেও ছিলেন দরিদ্র দর্জি এবং নানক ছিলেন রঙরেজ, দাদু ধুনকর, সুন্দরদাস বেণে, বিমান চাষী, তিরুবল্লভ পারিয়া, রামানন্দ-রামদাস-একনাথ-রজবও ছিলেন না মানী ঘরের সন্তান। উল্লেখ্য যে আরব, তুর্কী ও মুঘল বিজয়ের পরে দায়ে না ঠেকলে শূদ্রসেব্য কোনো বর্ণহিন্দুই সাম্যের আকর্ষণে ইসলাম বরণ করে আত্ম অধিকার, সুবিধে ও মর্যাদা হননে আগ্রহী হয়নি। তাই মুলতানের পূর্ব-দক্ষিণে উত্তর-পূর্বে হিন্দুবৌদ্ধজ মুসলিমরাও ছিল নমঃশূদ্র শ্রেণীর তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘৃণ্য ঘরানাপেশাজীবীর অজ্ঞ অনক্ষর নিঃস্ব নিরন্ন-দুস্থ দরিদ্র মানুষ। এতো দ্রোহ-বিপ্লবের পরেও উপমহাদেশে দুস্থ-দরিদ্র স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য মানুষের শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনামুক্তি ঘটেনি এ মুহূর্তেও। ভারতবর্ষ যে চিরকাল বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষী শাসিত হয়েছে, কারো আক্রমণ ও বিজয় ঠেকানো যায়নি, তার কারণ মানুষের প্রতি মানুষের অমানবিক অস্বাভাবিক ঘৃণাজাত বিচ্ছিন্নতা এবং সমস্বার্থে সংহতির ও সহযোগিতার অভাব।

আজকের উপমহাদেশের পাকিস্তানের সিন্ধুতে সামান্য সংখ্যক হিন্দু আছে মাত্র। কিন্তু মুসলিমদের মধ্যেই সম্ভবত হিন্দুর অভাবে শিয়ায়-সুন্নীতে-আহমদিয়ায়-জামাতে ইসলামিতে-বিহারীতে-সিন্ধিতে মারামারি হানাহানি এখন তুঙ্গে। বাঙলাদেশে সংখ্যালঘু খ্রীস্টানরা এন.জি.ওতে চাকরি পেয়ে আজ ধনী ও সুখী, হিন্দুরা নানাভাবে মানসিক পীড়নের লাঞ্ছনার এবং বৈষয়িক ক্ষেত্রে বঞ্চনার স্বীকার হয়ে অনিশ্চিতির মধ্যে 'দীনহীন নিশিদিন পরাধীন' জীবনই যাপন করছে আর অর্থসম্পদ পাচার করছে এবং সুযোগ মতো পালাচ্ছেও স্বস্তি-শান্তি-নিরাপত্তার আশায় ও আশ্বাসে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধেরা, গারো, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী উপজাতি জনজাতিরা অবহেলিত বলেই নৈরাশ্যে দুস্থ ও নিরানন্দ জীবন যাপন করছে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর ভারত ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে নানা জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-অঞ্চল-আবহাওয়া-সংস্কৃতির এবং জীবনযাত্রা পদ্ধতির বিষম ও বিচিত্র মানুষের অসঙ্গত-অসমঞ্জস সমাবেশে। ফলে দেহাবয়বে, ভাষায়, জীবনযাত্রার নিয়মে, স্বার্থচেতনায় বিভিন্নতা বিসদৃশ্যতা আছে, সাদৃশ্য ও ঐক্য ভেতরে বাইরে সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই কাশ্মীরে, পাঞ্জাবে, ঝাড়খণ্ডে, মিজোরামে, অরুণাচলে, ত্রিপুরায়, নাগাল্যাণ্ডে, মণিপুরে বড়ো কুকি-অহমী প্রভৃতি হিন্দু-ভারতীয় নয় বলেই ভারতরাষ্ট্রভুক্ত থাকতে নারাজ, আজ তাই তারা স্বাধীনতাকামী দ্রোহী– গেরিলাযুদ্ধে রত। আর বর্ণহিন্দুর সঙ্গে অচ্ছুৎদের ও মুসলিমদের দাঙ্গা তো এখানে সেখানে বারোমাস লেগেই রয়েছে। ইতিহাসের সাক্ষ্যে আমরা বলতে পারি বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষী-বিদেশীকে কেউ সহ্য করতে চায় না। পনেরো শতকে স্পেন থেকে মুরদের তথা মুসলিম শাসকগোষ্ঠীকে কেড়ে-মেরে-হেনে বিতাড়িত করেছিল স্পেন-পর্তুগালের খ্রীস্টানরা। ফিজিদ্বীপে আদিবাসীরা ভারতীয়দের দৌরাত্ম্য-আধিপত্য কিংবা স্থিতি সহ্য করতে চাইছে না। রোডেশিয়ার মতো দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেও শ্বেতকায় লোকেরা এখন থেকে ভাগতে থাকবে। হিটলারের ইহুদী হত্যা আবার স্মর্তব্য। এ সূত্রে কুইবেকের ফরাসীদের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি প্রয়াস, অস্ট্রেলিয়ার এবং নিউজিল্যান্ডের ইংল্যান্ডের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হওয়ার বাঞ্ছা স্মরণীয়। একালে কেউ কারো নামে চলতে রাজি নয়, স্বনামে ধন্য ও কৃতার্থ হতে চায়। এ সূত্রে উল্লেখ্য যে, বিজাতিকে কেউ স্বজন-স্বজাতিরূপে গ্রহণ করে না। প্রমাণ, য়ুরোপীয়দের উপনিবেশে য়ুরোপীয় ভাষা ইংরেজীতে, ফরাসীতে, স্পেনিশে লিখিত সাহিত্য প্রভুগোষ্ঠীর সাহিত্যের ইতিহাসে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়নি, হবেও না।

আগে ঔপনিবেশিক স্বার্থে, শ্রমিক জোগাড়ের প্রয়োজনে য়ুরোপীয়রা ও আমেরিকানরা স্বদেশের দ্বার বিদেশীদের প্রবেশের জন্যে উন্মুক্ত রেখেছিল। এখন আর্থ-বাণিজ্যিক মহাজনী সাম্রাজ্যবাদ চালু থাকলেও এর রীতিপদ্ধতি, নিয়মনীতি আলাদা। তাই আজকাল কেউ কাউকে সহজে স্বদেশে প্রবেশের ও থাকার অনুমতি দেয় না– দক্ষ লোকের শ্রমের প্রয়োজন না হলে। রাষ্ট্রবাসীর আর্থিক অবস্থা বিপর্যস্ত হলে, তারা বেকার হলে বিদেশী-বিধর্মী-বিজাতি-বিভাষীদের স্বদেশ থেকে তাড়াবে।

এ সেদিন পর্যন্ত তুর্কী শ্রমিকরা পশ্চিম জার্মানিতে কাজ পেত। পূর্ব জার্মানির বেকারদের কাজ পাইয়ে দেয়ার জন্যে তুর্কীদের বিদায় দিয়েছে, দিচ্ছে, আবার পুরুষের অভাবে জার্মান মহিলা বিয়ে করার অধিকার বাদামি রঙের লোকেরাও পাচ্ছে এবং নাগরিকত্ব পাচ্ছে। এগুলো সমস্যার সাময়িক সমাধান মাত্র। তেলওয়ালা পশ্চিম এশিয়ার ও উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলো অন্যদের সঙ্গে এ উপমহাদেশেরও লক্ষ লক্ষ লোককে পেশাগত দক্ষতা ও প্রয়োজন অনুসারে চাকরি দিয়েছিল, এখন তাদের নিজেদের লোক তৈরি হয়ে গেছে, যাচ্ছে, তাই কুলি-মজুর ছাড়া অন্যদের আর আদর-কদর ও চাহিদা নেই। শুনতে পাই জাপান, মালয়েশিয়া থেকে সৌদি রাজ্য অবধি অনেক দেশই অবৈধভাবে প্রবিষ্ট উপমহাদেশীয়দের, বাঙালিদেরও লাখে লাখে কিংবা হাজারে হাজারে ফেরত পাঠাচ্ছে।

যিশুর কথায় 'এ ম্যান ডাজ নট লিভ বাই ব্রেড এলোন'– তত্ত্বে যদি আস্থা রাখি, তাহলে মানতেই হবে বিদেশে বিভুঁইয়ে বিজাতি-বিধর্মীর মধ্যে কাজ পেয়ে অর্থাধিক্যে ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে-বিলাসে-ব্যসনে দিন যাপন করা যাবে বটে, কিন্তু সংখ্যাগুরুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবজ্ঞার, অবহেলার ও ঔদাসীন্যের পাত্রপাত্রী হয়ে বাঁচাতে জীবনের সার্থকতা কি? মানুষ ধন হলেই মান চায়, চায় যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্পদাপট-প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটানোর অধিকার বা সামর্থ্য। বিদেশে অসামান্য কোনো মনন-মনীষা-আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃষ্টি-নির্মিতি বা শিল্পে সাহিত্যে-দর্শনে-বিজ্ঞানে অনন্য দক্ষতা কেউ প্রদর্শন করে প্রখ্যাত হয়তো হতেও পারে। কিন্তু অন্যরা নিজেদের সংখ্যাগুরু সমাজে গাত্রবর্ণের পার্থক্যের জন্যে আত্মবিলোপে অভিন্ন হয়ে মিশে যেতে পারবে না, আবার স্বধর্ম, স্বভাষা, স্বসংস্কৃতি পালাপার্বণ আচার-সংস্কার বজায় রেখেই বা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে কোনোদিন সংখ্যাগুরুর শ্রদ্ধেয় ও নন্দিত হয়ে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়া যাবে কি বিদেশাগত ক্ষুদ্র সমাজের তাছাড়া নেট্যালে, মরিসাসে, ফিজিদ্বীপে ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম-খ্রীস্টান আদিতে কুলিমজুর রূপে গিয়ে এখন স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে বলে কি আমরা মূলভূখণ্ডের মানুষ তাদের গৌরব করি, কিংবা স্মরণ করি এবং তারাই বৃথা আমাদের জন্যে Reflected glory and pride অনুভব করে আত্মপ্রতারণায় আত্মপ্রসাদ লাভ করে। কথায় বলে 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা/বিদ্বানং সর্বত্র পূজ্যতে।' আমরা প্রতীচ্য দেশের স্তাবক, তারা বিদ্বান, উদ্ভাবক, আবিষ্কারক, স্রষ্টা, নির্মাতা বলেই। যে-ব্যক্তি এখন নিউইয়র্কে, কানাডায়, লন্ডনে-বার্লিনে অর্থলাভে মেধা-মনীষা বিক্রয় করছেন, তিনি আমাদের হারানো ধন বটে, কিন্তু ওদেশে তিনি দক্ষ কারীগর মাত্র। স্বদেশে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনের, আত্মীয়-কুটুম্বের গৌরব-গর্বের ও আত্মপরিচিতির অবলম্বন হতেন, হতেন প্রখ্যাত ও স্মরণীয়। হতে পারতেন রাজনীতিক, বড় পদের চাকুরে, সাংসদ, আমলা কিংবা সাহিত্যিক, গবেষক, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী বা আবিষ্কারক, উদ্ভাবক বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিকর্মী। বিদেশে তিনি তেমন অবাধ প্রতিবেশ, সমর্থন, সহকারী পাবেন না। অর্থবিত্ত ও কাজ আছে বলে স্বদেশীর ক্ষুদ্রসমাজে তাঁরা সুখে স্বচ্ছন্দে সচ্ছল জীবন যাপন করছেন সানন্দ পরিবেশে এবং তাদের সন্তানেরা হচ্ছে আমাদের অনাত্মীয়, অপরিচিত ও অচেতনা সংস্কৃতির মানুষ। কিন্তু সংখ্যাগুরুদের সমাজে কিংবা অন্যান্য বিদেশীদের ক্ষুদ্র সমাজে তাঁদের পরিচিতি কি? ভাষা-ধর্ম-গাত্রবর্ণ-সংস্কৃতি-আচার-আচরণের স্বাতন্ত্র্য তো তাদের কেবল বিচ্ছিন্ন ও গুরুত্বহীন অবহেলিত অনাথ এতিম বা পতিত করেই রাখবে। তাঁদের সন্তানেরা পাবেন না সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি ক্ষেত্রে আত্মবিকাশের ও বিস্তারের সহজ সুযোগ। আগের কালে চরবাসী চরুয়ারা আমাদের দেশে অবজ্ঞেয় ছিল, কেননা নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ, দরিদ্র না হলে কেউ স্বভিটে ছেড়ে দ্বৈপায়ন হয় না। তেমনি বিদেশে যাওয়া এক প্রকারের ভাগ্যান্বেষণ আর্থিক ক্ষেত্রে উচ্চাশীর। একে স্বার্থপরতাও বলা চলে।

কেননা তিনি অর্থসম্পদের পেছনে ধাওয়া করছেন। স্বদেশের সমাজের, সংস্কৃতির, রাজনীতির, ব্যবসা-বাণিজ্যের, সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়ার মতো মনোবল কিংবা আত্মপ্রত্যয় তাঁর নেই। আকাঙ্ক্ষার এ অভাব মানবিক শক্তির বিকাশের ও প্রয়োগের পরিপন্থী। স্বদেশ, স্বসমাজ, স্বজাতি, স্ব-অঞ্চল এবং আত্মীয়-জ্ঞাতি বিচ্ছিন্ন হয়ে সুখে বাঁচার সাধনা আর হিমালয়ের কন্দরে বৈরাগ্যে নিশ্চিন্ত নিরাসক্ত নিরবলম্ব জীবন যাপন একই কথা। যা হোক, 'ঘর ছেড়ে বিদেশে না গেলে বড় হয় না' বলে একটা কথা আছে। বিদেশে যাওয়া, থাকা আর স্থায়ীভাবে প্রজন্মক্রমে বাস করা দুটো ভিন্ন মনের ও মতের, চেতনার ও আদর্শের চিন্তার ও রুচির বিষয়। এ নিয়ে তর্ক চলতে পারে, তবে মীমাংসা কখনো সর্বজনগ্রাহ্য হবে না– হয় না। এখন আমাদের স্বদেশের আর্থ-বাণিজ্যিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুরবস্থা চরম পর্যায়ে রয়েছে, বেকারত্ব অসমাধ্য। কাজেই এ অবস্থায় 'য পলায়তি, স জীবতি'। কাজেই বিদেশে পাড়ি জমাতে উৎসাহিত করতে হয়। তবে অতীতের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা থেকে নয়, আজকের যুগের সভ্য মানুষের মনোভাবেও বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষী-বিদেশী বিদ্বেষ স্বার্থসম্পৃক্ত ক্ষেত্রে সুপ্রকট হয়ে ওঠে। একটা প্রমাণ– প্রখ্যাত চার্চিলের পৌত্র উইনস্টন চার্চিল সম্প্রতি ক্ষুব্ধ এবং বিচলিত এ কারণে যে তাঁর নির্বাচন এলাকায় অব্রিটিশ বিদেশী ভোটারের আধিক্য তাঁর রাজনীতিক ভবিষ্যৎ বিপন্ন করছে। এমনিভাবে কোনো দেশে কখনো জনগণের জীবনে আর্থিক সঙ্কট দেখা দিলে তখন প্রথমেই যে-পন্থার তথা সমাধানের উপায়ের কথা সাধারণ দুস্থ মানুষের মনে জাগবে, তা হবে বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষীকে কেড়ে-মেরে-হেনে বিতাড়ন। একালের ইতিহাসেও এ সাক্ষ্য বিরল নয়। ১৯৪৭ সনে পশ্চিম পাঞ্জাব হিন্দু শিখশূন্য এবং পূর্ব পাঞ্জাব মুসলিমরিক্ত হয়েছিল।

কাজেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিদেশগত লোকের প্রাজন্মক্রমিক স্থিতি নির্ভর করবে সে-দেশের আর্থ-বাণিজ্যিক সাচ্ছল্য-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর। পারিবারিক জীবনে আমরা দেখি নিঃস্ব-দুস্থ লোকেরা ভাই-বোনকেও একবেলা খাওয়াতে অসামর্থ্যের দরুন সম্মত হয় না। মুখের উপর অসামর্থ্যের কথা জানিয়ে দেয়।

এবার একটা তত্ত্বকথা বলি, প্রাণীর প্রজাতি মানবের মধ্যে সচেতন অনুশীলনের অভাবে মানবিক বড় গুণের বিকাশ হয় না। কেবল চর্যাযোগে পরিশীলিত মনের-মগজের-মনের সংস্কৃতিমান মানুষের মধ্যেই সংযম, পরমত-পরকর্ম-পরআচরণ সহিষ্ণুতা, যুক্তিনিষ্ঠা, ন্যায্যতাবোধ, বিবেকানুগত্য ও সৌজন্য সুলভ। তবু আস্তিক মানুষের জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-শ্রেণী-দক্ষতা-যোগ্যতার গুণ-মাপ-মাত্রার পার্থক্যে আস্থাবান মানুষের উদারতায়, সহিষ্ণুতায়, মনস্বিতায়, সত্যসন্ধিৎসায় একটা স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম সীমা থাকে এবং তা অতিক্রম করতে পারে না বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা চালিত মানুষ। আস্তিকের ও নাস্তিকের উপযোগ চেতনায় ও যুক্তিনিষ্ঠায়, ন্যায়বোধে, বিবেকানুগত্যে, ক্ষমাশীলতায় ও সৌজন্যে কিছু মাত্রাগত তারতম্য থাকেই। কাজেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতা ঘৃণ্য বলে নিন্দিত হলেও জাতীয়তা বাঞ্ছিত ও নাগরিকের প্রত্যাশিত বলে বিবেচিত ও নন্দিত হয়। আন্তর্জাতিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বৈশ্বিক চেতনার ক্ষেত্রে কিন্তু জাতীয়তা, স্বাদেশিকতা, স্বাধার্মিকতা, স্বাভাষিকতা স্বরূপে সাম্প্রদায়িকতার মতোই অভিন্নদোষের অনুদারতা। জাতীয়তাবোধ খাঁটি হলে আন্তর্জাতিকতা হয়ে ওঠে লৌকিকতার মতোই কৃত্রিম। আর বৈশ্বিকচেতনাঋদ্ধ আন্তর্জাতিকতাপ্রীতি অকৃত্রিম হলে জাতীয়তা সংকীর্ণ চিত্ততা ও মানবতাবিরোধী বলেই বর্জনীয় হয়ে যায়।

জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-সংস্কৃতি-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আচার-আচরণ-পালাপার্বণ নিরপেক্ষ সেক্যুলার জীবনচেতনা সংস্কৃতিমানতার চরম ও পরম বিকাশের প্রমাণ বটে, কিন্তু এমনি মানুষ দেশে দেশে দুর্লভ বলেই, কোটিতে গুটিক মেলে বলেই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রবাসী মানুষের পক্ষে বিশ্বজনীন অনুভব-উপলব্ধি মনে-মগজে-মননে-আচরণে ধরে রাখা সম্ভব হয় না। তাই আপাতত সুদূর ভবিষ্যতের জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে বিশ্বের নাগরিক হবার জন্যে। অথবা ব্যক্তির অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে বিপর্যয়কালে বিদেশীদের বিতাড়িত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবতার অন্যনাম: অভিন্ন মানবসংস্কৃতি

বাস্তব জীবনের পরোক্ষ প্রয়োজনে মানুষ স্বপ্নের ও সাধের পূর্তিসম্ভব এক কল্পজগৎ সৃষ্টি করেছে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে ও পরিধিতে। যা কিছু বঞ্চিত তাকেই স্থূল-সূক্ষ্মভাবে সম্ভব, স্বাভাবিক, প্রয়োজনীয়, আবশ্যিক ও জরুরি রূপে স্বীকার করে স্বর্গে-মর্ত্যে-পাতালে, দৃশ্য-অদৃশ্য, লৌকিক-অলৌকিক-অলীক অরি-মিত্র শক্তিরূপে যুগে যুগে স্থানে স্থানে মানুষ প্রয়োজনানুসারে মগজ-মনন-মনীষার গুণ, মান, মাপ ও মাত্রাভেদে সৃষ্টি করেছে বিভিন্নভাবে অজ্ঞানের, অপরিচয়ের ব্যবধানে গড়ে ওঠা গৌত্রিক ও আঞ্চলিক জীবনে। এভাবে গত সাত/আট হাজার বছর ধরে মানুষ প্রজন্ম পরম্পরায় জ্ঞান-বুদ্ধি-মনন-মনীষার প্রয়োগে ও প্রয়োজন চেতনার বিকাশ-বিস্তার অনুযায়ী পূর্বতন বিস্ময়-কল্পনা-অনুমান অনুসারে গড়ে ওঠা বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আচার-আচরণ এবং প্রাত্যহিক জীবনে ভাব-চিন্তা-কর্ম নিয়ন্ত্রণ করেছে। আর যতই দিন গেছে, যতই মানসিকভাবে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি মনন-মনীষাসম্পন্ন লোকের জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, বস্তুর উপযোগবুদ্ধি আর আচারের তাৎপর্যচেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে, ততই যোগ্য লোকের নেতৃত্বে চালিত গোত্রগুলো গ্রহণে-বর্জনে ও অর্জনে ঋদ্ধ হয়ে হয়ে আজকের এ অবস্থায় এসেছে। প্রতিবেশের তথা মাটি-রোদ-বৃষ্টি-শৈত্য প্রভৃতির গুণ-মান-মাত্রাভেদে প্রভাবের তারতম্যে জীবন-জীবিকা পদ্ধতির যে পার্থক্য ঘটে, তারই দরুন জগৎচেতনায় ও জীবনভাবনায়ও আসে বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা। এ কারণেই স্রষ্টা-সৃষ্টি সম্বন্ধে নয় কেবল, অরি-মিত্র শক্তির রূপ-স্বরূপ সম্বন্ধে, পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য, শক্তির পরিসর পরিধি অবয়ব প্রভৃতি সম্বন্ধেও ধারণার আর দর্শনের পার্থক্য ও বৈপরীত্য দেখা দেয়। তাই স্রষ্টা কোথাও সাকার, কোথাও নিরাকার, কোথাও অনপেক্ষ, কোথাও সহযোগী নির্ভর, কোথাও সৃষ্টি একের কৃতি, কোথাও যৌথ কর্ম, বিশ্বনির্মাতা কোথাও নারী, কোথাও পুরুষ, কোথাও স্বয়ম্ভু, কোথাও বা কারো সন্তান। কারো কাছে সৃষ্ট সবকিছুই স্রষ্টার অংশ, আবার কারো মতে স্রষ্টা ও সৃষ্টি আলাদা, কেউ বলে ব্রহ্ম বলছেন 'একোহম বহু স্যাম' যাতে আমি আত্মপ্রসারে ও আত্মবিকাশে নিজেকে সানন্দ অনুভবে তৃপ্ত করতে পারি। কারো মতে স্রষ্টা একক ও নিঃসঙ্গ, সৃষ্টি করে তিনি সৃষ্টির মধ্যে তাঁর শক্তির অশেষতা ও বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে সৃষ্টদের আনুগত্য ও তারিফ পেয়ে আত্মপ্রসাদ পেতে পারেন। আবার কারো স্রষ্টা ভীতিপ্রদ নিষ্ঠুর ক্ষমাহীন শাসক, কারো স্রষ্টা পিতৃবৎ স্নেহ-কৃপাময়, কারো স্রষ্টা ক্ষমাশীল, কারো স্রষ্টা ভরসার অভয়শরণ, কারো স্রষ্টা ভক্তিভাজন, কারো স্রষ্টা উপাস্য বা সেব্য, কারো স্রষ্টা দাতা ও দয়ালু, কারো স্রষ্টা প্রভু, কারো স্রষ্টা বন্ধু, প্রেমিক। এমনিভাবে কালে কালে স্থানে স্থানে গোত্রে গোত্রে স্রষ্টাতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব, জীবনতত্ত্ব ক্রমশ বিকাশের ও বিবর্তনের ধারায় গ্রহণে-বর্জনে-অর্জনে উন্নয়নে-উৎকর্ষে, সূক্ষ্মতাত্ত্বিক মাপে-মানে-মাত্রায় বিচিত্র শাস্ত্রিক ও দার্শনিকরূপ লাভ করে বিভিন্ন মতে, উপমতে, সম্প্রদায়ে, উপসম্প্রদায়ে স্থানিক, কালিক, গৌত্রিক মানুষকে বিরোধ-বিবাদে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে আজকের দিনেও জাত-জন্ম-বর্ণ-ভাষা-নিবাস-যোগ্যতা-দক্ষতা-অর্থসম্পদ-বিদ্যা প্রভৃতির ভিন্নতার দরুন পরস্পরের 'জানি-দুশমন' করে রেখেছে। স্বমতের, স্বগোত্রের, স্বদেশের, স্বভাষার, স্ববর্ণের, স্বশাস্ত্রের, স্বশ্রেণীর না হলেই একজন মানুষ অন্য মানুষের সম্ভাব্য শত্রু। কেবল কামে-প্রেমে এবং অভিন্নস্বার্থে অপকর্মেই মানুষ জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-যোগ্যতা প্রভৃতির প্রভেদ মানে না।

কাজেই গোটা পৃথিবীতে কেবল কায়িক শক্তিতে নয়, জ্ঞান-বুদ্ধিতে, অর্থ-সম্পদে ও সংস্কৃতি-সভ্যতায় সবলে-দুর্বলে সর্বপ্রকারে বৈষম্য ও দ্বান্দ্বিক অবস্থা ও অবস্থান রয়ে গেছে। মনুষ্য সমাজে এ বৈষম্য-শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা উপজাতি-জনজাতি-আদিবাসী সমাজেও সুলভ। এককথায় কেবল আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে নয়, সাত/আট হাজার বছরের মানব সংস্কৃতি-সভ্যতার ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্মারক, ধারক, বাহক, প্রচারক ও আধুনিকতম বিজ্ঞানের তত্ত্বের, তথ্যের ও সত্যের আবিষ্কারক, যন্ত্র, প্রযুক্তি ও প্রকৌশলের উদ্ভাবক, সমুদ্রের তলে, পর্বতের কন্দরে, অরণ্যের গভীরে, মরুর ও মেরুর মধ্যে আর নভোলোকে যাদের যথেচ্ছ বিচরণ, সে-মানুষগুলোও আজো মনের দিক দিয়ে প্রাণীর বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত অধিকাংশ ক্ষেত্রে। মানবিক গুণে, মানবতায়, মনুষ্যত্বে প্রত্যাশিত গুণে-মানে নিখাদ-নিখুঁত-খাঁটি মানবতায় বিশিষ্ট নয়। সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষেও নাস্তিক্য দুর্লভ। সংস্কৃতিমানতাও সুলভ নয়। কেননা তাদের মধ্যে সংস্কৃতি মানে প্রত্যাশিত সংযম, পরমত-পরকর্ম-পর আচরণ সহিষ্ণুতা, যুক্তিনিষ্ঠা, ন্যায্যতাবোধ, বিবেকপ্রীত্য ও সৌজন্যরূপ গুণগুলোর সবকয়টা মেলে না। বিজ্ঞানের বদৌলত আবিষ্কার-উদ্ভাবনের প্রসাদে আজ মানুষ যন্ত্রে-প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে যন্ত্রনির্ভর জীবন-যাপন সম্ভব হয়েছে, মনুষ্য শ্রমের ও সময়ের ব্যয়, অপব্যয় ও অপচয় কমেছে, বন্ধ হয়েছে, বন্ধ হয়েছে উন্নত দেশে পশুশ্রমও গরু-মোষ-হাতি-ঘোড়া-উট প্রভৃতির। মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-প্রকৌশল-প্রযুক্তি, তার-বেতার যন্ত্র সবকিছুই বাড়ল, সমুদ্র-পর্বত-অরণ্য-আকাশ মানুষের নানাভাবে আয়ত্তে এল, তবু মানুষ মনের দিক দিয়ে পিছিয়ে রইল, সিন্দাবাদের ভূত তার ঘাড় থেকে কিছুতেই নামছে না। সে যে-দেশে, যে-শাস্ত্রমানা পরিবারে, যে-সমাজে, যে-সম্প্রদায়ে, যে-বর্ণে, যে-গোত্রে, যে-অঞ্চলে, যে-ভাষী বা বুলি তথা উপভাষী গোষ্ঠীতে জন্মে তা থেকে যে-আশৈশব শ্রুত, লব্ধ, প্রাপ্ত বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায়-আচারে-আচরণে সে আমৃত্যু অভ্যস্ত থাকে, সচেতন সতর্ক প্রয়াসে প্রযত্নে অনুশীলন না করলে এ অভ্যস্ত মন ও মননধারা বদলানো যায় না। প্রতিটি ভাবের, চিন্তার, কর্মের, আচরণের ও বিশ্বাসের সংস্কারের ধারণার মানস জীবনে ও ব্যবহারিক বৈষয়িক জীবন-যাত্রায় তাৎপর্য কি, উপযোগ কি, প্রয়োজনই বা কি, তা যুক্তি প্রয়োগে বিশ্লেষণ করে গ্রহণের-বর্জনের আগ্রহ-সাহস-শক্তি অর্জন করা সম্ভব না হলে মানুষ প্রজন্মক্রমে অনুসৃত পরম্পরাগত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ অভ্যস্ত ও গতানুগতিক নিয়মে অনুসরণ করে চলে। মানুষ জীবন-জীবিকাক্ষেত্রে লাভ-লোভ-স্বার্থচেতনাবশে নানা ধান্ধায় জাগ্রত মুহূর্তগুলো ব্যয় করে। সেজন্যেই সে যে-শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ খণ্ড-খণ্ড ও অসমঞ্জসভাবে শুনে শুনে, দেখে দেখে মানে, সেগুলো কেন মানে, তার উপযোগ কি, তা যুক্তিযোগে বুঝবার চেষ্টা কখনো সে করে না– করার ইচ্ছাও তার জাগে না, যোগ্যতাও তার থাকে না। তাই মানুষ জীবিকা ও অর্থবিত্ত সম্পৃক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাব-চিন্তায়, কর্মে-আচরণে ব্যতীত আর কোনো বিষয়েই মাথা ঘামায় না– লোকাচারই অনুসরণ করে মাত্র বিনা প্রশ্নে। সেজন্যেই স্রষ্টা, সৃষ্টি, মৃত্যু ও পরবর্তী জীবন সম্বন্ধেও সে শোনা কথায় আস্থা রাখে মাত্র– পুরো বিশ্বাসও করে না, আবার অবিশ্বাস করার সাহসও রাখে না। ফলে মানুষে মানুষে বিরোধের, বিবাদের, দ্বেষণার, দ্বন্দ্বের, অবজ্ঞার, সম্ভাব্যশত্রু ভাবার শেকড় রয়েই গেছে দৃঢ়ভাবে। এবং সাময়িকভাবে কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানি এড়ানো যায়নি, যায় না, যাবে না। দাঙ্গা, যুদ্ধ, লড়াই, সংঘর্ষ, সংঘাত চলতেই থাকবে। অবশ্য অর্থবিত্ত নিয়েও লাভ-লোভ-স্বার্থচালিত মানুষ কখনো বিরোধ-বিবাদ ও হানাহানিমুক্ত থাকবে না।

তাই গ্যালেলিও, কোপার্নিকাসের আমলে নয় কেবল, উনিশ-বিশ শতকেও পাদরী ডারুইন, মার্কস, ফ্রয়েড, স্পনোজা, মিল, কোঁৎ, রাসেল, আইনস্টাইন, হকিং, গ্যয়টে, টলস্টয়, রোমারোলাঁ, এঙ্গেলস্ , লেনিন, মাও সেতুং প্রমুখ অনেক আস্তিক, নাস্তিক, বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, দার্শনিক, চিকিৎসাবিজ্ঞানী, পদার্থবিজ্ঞানী আবিস্কৃত-উদ্ভাবিত তত্ত্ব-তথ্য-সত্যও আমজনতার বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা বদলাতে পারেনি। মানুষ প্রজন্ম পরম্পরায় শ্রুত, লব্ধ, প্রাপ্ত অসমীক্ষিত, অপরীক্ষিত, অনিরীক্ষিত, অপর্যবেক্ষিত আন্দাজে-অনুমানে প্রচারিত সত্যে, তত্ত্বে ও তথ্যে বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা ভিত্তিক প্রত্যয় দৃঢ় রাখে। অথচ বিজ্ঞানের প্রমাণিত, প্রমাণসাধ্য, প্রমাণসম্ভব তথ্যে আস্থা স্থাপন করে না সাধারণ লেখাপড়া জানা তথাকথিত বিদ্বান-বুদ্ধিমান মানুষও। যদিও ওইসব বিজ্ঞানের তথ্য, তত্ত্ব ও সত্য মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় লিখে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ভালো চাকরি বাগায়। তারা সর্বত্র স্রষ্টার লীলাই দেখে– প্রকৃতির নিয়ম প্রত্যক্ষ করে না। শাস্ত্রপন্থীরা যুক্তিবাদকে, উদারতাকে ও বিজ্ঞানের নিরীশ্বর প্রাকৃত নিয়মকে অনাস্থায় পরিহার করেই চলে। অথচ আজকের দিনের মানব-সমস্যার সমাধান রয়েছে যৌক্তিক-বৌদ্ধিক চিন্তার ও চেতনার প্রয়োগে, প্রচারে ও প্রসারে। যুক্তিবাদের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত মানুষের পক্ষেই সম্ভব সহজে সংযত সহিষ্ণু ন্যায়বান বিবেকবান ও সুজন-সজ্জন হওয়া। এমনি ব্যক্তি মানুষের সমষ্টি ও সংখ্যাধিক্যই কেবল জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-যোগ্যতা নির্বিশেষে মানুষকে কেবল মানুষ হিসেবে জানা, মানা ও বোঝা সম্ভব করে তুলবে। এমনি মনের, মগজের, মননের, মনীষার মানুষের পক্ষেই সম্ভব বিশ্বময় অভিন্ন সংস্কৃতির সমর্থক ও প্রচারক হওয়া। সংস্কৃতি একটিই, তার নাম মানব-সংস্কৃতি। এরই অপর নাম মানবতা। মানবতা ও সংস্কৃতিমানতা অভিন্নার্থক ও অভিন্নাত্মক। দৈশিক, গৌত্রিক, ধার্মিক, জাতিক, আঞ্চলিক সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের উপযোগ অস্বীকার করা, বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক অভিন্ন মানব সংস্কৃতির অনুশীলন করা, অভিন্ন মানবিক গুণের পরিচর্যা করাই হবে মানবতার প্রকৃত অনুশীলন ও পরিচর্যা। একজন ব্যক্তি যেমন একাধারে ও যুগপৎ কারো ভাই, কারো চাচা, মামা, বাবা, পুত্র, কন্যা বা শত্রু ও বন্ধু হয়, তেমনি একজন ব্যক্তি একাধারে ও যুগপৎ দেশের, অঞ্চলের ও বিশ্বের নাগরিক হতে পারে।

অন্যভাবেও কথাটা বোঝা-বোঝানো সহজ, আজ বিজ্ঞানের প্রসাদে প্রকৌশল, প্রযুক্তি এবং সর্বপ্রকার যন্ত্রনির্ভর মানবজীবন বিশ্বময় অভিন্ন হয়ে উঠেছে। আজ যন্ত্র, যানবাহন স্থাপত্য, তৈজস, আসবাব, চিকিৎসাবিজ্ঞান, তার-বেতার যন্ত্র, বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচ্ছদ স্যুট, ভাষা ইংরেজি, খাদ্য পাঁচতারা হোটেলে তৈরি সামগ্রী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্তর্জাতিক আচার-আচরণ বা আদব-কায়দাও প্রতীচ্য পদ্ধতির। আমাদের সচ্ছল আমজনতার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা মোটামুটিভাবে বিশ্বময় সদৃশ বা অভিন্ন। এমনকি যুক্তিবাদী; জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞাচালিত আচার-আচরণের উপযোগ ও তাৎপর্য সচেতন উদার আস্তিক বিশেষ করে নাস্তিক বিবেকী লোকেরা আশৈশব শ্রুত, লব্ধ, প্রাপ্ত, বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণামুক্ত সদৃশ বা অভিন্ন মানসিক সাংস্কৃতিক জীবন-যাপন করে অনুভবে, উপলব্ধিতে। অতএব মানসিক ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানবসংস্কৃতি বিশ্বময় ক্রমে অভিন্ন হয়ে উঠছে এবং উঠবেই।

নভঃতথ্যে মগজ ধোলাই

ডারউইন, ফ্রয়েড, মার্কস এবং আইনস্টাইন শিক্ষিত-অশিক্ষিত-বুনো-বর্বর-ভব্য-সভ্য মানুষের হাজার হাজার বছর ধরে লালিত জগৎ ও জীবন সম্পৃক্ত বিশ্বাস-সংস্কার-শাস্ত্র-ধারণা তাঁদের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণালব্ধ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য প্রচারে পাল্টে দিলেন। জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা-যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রই তাঁদের প্রমাণ-সম্ভব ও প্রমাণিত সত্যে আস্থাবান হয়ে পূর্বতন শ্রুত ও লব্ধ কাল্পনিক, আনুমানিক, লৌকিক, অলৌকিক, অলীক-অদৃশ্য-অরি-মিত্র আসমানী জীবননিয়ন্ত্রক শক্তিতে বিশ্বাস হয় হারাল, না হয় সংশয়ী-সন্দিহান হয়ে উঠল। অজ্ঞেয়বাদী, প্রত্যক্ষবাদী, নিরীশ্বরবাদী নাস্তিকের সংখ্যা বাড়ল। তা ছাড়া উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে গোটা বিশ শতকের সব বিস্ময়কর যাদুশক্তিরূপ যন্ত্র-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-প্রকৌশল আবিষ্কৃত, উদ্ভাবিত, সৃষ্ট ও নির্মিত হওয়ার ফলে আগের শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা এবং বিধিনিষেধ লঙ্ঘন ও উপেক্ষা না করে সমকালের ভীরু-বিশ্বাসী লোকের পক্ষেও প্রাত্যহিক জীবনযাপন সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই শাস্ত্রিক অনেক বিধিনিষেধই জীবনে অকেজো-অপ্রযুক্তরূপে পরিহার্য বা অগ্রাহ্য হয়ে পড়ল। জীবন কালের দাবি ও কালিক প্রয়োজন এড়াতে পারে না। আর কায়রো সম্মেলন প্রমাণ করেছে মানুষের নিজের সমস্যা নিজেদেরই সমাধান করতে হবে– দৈবশক্তির সাহায্য মিলবে না।

এখন তো বিজ্ঞানীরা বিগ ব্যাঙ, ব্ল্যাক হোল, ওজোন, আকাশের বিস্তৃতি, সংকোচন সম্ভাবনা, বিস্ফোরণে বিশ্বসৃষ্টি এবং প্রচণ্ড কম্পনে ভূভাগের পঞ্চমহাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিস্তৃতি প্রভৃতি তথ্য প্রচার করছেন। এবং সাম্প্রতিক পরীক্ষণে-পর্যবেক্ষণে সমীক্ষণে প্রমাণিত হয়েছে যে বিশ্বের উদ্ভব বা বয়সমাত্র আট হাজার মিলিয়ন বছর বা আটশ কোটি বছর। আগের ধারণা মতে বিশ্বের বয়স ছিল ১৬/১৮শ' কোটি বছর। আরো নিষ্ঠ ও নিরবচ্ছিন্ন গবেষণায় আরো অনেক অভাবিত তত্ত্ব, সত্য উদঘাটিত হবে আগামী বিশ/পঁচিশ বছরের মধ্যেই। তখন আর প্রচল শাস্ত্র, সমাজ, বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আচার-আচরণ ধরে রাখা যাবে না, মন-মগজ-মনন-মনীষা ভিন্ন চেতনায় ও ভিন্ন চিন্তায় নিয়ন্ত্রিত হবে, বইতে থাকবে নতুন খাতে, মর্ত্যজীবনভিত্তিক হবে সব জীবন চেতনা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জগৎ ভাবনা। জাত-জন্ম-বর্ণ-ভাষা-নিবাস-যোগ্যতা-পেশা নির্বিশেষে কেবল মানুষ থাকবে। অন্য ভেদাভেদ ঘুচে যাবে। বিজ্ঞান-বাণিজ্য-যন্ত্র-প্রযুক্তি-প্রকৌশল নিয়ন্ত্রিত জীবন হবে কেবল ঐহিক।

মর্ত্যজীবনভিত্তিক মানুষ হবে বিজ্ঞানের তথ্যে ও সত্যে আস্থাবান, তারা হবে গ্রহণশীল প্রত্যক্ষবাদী সেক্যুলার, উদার ও সমাজতন্ত্রী। জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি ও ন্যায্যতা নিষ্ঠ, আত্মসত্তার মর্যাদা সচেতন ও বিবেকী হবে তারা।

পশ্চিমা আর্থ-বাণিজ্যিক মহাজনী সাম্রাজ্যবাদীরা কূটচাল প্রয়োগে তৃতীয় বিশ্বে বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্রে ও রাজ্যগুলোতে মধ্যযুগের য়ুরোপের অসহিষ্ণু, অসংযত, ক্ষমতালিপ্সু, রক্তপিপাসু, ধর্মান্ধ ও ধর্মধ্বজী-কুচক্রী খ্রীস্টানসন্তানদের মতোই একদল রক্ষণশীল গোঁড়া অর্থোডকস ও রাজনীতিসচেতন ক্ষমতালিপ্সু মৌলবাদী তৈরি করেছে অতীত ও ঐতিহ্যমুখী শিক্ষা ব্যবস্থায় উৎসাহ দিয়ে আত্মরক্ষার গরজেই। আশঙ্কা সম্ভবত এই যে, এরা এখন তেল, গ্যাস, বিদ্যা-বিত্তবান হয়ে উঠছে, উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য এশিয়ার দরিদ্র শক্তিমান-সাহসী যোদ্ধাদের সাহায্যে উনিশ-বিশ শতকের খ্রীস্টান শাসন-শোষণ-পীড়ন-নির্যাতন-হত্যা প্রভৃতির শোধ নিতে পারে মুসলিমরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে। কেননা পারমাণবিক শক্তি অর্জন এখন আর শিক্ষাসাপেক্ষ নয়, অর্থসাপেক্ষ মাত্র। মৌলবাদ এখন মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোকে রাহুর তথা গ্রহণের মতো গ্রাস করছে কিংবা পশ্চিমারা করাচ্ছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর তাই হয়তো য়ুরোপে মুসলিম রাষ্ট্রের স্থিতি চান না।

বিশ্ব মুসলিমদের এখন অতীত ঐতিহ্যপ্রীতি এবং বিজ্ঞান-বাণিজ্য-যন্ত্র-প্রযুক্তি-প্রকৌশল প্রভৃতির গুরুত্বচেতনাহীনতা তাদের সমকালীন বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক প্রগতি-প্রাগ্রসরতা সম্বন্ধে উদাসীন করে রাখছে। অতীতমুখিতা ও বিজ্ঞানভীতি তাদের পক্ষে যে নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার উন্মেষের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাদের মন-মগজ-মনন-মনীষা যে অনুশীলনে বন্ধ্য হয়ে থাকছে, তাদের মানসিক, নৈতিক, আর্থিক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক, আচারিক জীবন যে অবক্ষয়গ্রস্ত, গতানুগতিকতায় আবর্তিত এবং পরিণামে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বৈনাশিক আধি হয়ে দাঁড়াবে, তা তারা বুঝতে চায় না। বিজ্ঞানে গুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থা রেখে আর্থ-বাণিজ্যিক ঋদ্ধির জন্যে বনজ, কৃষিজ, খনিজ সম্পদ কাজে লাগিয়ে দেশী-বিদেশী বাজারের জন্যে পণ্য তৈরি করতে না পারলে এ যুগে যে রাষ্ট্র বা রাজ্য হিসেবে টিকে থাকা অসম্ভব হবে, তা যারা বুঝবে না, বুঝতে চাইবে না, তাদের ঠাঁই হবে না এ কালের বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রিক ও বাণিজ্যিক সমাজে। এ ধরনের রাষ্ট্রে বা রাজ্যে কোনো প্রবহমান সদা উন্মেষশীল কোনো সংস্কৃতি থাকে না, থাকে আবর্তিত আচার-আচরণ যাকে সাধারণে তথা আমজনতা জাতীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি বলে জানে ও মানে। যার হ্রাস আছে বৃদ্ধি নেই। আবর্তন আছে বিবর্তন-পরিবর্তন-পরিবর্ধন নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গাব্দের উদ্ভব কবে ও কোথায়

গত বছর বঙ্গাব্দের নতুন শতক শুরু হয়েছে। তাতেও বিতর্কের ঝড় উঠেছিল, নতুন শতক ১৪০০ অব্দ থেকে, না ১৪০১ থেকে শুরু। তর্কের কারণ গাণিতিক সূক্ষ্ম তত্ত্বের আর লোক ব্যবহারের সন তারিখ মাস হিসেবের, বলার বা লেখার পার্থক্যজাত। আমরা যখন ১.১.৯৫ লিখি, তা গাণিতিক হিসেবে অবশ্যই ভুল। কারণ পয়লা জানুয়ারি কোনো হিসেবেই মাস হিসেবে এক নয় এবং পয়লা জানুয়ারির মধ্যরাত্রির আগে দিনটাও পূর্ণতা পায় না। কাজেই সকালবেলা থেকে তারিখ হিসেবে 'এক' নির্দেশনা গাণিতিক হিসেবে ভুল। গণিত হচ্ছে বিজ্ঞান। আমরা এ ক্ষেত্রে সহজে বোঝা-বোঝানোর জন্যে প্রয়োগ করি স্থূলার্থে শুদ্ধ এবং সূক্ষ্মার্থে ভুল পদ্ধতি। ফলে বিজ্ঞানীর ও আনাড়ির এ বিতর্ক বহুদিন চললেও আনাড়ির আধিক্যে ও আনাড়ির সম্মতিতে ১৪০১ সাল থেকেই শুরু হল পনেরোশ' বঙ্গাব্দ। প্রতিবছরই বঙ্গাব্দের উদ্ভব তত্ত্ব জেনে না-জেনে লিখিত ও প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে পয়লা বৈশাখে নববর্ষ শুরুর সময়ে। গত বছর শতাব্দ পূর্তির ও শতাব্দ শুরুর বছর ছিল বলে দুই বঙ্গেই বঙ্গাব্দের উদ্ভবের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য নিয়ে বিতর্ক ও আলোচনা হয়েছে 'ইতিহাস' নির্মাণ ও সংশোধন লক্ষ্যে।

সে-সময়ে আমাদের মধ্যেও নানা প্রশ্ন জেগেছিল। কিন্তু জাতীয় উৎসাহ উদ্দীপনা, অতীত ঐতিহ্য-চেতনা প্রভৃতি গৌরব-গর্বের এবং বাঙালি সত্তার অনুভব-উপলব্ধি জড়িত আবেগময় যে অভিব্যক্তি ঘটে নবশতাব্দের নববর্ষের নবদিবস বরণ-উৎসবের উদ্যোগ-আয়োজনকালে, তাতে গণ-আবেগ ও গণ-ধারণা বিরোধী আনুমানিক তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে জাতীয় উৎসব মানসিকভাবে বিঘ্নিত করা পাণ্ডিত্য ফলানোর মতো অশোভন সংস্কৃতিহীন মানসেরই পরিচায়ক হতো। তাই তখন সে-আলোচনায় বিরত ছিলাম, যদিও ১৪০০ সালকে নতুন শতকের প্রথম বছর বলে মানতে পারিনি বলে আমাদের আমজনতার চিরকালীন ধারণার সমর্থক হিসেবে ১৪০১ সালেই পনেরো শতকের শুরু বলে লিখিত মত, মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত প্রকাশিত করেছিলাম দৈনিক কাগজে।

এখনো বঙ্গাব্দ বিষয়ে যেসব জিজ্ঞাসার উত্তর মেলেনি, প্রশ্ন রয়েই গেছে, সেসব প্রশ্ন কেবল উত্থাপন করাই আমাদের এ লেখার লক্ষ্য। গবেষণা করার যোগ্যতা-দক্ষতা যথা সময়ব্যয়ের, শ্রমদেয়ার, বিদ্যাপ্রয়োগের, মগজখাটানোর শক্তি আমাদের নেই। কাজেই উত্তর সন্ধানের, তথ্য, তত্ত্ব ও সত্য খোঁজার অসামর্থ্য সবিনয় স্বীকার করেই যোগ্যগবেষকের এ দায়িত্ব গ্রহণের প্রতীক্ষায় থাকব।

১. চান্দ্রবর্ষ গণনায় সূর্যাস্তের সাথে সাথেই নতুন দিন শুরু হয়, অর্থাৎ সৌরবর্ষের নতুন দিন যেমন ভোর-ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকে শুরু হয় কিংবা য়ুরোপীয় নতুন দিন যেমন মধ্যরাত্রি থেকে ধরা হয়, এ তেমন নয়, এক সূর্যাস্ত থেকে পরবর্তী সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্ত অবধি ধরা হয় একদিন।

হযরত মুহম্মদ হিযরত করেন ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জুলাই বৃহস্পতিবারের সূর্যাস্তের পরে রাত্রে, যা চান্দ্রবর্ষের নিয়মে শুক্রবার। কাজেই সৌরবর্ষানুসারে ১৫ই জুলাই আর চান্দ্রবর্ষানুসারে ১৬ই জুলাই। সেদিন ছিল শাবান মাসের প্রথম দিন এবং ৬২২ খ্রিস্টাব্দের পয়লা জানুয়ারি ছিল শুক্রবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. আকবরের জন্ম ১৫৪২ সনের ২৩শে নভেম্বর।

অতএব আকবর তেরো বছর বয়সে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে চৌদ্দই ফেব্রুয়ারি দিল্লী রাজ্যের অধিপতি হন। তখন হিজরী সন ছিল ৯৬৩ এবং তারিখ ছিল ২৭শে রবিউল আখির। চার বছর ধরে আকবরের অভিভাবক ছিলেন বৈরাম খান। আকবর কি তখ্‌তে বসেই হিজরী সনকে ফসলী সনে পরিবর্তন করেন? উল্লেখ্য যে, তাঁর পিতা হুমায়ুনের মৃত্যু হয় ১৫৫৬ সনের ২৫শে জানুয়ারি হিজরী ৯৬৩ সনের পয়লা রবিউল আউয়াল তারিখে। তবাকাত-ই-আকবরী লেখক খাজা নিযামউদ্দীন আহমদ ৯৬৩ হিজরী সনের ২৭শে রবিউল আখির আকবরের রাজত্বের আরম্ভকাল বলে উল্লেখ করেছেন। সেদিন ছিল ১৫৫৬ সনের ১০ই বা ১১ই মার্চ। অন্যমতে ১৫৫৬ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবারে দিল্লীর মসজিদে আকবরের নামে খুতবা পাঠ শুরু হয়। [হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় পৃঃ ৪১] নিযামউদ্দীন একে ইলাহি বছরের শুরু বলে উল্লেখ করেছেন, ফসলী সন বলে অভিহিত করেননি। বৈরাম খানের অভিভাবকত্ব মুক্ত হয়ে ১৫৬০ সন থেকে তরুণ আকবর ১৮ [বা ২০?] বছর বয়সেই শাসন শুরু করেন স্বাধীনভাবে।

৩. আকবর রণক্ষেত্রে বঙ্গ বিজয় করেন ১৫৭৫ সনের এপ্রিল মাসে। কিন্তু স্থানীয় ভূঁইয়ারা তাঁর আনুগত্য সহজেই স্বীকার করেননি। ফলে ১৫৭৫ থেকে ১৬১৬ সন অবধি ভূঁইয়াদের সঙ্গে লড়াই চলে বিভিন্ন অঞ্চলে। ভূষণার মুকুন্দ, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ, জালালপুরের মজলিশ কুতুব, ঢাকার কেদার রায়, জঙ্গলবাড়ির সুলায়মানপুত্র ঈসা খান, যশোরের নতুন ভূঁইয়া প্রতাপাদিত্য প্রমুখ অনেকে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠায় নানাভাবে বাধা দেন ১৬১৬ সন অবধি প্রায় একচল্লিশ বছর ধরে।

৪. কাজেই সঙ্গত কারণেই ১৬১৬ সনের আগে ওই তথাকথিত মুঘলাই ফসলী সন বাঙলায় চালু হতে পারেনি। আর হলেও তা আকবরী সন না হয়ে, আকবরাব্দ না হয়ে 'বঙ্গাব্দ' হবার কারণ কি, যখন 'বঙ্গ' একটা অঞ্চলের নাম মাত্র? তা ছাড়া দিল্লী সাম্রাজ্যে চালু ফসলী সন হঠাৎ বাঙলায় 'বঙ্গাব্দ' নামে চালু বা অভিহিত হওয়ার সঙ্গত যৌক্তিক বৌদ্ধিক কারণও খুঁজে পাওয়া যায় না। আকবরের ফসলী সন বা সৌরসন আকবরের অধিকৃত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে কি কি নামে পরিচিত বা উল্লিখিত হতো সে-সম্বন্ধে অনুসন্ধানও আবশ্যিক বাঙলায় এ সন প্রবর্তনের গৌরব আকবরকে দেয়ার আগে। শুনেছি, উত্তর ভারতে 'ফসলী সন' ও উড়িশ্যায় 'বিলায়েতী' সন নামে এ সন চালু হয়। সেকালে 'বঙ্গ' নামের প্রাধান্য ছিল না, এ অঞ্চল তুর্কী বিজয়কাল থেকে অন্তত 'গৌড়' ও গৌড়রাজ্য নামে ছিল পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। প্রমাণ চৈতন্য মতবাদের নাম হচ্ছে গৌড়ীয় নববৈষ্ণব মতবাদ। কাজেই আকবরের নামে না হলে, তা হতো গৌড়াব্দ, 'বঙ্গাব্দ' নাম হওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ নেই, বঙ্গ তখন রাঢ়-বরেন্দ্রের মতো স্থানীয়ভাবে উচ্চারিত, প্রচারিত ও প্রচলিত নাম।

৫. সম্প্রতি জানা যাচ্ছে যে আকবর ফসলী সন চালু করেন ১৫৮৪ সনে তাঁর রাজত্বের ২৮/২৯তম বছরে। তিনি নাকি মুসলিমদের আপত্তির ও দ্রোহের আশঙ্কায় হিজরী সন বর্জন করতে সাহস পাননি আটাশ বছর ধরে। তবে যখন চালু করেন, তখন তাঁর সিংহাসন আরোহণের স্মারক হিসেবে তখতে বসার তারিখ থেকেই ৯৬৩ হিজরী সন থেকেই গণনার ব্যবস্থা করেন। যে-আকবর মুসলিম সন্তান হয়ে কুরআন, হাদিস উপেক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে 'দ্বীন-ই ইলাহি' মত প্রবর্তনে ও প্রচারে সাহস পান, তিনি সৌর সন প্রবর্তনে মুসলিম আমীর-সেনানী-প্রজার আপত্তির পরওয়া করবেন, এ অনুমান অচল। বিশেষত ইরানে এবং মধ্য এশিয়ায় উমর খৈয়াম নিরূপিত সৌর সন ইসলামোত্তর যুগেও চালু ছিল। সেখানেও ভারতীয়দের মতো কয়েক বছর অন্তর 'মল' মাস যুক্ত হতো। ১৫৮৪ সনে ফসলী সন চালু হলেও বাঙলায় তখনো তা যে চালু করা সম্ভব ছিল না, তা দ্রোহী ভূঁইয়াদের কথা স্মরণে রাখলেই স্বীকার করতে হবে। এ সূত্রে উল্লেখ্য যে আজো 'বঙ্গ' ও সমতট অঞ্চল সুনির্দিষ্ট সীমায় চিহ্নিত করে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলা ঐতিহাসিকদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কাজেই 'বঙ্গাব্দ'-এর উৎস নিরূপণ সহজ নয়। একথাও কেউ কেউ বলেছেন যে আকবরই স্বয়ং এ সনটার নাম দিয়েছিলেন 'তারিখ-ই-ইলাহি'। কিন্তু যে-কোনো কারণে হোক এ নামটি সম্ভবত কোথাও গ্রাহ্য বা চালু হয়নি।

৬. এ কালের 'বাঙলা' ও 'বঙ্গ' নামে পরিচিত দেশ বা এলাকা পূর্বে রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সমতট, হরিকেল বা অরিখেল প্রভৃতি আঞ্চলিক নামে অভিহিত হতো। পরে রাঢ়, গৌড়, বঙ্গ, বরেন্দ্র, প্রাগজ্যোতিষপুর প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। আমাদের অজ্ঞাত কারণে তুর্কী বিজয়ের পরে গৌড় রাজধানী হিসেবে প্রখ্যাত হয়। পুণ্ড্রবর্ধন হয় বরেন্দ্রভূমি নামে খ্যাত। আর বঙ্গ নামও গুরুত্ব পেতে থাকে। কিন্তু তবু 'বঙ্গ' অঞ্চল কোনটা তা আজো সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় না। গৌড়ের নাম নাকি 'এখোগুড় সূত্রেই' সুপ্রাচীনকালেই গ্রীসে-কার্থেজে পৌঁছেছিল। তবে তুর্কী বিজয়ের পরে দিল্লী শাসনে কিংবা স্বাধীন সুলতানদের আমলে [১৩৩৮–১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ] এবং মহামারীতে বিপর্যস্ত গৌড়ের মুঘল সুবাদার মুনীম খানের স্থিতিকাল অবধি গৌড়ই ছিল এ কালের বাঙলার সাধারণ নাম। রামমোহন রায় বাঙলা ভাষার নয়– গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ লিখেছিলেন, যদিও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে রচিত ব্যাকরণের নাম ছিল [ভাষাক্রম] 'বাঙলা ব্যাকরণ'। উনিশ শতকেও নানা প্রসঙ্গে গোটা বাঙলাভাষী অঞ্চল নির্দেশনার লক্ষ্যে 'গৌড়-বঙ্গ' এ যুগ্মনাম ব্যবহৃত হয়েছে কারো কারো মুখে ও লেখায়।

AMARBOI.COM

কাজেই তুর্কী আমলে যে বঙ্গের কোনো রাজনীতিক গুরুত্ব ছিল না [উল্লেখ্য কদর খান কিংবা গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ ছিলেন রাজধানী সোনারগাঁ-র অধিপতিরূপে পরিচিত, বঙ্গাধিপতি রূপে নন] এ অবস্থায় 'গৌড়াব্দ' না হয়ে মুঘলাই ফসলী সন 'বঙ্গাব্দ' নামে অভিহিত হওয়ার কারণ কি? স্মর্তব্য যে ঢাকায় মুঘল সুবাহ'র শাসনকেন্দ্র হয় জাহাঙ্গীরের আমলে কোনো সময়ে এবং ১৭১২ সনে মুর্শিদকুলি খান সুবাদার বা নওয়াব হিসেবে 'মকসুদাবাদে' মুর্শিদাবাদে শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন। উল্লেখ্য যে, দেওয়ান হিসেবে তিনি ১৭০৪ সন থেকেই মুর্শিদাবাদে স্থিত ছিলেন। তখন সুবাহ-ই-বাঙলার সুবাহদার ছিলেন আজিমুসশানের পুত্র ফররুখ শিয়র। সেকালে 'বাঙলা ভাষা' নাম সর্বজন গ্রাহ্য ছিল না।

কেউ বলত অবজ্ঞায় 'ভাষা', উন্নাসিক মুসলিমরা জানত এ 'হিন্দুয়ানী ভাষা', ষোল শতকের কবি দ্বিজশ্রীধর ও রামচন্দ্র খান একে জানতেন 'প্রাকৃত ভাষা' বলে। ষোল শতকের আর এক কবি মাধবাচার্য একে বলতেন 'লোকভাষা'। সতেরো শতকের কবি শেখর একে উল্লেখ করেছেন 'লৌকিক ভাষা' নামে, শ্রীকরনন্দী, দৌলতকাজী প্রমুখ অনেক কবি একে 'দেশীভাষা' বলেই মানতেন। কেউই 'মাতৃভাষা' বলে জানতেন না। কেউ কেউ বাঙ্গলা বা বঙ্গভাষা বলেও অভিহিত করতেন। স্বয়ং ভারতচন্দ্র রায় একে

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষা-ই বলতেন [অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল]। বাইরে এর নাম ছিল গৌড়ীয় বা গৌড়িয়া ভাষা। এ অবস্থায় নতুন অব্দের নাম ‘বঙ্গাব্দ’ হওয়া স্বাভাবিক বা সম্ভব কি? এমন কি হোসেন শাহ [১৪৯৩-১৫১৯] প্রবর্তন করলেও এ সনের নাম হতো হোসেনী সন বা গৌড়াব্দ, বঙ্গাব্দ হওয়ার কোনো সঙ্গত কারণই ছিল না। এছাড়া ৫৯৩ সন যোগে খ্রিস্টাব্দ করাও সম্ভব হতো না।

যদিও ‘বঙ্গাল’ ও ‘বাঙ্গালী’ শব্দ দুটো চর্যাপদেও মেলে তা এক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়। পর্তুগীজদের ‘সিটি অব বেঙ্গলা’ য়ুরোপীয়দের বেঙ্গল এবং মুঘলের ‘সুবাহ্-ই-বাঙ্গলাহ’ থেকে বাঙলা নামটা সম্ভবত সুপরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে আর কোম্পানী রাজত্বে ‘কোলকাতা’ রাজধানী ও প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হওয়ার ফলে স্থানীয় ভাষাটি বঙ্গভাষা, ‘বাঙলা ভাষা’ নামে অভিহিত হতে থাকে, কেননা তখন গৌড় গুরুত্বহীন অনুচ্চারিত ও প্রায় বিস্মৃত নাম প্রাত্যহিক জনজীবনে।

৭. কিন্তু ‘বঙ্গাব্দ’ অঞ্চল বিশেষে পুঁথিলিপিকারেরা অন্তত সতেরো শতক থেকে ব্যবহার করে আসছেন। যদিও রাঢ়ের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রম সম্বৎ, মল্লাব্দ, লক্ষ্মণাব্দ এবং শকাব্দ ব্যবহৃত হতো। চট্টগ্রামে ‘মঘীসন’ এবং কুমিল্লা-ত্রিপুরায় ত্রিপুরাব্দ আজো জমি-জমা-খাজনা সংক্রান্ত কাজে নিত্য চালু রয়েছে। যেমন রয়েছে রক্ষণশীল মুসলিমদের মধ্যে হিজরী সন, উত্তরবঙ্গে সিলেটে চালু ছিল– ‘পরগনাতিসন’ [১২০২ খ্রিস্টাব্দে প্রচল হয়]। নাম দেখে মনে হয়, ঐটি বখতিয়ার খলজির গৌড় বিজয়ের ও রাজস্ব ব্যবস্থার স্মারক-সন রূপে চালু হয়। কাজেই এ মুহূর্তেও বঙ্গাব্দ উভয় বঙ্গের সর্বত্র অনক্ষর গ্রামীণ আমজনতার মধ্যে চালু নেই, কখনো ছিল না। একালে জাতিক স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্যপ্রীতিবশে পত্র-পত্রিকায় বঙ্গাব্দ মুদ্রিত হয় বটে, কিন্তু পত্রিকা পরিচালকরাও বঙ্গাব্দের মান-দিন বলতে পারবেন না, যেমন ভারতে ‘শকাব্দ’ সর্বত্র চালু হলেও শহুরে শিক্ষিত মাত্রই কেবল গ্রেগোরীয় ক্যালেন্ডারই জানে ও মানে। তাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় খ্রিস্টাব্দের দিন-মাস-বছরের হিসেবে।

৮. অতএব সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য বলে প্রচল হলেও ‘বঙ্গাব্দের উদ্ভব আকবরের ফসলী সন থেকে ৯৬৩ হিজরী সনের রূপান্তরে’– এর প্রমাণসম্ভব ও প্রমাণিত কোনো তথ্য কারো আয়ত্তে নেই। মিলটা আকস্মিক এবং যুক্তিটা কাকতালীয়। স্বীকৃতি বা সিদ্ধান্তটি বৌদ্ধিক হলেও যৌক্তিক নয়। তাই এ সিদ্ধান্ত সঙ্গতও নয়।

কেউ কেউ ইদানীং অনুমান করেন যে, কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত ৫৯৩ সন থেকে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেন। এ বিষয়ে সব বিদ্বান অভিন্নমত পোষণ করেন না। শশাঙ্ক সাত শতকের গোড়ার দশ থেকে সতেরো বছর রাজত্ব করেন বলেই অনেকের অনুমান। তিনিই বঙ্গাব্দের প্রবর্তক। কারণ আমরা ৫৯৩ যোগে খ্রিস্টাব্দ পাই। এ-ও হচ্ছে আকস্মিক মিল ভিত্তিক কাকতালীয় যুক্তি। কারণ শশাঙ্কের আমলে ‘বাঙলা’ বা বঙ্গ নামে রাজ্য পরিচিত বা অভিহিত হওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। তিনি ছিলেন দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের রাজা। উত্তর ভারতের কনৌজরাজ রাজ্যবর্ধনকে অপকৌশলে হত্যা করায় শশাঙ্কের সঙ্গে রাজ্যবর্ধনের ছোট ভাই রাজা হর্ষবর্ধনের যুদ্ধ হয়। হিউয়েন সাঙের মতে শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী ও বৌদ্ধবিনাশী ছিলেন। আর হর্ষবর্ধন ছিলেন আদর্শ বৌদ্ধ সম্রাট। বাণের রচিত হর্ষচরিতেও হর্ষ সপ্তমশতকের প্রথমপাদের একজন শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৌদ্ধ সম্রাট। দেশের নাম 'বঙ্গ বা বাঙ্গলা' হয়নি তখন। মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণের তথা ভৌগোলিকভাবে গৌড়ের বা পুণ্ড্রের ও রাঢ়ের রাজার প্রবর্তিত সন 'বঙ্গাব্দ' হবে কেন? তা ছাড়া সেকালের বঙ্গ [ফরিদপুর-ঢাকা-ময়মনসিংহ] অথবা একালের ঢাকা বিভাগ শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত ছিল বলেও আজ অবধি কোনো পরোক্ষ প্রমাণও মেলেনি। এমন কি শশাঙ্কের জন্মস্থানও কারো জানা নেই। তিনি একালের বাঙলাভাষী অঞ্চলের লোক ছিলেন, না প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের সন্তান ছিলেন তাও আজো অনির্ণিত। এ অবস্থায় বঙ্গাব্দ প্রবর্তনের কৃতিত্ব শশাঙ্কে আরোপ করা কল্পনা-আশ্রয়িতামাত্র।

৯. ক. সুবেহ বাঙলা থেকে বঙ্গাব্দ হলে সুবার অন্তর্ভুক্ত উড়িশায় বিলায়েতী সন নাম হতো না।

খ. City of Bengala এবং পদ্মার অপরপারের পূর্ববঙ্গের একাংশের মানুষকে সংস্কৃতিহীন অর্থে বাঙাল' বলার রীতি পদ্মার ওপারের লোকের মধ্যে চালু থাকলেও 'গুলে বকাউলী'র ফরাসী কবি ইজ্জত উল্লাহও এ অঞ্চলে বাস করতেন বলে তাঁর নামের সঙ্গে নিবাসস্থলযুক্ত করে তাঁকে 'ইজ্জৎ উল্লাহ বাঙ্গালী' বলেই অভিহিত করা হতো। এসব তথ্য জানা থাকা সত্ত্বেও 'বাঙলা' তখনো বাঙলাভাষী অঞ্চল পরিচিতির জন্যে ব্যবহৃত হতো না। প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত। এতে সুবেহ বাঙলার বিহার, উড়িশাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই জনসংখ্যা হয়েছে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস নির্বিশেষে সাতকোটি। এ সবকিছু জানা থাকা সত্ত্বেও আমাদের ধারণা বা অনুমান ইংরেজি যখন প্রাশাসনিক ভাষা হল, তখনই সুবেহ বাঙলা হল Bengal Presidency এবং গোটা ইংরেজ অধিকারের রাজধানী কোলকাতা হওয়ায় 'বাঙলা' নামেই 'সুহ্ম-রাঢ়-বরেন্দ্র-বঙ্গ-সমতট' পরিচিত হতে থাকে আর 'গৌড়' অব্যবহারে গুরুত্ব হারায়।

১০ আমরা কি এমন অনুমান করতে পারি না যে একালের বঙ্গে [করতোয়া নদীর এপারের বগুড়া থেকে একালের ঢাকা বিভাগে] কোনো রাজার নাম নিরপেক্ষ 'সৌর সন' প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব প্রয়োজনে সামন্তরা মিলে পরগনাতি সনের মতো [১২০২ খ্রীস্টাব্দে], বাঙলার প্রত্যন্ত পার্বত্যরাজ্যে মঙ্গোল রাজ প্রবর্তিত ত্রিপুরাব্দের [৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে] মতো, আরাকানের বা রোসাঙ্গের মঘীসনের মতো [৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে] ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রাশাসনিক প্রয়োজনে বঙ্গের কোনো রাজা বঙ্গাব্দ প্রবর্তন করেছিলেন আন্ত-আঞ্চলিক লেনদেনের প্রয়োজনে। এ জন্যেই এর সঙ্গে কোনো রাজা-বাদশাহর নাম বা রাজত্বাঙ্ক যুক্ত হয়নি। নিদেনপক্ষে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়-উক্ত সিলভাঁ লেভি অনুমতি পূর্ব ভারতবিজয়ী তিব্বতী রাজা স্রংসন প্রবর্তিত সন বঙ্গাব্দের উৎস-ভিত্তি বলে অনুমান করে গবেষণা চালানো যেতে পারে। আকবর প্রবর্তিত ফসলী সনের মিলটা নিতান্ত আকস্মিক, তা-ই কাকতালীয় ন্যায় প্রয়োগে উৎসাহ জুগিয়েছে। ৯৬৩ ও ৯৮৭ হিজরী সনের আগেকার কোনো উৎকীর্ণলিপিতে কিংবা পাণ্ডুলিপিতে 'বঙ্গাব্দ' যাবনীসম্মত কিংবা যবননৃপের রাজত্বাঙ্ক মিললে আকবরী সৌধ তাসের ঘরের মতো বিলুপ্ত হবে। কাজেই গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে।

দ্রষ্টব্য

১. হরিপদ মাইতির প্রবন্ধ 'বঙ্গাব্দ'– 'দেশ', ১৩ আগস্ট ১৯৯৪

২. পল অ্যানকোন-এর চিঠি– দেশ, ৫ নভেম্বর ১৯৯৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. কুমুদ নাথ– দেশ, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫
৪. শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস– দেশ, ঐ
৫. বিমেলেন্দু ঘোষ– দেশ, ঐ
৬. পলাশবরণ পাল– দেশ, ঐ
৭. ‘এক্ষণ’, শারদীয় সংখ্যা ১৪০০ কলিকাতা।

দাঙ্গার ইতিহাস

'বাংলাদেশ! বাংলাদেশ!' বাঙলা ও বাঙালি, জিন্না: পাকিস্তান/নতুন ভাবনা প্রভৃতি বহুগ্রন্থ প্রণেতা অনুবাদক এবং গান্ধীবাদী সত্যসন্ধ ও মানবতাকামী সাহিত্যিক– ঐতিহাসিক শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'দাঙ্গার ইতিহাস' [কলিকাতা, ২য় মুদ্রণ ১৪০১ সন, মূল্য-১০০ টাকা] একটি অনন্য গ্রন্থ। গোটা ভারতে সংঘটিত আঠারো, উনিশ ও বিশ শতকের এবং স্বাধীন ভারতের প্রায় সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংক্ষিপ্ত এবং কোনো কোনোটার বিস্তৃত কারণ ও পরিণাম এ গ্রন্থে তথ্যযোগে বয়ান করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক, শাস্ত্রিক, বার্ণিক, ভাষিক, গৌত্রিক ও নৈবাসিক দাঙ্গা সব যুগে সব দেশেই সব সমাজেই লঘু গুরুভাবে ঘটে থাকে।

আমাদের দেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে ব্রিটিশ শাসকদের 'ভেদ নীতি' প্রয়োগে সাম্রাজ্যিক শাসন-শোষণ দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে দাঙ্গায় পরোক্ষ প্ররোচনা দিয়ে দাঙ্গার সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল মাত্র। লাভে-লোভে-স্বার্থে ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ-বিবাদ, কাড়াকাড়ি, মারামারি ও হানাহানি ঘটে। ক্ষোভ, ক্রোধ ও লোভই সব বিরোধ-বিবাদের উৎস। ঘরোয়া জীবনেও আমরা সবাই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-ঈর্ষা-হিংসা-ঘৃণা মুক্ত থাকতে পারি না। অসূয়া, স্বাতন্ত্র্যচেতনা, ধন-মান-ক্ষমতালিপ্সা প্রভৃতি আমজনতাকে দ্বন্দ্বে-সংঘর্ষে-সংঘাতে প্ররোচিত করে। চরের দখল নিয়ে দাঙ্গা হয়। জমি থেকে উচ্ছেদের জন্যে লেঠেল দিয়ে দুর্বল পক্ষকে উৎখাত করা, রাজার লেঠেল সৈন্য দিয়ে পররাজ্য দখল করা প্রভৃতি গভীর তাৎপর্যে একই প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। এ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য স্বীকার করলে দাঙ্গার গুরুত্ব থাকেই না। আর দশটা রক্তঝরা প্রাণহরা অপরাধ-অপকর্মের মতো সাম্প্রদায়িক, শাস্ত্রিক, বার্ণিক, ভাষিক, গৌত্রিক ও নৈবাসিক বা আঞ্চলিক লড়াই বা দাঙ্গাও একটা স্বাভাবিক ও সাময়িক সামাজিক বা মানবিক বিপর্যয় মাত্র। একে আমরা অকারণ গুরুত্বে গ্রহণ করে একালের রাষ্ট্রিক জীবনে রাজনীতিক ও আর্থিক ফায়দা প্রাপ্তির সহজ ও কেজো উপায় রূপে চালু রেখেছি মাত্র। লক্ষণীয় সর্বথা ও সর্বদা দাঙ্গার উত্তেজনা-প্ররোচনাদাতা হচ্ছে ধন-মান-ক্ষমতালিপ্সু-স্থানীয় গণ্যমান্য উচ্চাশী বিবেকহীন সর্দার মাতব্বর-নেতারা। এরা নিজেদের মতলব হাসিলের জন্যেই নিঃস্ব দুস্থ দরিদ্র অজ্ঞ অনক্ষরদের বল-ভরসা দিয়ে হত্যায়, লুণ্ঠনে-হরণে-ধর্ষণে-দহনে লেলিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়। নিজেরা থাকে নিষ্ক্রিয় সানন্দ দর্শক। অজ্ঞ অনক্ষর নিঃস্বরা অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠনের লোভেই হত্যায় ও দহনে মাতে এবং প্রবৃত্তিচালিত হয়ে ধর্ষণে-হরণেও লিপ্ত হয়। আফ্রিকায় আজো গৌত্রিক হানাহানি আদি ও আদিম স্তরেই রয়ে গেছে। আমাদের অধিকাংশ মানুষ আজো অজ্ঞ অনক্ষর নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ, দরিদ্র এবং তারা আজো মানবেতর জীবন যাপন করে। তাই দাঙ্গা তাদের কাছে অর্থ-সম্পদ সংগ্রহেরও একটা সহজ উপায়। তারা মানবেতর জীবন যাপনে অভ্যস্ত বলেই মানবিক গুণের অনুশীলনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ফলে কীট-পতঙ্গ-মশা-মাছি-মাছ-পশু-পাখি হত্যা আর নরহত্যা তাদের প্রাণে-মগজে-মননে অভিন্ন। দাঙ্গা যারা বাধায়, একালে বাবরী মসজিদ ও তার প্রতিক্রিয়ায় মন্দির যারা ভাঙায় তারা উচ্চশিক্ষিত বিত্তবান, ধন-মান-ক্ষমতা-খ্যাতি লিপ্সু মনুষ্যাকৃতির প্রাণী, চিত্তবান মানুষ নয়। এমনিতে জীবজগৎটাই হচ্ছে খাদ্য-খাদক সম্পর্কে বাঁধা। হিংসা ও হিংস্রতা না-কি কোনো কোনো বৃক্ষে-লতায়ও সুলভ। কোনো কোনো তরুলতা কীট-পতঙ্গ পাতার মুঠিতে বেঁধে খায়। কাজেই প্রাণিজগতে মারামারি হানাহানি চিরকাল থাকবেই। এবং মনুষ্যত্বের ও সংস্কৃতির, যুক্তিমানতার ও বিবেকবানতার বিকাশের মান-মাপ-মাত্রা অনুসারে মনুষ্যসমাজেও কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানি চলবেই।

রবীন্দ্রনাথ তাই সর্বত্র হত্যালীলা দেখেছেন: হত্যা অরণ্যের মাঝে/হত্যা লোকালয়ে/হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে/কীটের গহ্বরে অগাধ সাগর জলে/নির্মল আকাশে, হত্যা জীবিকার তরে /হত্যা খেলাচ্ছলে /হত্যা অকারণে/হত্যা অনিচ্ছার ফলে।'

AMARBOI.COM

ব্রিটিশ বিভেদনীতি প্রয়োগে শাসন-শোষণ করার প্রয়োজনে ভারতের মনগড়া বিকৃত ও কাল্পনিক ইতিবৃত্তান্ত রচনার নির্দেশ দিয়ে নিয়োজিত করতে থাকে ইংরেজ বিদ্বানদের। জেমস মিল থেকে হান্টার প্রমুখ সবাই একই কাজ করেছেন। ফলে তাঁদের রচনায় তুর্কী-মুঘলদের সাড়ে ছয়শ' বছরের শাসনকাল হচ্ছে এক বর্বর জাতির দানবীয় শক্তি প্রয়োগে হিন্দুর নারী হরণের, ধর্ষণের ও বিবাহের বীভৎসতার কাল। তরবারি হাতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে জোরে জুলুমে হিন্দু-বৌদ্ধের ধর্ম কাড়ার ও ইসলামে দীক্ষিত করার আর সর্বপ্রকারে অর্থের, সম্পদের ও বৃত্তির-বেসাতের ক্ষেত্রে হিন্দু-পীড়নের ইতিবৃত্ত হল লিখিত। পাঠক হিন্দুরাও আক্ষরিকভাবে তা বিশ্বাস করে আজো ক্ষোভে ক্রোধে বিদ্বেষে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে।

শিক্ষিত হিন্দুও যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে এসব বয়ানের বাস্তবতা-সম্ভাব্যতা-স্বাভাবিকতা যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন মনে করে না ইতিহাসের তথ্যের আলোকে। আমরা জানি, প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে লর্ড ডালহৌসির [১৮৪৮-৫৬] পূর্বাবধি উপমহাদেশ সামন্ত-জমিদারের প্রত্যক্ষ শাসনেই ছিল সাধারণভাবে। দিল্লীর বা অন্যস্থানের সার্বভৌম শক্তির মালিক সুলতানের বা বাদশাহর প্রত্যক্ষ শাসনে থাকত সামান্য পরিসরের এলাকা। এ ক্ষেত্রে মুরশিদকুলি খানের 'ইজারাদারি প্রথা' প্রবর্তনও স্মর্তব্য। এছাড়া শূদ্রসেব্য ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণ-হিন্দুরা ইসলামী সাম্যে কায়েমী স্বার্থ ও আভিজাত্যচেতনা বশেই প্রভাবিত হয়নি। তাই অন্য কোনো দায়ে না পড়লে উচ্চ বর্ণের হিন্দুর ইসলাম গ্রহণের দৃষ্টান্ত গোটা উপমহাদেশেই বিশেষ করে মুলতানের পূর্বে এবং দাক্ষিণাত্যে বিরল। এ জন্যেই ব্রাহ্মণ্য ঘৃণা-অবজ্ঞা-দাসত্ব মুক্তির লক্ষ্যে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য-স্পৃশ্য শূদ্ররাই সর্বত্র ইসলাম বরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিল। কিন্তু মধ্যযুগে ধর্মান্তরের ফলে তাদের পেশান্তর সহজ ও সম্ভব ছিল না সেকালের সামাজিক আর্থিক-পরিবেশে। তাই তারাও ছিল আবহকাল থেকেই ঘরানা পেশায় নিযুক্ত, যার লেশ ও রেশ আজো রয়ে গেছে। দেশজ মুসলিমরা সাধারণভাবে অজ্ঞ, অনক্ষর, নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ, দরিদ্র এবং তুর্কী-মুঘল শাসনকালে আর ব্রিটিশ আমলে ছিল বর্ণহিন্দুর কাছে অন্ত্যজদের মতোই ঘৃণ্য-অবজ্ঞেয়, তুর্কী-মুঘল আমল থেকে এরা আজ অবধিও ভারতে বর্ণহিন্দুর শাসনেই রয়েছে। অবশ্য পাকিস্তানে-বাঙলাদেশে এখন তারা স্বধর্মীর শাসনেই শাসিত শোষিত হচ্ছে। তুর্কী আমলে গাঁয়ে গাঁয়ে মুসলিম সংখ্যা ছিল নগণ্য, মুঘল আমলে সংখ্যা বাড়ল মাত্র। অন্যদিকে তেমন উন্নতি হয়নি, অর্থে-সম্পদে-সংস্কৃতিতে তবু মোল্লা-মুয়াজ্জিন-মৌলভী-উকিল-হেকিম-কাজী এমন কি কেউ কেউ ফৌজদারও হল। কিন্তু শাসন-প্রশাসন রইল বর্ণহিন্দুর হাতেই। প্রমাণ, আজো পদজ্ঞাপক পদবীগুলো হিন্দুর মধ্যেই সুলভ, দেশজ মুসলিম বিরলতায় দুর্লভ ও দুর্লক্ষ্য। রাজস্বাদি বেসামরিক শাসনভার ছিল হিন্দুর উপরই। কাজেই নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের নিম্নবৃত্তির অন্ত্যজ অস্পৃশ্য থেকে দীক্ষিত দেশজ মুসলিমরা ছিল বর্ণহিন্দুর শাসনপাত্র গাঁয়ে, গঞ্জে ও শহরে। ব্রিটিশের বানানো বিকৃত ইতিবৃত্তান্তে রামমোহন রায় থেকে আজকের বিদ্বান হিন্দুও তুর্কী-মুঘল শাসনকালকে বর্বর নিষ্ঠুর শাসকের পীড়নের, নির্যাতনের, বিভীষিকার কাল বলে জানেন ও মানেন।

অন্যদিকে হান্টার প্রমুখ তথাকথিত ইতিহাস লেখকরা মুসলিমদের উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে জানাতে-বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে বৌদ্ধ-হিন্দুজ দেশী মুসলিমরাও তুর্কী-মুঘল শাসকদের স্বজাতি ও জ্ঞাতি। তারা দরিদ্র থাকতেই পারে না। হান্টার বলেন, One hundred and fifty years ago (1873) it was impossible for a Musalman to be poor.—এ কোন মুসলমান, ইরানী-তুরানী-মুঘল-মুসলমান, না দেশজ মুসলিম তা পষ্ট করে বলছেন না মতলব মন্দ বলেই। ফলে বিভ্রান্ত মুসলমান নিজেদের তুর্কী-মুঘলের জ্ঞাতি ভেবে তাদের বর্তমান অজ্ঞতার, অনক্ষরতার, নিঃস্বতার, নিরন্নতার, দুস্থতার, দরিদ্রতার জন্যে দায়ী করল বর্ণহিন্দু জমিদার-মহাজন-চাকুরে-বেণে-উকিল-চিকিৎসক-শিক্ষক প্রভৃতি সবাইকে। তাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল না বলেই তারা সাক্ষর-শিক্ষিত ছিল না আরবী-ফরাসী-বাঙলাতেও। কাজেই স্বাধীনতাহৃত মুসলিমরা ব্রিটিশ বিদ্বেষবশে ইংরেজি শেখেনি বলে যে কথা চালু আছে, তাতে কোনো সত্য নেই। বরং শাসকগোষ্ঠীর বংশধর উর্দুভাষীরা গোড়া থেকেই ইংরেজি শিখেছিল। প্রমাণ, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার। অতএব, প্রজন্মক্রমে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, প্রতিহিংসাপরায়ণ শিক্ষিত বর্ণহিন্দুর মুসলিমবিদ্বেষের কারণ অতীতে তুর্কী-মুঘলের হিন্দুত্ব ও হিন্দুর ইজ্জত হরণের ইতিবৃত্ত। হিন্দুরা শুনে শুনে আজো একে সত্য বলে জানে ও মানে। আর চিরকাল ধন-মানহৃত দুঃস্থ বঞ্চিত শিক্ষিত মুসলিমের হিন্দু-দ্বেষণার কারণ, তাদের ধন-মান ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশ আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে পরোক্ষে প্রত্যক্ষে হিন্দুদের শোষণের হরণের ক্ষোভের ও ঈর্ষার জ্বালা। অনক্ষর হিন্দু-মুসলিম চিরকালই ইদানীং পূর্বে প্রতিবেশীর সঙ্গে নির্বিরোধে নির্বিবাদে সহাবস্থান করেছে। হিন্দু নাপিত ধোপা কামার কুমার হাড়ি ডোম মুচি মেথর মালী চাঁড়াল মুসলিমের সেবা করেছে, প্রয়োজন মিটিয়েছে ভিন্ন ধর্মের হয়েও। তেমনি মুসলিমরাও মজুর খেটেছে হিন্দুর ঘরে। দরজি, মাঝি, গাড়োয়ান-দারোয়ান হিসেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা জানি মনুষ্য সমাজে বুনো-বর্বর ও সভ্য-ভব্য মানুষ আদি ও আদিমকাল থেকেই গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক, জাতিক কোন্দল করে করেই, নরহত্যার মাধ্যমে রাজ্যজয় করে করেই, শাসনের শায়েস্তার দমনের-দলনের প্রয়োজনে প্রজা বা শাসনপাত্র হত্যা করে করেই মানবজাতি হিসেবে আজকের স্তরে উন্নীত হয়েছে কোথাও কোথাও। আফ্রিকায়-এশিয়ায় কিংবা আরণ্য মানবে মনুষ্যত্বের ও রাজনীতিক নৈতিক সামাজিক সংস্কৃতির বিকাশ হয়নি বলে সেখানে নির্বিচার হত্যা চলে আজো, এখনকার রুয়েন্ডায় বা লাইবেরিয়ায় বা দক্ষিণ আফ্রিকায়। কিংবা কালো আফ্রিকার সব রাষ্ট্রে আজো হাজারে হাজারে লাখে লাখে নরহত্যা পার্বণিক উৎসবের আকার ধারণ করে। অতএব পরিবারে, পাড়ায়, মহল্লায় স্বজনের ও জাতির মধ্যেও মারামারি ঘটে। পাকিস্তানে জির্গা অঞ্চলে এখনো প্রাচীন আরবের মতোই হত্যায় হত্যায় বদলা নেয়ার রেওয়াজ চালু আছে। কেবল বিধর্মীর বিভাষীর বিদেশীর বিজাতির মধ্যে মারামারি হানাহানিকেই আমরা আজকাল বিশেষ অর্থে 'দাঙ্গা' নামে অভিহিত করি। আর রাষ্ট্রিক জাতীয়তার আবশ্যিকতায় ও অপরিহার্যতায় আস্থা রাখি বলেই আমরা ভিন্ন ধর্ম বা শাস্ত্রমতবাদীর দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতকে 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা' নামে আখ্যাত করি। আসলে ব্যক্তিগত যেমন, তেমনি অর্থ-বিত্ত-বেসাত ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতাজাত দলগত লাভে, লোভে, অসূয়ায়, স্বার্থে এবং ক্ষতিতে বাধে এবং বাধায় দাঙ্গা সর্দার-মাতব্বর-রাজনীতিক প্রভৃতি বিদ্যা-বিত্তবান ধূর্ত লোকেরাই। আর আস্তিক মানুষের উদারতার একটা সীমা আছে। তাই যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাথলিক ও নিগ্রো ভোট পায় না। উত্তর আয়ারল্যান্ডে ক্যাথলিকে প্রোটেস্ট্যান্টে হানাহানি চলে, শিয়া-সুন্নী-আহমদিয়ার দাঙ্গা আজো চলে, বর্ণহিন্দুরা অচ্ছুত হত্যা করে, বাঙালি-অসমি দাঙ্গা চলে, বড়ো, নাগা, কুকি, মিজো, শিখ, কাশ্মীরী প্রভৃতি দ্রোহী হয়, তামিল-সিংহলি লড়াই করে, কাবেনেরা ইয়াসুনীর শাসন মানে না। কুর্দীরা তাই চিরদ্রোহী। কুইবেকীরা কানাডা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। এমনি পৃথিবীব্যাপী আজো জাতি-সম্প্রদায়-উপজাতি-আদিবাসী-জনজাতির স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার সংগ্রাম চলছেই। তবু শান্তিপ্রিয় মানববাদী মানবতাকামী মানুষ স্থায়ী মীমাংসায় স্থায়ী শান্তি কামনা করেন। তাই আমাদের উপমহাদেশের দাঙ্গার কারণ ও বিলুপ্তিপন্থা আবিষ্কারের লক্ষ্যে বহু বহু বিদ্বান তাঁদের মন-মগজ-মনন-মনীষা প্রয়োগে তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য আবিষ্কারে, বিশ্লেষণে মতে মন্তব্যে সিদ্ধান্তেও মীমাংসার বা বিলুপ্তির পন্থা নির্দেশে ব্রতী হয়েছেন। দেশী-বিদেশী বিদ্বানের হাতে ইংরেজিতে ও বাঙলায় এমনি শতেক বই এবং হাজার প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। কিন্তু দাঙ্গা যথাপ্রয়োজনে যথাসময়ে যথাস্থানে যথাব্যক্তি বা যথাদল যথামতলবে বাধিয়েই চলেছে নানা অছিলায়। দুষ্টের ছলনার অভাব হয় না। আগেকার দিনে দাঙ্গা ব্যাপক আকারে হতো না, যান-বাহনের, তার-বেতারের অভাবে খবর স্থানান্তরে ছড়াত না বলেই স্থানিকভাবে দাঙ্গা বাধত, আবার দিনান্তে শেষও হতো। এমনকি ইংরেজ আমলেও ব্যাপক আকারে সপ্তাহব্যাপী দাঙ্গা কমই হয়েছে। দাঙ্গা রাজনীতিকরা ও বেণেরা মস্তান-গুণ্ডা-খুনীযোগে বাধাত বলে তা শহরেই থাকত নিবদ্ধ। এখন তারে-বেতারে গোটা উপমাদেশে রটে যায় বলে গাঁয়ে-গঞ্জেও দাঙ্গা ছড়ায়। বাবরী মসজিদ সম্পৃক্ত মূর্তি-মন্দির ভাঙন, গৃহস্থের অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন-দহন প্রভৃতি এর সর্বশেষ প্রমাণ।

শত শত গবেষণাগ্রন্থে ও প্রবন্ধে অনেকেই দাঙ্গার কারণ নির্দেশ ও দাঙ্গার অবসানের পথ অনুমান করেছেন। দাঙ্গার সংজ্ঞা ও সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন কেউ কেউ। গাঢ়-গভীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনস্তাত্ত্বিক কারণও নির্দেশে প্রয়াসী হয়েছেন কোনো কোনো বিদ্বান। দাঙ্গার ইতিহাস লেখক শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বইয়ে দু'জনের বিশ্লেষণে গুরুত্ব দিয়েছেন। পাঠকের জ্ঞাতার্থে সামান্যাংশ উদ্ধৃত করছি– স্বধর্ম ও স্বশ্রেণী চেতনার কারণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্র বলেছেন, 'এমনি এক বিশ্বাস, যে একদল মানুষ একটি বিশেষ ধর্মে বিশ্বাস করলে তাঁদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ সব একই হয়।' বর্ণে বিন্যস্ত হিন্দু সমাজ সম্বন্ধেও এ তত্ত্ব ও তথ্য প্রযোজ্য।

আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার বলেন, 'সাম্প্রদায়িকতার কেন্দ্রে ইহজাগতিকতা, কিন্তু এর বহিরাবরণ ধর্মীয়। আর এই বহিরাবরণই প্রায়শ আমাদের প্রতারিত করে। এভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা প্রধানত স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অভিজাতদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাকে ভাষা দিয়ে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক বাগধারা ও মানুষের আদিম চেতনার প্রতি আবেদন জানাবার জন্যে সুকৌশলে সমগ্র সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এ ধারণা সৃষ্টি করে।' [দাঙ্গার ইতিহাস পৃঃ ২১] আমাদের ধারণায় 'মানুষের প্রথম পরিচয় সে মানুষ এবং তার শেষ পচিয়ও সে মানুষ'– এ স্বীকৃতি কোনো আস্তিক জ্ঞানী-গুণী মানুষ দিতে পারেন না। কারণ তিনি বিশ্বাসে চলেন, যুক্তি তাঁর মানসসম্পদ নয়, নয় তার জীবনের পুঁজি-পাথেয়।

এ জন্যেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ধর্ম কারার প্রাচীরে বজ্র হানো' কিংবা 'অন্ধকার ভেদ করি আসুক আলোক/অন্ধতার মোহ হতে আঁখি মুক্ত হোক।' অথবা 'নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর। ... শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের 'ভালো'। তবু আস্তিক বলেই রবীন্দ্রনাথ বলতে দ্বিধা করেননি যে, 'বলশেভিক গণতন্ত্র একই দানবের পাশ মোড়া দেওয়া।' আমাদের মতে নাস্তিক হলেই, সমাজতান্ত্রিক হলেই মানুষের খেয়ে পরে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ থাকার অধিকার দেওয়া ও পাওয়া সম্ভব। 'নাস্তিক্য' পরিহার সম্ভব না হলে কেবল স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে মনুষ্যরচিত শাস্ত্র বর্জন করলে কিংবা নিদেনপক্ষে সেক্যুলার সংবিধানে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালিত হলে অর্থাৎ রাষ্ট্র ও সরকার মানুষের দিনানুদৈনিক জীবনের চাহিদা পূরণে তথা ইহজাগতিক জীবন-জীবিকা-অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা-নিবাস সম্পৃক্ত প্রয়োজন মেটানোর কাজে নিযুক্ত থাকলে এবং নাগরিকের ধর্মবিশ্বাসকে ব্যক্তিগত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা বলে তার অস্তিত্ব সরকারী বা রাষ্ট্রিকভাবে অস্বীকার করলেই দাঙ্গার সংখ্যা ও ব্যাপ্তি কমানো সম্ভব হবে। ভারতে ১৯৭৬ সনে যে সেক্যুলারিজম সাংবিধানিক করা হয়েছে, তা গোঁজামিল মাত্র। এতে সাম্প্রদায়িক দ্বেষণা বৃদ্ধিই পাবে– কমবে না। এ হচ্ছে ভোট জোগাড়ের ফাঁদ মাত্র, জনহিতৈষণা প্রসূন নয়।

শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইটি নির্ঘণ্ট সমেত ৩২৯ পৃষ্ঠার। গান্ধী-রবীন্দ্র প্রভাবিত প্রখ্যাত মননশীল লেখক অম্লান দত্তের ভূমিকা দিয়েই বইয়ের শুরু। লেখক দাঙ্গার ইতহাস মুক্ত মন-মননকে ও দৃষ্টিকে পুঁজি-পাথেয় করে সত্যসন্ধ হয়ে রচনা করেছেন, তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণে তিনি নিরপেক্ষ বিচারকের মতোই মত মন্তব্য সিদ্ধান্ত মীমাংসা অকপটে পরিব্যক্ত করেছেন এ বইয়েও। বইতে উপসংহারসহ সতেরোটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। যেমন ১. হে মোর দুর্ভাগা দেশ [১৯৯০ সনের দাঙ্গা] ২. হিন্দু-মুসলমান-তুর্কী-মুঘল আমলের বয়ান ৩. পুরাতনী [হিন্দুর কমঠবৃত্তি : ১৮৫৫ সনের দাঙ্গা অবধি বর্ণিত] ৪. গোরক্ষা থেকে খিলাফৎ ও তারপর ৫. কানপুর বোম্বে লাহোর ঢাকা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যত্র [১৯৩১ সন থেকে দাঙ্গার বয়ান] ৬. কলকাতা-নোয়াখালী-পাঞ্জাব-দিল্লী ও সর্বত্র [১৯৪৬ সনের দাঙ্গা] ৭. তৃতীয় পক্ষ অপসারিত তবু [স্বাধীনতা যুগে দাঙ্গা ১৯৬৮-১৯৮৯ সন অবধি]। এ সাত অধ্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ৮ সংখ্যক থেকে ১০ সংখ্যক অধ্যায়ে লেখক দাঙ্গার কারণ সন্ধান করেছেন 'সর্বত্র দাঙ্গার অন্তরালে' শিরোনামে ৮. রাজনীতি ৯. অর্থনীতি ১০. কয়েকটি কারণ ১১. অতীত পৃষ্ঠা থেকে [রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী-কাজী আবদুল ওদুদের মত মন্তব্য ধারণা] ১২. অলখ ইলাহি এক হ্যায় [মধ্যযুগের সন্ত-সুফী ও সমন্বয় সহিষ্ণুতা বিষয়] ১৩. হিন্দু না ওরা মুসলিম ঐ [সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্যে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের বয়ান] ১৪. হিন্দুদের প্রতি আবেদন [সদ্বুদ্ধি জাগানো লক্ষ্যে] ১৫. মুসলমানদের প্রতি [যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক বিবেচনার জন্যে আবেদন] ১৬. আরো দাঙ্গা [শিয়া-সুন্নী, শিখ-হিন্দু দাঙ্গা, অচ্ছুতদের প্রতি ঘৃণা, শিক্ষা, চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্য, মণ্ডল কমিশন প্রভৃতি] ১৭. উপসংহার: যেহেতু 'একের অনলে বহুরে আহুতি দেয়ার নাম ও পরিণাম দাঙ্গা। সেহেতু লেখকের আকুল আবেদন প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কবিতায়–

রাখো নিন্দাবাণী, রাখো আপন সাধুত্ব অভিযান
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয় পারাবার
নতুন সৃষ্টির উপকূলে
নতুন বিজয় ধ্বজা তুলে।

যদিও এ আবেদনে সাড়া মিলবে বলে মনে হয় না। শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এক দুর্লভ চরিত্রের ও চিত্তের, মননের ও মনীষার সত্যসন্ধ মানবপ্রেমী মানবতার সাধক এবং সুপরিচিত ও জনপ্রিয় লেখক। তাঁর দেখার চোখের, বোঝার মগজের, কারণ আবিষ্কারের সামর্থ্যের এবং চিন্তাশীলতার সাক্ষ্য রয়েছে এ গ্রন্থে। তাঁর কোনো কোনো মন্তব্য তথ্য সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ থাকলেও তা এ মহৎ প্রয়াসের তুলনায় এতো তুচ্ছ যে তার উল্লেখ নিরর্থক বলেই মনে করি। তাছাড়া সর্বজনগ্রাহ্য মত-মন্তব্য সিদ্ধান্ত সবসময়েই ও সব বিষয়েই বিরলতায় দুর্লভ। এক কথায় তত্ত্বের তথ্যের কারণ-কার্যের যথার্থ বিশ্লেষণ সম্বলিত এ বইটি নির্ভরযোগ্য দাঙ্গার ইতিহাস বিষয়ক অনন্য গ্রন্থ। এ বই পাঠে সংকীর্ণ চিত্তের সাম্প্রদায়িক চেতনার পাঠকের মনের ও মতের পরিবর্তনও সম্ভব হবে হয়তো।

দাঙ্গা-লড়াই-যুদ্ধের কারণ

জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-নিবাস-অঞ্চল-শ্রেণী সম্পৃক্ত দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, অবজ্ঞা-পীড়ন, শোষণ-দাঙ্গা-লড়াই-বঞ্চনা প্রভৃতি যে মূলত অর্থসম্পদ ও জীবিকাক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-প্রতিযোগিতার, জিগীষার ও জিঘাংসার উন্মেষ ও বিস্তার ঘটায়, তার প্রমাণ নিঃস্ব, নিরন্ন, দরিদ্র, দুস্থ এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঊনজনেরা জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-অঞ্চল-শ্রেণী পার্থক্য সত্ত্বেও যারা প্রতাপে প্রবলদের জীবিকাক্ষেত্রে অর্থে-বিত্তে-বিদ্যায়- বেসাতে প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বলে তাদের অস্তিত্ব বা দেশে স্থিতি সংখ্যাগুরুদের, ধনী-মানীদের মনের কোণে ঠাঁই পায় না, ওদের প্রতি এদের কোনো ক্ষোভ ক্রোধ হিংসা নেই, তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা থাকে হয়তো। তার প্রমাণ বাঙলাদেশের চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের প্রতি মুসলিমদের কোনো ক্ষেত্রেই কোনো দ্বেষ-দ্বন্দ্ব নেই, যেমন নেই হিন্দু নামে পরিচিত হাড়ি ডোম মুচি মেথর প্রভৃতির প্রতি। ভারতেও পিছিয়ে পড়া উপজাতি, আদিবাসী, জনজাতিদের প্রতি বর্ণহিন্দুরা উদাসীন ও উদার। কেবল পনেরো কোটি অচ্ছুত ও দশ কোটি মুসলিমই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়াচ্ছে বা দাঁড়াবার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই সংখ্যালঘু কিন্তু ধনে-মানে-বিদ্যায় বেসাতে প্রতাপে-ক্ষমতায় প্রবল বর্ণহিন্দুমনের জিগীষা ঘন ঘন জিঘাংসারূপে প্রকট হয়ে ওঠে। তার ফলেই ঘটে দাঙ্গা-লড়াই। স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে চাইলেই যে-কেউ কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণীর মুহূর্তে শত্রু হয়ে যায়। তখন জিগীষাজাত প্রবলের জিঘাংসা জাগে মনে এবং তা হননে-লুণ্ঠনে-দহনে-ধর্ষণে বাস্তবায়িত হয়। যাকে হিসেবে ধরে না, তার সঙ্গে দ্বন্দ্বে নামে না কেউ। তাচ্ছিল্যে মাফ করে দেয়।

অতএব, বোঝা যাচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিযোগী না হলেই শান্তিতে স্বস্তিতে নির্বিরোধে নির্বিবাদে নির্বিঘ্নে সহযোগিতায় সহাবস্থান করা যায়। আগের কালে সাধারণ মানুষ স্বাধিকারসচেতন ছিল না, উচ্চাশী ছিল না। কেননা এদেশের ব্রাহ্মণ শ্রেণী অতি সূক্ষ্ম ও অনন্য অসামান্য বুদ্ধি প্রয়োগে আসমানী দোহাই দিয়ে এক অমোঘ চিরস্থায়ী সামাজিক বন্দোবস্ত করে রেখেছে। ব্রাহ্মণ হচ্ছে মর্ত্যদেবতা এবং শূদ্রসেব্য। দশ বছরের ব্রাহ্মণ বালক শতবর্ষী ক্ষত্রিয়ের প্রণম্য। এ কারণেই নমশূদ্ররা কখনো দ্রোহী হয়নি, সৎশূদ্ররা সহযোগিতা করে অর্থে-বিত্তে-বেসাতে-ক্ষমতায় ঋদ্ধ হয়েছে এবং আজ অবধি সবাই ব্রাহ্মণের অনুগত থেকেছে। একে স্বেচ্ছা অনুরাগ, অনুগামিতা ও আনুগত্য বলে জেনে একালে প্রতীচ্য বিদ্যায় দক্ষ বিদ্বানেরা সনাতন বেদ-গীতা-উপনিষদের মহিমামুগ্ধতায় হৃষ্ট এবং সমাজে বৈচিত্র্যে ঐক্য আবিষ্কারের আনন্দে ও গৌরবে তৃপ্ত ও তুষ্ট।

এখন বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য এবং আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃষ্টি জীবন-জীবিকা পদ্ধতি আমূল বদলে দিয়েছে। শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ এ জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। ফলে শাস্ত্র লঙ্ঘন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী সব শাস্ত্রমনা লোকদের জীবনে। রক্ষণশীলদের চোখে এ বিপর্যয়, যুক্তিবাদী প্রগতিশীলদের কাছে এ বাঞ্ছিত ও প্রয়োজনীয়। তাই আজ পৃথিবীর সর্বত্র প্রাক্তন দাস-বশ-অনুরাগী-অনুগামী অনুগতজনেরা চিরকালের প্রভুজনদের বিরুদ্ধে স্বাধিকার আদায়ের লড়াইয়ে নেমেছে। লড়াই চলছে, প্রভুরা হারবে, আফ্রিকায়, লাতিন আমেরিকায়, এশিয়ায় হারছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এবার এ হার স্বীকার করা হল। লড়াই চলছে, আগুন জ্বলছে, রক্ত ঝরছে, মারছে ও মরছে। এতোকাল 'উত্তম নিশ্চিতে চলে অধমের সাথে। তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।' রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব সত্য ছিল। এখন আর মধ্যম নেই, উত্তমও আর নিশ্চিন্তে অধমের সাথে চলতে পারছে না। কেননা অধম এখন স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে চায়। আপন প্রাপ্য অধিকার চাইছে। তার জন্যে রক্তক্ষরা প্রাণহরা লড়াইয়ে নেমেছে। উত্তম দলনে-দমনে ব্যর্থ হয়ে কোথাও কোথাও অধমকে সমানাধিকার দিতে বাধ্য হচ্ছে। অন্তরে অবজ্ঞা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষোভ-জ্বালা পুষেও বাইরের দেঁতো হাসি যোগে হাত মেলাতে বাধ্য হচ্ছে। অঙ্গে সুন্দর হলেই মানুষ যেমন অন্তরে 'সৎ' হয় না, তেমনি অঙ্গে কালো অবয়বে লাবণ্যহীন হলেই অন্তরে মনুষ্যত্বহীন হয় না। এসব ব্যক্তির অনুশীলন কিংবা অননুশীলনজাত গুণ ও দোষ। আগের কথা আবার স্মরণ করে বলার কথা শেষ করছি। মানুষের বিরোধ-বিবাদ-ঈর্ষা-হিংসা-ঘৃণা-ক্ষোভ-ক্রোধ প্রভৃতির মূলে থাকে সামষ্টিক, সামূহিক ও সামগ্রিকভাবে অর্থসম্পদ সম্পৃক্ত প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতাজাত জিগীষা ও জিঘাংসা। আর ব্যক্তিক জীবনে কাম-প্রেম-লোভ-লাভ-স্বার্থ-ঈর্ষা-হিংসা-ঘৃণা ক্ষোভ-ক্রোধ প্রভৃতি। দাঙ্গা লড়াই যুদ্ধ বাধে এ কারণেই।

রাষ্ট্রীয় স্বার্থে সেক্যুলারিজম আবশ্যিক

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আবিষ্কৃত, তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য আমাদের মর্ত্যজীবনের কাজেই লাগে। আমাদের পারত্রিক জীবনের প্রয়োজন মেটায় না। তেমনি চিকিৎসাবিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য আমাদের রোগ ও রোগের লক্ষণ নিরূপণের এবং প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কারের সহায়ক হয়। আমাদের রোগের নিবারক ও প্রতিরোধক হিসেবেই আমাদের জাগতিক জীবনে নিত্যদিনের ব্যক্তিক পারিবারিক জীবনে নিরাময়তার ও নিরাপত্তার সহায় আয়ুর্বিজ্ঞান। তেমনি বনজ খনিজ কৃষিজ উৎপাদিত ও নির্মিত যে-কোনো সামগ্রী আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটায় মাত্র। পারলৌকিক কোনো কাজে লাগে না। তেমনি জলযান, বায়ুযান প্রভৃতির সঙ্গেও মানুষের শাস্ত্রিক জীবনের কোনো সম্পর্ক-সম্বন্ধ নেই। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, আমাদের হাটে-বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ও আমাদের নিতান্ত জৈব-পার্থিব জীবনেরই চাহিদা পূরণের কাজেই লাগে। আমাদের শাসন-প্রশাসন প্রভৃতিও সামাজিক মানুষের জীবনের, জীবিকার, চলাফেরার নিরাপত্তা-নিরুপদ্রবতার নিশ্চিতির ব্যবস্থা মাত্র। মানুষ, মগজ খরচ করে না বলে তথা মগজ খাটিয়ে বিচার-বিবেচনা, যাচাই বাছাই-ঝাড়াই করে না বলেই প্রাজন্মক্রমিক শ্রুত, লব্ধ ও আরোপিত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা নিয়ে গতানুগতিক নীতিনিয়মে, রীতিরেওয়াজে ও প্রথাপদ্ধতিতে অভ্যস্ত জীবনই যাপন করে। অথচ বিজ্ঞানের প্রসাদে যন্ত্র-প্রকৌশল-প্রযুক্তি বিস্ময়করভাবে বিচিত্র হয়ে উৎকর্ষ লাভ করছে প্রায় প্রতিদিনই পৃথিবীর উন্নত ও ধনীদেশগুলোতে, মানুষই মন-মগজ-মনন-মনীষা প্রয়োগে নব-উদ্ভাবনে ও আবিষ্কারে আর সৃষ্টিতে ও নির্মাণে যন্ত্র-প্রকৌশল-প্রযুক্তি বিচিত্র ও অধিকতর কেজো করে তুলছে।

কাজেই আমাদের নির্বিশেষ নাগরিকের জাগতিক জীবনের পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক, অভিভাবক ও নিয়ন্তা সরকারের বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়েছে আজকের বিজ্ঞান ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সম্বন্ধ, সংযোগ ও নির্ভরশীলতা সাপেক্ষ জীবনে-জীবিকায় উৎকর্ষ সাধনের জন্যে মর্ত্যজীবন সচেতন হওয়া, পারত্রিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের কল্যাণ চিন্তক হওয়া নয়। বিশেষ করে আজকের দিনে সংহত পৃথিবীর কোনো দেশ বা রাষ্ট্রই কেবল স্বজাতি-স্বধর্মী-স্বভাষী নিয়েই চলতে পারে না, নানা প্রয়োজনে বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষীকেও নাগরিক হিসেবে গ্রহণ-বরণ করতে বাধ্য হচ্ছে। এ অবস্থায় আমাদের রাষ্ট্রের সংবিধান সেক্যুলার হওয়া আবশ্যিক ও জরুরি বলেই বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। জাগতিক জীবন নিয়েই যখন সরকারের ও রাষ্ট্রের সব কাজ-কারবার আন্তর্জাতিক সহযোগিতা-প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পৃক্ত, তখন আমরা যত সেক্যুলার হব বৈষয়িক, বাণিজ্যিক ও ব্যবহারিক জীবনে, আমরা সে-হারেই বা সে-মাত্রায়ই হব সমকালীন জগতের ও রাষ্ট্রের যোগ্য সদস্য।

সচেতন হয়ে দেখলে ও ভাবলে আমরা বুঝতে পারব যে আজকের বিজ্ঞানের ও বাণিজ্যের এবং আন্তর্জাতিক ঘনিষ্ঠতার এ কালে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের ও মতবাদের মানুষই তার শাস্ত্র অনিচ্ছায় লঙ্ঘন করতে বাধ্য হচ্ছে। ভিন্ন দেশের, ভিন্ন মতের, ভিন্ন সংস্কৃতির ও খাদ্যের আর পোশাকের মানুষের সঙ্গে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে, থাকতে হচ্ছে, তারই রান্না করা খাদ্য গ্রহণ করতে হচ্ছে, তারই নিয়ম-রীতি মেনে চলতে হচ্ছে। কাজেই আজকের মানুষের পক্ষে স্ব স্ব শাস্ত্রের অনুগ বিধি-নিষেধ অনিচ্ছায় লঙ্ঘন বা উপেক্ষা না করে আন্তর্জাতিক কাজে-কর্মে অংশ গ্রহণের জন্যে বিদেশে বিভাষীর, বিধর্মীর ও বিজাতির সহযোগী হওয়া একরকম অসম্ভব। এ অবস্থায় সেক্যুলার হয়ে তথা জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-যোগ্যতার পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য উপেক্ষা করে বাস্তবকে মেনে চলাই শ্রেয়স বলে মনে করি।

আমাদের বাস্তব জীবনযাত্রার, জীবনচেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য এবং আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ঘরে বাইরে সব কিছুই তো এখন য়ুরোপীয় আদর্শের ও অবদানের চিহ্ন বহন করছে। আমাদের নিজেদের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় আবাস-তৈজস থেকে শুরু করে পরিচ্ছদ অবধি এমনকি অনেক অনেক খাদ্য সামগ্রীও য়ুরোপেরই দান। আমাদের দাঁতের মাজন, গায়ের সাবান, চুলের তেল, রোগের ঔষধও তো য়ুরোপের দান।

তা ছাড়া শাস্ত্রিক, জাতিক, ভাষিক স্বাতন্ত্র্য চেতনা ও দ্বেষণা নাগরিকের মধ্যে জিইয়ে রাখলে একক জাতিসত্তা ও রাষ্ট্রিক জীবনে সংহতি গড়ে ওঠে না। বিচ্ছিন্নতার, স্বাতন্ত্র্যের ও দ্বেষণার দরুন ঐক্যবদ্ধভাবে রাষ্ট্রিক বিপদকালে কাজ করানো সম্ভব হয় না। অন্য সময়েও সংহতির অভাবে অনাত্মীয়ভাবের প্রাবল্যে জাতির আর্থ-বাণিজ্যিক উন্নতি ব্যাহত হয় সহযোগিতার এবং বহুজনহিত ও বহুজনসুখ চিন্তার অভাবে। এমনি রাষ্ট্রে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাসভেদ মানুষকে স্বার্থপর রাখে, পরার্থপর করে না। দেশের, রাষ্ট্রের ও মানুষের সামূহিক, সামগ্রিক ও সামষ্টিক কল্যাণ কর্মে কারো আগ্রহ থাকে না। এ জন্যেই সরকার ও রাষ্ট্র মাত্রেরই এ কালে সেক্যুলার পন্থী হওয়া দরকার অন্তরে, অঙ্গে এবং কর্মে-আচরণে। এ হচ্ছে কালের দাবি। গণমানবের স্বার্থে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-রুচিমান সংযত সহিষ্ণু সজ্জন বিবেকী মানুষেরও এ-ই মনের ও মর্মের বাণী। সেক্যুলারিজমকে বাঙলায় নির্বিশেষ নাগরিক রাষ্ট্রবাদ নামে অভিহিত করা যায়। অর্থাৎ মর্ত্যজীবনের অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক, পরিচালক ও চাহিদাপূরক রাষ্ট্রের নাম হবে মর্ত্যজীবনবাদী রাষ্ট্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-ও উল্লেখ্য যে, আমাদের ১৯৭২ সনের সংবিধানও উদার মানবিক এবং বিভিন্ন শাস্ত্রের ও সংস্কৃতির অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত মানুষের মধ্যেকার স্বাতন্ত্র্যচেতনা যাতে জাতীয়তাবোধের ও রাষ্ট্রিক জাতিগঠনের পক্ষে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সে-লক্ষ্যেই বিশুদ্ধ সেক্যুলার করে তৈরি করা হয়েছিল। এখনো ১৯৭২ সনের সংবিধানকেই আমরা আদর্শ সংবিধান বলে মনে করি, পুঁজিবাদে তথা বাজার অর্থনীতিতে গুরুত্ব দিতে হলে সামান্য সংশোধনে সেক্যুলার রূপ বজায় রেখে তা চালু করা এখনো পরম কল্যাণকর বলেই বাঞ্ছনীয়।

নাগরিক নির্বিশেষকে কেবল 'মানুষ' রূপে গ্রহণ করলেই সরকার হবে নিরপেক্ষ, জনগণ পাবে সুবিচার, রাষ্ট্র হবে আধুনিকতম ধারণার ও প্রত্যাশার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আদিবাসী-উপজাতি-জনজাতিদের তাদের স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ করার দিন সমাগত। হাজার হাজার বছর ধরে ওরা শোষিত ও বঞ্চিত এবং মানুষ বলে প্রায় অস্বীকৃত। এখন সাঁওতাল, গারো, মুণ্ডা, ওঁরাও, মাহালে, মালো, ত্রিপুর, চাকমা, মার্মা, কুকি প্রভৃতি সবাইকে বাঙলাদেশে রাষ্ট্রের সমান অধিকারপ্রাপ্ত নাগরিকরূপে গ্রহণ ও বরণ করার জন্যেও সেক্যুলার নীতি প্রয়োজন। এ কেবল ওদের নয়, মনুষ্যত্বের ও মানবতার বিবেকী দাবিও।

AMARBOI.COM

আমাদের রাষ্ট্রিক জীবনে যা প্রয়োজন

বিজ্ঞানের আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃষ্টি নির্ভর জীবন যাপন করব, কিন্তু বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্যকে অস্বীকার করব, বিজ্ঞানমনস্ক হব না, বিজ্ঞানের তথ্যে আস্থা রাখব না, তা হয় না একালে। তেমনি সংহত পৃথিবীতে 'বাজার অর্থনীতি' চালু করব, কিন্তু বাণিজ্যে অবহেলা করব, তা আত্মহননেরই হবে নামান্তর। অতএব, একাল হচ্ছে বিজ্ঞানের ও বাণিজ্যের যুগ। প্রাণী হিসেবে আমাদের দেহ-প্রাণ এ দুটোর উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তবে আমরা 'মানুষ' হতে ও থাকতে চাই। সেজন্যে মানবিকগুণের উন্মেষের, বিকাশের ও উৎকর্ষের জন্যে আমাদের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান এবং চারু-কারু প্রভৃতি সর্বপ্রকার কলার ও ললিত কলার চর্চাও অবশ্যই আবশ্যিক বলে উপলব্ধি করতে হবে।

এ জন্যেই আমাদের ধারণায় এককালে যাকে বলা হতো মিশ্রকলা [Mixed Art] পাঠ্যসূচিতে তা নতুন করে চালু করতে হবে। বিজ্ঞানের ছাত্রেরও অবশ্য পাঠ্য হবে উপর্যুক্ত যে-কোনো বিষয় আর কলা, সামাজিকবিজ্ঞান-বাণিজ্য-প্রকৌশল, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতির শিক্ষার্থীদের অবশ্য পাঠ্য থাকবে জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতির বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে কিছু বুনিয়াদী বিষয়।

তা হলেই এ কালের উপযুক্ত নাগরিক সমাজ গড়ে উঠবে। এখন যেমন সমকালে জীবিত থেকেও আমাদের ঘরের লোক, প্রতিবেশী, সহকর্মী প্রভৃতি প্রাত্যহিক জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহযোগীদের কেউ কেউ আধুনিক যৌক্তিক-বৌদ্ধিক ও জীবনচেতনারিক্ত থাকার দরুন ইহুদী হিসেবে সাড়ে তিন হাজার, ব্রাহ্মণ্যবাদী হিসেবে তিন হাজার, জৈন-বৌদ্ধ-জরথুস্ত্রীয় হিসেবে আড়াই হাজার, খ্রীস্টান হিসেবে দু'হাজার এবং অন্যরা দেড়, এক, পাঁচশ বছর আগেকার জগতে মানুষ বিচরণ করে থাকে। তাদের দেহ-প্রাণ একালের, কিন্তু মন-মনন-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আচার-আচরণ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সত্য-তথ্য বিরল সেকালের। ফলে পৃথিবীর যে-কোনো রাষ্ট্রেই সমকালীন চেতনা-চিন্তা সাধারণভাবে রাষ্ট্রবাসীর মধ্যে দুর্লক্ষ্য। সমকালীন প্রাগ্রসর প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা ক্বচিৎ কারুর মধ্যে মেলে।

চেতনায়-চিন্তায় সমকালীন জীবন ও জগৎ গুরুত্ব না পেলে, আধুনিকতম জ্ঞান-বিজ্ঞান-মনীষার প্রতি অনুরাগে, অনুগামিতায় ও আনুগত্যে অনীহ থাকলে আমরা কেবল যে মানবিকগুণে হীন থাকব তা নয়, আমরা যে শোষণ-পীড়ন ও অবজ্ঞা-অবিচারমুক্ত মানব-সমাজ গড়ে তুলতে চাই, জীবনে ও সম্পদে মানুষের যে জন্মগত অধিকারে এবং খেয়ে পরে বেঁচে থাকার ন্যায্য অধিকারে আর সংযমে, পরমত-কর্ম-আচরণ সহিষ্ণুতায়-সৌজন্যে সহায়তায়, শ্রম ও পণ্য বিনিময়ে সামবায়িক সহযোগিতায় শান্তিতে স্বস্তিতে নির্বিরোধে-নির্বিবাদে, নির্বিঘ্নে নিরুপদ্রবে নিরাপদে স্বাধিকারের সীমায় প্রতিবেশীর সঙ্গে যে সহাবস্থান করতে চাই, তা কখনো বাস্তবে সম্ভব হবে না। কেননা আমরা প্রাণীর মানবপ্রজাতি হিসেবে তা স্বাভাবিক ও সম্ভব করে তুলতে পারব না। তার জন্যে আমাদের মানবিকগুণের বিস্তার ও উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। তাকে বাড়িয়ে তুলতে হবে মানে-মাপে-মাত্রায়।

AMARBOI.COM

এখন মার্কসবাদ, লেনিনবাদ কিংবা মাওচিন্তাধারা আর তত্ত্ব বা আদর্শ নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার আবশ্যিক সংগ্রামের তত্ত্ব ও পন্থা মাত্র। কাজেই এ হচ্ছে এখন মা-বাবার বোঝা, সমাজের দায়, হতাশার শিকার ক্ষুধার্ত বেকার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের যাত্রী তরুণ-তরুণীর সমাজে বাঁচার দিশা দান– এদের মধ্যে রয়েছে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত এবং সব বর্ণের, বর্গের, বৃত্তির নিঃস্ব দুস্থ দরিদ্র জনগণ। এদের নেতৃত্ব দিয়ে, দীক্ষা দিয়ে, প্রাণিত করে আশা ও আশ্বাস দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ করার দায়িত্ব হচ্ছে দেশপ্রেমী মানবসেবী রাজনীতি সচেতন উদ্যমশীল, উদ্যোগী মানববাদীদের। এ হচ্ছে আজকের এ মুহূর্তে যথাকালে, যথাপ্রয়োজনে যথাপাত্রদের বাঁচার সংগ্রাম অস্তিত্ব রক্ষার জরুরি গরজে।

রান্নার জন্যে যেমন চাল-ডাল-তরকারী-নুন-মসল্লা-ইন্ধন-হাঁড়ি-উনন-আগুন সব একই স্থানে ও সময়ে যুগপৎ প্রয়োজন, তেমনি জাতির ব্যবহারিক ও মানসিক জীবনের চাহিদাও একই সময়ে পূরণ করতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিকে পীড়ন-শোষণ-বঞ্চনামুক্ত রাখার অঙ্গীকারে ও আশ্বাসে সরকার একটা আপোস রফা করে বহুদিনের একটা দুষ্টক্ষতের সুচিকিৎসা করলেন বলে বর্তমান সরকার জনগণের কৃতজ্ঞতার দাবিদার হবেন, যদি অঙ্গীকার রক্ষা করে চলেন, মুসলিম অভিবাসন চিরকালের জন্যে বন্ধ রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সেখানে অধিজন হিসেবে পূর্বের মতো নিশ্চিন্তে তাদের স্ব স্ব আচার পার্বণ-ধর্ম-সংস্কৃতি এবং বিত্ত-বেসাত-অর্থ-সম্পদ নির্বিঘ্ন-নিরুপদ্রব ও নিরাপদ রাখেন। এবং ঠিক বাস্তবিক এভাবেই গোটা বাঙলাদেশে বৌদ্ধ-হিন্দু-খ্রীস্টান-গারো-সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়-উপজাতি-আদিবাসীদেরও জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে যথাপ্রাপ্য অধিকারে ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করে ও রেখে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবাস-যোগ্যতা নির্বিশেষে বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের 'মানুষ' ও 'নাগরিক' হিসেবে সমান নাগরিক মর্যাদায়-অধিকারে-গৌরবে-গর্বে চলার, বলার, করার অধিকার যদি সুনিশ্চিত করা হয়, তা হলে অকৃত্রিম একক অবিচ্ছেদ্য রাষ্ট্রিক জাতীয়তা সহজেই গড়ে উঠবে। তখন আমরা সমতলের লোকেরা জাত-জন্ম-ধর্ম-নিবাস-পোশাক- যোগ্যতা নির্বিশেষে যেমন থাকব সত্তায় ও আত্মায় তথা চেতনায় একাধারে ও যুগপৎ অকৃত্রিম বাঙালী, তেমনি অরণ্য-পর্বত ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের চাকমা, ত্রিপুর, মার্মা, গারো, সাঁওতাল-মণিপুরী প্রভৃতিও অভিন্ন-অবিচ্ছেদ্য বাঙলাদেশ রাষ্ট্রবাসী হিসেবে বাঙলাদেশী রাষ্ট্রিক জাতিভুক্ত থেকে দেশপ্রেমী এবং মানবসেবী হয়ে উঠবে। আমরা একটা সেক্যুলার রাষ্ট্রিক বা দৈশিক জাতি হিসেবে– জাতীয়তাবাদী হিসেবে অকৃত্রিম অনুভবে ও গাঢ়-গভীর উপলব্ধিতে যতদিন গড়ে না উঠব, ততদিন আমাদের উন্নতি হবে না বিদ্যায়-বিত্তে-বেসাতে-অর্থে-সম্পদে-সাহিত্যে-শিল্পে-সংস্কৃতিতে, এককথায় মনুষ্যত্বে। দেহে-প্রাণে-মনে-মননে আমরা একজাত 'মানুষ', প্রাণিজগতে মানবপ্রজাতি– এ বোধই হচ্ছে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব বা মানবিকতা। আজ এবোধের উন্মেষ বিস্তার প্রয়োজন।

AMARBOI.COM

মাতৃভূমিপ্রীতি ও জাতীয় সঙ্গীত

আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম জন্মভূমিকে মাতৃভূমি এবং মুখের ভাষাকে তথা স্বদেশী ভাষাকে মাতৃভাষা অভিধায় অভিহিত করে আমাদের মনোজগতে যুগান্তর ঘটান এবং বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম মাতৃভূমির একটা বাকপ্রতিমা সৃষ্টি করেন এবং তাকে মাতৃমূর্তিরূপে, দেশমাতৃকারূপে শিক্ষিত আমজনতার মানসে জীবন্ত ও বাস্তব করে তোলেন। উল্লেখ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দেমাতরম' সংস্কৃত-বাঙলা মিশ্র ভাষায় তাঁর উপলব্ধ দেশমাতৃকার বন্দনাগীতি রূপেই রচনা করেন আকস্মিক কিন্তু গাঢ়-গভীর আবেগবশে এবং অপ্রকাশিত অবস্থায় তার দেরাজে ফেলে রাখেন। কবি নবীন চন্দ্র সেন মিশ্র ভাষা প্রয়োগ পছন্দ করেননি, বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর মত ও মন্তব্য জানানো সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র নবীন সেনের মতে-মন্তব্যে কোনো গুরুত্ব দেননি। তার কারণ সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি-মাতৃভূমির পরিসর-পরিধি তখনো সীমিত ছিল মুঘলের সুবাহ্-ই-বাঙ্গালার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মধ্যেই। কেননা তাঁর বাল্যে-কৈশোরে ব্রিটিশ ভারত বিস্তৃত ছিল না। বাল্যে-কৈশোরে শ্রুত-লব্ধ-প্রাপ্ত ধারণা অনুযায়ী তিনি বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যাকেই মাতৃভূমি বলে জানতেন। ১৮৭১ সালের আদমশুমারি অনুসারে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস নির্বিশেষে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির লোকসংখ্যা ছিল সাত কোটি। বন্দেমাতরমে এ সাত কোটিকেই স্বজাতি ও দেশমাতৃকার সন্তানরূপে গ্রহণ করেছিলেন। বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার ভাষায় পার্থক্য রয়েছে জেনেবুঝেই 'বন্দেমাতরম' এ মাতৃবন্দনাগীতি সর্বজন বোধ্য ও গ্রাহ্য করার জন্যেই বাঙালি রচক একে সংস্কৃত-বাঙলা মিশ্রভাষায় বাকরূপ দিয়েছেন। 'মন্দেমাতরম'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সন্তানদের প্রেরণার, প্রণোদনার ও সংগ্রামে প্রবর্তনা দানের উৎসরূপে জাতীয় জীবনে অশেষ গুরুত্ব পায়– যা এ মুহূর্ত অবধি ভারতে অম্লান-অটুটভাবে রক্ষিত। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশমাতৃকা মাটি, মানুষ ও প্রকৃতি প্রতীক।

'বন্দেমাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্,
শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদলশোভিনীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটি কণ্ঠ-কল্ল-কল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃত খরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবল ধারিনীং নমামি তারিনীং
রিপুদল বারিনীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী
কমলা কমলদল বিহারিণী
বাণীবিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।

এর পরে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিকল্পিত বঙ্গমাতা বা দেশজননী হলেন স্বরূপে কালীদেবতা। বাঙলাদেশের হৃদয় থেকে তাঁর আবির্ভাব ঘটে এবং তাঁর স্থিতিও সোনার মন্দিরে কিন্তু তাঁর এক হাতে খড়্গ, অন্যহাতে শঙ্কাহরণ বরাভয়– তিনি রণরঙ্গিনী, শত্রুবিনাশিনী। তাঁর মেঘবর্ণ মুক্তকেশে লুকিয়ে আছে অশনি।

আজি বাঙলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।
ওগো মা, তোমার কি মূরতি আজি দেখিরে। ... ...
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি
তোমার আঁচল ঝলে আকাশ তলে রৌদ্রবসনী। ... ...
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ওই চরণের দীপ্তিরাশি। ... ...

আর নজরুল ইসলামের রক্তাম্বরধারিণী মা হচ্ছেন দানবদলনী রক্তক্ষরা প্রাণহরা ভীমা মত্তমাতঙ্গিণী স্বরূপা মা কালীই।

রক্তাম্বর পর মা এবার
জ্বলে পুড়ে যাক শ্বেতবসন;
দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন
বাজে তরবারি ঝনন্ ঝন্
সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেল মাগো
জ্বাল সেখা জ্বাল কাল-চিতা
তোমার খড়্গ-রক্ত হউক
স্রষ্টার বুকে লাল-ফিতা
এলোকেশে তব দুলুক ঝঞ্ঝা
কালবৈশাখী ভীম তুফান-
চরণ-আঘাতে উদ্গারে যেন
আহত বিশ্ব রক্তবান।
নিঃশ্বাসে তব পেঁজা-তুলো সম
উড়ে যাক মাগো এই ভুবন,
অসুর নাশিতে হউক বিষ্ণু-
চক্র মা তোর হেম কাঁকন।
টুটি টিপে মারো অত্যাচারে মা,
গল-হার হোক নীল ফাঁসি,
নয়নে তোমার ধূমকেতু জ্বালা
উঠুক সরোষে উদ্ভাসি। ... ...
দেখা মা আবার দনুজদলনী
অশিব-নাশিনী চণ্ডীরূপ। ... ...
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।

AMARBOI.COM

তিনজনই দেশমাতৃকার বাক্প্রতিমা তৈরি করেছেন স্বদেশচেতনা, দেশপ্রেম ও সংগ্রামী প্রেরণা দান লক্ষ্যেই। সঙ্গত কারণেই তিনজনের প্রতিমা বাহ্যত তিনরূপ পেলেও অন্তরে তিনটি মূর্তিই অভিন্ন। কেননা শক্তিস্বরূপা দুর্গা-কালী-চণ্ডীই তাঁদের দেশজননী। ব্রাহ্মণ্যবাদী, ব্রহ্মবাদী এবং একেশ্বরবাদী তিন কবিই পরাধীন জাতির দেশমাতৃকাকে রক্তক্ষরা প্রাণহরা এবং শত্রুরূপ দানবদলিনীরূপে অঙ্কিত করেছেন। মাতৃভূমিচেতনা গৌত্রিক গৌরব-গর্বচেতনা ক্রমে বিলুপ্ত করে জাতি চেতনা জাগিয়েছে। গৌত্রিক-গৌরব গাথার স্থান দখল করল জাতীয় গৌরবগাথা, জাতীয় সঙ্গীত। তা একালে হল রাষ্ট্রসঙ্গীত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালান্তরে দেশজননীর এ ভীমা মূর্তি বদলে গেছে কবিদের চোখে। দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের 'বঙ্গ আমার জননী আমার' কিংবা 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা', দেশপ্রেমের স্মরণীয় কবিতা। জীবনানন্দ দাশ বলেছেন, 'বাংলার রূপ আমি দেখিয়াছি।' সে রূপ সৌন্দর্যস্বরূপার। তাই যার খুশি যে যেখানে যেতে চায় যাক, এ কবি বাঙলার মাটি-মানুষ-নিসর্গকে ভালোবেসেই তুষ্ট, তৃপ্ত ও হৃষ্ট। বাঙলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ের কয়েকটি গানও জনগণকে সংগ্রামী প্রেরণা দিত 'একটি ফুলের জন্যে মোরা যুদ্ধ করি' কিংবা 'সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা/সোনার চেয়ে খাঁটি আমার দেশের মাটি।' অথবা 'রক্তেই যদি ফোটে জীবনের ফুল, ফুটুক না।' জিয়াউর রহমানের জঙ্গী শাসনামলে একটা গান চালু হয়েছিল 'আমার জীবন বাঙলাদেশ, আমার মরণ বাঙলাদেশ।'

প্রাচীনকালে মানুষের মধ্যে জাতীয় চেতনা গোত্র-গোষ্ঠীবন্ধন চেতনা এবং গোত্র বা গোষ্ঠীপতির প্রতি আনুগত্য চেতনারূপেই ছিল প্রবল। যাযাবর জীবনে, ফল-মূল-মৃগয়া নির্ভর জীবনে এ-ই ছিল স্বাভাবিক ও আবশ্যিক। তখন তাদের কোনো স্থায়ী নিবাস ছিল না, কাজেই জন্মভূমি ও মাতৃভূমি চেতনা উন্মেষের কারণ ছিল না। পরে রাজতন্ত্রেও দাস-ক্রীতদাস-ভূমিদাস প্রথাভিত্তিক সমাজে মালিক-মনিবের দৃষ্টিতে ও আচরণে দাস-ক্রীতদাস-ভূমিদাস ছিল গৃহপোষ্য প্রাণী মাত্র। কাজেই তাদের মনে আধুনিক তাৎপর্যে স্বদেশ-স্বজাতি চেতনা জাগতে পারেনি। প্রভু-ভৃত্য, দাস-প্রভু, মালিক-মজুর, মনিব-বান্দা সম্পর্কের সমাজে আমজনতার কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না মাটির ও মানুষের প্রতি। ধর্মশাস্ত্রের বন্ধনে গোত্রচেতনার ওপর বৃহত্তর সম্প্রদায় ও সংহতি চেতনা বৃদ্ধির ফলেই স্বদেশ-স্বজাতি চেতনার উন্মেষ-বিকাশ ঘটে। অতএব, শাহ্-সামন্ততন্ত্রের অবসানে, রাজার রাজ্যে রাজার অপ্রতিহত একান্ত অধিকার অস্বীকৃত হওয়ার উষাকালে, প্রজার মনে ব্যক্তিসত্তার বা মনুষ্যসত্তার মূল্য, মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য চেতনা সম্বন্ধে সচেতনতা উন্মেষের ফলে, সামন্তযুগের ক্রান্তিকালে আমজনতার অধিকারবোধ উন্মেষিত হওয়ার পরিণামেই 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মাতৃভূমির মাতৃভাষার স্বাজাত্যের গুরুত্বচেতনা প্রবল হতে থাকে। কাজেই একালে 'জাতীয় সঙ্গীত' প্রতি রাষ্ট্রেরই আবশ্যিক গণবন্দন সূত্র। এখন স্বজাতি, স্বদেশ, স্বরাষ্ট্র প্রীতি ও তার প্রতি দায়বদ্ধতা জাতীয় সঙ্গীতেই সংহত ও সর্বজনমান্য রূপ পেয়েছে। স্বদেশপ্রেমমূলক অন্য কবিতা, গান এখন আনুষঙ্গিক– কখনো প্রধান গুরুত্বের নয়। যদিও দলগত স্বার্থে নতুন নতুন গান-কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নাটক রচিত হতেই থাকে।

কিন্তু 'জাতীয় সঙ্গীত' একালে আগের তেজ ও দীপ্তি এবং প্রেরণা ও মর্মস্পর্শিতা হারিয়েছে। কেননা এখন রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-সংস্কৃতি প্রভৃতির গৌত্রিক, গৌষ্ঠীক, ভাষিক, শাস্ত্রিক, শ্রেণীক, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতা চেতনা নতুন তাৎপর্যে জেগে উঠেছে পৃথিবীর সর্বত্র। যানে-বাহনে, তারে-বেতারে, যন্ত্রে-প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে গোটা দুনিয়ার মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবনচেতনা তথা মন-মগজ-মনন-মনীষা প্রায় অভিন্ন খাতে বহমান হয়ে উঠছে যখন, তখনই এ স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতা বুদ্ধি উন্মেষিত হচ্ছে গৌত্রিক, গৌষ্ঠীক, শাস্ত্রিক, ভাষিক, শ্রেণীক, আঞ্চলিক সত্তার মূল্যে-মর্যাদায় ও স্বাতন্ত্র্যে গুরুত্বদান প্রবণতা থেকে। যেমন ব্রিটিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতীয় সঙ্গীত বা জাতীয় পতাকা এখন উত্তর আয়ারল্যান্ডের ক্যাথলিকদের অন্তরে উদ্দীপনা জাগায় না যেমন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকা কাশ্মীরের মুসলিমদের, পাঞ্জাবের শিখদের কিংবা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মঙ্গোলগোষ্ঠীর রাজ্য সাতটির জনমনে কোনো অনুরাগ জাগায় না। যেমন কুইবেকবাসীরা কানাডার জাতীয় সঙ্গীতের ও জাতীয় পতাকার এখন অনুরাগী নয়।

এখন সবাই স্বতন্ত্রসত্তা অঙ্গীকার ও স্বীকার করে সম ও সহস্বার্থে, সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সামবায়িক সহযোগিতায় ও প্রয়োজনীয় পণ্যবিনিময়ে একই ফেডারেসিতে বা কনফেডারেসিতে সহাবস্থানে সম্মত। সমক্ষমতায় ও সমমর্যাদায় দেবে আর নেবে, মেলাবে ও মিলবে। কাজেই পিতৃভূমিচেতনা, মাতৃভূমিপ্রীতি, মাতৃভাষালগ্নতাও আজ আর স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধি ও বিচ্ছিন্নতাবোধ সুপ্ত ও গুপ্ত রাখতে পারছে না। লুপ্ত করা হয়তো এক সময়ে নাস্তিক্যে নিরীশ্বরতায় সম্ভব হবে। স্টিফেন উইনস্টন হকিং প্রমুখ বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত বিশ্বতত্ত্ব নিঃসংশয়পূর্ণ প্রমাণে সর্বস্তরের লোকের আস্থা যখন অর্জন করবে, তখন মানুষের অনেক সংকীর্ণ চিন্তা-চেতনা-অভিমান-উত্তম্মন্যতা-হীনম্মন্যতা যাবে টুটে। 'মানুষ'কে প্রাণীরই এক অবিশেষ প্রজাতি বলে গ্রহণ করার মতো উদারতা তখন পরিবেষ্টনীগত কারণে সহজেই আয়ত্তে আসবে। তবে তা এখনো সুদূরে-স্বপ্নের ও সাধের জগতের কাল্পনিক তত্ত্ব।

তাছাড়া রাষ্ট্রিক, গৌত্রিক, ভাষিক, শাস্ত্রিক, বার্ণিক, নৈবাসিক ও সাংস্কৃতিক জাতি বা শ্রেণী চেতনা, এক কথায় রাষ্ট্রিক বা শাস্ত্রিক, ভাষিক, বর্ণিক, নৈবাসিক ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তা আন্তর্জাতিক ও বৈশ্বিক ঐক্যচেতনারও পরিপন্থী। এ কাল বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক মিলন ময়দান তৈরির কাল, বাঁচার ও বাঁচাবার গরজেই সহযোগিতার, সহায়তার ও মৈত্রীর মন, মনন ও হাত প্রসারিত করতে হবে। সহাবস্থান-প্রতীকরূপে হাতে হাত মেলাতেই হবে। আজকের আর্থবাণিজ্যিক রাজনীতি-কূটনীতি এ পথেই হচ্ছে চালিত।

AMARBOI.COM

গুণের মানুষ চাই

আমাদের সমাজে 'বড়লোক' বলতে ইংরেজি গ্রেটম্যান বোঝায় না। সাধারণভাবে ধনী লোককেই বলে 'বড়লোক'। তবে গুণে-মানে-খ্যাতিতে-ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদেরও বিশেষ বিশেষ কারণে এ সময়ে বড়লোক বলা হয়। ব্যক্তির মানসিক, হার্দিক ও চারিত্রিক অভিব্যক্তিতে যদি কোনো আকর্ষণীয় সংবেদী গুণ না থাকে, তাহলে পদ-পদবীজাত মর্যাদা, বাহুবলে-ধনবলে-জনবলে লব্ধ মান, খ্যাতি ও ক্ষমতা ব্যক্তিকে জনগণের কাছে তথা পরিচিত আমজনতার কাছে শ্রদ্ধেয় করে তোলে না। পদের-পদবীর-ধনের ও ক্ষমতার আসন কোনো ব্যক্তিকে কৃত্রিম বা ছদ্ম মর্যাদার অধিকারী করে বটে, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অকৃত্রিম আন্তরিক অনুরাগের পাত্র করে না। এক্ষেত্রে রাজা-বাদশাহ থেকে গাঁয়ের-গঞ্জের-পাড়ার-মহল্লার সর্দার, মাতব্বর অবধি সবারই পরিণাম অভিন্ন। ফ্রান্সের সম্রাট ষোড়শতম লুই থেকে রাশিয়ার জার নিকোলাস একই রূপ পরিণাম ভোগ করেন। ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষের হাতে লাঞ্ছিত ও নিহত হন সপরিবার।

মানলোভী ব্যক্তি যদি পরার্থপর না হন, লাভ-লোভ-স্বার্থবশে পঞ্চায়েত সদস্য, সাংসদ, পার্ষদ, মন্ত্রী হন, তাহলে তাঁর পদ-পদবী হারানোর পরে তিনি উপেক্ষিত ও নিন্দিত হন, তাচ্ছিল্যও জোটে তাঁর। আদর-কদর-মান মেলে না কারুর কাছে, কেননা কাউকে উপকারে কৃতজ্ঞ করেননি তিনি যখন উপবিষ্ট ছিলেন ক্ষমতার গদিতে। মানী লোকদের পদচ্যুতির সঙ্গে মানও উবে যায়, তাঁর প্রতি অন্যদের উপেক্ষা-ঔদাসীন্য তাঁকে অন্তরে বিদ্ধ করে। মানুষকে ভালো না বাসলে মানুষের উপচিকীর্ষা মনে জাগেই না। এ জন্যেই প্রাক্তন মন্ত্রী, সাংসদ, সদস্য, পার্ষদ, বড়চাকুরে কেউ সমাজে স্মরণীয়, সম্মানীয়, শ্রদ্ধেয় হয়ে নন্দিত জীবন যাপন করতে পারেন না, পরোপকারী সৎ সুজন না হলে। আত্মম্ভরী ধনীরাও ধনচ্যুত হলে অন্যের অবহেলা-অবজ্ঞাই পেয়ে থাকেন। কিন্তু অন্যদিকে গুণী লোক নিরক্ষর দরিদ্র হলেও শ্রদ্ধেয়, স্মরণীয়, বরণীয় ও মাননীয় হয়ে নন্দিত জীবনই যাপন করেন। এক্ষেত্রে আমরা লালন সাঁই কিংবা আরজ আলী মাতুব্বরের নাম স্মরণ করতে পারি। নানা জনের লিখিত স্মৃতিকথায় মেলে সাধারণ কিন্তু পরিচিত মহলের শ্রদ্ধেয় চরিত্রের আদর্শের, যোগ্যতার, দক্ষতার, সততার, পরার্থপরতার, হিতৈষণার মানুষের বয়ান। তাঁর জীবনই ধন্য, যাঁর মৃত্যুতে পরিচিত লোক বলে, 'আহা লোকটা বড় ভালো ছিল'। দুনিয়াতে সব মানুষ অনন্য, অসামান্য হয় না। কিন্তু তার একটা ক্ষুদ্র সমাজ আছে, সে সমাজে তার তারিফ থাকলেই সে ধন্য।

আমাদের দেশে এখন শিক্ষিতের সংখ্যা অগণ্য। গাঁয়ে-গঞ্জে-নগরে-বন্দরে-পাড়ায়-মহল্লায়-হাটে-ঘাটে সর্বত্র এরা নানা পেশায় ও মতলবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন। কিন্তু শ্রদ্ধা করার মতো লোক আজো কোটিতে গুটিক মেলে মাত্র। ধরা যাক, একজন শক্তিমান কবি কিংবা কথাশিল্পী অথবা নাট্যকার বা একজন আঁকিয়ে-গাইয়ে-বাজিয়ে কিংবা দক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রী। কিন্তু তার কোনো না কোনো ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের জন্যে তিনি পরিচিত সমাজে নিন্দিত। এ অবস্থায় তিনি গুণী বা মগজী শক্তিতে অনন্য-অসামান্য হয়েও নন্দিত না হয়ে নিন্দিত হতে পারেন। যেমন একজন লেখক সরকারপোষ্য বলে, একজন কবি সরকারঘেঁষা বলে, একজন নাট্যকার সরকারভীরু বলে জনধিকৃত হতে পারেন, হনও। খবরের কাগজে দেখছি, 'আগুনের পরশমণি' নামের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্রটিতে নাকি স্বাধীনতার প্রেরণা-প্রবর্তনাদাতা এবং নেতা শেখ মুজিবের সাতই মার্চের ভাষণ বাদ দেয়ার জন্যে নিন্দিত হচ্ছে। আমরা জানি, মানুষমাত্রই দেহে-মনে-মননে-মনীষায় সুপ্ত শক্তির আকর বা ভাণ্ডার নিয়েই জন্মে। মনের প্রবণতা অনুসারে অনুশীলনের মাধ্যমে সেই সুপ্ত শক্তির উন্মেষ ও বিকাশ সাধন করতে হয়। আমাদের দেহের অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে যে বিস্ময়কর শক্তি সুপ্ত রয়েছে তা সার্কাসে, ক্রীড়াজগতে, অলিম্পিকে নয় কেবল, ব্যক্তিক অনুশীলনেও চাক্ষুষভাবে প্রমাণিত নানাভাবে। একবার দু'বছরের শিশুর সাঁতার, হাতহীন কিশোরের পায়ের আঙুলে লেখার নৈপুণ্য, এক মহিলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়ের সাহায্যেই মাছ-মাংস-তরকারি কুটার দক্ষতা, এক অন্ধ মহিলার অভ্যস্ত নিয়মে স্টোভ জ্বালানো ও ডিমের পোচ, চা প্রভৃতি তৈরির দৃশ্য, এক তরুণের সর্বক্ষণ মাথায় বল রাখার দক্ষতা, এক বালকের যে-কোনো বছরের মাসের তারিখের 'বার' বলে দেয়ার আশ্চর্য শক্তির প্রমাণ, আর এক বালকের যে-কোনো বড় বড় সংখ্যার যোগ বা বিয়োগফল বলে দেয়ার সামর্থ্য টিভিতে দেখে আমার দৃঢ়প্রত্যয় জন্মেছে যে, মানুষ পারে না, পারবে না হেন কর্ম পৃথিবীতে নেই। বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ বিস্ময়কর আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের, সৃষ্টির, নির্মাণের তালিকা এখানে বাহুল্যমাত্র। এসব দেখে-শুনে-জেনে মনে গাঢ় গভীর মর্মভেদী আফসোস জাগে 'এমন মানবজমিন রইল পতিত/আবাদ করলে ফলত সোনা।'

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ দাসত্বে, ক্রীতদাসত্বে, ভূমিদাসত্বে প্রজন্মক্রমে জীবনের অপচয় ঘটিয়েছে, ঘটাতে বাধ্য হয়েছে অল্প কিছু সংখ্যক বাহুবলে, বুদ্ধিবলে জনবলে বলবান মানুষের মালিকানায়, প্রভুত্বে, মনিবত্বে ও হুকুমে-হুমকিতে-পীড়নে-শোষণে-বঞ্চনায়। সব মানুষ যদি আত্মবিকাশের অনুশীলনের স্বাধীনতা পেত, সব মানুষ যদি শিক্ষিত হতো, সব মানুষ যদি ভাতে-কাপড়ে অভাবমুক্ত থাকত, তাহলে অলস ও নির্বোধদের বাদ দিয়েও দুনিয়াব্যাপী হাজার হাজার মানুষ মনের প্রবণতা অনুসারে জিজ্ঞাসা-কৌতূহল-উচ্চাশা প্রণোদিত হয়ে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্তির ও সাধ্যের সীমা কোথায় এবং কত বিচিত্র তা অনুশীলনে অনুশীলনে এতোদিনে প্রমাণ করে দিত। কায়িক শক্তির মতো মগজী শক্তির অনুশীলনে দর্শনে-সাহিত্যে যেমন, তার চেয়ে অধিক ও সুনিশ্চিত প্রমাণিত আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের, সৃষ্টির, নির্মাণের বিস্ময়কর অবদানে মানবশক্তি সংস্কৃতিকে ও সভ্যতাকে কল্পনাতীতভাবে এগিয়ে দিতে পারত। আজ আমরা কেবল প্রতীচ্যমনীষার এতোদূর এগিয়েছি। গোটা পৃথিবীর সব রাষ্ট্রে যদি এমনি প্রকৌশল-প্রযুক্তির সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানের, জ্যোতির্বিজ্ঞানের, রসায়নের ও অন্যান্য শাখার বিজ্ঞানের চর্চা করতেন হাজার হাজার উদ্যমশীল উদ্যোগী গবেষক, তাহলে সমুদ্রের তলদেশে, পর্বতের অভ্যন্তরে, মাটির ভেতরে, অরণ্যের গভীরে এবং নভোমণ্ডলে আজ মানুষের অজ্ঞাত আর কিছুই থাকত না। বিজ্ঞানীরা যা-কিছু আবিষ্কার-উদ্ভাবন, সৃষ্টি, নির্মাণ করেছেন, যা-কিছু জেনেছেন, তার অনেক বেশি রয়েছে অনাবিষ্কৃত। এ জন্যেই মানুষ এখনো ভূতে-ভগবানে-প্রেতে-পিশাচে-অরি-মিত্র অদৃশ্য শক্তিতে আস্থাবান। তাই আজো মানুষের মধ্যে কারণ-কার্যচেতনা জাগেনি, মানুষ আজো নিয়তিবাদী, যৌক্তিক-বৌদ্ধিক জীবনে আস্থাহীন। প্রকৃতির বৈচিত্র্যের ও শক্তির উৎস কি, কেমন ও কোথায়, এ গ্রহ এমন কেন? জল-বায়ু-মাটি-অগ্নি এ চার প্রত্যক্ষ উপকরণ-উপাদানের-অণুর পরেও পরমাণু এবং তারও আবার ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন স্তর আছে। এগুলোর ভেতরেও রয়েছে বিভাজ্য শক্তিকণা। আর আকাশের নেই কিনারা– নভোমণ্ডল হচ্ছে বিস্তৃত। একদিন সংকোচনও শুরু হতে পারে। সেভাবেই হবে এর বিনাশ হয়তো আমরা আনাড়িরা, অজ্ঞরা শুনি, কেবলই শুনি, বুঝি না কিছুই, বুঝবার শক্তি যথাকালে অর্জন করিনি বলেই। অর্জন করতে চেষ্টা করলেও সাধ্যে কুলোতো কি-না, তাও অজানা। তবু জিজ্ঞাসা থাকা চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহামানব বুদ্ধ-সম্পৃক্ত চিন্তা

আড়াই হাজার বছর আগে আধুনিক বিহার অঞ্চলে দু'জন মহামানবের আবির্ভাব ঘটে। একজন জৈনমত প্রবর্তক জিন বর্ধমান মহাবীর, অপরজন 'সদ্ধর্ম' প্রচারক গৌতমবুদ্ধ। একজন বিহার অঞ্চলের অস্ট্রিক-দ্রাবিড় বংশীয়, অপরজন নেপালের তরাই অঞ্চলের কপিল বাস্তুর মোঙ্গল গোত্রজ। তাঁরা উভয়েই ছিলেন দেব-দ্বিজ- বেদদ্রোহী। ব্রাহ্মণেরা সমুদ্র-পর্বত-অরণ্য-আকাশ-পাতালের অদৃশ্য দেবতাদের প্রমূর্ত মর্ত্য প্রতিনিধিরূপে মানুষ মাত্রেরই অবশ্য পূজনীয় প্রভু হয়ে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়। আর সব মানুষকে দাস, ক্রীতদাস, ভূমিদাসরূপে নয় কেবল, ব্রহ্মের ব্রহ্মার অভিপ্রায় ও নির্দেশ অনুসারে মানুষকে স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য, সৎ-অসৎ শূদ্ররূপে বিভিন্ন বর্ণে, বর্গে ও শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে সবাইকে মর্ত্যদেবতা ব্রাহ্মণের সেবাদাস, সেবক, পূজক, পদাশ্রিত ও অনুগত রাখার স্থায়ী ব্যবস্থা কায়েম করে সৎ-অসৎ শূদ্রসেব্য ব্রাহ্মণ দেবকল্প হয়ে সর্বশ্রেণীর মানুষের আনুগত্য পেয়ে প্রণম্য হয়ে থাকল। ব্রাহ্মণের পদধূলি ক্ষত্রিয়-বৈদ্য-কায়স্থের শিরোভূষণ হলেও অচ্ছুৎ শূদ্রদের পদধূলিতে এবং মন্দিরে প্রবেশের অধিকার আজো নেই। বর্ণে বিন্যস্ত সমাজে অবর্ণ বা নিম্নবর্ণের ও নিম্নবর্গের স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য শূদ্ররা দেবাদেশেই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, ঘৃণ্য বৃত্তিকে প্রজন্মক্রমে ঘরানা পেশা হিসেবে গ্রহণ-বরণ করতে শাস্ত্রিক নিয়মেই বাধ্য ও অভ্যস্ত থাকত। এ রকম তুচ্ছ, ক্ষুদ্র ও ঘৃণ্য পেশাজীবীরা থাকত প্রজন্মক্রমে দারিদ্র্যের মধ্যে। তারা আকাঙ্ক্ষারিক্ত মানবেতর প্রাণীর জীবনই যাপন করত এ শতকের পূর্বাবধি।

ব্রাহ্মণ্য সমাজের ও শাস্ত্রের পীড়ন-শোষণ-দাসত্ব থেকে গণমানবের মুক্তির লক্ষ্যেই দেব-দ্বিজ-বেদদ্রোহী হন মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ। গরু-ভেড়া-পাখি-কুকুর-বিড়ালেরও আদর কদর ছিল। গৃহে প্রবেশের, কোলে বসার, শয্যায় ওঠার অধিকারও ছিল কুকুর-বিড়ালের ও পাখির। কিন্তু মানুষ ছিল অশুচি অস্পৃশ্য– যাদের ছায়াও বর্ণহিন্দুকে, ব্রাহ্মণকে করত অপবিত্র, পবিত্র হবার জন্যে তাদের স্নান করতে হতো। এমনি অবস্থাই মহাবীরের ও গৌতমবুদ্ধের দ্রোহের কারণ। তাঁরা উভয়েই হলেন প্রতিবাদী। যে-বেদের নামে, যে-দেবতাদের অভিপ্রায়ের নামে এবং ব্রাহ্মণের যে মর্ত্যদেবত্বের ও দেবপ্রতিনিধিত্বের নামে মানুষকে পীড়নে- শোষণে-দমনে-দলনে শায়েস্তা রাখত ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে, মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ সে-দেবতার কর্তৃত্ব এবং সে-ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করেন। তাই ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাঁদের নির্গ্রন্থ নাস্তিক বলে অবজ্ঞা করত।

দ্রোহ করতে গিয়ে তাঁরা দু'জনেই চরম ও পরম সত্যই পৃথিবীতে প্রথম উচ্চারণ করেন। সে সত্যটি হচ্ছে, জীব নির্বিশেষে সবারই এ মর্ত্যজীবন নির্বিঘ্নে, নিরুপদ্রবে ও নিরাপদে যাপন করার জন্মগত অধিকার রয়েছে। তাইতো জৈনরা মশা, মাছি, পিঁপড়ে, ছারপোকাও মারে না। গৌতমবুদ্ধও বলেন, 'পানাতিপাতা বেরমনি শিক্ষাপদম্'– গৌতমবুদ্ধের মুখেই উচ্চারিত হয়েছে করুণার ও মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তার তত্ত্ব। জীব নির্বিশেষে এ ভুবনে নির্বিরোধে ও নির্বিবাদে সহাস্থানের তত্ত্ব এ দুজনই কেবল উচ্চারণ করেছেন। কার্ল মার্কস কেবল মানবসাম্যের ও সহাবস্থানের জন্মগত অধিকারের কথা প্রচার করেছেন। অন্য জীব-উদ্ভিদের জীবনের কথা ভাবেননি। এদিক দিয়ে মহাবীরের ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৌতমবুদ্ধের মানবতা অনন্য, অসামান্য ও অতুল্য। মহাবীরের ও গৌতমবুদ্ধের শিষ্যরা তথা মতবাদ যারা গ্রহণ-বরণ করে, তাদের অধিকাংশ ছিল স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ও ঘৃণ্য বৃত্তিজীবী নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ দরিদ্র মানুষ। ব্রাহ্মণ্য দৌরাত্ম্য ও পীড়ন মুক্তির, গণমানব মুক্তির দিশারী, সংগ্রামী, যুক্তনিষ্ঠ, বিবেকানুগত, সত্যসন্ধ এবং জনগণকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠাকামী সন্তসৈনিক মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ তাই আজ অবধি স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন বিশ্বমানবের কাছে। যিশুও অবশ্য অহিংসনীতির ও ক্ষমার সমর্থক ছিলেন।

ভেবে বিস্মিত হই, যখন পৃথিবীর অন্যসব মহাদেশে আড়াই হাজার বছর আগে মানুষ আদি ও আদিম পর্যায়ে থেকে প্রায় প্রাণীস্তরের জীবনযাপন করছে, তখন ভারতে আড়াই হাজার বছর আগে সমাজবিপ্লবীর আবির্ভাব ঘটছে, সমাজবিপ্লব ঘটছে, সমাজ ভাঙছে, নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠছে, বর্ণে বিন্যস্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজ বিপর্যস্ত হচ্ছে।

দুনিয়ার অন্যসব শাস্ত্রীয় মতবাদের মতো বৌদ্ধমতেও নানা উপমতের উদ্ভব ঘটে, গড়ে ওঠে আঠারোটি মতবাদী উপসম্প্রদায়। প্রথম দিককার মহাযানীরা ক্রমে মন্ত্রযানে, কালচক্রযানে, বজ্রযানে ও সহজযানে বিভক্ত হয়ে যোগতান্ত্রিক নানা উপসম্প্রদায়ে বিভিন্ন হয়ে যায়। আর হীনযানীরাও থেরোবাদে তথা স্থবিরবাদে বা গুরুবাদে বিকৃতি লাভ করে। মহাযানী সাধন পন্থায় ও পদ্ধতিতে এবং লক্ষ্যে ও দর্শনে নানা বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্য দেখা দেয় এবং গৌতমবুদ্ধের নানা গুণনাম প্রমূর্ত ও সমূর্ত হয়ে পূজিত হতেও থাকে।

এই পার্থক্য, স্ববিরোধিতা, বৈপরীত্য, বৈচিত্র্য এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীর রাজনীতিক ও সামাজিক প্রাবল্য পরিণামে গোটা ভারতে বৌদ্ধবিলুপ্তি ঘটাতে থাকে। নবমশতকে শঙ্করাচার্য প্রচারিত জ্ঞানবাদ বা মায়াবাদ, সন্ন্যাসবাদ নিরাকার-নিরঞ্জন ব্রহ্মবাদ ও বিমূর্ত ব্রহ্মের স্মরণ, শরণ, উপাসনা প্রভৃতির মধ্যে মূল বৌদ্ধমতের সাদৃশ্য দর্শনে অজ্ঞ অনক্ষর বৌদ্ধেরা আবার পরোক্ষে ব্রাহ্মণ্য সমাজাশ্রিত হয়। এভাবে বারো শতকের মধ্যেই বৌদ্ধসমাজ তার উদ্ভব ক্ষেত্রেই প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ্য সমাজাশ্রিত হয়েও তবু কিছু লোক প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধমত চালু রাখে, ধর্ম ঠাকুরের পূজারীরা, তাঁতী-যোগীরা, হিন্দু-মুসলিম বাউলরা, বৈষ্ণব সহজিয়ারা। এবং বৌদ্ধমতের লেশ ও রেশ রয়ে গেছে কিছু হিন্দু দেবতার ও পালা-পার্বণের মধ্যে। মধ্যযুগেও আর একবার আরব-তুর্কী বিজয়ের পরে ব্রাহ্মণ্যসমাজে বিপ্লব ঘটে দাক্ষিণাত্যে শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভ ও বাঙলায় চৈতন্যদেব প্রমুখ দ্বৈত-অদ্বৈত নিরাকার ব্রহ্মবাদীরা এবং উত্তর ভারতে নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের ও নিম্নবৃত্তির রামানন্দ, রামদাস, কবির, দাদু, নানক প্রমুখরা ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রদ্রোহী হয়ে নতুন মত প্রচার করেন। এঁরাও ব্রাহ্মণের শাস্ত্রশাসন ও ঘৃণা-অবজ্ঞা-শোষণ-পীড়ন হতে মুক্তির লক্ষ্যে ঈশ্বরে ভক্তিকেই জীবনের পুঁজি ও পাথেয় করে নেন।

মানুষ পার্থিব জীবনকে গৌতমবুদ্ধের অনুভব-উপলব্ধির মতো যন্ত্রণার বলে মনে করে না। বৌদ্ধেরাও তাই লড়াই করে, করে নরহত্যা নির্বিচারে। পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি-আনন্দ-আরাম-ধন-মান-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্প-দাপট তারা বাঞ্ছিত বলে মানে। কাজেই তারাও কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি থেকে বিরত থাকে না। গৃহীদের বৈরাগ্য প্রভাবিত করে না। পৃথিবীর কোনো নবী-অবতারের অনুসারীরাই শাস্ত্র অবিকৃতভাবে মানে না, ব্যাখ্যায়-বিশ্লেষণে সুবিধে মতো নানা মতের ও উপমতের সৃষ্টি করে অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপরীতমুখী উপমত গড়ে তুলেছে। ইহুদীর, খ্রিস্টানের ও মুসলমানের মতো এ সেদিনকার ব্রাহ্মমতও আদি, সাধারণ নববিধান নামে তিনদলে বিভক্ত হয়ে গেল।

মানুষ মর্ত্যজীবনে আসক্ত। তাই ধর্মজীবনে তাদের আসক্তি হালকা ও গৌণ। এ জন্যেই মহামানবের বাণী বিভিন্ন সম্প্রদায় শাস্ত্র হিসেবে ধরে রেখেছে বটে, কিন্তু আন্তরিকভাবে অনুসরণ করে না, উপেক্ষা ও লঙ্ঘন করে। তাই পৃথিবীতে আজো মানুষের নির্বিরোধে নির্বিবাদে নিরুপদ্রবে নিরাপদে সর্বজনীন স্বার্থেই সংযম, সহিষ্ণুতায় সৌজন্যে সামবায়িক সম্প্রীতিতে সহযোগিতায় সহাবস্থান সম্ভব হচ্ছে না। সংখ্যালঘু দুর্বলরা দীনহীন রাত্রিদিন পরাধীন অনিশ্চিত ও ত্রস্ত জীবন যাপন করছে পৃথিবীর সব রাষ্ট্রে। গৌতমবুদ্ধ আড়াই হাজার বছর আগের জগতের অজ্ঞ-অনক্ষর স্বল্প সভ্য প্রাণী-প্রবৃত্তি চালিত অসংযত মানুষে যা দেখে 'ভবযন্ত্রণায়' ভীতত্রস্ত হয়ে দুঃখবাদী হয়েছিলেন, জীবনমাত্রই যন্ত্রণাপ্রসূ ও যন্ত্রণাগ্রস্ত বলে জেনেছিলেন, জন্ম-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্যে ভোগতৃষ্ণারূপ স্কন্ধমুক্ত হয়ে নির্বাণ পেতে চেয়েছিলেন, প্রবৃত্তিচালিত বাস্তবজীবনে আমজনতার পক্ষে তা সম্ভব ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি। তাই গণমানুষের মর্ত্যজীবনে স্বস্তি ও সুখ আসেনি। সে-ভবযন্ত্রণা বা জীবনযন্ত্রণা কিছু ধনী-মানী ক্ষমতাবান ব্যতীত আজো লাখে নিরেনব্বই হাজার নয়শ জনের জীবনে বাস্তব হয়ে রয়েছে। কাজেই বৌদ্ধেরাও বুদ্ধকে সর্বক্ষণ স্মরণ করে বটে, কিন্তু বুদ্ধের দেশনার বা বাণীর 'শরণ' নেয় না।

বাণীর সত্যে ও জীবনে প্রায়োগিক সত্যে পার্থক্য হচ্ছে সমুদ্র ও পর্বতের মতোই। বাণীর সত্য হচ্ছে আদর্শপ্রসূন আর বাস্তব জীবনের সত্য হচ্ছে প্রবৃত্তিবশ্যতা। আজো আস্তিক মানুষ স্ব স্ব শাস্ত্র আওড়ায়, মহৎ বাণী, আপ্তবাক্য, প্রবাদ-প্রবচন স্মরণ করে। লৌকিকে অলৌকিকে অলীকে আজো মানুষের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা অপরিমেয় ও অটুট। কেননা যুক্তিরিক্ত ভীরু মানুষের মগজের ও চিত্তের গভীরে এ সব বিশ্বাসের ও ধারণার স্থিতি। আশৈশব শ্রুত, লব্ধ ও দৃষ্ট বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা ও আচার উপযোগ চেতনার এবং যৌক্তিক-বৌদ্ধিক ও বিবেকী বিবেচনার নিরিখে যাচাই-বাছাই-ঝাড়াই করার মতো মনের মগজের মননের অনুশীলন বা প্রশিক্ষণ তাদের থাকে না।

বাহ্যত মানুষের জ্ঞান বাড়ছে, বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য মানুষের প্রাজন্মক্রমিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার মূলে আঘাত হেনে চলেছে। তবু মনে-মগজে-মননে আশৈশব প্রোথিত এবং ক্যান্সারের মতো অযৌক্তিক অসঙ্গত অসমঞ্জসভাবে প্রাত্যহিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে ছড়িয়ে থাকা গাঢ়-গভীর বিস্ময়-বিশ্বাস-ভয়-ভক্তি-ভরসা থেকে আস্তিক মানুষের মুক্তি মেলে না। কালগত ও স্থানগত জীবনের চাহিদা পূরণের জন্যে যুগে যুগে ও স্থানে স্থানে আসমানী দোহাই দিয়ে মানুষের কল্যাণ লক্ষ্যে উপযোগ চেতনা দিয়ে যুক্তসিদ্ধ শাস্ত্র নামের নীতি-নিয়ম চালু করেছেন কত জ্ঞানীগুণী মহামনীষী মহামানব। এভাবে কালিক স্থানিক মানুষের জীবন-জীবিকার ও যূথবদ্ধ অবস্থানের প্রয়োজনে নানা শাস্ত্র বারবার তৈরি হয়েছে, হয়েছে পরিবর্তিত, বিবর্তিত, পরিমার্জিত এবং বর্জিতও। তবু আস্তিক মানুষের ইহ-পরলোকে প্রসৃত জীবনে সমাজে বাঞ্ছিত সুখ-শান্তি এল না, নির্বিরোধ নিরুপদ্রব নিরাপদ সহযোগিতায় সহাবস্থান সম্ভব হল না। আজো মানুষকে কাড়াকাড়ি মারামারি হানাহানি করে বাঁচতে হয়, আজো গৌতমবুদ্ধ উপলব্ধ ভবযন্ত্রণা তথা জীবন-যন্ত্রণা থেকে মর্ত্যজীবনে গণমানবের-দুর্বলের-আমজনতার মুক্তি ঘটেনি; আজো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জোর যার মুলুক তার' নীতি উপযোগ হারায়নি। আজো সমাজ জুলুমচালিত এবং জালিমে-মজলুমে বিভক্ত। কারণ মানুষ মুখে ন্যায়-সত্য-শান্তি-সহাবস্থান প্রভৃতির গুরুত্ব ও আবশ্যিকতা স্বীকার করে বটে, কিন্তু নিজের লাভের, লোভের ও স্বার্থের অনুকূল না হলে কিছুই বাস্তব জীবনে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের অন্তর্ভুক্ত করে না। কোনো নীতি-আদর্শ-দেশনা-শাস্ত্র কারো প্রয়াসে প্রয়োগে প্রকাশ পায় না। তাই পৃথিবীর সর্বত্র সমাজে বৈষম্য-পীড়ন-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ-সংঘাত রয়েই গেছে। কোনো মহামানবের শাস্ত্রই কার্যত মানা হয় না। মানুষ উপেক্ষা ও লঙ্ঘন করেই ব্যক্তির, দলের, সম্প্রদায়ের, সরকারের ও রাষ্ট্রের স্বার্থে। কাজেই আজ তথাগত বুদ্ধের জন্মজয়ন্তী উৎসবে বুদ্ধকে স্মরণ করবে সবাই, কিন্তু তাঁর দেশনা 'শরণ' করার লোক মিলবে কি?

'বুদ্ধ'কে স্মরণ করি সবাই, কিন্তু

মেরুদণ্ড উঁচু করে চলার মতো প্রাণীর উদ্ভব সম্ভবত চল্লিশ লক্ষ বছর আগেই ঘটেছে। প্রাণীর মানব-প্রজাতির উন্মেষ ঘটেছে প্রায় চার লক্ষাধিক বছর আগে। আর তার মন-মগজ-মনন-মনীষার স্থূল সূক্ষ্ম নানা নিদর্শন কিংবা লেশ ও রেশ পাচ্ছি অন্তত সাত/আট হাজার বছর থেকে। আজ অবধি মানুষের জীবনের, জীবন-জীবিকার ও জীবনযাপন পদ্ধতির সম্পৃক্ত চেতনা-চিন্তার ও ব্যবহারিক জীবনের সামগ্রীগত যেসব নমুনা মিলেছে, তা থেকে প্রমাণে-অনুমানে বোঝা যায় প্রাণীর প্রজাতি হিসেবে তাদের মধ্যে সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তিগত পার্থক্য নেই বটে, তবে স্থান-কাল ও পরিবেশগত তথা সূর্যের নৈকট্য ও দূরত্বগত এবং রোদ-বৃষ্টি- শৈত্যে আর মাটির উর্বরতা-বন্ধুরতা প্রভৃতির প্রভাব মানুষের জীবনধারায়, এমন কি মননধারায়ও এনেছিল বৈচিত্র্য।

তাই আদিকাল থেকেই অসহায় মানুষের সংখ্যাল্পতার দরুন গৌষ্ঠীক গৌত্রিকজীবনে আবদ্ধ এবং যানবাহনের অভাবে বিচ্ছিন্নতায় অজ্ঞাতবাসে বাধ্য মানুষকে গোষ্ঠী ও গোত্রগতভাবে সর্বপ্রকারে স্বনির্ভর থাকতে হয়েছে। উদ্যমের, উদ্যোগের ও উপকরণের অভাবহেতু কেউ কেউ অন্য প্রাণীদের মতোই আজো আদি ও আদিম স্তরে রয়ে গেছে, যদিও ঋজু মেরুদণ্ডের ও হাতের বদৌলত মন্থরগতিতে হলেও অন্য প্রাণী থেকে উন্নততর জীবিকা পদ্ধতি উদ্ভাবনে ও জীবন-যাপনে সমাজবদ্ধ হতে পেরেছে। যৌথ জীবনে প্রয়োজনীয় বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভক্তি-ভরসার টোটেমে-ট্যাবুতে, যাদুবিশ্বাসে, সর্বপ্রাণবাদে এবং অদৃশ্য আলৌকিক, অলীক ও লৌকিক নানা শক্তিতে আস্থা ছিল আবশ্যিক ও জরুরি। অজ্ঞের অসহায়ত্ব নইলে কিছুতেই ঘুচত না। তার ভয়ের, ভক্তির ও ভরসার অবলম্বন চাই, আরো চাই দুর্যোগে দুর্দিনে দুর্দশায় প্রবোধ পাওয়ার মতো রুষ্ট ও অমোঘ নিয়তি। এ সবকিছুই মূলত তার মর্ত্যজীবনের প্রয়োজনেই উদ্ভূত। আত্মা-পরলোক-স্বর্গ-নরক, মোক্ষ, নির্বাণ-জন্মান্তর, ঈশ্বর প্রভৃতিতে তার বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা কখনো দৃঢ় ছিল না, আজো নেই। কিন্তু অস্বীকার করবার মতো অভীক আত্মপ্রত্যয়ী নয় বলেই সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশৈশব শ্রুত ও লব্ধ বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায় প্রথাগত আস্থা রাখে মাত্র। তাই সাধু-সন্ত, শ্রমণ-শ্রাবক, পুণ্যাত্মা-মহাত্মা কেউই মরতে চায় না– কেবলই মাটির ও কষ্টের ভুবনে বাঁচতে চায় যতদিন এবং যতক্ষণ সম্ভব। এজন্যেই মুখে যে যাই বলুক, আত্মায় বিশ্বাস রেখেও সবাই মৃত্যুকে অনস্তিত্বে বিলীন হওয়ার নামান্তর বলেই মানে অন্তরে। জন্মান্তরে আস্থা রেখেও সুদীর্ঘজীবী অচল রুগ্ন বৃদ্ধও তাই মরতে চায় না।

এ বিষয়ে বয়ান এখানেই শেষ করছি, নইলে ধানভানতে শিবের গীতই গাওয়া হবে অপ্রাসঙ্গিকভাবে।

আমাদের বক্তব্য এই, মানুষের ভাব-চিন্তা, স্বপ্ন-সাধ, কর্ম-আচরণ বাস্তবে মর্ত্যজীবনকেন্দ্রীই। এ মর্ত্যজীবনই সত্য এবং আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, উল্লাস-যন্ত্রণা, জয়-পরাজয়, প্রাপ্তি-ক্ষতি, অনুভব-উপলব্ধি সঞ্জাত প্রেরণা-প্রণোদনা-প্রবর্তনাই জীবনের চালিকাশক্তি। এবং আমজনতার মধ্যে অনুশীলন ও চর্যার অভাবে প্রাণীর সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তিই থাকে প্রবল। এ জন্যেই সে ষড়রিপুচালিত। লাভ-লোভ-স্বার্থ চেতনা প্রবল হলে, অন্য কথায় প্রলোভন প্রবল হলে এবং নিরাপত্তা ও নির্বিঘ্নতা সম্বন্ধে নিশ্চিতি পেলে মানুষ করে না, করতে পারে না হেন অপকর্ম-অপরাধ নেই। তখন তার পাপভীতি কিংবা নির্বাণপ্রীতি মন থেকে উবে যায়, বিবেক হয় বিলুপ্ত। আমাদের ধারণায় সর্বপ্রকার হিতকথা বলা হয়ে গেছে, সব মহৎ কথাও শোনা আছে, জানা আছে সব আপ্তবাক্য। দেশ-কালগত জীবনের প্রয়োজনানুগ নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতিও দেশে-দেশে, কালে কালে, গোত্রে গোত্রে চিরকালই চালু ছিল। কিন্তু প্রবৃত্তি-পরবশ নিবৃত্তির প্রয়াসহীন অসংযত, অসহিষ্ণু, অবিবেকী, অবিবেচক লোভী ও ভোগী মানুষ জেনে-বুঝেও অন্যায় কর্মে আত্মনিয়োগ করে। চুরি করা, মিথ্যা বলা, হিংস্র হওয়া, অসূয়া-রিরংসাগ্রস্ত হওয়া মন্দ জেনে এবং বুঝেও প্রলুব্ধ ভোগ-লিপ্সু মানুষ বিরত হয় না কোনো অপকর্ম-অপরাধ থেকেই।

ফলে পৃথিবীর নবী-অবতার সন্ত ও জ্ঞানী-গুণী মানবহিতৈষী মহৎ ব্যক্তিদের সব প্রয়াসই বলতে গেলে বাঞ্ছিত মাত্রায় কখনো সফল হয়নি। জীবনে প্রয়োগই হয় না, কেবল তাৎপর্যহীন নিরুদ্দেশ্য আচার-আচরণ, পালা-পার্বণ হিসেবে তাঁদের দেশনা কিংবা বিধি-নিষেধ শাস্ত্র হিসেবে চালু থাকে মাত্র। তবু আড়াই হাজার বছর আগে এ ভারতবর্ষে মানবতা প্রমূর্ত হয়ে আবির্ভূত হয়েছিল বর্ধমান মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ হিসেবে, যাঁরা সর্বপ্রাণীর এ পৃথিবীতে মর্ত্যজীবন নির্বিঘ্নে, নিরুপদ্রবে ও নিরাপদে যাপন করার জন্মগত অধিকার স্বীকার করে গেছেন। এমনি উচ্চতম মানের মানবতা, এমনি পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব পৃথিবীর আর কোথাও এমন সুস্পষ্ট উচ্চারণে কখনো প্রকটিত হয়নি।

যেহেতু মানুষও জন্মগতভাবে প্রাণীই, প্রাণীসুলভ সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তি নিয়েই তার জন্ম, সেহেতু সচেতন সযত্ন অনুশীলন ব্যতীত প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তিতে প্রশমিত করা সম্ভব হয় না। সেজন্যেই প্রত্যাশিত মাত্রার মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষ লাখে একজনও মেলে না কোনো কোনো অনুন্নত কিংবা দেশে বা রাষ্ট্রে।

জৈনরা মশা, মাছি, পিঁপড়ে, ছারপোকাও মারে না, পশু-পাখির সেবা করে– পিঁজরাপোলও করে, মানুষের কল্যাণেও নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। কিন্তু মানুষকে তেমন মাত্রায় ভালোবাসে না, যে-মাত্রায় মানবপ্রীতি থাকলে মানুষকে শোষণ করা থেকে বিরত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে। বৌদ্ধেরাও যুদ্ধ করে, নরহত্যা করে, চুরি করে, মিথ্যাবাদী হয়। অথচ তথাগত বুদ্ধের বাণী হচ্ছে, 'ভোগ বিমুখতা তন্হার [তন্নার] ভোগতৃষ্ণার বিলুপ্তি', তাই তিনি বলেছেন 'পানাতিপাতা মুসাবাদা অদীন্নদানা বেরমনি শিক্ষাপদম।' অথচ কয়জনে মানে বুদ্ধের দেশনা। গৌতমবুদ্ধ ছিলেন দুঃখবাদী। 'ভবযন্ত্রণার' ভীতি ছিল তাঁর প্রবল। তাই তিনি পুনর্জন্ম থেকেই মানবমুক্তি কামনা করেছিরেন। ভোগতৃষ্ণাই হচ্ছে স্কন্ধ, যা পুনর্জন্ম ঘটায় মর্ত্যে। কাজেই ভোগবিমুখতাই, বৈরাগ্যই হচ্ছে স্কন্ধমুক্তির তথা জন্ম-যন্ত্রণা মুক্তির বা নির্বাণের পন্থা। কিন্তু বৌদ্ধেরাই ভগবান তথাগতের বাণী ও দেশনা এবং দর্শন বিকৃত করে। বৌদ্ধেরা কেবল হীনযানে-মহাযানে সীমিত থাকেনি; নানা যান অবলম্বনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। বিশেষ করে মন্ত্রযান, কালচক্রযান, বজ্রযান ও সহজযান প্রবল হতে থাকে। তাদের 'যোগতন্ত্র' জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আধুনিক বিদ্বানদের ধারণা, ভারতে বৌদ্ধ বিলুপ্তির মুখ্য কারণ তাদের তন্ত্রাচার। বৌদ্ধেরাও ভারতবর্ষে রাজত্ব করে। কাজেই ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাদের পয়লা নম্বরের শত্রুরূপে চিহ্নিত করে বৌদ্ধ বিলুপ্তির লক্ষ্যে নানাভাবে শাসন শোষণে পীড়নে নির্যাতনে তাদের ত্রস্ত করে তোলে। 'নিরঞ্জনের রুস্মা ও কলিমা জালালী' তার সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু এতেও ভারতবর্ষে বৌদ্ধ বিলুপ্তি ঘটত না। আটশতকের দাক্ষিণাত্যের কেরল অঞ্চলের স্বল্পায়ু মনীষী সন্ত শঙ্করাচার্য জ্ঞানবাদ-মায়াবাদ-সন্ন্যাস এবং বিমূর্ত নিরাকার অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ প্রচার করেন যখন, তখন নিজেদের তথাগত দর্শনের ও দেশনার এবং বৌদ্ধচর্যার সাদৃশ্য শঙ্করাচার্যের [মৃঃ ৮২০ খ্রীঃ] বাণীর মধ্যে দেখে দলে দলে নির্জিত, ব্রাহ্মণ্যপীড়নে ত্রস্ত বৌদ্ধেরা শঙ্কর মত গ্রহণে উৎসাহী হয়। এভাবেই বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবভূমি আধুনিক বিহারে এবং বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলবাস্তুতে নেপালেও বৌদ্ধ-বিলুপ্তি ঘটে। তবু বাঙলাদেশে আজো হিন্দু সমাজভুক্ত ধর্মঠাকুরের পূজারী, নাথযোগী তথা তাঁতী সম্প্রদায়, হিন্দু-মুসলিম বাউলরা এবং বৈষ্ণব সহজিয়ারা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। আর চন্দ্রনাথ, আদিনাথ, জগন্নাথ, ধর্মঠাকুর, ক্ষেত্রপাল, বৎসলা, তারা প্রমুখ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতাই।

গৌতমবুদ্ধ চিকিৎসাবিজ্ঞানের নিয়মে ও আদলে মানব দুঃখের কারণ ও প্রতিকার পন্থা আবিষ্কার করেন। এটিই তাঁর মতবাদের মূল কথা এবং মানব সভ্যতায় ও ধর্মদর্শনে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এরই নাম 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' বা সংশ্লিষ্ট কারণ পরম্পরা। এ কারণ পরম্পরা সংখ্যায় বারোটি। তথাগত বুদ্ধ জানতেন 'সর্বম্ অনিত্যম্ সর্বং শূন্যম্'। অক্লেশ অবৈর অনাসক্ত চিত্ত স্থিরতারই নাম নির্বেদ অবস্থা। এরই অপর নাম নির্বাণ বা শূন্যতা। এসব তাত্ত্বিক আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। আমাদের মূল বক্তব্য ছিল মানুষ সভা-সমিতিতে, বক্তৃতায়, লেখায়, আড্ডায়, দেশনায় ভালো ভালো কথা, মহাপুরুষের, নবী-অবতারের, সন্তের, জ্ঞানী-গুণী-ঋষি-কবি প্রমুখের বাণী উচ্চারণ করে, কিন্তু প্রলোভন প্রবল হলে কিছুই জীবনে ও জীবনাচারে গ্রহণ করে না। তাই মুসা-ঈসা-মহাবীর-বুদ্ধ-মুহম্মদ-নানক-চৈতন্য প্রমুখের বাণী ও প্রবর্তিত শাস্ত্র আজো টিকে রয়েছে মাত্র—মানবচরিত্রে ও কর্মে-আচরণে বাস্তবায়িত না হয়েই।

পৃথিবীর কোনো ধর্মমতই আদি অকৃত্রিম অবস্থায় নেই। বিবর্তিত, পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত, পরিশীলিত এবং বিকৃত ও বিস্তৃত হয়ে নানা মতবাদী সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছে। বৌদ্ধ হীনযানীরা ত্রিপিটক 'সূত্র-বিনয়-অভিধর্ম' মানলেও তারা থেরবাদী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[স্থবিরবাদী] তথা গুরুবাদী। তা ছাড়া বৌদ্ধমত তথাগত বুদ্ধের নির্বাণের আড়াইশ' বছরের মধ্যেই আঠারোটি উপমতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে আঠারোটি মতবাদী সম্প্রদায়ও গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে দশটি ক্রমে প্রাধান্য পায়। সেগুলো হল স্থবিরবাদ, হৈমবত, ধর্মগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সর্বাস্তিবাদ, মূল সর্বাস্তিবাদ, সম্মিতীয়, মহাসাঙ্ঘিক ও লোকোত্তর বাদ। বৌদ্ধেরা কালক্রমে বুদ্ধের বিভিন্ন গুণনাম ও মূর্তি তাদের অনুধ্যানের এবং প্রমূর্তপূজার বিষয় করে তোলে। আমরা অন্যত্র বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। ডক্টর ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের রাজনীতিক প্রবর্তনায় ভারতে অস্পৃশ্যদের মধ্যে বৌদ্ধমত চালু হয়েছে বটে, তবে চট্টগ্রামের বৌদ্ধেরা আরাকানী বংশধর, আর পার্বত্য চট্টগ্রামীরা মোঙ্গল গোত্রীয়, ভারতীয় নয়।

আজ পৃথিবীতে ধর্মগুলো টিকে আছে, ধর্মভাব বিলুপ্তির পথে। এ জন্যেই মানুষের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, গৌত্রিক, গৌষ্ঠীক, জাতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে কোথাও বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে আফ্রো-এশিয়ায়, য়ুরোপে-আমেরিকায়-অস্ট্রেলিয়ায় সংখ্যালঘু মানুষেরা স্বাধিকার ও স্বস্তি থেকে এ মুহূর্তেও বঞ্চিত। অমন যে সরল ও ক্ষমাসুন্দর যিশু— সেই যিশুর অনুসারীরাও হত্যায় ও পীড়নে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী। মুসলিমরাও নিজেদের মধ্যেই মধ্যযুগীয় নিয়মে কাড়াকাড়ি মারামারি হানাহানিতে নিরত। সবাই জানে ধর্মের নামে ধর্মধ্বজীরা পৃথিবী নররক্তে চিরকালই সিক্ত করতে উৎসাহবোধ করেছে।

নবী-অবতার-সন্তের উদ্দেশ্য আজো সফল হয়নি। কেননা, ধর্মসম্প্রদায়গুলো বিরোধ বিবাদ প্রবণ, অসংযত, পরধর্ম-পরমত-পরআচরণ অসহিষ্ণু। অথচ মানবতার বা মনুষ্যত্বের কিংবা সংস্কৃতির লাক্ষণিক ও আচারিক রূপ হচ্ছে: সংযম, সহিষ্ণুতা, সৌজন্য, যুক্তিনিষ্ঠা, ন্যায্যতাবোধ ও বিবেকানুগত্য। এমনি গুণের মানুষের মনে-মগজে-মননেই কেবল করুণার ও মৈত্রীর গুরুত্বচেতনা জাগা সম্ভব।

একারণেই গৌতমবুদ্ধের সর্বমানবের সুখ, শান্তি ও কল্যাণকামিতা, সামাজিক বা গৌত্রিক, সাম্প্রদায়িক কিংবা রাষ্ট্রিকভাবে বাস্তবে কোথাও রূপায়িত হতে প্যারেনি। নইলে তাঁর বাণী ও দর্শন বিশ্বমানবের ব্যক্তির স্বার্থে, সংযমে, সহিষ্ণুতায় ও সৌজন্যে, সামবায়িক সহযোগিতায় সহাবস্থান সম্ভব করে তুলতে পারত। বুদ্ধদেবের উচ্চারিত বাণীতে রয়েছে সর্বকালের মানুষের অন্তরের অকৃত্রিম চিরন্তন কামনা 'সব্বেসত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, সুখী অত্তারং হরিহরন্তু। সব্বেসত্তা দুকোপমুঞ্চন্তু। সব্বেসত্তা মা যথালদ্ধ সম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।' সকল জীব সুখী হোক, বৈরমুক্ত হোক, সুখে কালযাপন করুক, সর্বজীব দুঃখমুক্ত থাকুক, সর্বজীব যথালব্ধ সম্পত্তিচ্যুত না হোক।' গৌতমবুদ্ধবাঞ্ছিত আদলে এমনি একটি মানবসমাজ আধুনিককালে কার্ল মার্কস প্রবর্তন করতে ও করাতে চেয়েছিলেন। মার্কস সর্বজীবনের কথা ভাবেননি অবশ্য। এ জন্যেই মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ জীবনমাত্রেরই প্রতি করুণা ও মৈত্রীকামী রূপে মহত্তম সত্তার অধিকারী। কিন্তু আজ সর্বজীবে সমদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ তো মিলবেই না, কোনো আস্তিকের মধ্যে সর্বমানবে সমদৃষ্টিও অলভ্য। এমনকি আত্মসত্তার বিকাশ ও উৎকর্ষ লক্ষ্যে আজ আন্তরিকভাবে 'বুদ্ধং শরণম্ গচ্ছামি'র অঙ্গীকার করার লোকও কি সুলভ! তাই মহামানবের অবহেলিত বাণীও 'নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। বুদ্ধকে স্মরণ করে সবাই, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর দেশনা শরণ করে না কেউ। মহামানব ও মহৎ বাণী আজ যেন কেতাবী বিষয়, বাস্তবে যেন উপযোগরিক্ত। তাই ধনিক-বণিক-শাসক-শোষক শ্রমণ ব্যতীত আর সবারই জীবনমাত্রই যন্ত্রণার। ভবযন্ত্রণা আমজনতার জন্যে পূর্ববৎই রয়ে গেল।

১. মৎপ্রণীত বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২১৮-৮৯ এবং 'বাউলতত্ত্ব' নামের গ্রন্থে।

নিঃস্ব বেকারে ও মুচিরাম গুড়ে দেশ আকীর্ণ

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা নুনের দারোগা থেকে পদোন্নতি পেয়ে ডেপুটি কালেক্টর হয়েছিলেন। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয় দম্ভ করার মতো লাখের উপর এক পরিবারে। সাচ্ছল্য ছিল, তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল, স্বাভাবিক ছিল, স্বপ্ন ও সাধ নিয়ে ভাবনা-চিন্তার অবসরও ছিল। সেজন্যেই বাল্যে-কৈশোরেই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল 'এ জীবন লইয়া কি করিব, জীবন লইয়া কি করিতে হয়।' এ কালে শহরে শিক্ষিত ধনীঘরের বালক-কিশোরদের এসব কথা ভাবতে হয় না। তাদের মা-বাবারাই এখন তাদের হয়ে ভাবে এবং তাদের শৈশবে ইংরেজী মাধ্যমে কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে পড়িয়ে এবং একটু বড় হলেই বালক-কিশোর-কিশোরীকে ভূস্বর্গ যুক্তরাষ্ট্রে, যুক্তরাজ্যে, কানাডায় পাঠিয়ে দেয় এবং অপেক্ষাকৃত কম অর্থ-সম্পদের লোকেরা পাঠায় ভারতের নানা বিদ্যালয়ে। এবং 'জীবন লইয়া কি করিবে'– তা নিয়ে এদের ভাবতে হয় না। কারণ জীবন হচ্ছে মার্কিন ডলার অর্জন, গাড়ি-বাড়ি-নারীর মালিক হওয়া, ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে অবাধ প্রাচুর্যের মধ্যে থাকা, যে-কোনো উপায়ে অর্থে বিত্তে বড়লোক হওয়া। ধনে মান বাড়ায়, ধন থাকলে সব মেলে– জীবন্ত বাঘের চোখও। পাঁচ-সাত খুন মাফও মেলে। 'ধন আছে যার সব আছে তার।' এমনকি যে-কোনো কঠিন রোগ থেকে মুক্তিও মেলে, আয়ু বাড়ে, বয়স বাড়লেও আয়ু কমে না। এরাই এখন ৯০/১০০ বছর বাঁচছে, বাঁচবে। এ কারণে এটি এখন ছোঁয়াচে রোগের মতো গাঁয়ে-গঞ্জে দরিদ্র নিরক্ষর ঘরে ও অনক্ষরের মনেও সংক্রমিত হয়েছে। ওরাও ডলারের মরীচিকার পিছু ধাওয়া করে পৈত্রিক ভিটে এবং ব্যক্তিবিশেষে পৈত্রিক প্রাণও হারাচ্ছে। ফেরেববাজের কবলে পড়ে প্রতারিত হয়েও আবার নতুন আশায়-আশ্বাসে বুক বেঁধে নতুন প্রতারণার শিকার হচ্ছে। এ সোনার হরিণ নয়, মায়ামৃগ।

এ সুযোগ দরিদ্র, দুস্থ, নিঃস্ব, নিরন্ন, আশাহীন, ভাষাহীন পরিবারের সন্তানদের মেলে না। তারা প্রজন্মক্রমে দুস্থ দরিদ্র পরিবারের ঋণী বাপের সন্তান। ঋণের পৈত্রিক বোঝা নিয়েই তাদের জন্ম, জীবন ও মৃত্যু। কাজেই জীবন নিয়ে স্বপ্ন দেখা, জীবনে কোনো সাধ লালন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না; হয়নি দাস, ক্রীতদাস, ভূমিদাস আমলে, হয় না আজো। অন্ন-বস্ত্রের বারোমেসে অভাব-অনটনের জীবনে অনিশ্চিতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্থিরতা, তাদের জীবনের জাগ্রত মুহূর্তগুলোও শঙ্কা-সঙ্কট-সমস্যা আকীর্ণ চিন্তায় ম্লান ও নিরানন্দ করে তোলে। হাঁচি-কাশির মতোই কখনো কখনো ওরা কোনো ঘটনায় বা দৃশ্যে আপন ভোলা হয়ে হাসে, আনন্দানুভব করে, মনে আকস্মিকভাবে ক্ষণপ্রভার মতো ফুর্তি জাগে বটে, তবে গাঁয়ে-গঞ্জে এবং বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের কোথাও সামন্তিক ও পুঁজিবাদী সমাজে তাদের অবস্থান্তর ঘটেনি। যদিও বিজ্ঞানের প্রসাদে যান্ত্রিক প্রযুক্তি-প্রকৌশলের প্রয়োগে পৃথিবীর চেহারা বদলে গেছে, জীবনযাত্রার পদ্ধতিও গেছে বিবর্তনে পালটে, কিন্তু এদের জীবনে অর্থ-সম্পদের অনিশ্চিতি আজো ঘোচেনি, ঘোচেনি নিঃস্বতা, নিরন্নতা, দুস্থতা, দরিদ্রতা, আজো সর্বোপরি অন্নচিন্তা। সংস্কৃতি-সভ্যতা বিকাশের সাত/আট হাজার বছর পরেও গণ-মানবের জীবনে অন্ন-বস্ত্র-নিবাসের সমস্যার সমাধান হল না। কিমাশ্চর্য অতঃপরম! চাঁদ-সূর্যের যেমন আগের মতো উদয়াস্ত ঘটছে ব্যতিক্রমবিহীনভাবে, তেমনি এদেরও ঝড়ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-মারী-অনাহার-অর্ধাহারে অকালে অচিকিৎসায় মৃত্যু আজো ওই চাঁদ-সূর্যের মতোই ওদের জীবনে প্রজন্মক্রমে আবর্তিত হচ্ছে, মানববাদীরা, সরকারগুলো, রাজনীতিকরা, লিখিয়েরা, বাগ্মীরা সবাই এদের শোষণ-পীড়ন-দারিদ্র্যমুক্তি চায়— দাবি করে, কিন্তু ওই মুখের কথা মুখে থাকে, লেখাও থাকে স্মরণীয় হয়ে। কিন্তু মুক্তি জোটে না ওদের। সাক্ষরতা-শিক্ষাও আশ্বাসের আনুপাতিকহারে মেলে না।

বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন প্রথম স্নাতক বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যায়— এককথায় সেদিনকার ব্রিটিশ ভারত সাম্রাজ্যে। তবু তিনি চাকরি জীবনে শ্বেতকায় প্রভুর সুনজরে ছিলেন না কখনো। মানসিকভাবে তাঁর 'বসের' প্রতি আনুগত্যের অভাব ছিল। এ রাশভারী ব্যক্তির অন্তরে ছিল অহঙ্কার, অঙ্গে ছিল মুঘলাই পরিচ্ছদ। তাঁর সাহিত্যে তিনি ব্রিটিশ-বিদ্রুপের সুযোগ ছাড়েননি। 'বাঙ্গালার বাতাসে ইংরেজদিগের অর্থাপহরণ রোগ জন্মিত। ...ভারতবর্ষে যাহারা রাজ্য সংস্থাপন করেন তাঁহাদের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী মনুষ্য সম্প্রদায় ভূমণ্ডলে কখনও দেখা দেয় নাই। ...তাহারা লোভ সম্বরণে অক্ষম।' বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ভারতে আগত ইংরেজ ও তাদের মুসলিম খানসামার মতো মন্দলোক দুনিয়ায় ছিল না। খানসামারা সম্ভবত মোটা বখশিশ ছাড়া 'বসের' সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দিত না। উল্লেখ্য যে সেকালের গরু-খেকো ইংরেজের খানসামা মাত্রই থাকত মুসলমান। 'বসের' সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বঙ্কিম বছরোর্ধ্ব কাল আগেই অবসর নেন চাকরি থেকে। এসব কারণে তাঁর প্রত্যাশিত মাত্রায় পদোন্নতি ঘটেনি। এ কারণেই তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল, হয়তো ঈর্ষাও। তাই ক্রীতদাসের মতো অনুগত, স্তাবক, চাটুকার, বসের পদলেহী বিদ্যাহীন ধূর্ত মুচিরাম গুড়দের পদোন্নতিকে, রায়বাহাদুর খেতাব প্রাপ্তিকে ব্যঙ্গের হুলে ও বিদ্রুপের শূলে বিদ্ধ করেছেন সাহিত্য রচনার ছলে। এসব চাটুকারেরা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'পা টিপিতে, গা টিপিতে, তৈল মাখাইতে সুশিক্ষিত হস্ত।'

আজকের বাঙলাদেশে আপনারা স্বভাবে-চরিত্রে আচারে-আচরণে সব আলয়ে-দফতরে এমনি হাজারো মুচিরাম গুড় দেখতে পাবেন। যারা কেবল লাভ- লোভ-স্বার্থ হাসিলের জন্যে, ধূর্ততাকে পুঁজি-পাথেয় করে নানা ফেরববাজির মাধ্যমে অর্থে-সম্পদে-পদোন্নতিতে, মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্প-দাপট-প্রভাব-প্রতিপত্তিতে সমাজে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। এ পথই উচ্চাশীর আশা বা কাঙ্ক্ষা পূর্তির ঋজু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথ। তাই এ পথে ভিড়ও বেশি– প্রায় যানজটের মতোই। জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে এ ভিড় বাড়ছে।

মুখ্য কারণ সম্ভবত নিঃস্ব বেকারের সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি। দেশে বা বিদেশে এদের রোজগারের তথা কাজের ব্যবস্থা করে না দিলে মস্তানী, গুণ্ডামী, খুনখারাবি, প্রতারণা, চোরাচালান, সন্ত্রাস বাড়তেই থাকবে। এসবের স্থায়ী সমাধান নিহিত রয়েছে জনগণের সমাজতান্ত্রিক সরকারের হাতে।

নন্দিত ও শ্রদ্ধেয় হয়ে বাঁচা

আপনি অকারণে মিথ্যে গল্প, ঘটনা বানিয়ে বলতে বাল্যাবধি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, কেউ আপনাকে নিন্দা করেনি, কিংবা মুখের উপর আপনার মিথ্যাবাদিতার জন্যে আপনাকে লজ্জা দেয়নি। আপনি নিজের দেহটা যেমন জন্মাবধি বয়ে চললেও স্বরূপে তাকে দেখেননি সামগ্রিক ও সামূহিকভাবে, তেমনি আপনার সম্বন্ধে আপনার আত্মীয়-পরিজন ও পরিচিতজনেরা কি ধারণা পোষণ করে তা আপনি সারাজীবনেও জানতে পারেন না। কেননা লোকে সাধারণত সৌজন্য ও লৌকিকতা লঙ্ঘন করে অকারণে অর্থাৎ কোনো কারণে, রুষ্ট বিদ্বিষ্ট কিংবা ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ-উত্তেজিত না হলে কারো ত্রুটির কথা তার মুখের উপর বলে দেয় না। আড়ালে অবশ্যই নিন্দা করে। তেমনি আপনি যদি ঘুষখোর হন, তা হলে সামনে আপনাকে সম্মান ও তোয়াজ করলেও অন্যত্র আপনার নিন্দা করে বেড়ানোই হয় আপনার পরিচিতজনের নিত্যকার কাজ। আপনি যদি চুগলিখোর হন, তা হলে আপনি যার কানভারী করছেন অপরের দোষ-ত্রুটি অপকর্ম-অপরাধের কথা বলে, সেও আপনাকে বাহ্যত আদরকদর করছে, সোৎসাহে আপনার কথা মনোযোগ দিয়ে সানন্দে শুনছে, কিন্তু অন্তরে আপনাকে খলচরিত্রের বদমায়েশ রূপে ঘৃণা-অবজ্ঞা করে, শ্রদ্ধা করে না।

আপনি যদি শিক্ষক হিসেবে প্রত্যাশিত মাত্রায় দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন না হন, কিংবা বাঞ্ছিত মানের, মাপের ও মাত্রার জ্ঞানের ও বিশ্লেষণ শক্তির অধিকারী সুবক্তা না হন আপনার অধীত ও অধ্যাপনার বিষয়ে, তা হলে আপনি বাহ্যত আপনার ছাত্র-ছাত্রীদের সালাম-সম্মান পাচ্ছেন বটে সামাজিক-নৈতিক প্রথা-পদ্ধতি ও রীতি-রেওয়াজ মতো, কিন্তু আড়ালে আপনি উপহসিত ও নিন্দিতই হন।

আপনি ডাক্তার হিসেবে যদি অভিজ্ঞতার ও বিশেষজ্ঞদের পুঁজি নিয়ে রোগের নিদান সহজে দেখতে-জানতে-বুঝতে না জানেন, তাহলে আপনি ডাক্তার সাহেব হিসেবে মান-সম্মান পাবেন বটে, কিন্তু শক্তরোগে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার জন্যে আপনার বন্ধুজনও আপনাকে ডাকছে না, তখন আপনার বোঝা উচিত যে আপনার আত্মীয়-পরিজন-পরিচিত জনেরা আপনার চিকিৎসা-বিদ্যার উপর মোটেই আস্থা রাখে না। কাজেই এ অবস্থায় আপনার হীনম্মন্যতায় ভোগাই স্বাভাবিক, যদি আপনি বুদ্ধিমান ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি যদি উকিল-ব্যারিস্টার হন, অথচ ফৌজদারী ও দেওয়ানী কোনো মোকদ্দমারই পক্ষে-বিপক্ষে কি কি জানার, বলার ও যুক্তিপ্রয়োগের সূত্রগুলো রয়েছে, কাগজে চোখ বুলোনোর সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মনে না জাগে, তা হলে মামলা-লড়ায় আপনার যোগ্যতা-দক্ষতা মক্কেলের কাছে কখনো স্বীকৃত হবে না। আপনি কখনো প্রখ্যাত আইনজীবী হবেন না।

আপনি যদি লেখক হন, শুধুই সর্বক্ষণ বা সারাজীবন লিখে লিখে বহু বহু কাব্য-গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ কিংবা, দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে বই লেখেন, সেসব গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায়-ভাষায়-ভঙ্গিতে এবং পড়ে শেখার-জানার-ভাবার-বোঝার মতো চমকপ্রদ, জিজ্ঞাসা মেটানোর মতো, অবোধ্যকে বোধগত করার মতো, অভাবিতকে অনুভব-উপলব্ধিগত করার মতো প্রত্যাশিত স্তরের না হয়, তা হলে আপনি জীবৎকালেও পরিচিতজনদের বই উপহার দিয়ে পড়ে দেখতে আগ্রহী করতে পারবেন না। আপনার নিজের শক্তি সম্বন্ধে নিজের একটা ধারণা না থাকলে আপনি কেবল নির্বোধের স্বর্গেই বাস করবেন। আমরা অধিকাংশ লেখকরা এমনি নির্বোধের স্বর্গে বাস করি সারাজীবন, আমরা যে অবহেলিত, উপহসিত, তাচ্ছিল্য পাওয়া অস্বীকৃত অনন্দিত লেখক, তা কেউ মুখের উপর কখনো বলে ফেললেও আমরা আত্মপ্রত্যয় হারাই না। এ আত্মবিশ্বাসটাই হচ্ছে অন্ধত্ব কিংবা মূর্খতা। এমনিভাবে নির্বোধের স্বর্গে বাস করেন ভেজালদাতা, চোরাকারবারি, সততাহীন কারখানাদার, দোকানদার, সওদাগর কিংবা চাকুরে, আমলা, পার্ষদ, পরিষদ, সাংসদ, মন্ত্রী, নানা পেশার আদর্শহীন চরিত্রহীন মদে-মাগে-অপরাধে, জুয়ায়-জোচ্চুরিতে আসক্ত ব্যক্তিরাও।

যে কেবল নিজের ও নিজের পত্নীসন্তানের জন্যে বাঁচে, প্রতিবেশীর সুখে-দুঃখে অবিচল থাকে, পরার্থে বাঁচে না, সে কারো ভালোবাসা পায় না। তার মৃত্যুতে পড়শীরা যদি না বলে 'আহা একজন ভালো লোক মারা গেল', কিংবা 'লোকটা ভালোই ছিল', তা হলে তার বাঁচাটা বৃথাই। কিন্তু যাঁরা সমাজে তাঁদের বিশেষ কৃতি-কীর্তির জন্যে বিখ্যাত এবং মৃত্যুর পরেও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন রাজনীতি-সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের, আবিষ্কার-উদ্ভাবনের, জনসেবার অথবা বৃহৎ-মহৎ কোনো কর্মের জন্যে তাঁদের অবজ্ঞেয় নিন্দিত হবার মতো কোনো আদর্শিক, চারিত্রিক, নৈতিক, সামাজিক, আর্থিকজীবনে স্বদেশ স্বজাতি স্বরাষ্ট্র স্বসমাজ কিংবা মানবতার মানবিকতার অপকর্ষজ্ঞাপক কোনো কিছু করা উচিত নয় লাভের লোভের স্বার্থের ফাঁদে পড়ে। কারণ কৃতি-কীর্তিমানদের অপকর্ম-অপরাধ, কার্পণ্য, মিথ্যাভাষণ, মদ-মাগ-জুয়া, ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা, অর্থগৃধ্নুতা, ভীরুতা, সুবিধে-সুযোগসন্ধিৎসা, আদর্শভ্রষ্টতা, পদ-পদবীলোভে দলছুট হওয়া অথবা আত্মোন্নয়ন লক্ষ্যে চাটুকারিতা, স্তাবকতা প্রভৃতি পরিহার করে চলা আবশ্যিক, নইলে জনগণের কাছে শ্রদ্ধেয় ও নন্দিত থাকা সম্ভব হয় না। এমনি গুরুত্বপূর্ণ লোকদের তথা কৃতী-কীর্তিমান ব্যক্তিত্বকে ইতিহাস ভুলে না বলেই চুলচেরা বিচারে তাঁকে স্বরূপে দেখতে, জানতে ও বুঝতে চায়, তাই যতই দিন যায় তাঁর মৃত্যুর পরে, তাঁকে ততই স্বরূপে অ্যানাটমিক-ফিজিয়োলজিক পদ্ধতিতে যাচাই-বাছাই-ঝাড়াই করে ইতিহাসে জিইয়ে রাখে। কৃতী ও কীর্তিমান ব্যক্তি যদি ত্রিগুণের অধিকারী হন, তাহলেই জাতীয় জীবনেও চরিত্রে-সংস্কৃতিতে উৎকর্ষ সম্ভব হয়, সে-ত্রিগুণ হচ্ছে ইনটেলেক্ট, ইন্টেগ্রিটি ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারেজ [Intellect, Integrity and Courage] আদর্শব্যক্তির ও ব্যক্তিত্বের ষড়গুণ থাকা আবশ্যিক: সংযম, পরমত-পরকর্ম-পরআচরণ সহিষ্ণুতা, সৌজন্য, যুক্তিনিষ্ঠা, ন্যায্যতাবোধ ও বিবেকানুগত্য– এমনি মানুষ আত্মসত্তার মূল্য-মর্যাদা সচেতন হন, মানবতার-মানবিকতার তথা মনুষ্যত্বের অনুশীলনকে এ মানুষ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। নিন্দিত ও অবজ্ঞেয় হয়ে নয়, নন্দিত ও শ্রদ্ধেয় হয়েই পরিবারের পরিজনের ও পরিচিতজনের মধ্যে জীবন যাপনেই রয়েছে মর্ত্যজীবনের সার্থকতা।

চিন্তার চাষ

আমরা ঐতিহ্য গর্বে গর্বিত। আমরা স্বাধীনতা এনেছি, ভাষা-সংগ্রাম করেছি, আমাদের স্বার্থবিরোধী শিক্ষা কমিশন বানচাল করেছি, উনসত্তরে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছি, মুক্তিযুদ্ধ করে লক্ষ লক্ষ জীবনের ও মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে দেশকে, জাতিকে স্বাধীন করেছি, স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মালিক হয়েছি, স্বৈরাচারী জঙ্গী শাসক এরশাদকে বিতাড়িত করে গণবাঞ্ছিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও চালু করেছি। আমাদের মধ্যে এখন বিদ্বান-বুদ্ধিমান, জ্ঞানী-গুণী, স্থপতি-ভাস্কর-চিত্রী-কবি-ডাক্তার-উকিল-বড় বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি করগণ্য হলেও দুর্লভ নয়। কাজেই আমাদের গৌরবের-গর্বের অন্ত নেই। ফলে আমরা অতীতের ঐতিহ্যের স্মৃতি রোমন্থনে নিপুণ ও অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আজো রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ও রক্তদানের আর মুক্তিযুদ্ধে প্রাণদানের কথা স্মরণ করি, আর প্রতিদিনই ইতিবৃত্তরূপে, নাটকরূপে, স্মৃতিকথারূপে, গল্প-কবিতা-গানরূপে আর উপন্যাস আকারে আমরা অনেক অনেক বড়-ছোট-মাঝারি বই লিখেছি, ছেপেছি, পড়েছি, গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় যে স্তরেরই হোক না কেন! আমাদের নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুন সৃষ্টির নমুনা মেলে না সহজে কারো মধ্যে।

কিন্তু আমরা ভেবে দেখি না ক্ষুধা-তৃষ্ণা যেমন রোজ বারবার মেটাতে হয়, তেমনি ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক, শৈল্পিক, সাংস্কৃতিক, সরকারী ও রাষ্ট্রিক জীবনে প্রতিদিন নব নব উদ্যমে, নব নব উদ্যোগে, নব নব আয়োজনে, নতুন নতুন চিন্তা প্রয়োগে, মন-মগজ-মনন-মনীষার নিয়মিত সযত্ন অনুশীলনে দেশ-জাতি-রাষ্ট্র-মানুষ প্রভৃতির সামগ্রিক, সামূহিক ও সামষ্টিক উন্নয়ন-উৎকর্ষ সাধন করতে হয়। পিতৃধনের ক্ষয় আছে, বৃদ্ধি নেই, পুরাতন জৌলুস হারায়, নতুনে থাকে উপযোগ, প্রয়োজন পূরণের শক্তি, চাহিদা মেটানোর যোগ্যতা, আর থাকে মনোহারী চাকচিক্য।

আমাদের চারদিককার শিক্ষিত শহুরে লোকদের দেখে মনে হচ্ছে, আমরা মানসক্ষেত্রে দেউলে হয়ে যাচ্ছি, আমরা এখন কেবল সসন্তান নিজের জন্যেই বাঁচাকে জীবনের পরম ও চরম তত্ত্ব বলে মেনে নিয়েছি। আমরা বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে, শিল্পে, ইতিহাসে আমাদের নিজেদের দানে-অবদানে, কৃতিত্বে-কীর্তিতে ধন্য হবার লক্ষ্যে কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার উদ্যম-উৎসাহ পাইনে যেন, এভাবে একটা জাতি উঠতে, টিকে থাকতে পারে না, আগেও পারত না, আর এ যুগেও শৈল্পিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতাসঙ্কুল আর্থ-বাণিজ্যিক সম্পদের ও বিজ্ঞানের প্রসাদপুষ্ট জগতে ও সমাজে অজ্ঞ-অনক্ষর-অসমর্থ-অলস থেকে অর্থে-যন্ত্রে-পণ্যে নিশিদিন পরাধীন ও পরনির্ভর এবং পরের চিন্তা-চেতনা, মন-মগজ-মনন-মনীষার ফুল-ফল-ফসলকে জীবনের সম্বল করে কাল কাটালে আমরা কখনো দীনতা-হীনতা, পরাধীনতা বা পরনির্ভরতা ঘোচাতে পারব না।

আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে উচ্চাশী হয়ে মন-মগজ-মনন-মনীষা প্রয়োগে নতুন নতুন উদ্ভাবনে, আবিষ্কারে, সৃষ্টিতে, নির্মাণে প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোর মতো হবার চেষ্টা করতে হবে। তার জন্যে প্রথমেই আর্থিক সামর্থ্য অর্জন এবং শৈল্পিক যোগ্যতা আয়ত্ত করা আবশ্যিক ও জরুরি। এর জন্য অবশ্য রাজনীতিকদের মগজী যোগ্যতা, উদ্যম, উদ্যোগ, অঙ্গীকার ও নিষ্ঠা দরকার। আমরা আমাদের বনজ, খনিজ ও কৃষিজ উপাদান-উপকরণের সঙ্গে আমদানীকৃত উপকরণের প্রয়োগে উৎপাদনে ও নির্মাণে আমাদের পণ্য-বাজার দখল করতে হবে দেশের অভ্যন্তরে ও বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে।

অতএব, আমাদের কেবল প্রকাশ্যে-গোপনে অর্থ-সম্পদ অর্জন করে গাড়ি-বাড়ির মালিক হয়ে আহারে-বিহারে, বিলাসে, ব্যসনে, ভোগে-উপভোগে সম্ভোগে ব্যক্তিক বা পারিবারিক জীবন যাপনে তুষ্ট, তৃপ্ত, হৃষ্ট ও পুষ্ট থাকলে চলবে না; দেশ, রাষ্ট্র, জাতি ও মানুষের কথাও ভাবতে হবে, তারা যেন দীনহীন, 'সুখহীন, নিশিদিন পরাধীন' না থাকে। তাই আমাদের রাষ্ট্র যেন স্বনির্ভর ও স্বয়ম্ভর হয়— বিত্তে-বেসাতে-জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, মৌলিক চিন্তা-চেতনায় যেন সৃষ্টিতে-উদ্ভাবনে আবিষ্কারে ধন্য হয়, সে-চেষ্টাই আমাদের করতে হবে।

AMARBOI.COM

মৌলবাদ

মূলানুগত্যের তথা শাস্ত্রকে নিষ্ঠার সঙ্গে আক্ষরিকভাবে মেনে চলার অঙ্গীকারের, সংকল্পের ও বাস্তবে রূপায়ণের নাম মৌলবাদ। শাস্ত্রকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করলে শাস্ত্রবৃক্ষ ধরে থাকার নাম অর্থাৎ দেশের কালের বিবর্তন, পরিবর্তন আর চাহিদার রূপান্তর অস্বীকার করে আবর্তনকে দেহে-প্রাণে-মনে-মগজে-মননে ধরে রাখার, অনুশীলনে আচারে আচরণে চালু রাখার নাম মৌলবাদিতা। যেহেতু শাস্ত্র মাত্রই ঐশ এবং চিরন্তন সত্য ও কল্যাণকর এবং সমস্যা-সঙ্কট মুক্তির দিশারী, সেহেতু শাস্ত্রানুগত্য রক্ষণশীলতার, দেশের, কালের, প্রজন্মের, প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতার অস্বীকৃতিরই নামান্তর। নাস্তিক-নিরীশ্বর-সমাজবাদী এবং নতুন চেতনার-চিন্তার ধারক, উদ্ভাবক, আবিষ্কারক আর উপযোগবাদী প্রগতিশীল উদার মননশীল ব্যক্তিরা নতুন প্রজন্মের ও দেশ-কালের দাবি লঙ্ঘন ও উপেক্ষা করে বলেই মৌলবাদকে মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির নয় শুধু, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রারও বিঘ্ন বলেই মনে করে। তাই তারা মৌলবাদবিরোধী। প্রগতিবাদীরা, বিজ্ঞানমনস্করা, প্রকৌশল-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রযুক্তি-যন্ত্র ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের তথ্য, তত্ত্ব ও সত্য অস্বীকৃতির দরুন মৌলবাদীদের অবজ্ঞা করে।

এ কালে মানে উনিশ শতকের শেষপাদে সম্ভবত ফরাসী দেশে 'মৌলবাদ' বা ফান্ডামেন্টালিজম তত্ত্বের উদ্ভব। এর লালন নাকি ব্রিটেনেই। কিন্তু প্রথম 'মৌলবাদ' নিয়ে সম্মেলন হয় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে। এভাবে মৌলবাদের বীজ অঙ্কুরিত হয় ফ্রান্সে, লালিত হয় ব্রিটেনে এবং রাজনীতিক কূটনীতিক চাল হিসেবে বিশ্ব রাজনীতিতে ও তৃতীয় বিশ্বে প্রযুক্ত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি হিসেবে।

এখন মৌলবাদ বিশ্ব রাজনীতিতে ক্যান্সারের মতোই শিকড় ছড়াচ্ছে সর্বত্র। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এখন আর এ ব্যাধি থেকে মুক্ত নয়। আমাদের উপমহাদেশে মুসলিম সমাজে মওদুদীবাদীরা, হিন্দুসমাজে হিন্দু ঐতিহ্যবাদী বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ, শিবসেনা, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী পার্টি (বিজেপি), বজরঙ, নাগা সন্ন্যাসী সঙ্ঘ প্রভৃতি সঙ্ঘ পরিবার এবং উত্তর আফ্রিকার ও পশ্চিম এশিয়ার মৌলবাদীদের মতো এখন ইন্দোনেশিয়ায়-মালয়েশিয়ায় তা ক্যান্সারের শিকড় বিস্তার করে রাজনীতি-প্রশাসন-সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারায় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে ও করছে কিংবা করতে অঙ্গীকার ও সংকল্পবদ্ধ হচ্ছে। বাঙলাদেশী মওদুদীপন্থী মৌলবাদীদের সঙ্গে অর্থোডক্স তথা শাস্ত্রের দেশে-কালে-প্রজন্মে পরিবর্তন বিরোধীরা রবোটের মতো বন্ধ্য মনের-মননের মানুষেরা এবং যুক্তি প্রয়োগে অনীহ সৎ ধার্মিকেরাও যারা শাস্ত্রের চিরন্তনতায় আস্থাবান এবং জীবনের সর্বপ্রকার সমস্যা-সঙ্কট সমাধানের সামর্থ্যের ও সমাধানের আকরই শাস্ত্র– এ মতবাদীরাও জুটেছে। ফলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে-আচারে-আচরণে শাস্ত্রের উপযোগ অস্বীকৃতি ও উপেক্ষা সহ্য করেন না তাঁরা, যদিও নিজেরাও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি যন্ত্রনির্ভর জীবনে অনিচ্ছায় লঙ্ঘন ও উপেক্ষা করা আবশ্যিক ও জরুরি বিধায় লঙ্ঘন ও উপেক্ষা করে থাকেন দায়ে পড়ে। হাসপাতালে নার্সের, টিভিতে বেগানা নারীর ভাষণ-অভিনয়, বিমানে বেগানা তরুণীর সেবা গ্রহণ করছেনই। তাছাড়া সহশিক্ষা, সহচাকরি, সহসাংসদী, নারীর শাসনে-প্রশাসনেও জীবনে যাপন করছেন। পৃথিবীর সব শাস্ত্রপন্থীই আজ বিজ্ঞানের প্রসাদে শাস্ত্র কমবেশি জীবনের সর্বক্ষেত্রে উপেক্ষা করছেন। তবু এঁরা শাস্ত্র নিয়ে রাজনীতির নামে প্রগতির পথে বৃথা জেনেও বিঘ্ন সৃষ্টি করছেন। উজান স্রোতে যাত্রা ব্যর্থ হবেই। কারণ তা দেশের, কালের ও প্রজন্মের চাহিদাবিরোধী। আগেই বলেছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও এখন বার্টন প্রমুখ গোঁড়া খ্রিস্টানরা পুরোনো ও নতুন টেস্টামেন্ট অনুগ শাসন দাবি করছেন মানুষের নৈতিক চরিত্র উন্নয়নের লক্ষ্যে। গণতান্ত্রিক অধিকার বা স্বাধীনতা চান না। মৌলবাদীর আন্দোলন পারত্রিক কল্যাণ লক্ষ্যে আধ্যাত্মিক নয়, তা ইহজাগতিক, সামাজিক ও মতলবী রাজনীতিক উপসর্গমাত্র। হয়তো মার্কিন মৌলবাদীরা ইউনাইটেড স্টেটসকে ফেডারেল স্টেটস করতে আন্দোলন করবে। কিন্তু বিজ্ঞানের ও যুক্তিবাদের প্রসার তাঁদের সাফল্যের পথে অপ্রতিরোধ্য বাধা হয়েই থাকবে। প্রতি প্রজন্মে সমাজের মনন-চিন্তন বদলায়, তাই দেশ-কাল-জীবনের চাহিদাও নতুন রূপ নেয়। পুরোনো নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি উপযোগরিক্ত বলে বর্জিত হয়, গৃহীত হয়, চালু হয় নতুন নীতি-রীতি-পদ্ধতি। জীবনযাত্রার ধরন বদলায়, বদলায় তৈজস-আসবাব-পোশাক আর খাদ্যও। এর নামই বিবর্তন, পরিবর্তন, অগ্রগতি, প্রগতি এবং প্রাগ্রসরতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্গে বিভক্ত মনীষা তার রাজনীতিক আর্থিক ও সাংস্কৃতিক প্রকাশ

মানুষের মন ও মগজ এক অমিত শক্তিধর বিচিত্র চেতনা-চিন্তাপ্রসূ কল। মানুষ এ মন-মগজের অনুশীলন করে না। ক্বচিৎ কোথাও কেউ কেউ করেছেন এবং করেন। তাতেই এ প্রায় ছয় সাত হাজার বছরের চেতনা-চিন্তার ফুল-ফল-ফসল রূপে দেদার সত্য-মিথ্যার মিশ্রণে কল্পনার ও প্রাতিভাসিক তথ্যের ভেজালে তৈরি নানা তত্ত্ব, তথ্য, সত্য, শাস্ত্র ও নীতি-নিয়মরূপে মানুষকে লৌহকঠিন খাঁচার মধ্যে ধরে রেখেছে। দেহে-প্রাণে-মনে ভীরু মানুষ বাছাইয়ে বর্জনে-অর্জনে বিমুখ থেকে প্রাজন্মক্রমিক বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায় চালিত গতানুগতিক অভ্যস্ত আচারে-আচরণে ও চিন্তার কর্মে আত্মতৃপ্ত, তুষ্ট-পুষ্ট থেকেছে– থাকে। ক্বচিৎ কেউ বাছাই-বর্জন ও অর্জন করার জ্ঞান-প্রজ্ঞা, সাহস-শক্তি, যুক্তি-বুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে পুরোনোকে উপযোগরিক্ত, তথ্যশূন্য তত্ত্বভ্রষ্ট, সত্যচ্যুত বলে বর্জন করে নতুন তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য মন-মগজ-মনন-মনীষার পুঁজি প্রয়োগে অর্জন করে। তবু যেহেতু এ কেবল চেতনার-চিন্তার অনুভবের ও উপলব্ধির প্রসূন, অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই এর উৎস ও ভিত্তি, সেজন্যে কোনো দুজনের মতের মধ্যে গুণে-মাপে-মানে-মাত্রায় অভিন্নতা মেলে না। চেতনার ও চিন্তার বৈচিত্র্যই, বিভিন্নতাই সংস্কৃতি-সভ্যতায়ও এনেছে পার্থক্য, বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য।

সাধারণভাবে শিক্ষিতরা হচ্ছে 'ইন্টেলিজেন্টশিয়া' আর মনীষীরা হচ্ছেন 'ইন্টেলেকচুয়াল'। বাঙলায় ইন্টেলিজেন্টশিয়াদের বলা হয় 'বুদ্ধিজীবী'। শব্দটা পরিভাষা হিসেবে স্বীকৃত, গৃহীত ও সর্বজন ব্যবহৃত বটে, তবে যেহেতু জীব-উদ্ভিদ সবাই বুদ্ধি দিয়েই আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তার করে, সেহেতু বুদ্ধিজীবী তাৎপর্যরিক্ত পরিভাষা। বরং মানসিক বা মগজী শ্রমজীবী হিসেবে এদের মগজী বা মস্তিষ্কজীবী বলে অভিহিত করলে কিছুটা অর্থজ্ঞাপক হতো। আসলে শিক্ষিত সাফকাপুড়ে মাত্রই সরকারী চাকুরে না হলেই সাধারণভাবে 'বুদ্ধিজীবী' বর্গের অন্তর্গত হয়ে যায়। ডাক্তার, প্রকৌশলী, আইনজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী সবাই বিশেষ করে যারা কাগুজে বিবৃতিতে সই করে, মেঠো বক্তৃতায় অংশ নেয় কিংবা মিলনায়তনে প্রেক্ষাগৃহে সেমিনারে সভায় ভাষণ দেয় এবং প্রয়োজনে গা-পা বাঁচিয়ে মিছিলে শামিল হয় স্বল্পক্ষণের জন্যে, তারাই 'বুদ্ধিজীবী' আখ্যা পেয়ে থাকে। আর একটি পরিভাষাও ভুল সেটি 'চিন্তাবিদ কিংবা শিক্ষাবিদ'। বিদ মানে বিদ্যা, জ্ঞান যার আছে সে ব্যক্তি। চিন্তাবিদ বা শিক্ষাবিদ মানে দাঁড়ায় যিনি বিভিন্ন ধরনের চিন্তা বা শিক্ষা সম্বন্ধে জানেন। অথচ আমাদের উদ্দিষ্ট অভিধা হচ্ছে চিন্তক বা চিন্তাশীল, শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তক বা শিক্ষার নতুন পথ-পদ্ধতি সম্বন্ধে চিন্তাশীল। কাজেই চিন্তক 'বিশিষ্ট চিন্তাবিদ' নয়, বরং বিশিষ্ট চিন্তাশীল।

যেহেতু সবলোক নতুন চেতনায়-চিন্তায় প্রবুদ্ধ নয়, কেবল কোনো কোনো জিজ্ঞাসু, পুরাতনের উপযোগরিক্ততায় বিরক্ত, স্বীকৃত তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে, বিশ্বাসে, সংস্কারে ও ধারণায় আস্থাহীন এবং বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থাবান এবং বাছাইয়ে-বর্জনে ও অর্জনে গ্রহণে আগ্রহী, উদ্যোগী ও সাহসী, তারাই কেবল নতুন চেতনার, চিন্তার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের, সৃষ্টির শক্তি এবং সত্য প্রচারের সাহস ও শক্তি রাখেন, পুরোনো নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি, বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আচার-আচরণ বর্জনের সাহস রাখেন। এমনি জ্ঞান-প্রজ্ঞা, যুক্তি-বুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা, শক্তি-সাহস, উদ্যম-উদ্যোগ অঙ্গীকারে প্রাণিত ব্যক্তিদেরই অবদানে আজকের বিশ্বের সংস্কৃতি-সভ্যতার, চেতনার-চিন্তার, প্রগতির-প্রাগ্রসরতার প্রবাহ অপ্রতিরোধ্য রয়েছে, বিঘ্নিত হয়ে হয়েও এগিয়ে নেয়ার পথ করে নিয়েছে।

গত শতক থেকে আজ অবধি বাঙলাভাষীদের মনে-মগজে-মননে গাঢ়-গভীর প্রভাব বিস্তার করেন সাধারণভাবে কোলকাতার মনীষীরা। আজকের কোলকাতায় মনীষারা কয়েক বর্গে বিভক্ত। এঁদের চিন্তাধারাও রূপে ঢঙে দিশায় লক্ষ্যে বিবিধ ও বিচিত্র। একটি ধারা হচ্ছে গান্ধী-রবীন্দ্র চিন্তা প্রভাবিত ও গান্ধী-রবীন্দ্র দর্শনের খাতে প্রবহমান, অন্য একটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ দর্শনের অনুসারী, তৃতীয়টি বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য প্রভাবিত নাস্তিক্য ধারা– এ ধারায় মানবেন্দ্রনাথ রায়ের পরোক্ষ ক্ষীণপ্রভাব থাকলেও মুখ্যত য়ুরোপীয় নাস্তিক্য দর্শনের প্রভাবই গাঢ়, গভীর ও ব্যাপক। চতুর্থটি হচ্ছে মার্কসবাদের প্রভাবজ ধারা, এর যুক্তি ও শক্তি বাড়িয়েছে মর্গ্যান-ফ্রেজার, ডারউইন, ফ্রয়েড, ইয়ং, পাভলভ। আর এ কালের পদার্থবিজ্ঞানে প্লাঙ্ক, আইনস্টাইন, জ্যোতির্বিজ্ঞানে স্টিফেন উইনস্টন হকিং প্রমুখের নতুন বিশ্বতত্ত্ব। পঞ্চমটি হচ্ছে শূদ্র-শক্তি ভারতব্যাপী স্বাধিকার সচেতন শূদ্রদের স্বাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠ হওয়ার লক্ষ্যে অন্ত্যজ শূদ্রের আর্থিক, আত্মিক ও সামাজিক মুক্তিসংগ্রামী চিন্তানায়ক ডক্টর ভীমরাও রামজী আম্বেদকরকে নতুনভাবে প্রেরণার ও প্রণোদনার উৎস করে কাশীরামের নেতৃত্বে অঙ্কুরিত ভারতময় শূদ্রদ্রোহ চিন্তায়, চেতনায় ও বাস্তবে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কালান্তরে যন্ত্রচালিত জীবন-জীবিকা প্রভাবিত জীবনযাত্রায় গান্ধী-রবীন্দ্র দর্শন এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রভাব অবশ্য যথাশিগগির লোপ পাবে প্রাত্যহিক জীবনে উপযোগরিক্ত হয়ে যাচ্ছে বলেই।

নাস্তিক্য-নিরীশ্বরতা বৃদ্ধি পাবে আর বিকল্পহীন বলেই মার্কসবাদ গণতান্ত্রিক সংবিধান অনুগ ব্যবস্থায় গোটা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে। বিশেষ করে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার দরিদ্র তৃতীয় বিশ্বে। এ সাধ ও স্বপ্ন নয়, আগাম আন্দাজ মাত্র।

পশ্চিমবঙ্গে গান্ধী-রবীন্দ্রভক্ত মনীষী অন্নদাশঙ্কর রায় কিংবা অম্লান দত্ত যেমন আছেন, মার্কসবাদী মনীষী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যেমন রয়েছেন, নিরীশ্বর ও মানবেন্দ্রনাথের র‍্যাডিক্যাল হিম্যানিস্ট শিবনারায়ণ রায় যেমন আজো প্রচারপ্রবণ, তেমনি পাভলভ তত্ত্ব প্রচারক ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও আছেন। মার্কসবাদে ও বিজ্ঞানের তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থাবান নাস্তিক, নিরীশ্বর য়ুরোপ-আমেরিকার মতো কোলকাতায়ও সংখ্যায় বেড়ে চলেছে। ঢাকায়ও নাস্তিক-নিরীশ্বর নিতান্ত নগণ্য নয়, কিন্তু ভীরু বলে আত্মপ্রকাশ করে না। এ জন্যেই তাদের নাস্তিক্য নিষ্ফল। কেননা তাদের প্রভাবে চেতনার, চিন্তার, মনের, মননের, সংস্কৃতির, সমাজের কোনো পরিবর্তন সম্ভব হয় না। দেশ এগোয় না, মানুষের অভ্যস্ত বিশ্বাস-সংস্কার-আচার-আচরণ-রক্ষণশীলতা ঘোচে না। পরমত ও পরআচরণ সহিষ্ণুতা বাড়ে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বীকার করতেই হবে যে উপর্যুক্ত সব মতবাদীরই একটা বিশেষ ধরনের গুণের মানের মাপের ও মাত্রার সংস্কৃতি, সহিষ্ণুতা ও সৌজন্য আছে। কিন্তু অর্থোডকস্ বা গোঁড়া আক্ষরিকভাবে শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মানা রক্ষণশীলরা এবং রাজনীতিক সুবিধেবাদী আদর্শ-বিমুখ নীতিবোধশূন্য ও চরিত্রহীন এবং রাজনীতিক সংস্কৃতিরিক্ত মৌলবাদীরা বা ফান্ডামেন্টালিস্টরা সমাজে ও রাষ্ট্রে শরীরের দুষ্টক্ষতের মতো জনগণের মানস স্বাস্থ্যের রোগজীবাণু বিশেষ।

বিদ্যায় বিত্তে ধনে মানে দর্পে দাপটে প্রভাবে প্রতিপত্তিতে প্রবল হলেও বাস্তবে বর্ণ হিন্দুরা ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যালঘু। শূদ্ররা অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে আঁতাত করলে দিল্লীর সরকার বর্ণহিন্দুর কবলমুক্ত হয়ে যাবে চিরকালের জন্যেই। তাছাড়া ভারতে আজ দিকে দিকে সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীক স্বাতন্ত্র্যচেতনা প্রবল হয়ে উঠেছে। পূর্বপ্রান্তের সাতরাজ্যে মঙ্গোল ও খ্রীস্টানদ্রোহ সন্ত্রাসী ও সশস্ত্র গেরিলাযুদ্ধের রূপ নিয়েছে, নাগা, কুকি, বড়ো, খাসিয়া, মণিপুরী, ত্রিপুর প্রভৃতি সব পার্বত্য ও আরণ্য গোত্রগুলো আজ ভারত-বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করতে প্রয়াসী। ওদের যুক্তি ওরা ধর্মে, রক্তে, সংস্কৃতিতে ও ভৌগোলিক অবস্থানে ভারতীয় ছিল না কখনো, এখনো নয়; কাজেই ভারত কেন সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তি প্রয়োগে তাদের শাসন-শোষণ করবে? দক্ষিণ ভারত হিন্দি গ্রহণ করবেই না, উর্দুতো নয়ই। কাশ্মীরীরা মুসলিম, কাজেই তারা হিন্দু-ভারতে যুক্ত থাকবেই না, এ অবস্থায় ভারত অখণ্ডভাবে সহযোগিতায়-সহাবস্থানে টিকে থাকতে পারে কেবল কনফেডারেসি বা শিথিল ফেডারেশন গঠন করেই এবং তা সম্পর্ক তিক্ত ও ক্রোধদুষ্ট হওয়ার আগেই এখনই করা শ্রেয়। বৃহৎ রাষ্ট্র ভারতপরিবেষ্টিত বাঙলাদেশ রাষ্ট্রও ভারতের সঙ্গে সহযোগিতায় সহঅবস্থানে আর্থিকভাবে অর্জন বাড়াতে পারে সহজেই এবং সামরিকভাবেও হতে পারে নিশ্চিত।

আমরা জানি ভারতের পূর্বাঞ্চলের সাতটা রাজ্যই নদীপথ তথা সমুদ্রবন্দর বঞ্চিত। বাঙলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর হচ্ছে সাড়ে তিন/তিন হাজার বছরের পুরোনো আন্তর্জাতিক বন্দর। কাজেই পূর্বভারতকে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি-রফতানি করার সুযোগ দিলে, কোটি কোটি টাকা শুল্ক হিসেবে অর্জিত হবে বিনা পুঁজিতে। তেমনি ফারাক্কা বাঁধ যে আমাদের রাজশাহী বিভাগকে খরায়, বন্যায় আর্থিক ও পরিবেশিকভাবে পঙ্গু করে তুলেছে, তা-ই নয়, পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলাকেও ভাঙনের ও প্লাবনের কবলে ফেলেছে। ফারাক্কা বাঁধের বাঞ্ছিত ও প্রত্যাশিত সুবিধে থেকেও পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত হয়েছে। ভাগীরথীতে প্রত্যাশিত পরিমাণে পানি মেলে না। আর হুগলী নদীতে আমাদের 'সারা সেতু' অঞ্চলের পদ্মা নদীর মতো চরা পড়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় যদি ভারতকে বলা যায় যে ফারাক্কা বাঁধ ভেঙে দিয়ে স্বল্প শুল্কে আমাদের মঙ্গলাবন্দরে পণ্য আদান-প্রদানের জন্যে আন্তর্জাতিক নীতি-নিয়মে ব্যবহার করতে, তাহলে আমরা আমাদের উত্তরবঙ্গকে যেমন খরা-বন্যার কবল মুক্ত রাখতে পারব, তেমনি আমরা নেপালের, ভুটানের ও পশ্চিমবঙ্গের 'পণ্য' সামগ্রীর শুল্ক হিসেবে কোটি কোটি টাকা বিনা পুঁজিতে আয় করব এবং আমাদের কয়েক হাজার শ্রমিক ও যানবাহনও আয়ের নতুন পথ খুঁজে পাবে। এভাবে বাঙলাদেশ বিশ্বব্যাঙ্কের, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের ও ধনী রাষ্ট্রের ঋণ, দান, অনুদান ও ত্রাণ গ্রহণের গ্লানি, আনুগত্য ও লজ্জা থেকেও কিছুটা হলেও রক্ষা পাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরুপদ্রুত সুন্দর জীবনের ও সমাজের অন্বেষা

জীবন-চর্চা আদর্শে, উদ্দেশ্যে ও বাস্তবে একরূপ শিল্পের অনুশীলনই, সংস্কৃতি চর্চাই। জীবনকে শিল্পসুন্দর করাই ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা জীবন একটা সম্পদ। সৌন্দর্যের, মাধুর্যের, সুখের, আনন্দের, রুচির, শান্তির ও সংস্কৃতির উৎস, ভিত্তি এবং বিষয় ও অবলম্বন হচ্ছে এ জীবন। কিন্তু সবার জীবন-যাপন চেতনায় এ বোধের উদয়ই হয় না। তারা প্রাণীর বৃত্তি-প্রবৃত্তি অনুগ লাভ-লোভ-স্বার্থবুদ্ধি ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণে নিয়োজিত রাখে। জীবন কেবল জীবিকা অর্জনে ব্যয় করার বা অপচিত করার মতো তুচ্ছ সম্পদ নয়।

জীবনে আহার-নিদ্রা-মৈথুন প্রাণীর জৈব চাহিদা পূরণ করে মাত্র। তা মনুষ্য জীবনে অপরিহার্য হলেও, তা জীবনযাপনের তথা মর্ত্যজীবনের লক্ষ্য হতে পারে না কোনো ব্যক্তির। মানুষ আহারে-বিহারে-বিলাসে-ব্যসনে-উৎসবে-পার্বণে- ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে সুরুচি, সৌন্দর্য, মাধুর্য, সংযম, সহিষ্ণুতা, সৌজন্য, যুক্তিনিষ্ঠা, ন্যায্যতা ও বিবেকানুগত্য প্রভৃতি লঙ্ঘন করবে না– ব্যক্তিমানুষের এবং সমাজসদস্য মানুষের কাছে এমনি গুণ প্রত্যাশিত থাকে। কিন্তু দাসপ্রথা বিলুপ্ত হলেও সাধারণ শক্তিমান বুদ্ধিমান ধূর্ত প্রবল ব্যক্তি দুস্থ দুর্বল মানুষকে শাসনে শোষণে পীড়ণে বঞ্চনায় প্রতারণায় অনুগত ও অনুগামী রাখতে চায়– তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে দুস্থ দরিদ্রদের অন্নে-বস্ত্রে কাঙাল রেখে। নিঃস্ব নিরন্ন জীবনযন্ত্রণায় ক্লিষ্ট শ্রমজীবী ভিক্ষাজীবী মানুষ নিদ্রার আর মৈথুনের সুখ থেকেও বঞ্চিত হলে হাজারে হাজারে আত্মহত্যায় ভব-যন্ত্রণার অবসান ঘটাত হয়তো, অথবা বিদ্রোহে বিপ্লবে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হতো। দরিদ্র শ্রমজীবীদের জন্ম যেন কিছুই ভোগ করতে নয়, অন্যের ভোগ্য-উপভোগ্য-সম্ভোগ্য তৈরি করতেই। শ্রমজীবী মানুষেরা যেন গৃহস্থের গরু-মোষ-গাধা-ঘোড়া-হাতির মতো ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে পৃথিবীতে মানবাকৃতি নিয়ে জন্ম নেয়। বিদ্যায়-বিত্তে প্রবলদের চিত্তে এ ধারণাই আজো অটুট, তাই সমাজবাদ মানববাদবিরোধী এবং বৈষম্যবাদী তারা।

অবশ্য এমনি ধারণা ও রুচি জীবন সম্বন্ধে অর্জন করা অজ্ঞ-অনক্ষর-দুস্থ-দরিদ্র এবং শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সভ্যতায় পিছিয়ে পড়া সমাজের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন কালো আফ্রিকায় কিংবা প্রান্তিক অঞ্চলবাসী আদিবাসীর উপজাতির জনজাতির মধ্যে এমনি মানসবিকাশ, সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ ও আর্থিক সাচ্ছল্য শিগগির তথা অদূর ভবিষ্যতে সম্ভবত হবে না। এ শিক্ষার, প্রকৌশলের, প্রযুক্তির ও বিজ্ঞানে জ্ঞানের দ্রুত ও বিস্ময়কর প্রসার সত্ত্বেও।

জীবনকে শিল্প হিসেবে রচনা ও উপভোগ-অনুভব করতে হলে শিক্ষার এবং অর্থ-সম্পাদর অজস্রতার প্রয়োজন। বাঁধা আয়ের গনা টাকার গরীব লোকেরপক্ষে জীবনকে নিশ্চিন্তির ও নিশ্চিতির পরিবেশে ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ করা সম্ভব নয়। কারণ এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে মানুষের স্বপ্ন-সাধের, সৌন্দর্যপিপাসার ও সুরুচির প্রকাশ ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, চিত্রে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, অভিনয়ে, উদ্যানে, উৎসবে, সামগ্রীর বৈচিত্র্যে, প্রাসাদে, ঔজ্জ্বল্যে সম্ভব হয় কেবল অর্থ ব্যয়ে মেধা-মনন-মনীষা সম্পন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃষ্টিশীল যোগ্য দক্ষলোক নিয়োগের ফলেই। সমাজে সৃষ্টিশীল আবিষ্কারক-উদ্ভাবকদের গবেষকদের অর্থে-সম্মানে তুষ্টির ও তাঁদের অবদানের স্বীকৃতির পরিবেশ তৈরির ফলেই সম্ভব। এ জন্যেই ব্যবহারিক জীবনের সংস্কৃতি-সভ্যতার পাথুরে-ধাতব কিংবা অন্য সূক্ষ্ম অঙ্কন- খোদাই-সূচিকলামূলক নিদর্শনাদি ব্যয়বহুল, শাহ-সামন্তরাই তাই চিরকাল সৃষ্টিশীল বিভিন্ন শাখার শিল্পীদের ছিলেন প্রতিপোষক। স্রষ্টারা সাধারণভাবে মধ্যশ্রেণীর কিংবা ঘরানা বৃত্তিজীবী। কাজেই বাস্তবায়নের কৃতিত্ব এদেরই, কীর্তি এদেরই। কিন্তু অর্থ যার, মান তার, মালিকানাও তার। ফলে প্রাসাদ-অট্টালিকা, মন্দির-মসজিদ, প্রতিমা, চিত্র, তাজমহল হয় মালিকের, স্রষ্টার বা নির্মাতার নাম-নিশানাও থাকে না। দারিদ্র্যের বিড়ম্বনা আজো একইভাবে স্থির ও স্থায়ী হয়ে রয়েছে। গোটা পৃথিবীর যা কিছু সভ্যতা-সংস্কৃতির পাথুরে-ধাতব-মেটে কিংবা অন্য প্রকারের সৌন্দর্য প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ সবটাই হচ্ছে গণমানবের শ্রম ও সময় ব্যয়ের, জীবনব্যাপী সাধনার ফল। ফুল যেমন আপনার জন্যে ফোটে না, তেমনি শ্রমিক-শিল্পীর কৃতিও নিজেদের ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগের জন্যে নয়– শাহ-সামন্ত ধনী-মানীদের জন্যে। তাজমহল, ফতেপুরসিক্রি, লালকেল্লা যারা তৈরি করেছে, তাদের অনেকের ভাগ্যে বেড়ার ঘরে থাকাও সম্ভব ছিল না, সম্ভব ছিল না দুবেলা ভরপেট খাওয়া। নৈতিক চেতনার প্রয়োগে বিচার করলে বিবেকবিরোধী অমানবিক হলেও স্বীকার করতেই হবে যে সামন্ত-বুর্জোয়া সমাজে জীবনকে শিল্প হিসেবে রচনা করা, পরিচর্যা করা এবং ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ করা ওই ধনীলোকেরই আয়ত্তে, ওই পর্যাপ্ত টাকাঅলা পর্যটকের পক্ষেই সম্ভব। যতই চমৎকার বা বিস্ময়কর নৈপুণ্যের নিদর্শন হোক, আমি দশ/বিশ হাজার টাকা দিয়ে শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র ক্রয় করে ঘর সাজাতে পারি?

আমজনতার জীবনের ট্রাজেডি হচ্ছে মানসিক সংস্কৃতি এবং বস্তুগত সংস্কৃতি– এ দুটোই থাকে তাদের আয়ত্তের বাইরে– বিশেষ মানের শিক্ষার বা বিদ্যার এবং বিশেষ স্তরের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার ও অবস্থানের অভাবে। অর্থ চাই। জীবন সেকালে ও একালে অর্থসম্পদ নির্ভর। অর্জনের পন্থা অবশ্য সেকালে ও একালে ভিন্ন। সেকালে বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের ও যুক্তির এবং সাহসের সঙ্গে শক্তির, স্বপ্ন-সাধের সঙ্গে উদ্যম, উদ্যোগ ও আয়োজনের সংযোগ ঘটলেই কেড়ে-মেরে-হেনে অর্থ-সম্পদ, জমি-রাজ্য জোরে জুলুমে দখল করা যেত ও হত। একালে কালোবাজারি ব্যবসায়ে ভেজালে, প্রতারণায়, ঠিকেদারিতে ঘুষে, সুদে ধনী হওয়া সম্ভব, কিন্তু শিগগির হওয়া সহজ নয়। ফলে যৌবনে জীবনরসিকের স্বপ্ন-সাধ অনুসারে জীবন রচন, গঠন ও যাপন সম্ভব হয় না। উপাদান-উপকরণ জোগাড় করতেই প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে যায় জীবন। তখন তার আহারে-বিহারে, বিলাসে-ব্যসনে, ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে-আসক্তি-আগ্রহ সামান্যই থাকে। অতএব, বাস্তব জীবনে বস্তুগত সাংস্কৃতিক চেতনার, সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির, সামগ্রীগত তথা ঘরে, তৈজসে, আসবাবে, ভাস্কর্যে-স্থাপত্যে, চিত্রশিল্পে, সাহিত্যে আসক্তির কিংবা আগ্রহের অভিব্যক্তি দেয়া, সাক্ষ্য ও স্বাক্ষর রাখা সম্ভব হয় না।

কাজেই জীবনরস প্রাপ্তি আমজনতার সাধ্যের বাইরেই থেকে যায়। তবে সবকিছুতেই ব্যতিক্রম থাকে। এ ক্ষেত্রেও দেখা যায় বিরুদ্ধ প্রতিবেশে-পরিবেশে সাহিত্য-শিল্প-ইতিহাস-দর্শন পাঠজাত মানসোৎকর্ষের ফলে মন-মেধা-মনন-মনীষাসম্পন্ন ভাবপ্রবণ কিংবা যুক্তিনিষ্ঠ মানুষ ব্যক্তিগতভাবে অনন্য ও অসামান্য রুচির, সৌন্দর্যবুদ্ধির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োগে জীবনের মাধুর্য ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ অনুভব-উপলব্ধি করেছেন এবং করেন। হয়তো এমন ব্যক্তি কারো না-কারো আদর্শের অনুকরণে-অনুসরণে ব্যক্তিক জীবনচেতনা নিয়ন্ত্রণে পরিমার্জনে জীবনাচার নিয়মিত করেন।

আজকাল তার-বেতারের বদৌলত তথা রেডিয়ো-টিভি-সিনেমা-নাটক-ক্যাসেট প্রভৃতি মাধ্যমে অজ্ঞ-অনক্ষর দুস্থ-দরিদ্র নারী-পুরুষ এবং সববয়সের মানুষই স্বশিক্ষিত হয়ে উঠছে। দেখেজেনে-শুনে সবাই জ্ঞানী ও বিজ্ঞ হচ্ছে– হাবা-গোবা মানুষ দুর্লভ হয়ে উঠছে। কাজেই এ কালে বস্তুগত সংস্কৃতিতে ওরা অর্থাভাবে ঋদ্ধ হতে না পারলেও মানসসংস্কৃতি অর্জনে আগ্রহীদের পক্ষে এখন বাধা দুর্লঙ্ঘ্য নয়।

আমাদের ধারণায় সংস্কৃতি ষড়াঙ্গিক তথা ষড়গুণাধার। এগুলো হচ্ছে : সংযম, পরমত-পরকর্ম-পরআচারণ সহিষ্ণুতা, সৌজন্য, যুক্তিনিষ্ঠা, ন্যায্যতাবোধ ও বিবেকানুগত্য। আত্মসত্তার মান-মর্যাদার গুরুত্ব সচেতন যে-কোনো ব্যক্তি স্বাধিকারের সীমায় থেকে সহ ও সমস্বার্থে অপরের সঙ্গে সহযোগিতায় পণ্য বিনিময়ে সামবায়িকভিত্তিতে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন হয়ে সংযত, সহিষ্ণু, সুজন, যক্তিবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ ও বিবেকবান হবে– এ প্রত্যাশা অসঙ্গত নয়। কারণ আমরা সবাই নন্দিত হতে চাই, নিন্দিত হতে নয়। তাই অপকর্ম গোপনে করি, কুৎসিতকে ঢেকে রাখতে আগ্রহী হই।

একাল শাহ-সামন্ত-সদাগরের নয়, রাষ্ট্রের নাগরিকের। কাজেই একালে দুর্গ, প্রাসাদ, যাদুঘর, হ্রদ, দীঘি, উদ্যান, ময়দান, স্টেডিয়াম, চিত্রশালা, গ্রন্থাগার, চিড়িয়াখানা, কৃত্রিম অরণ্য সৃষ্টি প্রভৃতি সবকিছুই রাষ্ট্রের তথা সরকারেরই দায়িত্ব। অতএব, আমজনতার সংস্কৃতি এখন বস্তুগত হওয়ার প্রয়োজন নেই, অর্থাৎ বাস্তবে সামগ্রীর মালিক না হলেও চলে। তাছাড়া আজকাল বিজ্ঞানীর বদৌলত বিজ্ঞানের প্রসাদরূপে প্রকৌশল-প্রযুক্তির বিস্ময়কর ও বিচিত্র বিকাশ ঘটছে। এ অবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার প্রয়োজন নেই। গণমানবের অধিকারে চলে গেছে রাষ্ট্রের সব সম্পদ, রাষ্ট্রের সব সুবিধে-সুযোগ প্রাপ্তি সম্ভব হচ্ছে উচ্চাশী নাগরিকের পক্ষে।

কাজেই আমরা এখন পূর্বতন বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা বর্জন করে নতুন চেতনা, নতুন চিন্তা, নতুন আকাঙ্ক্ষা ও নতুন উদ্যম নিয়ে মনুষ্যত্বরূপ সংস্কৃতি চর্চায় আগ্রহী হলে অধিকাংশ মানুষের ব্যক্তিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রিক জীবন এবং বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক জীবন হবে উপভোগ্য– জীবনে মাধুর্য মিলবে। মর্ত্যজীবন হবে আকর্ষণীয়, স্বর্গসুখের আসক্তি যাবে কমে। মনুষ্য জীবন হবে মানবিক, প্রাণীর স্তরে থাকবে না।

আজকের কোন্দলক্লিষ্ট জোর-জুলুম বঞ্চনা-প্রতারণা পীড়িত জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে এবং বৈশ্বিক সম্পর্কে-সম্বন্ধে আমাদের অধিকসংখ্যায় বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী উদার সহিষ্ণু সজ্জন হওয়া প্রয়োজন, নিরুপদ্রব নিরাপদ ভাতে-কাপড়ে নিশ্চিত-নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের জন্যে। তাই সংস্কৃতিমান মানুষের পৃথিবীব্যাপী সংখ্যাধিক্য কাম্য, আবশ্যিক ও জরুরি। আবার বলি সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ বা সংস্কৃতিমানতার বাহ্য অভিব্যক্তি ঘটে ছয় প্রকারে: সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সৌজন্যে, যুক্তিবাদিতায়, ন্যায়নিষ্ঠায় বিবেকানুগত্যে।

আমরা অধিকসংখ্যায় সংযত, সহিষ্ণু, সজ্জন, যুক্তিবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ, বিবেকবান ব্যক্তি বা নাগরিক চাই সামজে। আমরা নিরুপদ্রব শান্তি-স্বস্তির নিশ্চিতির অঙ্গীকৃত সুন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের ও সমাজের প্রত্যাশা করি। আমরা প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে মানুষের মধ্যে গৌত্রিক বিবাদ, বিরোধ ও হত্যাকাণ্ড দেখে আসছি– যা আজো কালো আফ্রিকায় প্রায় অবিলুপ্ত। এ সেদিন রুয়্যান্ডায় পাঁচ লক্ষ লোককে কচুকাটা করা হল, তারা কেবল ভিন্নগোত্রের বলেই। আমাদের উপমহাদেশেও এ মুহূর্তেও উপাস্যের কিংবা উপাসনা পদ্ধতির ভিন্নতার দরুন, মতবাদী সম্প্রদায়ে বিভক্তির কারণে দলগত উদ্যোগে নরহত্যা উৎসব হয়। একালের এক কবির ভাষায় 'তুমি হিন্দু, আমি মুসলিম/শুধু এই জন্মদোষে/আমি পড়িয়াছি হিন্দুর কোপে/তুমি মুসলিম রোষে [বীরভূমের কবি আবদুর রহমান– ১৯০৮-৯২]। আমরা এ সূত্রে চেঙ্গিস-হালাকু-অ্যাটিলা থেকে হিটলার অবধি অনেক নরদানবের কথা জানি। আমরা দেখেছি মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের নেতৃত্বে হিরোসিমা-নাগাসাকির বীভৎস দানবিক হত্যাকাণ্ড। হিটলারি কায়দায় চেচনিয়ায় নরহত্যা দেখেছি ইয়েলৎসিনেরও, বসনিয়ায় চলছে খ্রীস্টান য়ুরোপের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে সার্বদের স্বভূম থেকে মুসলিম নিধন ও বিতাড়ন। কাজেই গোটা দুনিয়াব্যাপী বড়-ছোট মাঝারি হত্যাকাণ্ড– পশু-পাখি-মাছের মতো নরহত্যাও আজো লোকে চালাচ্ছে জীবনধারণের জন্যে আবশ্যিক ও জরুরি বলে মনে করে।

আজো যুদ্ধকে ন্যায্য, বিদ্রোহ-বিপ্লবকে প্রয়োজনীয় এবং সন্ত্রাসকে অপরাধ বলেই মানে আমজনতা, সরকার ও রাষ্ট্র। তিনটির লক্ষ্য ও ফল কিন্তু একই– নরহত্যা। অতএব, জীবনকে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ মাধ্যমে শিল্পসুন্দর করে অনুভব-উপলব্ধি করার, ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ করার অনুকূল পরিবেশ আজো নেই। মানুষ মাত্রেরই জীবনের মূল্য-মর্যাদা-গুরুত্ব স্বীকৃত না হলে আন্তরিকভাবে, মানুষ চিন্তাবান না হলে এ কখনো সম্ভব হবে না কোথাও। অবশ্য মানবপ্রজাতির সবার মধ্যে প্রাণী-প্রবৃত্তির সংযমনে মানবে বাঞ্ছিত গুণের বিকাশ কখনো সম্ভব হবে না। তবে অর্ধেকমানুষে মনুষ্যত্ব, মানবিকতা তথা মানবতাসুলভ হলে, অন্তত সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচার-আচরণনিষ্ঠ হলে নরহত্যা কমবে এবং ব্যক্তিজীবনে নিরুপদ্রবতা ও নিরাপত্তা বাড়বে। তখন কেবল কিছু সংস্কৃতিমান মনীষী সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক-দার্শনিক-চিকিৎসাবিজ্ঞানী নন, আমজনতারও অনেকে জীবনকে শৈল্পিক অবয়ব দিয়ে জীবনযাপন করতে আগ্রহী হবে।

আমাদের এ আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন ও সাধরূপেই থেকে যাবে, কোথাও কখনো বাস্তবরূপ নেবে না– এ কল্পনা আমাদের ব্যথিত করে। মানুষ অসংখ্য, পৃথ্বীবিপুলা আর কাল নিরবধি। কাজেই আমরা আশা-আশ্বাস ও প্রত্যাশা নিয়ে বাঁচব। স্মরণ করব বর্ধমান মহাবীরকে, স্মরণ করব গৌতমবুদ্ধকে। স্মরণে রাখব হৃদয়বান ব্যক্তিদের, সন্ত-সাধু-শ্রমণ-দরবেশদের– যাঁরা পশু-পাখি-কীট পতঙ্গকেও বাঁচিয়ে রাখার, জুলুম না করার, লালন-পালন করার জন্যে জনগণের কাছে সমিতি-সংস্থার মাধ্যমে আবেদন জানান। তবে মনে রাখতে হবে বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার প্রতি আনুগত্য মুক্তচিন্তার এবং স্বাধীন সিদ্ধান্তের পরিপন্থী– মানবতার, যুক্তির ও বিবেকের বিকাশের বাধা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষজ্ঞতা ও মনুষ্যত্ব চর্চা

বিদ্যাবুদ্ধি আমার কোনোকালেই ছিল না, পরীক্ষা পাসের জন্যেই ন্যূনতম বিদ্যা ও বুদ্ধি অবশ্য অর্জন করতেই হয়েছিল, পরীক্ষার 'পুলসিরাত' পার হওয়ার লক্ষ্যে। তারপর শিক্ষকতার চাকরি রক্ষার জন্যে প্রাত্যহিক প্রয়োগের নিয়োগের জন্যে বিদ্যার যে-সঞ্চয় পুঁজি-পাথেয় রূপে সর্বক্ষণ কণ্ঠস্থ রাখতে হয় ততটুকুতেই আমার বিদ্যা অবসর গ্রহণের পূর্বাবধি সীমিত ছিল। এখন বহুকাল ধরে চর্চার, প্রয়োগের, নিয়োগের এবং নতুন অনুশীলনের অভাবে সর্বোপরি স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতার ও ভ্রষ্টতার দরুন যা ছিল, তাও অচল ইঞ্জিনের মতোই অকেজো হয়ে গেছে। কাজেই আমার মুখে বিদ্যাবিষয়ক কথা হয়তো শোভা পাবে না। তবু মানুষ বার্ধক্যে বাচাল হয়, সে-বাচালতা কার্যত প্রাণেরই পরিচর্যা মাত্র।

শেখাতে হলে আগে শিখতে হয়, পড়াতে হলে আগে পড়ে নিতে হয়, জানাতে হলে আগেভাগে খুঁজিয়ে জেনে নিতে হয়, তেমনি লিখতে হলেও পড়তে হয়; কেননা লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠকের পড়ার যোগ্য করে কিছু গদ্যে-পদ্যে রচনা– যা মন-মগজ-মনন মর্মগ্রাহী হবে। আমরা সবাই জানি, ভাষার প্রতিটি শব্দ আমরা অন্যের কাছ থেকে শিখি।

বিদ্বানেরা, লিখিয়েরা ভাবানুগ শব্দ সন্ধান করেন শব্দকোষে বা অভিধানে। তেমনি আমরা বাক্য গঠনও শিখি শুনে শুনে, পড়ে পড়ে, তারপর নিজের রুচি মতো রচনশৈলী তৈরি করার জন্যে আমরা ব্যক্তিগতভাবে সূচিত শব্দের সুবিন্যাসে ধ্বনিসুষম ব্যঞ্জনাঋদ্ধ বাক্য বানাই। তেমনি আমরা জীবন-জগৎ সম্বন্ধে, আমাদের আশৈশব শ্রুত ও লব্ধ লৌকিক-অলৌকিক-অলীক সর্ব প্রকারের ও সর্বব্যাপী অরি-মিত্র শক্তির রহস্যের সম্বন্ধে বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা এবং অপরের বিজ্ঞতাকে ও অভিজ্ঞতাকে প্রজন্মক্রমে জ্ঞান রূপে পেয়েই হই মর্ত্যে জন্ম-জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে ইহ-পরলোকে প্রসৃত ধারণায় পূর্ণতার তৃপ্তি, তুষ্টি ও হৃষ্টি লাভ করি। আমরা দেখে শিখি, শুনে শিখি, পড়ে শিখি, কিন্তু ভেবেও যে লিখতে হয়, যুক্তি প্রয়োগেও যে বুঝতে হয়, তা সবাই অনুভব-উপলব্ধি করি না।

দুনিয়াতে নতুন চেতনা, নতুন মৌলিক চিন্তা কয়জনেই বা করতে পারেন এবং এ যাবৎ করেছেন, সবাই তো পরের কথাই নিজের ভাষায় পুনরাবৃত্তি করে মাত্র। পরের আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃষ্টি-নির্মাণই তো অনুকৃত, অনুসৃত, আত্তীকৃত, সাঙ্গীকৃত, আত্মীকৃত হয়ে হয়ে সংস্কৃতি-সভ্যতার কালিক ও স্থানিক বিকাশ ঘটিয়েছে। কাজেই একের আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃষ্টি-নির্মাণ-বিজ্ঞতা-অভিজ্ঞতা-অনুভব-উপলব্ধি অনুকৃত ও অনুসৃত হয়েছে। সামাজিক মানুষের ঐতিহ্য ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ রূপে হয়েছে আবর্তিত। কাজেই সাধারণভাবে আমরা কেউ মৌলিকতার দাবিদার নই। আমরা যতই শিখব ততই জানব বা যতই জানব ততই শিখব। আমাদের মধ্যে ঘরানা পেশা হিসেবে কিংবা ব্যক্তিগত রুচিপ্রবণতা অনুসারে আমরা এক একটা বিশেষ বিষয়ে কারিগর হই। অর্থাৎ আজকাল আমরা স্পেশিয়ালাইজেশনে বা বিশেষজ্ঞতায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকি। ফলে আমাদের বিশেষ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জিত হয় এবং এভাবে আমরা হই বিশেষজ্ঞ। এক প্রকারের টেকনোক্র্যাট হয়ে উঠি। এতে অবশ্য আমাদের ব্যবহারিক জীবনে আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, স্রষ্টা, নির্মাতা সুনিপুণ বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ ব্যক্তি পাই আমাদের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে যন্ত্রে, প্রযুক্তিতে, প্রকৌশলে, কিন্তু আমাদের মানস জীবনে নানা অনুভব-উপলব্ধির ক্ষেত্রগুলো অবহেলিত ও পতিত হয়ে পড়ে থাকে। অতএব বিশেষজ্ঞতা এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে আবশ্যিক ও জরুরি আমাদের বাহ্য বাস্তব জীবনের চাহিদা মেটানোর জন্যে।

কিন্তু মনের জমি অনাবাদে পতিত থাকলে প্রাণী জীবনে বিকাশ ঘটে না। প্রাণীর মানব প্রজাতির শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে তার শারীর ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে, সংযমনে, পরিশীলনে। চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বকজাত রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শ, তার উপজাত কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য এবং প্রেম-স্নেহ-কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য-মৈত্রী প্রভৃতি। প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তির সংযমন-পরিশীলন এবং নিবৃত্তির অনুশীলনই হচ্ছে মনুষ্য সাধনা। ব্যক্তির বিশেষ বিষয়ক জ্ঞান-দক্ষতা-নৈপুণ্য-যোগ্যতাকে গুণ-মান-মাপ-মাত্রা-উৎকর্ষভেদে যদি ডোবা-পুকুর-দীঘির গভীরতা ও ব্যাপকতার সঙ্গে তুলনা করি, তাহলেও সংকীর্ণ পরিসরের সীমাবদ্ধতা থেকেই যায়। এর বাইরেও থেকে যায় অসীম অশেষ ভাবনার চেতনার বিপুল বিশাল জগৎ ও জীবন। তার সন্ধান জানা সমাজস্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে আবশ্যিক। মানবিক গুণের উন্মেষ-বিকাশের এবং চিন্তার উৎকর্ষের জন্যে যে বিদ্যার অনুশীলন আবশ্যিক ও জরুরি, এ বিশেষজ্ঞতার যুগে তা একরকম অস্বীকৃতই হচ্ছে। ফলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা অর্থ ও বাণিজ্য বিজ্ঞানী স্ব স্ব ক্ষেত্রে অনন্য-অসামান্য দক্ষতা কিংবা আবিষ্কারক-উদ্ভাবক-নির্মাতা হিসেবে কৃতি-কীর্তির অধিকারী হয়েও মানবিক গুণে তথা মনুষ্যত্বে হীন হতে পারে। এভাবে মানবিক গুণ অবিকশিত থাকলে আর যান্ত্রিক জীবন অসামান্য ও দ্রুত বিকাশ ও উৎকর্ষ পেতে থাকলে মানুষ তো যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনাহীন আদি অকৃত্রিম প্রাণী-প্রবৃত্তি চালিত হতে থাকবে। প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-মমতা-সহানুভূতি-পরার্থপরতা, হিতৈষণা, কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য-মৈত্রী, বিশেষ করে ন্যায্যতাচেতনাই মানবিকতা অর্থাৎ যে দুঃখ-বেদনা-ক্ষতি-লজ্জা-বঞ্চনা নিজের জন্যে কাম্য নয়, তা পরের জন্যে, প্রতিবেশীর জন্যে বাঞ্ছিত মনে না করার নামই মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্বকে সাধারণভাবে আমরা মানবের প্রত্যাশিত আবশ্যিক গুণের সমষ্টি বলেই মানি। মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ মানববাদে-মানবতায়, মানুষকে ভালোবাসার জীবনির্বিশেষের প্রতি ন্যায্য আচরণের নাম মানবতা। তা হলে মানুষকে ভালোবাসার ও ন্যায্যতার নামান্তরই মানবতা বলে মেনে নিতে বাধা নেই। মানবতার বিকাশে বিবেকানুগত যুক্তিমান ব্যক্তিই কেবল মানবতাবাদী হতে পারে। তা হলেই বাহ্যজীবনে বিজ্ঞানের বদৌলত যন্ত্র-প্রযুক্তি-প্রকৌশলের প্রসাদপুষ্ট মানুষের সমাজ মানসিক সংস্কৃতি-সভ্যতায়ও সমভাবে সমতালে এগুতে পারবে। দাঙ্গা-লড়াই-যুদ্ধ থাকবে না জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-সম্পদ-শক্তির পার্থক্যের দরুন।

অতএব, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন স্বীকার করেও আমরা ডাক্তারী-ইঞ্জিনিয়ারিং-বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের জন্যে আনুষঙ্গিক বিষয় হিসেবে সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস এবং অন্যদের জন্যে প্রাণিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা কিংবা রসায়ন প্রভৃতির অন্তত যে-কোনো দুটো বিষয়ে একশ' করে দুশ' নম্বরের দুটো পত্র অবশ্য পাঠ্য করে দেয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি। একালের পরিভাষায় একে মনুষ্যত্বের বিকাশ লক্ষ্যে মগজধোলাই বলা যেতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলমবাজি বনাম নকলবাজি

জন্ম মুহূর্ত থেকে আমরা তো দেখে-শুনে-জেনে অনুকরণেই শিখি। আমাদের আয়ত্তে আসে প্রায় সব দোষ-গুণই অনুকরণেই। গভীর তাৎপর্যে ও বিশ্লেষণে দেখা যাবে, মানুষের স্বপ্নে-সাধে, ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ বাসনায়, চিন্তায়-চেতনায়, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের বৈচিত্র্য কল্পনায় কিংবা আসমান-জমিনের মধ্যেকার নানা লৌকিক-অলৌকিক-অলীক অরি-মিত্র অদৃশ্য অশরীরী শক্তির অনুভবে-উপলব্ধিতে প্রাণীর প্রজাতি মানুষের মধ্যে বিবর্তনের চেয়ে আবর্তন হয়েছে বেশি। আজো দুনিয়ার উন্নত-অনুন্নত, সভ্য-অসভ্য, বুনো-বর্বর সব সমাজই শিক্ষিত-অশিক্ষিতদের, পণ্ডিত-মূর্খের মধ্যেও রয়ে গেছে আদি ও আদিম নানা বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার-কল্পনার-বিস্ময়ের লেশ ও রেশ। এ তাৎপর্যে মানুষের চিন্তা-চেতনায় নতুন তেমন কিছু মেলে না। কেবল কালভেদে ও অঞ্চলভেদে, প্রজন্মভেদে অনেক তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য নতুন উদ্ভাবিত বলে মনে হয় মাত্র। যেমন ধরা যাক ভাষার কথা। অভিধানে সব শব্দই রয়েছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের অবলম্বন যে-অভিধান, এক স্বল্প শিক্ষিত গাঁয়ের জ্ঞানে-প্রজ্ঞায়-কল্পনায়-চেতনায়-চিন্তায় নিতান্ত ক্ষীণ শক্তির কবিরও শব্দের উৎস সেটিই। একজন সুব্যবহারে সেই পুরোনো আটপৌরে বহুযুগের বহুমানবের ব্যবহৃত শব্দকে চিন্তার-চেতনার গাঢ়-গভীর অভিধা বা অর্থ বা ব্যঞ্জনা আরোপ করে পুরোনো অভিধার অর্থের বন্ধনমুক্ত করে নতুন তাৎপর্যে বিশিষ্ট করে তোলেন, অপরজনের প্রয়োগে তা আমজনতার ব্যবহৃত অর্থের সীমা অতিক্রমে হয় অসমর্থ। কাজেই তা শিল্পকর্ম তো হয়ই না, এমনকি সূচিত শব্দের বিন্যাসে কোনো তত্ত্ব, তথ্য বা সত্যগর্ভ প্রবচন কিংবা আপ্তবাক্যও হয়ে ওঠে না। ধরা যাক 'প্রেম' বিষয়ক কবিতা, বিষয়তো অকৃত্রিম বটেই, সব কবির আবেগও খাঁটি। তবু কোনো দু'জন কবির কবিতা গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় সমান হয় না।

এ জন্যেই কবিতা লিখেও 'সবাই কবি হয় না, কেউ কেউ মাত্র কবি হয়', তেমনি সবাই কথা বলে, কিন্তু সবার কথার মধ্যে শ্রী-ছাঁদ থাকে না। অনেকেই লেখেন কিন্তু তাঁদের লেখা লোকগ্রাহ্য হয়ে জনপ্রিয় হয়ে টেকে না। গল্প-কবিতা-নাটক-গান-উপন্যাস-রম্যরচনা-গোয়েন্দাকাহিনী এমনকি জ্ঞানগর্ভ তথ্যনির্ভর প্রবন্ধ বা গবেষণা কর্মও টেকে না, নতুন তথ্য, তত্ত্ব ও সত্য আবিষ্কৃত হলে।

যেহেতু দুনিয়ায় কোনো ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণই মৌলিকতার– কেবল বিজ্ঞানের তথ্য ব্যতীত– দাবিদার হতে পারে না, কোথাও না-কোথাও, কোনো না-কোনো কৌমে-গোত্রে-সমাজে তা পরিবেষ্টনীগত জীবনের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে গেছে, সে জন্যেই কলমবাজিও জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে নকলবাজিও। আমরা জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা প্রভৃতি যা কিছু আয়ত্ত করি, তা কারো না-কারো মুখে শুনে, কারো না-কারো কিস্‌সা-কাহিনীতে জেনে, কোনো না-কোনো প্রবাদে-প্রবচনে-আপ্তবাক্যে কিংবা কোনো না-কোনো ঘটে-যাওয়া বিবাদের বিরোধেরই শ্রুতিফল। অতএব, আমরা যা কিছু বলি, যা কিছু ভাবি, যা কিছু মত-মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রকাশ করি, তাতে যে কত কালের কত মানুষের কাছে ঋণী হয়ে যাই, তা জীবনে কখনো অনুভব-উপলব্ধি করি না। মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করি, আমি নকলবাজি করছি না। নিজের জ্ঞান-বিশ্বাস-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগেই স্বাধীনভাবে সব কথা বলছি কিংবা লিখছি। আমাদের কলমবাজি যে আসলে নকলবাজি তা নিজেরা বুঝি না কিংবা আমাদের পাঠকেরা ধরতে, বুঝতে পারেন না। আমাদের দেশী কথায় বলে 'সাত ঘাটের' পানি না খেলে কেউ বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ হয় না।

এবার দু'একটি স্থূল উদাহরণ দিই। অতীত ও ঐতিহ্য নিয়ে আমাদের গাঢ়-গভীর গর্ব। ওতো আমরা প্রজন্ম ক্রমে শুনে শুনে পড়ে পড়ে জেনে জেনে এমনকি বুঝে না-বুঝে বারবার উল্লেখ করছি, বিশ্লেষণ করছি, নতুন তাৎপর্য আরোপের চেষ্টা করছি, নতুন নাটকে-গল্পে-উপন্যাসে-কাব্যে নতুন তাৎপর্যমণ্ডিত করে বাকজাল প্রয়োগে অঙ্গে ও অন্তরে বারে বারে নতুন করে তুলি ভাবে-ভাষায়-ভঙ্গিতে কালিক জীবনের চাহিদার ও রুচির অনুগত করে। তাহলে সেই অতি পুরোনো অতীতকে এবং অতিরঞ্জিত ঐতিহ্য প্রজন্ম পরম্পরায় তিলে তিলে নতুন করে তুলে নিজেরাই নতুনতর অনুভবের বিস্তৃতিতে নতুন অনুরাগে নতুন হয়ে উঠি, উজ্জীবিত হই বলে-বীর্যে-ভরসায়। এ হচ্ছে 'অতি পুরাতন কথা নব আবিষ্কার'।

এবার আর একটি দৃষ্টান্ত দিই, উনিশশতকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন, অক্ষয় দত্ত, মধুসূদন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিহারী লাল, দীনবন্ধু, রাজেন্দ্র লাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিবেকানন্দ সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথকে কি পেতাম প্রতীচ্য-বিদ্যা-বুদ্ধির, রুচি-সংস্কৃতির, বিজ্ঞান-দর্শনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় না হলে? ওঁরা যা কিছু আমাদের মাতৃভাষায় ভেবেছেন বা লিখেন তার জড় কোথায়, তার উৎস কি– তা কি কাউকে বলে দিতে হয়? কাজেই কলমবাজি সার্থক হয় তারই, যার নকলবাজির পরিসর-পরিধি বিস্তৃততর।

আরো হিসেব করে দেখা গেছে, যাঁরা অনেক বেশি আধুনিক ভাষা-সাহিত্যের চর্চা করেছেন এবং করেন, তাঁদের গদ্যে-পদ্যে রচিত যে-কোনো বিষয়ক লেখা পড়ে অর্থ, সময় ও শ্রম নষ্ট হল বলে মনে হয় না। আমাদের যে-কয়জনকে 'ত্রিশের কবি' বলে আলাদাভাবে যুগান্তকারী কিংবা যুগস্রষ্টারূপে চিহ্নিত করা যায়, তাঁরা সবাই সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ ইংরেজি সাহিত্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিধারী। এঁদের কেউ কেউ ফরাসী-স্পেনিশও জানতেন। এমন কি ঢাকা শহরের মুনীর চৌধুরী, শামসুর রাহমান, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখরাও ইংরেজি সাহিত্যের লোক। আমাদের আধুনিক যুগস্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্ত গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী প্রভৃতি দশ/বারোটা ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। আমাদের দেশে প্রথম বহু য়ুরোপীয় ভাষাবিদ পণ্ডিত হলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ, রজনীপাম দত্তের প্রপিতামহ এবং বাঙলাদেশের আধুনিককালের প্রথম নিরীশ্বরের একজন অক্ষয় কুমার দত্ত। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে ছিল স্বশাস্ত্র, স্বদেশ ও স্বধর্মীপ্রীতি এবং তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে ও রচিত ইতিহাসগ্রন্থে– তিনি ছিলেন ধীরবুদ্ধির ও স্থিরবিশ্বাসের যুক্তিবাদী লেখক। এও প্রতীচ্য শিক্ষার দান। উনিশ শতকে কোলকাতায় যাঁরা একটা কৃত্রিম লণ্ডন শহর গড়ে তুলেছিলেন নিজেদের যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞাযোগে, তাঁরা সবাই বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস ও সাহিত্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁদের বিদ্যার পরিসর ও পরিধি সংকীর্ণ ছিল না– যদিও সেকালে বিলেতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বই ইচ্ছেমতো জোগাড় করা সময়-অর্থ ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। এর মধ্যেই এঁরা কোলকাতায় এ দেশে বিলেতি চিন্তার বীজ বাঙালির মগজে-মননে বপন করেছিলেন, চেতনার বীজ বুনেছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত শহুরে আমজনতার মনে ও মর্মে। এঁদের মধ্যেই শুধু নাস্তিক-নিরীশ্বর নয়– প্রত্যক্ষবাদী, ব্রহ্মবাদী অজ্ঞেয়বাদী এবং থিয়োসফিস্ট আবির্ভূত হয়েছিলেন। এসব স্রষ্টা, সংস্কারক, নতুন চিন্তা-চেতনা প্রচারক, দ্রোহী, উদ্যমশীল উদ্যোগীদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণই তো আগের কালে সর্বসম্মতভাবে এবং একালে অনেকের মতে বাঙলার রেনেসাঁস। এমন যে বহু দোষে দুষ্ট প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, তিনিই তো এদেশে প্রথম য়ুরোপীয় আদলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও ব্যাঙ্ক প্রথা চালু করেন বাঙালির মধ্যে। তিনিই তো অনেক অর্থ চাঁদা দিয়ে কোলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করান। প্রভুগোষ্ঠীর ইংরেজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জাহাজের মালিকানাসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সাফল্য অর্জন করেন এবং প্রলুব্ধ ও উদ্বুদ্ধ করেন আরো অনেক বাঙালিকে।

অতএব, আমাদের দেশ বাস্তবে ১৭৬৫ সাল থেকেই ইংরেজ শাসনে গেলেও আমাদের চিন্তা-চেতনা-শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতি-আচার-আচরণ অপরিবর্তিতই ছিল ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বাবধি। নিতান্ত তরুণ (১৮০৯-৩১) ডিরোজিওর প্রেরণায়-প্রণোদনায়-প্রবর্তনায় ও ব্যক্তিত্ব প্রভাবে য়ুরোপ কোলকাতা শহরের বিত্তবানদের সন্তানদের চিত্তবান করে তুলল বিস্ময়করভাবে। তাতেই তো এল রেনেসাঁস।

কাজেই কলমবাজিতে সাফল্য অর্জনের জন্যে চাই বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন মানুষের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে, বিভিন্ন ভাষায় রচিত ইতিহাস-দর্শনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়। এ হচ্ছে বাল্যকালের সেই আপ্তবাক্য 'যতই পড়িবে, ততই শিখিবে' এবং ততই হবে বিজ্ঞ ও বিদ্বান। আমাদের দেশে জ্ঞানের সঙ্গে চোখের তুলনা দেয়া হয় তাই লোকে বলে জ্ঞানচক্ষু, শিক্ষাকে বলে আলো। কাজেই শিক্ষার আলো সর্বত্র প্রসৃত হলে আমাদের জ্ঞানরূপ চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও সুদূরপ্রসারী হলে আমাদের কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নাটক-রম্যরচনা কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশ্লেষণমূলক চিন্তা-চেতনার অভিব্যক্তিতে উৎকর্ষ লাভ করবেই। হবে অনুকৃত, আত্তীকৃত, সাঙ্গীকৃত ও আত্মীকৃত। পুচ্ছ-গ্রাহিতা থাকবে না। আমাদের সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস-চিত্র-স্থাপত্য-ভাস্কর্য, রুচি-সংস্কৃতি-মন-মগজ-মনন-মনীষা উন্নত হবে, হবে পরিশীলিত, হবে নতুন চেতনার উন্মেষ ও বিস্তার।

একুশের চেতনা ও ভবিষ্যতের ভাবনা

উনিশশতকে মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা নগণ্য ছিল বলে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে গদ্যে-পদ্যে চতুর্থপাদের আগে শুরুই হতে পারেনি এবং যারা সাময়িকপত্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাধ্যমে গদ্য-পদ্য রচনা শুরু করলেন, তাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত নানা আঞ্চলিক ও আর্থিক কারণে কিংবা ব্যক্তিক অনীহার দরুন।

বিশশতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে মুসলিম শিক্ষিতের সংখ্যা যেমন দ্রুত বাড়তে থাকে, তেমনি লিখিয়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন সাময়িক পত্রিকা ও দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক পত্রিকা যেমন দীর্ঘস্থায়ী হতে থাকে, তেমনি লেখকদের লেখার মানেও উৎকর্ষ-উন্নতি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তারপরে পাকিস্তান আমল থেকে স্বাধীনতা-উত্তরকালে কবির সংখ্যাই তরুণদের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এখন বাঙলাদেশে প্রায় পাঁচশ কবি রয়েছেন, তাঁদের কবিতা যেমন গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় ভালো-মন্দ-মাঝারি, তেমনি প্রতিষ্ঠায়-পরিচিতিতে তারা বড়-ছোট-মাঝারি আর বয়সেও কিশোর-তরুণ-প্রৌঢ়-প্রবীণ। কবির পরেই গল্প লেখকের সংখ্যানুপাতিক স্থান, তারপরে নাট্যকারের ও ঔপন্যাসিকের। আর বিভিন্ন বিষয়ক কলাম, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সম্পাদকীয় লেখকরা ঠিক স্বাভাবিক আবেগে সানন্দ স্বেচ্ছায় লেখেন সবাই এমন মন্তব্য করা না গেলেও অর্থাৎ নেশার বশে নয়, পেশার দায়িত্ব পালনে লেখেন অনেকেই, তবু প্রবন্ধ লিখিয়ে এবং ভালো লিখিয়ে দুর্লভ নন, যদিও পড়ুয়া এখনো বিরল।

বাঙালির ভেতো ও ভীত বলে নিন্দা ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগে; মিথ্যাবাদী, কপট প্রতারক বলেও ছিল তারা নিন্দিত, কিন্তু বিশশতকে মগজে শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমত্তায় অজেয়, চিন্তায় চেতনায় আগ্রহী এবং সাহসী বলে নন্দিতও হয়েছিল সর্বভারতীয় পর্যায়ে।

এখন আমরা শিক্ষায় এগিয়েছি, কিন্তু বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের, সাহসের সঙ্গে শক্তির, স্বপ্নের সঙ্গে উদ্যমের, সাধের সঙ্গে উদ্যোগের, অঙ্গীকারের সঙ্গে দায়িত্ব-কর্তব্য চেতনার এবং বাস্তবায়নের জন্যে আয়োজনের কাজে আমাদের আলস্য-ঔদাসীন্য প্রচ্ছন্ন বাধা হয়ে যে রয়েছে, তা আমরা অনুভব-উপলব্ধিই করি না।

কথাগুলো মনে জাগল আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারির পার্বণিক উদ্যোগে-আয়োজনে-উৎসাহে বাঙালি চিত্তের নিখুঁত নিখাদ বাস্তব অভিব্যক্তি আমাদের কর্মে-আচরণে সুপ্রকট হয়ে উঠেছে দেখে ও শুনে। আমাদের হুজুগে বাঙালি বলে যে নিন্দা রয়েছে, একে সেই হুজুগ বলেও তাচ্ছিল্য ও নিন্দা করা সম্ভব। যদিও এ মন্তব্যের ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লক্ষ কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবেই, এ-ও ধ্রুব সত্য।

আমরা শুধু এখানে নিন্দিত বা নন্দিত করার জন্যে এ আলোচনা করিনি। কেবল আত্মসম্বিৎ সম্বন্ধে আত্মসমীক্ষণ করার চেষ্টা করছি মাত্র। আমরা মধ্যযুগেও দেখেছি একই বিষয়ে অনেক কবি কাব্য লিখেছেন অন্যের অনুসরণে ও অনুকরণে। এমনকি উনিশশতকেও নাম পর্যন্ত অনুকৃত হতে দেখলাম, যেমন মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার, এজিদবধ কিংবা নীলদর্পণ, জমিদারদর্পণ, বিধবাদর্পণ প্রভৃতি। মধ্যযুগে বর্ধমান বিভাগে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কথা ধর্মমঙ্গল রচনা করেছেন কেবল সতেরো আঠারো শতকেই চৌদ্দ-পনেরো জন কবি, তেমনি অনেক কবি রচনা করেছেন 'মনসামঙ্গল' কিংবা সত্যনারায়ণ কিস্সা রচনা করেছেন প্রায় ৭০/৮০ জন কবি। একালেও দেখছি 'মুক্তিযুদ্ধ' সম্বন্ধে রচিত হচ্ছে গল্প-উপন্যাস-নাটক-ইতিবৃত্ত বা ইতিবৃত্তান্ত, এগুলোতে যেমন ইতিহাসের অনেক উপাদান উপকরণ-তথ্য-তত্ত্ব মিলছে, তেমনি হয়তো সমপরিমাণে বা অধিকমাত্রায় ঘটছে তত্ত্বের ও তথ্যের আর সত্যের ও সিদ্ধান্তের বিকৃতি। ফলে ইতিহাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিকথায় পরিণত হবার আশঙ্কাও বাড়ছে। এতো বই এতো লেখা ইতোমধ্যেই মুদ্রিত হয়েছে এবং হয়েই চলেছে, আর জায়মানও রয়েছে। অনুমান করে বলা চলে, একজনের পক্ষে এক জীবনে সব বই জোগাড় করা, পড়া, জিয়াউদ্দীন বুখারীর মতো সত্যসন্ধ ধৈর্যশীল অধ্যবসায়ী লোকের পক্ষেও তথ্যের ও সত্যের উদ্ধার অসম্ভব হয়ে উঠছে, উঠেছে। এর জন্যে হংস-গুণের মনীষা হবে আবশ্যিক, যিনি জল বাদ দিয়ে দুধ চোষা হাঁসের মতো মিথ্যা থেকে সত্যকে স্বরূপে উদ্ধার করতে পারবেন। ভাষা আন্দোলন সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ বই বেশি লেখা হয়নি বটে, তবু স্মৃতিকথা কিংবা ইতিবৃত্তান্ত হিসেবে অনেক হ্রস্ব-দীর্ঘ প্রবন্ধ রচিত ও মুদ্রিত হয়েছে। সেগুলো থেকেও সত্য-মিথ্যা-বিকৃতি বেছে নেয়া সহজ ও সম্ভব হচ্ছে না। কোনো দু'জনের দুটো বইতে সত্য ঘটনার বয়ান একই গুণের মানের মাপের ও মাত্রার হয়নি, হয় না। তাই বিভ্রান্তি কেবলই বাড়তে থাকবে।

আমাদের এখন লেখার ও পার্বণের দুটো বিষয় ৪২ ও ২২ বছর ধরে। এক, ভাষা সংগ্রাম ও বিজয়। দুই, মুক্তিযুদ্ধ, শাহাদৎ, বিজয় ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তি। এ চিন্তা-চেতনা, প্রয়াস-প্রযত্ন, উৎসাহ-উদ্দীপনা, উদ্যম-উদ্যোগ এখন আমাদের শিক্ষিত ও লিখিয়ে সমাজে আবর্তন ও রোমন্থনধর্মী হয়ে উঠেছে। দুটোই অতীতের ও ঐতিহ্যের গৌরবের. গর্বের, অহঙ্কারের, আস্ফালনের, আত্মতৃপ্তির, আত্মতুষ্টির, হৃষ্টির আর মানস পুষ্টির বিষয় এবং অলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুন পরিকল্পনার, নতুন কিছু করার প্রেরণা, উদ্যম, প্রণোদনা, প্রবর্তনা জোগাচ্ছে কি-না ঐতিহ্যগর্ব, তা আমাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ থেকে বোঝাই যাচ্ছে না। আমরা মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদাদানের জন্যে রক্ত দিয়েছি, দিয়েছি প্রাণ। এ নিশ্চয়ই গর্ব করবার মতো ঘটনা ও কাজ, যদিও দুটোই আমাদের আবেগচালিত হুজুগে ভুল সিদ্ধান্তের রক্তক্ষরা প্রাণহরা মাশুল দিয়েছি মাত্র। এ ১৯৪৭ সালে একরাষ্ট্রে গড়ায় সম্মতিদানের কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত মাত্র। কিন্তু শিক্ষিত লোকের এ সংগ্রামের প্রেরণার মূলে চাকরি-বাকরির স্বার্থ চেতনাও কি প্রচ্ছন্ন ছিল না, কেবলই কি অধিজনের ভাষায় মর্যাদাচেতনা ছিল? আমাদের এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন, আমাদের মাতৃভাষা-প্রীতি যদি এমন অকৃত্রিম হয়, স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম নিখাদ ও নিখুঁত হয়, তাহলে যে মাতৃভাষার জন্যে আমাদের ভাইরা রক্ত দিল, প্রাণ দিল, প্রাণ দিতে কৃতসংকল্প হয়েও গাজী হয়ে জয়ী হয়ে বেঁচে রইল, সেই মাতৃভাষার, লিখিত মাতৃভাষার অধিকার থেকে আমরা স্বদেশের স্বজাতি আত্মীয়-স্বজনকে কেন এ বিয়াল্লিশ বছর ধরে বঞ্চিত রাখলাম, কেন তাদের সাক্ষর শিক্ষিত করার জন্যে আমাদের রাজনীতিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো স্বেচ্ছাসেবী হয়ে এগিয়ে এল না? কেন বিগত বাইশ বছর ধরে সরকারও আমাদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের আশা-আশ্বাস দিয়ে, গণ-শিক্ষার বা গণ-সাক্ষরতা ব্যবস্থা চালু করার ঘোষণা দিয়ে দিয়ে বারবার বঞ্চিত ও প্রতারিত করল? আজকের এ মুহূর্তেও কি সরকার অকৃত্রিম অকপট প্রয়াসে প্রযত্নে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করেছে দেশের সর্বত্র? এখনো প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করার ব্যবস্থা করার মতো অর্থ জোগাড় হয়েছে কি সরকারের তহবিলে? এখনো নিঃস্ব-নিরন্ন ঘরের সন্তানদের স্কুলে নেয়ার কোনো ব্যবস্থা শহরে বা গ্রামে হয়েছে কি? সরকার যা যা প্রচার-প্রচারণা, ঘোষণা-বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে জনগণকে জানিয়ে জনগণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে আশা ও আশ্বাস জাগাচ্ছেন, নিশ্চিন্ত ও নীরব রাখছেন শিক্ষিত ও সংবাদপত্র পাঠকদের, তা কি বাস্তবে কোথাও মেলে দেশের কোনো অঞ্চলে বা অংশে?

অতএব একুশে উদযাপন, একুশের পার্বণ, একুশের মেলা, একুশের বই বেচা-কেনা দেশের লোকের শতে দু'জনের মধ্যেও হয়তো চালু হতে পারেনি আজো! এ স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিতের দেশে স্বল্পসংখ্যক লেখকের বইয়ের প্রকাশের এবং বইয়ের মেলার সঙ্গে দেশের কয়জন লোকের সম্পর্ক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে এ বিয়াল্লিশ বছরে? তাহলে এর সঙ্গে নগরবাসী বাঙালিরই বা কয়জনের যোগ রয়েছে! আমাদের বিবেক কি আমাদের মনে গ্লানি বা অপরাধবোধ জাগায়?

কাজেই ভাষাসংগ্রাম ও বিজয় যেমন ভদ্রলোকের স্বার্থই রক্ষা করেছে, তেমনি মুক্তিযুদ্ধও ধূর্তদেরই জীবনে-জীবিকায় তরক্কী এনেছে। লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণদান-ইজ্জত বিনষ্টি জনগণের আর্থিক, শৈক্ষিক, বৈজ্ঞানিক-বাণিজ্যিক জীবনে অর্থাৎ শিক্ষায় সংস্কৃতিতে, অর্থে-বিত্তে-বেসাতে কোনো উন্নতি ঘটায়নি। বরং ধূর্তলোকদের লুটপাটের ফলে, কল-কারখানা-ব্যবসা-বাণিজ্য, পণ্য উৎপাদন ও নির্মাণ ব্যাহত হয়ে হয়ে দেশ দরিদ্রতর হয়েছে— হচ্ছে।

অতএব, মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের শাহাদতের, স্বাধীনতার ফায়দা লুটছে লাভ-লোভ-স্বার্থ বুদ্ধিদুষ্ট একটা ক্ষুদ্র শ্রেণীমাত্র। আর শতে পঁচানব্বইজন স্তন্য বঞ্চিত তৃতীয় বাচ্চার মতো স্বদেশের, স্বজাতির, স্বরাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের আনন্দে-গৌরবে-গর্বে তুষ্ট, তৃপ্ত ও হৃষ্ট থাকছে। ফলে একটিও শুদ্ধ ইংরেজি বাক্য লিখতে না-জানা মফস্বলের গৃহস্থঘরের স্নাতক পাশ সন্তানেরা কোথাও চাকরি পায় না। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ কিন্তু ইংরেজিতে কাঁচা তথাকথিত শিক্ষিত তরুণেরা চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারী পদে কাজ করছে, শোনা যায় কেউ কেউ অন্নাভাবে রিকশা চালায়, মোটরগাড়ির চালকও হয়। এদিকে শহরে বন্দরে নবধনী শিক্ষিত আমলা-সাংসদ, বেণে-ডাক্তার-উকিল-সাংবাদিক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের সন্তানদের সাড়ে তিন বছর বয়স থেকেই ইংরেজি মাধ্যমে পাঠদানের স্কুলে ভর্তি করান। এঁরাই আবার বাঙলা একাডেমীর মেলায়, শিশু মেলায়, পয়লা বৈশাখের ছায়ানট মেলায় সপরিবার ও সগাড়ি উপস্থিত হন সবার আগে। সুযোগ পেলে বাঙালি সংস্কৃতি রক্ষার জন্যে আবেদন জানান, দেশপ্রেমের ও জনসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবার জন্যে আকুল আবেদন জানান আমলা, সাংসদ, মন্ত্রীরূপে বক্তৃতা দেবার মওকা পেলেই। রাষ্ট্রের প্রথম সারির নাগরিকদের এ ধূর্ততা, এ কার্পণ্য, এ পর-প্রতারণা— এ রাষ্ট্রের যে-কোনো প্রকারের উন্নতির অন্তরায় নয় কি?

আজ এ সত্য ও তথ্য স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে যে, দেশের ধনীমানী শিক্ষিত লোকেরা সব বিদেশমুখী ও স্বদেশবিমুখ। সবাই ইংরেজিমুখী এবং বাঙলাবিমুখ। সবাই পরিবার পরিজনকে বিদেশে অভিবাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে উৎসাহী, স্বদেশে রাখতে অনীহ।

স্বদেশপ্রেমীর, মানবসেবীর জনগণ হিতৈষীদের আজ এসব সমস্যা-সচেতন হওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

আমার কন্যা

বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজের অধ্যাপক

ডক্টর প্রথমা রায় মণ্ডল-এর নাম

তাঁর আত্মীয়তার, মমতার, সেবার ও আমার অনেক অপরিশোধ্য ঋণের স্মারক রূপে মুদ্রিত রইল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা

আমাদের মানতেই হবে যে কেবল দর্শন-বিজ্ঞান নয়, সাহিত্যও চিত্তলোকের জিজ্ঞাসার ও অন্বেষারই ফুল, ফল ও ফসল। জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা পরোক্ষেও প্রকাশ না পেলে, সে-সাহিত্য অকেজো বলেই অপ্রয়োজনীয়। আদি ও আদিমকাল থেকেই অজ্ঞ বিস্মিত কল্পনা-প্রবণ ভীত কৌতূহলী জিজ্ঞাসু মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে: জীবন কি, জগৎ কি, সৃষ্টি কি, স্রষ্টা কে, জীবনের লক্ষ্য কি, জীবনে দায়িত্ব ও কর্তব্য কি, পৃথিবীর সীমা কত, আকাশ কি, গ্রহ কি, নক্ষত্র কি, চন্দ্র-সূর্যের আমাদের জীবনে প্রয়োজন ও গুরুত্ব কি? আর এ দৃশ্য প্রাণিজগতের কীট পতঙ্গ পশু পাখি সরীসৃপ ছাড়াও কি কোনো অদৃশ্য জগৎ আছে যেখানে অশরীরী নানা প্রাণী বা শক্তিধর রয়েছে ভূত-প্রেত-পিশাচ-দেবতা-উপদেবতা-অপদেবতা-জীন-পরী-রাক্ষস-ড্রাগন প্রভৃতি নামে, যারা অদৃশ্য অশরীরীরূপে আকাশ পাতাল পৃথিবী অবলীলায় পরিভ্রমণ করে চলে? আকাশের ওই নক্ষত্র কি আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে! আমাদের আহার-নিদ্রা এবং বিশেষ বয়সের মৈথুনও কি ওই সব অজানা শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে! রোগ-মৃত্যুও কি অদৃশ্য শক্তির রোষ-ক্ষোভের ফল? উল্লেখ্য যে, অজ্ঞেয়তা সত্ত্বেও ঈশ্বরের উদ্ভব ভূম হচ্ছে মানব মস্তিষ্ক।

এসব অসংখ্য অদৃশ্য শক্তির প্রতি আমাদের দায়িত্ব কি, কর্তব্য কি? আমাদের আনুগত্য, স্তাবকতা, চাটুকারিতা, পূজা-উপাসনা, খাদ্য দিয়ে, তোয়াজে-তোষামোদে তাদের তুষ্ট, তৃপ্ত, হৃষ্ট, পুষ্ট রাখলেই কি আমরা নিরাপদ নিরোগ নিরুপদ্রব ও দীর্ঘকাল মৃত্যুমুক্ত জীবনযাপনে সমর্থ থাকব?

যে দুর্বল সে তো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতিযোগিতায় বাঁচতে পারে না, সে বাঁচতে চায় অনুগামিতায়, আনুগত্যে ও দয়ায়-দাক্ষিণ্যে-কৃপায়-করুণায়-সহযোগিতায়। তাই মানুষ গোড়া থেকেই আকাশে-পৃথিবীতে-পাতালে, দৃশ্য-অদৃশ্য জগতে কেবল স্তব-স্তুতির জন্যে, পূজা-অর্চনার জন্যে, তোয়াজের-তোষামোদের-উপাসনার জন্যে, নতশির আনুগত্য প্রদর্শনের জন্যে, অতিরিক্ত অনুগ্রহ পাবার জন্যে নানাভাবে চাটুকারিতার ও সেবার জন্যে নানা পন্থা আবিষ্কার করেছেন। অজ্ঞ-অনভিজ্ঞ, অবিজ্ঞ, যুক্তি-প্রজ্ঞাহীন দুর্বল ভীরু মানুষ অরি বা বিরূপ শক্তিকে বশ করার জন্যে কোনো শক্তিকে এভাবে তোয়াজে সেবায় তুষ্ট রেখে ভয় ও বিপদ মুক্তির জন্যে বল-ভক্তি-ভরসার পাত্র বা পাত্রী করে তুলেছে। সেকালের অজ্ঞানের অপরিচয়ের বিচ্ছিন্নতার ব্যবধানে বসবাসরত কৌম-গোত্র-গোষ্ঠী-গ্রামভুক্ত-দলবদ্ধ অজ্ঞ অসহায় দুর্বল দুস্থ নিঃস্ব মানুষ-যাযাবর মানুষ তাই স্ব স্ব দলের সর্দার-মাতব্বর সাহসী বুদ্ধিমান লোকের নেতৃত্বে ওই অদৃশ্য জীবননিয়ন্তা অরিমিত্র শক্তিকে স্থান-কালের পরিপ্রেক্ষিতে স্ব স্ব অনুভব-উপলব্ধি অনুসারে তাদের রোষ প্রতিরোধের লক্ষ্যে এবং সন্তোষ ও কৃপা-করুণা পাবার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য ও যথাবুদ্ধি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবস্থা করেছে। সে-সব নিয়ম-নীতি, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি অবশ্য স্থানে স্থানে, কালে কালে, গোত্রে গোত্রে পরিবর্তিত, বিবর্তিত, বিবর্জিত, পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত ও বিকল্পযুক্ত হয়েছে। এ তাৎপর্যে প্যাগান আমল থেকেই অদৃশ্য স্রষ্টা ও শক্তি পূজার নিয়ম-নীতির, রীতি-রেওয়াজের জন্ম-মৃত্যু ঘটেছে অসংখ্যবার। মানুষের প্রজন্মক্রমে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিজ্ঞতা-অভিজ্ঞতার, যুক্তির, সাহসের, বিচার-বিবেচনা শক্তির বিকাশ প্রভৃতির দরুন আচারিক পালা-পার্বণের Arts-এর ও Ritual-এর উদ্ভব ও বিলুপ্তি ঘটে। মানুষের তথাকথিত ধর্মবোধ ও শাস্ত্রগুলো সভ্যতার বিশেষ উন্নতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন নতুন রূপ লাভ করেছে কেননা মানব বুদ্ধিতো সব সময়েই উৎকর্ষ লাভ করছে কোথাও কোথাও, কোনো না-কোনো গোত্রে, গোষ্ঠীতে। এভাবেই তো সভ্যতা এগিয়েছে। মানুষের তো জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। সাহসের অভাবে উচ্চারণ করতে ভয় পায় সাধারণ মানুষ, পাছে আসমানী উপাস্য অদৃশ্য জীবননিয়ন্তা শক্তি রুষ্ট হয়ে তাকে সবংশ বিনাশ করে। তাই দুনিয়ায় দ্রোহী ও নতুন মত প্রচারক লোক কোটিতে ক্বচিৎ কখনো গুটিক মেলে। মানুষ বাস্তব জীবনে অর্জনের ও ভোগের ধান্ধায় জাগ্রত মুহূর্তগুলো ব্যয় করে। এ জন্যেই ওরা কখনো জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগে তার শাস্ত্রিক জীবনের যৌক্তিকতা, উপযোগ, প্রয়োজন যাচাই করে না। এ ক্ষেত্রে সে গতানুগতিক শিক্ষিত-অশিক্ষিত, জ্ঞানী-গুণী নির্বিশেষে।

এ এমন এক গোলকধাঁধা, এর থেকে কেউ বের হতে পারে না, চেষ্টাও করে না, সাহসও পায় না। এ জন্যেই ভারতে বেদ-উপনিষদ হয়ে ছয়টা দার্শনিক মতেরও সৃষ্টি হল। এদের মধ্যে লোকায়তিক চার্বাক মত ছাড়াও সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক ও পূর্বমীমাংসা মূলত নাস্তিক্যমত, আর বৌদ্ধমতও নাস্তিক্যই, তবু বাঁধন খোলে না কারো, সবাই এক এক প্রকারের বাঁধনে আজো বাঁধা। জৈন অনেকান্তবাদ, বৌদ্ধ স্কন্ধ-নির্বাণবাদ, সাংখ্যযোগে অনুপ্রবিষ্ট ঈশ্বরবাদ সবাইকেই বন্ধনমুক্তির অন্বেষায় ঘুরিয়ে মারছে, মন-বুদ্ধি-চিন্তার মুক্তি দেয়নি কাউকেও। নিরীশ্বর-নাস্তিক-ঐহিক তথা মর্ত্যজীবনবাদী করে গড়ে তোলেনি আজ অবধি কোনো মতবাদী সম্প্রদায়কে। লোকায়তিকরাও এক কানাগলি ছেড়ে আর এক অপকৃষ্ট কানাগলি আশ্রিত হয়ে ধন্য, স্বস্থ ও নিশ্চিন্ত হয়।

তবু মানুষের মধ্যে কেউ না-কেউ সাহসী আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ থাকে, যে নিজের যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞানকে সম্বল ও পুঁজি-পাথেয় করে তার জিজ্ঞাসা, কৌতূহল, সন্দেহ, অবিশ্বাস যুক্তিযোগে প্রচার করে গঞ্জনা-লাঞ্ছনা-হত্যার ভয় না করেই। আগের যুগে বিজ্ঞান ছিল না, মানুষের মন-মগজ-মনন-মনীষার অনুশীলনজাত উপলব্ধিকেই 'জ্ঞান' নামে স্বীকার করা হত। যদিও প্রমাণসম্ভব বা প্রমাণিত না হলে কিছুই 'জ্ঞান' হতে পারে না। শাস্ত্র, দর্শন, আপ্ত-বাক্য, প্রবাদ, প্রবচন, সূক্তি সবকিছুই হচ্ছে উপলব্ধির সত্য, প্রমাণিত তথ্য বা তত্ত্ব নয়। সতেরো শতকের আগে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান-সত্য খুব কমই মানুষের জানা ছিল। বিজ্ঞানের প্রসাদে এখন আমরা সমুদ্রের তলদেশের, পর্বতের ভেতরকার, অরণ্যের গভীরের, নভমণ্ডলের প্রমাণিত, প্রমাণসাধ্য 'জ্ঞান' অনেক অর্জন করেছি। এ জন্যেই বিশ্বের বিদ্বান ও জিজ্ঞাসু যুক্তিবাদী মানুষের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণামুক্তি ঘটছে। মানুষ নিরীশ্বর হচ্ছে, নাস্তিক হচ্ছে, যুক্তিবাদী হচ্ছে, উদারতাবাদী হচ্ছে, শ্রেয়কে, সত্যকে, ন্যায়কে গ্রহণে বরণে আগ্রহী হচ্ছে, জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-যোগ্যতা-দক্ষতা নির্বিশেষে মানুষকে কেবল 'মানুষ' হিসেবে গ্রহণে বরণে আগ্রহী হচ্ছে। কোথাও কোথাও রাষ্ট্রিক বিচ্ছিন্নতার দেয়াল ভাঙতেও রাজি হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের জিজ্ঞাসা, শাস্ত্রিক সত্যে অনাস্থা মানুষের মনে নতুন নতুন অন্বেষা জাগিয়েছে। আজ তাই বিশ্বের উদ্ভবতত্ত্ব, বিগব্যাঙ, ব্ল্যাকহোল, স্রষ্টার অনস্তিত্ব প্রভৃতি হচ্ছে আলোচনার ও গবেষণার বিষয়। এ অন্বেষা মানুষকে শিগগির আরো অনেক অভাবিত সত্যের প্রমাণিত রূপ দেখাতে পারবে। এ জ্ঞান মানুষের দিন দিন বাড়বে। শাস্ত্রিক সত্য এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারবে না, পোপ নতুন সত্য অস্বীকারের কারণ বা যুক্তি খুঁজে পাবেন না। দেশ-কাল-জীবনের প্রয়োজন ও দাবি কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তাই কায়রো সম্মেলন ব্যর্থ হলেও, ওই সব দাবি পূরণ করতেই হবে সমাজকে। করতে হবে বিশ্বমানবকে শোষণ-শাসন-পীড়ন-বঞ্চনা-প্রতারণামুক্ত। সেদিন দূরে নয়, অতএব মাভৈঃ।

এক ইরানী মনীষী বলেছিলেন, 'পৃথিবী হচ্ছে এক ছেঁড়াপুঁথি, এর আদি গেছে খোয়া, অন্ত রয়েছে অলিখিত।' এ জন্যেই যার যেমন মেধা-মন-মগজ-মনন-মনীষা সে তেমনভাবে এ জগৎ ও জীবন দেখেছে, দেখছে ও দেখবে আর জগতের ও জীবনের তাৎপর্য ও পরিণাম সন্ধান করেছে, করছে ও করবে। এ বিজ্ঞানের যুগে প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো আদি ছেঁড়া অংশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নমুনা, ছায়া-কায়া-কঙ্কাল নিঃসংশয় অনুমান করা সম্ভব হবে এবং অন্তের মিলবে আভাস। মানুষের জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা চিরকাল চলতে থাকবে, তাতে বদলাবে শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কৃতি, রুচি, সৌন্দর্যবুদ্ধি, ইতিহাসচেতনা, দার্শনিকচিন্তা, চিত্রশিল্প, সাহিত্যশিল্প, স্থাপত্য, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি, মানবিকতা, মানবতা, মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে ধারণা। আবিষ্কৃত হবে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সব তত্ত্ব। প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো, নৃবিজ্ঞানীর মতো মানুষ নতুন করে জানবে বুঝবে জগৎ ও জীবন, বুঝবে বিশ্বব্যবস্থা। প্রযুক্তির প্রকৌশলের হবে বিস্ময়কর অভাবিত উন্নতি, কম্প্যুটার-ফ্যাক্স তখন হবে আটপৌরে সেকেলে যন্ত্র। জিজ্ঞাসা ও অন্বেষাই মানুষকে মনে-মগজে-মননে-মনীষায় আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে অনন্য অসামান্য যান্ত্রিক কাঠামো নির্ভরতায় অধীশ্বর করে তুলবে মর্ত্যজীবনের।

প্রগতিশীলতার সংজ্ঞা

প্রগতিবাদীদের ও মৌলবাদীদের দ্বন্দ্বকে যদি আমরা নতুনে আসক্তি ও পুরাতনে অনুরাগ, সম্মুখের আকর্ষণ ও পশ্চাতের টান, অতীত আর ঐতিহ্যমুখিতা ও দেশ-কাল-জীবন-জীবিকার চাহিদাচেতনা, অনুকরণে-অনুসরণে সমকালীন জীবনযাপনে আগ্রহী ও সৃষ্টিশীল হওয়া আর থাকা এবং কল্যাণকর হলেও বিদেশীর বিজাতির বিধর্মীর বলে কিছু গ্রহণেবিমুখ ও রক্ষণশীল থাকা আর প্রয়োজন, উপযোগ ও তাৎপর্যরিক্ত লৌকিক-অলৌকিক-অলীক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আচার-আচরণ-ভয়-ভক্তি-ভরসা মানসিকভাবে আঁকড়ে থাকা প্রভৃতি প্রগতিশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার দ্বন্দ্ব বলে মানি, তাহলে এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে মুক্তির, নিষ্কৃতির কিংবা বিপরীতমুখী চিন্তার ও জীবনপদ্ধতির সংঘর্ষ-সংঘাত এড়ানোর উপায় হচ্ছে অহিংস পদ্ধতিতে আপোসহীন বিরামহীনভাবে প্রগতিবাদীদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের মাধ্যমে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, যা দৃশ্যত স্বমতে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ থাকার প্রয়াস মাত্র, আর অদৃশ্যে নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার অনুশীলন করা, এক কথায় ফ্রিথিঙ্কার হওয়া এবং আচারে-আচরণে কাল-অনুগ জীবন-জীবিকার চাহিদা পূরণ লক্ষ্যে জীবনযাপন পদ্ধতি গ্রহণ। আমাদের দেশে ও সমাজে, সরকারে ও রাষ্ট্রে মুক্তচিন্তার প্রগতিশীল প্রগতিবাদী লোকের আধিক্য দরকার।

এ কালের সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে প্রগতিবাদী ও প্রগতিশীল কে? আমাদের ধারণায় যারা জাত-জন্ম-বর্ণ-ভাষা-নিবাস-বিশ্বাস-যোগ্যতা-দক্ষতা নির্বিশেষে মানুষকে কেবল মানুষ বলেই জানে ও মানে, যারা শোষিত-বঞ্চিত-প্রতারিত-পীড়িত মানুষকে শাসন-শোষণ-দলন-দমনমুক্ত করে প্রত্যেকটা মানুষকে তার স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ করার ও রাখার সংগ্রামে আস্থাবান, যারা কল্যাণকর যা কিছু নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি তাকে অনুকরণে-অনুসরণে মানব উত্তরাধিকার রূপে গ্রহণ-বরণ করে আত্মোন্নয়নে উৎসাহী, যারা প্রতীচ্য মনীষার সর্বপ্রকার অবদান গ্রহণে-বরণে সদা আগ্রহী, যারা যন্ত্রে, তারে-বেতারে, যানে-বাহনে, প্রকৌশলে-প্রযুক্তিতে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে আধুনিকতম প্রতীচ্য প্রসাদ গ্রহণে জীবনে-জীবিকায়-দেহে-প্রাণে-মনে স্বাচ্ছন্দ্য, সাচ্ছল্য, আরাম ও আনন্দকামী, যারা আজকের সংহত ও পরিচিত পৃথিবীতে আদবে লেহাজে সৌজন্যে এবং চিন্তায় চেতনায় আবিষ্কারে উদ্ভাবনে নির্মাণে, জীবনযাপন পদ্ধতিতে, তৈজসে আসবাবে পোশাকে আহার্যে ভাষায় বৈশ্বিকস্তরে আন্তর্জাতিক হতে উৎসাহী অর্থাৎ অভিন্ন ব্যবহারিক ও মানসসংস্কৃতি সৃষ্টিতে ও বরণে উৎসুক, তারাই প্রগতিবাদী ও প্রগতিশীল। যারা উপযোগ ও তাৎপর্যরিক্ত আচার-আচরণ, পালা-পার্বণ, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি, ভাব-চিন্তা বর্জনে দ্বিধাহীন, যারা যাচাই-বাছাই-ঝালাই করেই দেশ-কাল-জীবন-জীবিকার দাবি অনুগ জীবন ও সমাজ রচনায় উদ্যোগী, যারা প্রয়োজন অনুসারেই আয়োজনে প্রয়াসী, যারা একালে বিজ্ঞানকে ও বাণিজ্যকে দেশ, রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থসম্পদ প্রভৃতির নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক বলে জানে ও মানে, যারা অর্জনে ও বর্জনে সমভাবে প্রয়োজন ও উপযোগ সচেতন, যারা সম ও সহ স্বার্থেই আত্মসংযমে, পরমত-কর্ম-আচরণ সহিষ্ণুতায়, যুক্তিনিষ্ঠায়, ন্যায্যতাবোধে, বিবেকানুগত্যে, মানবতায় ও সৌজন্যে প্রত্যাশিত মানের, মাপের, গুণের ও মাত্রার সংস্কৃতিমান, তারাই প্রাণীর মানব প্রজাতির মধ্যে মনুষ্যত্বে ঋদ্ধ, অন্যরা মনুষ্যত্বে রিক্ত, প্রবৃত্তি চালিত। সংস্কৃতিমান মানুষই দেশের, রাষ্ট্রের ও সমাজের সম্পদ ও সম্বল, বিপন্ন মানুষের অভয়শরণ। এ মানুষই যথার্থ প্রগতিশীল প্রগতিবাদী দেশপ্রেমী গণমানবসেবী এবং আমজনতার আশা-ভরসার অবলম্বন, এরূপ লোকই জনপ্রতিনিধি সাংসদ, মন্ত্রী, আমলা প্রশাসকরূপে নিরুপদ্রব, নিরাপদ নিশ্চিত জীবনের আশ্বাসে আশ্বস্ত রাখতে পারে আমজনতাকে।

এ প্রগতিশীল ও প্রগতিবাদী সর্বসংস্কারমুক্ত প্রয়োজনে গ্রহণ-বর্জনশীল মানুষের সংখ্যাধিক্যেই আমরা মৌলবাদের ও মৌলবাদীর খপ্পরমুক্ত হতে পারব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রগতি-প্রতিক্রিয়াশীলতার লড়াই

মার্কস-এঙ্গেলস্ এক কথায় মানুষকে যৌক্তিক-বৌদ্ধিক নীতি-নিয়মে জীবনযাপনের দিশা দিয়েছিলেন, যা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছিল। ইতোপূর্বে মানবিকতার দোহাই দিয়ে পাপ-পুণ্যের পারলৌকিক পরিণামচেতনা জাগিয়ে বহু বহু গুণী মানবহিতৈষী সমাজসচেতন নবী-অবতার সন্ত-দরবেশ কৃপা-করুণা-দয়া দাক্ষিণ্য যোগে যৌথজীবনে দুস্থমানবতার সেবার দায়-দায়িত্ব পালনে ও কর্তব্য সাধনে ঐহিক-পারত্রিক জীবন সার্থক ও সফল করার দেশনা দিয়েছেন। যা আপ্তবাক্য হিসেবে, মহৎ কথা হিসেবে, নীতিকথা রূপে স্মরেণ্য, মান্য এবং উচ্চারিত হয়ে আসছে। এমনকি এসব তাৎপর্যহীন আচার-আচরণ রূপে টিকেও আছে, কিন্তু শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা-প্রতারণা মুক্ত করতে পারেনি সমাজের দীন-দুর্বল, নিঃস্ব-নিরন্ন অজ্ঞ-অনক্ষর পূর্বেকার দাস-ক্রীতদাস-ভূমিদাস এবং একালের প্রান্তিক বর্গা চাষীদের, কারখানা শ্রমিকদের, ক্ষেত মজুরদের এবং অন্যান্য নিঃস্ব কুলি-মজুরদের আর ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পেশাজীবীদের। অদৃশ্য শ্রেণীপ্রতিযোগিতা-শ্রেণীপ্রতিদ্বন্দ্বিতা অর্থ-সম্পদের অর্জন ও মালিকানা নিয়ে চলছেই স্বয়ম্ভরজীবনযাপনে আগ্রহী প্রাণীর মানব প্রজাতির মধ্যে সভ্যতার উষাকাল থেকেই। এ নিত্যকার কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানির নাম সবল-দুর্বল দলের শ্রেণী সংগ্রাম। সে-সংগ্রামে নগণ্য সংখ্যক লোক জ্ঞান-বুদ্ধি-ধূর্ততা-শক্তি-সাহস-উদ্যম-উদ্যোম-আয়োজন প্রভৃতির সুনিপুণ প্রয়োগসাফল্যে অর্থ-সম্পদের এবং শাসন-শোষণ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রজন্মক্রমে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে শোষণে-পীড়নে-বঞ্চনায়-প্রতারণায়-হুকুমে-হুমকিতে-হুঙ্কারে-হামলায়-দলনে-দমনে কাবু রেখে পার্থিব সম্পদ ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে নিজেদের মর্ত্যজীবন ধন্য করেছে। শাহ-সামন্ত-জমিদার-মহাজন-সাংসদ-মন্ত্রী-আমলা আর বনজ, জলজ, খনিজ, কৃষিজ উৎপাদিত ও নির্মিত পণ্যের মালিক সওদাগরেরাও শাহ-সামন্ত-মন্ত্রী-আমলার সহযোগী হয়ে ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগের অংশীদার হয়েছে চিরকাল। আজো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও কোথাও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। নিঃস্ব নিরন্ন মানুষ তেমনি দুস্থ দরিদ্র অজ্ঞ অনক্ষর দুর্বল রয়ে গেছে আজো। ব্যতিক্রম মেলে কেবল কম্যুনিস্ট শাসিত রাষ্ট্রে। সেখানে জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম নিবাস দক্ষতা যোগ্যতা নির্বিশেষে মানুষ মাত্রেরই খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্মগত মৌল মানবিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। সুস্থ সবলেরা যোগ্যতা দক্ষতা অনুসারে কাজ পেয়ে ও কাজ করে আর শিশু রুগ্ন বৃদ্ধ পঙ্গু পাগলেরা ভাতা পেয়ে বাঁচার অধিকার পেয়েছে। আর পুঁজিবাদী সনাতনপন্থীদের সমাজে-রাষ্ট্রে প্রতিযোগিতায়-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাড়াকাড়ি মারামারি ও হানাহানি করে বাঁচতে হয় বলে ধূর্ত-দক্ষরা বর্তে যায়। দুর্বল অদক্ষ স্বল্প ও স্থূল বুদ্ধির লোকেরা বঞ্চিত-প্রতারিত-পীড়িত-দলিত হয় নিত্যকার জীবনে। মর্ত্যজীবনে মানবমুক্তির অন্যতম দিশারী ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের (১৮২০-১৮৯৫) মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্তি দিন স্মরণে আসায় উপর্যুক্ত কথাগুলো মনে জাগল।

আজ আমাদের মনে সংশয় জেগেছে, আমরা কি চিন্তায়-চেতনায় সমকালীনতা রক্ষা করে এগিয়ে চলেছি, না কি অতীতের ও ঐতিহ্যের ভয়-ভক্তি-ভরসার বশে পিছিয়ে পড়ছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিছু টানে। আজ আমাদের দেশের রাষ্ট্রে, সরকারের রাজনীতিতে চলছে প্রগতিশীলতার ও প্রতিক্রিয়াশীলতার টানাপোড়েন, লড়াই, অদৃশ্য 'টাগ অব ওয়ার'। এতে চারিত্রিক দার্ঢ্যের অভাবে লাভ-লোভ-স্বার্থতাড়নায় আত্মপ্রত্যয়হীন প্রগতিবাদীরা যেন পিছু হটছে, আপোস করছে প্রতিক্রিয়াশীলতার সঙ্গে। প্রতিক্রিয়াশীলতা যেন সূর্য-চন্দ্র গ্রহণের মতোই ব্যক্তিকে, সমাজকে, সরকারকে, রাজনীতিক দলগুলোকে এবং সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রকে গ্রাস করছে দ্রুতগতিতে। প্রগতি-প্রতিক্রিয়াশীলতার এ লড়াইয়ে প্রগতিবাদের ও প্রগতিবাদীর পরাজয় ও পিছুহটা দেশ-কাল-জীবন-জীবিকা চেতনার ক্ষেত্রে অবক্ষয়েরই, পরিণামভীতির অভাবেরই পরিচায়ক। কেননা এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে যন্ত্রনির্ভর বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পৃক্ত জীবনে এ ঔদাসীন্য, এ সমকাল চেতনাহীনতা, বিজ্ঞানের ও বাণিজ্যের গুরুত্ববুদ্ধিরিক্ততা আত্মহননের পথে নিশ্চিন্তে পা বাড়ানোরই নামান্তর। বাঁচার জন্যেই দেশ-কাল-জীবন-জীবিকা সচেতন হয়ে কালিক জীবনের সর্বপ্রকার চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে। সমকালীনতা অর্জনেরই জন্যে পুরোনো অকেজো নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি বর্জন করতেই হবে, অর্জন-গ্রহণ-বরণ করতে হবে মানব-উত্তরাধিকার রূপে আবিষ্কারক, উদ্ভাবক-নির্মাতাদের বিজ্ঞানের তথ্য-তত্ত্ব-সত্য-যন্ত্রকে, পরিহার করতে হবে ভুল লৌকিক, অলৌকিক, অলীক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা। ভূত-প্রেত-পিশাচ-ড্রাগন-রাক্ষস-ওলা-শীতলা-ষষ্ঠী যে নেই, তা আজকাল গ্রামীণ লোকেরাও জানে ও বোঝে। আমাদের বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী হতে হবে, হতে হবে ফ্রিথিঙ্কার বা মনে-মর্মে মুক্ত আর যুক্তিসঙ্গত মগজী চিন্তা-চেতনাকেই সম্বল করতে হবে। নইলে আমরা জাতি বা রাষ্ট্র হিসেবে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্মত যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবনযাপনে সমর্থ ও অভ্যস্ত হব না। আমাদের উৎপাদনে, নির্মাণে ও উত্তোলনে পণ্য দেশে-বিদেশে বাজারজাত করে অর্থসম্পদ বৃদ্ধি করে স্বনির্ভর ও স্বয়ম্ভর হতে হবে। একজন উদ্যমশীল গৃহস্থ যেমন হয় স্বনির্ভর তেমনিভাবেই। এখনকার মতো বিদেশীর ঋণে-দানে-অনুদানে-ত্রাণে এবং 'এনজিও'র সেবায়-সাহায্যে আমরা কখনো জাতি বা রাষ্ট্র হিসেবে স্বনির্ভর হয়ে মাথা উঁচু করে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্মানের আসন দাবি করতে পারব না। এ বিজ্ঞান-বাণিজ্য-প্রযুক্তি প্রকৌশল চালিত জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সমকালীনতা রক্ষা করতে হলে আমাদের যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে যৌক্তিক-বৌদ্ধিক জীবননিষ্ঠ হতে হবে, গুরুত্ব দিতে হবে বিজ্ঞানে ও বাণিজ্যে। আমাদের অশন-বসন-আবাস-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-চিকিৎসা প্রাপ্তি সম্ভব হবে যুক্তিবাদী হলে, ফ্রিথিঙ্কার হলে। আর গতানুগতিক অভ্যস্ত জীবন দেশ-কাল-জীবন-জীবিকা বিরুদ্ধ হলে তা বর্জন করার মতো শক্তি-সাহস পাব মুক্ত ও যুক্তিনিষ্ঠ মন-মগজ-মনন-মনীষার চর্যায় ও চর্চায়। প্রগতি-প্রতিক্রিয়াশীলতার লড়াইয়ে আপোসহীন বিরামহীন মগজ-মনীষা প্রয়োগে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে সাহসের সঙ্গে যৌক্তিক-বৌদ্ধিক প্রতিরোধ অলঙ্ঘ্য-অপরাজেয় করে তুলতে হবে। এ কাজ ফ্রিথিঙ্কারের, মুক্তচিন্তকের, তরুণ-তরুণীর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের কালিক প্রয়োজন চেতনার নাম প্রগতিশীলতা

সংস্ত্রায় ও সংস্ত্রার্থে জীবনের দৈশিক কালিক প্রয়োজন চেতনার নাম প্রগতিশীলতা। প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া, প্রগতিশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা কোনো দেশে কালে সীমিত দ্বন্দ্বের ইতিবৃত্তান্ত নয়। সংস্কৃতি-সভ্যতার উন্মেষকাল থেকেই এর উদ্ভব। এ তাৎপর্যে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল পৃথিবীর সর্বত্র সব গোত্রে, গোষ্ঠীতে, সমাজে এমনকি পরিবারেও চিরকালই সহাবস্থান করছে। কেননা মানুষের মন-মগজ-মনন-মনীষা অভিন্ন ধারায় চালু থাকে না। কল্পনা-বিস্ময়-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতা-রুচি প্রভৃতির গাঢ়তা, গভীরতা, মান, মাপ, মাত্রা অনুসারে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যৌক্তিক বৌদ্ধিক ও রৌচিক পার্থক্য ঘটে। ফলে দেখা দেয় মনের মতের পথের আদর্শের উদ্দেশ্যের ও শ্রেয়-সচেতনতার বৈসাদৃশ্য, বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে গোত্রে গোত্রে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে এ কারণে মারামারি-হানাহানি হয়েছে। ওরা জয়ে-পরাজয়ে, হননে-দহনে, বিনাশে-বিতাড়নে খুঁজেছে সমাধান। প্রবল টিকেছে, দুর্বল হয় বিলুপ্ত হয়েছে অথবা পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। আজো বিশ্বের অনুন্নত এমনকি উন্নত দেশেও 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি কেজো ভূমিকা পালন করে। মুখে উচ্চারিত এবং আলাপে ভাষণে দেশনায় স্বীকৃত ও প্রচারিত ন্যায়নীতি আজো কার্যত অচল। এখনো পৃথিবী শাসিত হয় অর্থের, অস্ত্রের, জনবলের জোরে ও জুলুমে। কাজেই গোটা দুনিয়ায় জাতে জন্মে বর্ণে ধর্মে ভাষায় বিদ্যায় বুদ্ধিতে কৌশলে মতে দক্ষতায় যারা দুর্বল ও সংখ্যালঘু তারা সর্বত্র সংখ্যাগুরুর জোর-জুলুমের শিকার। তাই জুলুম, জালিম আর মজলুম আকীর্ণ পৃথিবী আজো এ মুহূর্তেও। শান্তিতে নিরুপদ্রব ও নিরাপদ নির্বিরোধ সহাবস্থান আজো স্বপ্নের ও সাধের স্তরে রয়ে গেছে, বাস্তবে কার্যকর হয়নি কোথাও। কাজেই কাড়াকাড়ি মারামারি হানাহানি প্রভৃতি মানবমুক্তির সহায় হয়নি কোথাও কখনো। বরং প্রগতির ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বে নির্বিরোধ নির্বিবাদ নিরুপদ্রব ও নিরাপদ সহাবস্থানে থেকে একালের জাতিসঙ্ঘের
দ্বন্দ্বে নির্বিরোধ নির্বিবাদ নিরুপদ্রব ও নিরাপদ সহাবস্থানে থেকে একালের জাতিসঙ্ঘের
স্বীকৃত ও প্রচারিত মৌল মানবিক অধিকারভুক্ত ব্যক্তির স্বচিন্তা-স্বমত প্রকাশের, প্রচারের ও মুদ্রণের জন্মগত অধিকার প্রয়োগের দাবি ও অধিকার প্রতীচ্য প্রভাবিত আধুনিক তৃতীয় বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হলেও প্রয়োগের অধিকার নানা স্থানিক ও সামাজিক কারণের মারপ্যাঁচ উল্লেখে হরণ করা হয়ে থাকে। কাজেই অধিকার কেতাবে আছে, জীবনাচরণে নেই। হিংস্রতায় মানুষ শ্বাপদের চেয়েও মাত্রায় বেশি এবং জগতে অতুল্য। তবু অভিজ্ঞতা থেকে, ইতিহাসের সাক্ষ্যেও বলা চলে যে রেনেসাঁসের প্রভাব যেমন শেষাবধি ঠেকানো যায়নি, ফরাসী এনলাইটমেন্ট যেমন গাঢ়-গভীর প্রভাব ফেলতে পেরেছিল, জোয়ান অব আর্ককে পুড়িয়ে মেরেও য়ুরোপ যুক্তি-বুদ্ধি-বিজ্ঞানযোগে বিবেকী হয়ে উঠেছিল যেমন, তেমনি প্রগতিবাদীরাও স্থির বিশ্বাস ও ধীর বুদ্ধি প্রয়োগে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের, নীতি-নিয়মের, রীতি-রেওয়াজের, প্রথা-পদ্ধতির কালিক উপযোগ ও তাৎপর্যহীনতা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতে পারলে জিজ্ঞাসু বুদ্ধিমান শ্রোতা বা পাঠক সহজেই প্রভাবিত হয় এবং হবে। এভাবেই তো যুগে যুগে দেশে দেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোত্রে গোত্রে, অঞ্চলে অঞ্চলে নতুন শাস্ত্র, সমাজ, মন-মত-পথ এবং নতুন কালোপযোগী প্রয়োজনানুরূপ জীবনধারা তৈরি হয়ে হয়ে আজকের এ অবস্থায় এসেছে উন্নততর উদ্যমশীল মননশীল যুক্তিবাদী বুদ্ধিনিষ্ঠ সংস্কৃতিমান সভ্য সমাজ। প্রাগ্রসর সংস্কৃতিমান মতবাদী সম্প্রদায়ও গড়ে ওঠে এভাবেই। গ্রামীণ দ্রোহীবৃদ্ধ আরজ আলী মাতুব্বর এ সূত্রে স্মরণ্য। অভ্যস্ত রীতিতে আস্থাবান আশ্বস্ত লোকদের থাকে পুরোনো প্রীতি এবং নতুন ভীতি। তাই তারা হয় রক্ষণশীল, অসহিষ্ণু ও প্রতিক্রিয়াশীল। ইতিহাসের এ সাক্ষ্য জানা থাকা সত্ত্বেও মানুষ পরিণত বয়সে প্রতিক্রিয়াশীল হয়, যে তরুণ প্রগতিশীল ছিল, সেই প্রবীণ হয়ে হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল। আমরা জানি, প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বে পৃথিবীর সর্বত্র সবযুগের শেষাবধি জয় হয়েছে প্রগতিপন্থীদেরই। যদিও সক্রেটিস থেকে আজ অবধি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজে ও গোত্রে নতুন চেতনার ও নতুন চিন্তার উদ্ভাবক, ধারক, বাহক ও সমর্থক প্রভৃতিকে শাস্ত্রের, সমাজের, মানুষের ও সরকারের শত্রুরূপে চিহ্নিত করে দমনে দলনে হননে বিলুপ্ত করা হয়েছে, তবু তাদের উচ্চারিত বাণী বায়ুবাহনে তারে-বেতারে, যানে-বাহনে, মুখে মুখে, কানে কানে এবং লিখিত মুদ্রিত গ্রন্থের মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে অবিনশ্বর হয়ে রয়েছে পৃথিবীব্যাপী। কাজেই বক্তাকে কর্তনে দহনে হননে বিনাশ করা সম্ভব ও সহজ কিন্তু তার উক্তি বিলোপ করা মনুষ্যসাধ্যের অতীত।

এ জন্যেই মানবহিতৈষী মাত্রেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে কালের দাবি ও প্রয়োজন অনুগ জীবনযাপন করার জন্যে জনগণকে বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-পালা-পার্বণ-আচার-আচরণ প্রভৃতির উপযোগশূন্যতা, কালিক প্রয়োজন ও তাৎপর্য সম্বন্ধে সচেতন করা এবং উপযোগ, প্রয়োজন ও তাৎপর্য রিক্ত বা হৃত সবকিছু বর্জন করার আর কালানুগ জীবনযাত্রার প্রয়োজনে যে-কোনো কারো যে-কোনো কিছু অর্জন করার কিংবা অনুকরণ-অনুসরণ করার মতো উদার অসংকোচ মন ও রুচি গড়ে তোলার জন্যে প্রেরণা-প্রণোদনা-প্রবর্তনা দান। নতুনের প্রতি আগ্রহ, অনুরাগ, নতুন কিছু গ্রহণে বরণে উৎসাহ হচ্ছে প্রগতিশীলতারই লক্ষণ। মুক্ত চেতনা, মুক্ত চিন্তা, মুক্ত মন, মুক্ত বুদ্ধি এবং মুক্ত যুক্তি ও মুক্ত রুচি প্রভৃতির অনুশীলন না করলে প্রগতিপ্রীতি মানুষকে প্রগতির প্রাগ্রসরতার পথে সহজে এগিয়ে নেয় না। তাই এ ক্ষেত্রে সচেতন চর্যা বা অনুশীলন আবশ্যিক ও জরুরি। আলাপে-আলোচনায় সভে-সমিতিতে কিংবা আড্ডায় বহু মনের মতের মগজের মননের মনীষার প্রভাবে, বিনিময়ে সমন্বয়ে সংমিশ্রণে প্রগতিশীলতা অবাধে প্রবহমান থাকে। এ জন্যে তরুণ-তরুণীদের, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এবং যে-কোনো বয়সের প্রগতিবাদীদের ফ্রিথিঙ্কারস ফোরাম গড়ে তোলা বাঞ্ছনীয়। এর একটা প্রমাণ আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে। পাকিস্তান যখন হল, তখন বিধর্মী দ্বেষণা ও স্বধর্মীর আচার-আচরণ-সংস্কৃতি প্রভৃতির ভাষিক, পোশাকী, আচারিক প্রতীকী অনুকরণ এবং পাঁচ হাজার বছর ধরে চালু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কিছু রীতি-রেওয়াজ প্রথা-পদ্ধতি চালু করার প্রয়াস দেখা গেল একশ্রেণীর তরুণ-প্রবীণ উৎসাহী তমদ্দুনকামীদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে ও লেখায়। কিন্তু প্রগতিবাদীদের নীরব অথচ সচেতন সতর্ক প্রতিরোধ প্রচেষ্টা যখন ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে ও লেখায় গানে চিত্রে নাটকে ভিন্নরূপে সমান্তরালভাবে প্রকাশ পেতে থাকে, তখন দেখা গেল, রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াশীলরা ১৯৫৭ সালের মধ্যেই কাগমারী সম্মেলনের পরেই জনপ্রিয়তা হারিয়ে প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন হয়ে পড়ল, চট্টগ্রামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাসম্মেলন করেও, রওনক নামে সঙ্ঘ চালু রেখেও সমর্থক জোগাড় করা গেল না। অথচ পরোক্ষ ও সক্রিয় নির্বিরোধ পন্থায় চট্টগ্রামের ও ঢাকার ১৯৪৮ সালের, ১৯৫২ সালের কুমিল্লার এবং ১৯৫৪ সালের ঢাকার সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রভাব ব্যাপক হয়ে ছড়িয়ে পড়ল দেশের সর্বত্র। ফলে প্রগতিশীলেরা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের আশঙ্কা না করে অবাধে প্রায় নির্বিঘ্নে ১৯৯০ সাল অবধি মুক্তমনে মুক্তবুদ্ধির ও মুক্ত উদার চেতনার অভিব্যক্তি দিতে পেরেছেন সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে। ১৯৯১ সাল থেকে ইসলামবাদী বিএনপি সরকার গদি দখলের গরজে জামাতে ইসলামীর সঙ্গে আঁতাত করার ফলে সরকারের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে অনুমোদনে সাহায্যে সহায়তায় ও উৎসাহে প্রতিক্রিয়াশীলেরা প্রগতিবাদীদের উচ্চারিত প্রতিটি বাক্যেরই প্রতিবাদে-প্রতিরোধে মুখর ও সক্রিয় হয়ে ওঠে, যা এ মুহূর্ত অবধি চলছে। দেশগৌরব কবি শামসুর রাহমানের সংবর্ধনায় বাধাদান হচ্ছে নতুন ধরনের উদ্যোগের ও উপসর্গের নমুনা।

ফ্যাশনও প্রগতিপ্রতীক

AMARBOI.COM

দেশ-কাল-জীবনের প্রয়োজনে জীবনের জীবনযাত্রার চাহিদা প্রজন্মে প্রজন্মে বদলায়। কাজেই জীবনের দাবি পূরণ করতেই হয়। পুরোনো রূপে-রসে-আকারে-রুচিতে জীর্ণ, উপযোগরিক্ত ও তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে, রক্ষণশীল থেকে তা জীবনে বর্জন না করলে প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। প্রজন্মে প্রজন্মে মানুষের রুচি-বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা বিকশিত হয়ে চলেছে। আগের যুগে বিচ্ছিন্নতায় অপরিচিতিতে অসংযোগে মানুষ স্বাতন্ত্র্যে অজ্ঞাত বাস করত গোত্রীয়ভাবে। তাই আবিষ্কার-উদ্ভাবন-নির্মিতির শক্তির অভাব, উপকরণ-উপাদানের অপ্রাপ্তি এবং প্রাকৃতিক প্রতিবেশের প্রাতিকূল্য মানুষকে সমভাবে সংস্কৃতি-সভ্যতায় এগুবার ও উন্নত জীবনযাপনের সামর্থ্য দেয়নি।

গত শতক থেকেই গোটা পৃথিবী মানুষের চেতনার আয়ত্তে ও জ্ঞানের সীমায় আসে এবং যাওয়ার-আসার ও লেন-দেনের আওতায় আসে মাত্র গত শতকের শেষপাদ থেকেই।

তবু তার আগেও মানুষ শম্বুকগতিতে আত্মবিকাশের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল। মানস শক্তির ও সামর্থ্যের প্রয়োগে অনুকূল প্রাকৃতিক প্রতিবেশে কোনো কোনো গোত্র এগিয়েছে, সংস্কৃতি-সভ্যতায় চলচপলার চমক লাগিয়েছে, জানাজগতে প্রভুত্ব করেছে। অন্যরাও কিন্তু নিষ্ক্রিয় ছিল না। কেননা মানুষের মধ্যে রয়েছে কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, উচ্চাশা, স্বাচ্ছন্দ্যবাঞ্ছা, সাচ্ছল্যকাঙ্ক্ষা, আবিষ্কারের-উদ্ভাবনের-নির্মিতির স্বাভাবিক বৃত্তিপ্রবৃত্তি। তবে মধ্যযুগ অবধি আধুনিকতম বিজ্ঞানের প্রসাদবঞ্চিত সমাজ জীবনযাপন পদ্ধতিতে তেমন পরিবর্তন আনতে পারেনি, আবর্তনই ছিল বেশি, বিবর্তন ছিল নগণ্য, বিকল্প ছিল অজ্ঞাত, অর্জন ছিল না, তাই বর্জনও ছিল না সম্ভব ও সহজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকের যানবাহনবহুল যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জীবনে ও জগতে এসেছে পূর্বের রূপকথায়ও অকল্পনীয় জীবনযাত্রার নতুন রূপ, নিয়ম-নীতি, রেওয়াজ-রীতি এবং প্রথা-পদ্ধতি। আজ সমুদ্র-পর্বত-অরণ্যের বাধা নেই, নেই নভলোকের দুর্গমতা। আজ তার-বেতার রেডিও-টিভি, ক্যাসেট-স্যাটেলাইট-এ্যান্টেনা, কম্প্যুটার-ফ্যাক্স-ফোন যোগে বদ্ধঘরের মধ্যেই দুনিয়ার যাবতীয় রটনা-ঘটনা-দৃশ্য কানের কাছে চোখের সামনে বাস্তব হয়ে ধরা দিচ্ছে। পৃথিবী আজ আর বিরাট, বৃহৎ নেই, একেবারে একটা 'জনপদ' হয়ে সবাইকে একত্র বসবাস করাচ্ছে মানসিকভাবে। এখন মানুষ মাত্রই নানা স্বার্থ সম্পৃক্ত প্রতিবেশী পরস্পরের। ঘরে বসেই বেকার অচল রুগ্ন বৃদ্ধ দুনিয়ার তাবৎ দৃশ্য ও ঘটনা, কাজের-অকাজের, বিরোধের-বিবাদের, বিলাসের-বিনোদনের বিষয় শুনতে, দেখতে ও জানতে পারে। আগের কালের মতো বই পড়ে বয়ান মুখস্থ করতে হয় না। শ্রম ও সময় আগের মতো জীবনযাত্রায়, জীবিকা অর্জনে ব্যয় করতে হয় না। ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগের এমন অচিন্ত্য ব্যবস্থা আজ যে-কোনো উদ্যোগী-উচ্চাশী মানুষের আয়ত্তে। যে-কোনো যন্ত্র-প্রযুক্তি-প্রকৌশল প্রয়োগে মানুষের ব্যবহারিক জীবনযাত্রা বিচিত্র ও বিস্ময়কর করে তুলেছে। মানুষও তাই পৃথিবীর সর্বত্র গ্রহণশীল হয়েছে প্রয়োজনে, স্বাচ্ছন্দ্যলোভে, সাচ্ছল্যবাঞ্ছাবশে এবং আধুনিকতম রুচির আকর্ষণে।

আমাদের দেশেই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে পেটের দায়ে গরীবের মেয়েরা শাস্ত্রের নিষেদ উপেক্ষা করে, সমাজের নিয়ম লঙ্ঘন করে একা অসহায় অবস্থায় কাজ করে চলেছে লক্ষে লক্ষে। এক সময়ে আমাদের কবি গোলাম মোস্তফা ইসলামী লেবাস হিসেবে সালোয়ার-কামিজ চালু করার জন্যে অনেক লেখালেখি করেছিলেন কিন্তু কোনো ফল হয়নি, পরে বাসে-ট্রামে ওঠা-নামার, হাটে-বাজারে দ্রুত চলাফেরার সুবিধে হবে জেনে-বুঝে কোলকাতার হিন্দুর মেয়েরা সালোয়ার-কামিজ ধরে, কেউ কেউ ধরে প্যান্ট-শার্টও। তখন তাদের প্রভাবে তা আমাদের শহরে-বন্দরে, গাঁয়ে-গঞ্জে সর্বত্র চালু হয়ে যায়। এর জন্যে প্রচারপত্র বিলি করতে হয়নি, বিজ্ঞাপনও দিতে হয়নি কোথাও। আজ এ পরিচ্ছদই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে শিক্ষিত সমাজে। এ সঙ্গে ধনিক-বণিক মানী সমাজে মেয়েরা প্যান্ট-শার্টকেও গ্রহণে এগিয়ে এসেছে। যেমন আমাদের পুরুষদের ধুতি-পাজামা ছেড়ে প্যান্ট পরার জন্যে কখনো রাস্তায় মোড়ে চোঙা ফুঁকে কিংবা ভেঁপু বাজিয়ে আবেদন জানায়নি কেউ। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে প্যান্ট পরুয়ার সংখ্যা শতে পঁচানব্বই। কোলকাতায়ও প্যান্ট আর রাজপুতের চোঙা পাজামা হিন্দু সমাজে জনপ্রিয় হয়েছে, ঘরে হয়েছে লুঙ্গি। কাজেই ফ্যাশনও প্রগতিপ্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ।

এভাবেই চুল বাঁধা, বব করা নারীরা, স্বাধীনভাবে পুরুষের সঙ্গে জীবন-জীবিকার সর্ব ক্ষেত্রে সমান যোগ্যতায় ও সমতালে পা ফেলে চলছে, শ্রমিক মজুর হিসেবেও নারী এখন পুরুষের সহযোগী ও সমকক্ষ। চলচ্চিত্রে, নাট্যমঞ্চে, অভিনয়ে রেডিও-টিভি-ক্যাসেটে নাচে-গানে-বাজনায় কিংবা আদালতে বিচার কার্যে, দফতরে কর্ত্রীপদে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে মালিকানায়-পরিচালনায়, রাজনীতিক দলের নেতৃত্বে-কর্তৃত্বে, শাসনে-প্রশাসনে অথবা পার্ষদ, পারিষদ, সাংসদ, মন্ত্রী হিসেবে, কূটনীতিকরূপে নারী আজ কোথায় অযোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে? বিদ্যাচর্চায়, গবেষণায়, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারে, শিক্ষকতায় নারীর যোগ্যতা ক'জন পুরুষ শিক্ষকই বা রাখেন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশ-কাল-জীবনের চাহিদা পূরণের অবচেতন-সচেতন প্রেরণাই নারীকে ঘরের আঙিনার বাইরে টেনেছে, এনেছে, তাকে ঘরে ফেরাবার সাধ্য আছে কার? মৌলবাদীরা কিংবা স্বয়ং পোপ কি পারেন তাদের ফেরাতে? কায়রো সম্মেলন ব্যর্থ হয়েছে কাগজে-কলমে। বাস্তবে দেশ-কাল-জীবনের প্রয়োজন নারীকে শাস্ত্রিক নিষেধ লঙ্ঘনে, সমাজ-শাসন উপেক্ষায়, পুরোনো নীতি-রীতি বর্জনে, উপযোগরিক্ত, তাৎপর্যশূন্য আচার-আচরণ প্রথা-পদ্ধতি পরিহারে বাধ্য করেছে। দেশের কালের এবং প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন বা চাহিদা অনুগ জীবন রচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে হয়েই নারী-পুরুষের পুরোনো সংস্কৃতি-সভ্যতা, বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা বর্জন করে করেই, জীবনের জীবিকার অনুকূল ব্যবস্থা গ্রহণ করে করেই, সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও জীবন এগোয় প্রজন্মক্রমে।

ফ্রিথিঙ্কার্সের প্রভাবে সমাজপরিবর্তন সম্ভব

মানুষের দেহ-মন-মগজের শক্তি যে অশেষ, তা আমরা আজকাল বিজ্ঞানী, দার্শনিক, যন্ত্র আবিষ্কারক, উদ্ভাবক ও সামগ্রী নির্মাতা প্রমুখের অবদান দেখেই জানতে ও বুঝতে পারি। মনে হয় মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। চেষ্টা করলেই, ধৈর্য, অধ্যবসায় ও মগজী শক্তি প্রয়োগে মানুষ আপাতদৃষ্টে যা কিছু অসাধ্য, তা-ও এক সময়ে অতি সহজেই করতে পারবে। আর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োগের অনুশীলনে বিস্ময়করভাবে নানা আপাত অসম্ভব কর্মে জাদুকরের মতো সাফল্য অর্জন যে সম্ভব হয়েছে, তা দেখে জেনে বুঝে আমরা মানুষের শক্তি যে অসীম, তা অনুভব ও উপলব্ধি করি।

কিন্তু মনুষ্যজাতির বিগত আট/দশ হাজার বছরের সংস্কৃতি-সভ্যতার স্থানিক বা আঞ্চলিক ধারার উদ্ভবের ও বিকাশের আর বিলুপ্তির সাক্ষ্যে ও প্রমাণে বোঝা যায় যে কেবল করগণ্য সংখ্যার মানুষের চেতনা-চিন্তার, জিজ্ঞাসার ও অন্বেষার ফুল-ফল-ফসল হচ্ছে স্থানিক, গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক বা জাতিক সংস্কৃতি-সভ্যতা। তাই গোটা পৃথিবীতে ঝড়ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-মারী-ভূকম্প প্রভৃতির অজ্ঞ-অসহায় শিকার মানুষ কখনো সংখ্যায় দ্রুত বাড়তে পারেনি বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আগে। তখন গোত্রগুলো যান-বাহনের অভাবে সমুদ্র-পর্বত-অরণ্য-মরু অতিক্রম করতে পারেনি বলেই পৃথিবীর পরিসর-পরিধি ছিল তাদের কল্পনাতীত, অসীম, অজানা ও অগম্য। পৃথিবীব্যাপী মানুষ থাকলেও তাদের বাস করতে হয়েছে বিচ্ছিন্নতায় অপরিচয়ের ব্যবধানে। বাধা অতিক্রম সম্ভব ছিল না উনিশ শতক অবধি। পৃথিবীর সব স্থলভাগ আবিষ্কৃত হল, জলভাগ পরিমাপ করা হল, পৃথিবীর আকৃতি জানা গেল নির্ভুলভাবে বিশ শতকেই। নভলোকের ঠিকানা-সন্ধিৎসা প্রবল হয়েছে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বিজ্ঞানের বদৌলত প্রযুক্তির প্রসাদে মানুষ আজ বিচরণ করে নভলোকে। আজ অবধি যা কিছু আবিষ্কার-উদ্ভাবন-নির্মিতি সম্ভব হয়েছে, তা স্বল্পসংখ্যক মানুষেরই গবেষণার, সাধনার, জিজ্ঞাসার ও অন্বেষার প্রসূন। কোটি কোটি মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মেছে, প্রাণীর মতো শিশ্নোদরের চাহিদা মিটিয়েছে, দেহের মনের মননের মনীষার চর্যায় চর্চায় থেকেছে উদাসীন। মনের মগজের মননের মনীষার শক্তি রইল সুপ্ত, গুপ্ত ও বন্ধ্যা। কারণ আর সব মানুষ জন্ম-জীবন-মৃত্যুর পরিসরে দেহ-প্রাণ-মনের পরিচর্যায় থাকে অনীহ। তারা শাস্ত্রমানা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও স্বশাস্ত্র জানা-বোঝার গরজ বোধ করে না। আশৈশব শ্রুত, দৃষ্ট, লব্ধ ও প্রাপ্ত লৌকিক-অলৌকিক-অলীক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-ভয়-ভক্তি-ভরসা প্রভৃতি অনায়াসলব্ধ পুঁজিপাথেয়ই তাদের পারত্রিক জীবনের সম্বল ও সম্পদ হয়ে থাকে। উপযোগ ও তাৎপর্যরিক্ত কর্ম-আচার-আচরণ-পালা-পার্বণেই থাকে তাদের শাস্ত্রিক জীবন-চেতনা নিবদ্ধ। এভাবেই তারা পারত্রিক জীবনে গাঢ়-গভীর আস্থা রেখে মোক্ষ কামনা করে। কাজেই 'এমন মানব জমিন রইল পতিত। আবাদ করলে ফলত সোনা' এ কেবল প্রাবচনিক সত্য বা তত্ত্ব ও তথ্য হয়ে রইল আজ অবধি মানুষের সমাজে।

ফলে তারা কখনো মন-মগজ-মনন-মনীষার অনুশীলনে জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনার প্রয়োগে আগ্রহী হয় না। আশৈশব ঘরোয়া ও সামাজিক প্রতিবেশে খণ্ড খণ্ড ভাবে শ্রুত, লব্ধ ও দৃষ্ট ধারণা ও আচার অভ্যস্ত ও অনুকৃত নিয়মে গতানুগতিকভাবে মেনে স্বর্গসুখের প্রত্যাশী হয়। আত্মা, পরলোক প্রভৃতি স্রুতি ও ভীতি প্রসূন মাত্র। মানুষ মাত্রই মর্ত্যজীবনকেই সত্য, খাঁটি ও বাস্তব বলে জানে ও মানে। তাই ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ লক্ষ্যে লাভ-লোভ-স্বার্থবশে মানুষ সারাটা জীবন নানা ধান্ধায় মন-মগজ-মনীষা প্রয়োগ করে। যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে শ্রেয়স বা শ্রেয় যাচাই, বাছাই করে না, অর্জনে-বর্জনে প্রাণীর বৃত্তি-প্রবৃত্তি পরিতৃপ্তির কোনো গরজ অনুভব করে না। শাস্ত্রমানা মানুষ তাই আক্ষরিকভাবে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ মানে রবোটের মতোই, দেশ-কাল-জীবন-জীবিকা তাদের চোখে পরিবর্তমান নয়। তারা আবর্তনবাদী, বিবর্তন তারা স্বীকারই করে না। সেজন্যে স্থানের, কালের, জীবনের, জীবিকার, সমাজের, রাষ্ট্রের সদা বিবর্তমান ও পরিবর্তমান চাহিদাচেতনা বর্জিত তারা। তারা চিরন্তনতাপ্রিয়, স্থিতিতেই তারা স্বস্তি ও সুস্থ বোধ করে, গতিতে তারা আগ্রহী নয়, প্রগতিভীতি তাদের মজ্জায় অথচ আমরা জানি গতিতেই জীবনের স্ফূর্তি, উৎকর্ষ, স্থিতি। তাই ভদ্রভাষায় অর্থোডকস, ফান্ডামেন্টালিস্ট, গোঁড়া ধার্মিক প্রভৃতি শাস্ত্রের মূলবাণী নিষ্ঠ মৌলবাদী। তারা জরার, জড়তার ও জীর্ণতার শিকার। এতকাল এসব মানুষের সামাজিক, বৈষয়িক, ব্যবহারিক, আর্থিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিকজীবনে কখনো গুরু সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। কেননা উনিশ শতকের আগে দাস-ক্রীতদাস-ভূমিদাস-নিঃস্ব-নিরন্ন অজ্ঞ-অনক্ষর-দুস্থ-দরিদ্র মানুষ আত্মসত্তার মূল্য-মর্যাদাচেতনা লাভ করেনি।

একালে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে জনজীবনে ও জীবিকায়, স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার চেতনার উদ্ভবে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে, অর্থ-সম্পদ অর্জনে প্রতিযোগিতার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতার কারণে জীবনে প্রত্যাশিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অনিশ্চিত ও অসম্ভব হয়ে ওঠায়, নিঃস্বতা, নিরন্নতা, দুস্থতা, দরিদ্রতা ঘোচানোর বিকল্প পন্থা আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে অনেক মনীষীই আত্মনিয়োগ করেছেন। উনিশ শতকে অনেক দার্শনিক-চিন্তাশীলের মধ্যে কার্ল মার্কস-এঙ্গেলস একটা নতুন নীতি-নিয়ম উদ্ভাবন করেন একটা কারণ-কার্যতত্ত্বের ভিত্তিতে। এঁদের ভাষায় এ তত্ত্বের, তথ্যের ও সত্যের নাম দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। বঞ্চক-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঞ্চিতের শোষক-শোষিতের শ্রেণীদ্বন্দ্ব। মার্কসই প্রথম আমাদের যুক্তিগ্রাহ্য এ ধারণা দেন যে মানুষ মাত্রেরই রয়েছে অশনে বসনে নিবাসে শিক্ষায় স্বাস্থ্যে চিকিৎসায় জন্মগত অধিকার। সুস্থ-সমর্থ লোককে অর্থোপার্জনের অধিকার দান এবং রুগ্ন, শিশু, বৃদ্ধ, পঙ্গু, পাগল প্রভৃতি অসমর্থদের ভাতা দিয়ে পালন করাই হচ্ছে সরকারের তথা রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে প্রভাবিত হল বুর্জোয়ারাও, তাই তারা শোষিত জনদের কাজ দিয়ে ভাতা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার, অনাহার-মৃত্যু ঠেকানোর ব্যবস্থা করেছে– দায়িত্ব নিয়েছে। পৃথিবীর মানুষ পারিবারিক, গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক, রাজ্যিক, শাস্ত্রিক জীবনে প্রবলের শাসনের শোষণের পীড়নের বঞ্চনার প্রতারণার হুকুমের হুঙ্কারের ও হামলার দাস, ক্রীতদাস, ভূমিদাস ও শাসনপাত্রই ছিল, আজো রয়েছে। শাহ-সামন্ত-বেণে প্রভৃতি পেশীশক্তিতে ধনবলে জনবলে বুদ্ধিবলে প্রবল। তাদের স্বার্থরক্ষার, তাদের ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ অবাধ রাখার অনুকূল শাসন-শোষণই তাদের ন্যায় ও নিয়ম। তাদের কল্যাণই জনকল্যাণের নামান্তর। বলেছি সাধারণ মানুষ নিজের ও স্বজনের ভাত-কাপড় জোগাতে ব্যস্ত থাকে জীবনের জাগ্রত মুহূর্তগুলোতে। অন্নচিন্তা চমৎকার! কাজেই ওরা সংগ্রামী হয় না, দাবি আদায়ে এগিয়ে আসার জন্যে সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে না, জানে না অজ্ঞতা, ভীরুতা নির্ধনতা প্রভৃতি নানা বাস্তব কারণে। এ সুযোগ নেয় ধূর্ত ধনিক-বণিক-রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবী-পেশাজীবীরা। তাই দুনিয়াব্যাপী দরিদ্র আমজনতা এবং জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম নিবাস ভাষা প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্যে ও পার্থক্যে সংখ্যালঘুরা পৃথিবীর উন্নত-অনুন্নত কোনো রাজ্যে-রাষ্ট্রে জান-মাল-মান নিয়ে নির্বিঘ্ন নিরুপদ্রব নিরাপদ জীবনযাপন করে না। হীনম্মন্যতা, গ্লানি, অসহায়তা ও অনিশ্চিতি আর মানসিকভাবে অবজ্ঞার অবমাননার বিড়ম্বনা তাদের প্রজন্মক্রমে জীবনের নিত্যসঙ্গী। মানুষের জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস সংস্কৃতি সভ্যতা প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্যচেতনা বা অস্তিত্বের ভিন্নতা রক্ষার প্রয়াস মানুষকে দলনের, দমনের আর হুকুমের, হুঙ্কারের, হামলার, কাড়াকাড়ির, মারামারির, হানাহানির কারণ হয়ে রয়েছে। এর থেকে মুক্তির রয়েছে চারটি পন্থা: শাস্ত্র নয়, স্রষ্টামানা, নাস্তিকনিরীশ্বর হওয়া, কম্যুনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক হওয়া অথবা নিদেন পক্ষে উদার মানববাদী হওয়া– সেক্যুলার হওয়া। কোনোটাই অবশ্য যুক্তিবাদী বিবেকী না হলে কোনো মানুষই গ্রহণ-বরণ করবে না। কেননা এ সব চেতনা-চিন্তা শাস্ত্রসম্মত নয়। তাছাড়া লাভে-লোভে স্বার্থে শক্তিমান সাহসী ও উচ্চাশী প্রবল দুর্বলের ওপর কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব করতে চাইবেই।

কাজেই বিরোধ-বিবাদ-দাঙ্গা-লড়াই-নরহত্যা থেকে মানুষকে বিরত করা যাবে না। তবে মানবিক গুণের অনুশীলনে সংযম, পরমত-কর্ম-আচরণ সহিষ্ণুতা, যুক্তিনিষ্ঠা, বিবেকানুগত্য, ন্যায্যতাবোধ, উদার মানবপ্রীতি, নির্বিশেষ মানুষকে কেবল স্বপ্রজাতি, জ্ঞাতি বলে মানার মতো সুজন সজ্জন হলেই বিরোধ-বিবাদ-দাঙ্গা-লড়াই-যুদ্ধ-নরহত্যা কমবে। এসব গুণ থাকলেই মাত্র একজন মানুষ সংস্কৃতিমান হয় এবং সংস্কৃতিমান মানুষ হচ্ছে যে-কোনো বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষীর অভয়শরণ। শৈশববাল্যে লব্ধ লৌকিক অলৌকিক অলীক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার ও ভয়-ভক্তি-ভরসা মানুষের মগজ-মনন-মনীষাকে লৌহ-কঠিন কাঁটাল খাঁচায় নিবদ্ধ রেখেছে। ফলে মনে-মগজে কোনো চালু বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-ভয়-ভক্তি-ভরসা আর আচার-আচরণ-পালা-পার্বণ সম্বন্ধে সন্দেহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবিশ্বাস, উপযোগ ও তাৎপর্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না জাগলে যুক্তি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা প্রয়োগে সত্যাসত্য প্রয়োজন-অপ্রয়োজন যাচাই-বাছাই-ঝাড়াই সম্ভব হয় না কারো পক্ষে। মানুষ যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে কল্যাণকর যে-কোনো মত, আচার-আচরণ দ্বিধাহীন চিত্তে প্রযুক্তি-প্রকৌশলের মতো গ্রহণ করতে আগ্রহী হলেই আমরা সমকালীন জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যোগ্য নাগরিক হতে পারব। আমাদের মানবিক গুণের বিকাশ সাধনের জন্যে, মানববাদী ও মানবতাবাদী হওয়ার জন্যে এক কথায় প্রাণীর বৃত্তিপ্রবৃত্তি প্রশমনে মনুষ্যত্বের বিকাশ-বিস্তারকল্পে আমাদের যুক্তিবাদী বা র‍্যাশনাল হয়ে অনুকরণে অনুসরণে মানব-উত্তরাধিকার হিসেবে যে-কোনো শ্রেয়সকে গ্রহণে-বরণে উদার ও দ্বিধাহীন হয়ে নতুন চেতনায় নতুন চিন্তায় মুক্ত বুদ্ধি ও যুক্তিনির্ভর বিবেকানুগত জীবন-যাপনে আগ্রহী হতে হবে।

এক কথায় আমরা মুক্তচিন্তক বা ফ্রিথিঙ্কার হলেই আমরা দেশে কালে জীবনে জীবিকায় সদা বিবর্তমান দাবি বা চাহিদা মিটিয়ে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের জীবনে জীবিকায়, চিন্তায় চেতনায়, সংস্কৃতিতে সভ্যতায়, বিজ্ঞানে-বাণিজ্যে সমকালীন থাকতে পারব। এবং এ ফ্রিথিঙ্কারের সংখ্যা সমাজে দ্রুত বৃদ্ধি পেলেই কেবল রক্ষণশীলতা, অর্থোডকসি, মৌলবাদ প্রভৃতির অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত লোকের সংখ্যা স্বল্প হয়ে যাবে সমাজে, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কিংবা রাজনীতিক অঙ্গনে। রক্ষণশীলতা, শাস্ত্রানুগত্য মৌলবাদ তখন আর সমস্যা হয়ে থাকবে না, যদিও ব্যক্তিগত জীবনে টিকে থাকবে অনেকেরই। তাতে অন্যদের আপত্তির ও আশঙ্কার কারণ থাকবে না।

AMARBOI.COM

সংজ্ঞার্থে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তা

স্বশ্রেণীর বা স্বপ্রজাতির সঙ্গে সম্পর্ক-সম্বন্ধ রক্ষা না করে কোনো প্রাণীই বাঁচতে পারে না। কেননা মৈথুনে প্রজনন প্রক্রিয়া চালু রাখা জীবনে সুখের ও আনন্দের উৎস এবং মর্ত্য-জীবনপ্রীতির তথা বাঁচার আগ্রহের ভিত্তি। মানব প্রজাতির প্রাণীদের যূথবদ্ধ ও দলবদ্ধ হয়ে সহযোগিতায় জীবনযাপন করা বেশি করেই আবশ্যিক ও জরুরি। কেননা তাদের হাত প্রয়োগে সহযোগিতা তাদের প্রকৃতিকে দাস, বশ ও প্রকৃতির সঙ্গে আপোস করে, প্রকৃতি সম্বন্ধে সতর্ক থেকে পরস্পরের মগজী শক্তির সমন্বয়ে সংযোগে মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনে দ্রুত আত্মবিকাশ, আত্মোন্নয়ন সম্ভব। প্রকৃতির রোদ-বৃষ্টি-শৈত্য থেকে আত্মরক্ষা করে নয় কেবল, খাদ্য সংগ্রহে, সঞ্চয়ে, উৎপাদনে ও নির্মাণে অন্য প্রাণীদের মতো জাগ্রত মুহূর্তগুলো খাদ্য সন্ধানে ব্যয় না করে অলস অবসরে উৎকৃষ্ট নীতি-নিয়মে, রীতি-রেওয়াজে, প্রথা-পদ্ধতিতে যৌথ জীবনযাপনের উপায় আবিষ্কারে উদ্ভাবনে সৃষ্টিতে মন-মগজ-মনন-মনীষা প্রয়োগ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, হচ্ছে। পরস্পরের বুদ্ধি, যুক্তি, শক্তি, সাহস প্রভৃতির সমন্বিত প্রয়োগে মানুষ আজ অবধি সমুদ্রের তলদেশের,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরণ্যের গভীরের, পর্বতের অভ্যন্তরের ও চূড়ার, নভলোকের অনেক বিস্ময়কর তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য আমাদের জ্ঞানগোচর করছে। এমনকি আমরা বিশ্বের উদ্ভবতত্ত্বও আন্দাজ করতে পারছি কিছুটা প্রমাণে কিছুটা অনুমানে। পৌরাণিক স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এখন মানুষের পায়ের স্পর্শে ধন্য– যা ছিল কল্পনার জগতের দেব-দৈত্য-রাক্ষস-ড্রাগন-ভূত-প্রেত-ভগবানের অধিকারে এবং মানুষ এদের ভয়ে থাকত ভীত-ত্রস্ত।

হাজার হাজার বছর ধরে মিসরে-ব্যাবিলনে-গ্রীসে-রোমে-চীনে-ভারতে-কেনানে-আনাতোলিয়ায়-পশ্চিম গোলার্ধে-মধ্য এশিয়ায়-য়ুরোপে ব্যক্তি মানুষের মনের-মগজের-মননের-মনীষার বিস্ময়কর অসামান্য অনন্য বিকাশ ও উৎকর্ষ হওয়া সত্ত্বেও, সূক্ষ্ম চেতনা-চিন্তা-অনুভব-উপলব্ধি উঁচুমানের হওয়া সত্ত্বেও, সংস্কৃতি-সভ্যতা বিভিন্ন কলার উদ্ভবে ও উৎকর্ষে মনুষ্যশক্তির অশেষ সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিঃসংশয় ধারণা প্রমাণসিদ্ধ দৃঢ়মূল হওয়া সত্ত্বেও মানুষের যৌথজীবনে তথা পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আজো বাঞ্ছিতমাত্রায় সমস্বার্থে সংযম, পরমত-পরকর্ম-পরআচরণ সহিষ্ণুতা, যুক্তিনিষ্ঠা, ন্যায্যতাবোধ, বিবেকানুগত্য ও সৌজন্য প্রভৃতির প্রয়োজনীয় ও আবশ্যিক অনুশীলন হয়নি আমজনতার মধ্যে। প্রাচীন কেনানে তথা আধুনিক ফিলিস্তিনে-জেরুজালেমে-ইসরাইলে সোয়া লাখ নবী আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে বাইবেল-কোরআনের সাক্ষ্যে আমরা জানতে পারি। অথচ সেই সেমেটিক জগতে ঘটছে সবচেয়ে বেশি রক্তক্ষরা প্রাণহরা সহিংস সংগ্রামে হিংস্রতার শ্বাপদসুলভ বীভৎস প্রকাশ। ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের প্রসারে প্রকৌশল-প্রযুক্তি তার-বেতার যন্ত্রের প্রয়োগে রূপকথায় অভিব্যক্ত মানুষের বাঞ্ছিত অলৌকিক স্বাচ্ছন্দ্যের উপভোগ-সুখ বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এখন মানুষের আয়ত্তে।

কিন্তু আমজনতার মনোলোকে এখনো যুক্তির ও উপযোগচেতনার গুরুত্ববোধের অভাবে এবং আবাল্যের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার প্রভাবে এবং সচেতন জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞার, সংযম-সহিষ্ণুতা-বিবেকের অনুশীলনে অনীহার ফলে আর প্রাণীসুলভ লাভ-লোভ-স্বার্থবুদ্ধি বশ্যতার দরুন আদি ও আদিম প্রাণী পর্যায়ে রয়ে গেছে। এ জন্যেই জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা, ন্যায্যতাবোধ, সংযম, সহিষ্ণুতা, সৌজন্য আজো যথাকালে যথাপ্রয়োজনে যথাস্থানে যথাপাত্রে মেলে না। মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে নৈতিক বা আদর্শিক বাধা-বন্ধন থাকে না, লাভে লোভে স্বার্থে সে মন বদলায়, মত পাল্টায়। সে বেচশম, বেশরম, বেহায়া, বেদানাই, বেআক্কেল, বেআদব, বেল্লিক, বেদরদ, বেলেহাজ, বেঈমান হয়ে যায়। তাই সংস্কৃতি-সভ্যতা-সৌজন্য-সহযোগিতা-সহাবস্থান প্রত্যাশিত মাত্রায় আজো মেলে না কোথাও বাস্তবে।

যদিও আমরা একাধারে ও যুগপৎ কারো ভাই, কারো বাবা-চাচা-মামা, কারো বন্ধু, কারো সহকর্মী– তাতে আমাদের কোনো সমস্যা হয় না। তবু এখন বোঝা যাচ্ছে মানুষের দেহবয়বের সৌকর্যে তথা ঋজুমেরু ও দু'হাত মানুষকে যেমন অন্য যাবতীয় প্রাণীর প্রধান ও প্রভু করে তুলেছে, প্রকৃতিকে দাস বশ ও প্রকৃতির সঙ্গে আপোস করে, প্রকৃতির প্রচণ্ডতা সম্বন্ধে সতর্ক থেকে আত্মরক্ষা করার উপায়সমূহ যেমন আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও নির্মাণ করেছে ওই দু'হাত প্রয়োগে ও পারস্পরিক সহযোগিতায়, তেমনি ওই দু'হাত প্রয়োগের সুযোগ-সুবিধে আয়ত্তে আছে বলেই প্রাণিপ্রবৃত্তিচালিত অসংযত মানুষ লাভে লোভে স্বার্থে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানি-করে। এভাবে বুদ্ধিমান শক্তিমান সাহসী ও উচ্চাশী নগণ্য সংখ্যার মানুষ দাস, ক্রীতদাস, ভূমিদাস করে রেখেছিল লক্ষকোটি মানুষকে গোটা পৃথিবীব্যাপী কিংবা আসমানী দোহাই দিয়ে মানুষকে সুকৌশলে হীনকর্মে, তুচ্ছ পেশায়, ক্ষুদ্র বৃত্তিতে চির নিবদ্ধ রেখে, দরিদ্র রেখে, দাস ও বশ রেখে সর্দার-শাস্ত্রী-সমাজপতি-রাজারূপে গণমানবকে বঞ্চিত রেখেছে হাজার হাজার বছর ধরে। আবার একই প্রয়োজনে মানুষে মানুষে ঈর্ষা-হিংসা-ঘৃণা জাগিয়ে বিচ্ছিন্নতার ব্যবধান চিরন্তন করেছে। জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-গোষ্ঠী-গোত্র-মতাবাদী সম্প্রদায় প্রভৃতির সঙ্ঘশক্তি কেবল দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-ধর্ম-সংঘর্ষ-সংঘাতই জিইয়ে রেখেছে। তাই পৃথিবী এ মুহূর্তেও কোন্দল-দুষ্ট, মাটি আজো রোজ নররক্তে হয় সিক্ত।

অতএব বাহ্য ব্যবহারিক বিচিত্র বিস্ময়কর সংস্কৃতি-সভ্যতার বস্তুগত প্রসার ও উৎকর্ষ যেমন দু'হাতের বদৌলত সম্ভব হয়েছে, তেমনি মানুষে মানুষে রক্তক্ষরা প্রাণহরা বিরোধ-বিবাদ হরণে-হননে-দহনে বৈনাশিক দানবিক প্রচণ্ডতায় চালু রাখা সম্ভব হয়েছে ওই দু'হাত প্রয়োগের ফলেই। পারস্পরিক সহযোগিতা সম্ভব হয়েছে যেমন দু'হাতের বদৌলত, তেমনি সে-সহযোগিতা সম্ভব করেছে ভাষাসৃষ্টি। বুদ্ধি-জ্ঞান-অভিজ্ঞতা-যুক্তি-প্রজ্ঞা বিনিময়ে মানুষ প্রাণিজগতে লাভ করেছে প্রাধান্য ও প্রভুত্ব। এ জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-প্রজ্ঞা-চিন্তা-চেতনা মানুষকে করেছে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ। তাই সৃষ্টি হয়েছে প্রবচন, আপ্তবাক্য, মহৎ দেশনা। ক্ষমা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, স্নেহ, মমতা, প্রেমপ্রীতি, কৃপা, করুণা, দয়াদাক্ষিণ্য, মৈত্রী, নিরুপদ্রব নিরাপদ স্বস্তিতে শান্তিতে সামবায়িক সহযোগিতায় যৌথজীবনে সহাবস্থান প্রভৃতির মহিমা, মাহাত্ম্য, প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি প্রচারিত হয়েছে আমজনতাকে জানিয়ে, বুঝিয়ে শাসনে শায়েস্তা রাখার গরজে। মানবহিতৈষীরা যদিও সর্দার-শাস্ত্রী-শাসক-শাহ-সামন্তের পক্ষেই ছিলেন চিরকাল, তবু আমজনতার শাস্ত্রে ও শাসকে আনুগত্যজাত শান্তি ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য। সন্ত-শ্রমণ-শ্রাবক-দরবেশ প্রমুখ মানবহিতৈষণাকামী মাত্রই দেশনা-বাণী উচ্চারণ করেছেন। আমরা তা স্মরণে রেখেছি, উচ্চারণ করি সভায়-আড্ডায়-ভাষণে-দেশনায়। কিন্তু বাস্তব জীবনাচারে ও আচরণে প্রয়োগ করি না- লাভ নেই বলেই। আমরা সবাই জানি 'ভালো হও, ভালো থেকো, পরের ভালো করো, পরের ভালো চাও, সম্প্রীতিতে বাস করো প্রতিবেশীর সঙ্গে।' এর কোনো বিকল্প নেই। এ-ই হচ্ছে মর্ত্যজীবনে সুখ-শান্তি-আনন্দ-আরাম ও আয়ুবৃদ্ধির উপায়। এ সব আমরা জানি, স্মরণ করি, মুখে উচ্চারণ করি, কথায় মানি, কাজে মানি না। তাই আজো আমরা সুখ কাউকে দিতে পারি না, নিজেরাও সুখ পাই না। ভুল পথে চলি বলেই 'সুখের লাগিয়া যে করে আশা/দুখ যায় তার ঠাঁই।'

আমাদের মধ্যে নীতি-আদর্শ চেতনার গুরুত্ববোধ নেই বলেই আমরা আজো লাটিমের মতো কিংবা কললগ্ন চাকার মতো কেবলই জীবনব্যাপী চলি, কিন্তু মানসিকভাবে সদগুণে মানবিকতায় মানবতায় তথা মনুষ্যত্বে ঋদ্ধ হই না- প্রাণীই থেকে যাই। আমাদের গোটা জীবনে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে কোনো সঙ্গতি, পারম্পর্য ও সামঞ্জস্য থাকে না। আমাদের জীবন প্রায়োগিক ও প্রায়োজনিক এবং সে-তাৎপর্যে সাময়িক। আমরা চলতি-হাওয়ার নয়, লাভ-লোভ-স্বার্থের পন্থী। একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করি, আমরা স্বরাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতাকে ও রক্ষণশীলতাকে বা শাস্ত্রিক মৌলবাদকে ঘৃণা করি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতিক ও রাষ্ট্রিক স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর বলে। অথচ আমরা রাষ্ট্রিক বা শাস্ত্রিক জাতীয়তাবাদী এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবাদী– এগুলোর সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার মৌলবাদের বা অর্থোডকসির শেকড়গত বা মূলগত পার্থক্য কিছু আছে কি?

স্বরাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতা ঘৃণ্য, তেমনি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতার ও সম্প্রীতির পক্ষে রাষ্ট্রিক জাতীয়তাও সংকীর্ণতা বলে পরিত্যজ্য।

'বসুধৈবকুটুম্বকম'ই তথা বৈশ্বিক আন্তর্জাতিক মৈত্রীচেতনাই তো বাঞ্ছনীয় মনুষ্যত্বের-মানবতার উৎকর্ষের জন্যে।

অস্থির-অশান্ত পৃথিবী

প্রাকৃতিক তথা নৈসর্গিক অর্থে নয়, রাজনীতিক, সামাজিক, আর্থিক ও বাণিজ্যিক তাৎপর্যে আজ গোটা পৃথিবীর সব রাষ্ট্রেই অস্থির-অশান্ত-উৎকণ্ঠ-উদ্বিগ্ন এবং শঙ্কিত। কালো আফ্রিকা দারিদ্র্য ও গৌত্রিক সংঘর্ষ-সংঘাতের শিকার। উত্তর আফ্রিকা প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বে বিভক্ত। আরব উপদ্বীপের রাজ্যগুলো মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রের তথা স্বৈরস্বেচ্ছা শাসনের এবং উপযোগরিক্ত সুপ্রাচীন বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার লৌহকঠিন খাঁচায় আবদ্ধ। অন্যদিকে পেলেস্টাইন-ইজরাইল-লেবানন-সিরিয়া প্রভৃতি ইহুদি-খ্রীস্টান-মুসলিম দ্বেষ-দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। প্রাক্তন সোভিয়েট রাশিয়ার বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রগুলো এখনো নানাভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় অস্বস্থ-অস্থির। যুগোস্লাভিয়ার বিখণ্ডিত অংশগুলোর রক্তঝরা প্রাণহরা যুদ্ধে জনজীবন বিপন্ন ও অনিশ্চিত করে তুলেছে। রাশিয়া তার হাজারো সমস্যায় জর্জরিত থেকেও চেচনিয়ায় নরহত্যার উল্লাসে মত্ত। ন্যাটো জোট সমস্বার্থে বিপন্ন অস্তিত্বকে নিরুপদ্রব নিরাপদ করার লক্ষ্যে অভিন্ন সত্তায় ও স্বার্থে একীভূত হওয়ার প্রয়াসে উদ্যোগে-আয়োজনে ও উদ্বেগে কাতর এবং অস্থির। লাতিন আমেরিকাও সমস্যার-দ্রোহে-দারিদ্র্যে জনজীবনের বিপন্নতায় অস্থির অশান্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাফতা প্রভৃতি করেও, 'গ্যাট' করেও, ম্যাক্সিকোর বাজার দখল করেও জাপানী প্রাবল্যে ঘরে-বাইরে প্রতিযোগিতায়-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষোভে-ক্রোধে অস্থির। ডলারের দিন যেন ফুরিয়ে আসছে। জাপান-জার্মানী যেন পৃথিবীর নেতৃত্বের কর্তৃত্বের অভিভাবকত্বের তত্ত্বাবধানের এমনকি পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠছে। মার্কিন সরকারের আর্থ-বাণিজ্যিক-মহাজনী-সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতিক নজরদারির, খবরদারির ও তদারকির অধিকারও যেন অচিরে খর্ব হয়ে আসবে। মিশর, ভারত, উত্তর কোরিয়া প্রভৃতি এখন মার্কিন নির্দেশ না-মানার সাহস দেখাচ্ছে। দুস্থ রাশিয়া মার্কিন অর্থ সাহায্যপুষ্ট হয়েই অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, চীনও নানা কারণে আজ দুস্থ। তবু রাশিয়া ও চীন মার্কিন সরকারের পরামর্শ-প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি জাপানী-ফরাসী-জার্মান সরকারও আগের মতো মান্য করে না মার্কিন সরকারকে যদিও জাতিসঙ্ঘে আজো মার্কিন প্রভাবই প্রবল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপকথার যুগের আদর্শ রাজা-রাজ্য ও সুখী-সুস্থ অনুগত প্রজা পৃথিবীর কোথাও কেউ আজকাল খুঁজে পাবে না। কোন্দল চলছে মধ্য এশিয়ার ভাঙা সোভিয়েত সদস্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরে, কোন্দল চলছে নয় বছর ধরে আফগানিস্তানের বিভিন্ন শাখার ইসলামীপন্থীদের মধ্যে। পাকিস্তানে বিধর্মীর অভাবে স্বধর্মীদের মধ্যেই আর্থিক-দৈশিক-গৌত্রিক এবং মতবাদী সাম্প্রদায়িক স্বার্থে রক্তঝরা প্রাণহরা হানাহানি চলছে প্রায় গৃহযুদ্ধের আকারেই। ভারতে কাশ্মীরের মুসলিমরা, পাঞ্জাবের শিখেরা, ঝাড়খন্ডের আদিবাসীরা, উত্তরপূর্ব ভারতের সাত রাজ্যে গেরিলাযুদ্ধ চালাচ্ছে বহু বহু বছর ধরে, কেউ চায় স্বাধীনতা, কেউ চায় স্বায়ত্তশাসন, কেউ চায় আলাদা রাজ্য। বাঙলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামে আজো সমস্যার সমাধান হয়নি। মায়ানমার কারেনরা স্বাধীনতার দাবি আজো পরিহার করেনি, কম্বোডিয়ায় আপোস আজো দূরস্ত্। ডেঙশিয়াও পিঙের পরে চীনে কিছু একটা ঘটবে এ অনুমান সবারই মুখে মুখে। যদি ঘটে তবে তা হবে প্রায় প্রলয়ঙ্কর। ফিলিপাইনে মুসলিম দ্রোহীরা সরকারকে অস্থির করে রেখেছে বহু বহু বছর ধরে। ওদের দমানো-কমানো যাচ্ছে না যেন। ইন্দোনেশিয়ার জঙ্গীনায়ক মহাপ্রতাপশালী সোহার্তও এখন মৌলবাদীর উত্থানে অস্থির ও উদ্বিগ্ন। মালয়েশিয়ায়ও হচ্ছে সংক্রামিত, মৌলবাদ মৌলবাদী কেবল পাকিস্তানে, ভারতে-বাঙলাদেশে নয়, তুরস্কে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। আর আগেই তো বলেছি পশ্চিম এশিয়ায় ও উত্তর আফ্রিকায় মৌলবাদ রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে, প্রশাসনকে, জননিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছে।

আশ্চর্য যখন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন যৌক্তিক-বৌদ্ধিক ও প্রমাণিত তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য আবিষ্কার করে চলেছেন, যখন বিজ্ঞানের বদৌলত সমুদ্র-পর্বত-অরণ্য-আকাশ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি ও পূর্ণতা পাচ্ছে, যখন মন-মনন-মগজ-মনীষা যুক্তিবাদে ঋদ্ধ ও পুষ্ট হচ্ছে, যখন আমাদের জাগতিক জীবনযাত্রায় প্রকৌশল-প্রযুক্তি-যন্ত্র নতুন নতুন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্য এনে দিচ্ছে, যখন তারে-বেতারে যানে-বাহনে আমরা ধরাকে 'সরা'-বৎ চোখের ও কানের আয়ত্তে এনেছি, যখন চিকিৎসাবিজ্ঞান আমাদের সর্ব প্রকার রোগমুক্তির ব্যবস্থা করে আমাদের আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছে, অকালমৃত্যুর ভয়মুক্ত করেছে, যখন ভূত-প্রেত-পিশাচ-পরী-ড্রাগন-নিয়তি-অদৃষ্ট-কর্মফল-ঝাড়ফুঁক-দারুটোনা, মন্ত্র-মাদুলী-মন্ত্রপূত ধূলি-পানি-পাথরে অনাস্থা বেড়ে গেছে, যখন শিক্ষিত যুক্তিবাদী-বুদ্ধিমান মানুষ জীবনে রাশির প্রভাব অবিশ্বাস করে অন্তত জীবন ঈশ্বরনিয়ন্ত্রিত কি রাশিচালিত সে-সম্বন্ধে অনিশ্চিতির দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মনে পোষণ করে, সে-সময়ে কেন সুপ্রাচীন মৌলবাদ মহিমান্বিত হচ্ছে অবিচল আস্থায়-ভরসায় এবং সুনিশ্চিত অবলম্বন হিসেবে?

এ কি জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি ও জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে অর্থ-সম্পদ অর্জনে খাদ্য সংগ্রহে অনিশ্চিতি বৃদ্ধির ফল? একি আত্মপ্রত্যয়হীন সামর্থ্যহীন যুক্তি-বুদ্ধিরিক্ত অনন্যোপায় মানুষের অদৃশ্য নিয়তি, দৈবশক্তি নির্ভরতার লক্ষণ? এ কি পার্থিব সুখে সাফল্যে-দুরাশা-নিরাশা-হতাশাজাত মানসিক অসহায়তার সাক্ষ্য?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বদেশে-বিদেশে মানবমুক্তিপন্থা

আমরা জানি, জীবন ফুলশয্যা নয়, পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, চলার পথে কাঁটা থাকে, পিচ্ছিল কাদা থাকে, নদী-নালা-খাল-খাদ থাকে, নিটোল নিখাদ নিখুঁত সুখ-স্বস্তি-শান্তির লাগাতার জীবন অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। জীবন দুঃখ-সুখের দোল-দোলানো বিচিত্র চেতনা সমষ্টি, যা অনুরাগে বিরাগে আসক্তিতে বিরক্তিতে জড়ানো– মেঘ-রোদের খেলা যেন। তাই মর্ত্যজীবন প্রিয়, তাই আমরা জীবনের অবসান আশঙ্কায় নিত্য ভীত। মৃত্যু নয়– আয়ুই কাম্য এমনকি অসহ্য যন্ত্রণার রুগ্ন অবস্থায়ও। কাজেই চলার পথের কাঁটা দলেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে জীবনের ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ বাঞ্ছা পূর্তির আকর্ষণে।

অতএব কৈশোরে-যৌবনেই স্থির করতে হবে কে জীবন কোন্ লক্ষ্যে চালিত করবে। আমাদের আজকের সমাজে অবক্ষয়ের লক্ষণ সব বয়সের মানুষের মধ্যে যেন দ্রুত সংক্রমিত হচ্ছে। জীবন যেন কেবলই ঘৃণা-লজ্জা-ভয়মুক্ত বেপরওয়া স্বেচ্ছা ও স্বৈর বিহারে ও আচরণে ব্যয় করার সম্পদ। আমাদের অজ্ঞতার অনক্ষরতার নিঃস্বতার নিরন্নতার দুস্থতার দরিদ্রতার দরুন আমাদের অতীতের তেমন কোনো গৌরব-গর্বের সম্পদ-সম্বল নেই, আমাদের বর্তমান নির্লক্ষ্য। বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে যথেচ্ছ ভেলা ভাসানোর ও গন্তব্যে পৌঁছার সুনিশ্চিত সহজপন্থা রূপে বিবেচিত হচ্ছে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ও উচ্চাশী কিন্তু নৈতিক-আদর্শিক-মানবিক পুঁজি-পাথেয়রিক্ত বিভিন্ন বয়সের, পেশার ও শ্রেণীর মানুষের মধ্যে। আমাদের অতীত শূন্য, বর্তমান অনিশ্চিত এবং ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট। আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের সমাজে ও রাষ্ট্রে আজো উনিশ শতকের রামমোহনের-বিদ্যাসাগরের-বঙ্কিমচন্দ্রের-বিবেকানন্দের মতো কোনো নতুন চিন্তা-চেতনার অনন্য, অসামান্য ও অতুল্য মানুষের আবির্ভাব ঘটল না। আমরা কোনো মনীষীর, কোনো মনীষার, কোনো গড়ে-ওঠা ব্যক্তিত্বের বা নেতৃত্বের প্রভাব ও প্রসাদ থেকে এ মুহূর্তেও বঞ্চিত।

প্রায় দু'হাজার বছর ধরে আমাদের বর্তমান বাঙলাদেশীর অধিকাংশই হচ্ছে বিদেশী শাসিত, শোষিত, প্রতারিত, পীড়িত অবজ্ঞতা নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র অজ্ঞ অনক্ষর তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র ঘরানা পেশাজীবীর বংশধর। তাদের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার এবং আচার-আচরণ-সংস্কৃতির ভিত্তি ছিল অলীক, অলৌকিক, লৌকিক ও স্থানিক কল্পনাপ্রসূন ফোকলোর ও লোকসাহিত্য, যা অসামর্থ্যেরই সাক্ষ্য-প্রমাণমাত্র।

আমরা উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে বিশ শতকেই পেয়েছি ও পাচ্ছি স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার সুযোগ, আত্মবিকাশের ও আত্মশক্তি প্রসারের অধিকার। কিন্তু যেহেতু আমরা গড়ে ওঠা মনীষীর, ব্যক্তির ও নেতৃর মনন-মনীষার, চেতনা-চিন্তার কর্ণধারের মতো পরিচালনা পাইনি, পাই না জাতীয় স্তরে, সেহেতু আমরা কখনো শীতের শান্ত সমুদ্রে, কখনো বা বর্ষার ঝড়ো সমুদ্রে হাল-পালহীন তরণীর আরোহীর মতো জীবনের ও জীবিকার সর্বক্ষেত্রে অনিশ্চিত টালমাটাল ও দিশেহারা ভাসমান জীবনযাপন করি। এ জন্যেই আমাদের রাজনীতিক দলেরও নেই কোনো সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট জনজীবন-জীবিকা উন্নয়নে কর্মসূচি। কেবল সাংসদ-মন্ত্রী হয়ে গদি দখল করে ধন-মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভাব-প্রতিপত্তি-দর্প-দাপট অর্জনই লক্ষ্য হয়েছে রাজনীতিক প্রধান দলগুলোর। এ জন্যেই এদের অধিকাংশই নীতি আদর্শহীন চরিত্রভ্রষ্ট, দলছুট সুবিধে-সুযোগসন্ধানী ঘৃণা-লজ্জা-ভয়হীন। এদের উচ্চকণ্ঠে নিন্দা করতে হবে সমাজের মানুষকে চরিত্রবান করবার লক্ষ্যে। আমরা নিন্দা করি না, তাই ওরা হায়াহীন। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক, উকিল, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, আঁকিয়ে, লিখিয়ে, চিত্রী-সাহিত্যিকদের মধ্যে থেকে এমন কোনো বিদ্বান-মনীষী ব্যক্তিত্বও আমরা পাইনি। তাই তাঁদের চিন্তা-চেতনায় আমরা আত্মগড়নের প্রেরণা-প্রবর্তনা পাই না। আমাদের এ মুহূর্তে সঙ্কট-সমস্যার মূলে রয়েছে নীতি-নিয়ম ও আদর্শমানা আত্মসম্মানচেতনাসম্পন্ন মনীষীর ব্যক্তিত্বের ও নেতৃত্বের অভাব। শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব না হলে অপরের আস্থাভাজন ব্যক্তি হবেন না কেউ। যাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনায় শিক্ষিত জনগণের আস্থা থাকে, তাঁর দেশনা-নির্দেশনা-পরামর্শই জাতির দিশারী হয়।

বর্তমান অবক্ষয়, জীবন-জীবিকার অনিশ্চিতি, নৈতিক-আদর্শিক চেতনা-চিন্তাশূন্যতা থেকে আমাদের মুক্তি পেতেই হবে। দেশ, মানুষ, জাতি, রাষ্ট্র, সরকার ও নাগরিক এমন লাওয়ারিশ লুটপাটের অবাধ অধিকারপ্রাপ্তদের কবলমুক্ত না হলে রাষ্ট্র ও সরকার হবে জনযন্ত্রণার কারণ। এখনো অবশ্য রাষ্ট্র ও সরকার জনজীবনে যন্ত্রণাবৃদ্ধির কারণ হয়ে রয়েছে ক্ষমতার রাজনীতিপ্রিয় রাজনীতিক দলগুলোর গদি কাড়াকাড়ির প্রত্যক্ষ ও সহিংস প্রতিযোগিতার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে।

সমাজ পরিবর্তন আবশ্যিক ও জরুরি। আমজনতাকে দুঃশাসন, শোষণ, পীড়ন-প্রতারণা-বঞ্চনামুক্ত করে তাদের ভাতে-কাপড়ে-আবাসে-চিকিৎসায়-শিক্ষায়-স্বাস্থ্যে জন্মগত অধিকারের স্বীকৃতি দান সম্ভব কেবল বণ্টনে বাঁচার নীতি গ্রহণ ও প্রয়োগ করলেই। সম ও সহস্বার্থে, সংযমে, সৌজন্যে সামবায়িক সহযোগিতায় সহাবস্থানই হচ্ছে এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে আর যন্ত্রনির্ভর জীবনে বাঁচার উপায়।

এ জন্যেই বর্তমানে চালু লৌকিক, অলৌকিক, অলীক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-পালা-পার্বণ আচার-আচরণ বদলানো দরকার। এবং বদলানো সম্ভব কেবল যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবনযাত্রার, জীবনযাপনের পন্থা গ্রহণে। এখন চেতনার ও চিন্তার মুক্তি ঘটবে, ছিঁড়বে আশৈশব শ্রুত-লব্ধ-অভ্যস্ত-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-ভয়-ভক্তি-ভরসার বাঁধন। যুক্তি প্রয়োগে দেশ-কাল-জীবনের প্রয়োজনে তখন নতুন কিছু আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-নির্মাণে-গ্রহণে অনুকরণে-অনুসরণে কোনো পিছু টান থাকবে না। 'শ্রেয়সই' হবে গ্রহণে-বরণে যাচাই-বাছাইয়ের, বর্জন-অর্জনের ভিত্তি ও উৎস। যুক্তিবাদী মাত্রই হবে ফ্রিথিঙ্কার। মর্ত্যজীবন চেতনাই হবে তার চলার পথের, জীবনযাপনের পুঁজি-পাথেয়। মানবিকতা, মানবতা, শ্রেয়সচেতনা তথা মানববাদই হবে তার বিবেক-বিবেচনার চালিকাশক্তি।

বিশ্বে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-নিবাস-ভাষা-যোগ্যতা-দক্ষতা-বিশ্বাস-সংস্কার ধারণা-ভয়-ভক্তি-ভরসা ও সাংস্কৃতিক বা অন্য প্রকার স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি বর্জিত মনুষ্য সমাজ গড়ে তুলবার জন্যে চাই Rationalism, যা যুক্তি-বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় যা উপযোগ ও তাৎপর্য কিংবা মানবিক দ্যোতনারিক্ত তা-ই বর্জনীয়। আজ বৈশ্বিকস্তরে আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রিকক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ কিংবা আন্তঃরাষ্ট্রিক বিরোধ-বিবাদ-সংঘর্ষ-সংঘাত যে কোথাও না-কোথাও নিত্য ঘটছে, দাঙ্গা-লড়াই-যুদ্ধ চলছে, তা তো ওই স্বাতন্ত্র্যচেতনা থেকেই। এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাতন্ত্র্যচেতনা Racial, Regional, Religious, linguistic, Ethnic, National and Cultural. যুক্তি বুদ্ধি বিবেক প্রয়োগে যদি আমরণ আচারিক শাস্ত্র বর্জন করি, কেবল স্রষ্টা মানি, তা হলেও মানুষে মানুষে ভেদ ব্যবধান কমবে। মানুষকে যদি আমরা প্রাণীর মানবপ্রজাতি হিসেবে স্বজাতি বা জ্ঞাতিরূপে অন্তরে গ্রহণ করতে পারি, তা হলে গোটা পৃথিবী ব্যাপী এ যন্ত্রযুগে অভিন্ন সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে। জীবনযাপনে তার লক্ষণও একালে উঁচু শ্রেণীর মধ্যে সুপ্রকট– পোশাকে স্যুট, ভাষায় ইংরেজি, আচরণে য়ুরোপীয় সৌজন্য, খাদ্যে বৈশ্বিকস্তরে আন্তর্জাতিক খাদ্যের পাঁচতারা হোটেলের মেনু তো বিশ্বব্যাপী সব রাষ্ট্রেই চালু হয়েছে, রাষ্ট্রিক, সরকারী ও ধনিক-বণিক অভিজাত সমাজে। আগের কালে অর্থাৎ এ শতকের আগে মানুষ যানবাহনের অভাবে অজ্ঞতার ও বিচ্ছিন্নতার ব্যবধানে বাস করত বলেই তো সাংস্কৃতিক জীবনে সামর্থ্যের-অসামর্থ্যের দরুন উপকরণের উপাদানের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির কারণে আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-নির্মাণে হাতিয়ারে জীবনযাত্রার গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায়-স্বাচ্ছন্দ্যে-সাচ্ছল্যে ঘটেছে পার্থক্যের ব্যবধান। তা-ই হীনম্মন্যতা-উত্তম্মন্যতাজাত অভিমান আজো স্বাতন্ত্র্যচেতনা প্রবল রেখেছে সবার মধ্যেই। এটা মূলত গৌষ্ঠীক ও গৌত্রিক, তাই উচ্চ সংস্কৃতি-সভ্যতার অধিকারী জাতির মধ্যে যেমন তার স্থিতি মেলে, তেমনি আদি ও আদিমস্তরের উপজাতি, আদিবাসী ও জনজাতি প্রভৃতির মধ্যেও তার প্রাবল্য দেখা যায়। এ স্বাতন্ত্র্যচেতনা আধি-গুণ নয়।

AMARBOI.COM

ডিফেন্স বাজেট

আজকাল বলতে গেলে পররাজ্য দখল করার নীতি ও রীতি উঠেই গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি উপনিবেশবাদীদের চোখ খুলে দিয়েছে। তাই তারা নিজেরাই জাতিসঙ্ঘ সনদ-এর মাধ্যমেই পররাজ্য দখল নীতি পরিহার করেছে। তার বদলে আর্থ-বাণিজ্যিক-মহাজনী সাম্রাজ্যবাদ আশ্রিত হয়েছে। মার্শাল-পরিকল্পনা অনুযায়ী দুস্থরাষ্ট্রে ধন দিয়ে, জন দিয়ে, সেবা দিয়ে, ত্রাণ দিয়ে, গণসেবার মাধ্যমে মিত্র ও বন্ধু রাষ্ট্রে সদাগরীর পণ্য চালানোর এক সূক্ষ্ম ও অভিনব পন্থা আবিষ্কার, উদ্ভাবন, নির্মাণ ও চালু করেছে। এ হচ্ছে ছেলের হাতে মোয়া দিয়ে মা-বাবার মনভোলানো নীতিরই অনুসৃতি ও অনুকৃতি। আজকাল রাজ্য-সাম্রাজ্য বিস্তারের দিন অপগত। আজকাল বিজ্ঞানের প্রসাদপুষ্ট জীবনযাপন পদ্ধতি মানুষের প্রাণ-মন-মনন প্রভৃতির ধারা বদলে দিয়েছে। ফলে আনুগত্য, দাসত্ব, অধীনতা প্রভৃতি এ কালের কোনো ব্যক্তি মানুষেরও রুচিসম্মত জীবনচেতনার অঙ্গ নয়। তাই গোটা পৃথিবীর সর্বত্র কুইবেক, উত্তর আয়ারল্যান্ড প্রভৃতির মতো গোষ্ঠীগত, গোত্রগত, ভাষাগত, শাস্ত্রগত, অঞ্চলগত স্বাতন্ত্র্যচেতনা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে। ফলে সবাই এখন বিচ্ছিন্নতার প্রত্যাশী ও প্রবক্তা। স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্যপ্রীতি সর্বত্রই প্রকট রূপ ধারণ করেছে। এক কথায় জাত, জন্ম, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, নিবাস, গোষ্ঠী, গোত্র,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঞ্চল ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের, রাষ্ট্র সৃষ্টির দাবি উঠেছে পৃথিবীর সর্বত্র। আফ্রিকা-য়ুরোপ-এশিয়া-অস্ট্রেলিয়া কিংবা পশ্চিম গোলার্ধ এ ক্ষেত্রে প্রায় অভিন্ন সংকট-সমস্যার ও দাবির সম্মুখীন। সবাইকে স্বাতন্ত্র্যে স্বাধিকারে, স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার অধিকার দানই তো বিবেকসম্মত ন্যায্য ব্যবস্থা। তা হলে তো আর ডিফেন্স ব্যবস্থার প্রয়োজনই থাকে না। ডিফেন্স বাজেটও প্রয়োজন হয় না। আমরা যেমন গৃহস্থ হিসেবে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন থেকেও লেনদেনে, পণ্য বিনিময়ে, শ্রমে ও কর্মে পরস্পরের সহযোগী হয়ে সহযোগিতায় সহাবস্থান করছি, তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রও সহযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে। এতে বোঝা যায় পৃথিবীতে একটা মানসবিপ্লব ঘটে গেছে। মানুষ আগের মতো অর্থে-বিত্তে বিদ্যায়-দেহে কিংবা জনবলে হীন হলেও মনোবলে আত্মসত্তার মূল্য ও মর্যাদা বোধে ঋদ্ধ ও পুষ্ট হয়েছে। তাই সে স্বাতন্ত্র্যে ও স্বাধীনতায় স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে অঙ্গীকারবদ্ধ। তারই ফলে বিশ্বের বহু বহু রাষ্ট্রে চলছে গৃহযুদ্ধের আকারে গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক, ভাষিক, বার্ণিক, শাস্ত্রিক, আঞ্চলিক দ্রোহ, সংগ্রাম, আন্দোলন, গেরিলাযুদ্ধ। গোপনে মদদ জোগাচ্ছে পৃথিবীর কোনো কোনো বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্র স্বার্থবশে। পৃথিবীর সেভেন গ্র্যাট রাষ্ট্রের ছয়টিই তো অস্ত্র বিক্রেতা। তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্রই দরিদ্র এবং বিজ্ঞানে ও বাণিজ্যে আনাড়ি। তারা নিজেরাও জানে যুদ্ধ করে জয়ী হবার শক্তি-সামর্থ্য নেই, আর্থিক, দৈহিক কিংবা সামরিক শক্তি তাদের নেই। তবু তারা মুরুব্বী শক্তিগুলোর হুকুমে ও পরামর্শে প্রতিবছর অস্ত্র কেনে। সে-অস্ত্র কাজে লাগে না। তার কিছুটা মাত্র প্রজাশাসনে, প্রজার দ্রোহ দমনে কিংবা রাষ্ট্রাভ্যন্তরে দ্বিদলীয় বা ত্রিদলীয় দ্বন্দ্বে, সংঘর্ষে ও সংঘাতে কাজে লাগে মাত্র। অর্থাৎ শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ের প্রয়োজনে নয়, রাষ্ট্রের সীমা ও স্বাধীনতা রক্ষার গরজে নয়, কারণ সে-শক্তি তাদের নেইই- এমন কি প্রজার দ্রোহ দমনের লক্ষ্যেও নয়– ঋণ-দান-অনুদান-ত্রাণদাতা মুরুব্বী রাষ্ট্রের মুখ্য ব্যবসায়ীপণ্য অস্ত্র ক্রয় প্রায় বাধ্যতামূলক বলেই তৃতীয় বিশ্বের দুস্থ দরিদ্র রাষ্ট্রগুলো ঋণের টাকা দিয়ে অস্ত্র ক্রয় করে প্রতি বছর। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুকৌশলে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ জিইয়ে রেখে অনুগত রাষ্ট্রগুলোকে অস্ত্র ক্রয়ে উত্তেজনা-উদ্দীপনা জোগায়। ফলে বাজেটের এক তৃতীয়াংশ বৃথা ব্যয় হয় অস্ত্র ক্রয়ে প্রতি বছর। এ জন্যে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো উন্নয়ন খাতে ব্যয় করতে পারে না অর্থ। পুঁজির অভাবে রাষ্ট্রের আর্থিক বৃদ্ধি আসেই না– দারিদ্র্যে থাকে বরং নিত্যসঙ্গী, বাড়তে থাকে ঋণ, চক্রবৃদ্ধির হারে পরিশোধ করতে হয় বার্ষিক সুদ। আসল ঋণ ও সুদই কেবল বাড়ে। ফলে, রাষ্ট্রের দারিদ্র্যও বাড়ে। এমনি গরিব এক রাষ্ট্র বাঙলাদেশও। আমরা কেন অস্ত্র ক্রয় করি? কারো সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো আর্থিক সঙ্গতি কি আমাদের আছে? যা প্রয়োগ করা যাবে না, যা প্রয়োজনে লাগবে না, তা আমরা ক্রয় করব কেন? রাষ্ট্রের অধিবাসী বিরোধী দলের শাসনপাত্রদের মারার জন্যে, হানার জন্যে ভারী অস্ত্রের দরকার আছে কি? আর প্রতিবেশী কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে যুদ্ধ করার মতো লক্ষ লক্ষ সৈন্য পোষা, ভারী ভারী অস্ত্র, জল-স্থল-বায়ুযান ক্রয় কি তৃতীয় বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রের আছে? শোনা যায় এমন যে অঢেল তেলওয়ালা সৌদি সরকার মুরুব্বীর হুকুম ও পরামর্শ তামিল করতে গিয়ে আর্থিকভাবে নাকি আক্ষরিক অর্থেই পথে বসেছে। সত্য-মিথ্যা যাচাই করার সাধ্য অবশ্য আমাদের নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা জানি সোভিয়েত রাশিয়ার বিলুপ্তির পর থেকে মার্কিন রাষ্ট্র এখন জগদিন্দ্র জগদীশ্বর। তার হুকুমের হুঙ্কারের হুমকির ও হামলার আওতায় এসে গেছে গোটা পৃথিবী অন্তত তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো। এ অবস্থায় ও এমনি অবস্থানে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর উচিত আত্মকল্যাণ বাঞ্ছায় জাতিসঙ্ঘের শান্তি বাহিনীর আশ্রিত হওয়া, নিজেদের কোনো সামরিক বাহিনী রাখা নয়। তা হলে তথাকথিত এ কেজো 'ডিফেন্স বাজেট' নামে প্রায় এক তৃতীয়াংশ সম্পদ বছর বছর বিনষ্টি থেকে রক্ষা পাবে। অর্থ জনগণের আর্থিক কল্যাণে কিংবা শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ও অর্থোপার্জন ব্যবস্থায় ব্যয় হতে পারবে।

তৃতীয় বিশ্বের সরকারগুলো কি এ সৎপরামর্শ শুনবে বা শুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি বা অধিকার রাখে? অস্ত্র-জলযান-স্থলযান-বায়ুযান যাদের প্রধান পণ্য, আয়ের মুখ্য উৎস সেসব পরাশক্তি ভিটোপ্রয়োগের অধিকারীশক্তি বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর অভিভাবকত্বের, তত্ত্বাবধানের, নজরদারির ও তদারকির স্বেচ্ছাবৃত অধিকারী। সে রাষ্ট্রগুলো এবং তাদের গোপন অ্যাজেন্টরূপী অস্ত্রব্যাপারী রাষ্ট্রগুলো কি পৃথিবীকে রক্তপাতমুক্ত যুদ্ধশূন্য রাখবে? তা যে তাদের পক্ষে আত্মহননের শামিল! অথচ মানবিকতার, মানবতার, মনুষ্যত্বের, বিশ্বশান্তির, আমজনতার দাবি হচ্ছে অস্ত্রমুক্ত রক্তঝরা প্রাণহরা যুদ্ধমুক্ত পৃথিবী।

AMARBOI.COM

তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের লাক্ষণিক রূপ

মেঘভাঙা রোদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র ও অজ্ঞ-অনক্ষর লোক অধ্যুষিত রাষ্ট্রে মাঝে মধ্যে নাগরিকের ভোটে গণতন্ত্র নামের এক ভোটতন্ত্র চালু হয়। কিন্তু তা বেশি দিন টেকে না। কারণ, অনুন্নত রাষ্ট্রে জনমত রাজনীতি ও সরকার নিয়ন্ত্রণ করে না, সরকারই জনমত নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে গণতন্ত্র মাত্রই স্বৈর ও স্বেচ্ছাতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তখন শাসক-প্রশাসক-পর্ষদ, পারিষদ, সাংসদ, মন্ত্রী, আমলা এবং বুদ্ধিজীবী নামে পরিচিত নানা পেশায় নিয়োজিত শিক্ষিত লোকেরাও মান-যশ-অর্থ-বিত্ত-বেসাত-প্রভাব-প্রতিপত্তি-দর্প-দাপট প্রভৃতির অধিকারী হওয়ার জন্যে জীবনের জাগ্রত মুহূর্তগুলো ব্যয় করে। এদের অধিকাংশ থাকে সাধারণভাবে ভুঁইফোঁড় দরিদ্র গ্রামীণ গৃহস্থ ঘরের সন্তান। এরা লাভ-লোভ-স্বার্থসচেতন হয়ে শহরে আসে কাঙ্ক্ষাপূর্তির লক্ষ্যে। এ মানুষে আদর্শ নিষ্ঠা, ঘৃণা-লজ্জা-ভয়, আত্মমর্যাদার বাধা প্রভৃতি কিছুই থাকে না। থাকে কেবল যে-কোনো উপায়ে অর্থে-বিত্তে-মানে-ক্ষমতায় দশজনের একজন হওয়ার প্রবল প্রয়াস। এ মানুষে সততা, আদর্শপ্রীতি ও চরিত্রবল অনুপস্থিত থাকে। ফলে রাষ্ট্রে কোথাও আইন-শৃঙ্খলা, ন্যায়-নীতি, আইনের শাসন প্রত্যাশিত মাত্রায় মেলে না। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' নীতিই জনজীবনে এবং শাসক-প্রশাসক, ব্যবসায়ী, কারখানাদার ও সামরিক বাহিনী প্রভৃতি সব শ্রেণীর ও সব পেশার মধ্যে এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রেও তা সংক্রমিত হয়। দুর্নীতি-কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানি এবং বেপরওয়া শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা-প্রতারণা এবং কৃত্রিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোটতন্ত্রের আবরণে জঙ্গীনায়কের শাসনের নামান্তর হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের গণতন্ত্র। কারণ অস্ত্রধারী দেশরক্ষীবাহিনী কখনো নিজেদের সরকারের বেতনভুক কর্মচারী রূপে ভাবতেই পারে না। আমরা জানি, তিনরঙা বাহিনী– স্থল-জল-বায়ু বাহিনী নিজেদের মনে করে রাষ্ট্রের প্রকৃত অভিভাবক-তত্ত্বাবধায়ক কিংবা মালিকই। কাজেই শাসনে-প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় দেখা দিলে, জনজীবনে আর্থিক-নৈতিক-সামাজিক বিপর্যয়-বিপন্নতা দেখা দিলে কিংবা জনগণ প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি মারমুখো হয়ে দ্রোহী হলে সেনানীরা আকস্মিকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে এবং বন্দুকের নলের ডগা জনগণ বুকমুখী তাক করে অনির্দিষ্টকাল ধরে রাজত্ব করতে থাকে নজরদারির, খবরদারির ও তদারকির নামে। জঙ্গীনায়কের উচ্চারিত ধ্বনিই তখন আইন ও আদেশ। তারপর এক সময়ে লাভ-লোভ– স্বার্থসচেতন সুযোগ-সন্ধানী সুবিধেকামী লোকের সমর্থনে, সহযোগিতায় এবং অনুরাগে, অনুগামিতায় ও আনুগত্যে জঙ্গীনায়ক জাতীয় নেতারূপে অভীকচিত্তে শাসন করতে থাকেন কোথাও কোথাও সুদীর্ঘকাল ধরে বা জীবনব্যাপী। কাজেই তৃতীয় বিশ্বে কখনো 'রুল অব ল' বলে, আদর্শবাদিতা বলে, ন্যায়-অন্যায় বলে কোনো কিছুর মূল্য-মর্যাদা-গুরুত্ব থাকে না। স্বৈর-স্বেচ্ছাচারিতাই হয়েছে এ ধরনের রাষ্ট্রে শাসন-প্রশাসন ও গণহিতৈষণার লাক্ষণিক রূপ।

তৃতীয় বিশ্বে সাধারণভাবে নতুন নতুন ভুঁইফোঁড় পয়সাওয়ালারাই, ব্যবসায়ীরাই এবং অবসরপ্রাপ্ত সামরিক চাকুরেরাই রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে টাকা দিয়ে ভোট ক্রয় করে এবং মস্তান-গুণ্ডা-খুনী দিয়ে ভোটারের মনে ভীতি জাগিয়ে জান-মাল সম্বন্ধে। কেননা, তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রে প্রত্যাশিত মাত্রায় রাজনীতিক সংস্কৃতিতে ও নীতি-নিয়মে, নৈতিক চেতনায় চারিত্রিক-আদর্শিক দায়বদ্ধতা থাকে না। এ কারণে সাংবিধানিক ব্যবস্থা না থাকলেও একটা দল গায়ের জোরে শূন্য সংসদে বসে অর্থাৎ বিরোধী দলের পদত্যাগের পরেও জমিদারের মতোই শাহ-সামন্তের মতোই 'গদি' দখল করে বসে থাকে। লজ্জা পায় না, অনুভব করে না বিবেকের দংশন। উপেক্ষা করে জনমত, লঙ্ঘন করে সংবিধান, তেমনি সাংবিধানিক ব্যবস্থার বাইরে কারো কিছু দাবি করার অধিকার নেই। অধিকার আছে সংশোধন দাবি করার। অসাংবিধানিক কিছু চাওয়া মানে আবদার করা, দাবি করা নয়। দাবিতে অধিকার চেতনা থাকে, আর আবদারে থাকে অন্যায় প্রশ্রয়ে কিছু ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ করার সাধ। তৃতীয় বিশ্বে এসব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার লোকও মেলে না। কেননা এখানে ভুঁইফোঁড়ের অর্থে-বিত্তে-বেসাতে-মানে-ক্ষমতায় স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার গরজই বেশি। তাই এখানে শতে ছেষট্টি জন সরকার-ভীরু, শতে তেত্রিশ জন সরকার-ঘেঁষা এবং শতে কৃচিৎ একজন সরকার-শত্রু। তাই স্বেচ্ছাচার-স্বৈরাচার অপ্রতিরোধ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিংস্রতা ও নরহত্যা বৃদ্ধির কারণ অন্বেষা

আত্মরক্ষার আর উপদ্রব থেকে নিষ্কৃতির লক্ষ্যে মানুষ ঘরে সংসারে সব সময়েই মশা-মাছি-পিঁপড়ে মারে অবলীলায়। কিন্তু হাঁস-মোরগ-গরু-ছাগল জবাই বা জবেহ করানোর জন্যে খুঁজত মোল্লা-মিয়াজি, নিজেরা সাহস পেত না। ছোটকালে আমরা মোরগ জবাই করার লোকও পাড়ায়-মহল্লায় দুর্লভ দেখেছি। অবশ্য মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, ছিপে মাছ মারার, তীরে-বর্শায়-বন্দুকে পশু-পাখি শিকার করার মধ্যে এক প্রকার মনস্তাত্ত্বিক হিংস্রতা আছে, আছে হত্যার আনন্দ ও উল্লাস। তেমন মনোভাবের বা চরিত্রের লোক নাকি চিকিৎসক হিসেবে শৈল্যবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠে। এগুলো সব শোনা কথাই বললাম। সত্য-মিথ্যা যাচাই করার সুযোগ ঘটেনি জীবনে। তবে এ নিশ্চিত জানি, আমাদের দেশে চরুয়ারা চর দখলের জন্যে কাড়াকাড়ি-মারামারি এবং কিছুটা হানাহানিও করত বটে। কিন্তু সাধারণভাবে মানুষ ১৯৭১ সালের পূর্বাবধি হত্যাভীরু ছিল। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সাহসী করেছে, প্রাণ দেয়ায়-নেয়ায় দীক্ষা দিয়েছে। কেননা ইতিহাস বলে, বাঙালীরা ভেতো ও ভীত। প্রাণের ভয়ে তারা যুদ্ধ-লড়াই বিমুখ ছিল। এ জন্যে সৈনিকবৃত্তি তাদের ছিলই না। ক্বচিৎ বাঙালী সিপাহি, তাও পদাতিক মিলত।

মুর্শিদাবাদের শেষ নওয়াবের সৈন্যদল গঠিত ছিল বিহার ও উত্তর প্রদেশের হিন্দু-মুসলিম নিয়ে। ওদেরই চাকরি যখন গেল কোম্পানির অধিকারে, তখন ওরাই হিন্দু নাগা সন্ন্যাসী রূপে এবং মুসলিম বুরহান (নগ্ন) ফকির রূপে ব্রিটিশ বাঙলায় ১৭৬৫ থেকে ১৭৮৫ সাল অবধি জমিদার-মহাজন-বেণে প্রভৃতির বাড়ি ও সম্পদ লুট করত বছরে একবার হঠাৎ এসে। এরাই আমাদের কাছে 'ফকির-সন্ন্যাসী' দ্রোহীরূপে পরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ রচনার প্রেরণাও জুগিয়েছে ওই সন্ন্যাসী নামের চাকরিচ্যুত বেকার সৈনিকরাই।

এবার আবার পূর্ব কথায় ফিরে আসি। আমরা রক্তভীরু হত্যাভীরু জাতি ছিলাম। আমরা এখন ক্রমশ এবং দ্রুত হত্যাপ্রবণ হিংস্র জাতিতে পরিণত হতে চলেছি। প্রাণ নেয়ার-দেয়ার এ কাজ নিশ্চয়ই শক্তির ও সাহসের কাজ। 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' এবং চিত্ত মানবিক গুণরিক্ত না হলে অতো সহজে মস্তান-গুণ্ডা-খুনী হওয়া যায় না। লোকে বলে নিঃস্বতা, নিরন্নতা, দুস্থতা, দরিদ্রতা, বেকারত্ব, নৈরাশ্য, নিরানন্দ এবং জীবিকা অর্জনের সুযোগ-সুবিধের অভাব, এক কথায় জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে আর্থিক অনিশ্চিতি একালের তরুণদের উন্মত্ত ও বেপরোয়া করে তুলেছে। বাঁচার ঋজু উপায় না থাকায়, অর্থসম্পদ অর্জনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকারের ব্যর্থতার দরুন ছাত্র-যুবার মনে জীবন সংগ্রামসঙ্কুল হয়ে দেখা দিয়েছে, তাই মারতে ও মরতে এখন সবাই রাজি। সুখের, সাচ্ছল্যের, স্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্ন-সাধ যখন উবে যায়, তখন নিরাশ হতাশ ব্যর্থ মানুষ জুয়ায়-মদে-মেয়েমানুষে পূর্বের ভাঙ-ধুতুরার মতো কোকেনে-হেরোইনে-মারিজুয়ানায় আসক্ত হয়ে পড়ে ও পড়ছে– দুঃখ-হতাশা-নিরানন্দ মুক্তির লক্ষ্যে। জীবনে বেকারত্ব এবং জীবিকা অর্জনে অসামর্থ্য তাদের পাপ-পুণ্য-বিবেক-বিবেচনা-নীতি-আদর্শ চেতনাচ্যুত করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব কথা না হয় তথ্য, সত্য ও বাস্তব জ্ঞান-অভিজ্ঞতা-বিজ্ঞতা প্রসূত বলে মেনেই নিলাম। কিন্তু মানুষ গড়ার অর্থাৎ মানব প্রজাতির সন্তানদের প্রাণীর বৃত্তি-প্রবৃত্তি সংযত, মার্জিত, প্রশমিত করে মানবিক গুণের উন্মেষ, বিকাশ ও বিস্তার ঘটানোর কালে তথা মানুষ গড়ার কারখানা নামে পরিচিত স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে মর্ত্যজীবনের স্বপ্ন-সাধ যখন দানা বেঁধে ওঠার সময়, যখন দারিদ্র্যের, বেকারত্বের, নিঃস্বতার, দুস্থতার, হতাশার, নৈরাশ্যের কারণ উদ্ভূত হওয়ার সময় আসে না, তখন কেন স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্তক্ষরা প্রাণহরা মারামারি হানাহানি শুরু হয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে? তখন কেন দলন-দমন-দহন-লুণ্ঠন-হনন স্পৃহা জাগে কিশোর ও নবযুবার মনে? কে বা কারা, রাজনীতিকরা, শিক্ষকরা কিংবা বেণে-বুদ্ধিজীবীরা অথবা সমাজ নামের শাস্ত্রমনা, সম্প্রদায় সচেতন জনগণ কেন এ নরহত্যার প্রেষণা জোগায়? আজো কি জাতীয় স্বার্থে, মানবতার খাতিরে, মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষার গরজে এর কারণ সন্ধানের, এর প্রতিকারের উপায় অন্বেষণের, এর প্রতিবাদের প্রয়োজনের, এর প্রতিরোধের পন্থা উদ্ভাবনের সময় আসেনি? এ প্রশ্ন রইল আমাদের দেশের সর্বপেশার ও শ্রেণীর শিক্ষিত শহুরে জনগণের প্রতি।

AMARBOI.COM

অবক্ষয়ের প্রতিষেধক হচ্ছে নৈতিক ও আদর্শিক চর্যা

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসকদের ভারত ত্যাগের ফলে ভূমিকম্পের মতোই একটা প্রবল প্রচণ্ড ধাক্কায় শত শত বছরের নিস্তরঙ্গ সামাজিক, আর্থিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক জীবনধারায় একটা দেয়ালভাঙা একটা বেড়াভাঙা এবং জানমাল বিধ্বংসী বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা জাঙ্গলিক ও গাড্ডলিক রূপ নিয়ে দেখা দিল। তখন কারো হল সর্বনাশ, আর কারো জীবনে ও ঘরে এল পৌষ মাস। ভাঙা-গড়ার, উঠতি-পড়তি-ঝরতির ওই নৈরাজ্যিক সময় পরিসরে দু'হাজার বছরের পুরোনো জীবনধারায় অভ্যস্ত, প্রাজন্মক্রমিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-ভয়-ভক্তি-ভরসাচালিত জীবনে এল পরিবর্তন। যদিও পুরোনো ধারার আবর্তন তখনো চলছিল অজ্ঞ-অনক্ষর-অসহায় নিঃস্ব-নিরন্ন-দুস্থ-দরিদ্র গ্রামীণ মানুষের জীবনে-জীবিকায়। কিন্তু সাক্ষর-শিক্ষিত, চালাক-চতুর, সুবিধে-সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তিরা তখন প্রাণপণ করে নেমেছে বিত্ত-বেসাত ও অর্থ-বাণিজ্য আয়ত্ত করার প্রতিযোগিতার দৌড়ে এবং মেতেছে জীবনপণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার খেলায়। এমনি স্বদেশীর ভিটে ছাড়ার ও বিদেশীর আশ্রিত হওয়ার সময়ে নিজেদের মধ্যেও লাভে লোভে স্বার্থে বাধে বিরোধ-বিবাদ-সংঘর্ষ-সংঘাত, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-রেষারেষি এবং কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানিও বাড়ে। লাভে লোভে স্বার্থে সাহসী চতুর মানুষ হয় বেপরওয়া-বেহায়া-বেশরম-বেচশম-বেদানাই-বেদরদ-বেআদব-বেআক্কেল-বেল্লিক। এমনি সময়ে রাষ্ট্র ও সরকার শাসনে-প্রশাসনে মানুষকে শায়েস্তা রাখতে পারে না। তখন আত্মসত্তার মূল্য-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মর্যাদাবোধহীন, নৈতিক চেতনারিক্ত বিবেক-বিবেচনাশূন্য মানবিক গুণহীন ও দানবিক শক্তিধর প্রাণীর সংখ্যাই বাড়ে। ফলে নীতি-নিয়ম মানা, আদর্শের ডিগদড়ি বাঁধা মানুষের সংখ্যা যায় কমে। সৎ সরল পাপভীরু কিংবা সরকারের শাস্তি ভীত এবং সমাজের নিন্দাকাতর ব্যক্তিরা থাকে দুর্বল ও প্রভাবহীন।

নিঃস্বতা, নিরন্নতা, দুস্থতা, দরিদ্রতা, অজ্ঞতা, অনক্ষরতা জীবিকাক্ষেত্রে আর্থিক অনিশ্চিতি, জীবনে নির্বিরোধ নিরুপদ্রব নিরাপত্তার অভাব, বেকারত্ব, নৈতিক ও আদর্শিক জীবনের গুরুত্ববোধরিক্ততা মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান-শক্তিমানদের করেছে বেপরওয়া সাহসী দুষ্ট-দুর্জন-দুষ্কৃতী ও দুর্নীতিবাজ আর দুস্থ দরিদ্র দুর্বল ভীরুদের করেছে গাঁয়ে-গঞ্জে-নগরে-বন্দরে-পাড়ায়-মহল্লায় মস্তান-গুণ্ডা-খুনী-রাহাজান-বাটপাড়-চাঁদাবাজ-ডাকাতদের হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলার শিকার। এখন দেশের সর্বত্র আমজনতার জান-মাল গর্দানের মালিক ওই মস্তান-গুণ্ডা-খুনীরাই। মানুষের জান-মান-মাল-গর্দান রক্ষার দায়িত্ব যে সমাজের ও সরকারের তা স্বীকৃত, কিন্তু কার্যত সে-দায়িত্ব পালনে যে সমাজ ও সরকার অসমর্থ, তার সাক্ষ্য-প্রমাণ দৈনিক পত্রিকাগুলোতে রোজই মেলে। আমজনতা তাই সদাশঙ্কিত, পরিবারগুলো সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত। কার জীবনে কখন কি ঘটে, তা কেউ আন্দাজ-অনুমান করতেও পারে না। বাইরে যারা যায়, তাদের ঘরে ফেরা যেন দিন দিন অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। কেবল স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রেও নয়, রাস্তায় যানবাহনের চাকা-চাপা পড়ায়ও নয়, অর্থাৎ রাজনীতি ক্ষেত্রে, আর্থ-বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে, ক্রীড়ার ময়দানে, পথচারিতায়, যানবাহনে, পর্যটনে সর্বত্র মরণফাঁদ-প্রাণবিনাশী মাইনের মতো পাতা রয়েছে। এখন নরহত্যা আর ত্রাসকর কিছু নয়, মাছ-মোরগ হত্যার মতো নিতান্ত তুচ্ছ নিত্যকার জীবনযাত্রার অপরিহার্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ নিশ্চিতই অবাঞ্ছিত অমানবিক সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনীতিক অবস্থা ও অবস্থান। মৌলবাদীদের প্রাবল্য সত্ত্বেও শাস্ত্রিক-মানবিক আচার-আচরণ বিবেকী বিবেচনা যৌক্তিক বৌদ্ধিক জীবনযাপন পদ্ধতি দেশে দুর্লভতায় দুর্লক্ষ্য। এর কারণ মানবিক গুণের স্বল্পতা। এর নাম জাতীয় জীবনের তথা দৈশিক-রাষ্ট্রিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের অবক্ষয়। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে কিশোর-কিশোরী-যুবক-যুবতীদের মধ্যে নয় কেবল, সমাজের সর্বস্তরের ও সব বয়সের শিক্ষিত মানুষের মধ্যে এ সমস্যা-সংকট নিয়ে আলাপচারিতার ছলে সার্বক্ষণিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে– বলতে হবে যৌথজীবনে দলীয় জীবনে এথিক্যাল ভেল্যুস অব লাইফ– একালের ভাষায় বিবেকানুগত্য ও যুক্তিনিষ্ঠা এবং ইডিওলজি– অন্য কথায় ন্যায্যতার মূল্যবোধ একান্ত আবশ্যিক ও জরুরি। নইলে জাতীয় জীবনে বিবর্তন-উন্নয়ন-তরক্কি মিলবেই না। উল্লেখ্য যে, মন-মগজ-মননই জীবনযাত্রার স্টিয়ারিং হুইল। মানসে সংস্কৃতির স্থিতি হচ্ছে দ্যোতনায় ও তাৎপর্যে ওই নৈতিক চেতনা ও হার্দ্যিক মূল্যবোধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষা-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যাকে বিদ্যার্থীর মনে-মগজে গাঢ়-গভীর করবার লক্ষ্যে নতুন করে কোর্স প্রথাকে ইন্টেগ্রেটেড কোর্সে উন্নীত ও সংহত করছে নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে। এদিকে সরকারও কলেজী শিক্ষা সুষ্ঠু করার জন্যে আলাদা পরীক্ষা গ্রহণ বোর্ড করেছে বিশ্ববিদ্যালয় নামে। অন্যদিকে দুস্থ দরিদ্র সুযোগবঞ্চিতদের শিক্ষাদানের জন্যে স্থাপিত হয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। আবার মাধ্যমিক স্তরেও শিক্ষা ব্যবস্থাকে পাঠ্যসূচি মাধ্যমে ঢেলে সাজানোর জন্যে বহু বহু গুণীজন শিক্ষাবিদ নিয়ে গঠিত হয়েছে কমিটি বুদ্ধি-পরামর্শ দেয়ার জন্যে যাঁর যাঁর জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিজ্ঞতা-অভিজ্ঞতা প্রয়োগে। তাছাড়া খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য, গণসাক্ষরতা প্রভৃতি নানা ব্যবস্থা রয়েছে ও হচ্ছে। 'এনজিও'রাও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছে গ্রামে গঞ্জে। কাজেই মানতেই হবে দেশ ভাত-কাপড়ের অভাবে দুর্ভিক্ষ কবলিত হবে এ আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও গোটা দেশে সরকারের ও সর্বস্তরের মানুষের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে শিক্ষার সাক্ষরতার সুষ্ঠু বিস্তার প্রয়াস। কেননা জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে ও জনসম্পদে এবং জনপুঁজিতে পরিণত করতে হলে এ ছাড়া উপায় নেই। নান্যপন্থা! বেসরকারী ভাবে ব্যক্তিক উদ্যোগে গড়ে উঠেছে, উঠছে, ইংরেজি ভাষা মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সর্বপ্রকারের শিক্ষাদান লক্ষ্যে। মুসলিম বানানোর ও রাখার উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছে, উঠছে অসংখ্য প্রাথমিক ও উচ্চমাদ্রাসা।

কিন্তু দেশব্যাপী এ শিক্ষামনস্কতার লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের জীবিকা সংস্থান। এ জন্যেই টেকনোলজি ও টেকনোক্রাসি শেখানো, টেকনোলজিস্ট ও টেকনোক্রাট বানানোই হয়েছে শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য। তাই আজকাল ডাক্তার, প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ, যন্ত্রনির্মাতা, স্থপতি, বাণিজ্যবিদ্যা এবং ব্যবসায় পরিচালনাবিদ্যা শেখানোই লক্ষ্য হয়েছে। অবশ্য আগের নীতিতে ও নিয়মে শিক্ষাব্যবস্থা কলা অনুষদে, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে ও সাধারণ বিজ্ঞান অনুষদগুলোতে চালু রয়েছে। এবং বৈশ্বিকস্তরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভাববিনিময়ের ভাষা হিসেবে ইংরেজি শেখার ও শেখানোর গুরুত্ব এখন স্বীকৃত। যুক্তি-বুদ্ধির সমর্থনে অর্থকরী শিক্ষার আদর-কদর স্বাভাবিকভাবেই বেশি। কারণ মানুষও প্রাণী, আগে অশন-বসন-নিবাস-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা প্রভৃতির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্যে অর্থোপার্জন আবশ্যিক ও জরুরি। তারপরে মানুষ হিসেবে মন-মগজ-মনন-মনীষা প্রয়োগে শাস্ত্রের, পরিবারের, সমাজের, সরকারের এবং ব্যক্তি মানুষের প্রতি মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করার, স্বীকার করার, অনুভব করার ও উপলব্ধি করার একটা সামাজিক বা বিবেকী দায়িত্বচেতনা কারো কারো মনে জাগে মাত্র। তাও যতটা সামাজিক নীতি-রীতি-প্রথার আনুগত্যে করা হয়, ততটা আন্তরিকতায় করা হয় না।

আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক জাতিচেতনাই দেয়া হয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের স্বার্থে। সংখ্যালঘু নাগরিকদের হিসেবের মধ্যে রাখা হয় না হয়তো সচেতনভাবে ওদের অধিকারে গুরুত্ব না দেয়ার ফলেই। বাঙলাদেশী সংস্কৃতি বস্তুটার কিংবা জাতীয় সংস্কৃতির অবয়বটা কি এ যাবৎ কেউ ব্যাখ্যা করেননি, কেবল লেখায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবৃতিতে ও ভাষণে উল্লেখ করেন মাত্র। সংস্কৃতিমাত্রই সভ্যজগতের সর্বত্র মিশ্রণে-অনুকরণে অনুসরণে বিনিময়ে গড়ে ওঠে। এরশাদের সময়ে এক ইসলামি সংস্কৃতি তৈরির কমিশন বসানো হয়েছিল। আসলে ইসলামি সংস্কৃতি হচ্ছে মিশরীয়-ব্যাবিলোনীয়-পেলেস্টাইনীয়-ফিনিসীয়-কেনানী-ইরানী, ইরাকি ও মধ্য এশীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রিত রূপ। উপমহাদেশে তা দেশীয় উৎপাদনেও হয়েছিল সমৃদ্ধ। তাই ইসলামিক সংস্কৃতি নামে অবিমিশ্র কিছু পাওয়া যাবে না। পৃথিবীর কোনো জাতির সংস্কৃতিই অবিমিশ্র মৌলিক নয়, নানাভাবে ভিন্ন জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রায় ও মন-মগজ-মনন-মনীষা-আবিষ্কার-উদ্ভাবন-নির্মাণ-সৃষ্টি প্রভৃতির প্রভাবে প্রভাবিত ও মিশ্রিত। তাই ইসলামি সংস্কৃতি বলে কিছু ছিল না, নেই। ছিল ও আছে আসলে মুসলিম সংস্কৃতি এবং তাও জাত-জন্ম-বর্ণ-ভাষা-নিবাস-শিক্ষা ও প্রকৃতি পরিবেষ্টনী ভেদে বিভিন্ন। আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে একটা বলার কথা এই, মানুষ খাওয়ার জন্যে বাঁচে না, বাঁচার জন্যেই খায়। আমাদের মধ্যে কেবল জীবিকা অর্জনে যোগ্য লোক সৃষ্টি হলেই আমাদের মনুষ্যত্ব মানবিকগুণ মানবতা বৃদ্ধি পাবে না, আমাদের মধ্যে মানবিকগুণের অনুশীলনকে গুরুত্ব দিতে হবে। তার জন্যে প্রয়োজন সাহিত্য, চিত্র শিল্প, দর্শন, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের যে-কোনো একটিকে অন্তত অবশ্য পাঠ্য করতে হবে সর্ব শ্রেণীর ও শাখার শিক্ষার্থীদের জন্যে। এসব বিষয় মানুষকে ভাবায়, মানুষের সূক্ষ্ম অনুভব-উপলব্ধির শক্তি ও যোগ্যতা বাড়ায়। হৃদয়বৃত্তির প্রসার ঘটায়।

AMARBOI.COM

যুক্তিবাদের পক্ষে কিছু কথা

সব শাস্ত্রই বলে 'হে মানবসন্তান তোমরা মানুষ হও', অর্থাৎ মানবিক গুণের শাস্ত্রানুগ বিকাশ ঘটাও, কেননা দলীয়, গোত্রীয়, সামাজিক তথা যৌথজীবনে সুখে-শান্তিতে, স্বস্তিতে, নিরুপদ্রবে, নিরাপদে, নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের জন্যে নির্বিরোধ, নির্বিবাদ, সহযোগিতায়, সহাবস্থান আবশ্যিক অর্থাৎ পূর্বশর্ত। ফলে 'মানুষ হওয়া' সূক্ষ্ম তাৎপর্যে বোঝায় 'ভালো হওয়া, ভালো থাকা, নিজের ও অপরের ভালো চাওয়া।' কিন্তু বাস্তবে স্থূলবুদ্ধি শাস্ত্রী ও দেশিক চিরকাল তাঁদের দেশনায় বলেন যে, শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ আক্ষরিকভাবে জীবনচর্যায় রূপায়িত করে আদর্শ ইহুদী, সৎ খ্রীস্টান, ভোগবিমুখ জৈন, বৈরাগ্যপ্রবণ বৌদ্ধ, আচারনিষ্ঠ হিন্দু, স্বধর্মীর ভ্রাতৃত্ব বোধেপুষ্ট মুসলিম, গুরু ভাইয়ের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য ও প্রীতিপরায়ণ বাহাই, শিখ, বৈষ্ণব, সন্তধর্মী হওয়াই হচ্ছে মর্ত্যজীবনে মানুষ মাত্রেরই লক্ষ্য হওয়া আবশ্যিক ও জরুরি।

ফলে গোড়া থেকেই আদি ও আদিম গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক, বার্ণিক, ভাষিক, আঞ্চলিক, শ্রেণীক দ্বেষ-দ্বন্দ্বের মতো ধর্মীয় মতবাদী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে, বিধর্মীর ও ভিন্ন মতের, স্বধর্মীর মধ্যে দাঙ্গা-লড়াই-যুদ্ধ ঘটে আসছে, আজ অবধি তার অবসান হয়নি, দেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশে সংস্কৃতির গুণ-মান-মাপ-মাত্রা অনুসারে এ যুগে এ দ্বেষণার সামান্য রূপান্তর ঘটেছে মাত্র, অর্থাৎ বাহ্য আচরণে সুপ্ত ও গুপ্ত, কিন্তু মানস জগতে সক্রিয় হয়ে রয়েছে। উঁচুমানের সংস্কৃতিমানের দেশেও ক্ষোভ-ক্রোধ-স্বার্থচেতনা বৃদ্ধি পেলে তা দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-দাঙ্গা-লড়াই-যুদ্ধ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-গোত্র-ভাষা-নিবাস প্রভৃতির পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্যজাত কারণে স্বাধীন হবার জন্যে আন্দোলন-সংগ্রাম রক্তক্ষরা প্রাণহরা যুদ্ধ রূপে এ মুহূর্তেও চালু রয়েছে। কাজেই শাস্ত্রেও মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে মানুষ। এখন স্বমতের ও স্বসম্প্রদায়ের মধ্যেই কেবল শাস্ত্র মিলনসূত্র বা ঐক্যের বন্ধনসূত্র রূপে কাজ করে, অবশ্য ব্যক্তিগত লাভ-লোভ-স্বার্থচেতনাবশে মানুষ সপরিবারে স্বসমাজে স্বপ্রতিবেশীর ও স্বজনের সঙ্গেও প্রাণঘাতী বিবাদে মেতে ওঠে প্রাণিজগতের অন্যান্য প্রাণীর মতোই।

পৃথিবীর সব আদিম সমাজের সমস্যারই স্থূল-সূক্ষ্ম রূপ, রেশ ও লেশ রয়ে গেছে সব রাষ্ট্রেই। তাই সমাজে দুর্বল মানুষ শোষণ-পীড়ন-প্রতারণা-প্রবঞ্চনা মুক্ত হয়নি। সবল-প্রবলেরা আজো জোর-জুলুমে মানুষকে বশে রাখে, শায়েস্তা রাখে, রাখে নিঃস্ব, নিরস্ত্র, দুস্থ, দরিদ্র করে। একবার একনায়কত্বে মার্কসবাদের প্রয়োগ পরীক্ষিত হয়েছে, আর একবার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মার্কস নির্দেশিত পন্থায় সমাজ পরিবর্তিত ও বিন্যস্ত করে দেখা জরুরি। কেননা, এ মার্কসবাদ বলে: খেয়ে পরে বেঁচে থাকার অধিকার হচ্ছে মৌল মানব অধিকার বা মানুষের জন্মগত অধিকার। এবং শিশু-রুগ্ন-পাগল-পঙ্গু-বৃদ্ধ প্রভৃতিকে ভাতা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা আর অন্যদের কাজ দিয়ে বাঁচার ব্যবস্থা করে দেয়াই হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কাজ। মার্কসবাদ যাদের কাছে আতঙ্কের বলে অবজ্ঞেয় ও পরিহার্য তাদের কাছে আমাদের ভিন্ন আবেদন রইল। তাঁরা জন্মসূত্রে পরিবারের, সমাজের, শাস্ত্রের প্রভাবে আশৈশব যে বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা লাভ করে রবোটের মতো অভ্যস্তপন্থায় জীবনযাপনে তুষ্ট, তৃপ্ত, পুষ্ট ও হৃষ্ট, কিন্তু কখনো 'র‍্যাশন্যাল' হয়ে যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-মন-মনন-মনীষা প্রয়োগে অর্থাৎ এক কথায় মুক্ত মন-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগে তাঁদের সেই লব্ধবিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার লৌকিক-অলৌকিক-অলীক অংশ যাচাই-বাছাই-ঝাড়াই করে গ্রহণে-বর্জনে-অর্জনে যদি যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবনাচার ও আচরণ আর কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন এবং উপযোগরিক্ত বলে অভ্যস্ত জীবনধারা পরিহার করেন, তা হলেও তাঁদের আস্তিক্য সত্ত্বেও তাঁরা ভিন্ন মতের, পথের, আদর্শের, চেতনার, আচারের মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রাভ্যন্তরে এবং বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সহযোগিতায়, উদারতায় ও বিবেকানুগত্যে সহাবস্থানে উন্নততর মানস ও ব্যবহারিক জীবনযাপনে সমর্থ হবেন। এ জন্যে তাঁদের ফ্রিথিঙ্কার বা মুক্তমনের চিন্তক হতে হবে, হতে হবে যুক্তি-বুদ্ধি উদারতাবাদী, হতে হবে বিজ্ঞান ও বাণিজ্যমনস্ক, হতে হবে আধুনিক যন্ত্রনির্ভর জীবনচেতনায় ও জগৎভাবনায় ঋদ্ধ। আমাদের ধারণা, যুক্তিবাদী জিজ্ঞাসু কৌতূহলী ব্যক্তিমাত্রই হয় শ্রেয় সচেতন সুজন। অতএব, Rational না হলে ফ্রিথিঙ্কার বা মুক্ত চিন্তক হওয়া যায় না কিংবা ফ্রিথিঙ্কারই কেবল Rational হয়। এবং Rational বা যুক্তিবাদী সাধারণভাবে চিত্তবান হয় তথা বিবেকানুগত্য বশে মানবতার ধারক হয়। বিশ্বাস বা ধারণা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করা যায় না বলেই বিশ্বাসে সন্দেহ ও অনিশ্চিতি থেকেই যায়। তাই বিশ্বাসে প্রতারিত চেতনা, হওয়ার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তিবাদের যে ভিত্তি কারণ-কার্য চেতনা তাতে আয়ুর্বিজ্ঞানের কিংবা মনোবিজ্ঞানের অথবা সমাজবিজ্ঞানের সমর্থন মেলে, তাই যুক্তিবাদ নিঃসংশয়ে নির্ভরযোগ্য। আমাদের সমাজে যুক্তিবাদীর, ফ্রিথিঙ্কারের সংখ্যা বৃদ্ধি না পেলে আমাদের পক্ষে চিন্তায়-চেতনায় কর্মে আচরণে সমকালীন বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে সমতালে চলা সম্ভব হবে না। যৌক্তিক-বৌদ্ধিক চেতনায় জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যিক শ্রেয়স্কর বলেই। কারণ যৌক্তক-বৌদ্ধিক চেতনা সেক্যুলার জীবনদৃষ্টির জনক। আর সেক্যুলারিজম মানবিকতা ও মানবতা প্রসূ।

মর্ত্যজীবনে যৌক্তিক দাবির গুরুত্ব

এ কালে কোনো ব্যক্তির মন-মনন রাখা বাঞ্ছনীয় নয়, জীবন কি, জীবন কেন, জীবন সার্থক করার উপায় কি, জীবনে ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ-আনন্দ-আরাম-সুখ আবশ্যিক ও জরুরি কেন, সুখই-বা কি, দুঃখই-বা কি, দুঃখ-হতাশা এড়ানোর উপায়ই-বা কি? এক কথায় জীবনযাপনের শ্রেষ্ঠ সার্থক পন্থা কি, জীবনে নিজের ও পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য কি, দল বা সমাজবদ্ধ যৌথজীবনে দায়িত্ব ও কর্তব্য চেতনার তাৎপর্য কি প্রভৃতি সম্বন্ধে সচেতন থাকা, নতুন চেতনায় ও চিন্তায় জীবনকে মানসিকভাবে উপভোগে, অনুভবে ও উপলব্ধিতে উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস-প্রযত্ন করা এ যুগে শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তি মাত্রেরই পক্ষে প্রয়োজনীয়। কারণ এ যুগ বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক, যন্ত্রনির্ভর, বিজ্ঞানীর আবিষ্কার-উদ্ভাবন-নির্মিতির ও সৃষ্টির প্রসাদপুষ্ট। বিজ্ঞান ও বাণিজ্য মানুষ মাত্রকেই জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক জীবনচর্চার ও জীবনযাপন পদ্ধতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে।

আমাদের প্রত্যেককেই জানতে, বুঝতে ও মানতে হবে যে এ মর্ত্যজীবন বাস্তব ও প্রত্যক্ষ। মর্ত্যজীবন আছে বলেই মর্ত্যজীবনের প্রয়োজনে দলবদ্ধ গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক, আঞ্চলিক জীবনে পরস্পরের সহযোগিতায়, লেনদেনে অর্থাৎ ভাব-চিন্তা-পণ্য বিনিময়ে সহাবস্থানের গরজেই আমাদের লৌকিক, অলৌকিক, অলীক অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির, আসমানী নিয়মিত ও নিয়ন্তার স্বেচ্ছাবৃত শরণ নিতে হয়েছে। তার সঙ্গে টীকা-ভাষ্য যুক্ত হয়ে তা শাস্ত্রে ও দর্শনে উৎকর্ষ লাভ করেছে। শৈশবে বাল্যে লব্ধ বিশ্বাস বা আস্থা হয়েছে ভীরু হৃদয়ের পুঁজি ও পাথেয়। মন-মনন বন্ধ্য বলেই তাতে গতানুগতিক অনুরাগ, অনুগামিতা ও আনুগত্য হয়েছে প্রাজন্মক্রমিক। ফলে, ভিন্ন মতবাদী সম্প্রদায় হয়েছে পর ও শত্রুকল্প। অসংযত, অসহিষ্ণু, অবিবেকী, অবিবেচক সংকীর্ণ চিত্তের বন্ধ্য মননের মানুষ চিরকালই গোষ্ঠীগত, গোত্রগত, বিশ্বাসগত, ভাষাগত, বর্ণগত ও ধর্মমতগত পার্থক্যের কারণে দাঙ্গায়-লড়াইয়ে হিংস্র শ্বাপদের মতো নরহত্যা করে গোষ্ঠী-গোত্র বিলুপ্ত করেছে। এ ১৯৯৬ সনেও প্রাক্তন কম্যুনিস্টরাই বসনিয়ায় য়ুরোপীয়-আমেরিকান খ্রীস্টানরা কপট ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃত্রিম গুরুত্বে মুসলিম-খ্রীস্টান যুদ্ধ বন্ধের প্রয়াসে রত। আসলে তারা সার্বদের সর্ব প্রকারে সর্বক্ষণ প্রশ্রয় ও সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের এ কালের এ যন্ত্রনির্ভর যন্ত্রজগতে ও যন্ত্রনির্ভর জীবনে মর্ত্যজীবনের বাস্তব চাহিদা পূরণ লক্ষ্যেই জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস দক্ষতা চরিত্র নির্বিশেষে মানুষকে মানুষ রূপেই জানা ও মানা আবশ্যিক ও জরুরি। আমাদের জানতে বুঝতে ও মানতে হবে যে এ মর্ত্যজীবন আছে বলেই স্বর্গ-নরক-পরলোক আছে। কাজেই মর্ত্যজীবন বাস্তব ও প্রত্যক্ষ, অন্যগুলো প্রমাণিত নয়, কেবল বিশ্বাস ও অনুমান ভিত্তিক। তাই আগে মর্ত্যজীবনের দাবি মেটাতেই হয়, সে-দাবি-ব্যক্তিক, পারিবারিক, আর্থিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক, বৈজ্ঞানিক, প্রাযুক্তিক, প্রাকৌশলিক, বৈশ্বিক আন্তর্জাতিক এবং সরকারী ও রাষ্ট্রিক। তার জন্যে অধিকাংশ নাগরিকের মানবিকগুণের, মানবত্যবোধের, মনুষ্যত্বের অনুশীলন ও বিকাশসাধন প্রয়োজন। মানবিকগুণের উৎকর্ষ ব্যতীত প্রাণীর প্রজাতি মানব নামে পরিচিতদের সহজাত প্রাণিপ্রবৃত্তির প্রশমন সম্ভব নয় কিছুতেই। তাই আমাদের সচেতন অনুশীলনে মানবিক গুণের উন্মেষ ও বিকাশসাধন আবশ্যিক ও জরুরি। নইলে আমাদের দেশ-কাল-জীবন-জীবিকার প্রাজন্মক্রমিক বিবর্তনধারার বাঁকে বাঁকে উদ্ভূত সঙ্কট-সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না। তাই আমাদের বিজ্ঞানমনস্ক হতে হবে, যুক্তিপ্রয়োগে আচার-আচরণ নীতি-রীতি-পদ্ধতি গ্রহণ-বর্জন করতে হবে, জীবনযাপনে উৎকর্ষসাধনের গরজে। আর আমাদের সহযোগিতায় সহাবস্থানের গরজে সংযত, পরমত-কর্ম-আচরণ সহিষ্ণু, যুক্তিনিষ্ঠ, ন্যায্যতা সচেতন, বিবেকী সজ্জন ও সুজন হতে হবে। অধিকসংখ্যায় এমনি বৈশ্বিক আন্তর্জাতিক জীবনে বিজ্ঞান-বাণিজ্যসচেতন বিবেকানুরাগী, বিবেকানুগামী ও বিবেকানুগত ব্যক্তি প্রয়োজন, গ্রহণ-বর্জনশীল উদার মানুষ সমাজে সুলভ হলেই আমরা সর্বপ্রকার দলীয় ও সাম্প্রদায়িক অযৌক্তিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত বিরল করে তুলতে পারব, আমাদের মানসিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, রাষ্ট্রিক জীবনও হবে উন্নত। মর্ত্যজীবনে দেশ-কাল-জীবিকা-শান্তি-স্বস্তি-নিরাপত্তা প্রভৃতির নিশ্চিতি সম্ভব হবে মর্ত্যজীবনের বাস্তব চাহিদায় যৌক্তিক-বৌদ্ধিক গুরুত্ব দিলেই।

ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল চায় আমজনতা

একে তো অভিভাবক অজ্ঞ-অনক্ষর বা সাক্ষর মাত্র, এ ছাড়া সরকারী নির্দিষ্ট নীতি-নিয়মও না থাকায় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার্থীর শিক্ষা নিরুদ্দেশ নির্লক্ষ্য। স্নাতক পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার কয়েকশ' পরীক্ষা দিয়েছিল, পাস করেছে বিরানব্বই হাজার কয়েকশ'। এদের মধ্যে প্রায় সত্তর হাজারের মতো কলা অনুষদের তথা বিএ শিক্ষার্থী এবং পরীক্ষার্থীদের স্বল্পসংখ্যক পাস করেছে দ্বিতীয় বিভাগে এবং অধিকাংশ পাস করেছে তৃতীয় বিভাগে। অর্থাৎ এরা নিরুদিষ্ট লেখাপড়ায় মাঝারি ও মন্দ। বিদ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্দ-মাঝারি হলেও হয়তো অনেকেই বুদ্ধিতে পাকা। এবং পাকাবুদ্ধির লোক নিঃস্ব, দুস্থ, দরিদ্র ও বেকার হলে ওরা বুদ্ধিকে ধূর্ততায় বিকৃত করে চালু ও চালাক হয় এবং চালাকি আবার প্রতারণাপন্থার নামান্তরও বটে। যারা অনুত্তীর্ণ হল, তারাও যে সবাই আবার পরীক্ষা দেবে আগামী বছর, তা অনিশ্চিত। তাই আমাদের চোখে এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার লেখাপড়া-জানা কর্মপ্রার্থী, উপার্জনের উপায় সন্ধানী তরুণ-তরুণী বাড়ল এ বছর। এবং বছরের মধ্যেই তাদের সবার জীবন-জীবিকার সুরাহা মিলবে না– মেলা অসম্ভব বলেই। পৃথিবীর সবদেশেই অল্প-বিস্তর বেকার আছেই এবং তা সরকার মাত্রেরই লঘু-গুরু সমস্যার অন্তর্গত। তবে উন্নত-অনুন্নত দেশে, ধনী-নির্ধন রাষ্ট্রে এ সমস্যায় পার্থক্য আছে। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র রাষ্ট্রে বিশেষ করে বাঙলাদেশের মতো জনবহুল জনাকীর্ণ ক্ষুদ্রাকারের রাষ্ট্রে এর চেয়ে বড় সমস্যা-সঙ্কট কোনো সরকারেরই থাকতে পারে না। কারণ 'অন্ন চিন্তা চমৎকারা'। ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জল প্রাণের পরিচর্যার জন্যে শুধু প্রয়োজন নয়, আবশ্যিক ও জরুরি। এ কালের মানববাদীর ও মানবতাবাদীর মতে মানুষ মাত্রেরই এ মর্ত্যজীবনে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার রয়েছে এবং তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম রাষ্ট্র বলে অভিহিত আমাদের বাঙলাদেশ রাষ্ট্রে এ বেকার সমস্যার সমাধানের জন্যে দেশবাসীর, সরকারের এবং রাষ্ট্রিক পর্যায়ে সর্বাত্মক ও সর্বার্থক প্রয়াস প্রযত্ন প্রথম ও প্রধান গুরুত্বের বলে স্বীকৃতি পাওয়ার কথা বটে, কিন্তু সরকারের শাসক-প্রশাসক, সাংসদ, মন্ত্রী এবং অর্থসম্পদ নিয়ন্ত্রক ধনিক-বণিক শ্রেণী এ বিষয়ে তেমন সচেতন বলে মনেই হয় না, তাদের কথায়-কাজে ও আচরণে তা তেমন অভিব্যক্তিও পায় না। বরং দেখা, শোনা ও জানা যাচ্ছে যে, কলকারখানার বিস্তার নেই, এখন সংকোচনই চলছে। নানা জায়গায় বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কলকারখানা বন্ধ না বিলুপ্ত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবার আশঙ্কা বাড়ছে বাজার অর্থনীতি ও মুক্ত বাণিজ্যনীতি গ্রহণের ফলে। 'বিজ্ঞান ও বাণিজ্য' নিয়ন্ত্রিত এ কালের পৃথিবীতে দুর্বল রাষ্ট্রের সঙ্কট-সমস্যা আগের কালের চেয়ে অনেক গুণ বাড়ার কারণ তৈরি করছে বাঁচার ও টিকে থাকার গরজেই বিশ্বের প্রবল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো। সেভেন গ্র্যাট কিংবা য়ুরোপীয় ন্যাটো জোট নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন ও চালু করে সাচ্ছল্যে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচার ও আর্থ-বাণিজ্যিক শাসনের ও শোষণের ব্যবস্থা করছে এবং প্রতিবাদের ও প্রতিকারের কোনো আশঙ্কা না করেই দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর ওপর তা চালিয়ে ও চাপিয়ে দিচ্ছে।

আমাদের মাছ-মোরগের লালন কি রাষ্ট্রিক দৈন্য ঘোচাতে পারবে? পশ্চিম এশিয়া এখন আর আগের মতো বেশি লোক নেবে না। তাদের নিজেদের মধ্যেই ডাক্তার-প্রকৌশলী তৈরি হয়ে গেছে। কিছু শ্রমিক কর্মী হয়তো নেবে।

কিন্তু সেখানে নাগরিকত্ব দিয়ে স্থায়িভাবে বসবাস করতে দেবে না। এখন মালয়েশিয়ায় কিছু লোক যাচ্ছে। শিক্ষিতরা অস্ট্রেলিয়ায়, জাপানে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডায়, জার্মানিতে এমনকি নরওয়েতে সুইডেনে যাচ্ছে। এবং কোনো কোনো রাষ্ট্রে নাগরিকত্বও পাচ্ছে। কিন্তু এদেরও অদূর বা সুদূর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। স্থায়ী নাগরিক হলেও সংখ্যালঘু বলেই বঞ্চনা, হীনম্মন্যতা ও গ্লানি-অবজ্ঞা-অবহেলা থেকে তাদের মুক্তি মিলবে না কখনো। পাঁচশ' বছর আগে মুসলিম মাত্রই বিতাড়িত হয়েছিল স্পেন-পর্তুগাল থেকে সাতশ' বছরের প্রভু শাসকগোষ্ঠী হয়েও, য়ুরোপের পোল্যান্ড, জার্মানি, রাশিয়া,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইটালি প্রভৃতি নানা অঞ্চল থেকে নানাভাবে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত হয়ে ইহুদীরা বিদ্যায়-বিত্তে-জ্ঞানে-প্রজ্ঞায় শ্রেষ্ঠ হয়েও বিতাড়িত হয়েছে বারবার। বসনিয়ান সার্বরা এখন বিতাড়িত করছে পাঁচশ' বছরের পুরোনো দেশজ ও তুর্কী শাসক বংশজ মুসলিমদের। সাড়ে তিন হাজার বছর আগে মুসা নবীর কালে ইউসুফ নবীর কেনানী গোষ্ঠীর লোকদের মিশরের ফেরাউ গোষ্ঠীর লোকেরা বিতাড়িত করেছিল। কাজেই আজ যারা নিশ্চিন্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যত্র নাগরিক রূপে স্থায়ী বাসিন্দা হচ্ছে, এক সময়ে ওইসব দেশের সংখ্যাগুরুরা দারিদ্র্য কবলিত হলে এসব সংখ্যালঘুদের বিতাড়িত করবেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ইংল্যান্ডে এখনই বিদেশীর আগমন রোধে-নিয়ন্ত্রণে সরকার সচেতন। কথায় বলে 'তেলে জলে মেশে না'। তেমনি বিদেশী বিজাতি বিধর্মী বিভাষী হলেই পরগাছার ভাগ্য এড়াতে পারে না। সাম্রাজ্যিক স্বার্থে ইংল্যান্ড-ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ তাদের আফ্রো-এশিয়ান প্রজাদের স্বদেশে ঠাঁই দিয়েছিল, এখন ওরাও স্বাধিকার প্রমত্ত হয়ে নানা সমস্যা সৃষ্টি করছে, এখনো আপোসে সহাবস্থানের চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু আর্থিক দুর্দিন শুরু হলে সবাইকে ঝেঁটিয়ে বের করতেও দ্বিধা করবে না। ইতিহাসের সাক্ষ্যে নয় কেবল, বর্তমানকালের রাষ্ট্রগুলোতেও লঘু-গুরুভাবে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-গোত্র-গোষ্ঠীগত বিরোধ-বিবাদ, বঞ্চনা-পীড়ন-শোষণ আজো একটা রাষ্ট্রিক সমস্যা। পৃথিবীর সব মহাদেশের প্রায় সব রাষ্ট্রেই রয়েছে এ সমস্যা। এ লঘু-গুরু সমস্যার মীমাংসার কোনো উপায় মেলেনি আজো কোথাও।

কাজেই বিদেশে লোক পাঠিয়েও স্বস্তিতে আর্থিক সাচ্ছল্যে রাষ্ট্র ঋদ্ধ হবে তেমন সম্ভাবনা নেই। মা-বাবা শিক্ষিত হলেও জনসংখ্যা সহজে বাঞ্ছিত সংখ্যায় কমবে না। কেননা প্রায় সব রোগেরই প্রতিষেধক বের হয়েছে, হচ্ছে, দরিদ্রের চিকিৎসারও ব্যবস্থা হচ্ছে। অশিক্ষা দূর হলেই কি বেকারত্ব ঘুচবে? ঝড়-ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-মহামারী-আকাল প্রতিরোধ করাও অর্থাৎ মনুষ্যজীবন এ সব বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা ক্রমে সহজ হয়ে উঠবে। কাজেই ভাত-কাপড়ের চাহিদা পূরণের জন্যে বিজ্ঞানকে ও বাণিজ্যকে কাজে লাগাতে হবে। ভারী ভারী কলকারখানা স্থাপন করে বনজ, খনিজ, কৃষিজ, জলজ উৎপাদিত ও নির্মিত পণ্য স্বদেশের বিদেশের বাজারে বেচার এবং চাহিদা বিস্তারের ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষকে এ কালে জাতিসঙ্ঘের শ্লোগান শুনিয়ে শুনিয়ে বিভ্রান্ত করার দিন অপগত। পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার, দু'হাজার সালের মধ্যে সবার স্বাস্থ্য অটুট রাখার ওয়াদা, চাষী-মজুরকে আম-কাঁঠালের বীজ বপনের বা কলার চারা রোপণের জন্যে উৎসাহ দান করা একেবারে প্রায় ভাঁওতাবাজির মতোই অলীক প্রয়াস। কেননা চাষী-মজুরের এক চিলতে ভিটেতে পতিত জমি কোথায় যে সে গাছ লাগাবে, অক্সিজেন ও ছায়া পাবার আর ফুল-ফল ও গাছ বেচে অর্থ পাওয়ার লোভে? বলেছি মানুষও প্রাণী। ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জল পেলেই সে বাঁচবে। অতএব, প্রতি বছর শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়বে লাখে লাখে। এদের কাজ দেয়া সহজ হবে না গরীব রাষ্ট্রের পক্ষে। দেশী-বিদেশী পুঁজি প্রয়োগে পণ্য রফতানি বাড়ানোর চেষ্টাও যে মুক্ত বাজার অর্থনীতি অঙ্গীকার করায় সফল হবে, তা বলা যায় না। কাজেই বন্টনে বাঁচার বিষয়, সমাজতন্ত্রের বিষয়, রাষ্ট্রিক পর্যায়ে আঞ্চলিক ও সামবায়িক সহযোগিতায় বাঁচার উপায় চিন্তা এখন থেকেই করা জরুরি বলে আমাদের ধারণা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ সূত্রে এ-ও উল্লেখ্য যে 'এনজিও' আমাদের পরনির্ভর, পরমুখাপেক্ষী এবং মনে-মগজে-মননে অলস ও নিষ্ক্রিয় করে রাখছে, কোনো প্রকারেই ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে স্বনির্ভর ও স্বয়ম্ভর হতে দিচ্ছে না, দেবে না। ওরা আমাদের ওদের আর্থ-বাণিজ্যিক-মহাজনী স্বার্থেই বাঁচিয়ে রাখবে, উঠতেও দেবে না, মরতেও দেবে না। আমাদের 'এনজিও'র কবলমুক্তি আবশ্যিক ও জরুরি।

বারোমেসে আকাল কবলিত মধ্যবিত্ত

একালে দুর্ভিক্ষ বা আকাল খাদ্যাভাবে ঘটে না, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে ক্রয়ক্ষমতার অভাবেই ঘটে। যে দিনমজুর, যে বেকার, যে নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র রুগ্ন, যে সবদিন দৈনিক খাদ্য সংগ্রহের জন্যে আবশ্যিক অর্থ জোগাড় বা উপার্জন করতে পারে না, সে-ই আকাল বা দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়। আমরা সবাই জানি এ বছর মৌসুমী বৃষ্টির অভাবে ধান-গম উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে দেশে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে। তাই পৌষ মাসেও চালের মূল্য গরীবের ক্রমক্ষমতার উর্ধ্বে ছিল। তাছাড়া আড়তদারেরা বেশি মুনাফার লোভে মৌজুত করে রেখেছিল বা রেখেছে। এতে নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র রুগ্ন ভিখিরীরা নয় কেবল, ভূমিহীন সাফকাপুড়ে (হোয়াইট কলার) গ্রামীণ মানী গৃহস্থরাও খাদ্যাভাবে বিপন্ন হয়েছে। তাদের অবস্থা আরো করুণ। কেননা তারা আত্মসম্মান বর্জন করে ত্রাণসামগ্রী কিংবা লঙ্গরখানার খাদ্যও অর্জন করতে পারে না, ক্ষুধার জ্বালাও সহ্য করতে পারে না। এদের এ ত্রিশঙ্কু অবস্থা আমরা সাধারণত স্মরণ করি না। এমনি আমজনতার সংখ্যাই কিন্তু দেশে বেশি।

আমাদের দেশে আত্মসম্মান রক্ষার বা বৃদ্ধির গরজে আমাদের বিত্তহীন কিংবা নিতান্ত নগণ্য মাত্রায় স্বল্পবিত্ত সাফকাপুড়ে লোকেরাও নিজেদের মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। আসলে আমাদের তথাকথিত নিম্নবিত্ত পরিবার বিভিন্ন পেশায় অর্জিত অর্থ-নির্ভর জীবনযাপন করে দারিদ্র্যের সঙ্গে বারোমেসে সংগ্রাম করেই। রোগে-শোকে-বিয়েতে-মামলাতে নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই এরা ঋণগ্রস্ত হয়। ঋণ যে সব সময়ে মেলে তা-ও নয়। এসব আমজনতার জীবনযন্ত্রণা সবচেয়ে বেশি। কেননা এরা 'কইতেও পারে না, সইতেও পারে না'। ঝড়-ঝঞ্ঝা-বন্যা-খরা-মারীর সময়ে এদের বিনা সুদে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করলেই বরং এদের যথাযথ ত্রাণের ব্যবস্থা হবে। এদের কথা জনগণের, সাংসদের, সরকারের এবং রাজনীতিক দলের ও বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে রাখা আবশ্যিক ও জরুরি প্রাকৃতিক কিংবা রাজনীতিক দুর্যোগ-দুর্দিন-বিপর্যয়ের সময়ে।

যারা কারো ধারেও না কাউকে ধারায়ও না, অর্থাৎ ধারও করে না, ধার দেয়ার সঙ্গতিও রাখে না, তারা মধ্য শ্রেণীর মধ্যবিত্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার সাধারণভাবে যথার্থ মধ্য শ্রেণীর মধ্যবিত্তের কথাই বলি। উচ্চবিত্তের তো অভাব থাকে না। তারা তো সৎ অসৎ পথে অর্জিত অর্থ-সম্পদ ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে-বিলাসে-ব্যসনে ব্যয় করেও শেষ করতে পারে না। তারা তো ঐহিক জীবনেও স্বর্গসুখ ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ-অনুভব-উপলব্ধি করে। আর নিম্নবিত্তের অভাব-অনটন-দুর্ভোগ-দৈন্য তো হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন মতে পূর্বজন্মের কর্মফলই। তবে মুসলমানরা তাকে 'তকদির' বলে, নিয়তি বলে মেনে নিয়ে পারত্রিক সুখের প্রত্যাশ্যায় থাকে। এ কয় বছরের ক্ষুদ্র জীবনের দুঃখ-দুর্দশা যন্ত্রণা সহ্য করার মতো তাদেরও এভাবে প্রবোধ মেলে। কিন্তু আমরা যারা ঘরেরও নই, ঘাটেরও নই, নিতান্ত মধ্য শ্রেণীর মধ্যবিত্ত আমাদের আগে অনেক অভাব-অনটন অনুভব-উপলব্ধি করতে হত না। আমাদের আম-জাম-কাঁঠাল-কমলা-আপেল, মধু-মিষ্টি-দই-ডিম-পুডিং-কেক কিংবা কলা-লিচু-তরমুজ-আঙুর মৌসুমে মৌসুমে খাওয়ার মতো অর্থ ব্যয় করতে পারতাম স্বল্প মূল্যের ছিল বলে, সেই আমরাই এখন শুধু যে মুদ্রাস্ফীতিজাত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে উক্ত সব ফল-মূল-মণ্ডা-মিষ্টি-কেক-বিস্কুট-পিঠা খেতে পাই না তা নয়, আমরা রুই-কাতলা-ইলিশ-চিংড়ি-খাসী-গরু নয় কেবল, ছোট মাছও রোজ কেনার সামর্থ্য রাখি না, সব ধরনের সবজি বা তরিতরকারি ক্রয়েরও আর্থিক সঙ্গতি দিন দিন হারিয়ে ফেলছি। এ কারণেই এ শ্রেণীর লোকেরা সন্তানদের ও জামাইদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্য দেশে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। সরকার এসব দেখে-শুনে-বুঝে সরকারী চাকুরে ও শ্রমিকদের বেতন বাড়ায়। আমাদের তো দৈনিক কি মাসিক বেতন নেই, আমাদের এ ক্ষতি, এ ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও অভাব অনটন ঘোচায় কে? আমাদের ও আমাদের শিক্ষিত সন্তানদের বেকারত্ব ঘোচানোর কোনো আন্তরিক প্রয়াস আছে কি সরকারের বা রাজনীতিক দলগুলোর কিংবা আমাদের অর্থ-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রক ব্যবসায়ীদের অথবা সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীদের? কাদের দোষে, অযোগ্যতায় আমাদের এ দুর্দশা?

AMARBOI.COM

শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ কেন খাদ্যাভাবে মরে!

প্রাণিজগতে ঋজুমেরুদণ্ডের হাতওয়ালা প্রাণী হিসেবে সর্বপ্রকারে ও সর্বক্ষেত্রে, সর্বার্থে ও সর্বাত্মকভাবে শ্রেষ্ঠ হয়েও কেন খাদ্যাভাবে অনাহারে-ঝড়ে-বন্যায়-খরায়-মারীতে মরে একশ্রেণীর অজ্ঞ-অনক্ষর-দীন-দুর্বল-রুগ্ন-বৃদ্ধ-শিশু মানুষ? কেন তারা অর্থসম্পদ-হীন নিঃস্ব-নিরন্ন, দুস্থ-দরিদ্র, অযোগ্য-অদক্ষ কাজের ক্ষেত্রে? এসব আগেকার নিয়তিবাদী আদি ও আদিম সমাজে ঐশ-লীলাজাত বলে ব্যাখ্যাত হয়ে মনে প্রবোধ দেয়া ও পাওয়া সহজ ছিল। সে-আসমানী শাসন এখন জনবহুল বিদ্যাবহুল পৃথিবীতে শিথিল হয়ে এসেছে। এখন মানুষ মর্ত্যজীবন ও সমাজ সচেতন গাঢ়-গভীর নানা অজ্ঞতা সত্ত্বেও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা এখন এতে মানুষের কারসাজি আবিষ্কার করে ফেলেছে। আগে হাজার হাজার বছর ধরে দাস, ক্রীতদাস, ভূমিদাস আর নিঃস্ব-নিরন্ন থেকে অকালে অস্থানে অসহায়ভাবে প্রতি বছর ঝড়ে-বানে-খরায়-মারীতে মরেছে হাজারে হাজারে, উজাড় হয়েছে কেবল ভিটে নয়, গ্রামও, জনপদও। নিয়মিত অপ্রতিরোধ্য লীলা বলেই একে জীবন্ত জ্ঞাতিরা জেনে-বুঝে-মেনে মনে প্রবোধ পেত। আজকাল সচেতন মানুষ প্রাকৃত শক্তির উপদ্রবে জান-মালের ক্ষতির জন্যেও সরকারকে ও সমাজকে দায়ী করতে শিখেছে। উত্তরাধিকার সূত্রে কিংবা অর্জন-উপার্জন রূপে প্রাপ্ত পর্যাপ্ত, অঢেল, অজস্র সম্পদ ব্যক্তিমালিকানায় স্তূপীকৃত হয়ে থাকবে, পাশে থাকবে নিঃস্ব মানুষ এ অবস্থা ও ব্যবস্থা আর সহ্য করতে চাইছে না আজকের নিঃস্ব-দুস্থ-দরিদ্র-বেকার সচেতন মানুষ। পৃথিবীতে মানুষ বাড়ছে, কিন্তু জমি বাড়ছে না, সম্পদও বণ্টিত হচ্ছে না আমজনতার মধ্যে পুঁজিবাদী সমাজে। এরা সমাজতন্ত্র চায়, বণ্টনে বাঁচতে চায়। জীবনে-জীবিকায় মানুষ মাত্রেই জন্মগত অধিকার স্বীকার করে। কিন্তু এর সহজ সমাধানতত্ত্ব কার্ল মার্কস জানিয়ে, বুঝিয়ে ও বাস্তবে প্রয়োগ সাফল্য দেখিয়ে দিলেও অধিকাংশ মানুষ সঙ্ঘশক্তির অভাবে তা স্ব স্ব জীবনে-সমাজে-রাষ্ট্রে বাস্তব করে তুলতে পারছে না। কারণ পুঁজিবাদীরা দুনিয়ার সর্বত্র অর্থ-সম্পদে প্রবল থাকায় তারা মানুষকে নানা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে অর্থ-সম্পদ দিয়ে ওদের ব্যক্তি জীবনে বিপন্মুক্তি ঘটিয়ে তাদের স্বপক্ষে রাখে, ওরা আর শোষিত-বঞ্চিত প্রতারিত গণমানবের মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য-সহায়তা-সহযোগিতা করে না। আবার কোনো কোনো পরাধীন গোষ্ঠী, গোত্র স্বাতন্ত্র্যচেতনা বশে ভিন্ন গোত্রের-বর্ণের-ধর্মের-ভাষার-অঞ্চলের মানুষ শাসিত বৃহৎ রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন স্বরাষ্ট্র গড়ার জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে-আমাদের উপমহাদেশেও- দ্রোহে-রক্তক্ষরা-প্রাণহরা সংগ্রামে রত। প্রায় প্রজন্মক্রমে চলছে সেসব সংগ্রাম। কারো মধ্যস্থতায়ও থামে না লড়াই, হয় না মীমাংসা।

মানুষ শাস্ত্রের, মানবিকতার, মানবতার, মনুষ্যত্বের মহিমা-মাহাত্ম্য স্বীকার করেও ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে তা রূপায়িত বা বাস্তবায়িত করে না। নইলে দেহ-প্রাণ-মন জিইয়ে টিকিয়ে রাখার জন্যে যে খাদ্যের প্রয়োজন, তাতে গুরুত্ব না দিয়ে, মানুষকে খেয়ে-পরে বাঁচার নিশ্চিতি ও অধিকার না দিয়ে, পুঁজিবাদী বুর্জোয়ারা এবং তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় পুষ্ট ও ধন্য আঁকিয়ে-লিখিয়ে-গাইয়ে-বাজিয়ে-নাচিয়ে-নাটুকেরা সাহিত্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র, নৃত্য, বাদ্য প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধনে সংস্কৃতিমান হওয়ার জন্যে, বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক মানের স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্যে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণে অনুকরণের জন্যে অর্থ, শ্রম ও সময় ব্যয় করত না। কেউ চান সাহিত্যের উৎকর্ষ, কেউ সাধনা করেন সঙ্গীতের উৎকর্ষের জন্যে, কোনো চিত্রী বৈশ্বিক মানের ও কদরের চিত্রাঙ্কনে প্রাণপাত করতে রাজি, কোনো কোনো বিদ্বান বিশ্বময় সেমিনার করে বেড়ান। কেউ কেউ চলচ্চিত্রের মান উন্নয়নে নিরত। কেউ বা রাজনীতির ও গণতন্ত্রের সংরক্ষণে ব্যস্ত। কাজেই শোষিত দুস্থ মানবের মুক্তি আজো সম্ভব হচ্ছে না। বণ্টনে বাঁচার তত্ত্বে আস্থাবান লোকের সংখ্যাও বাড়ছে না। দুস্থ দীন মানুষের খেয়ে পরে বাঁচার অধিকারও মিলছে না। এখন কম্যুনিস্ট বা সমাজতন্ত্রী হতে উৎসাহ পায় না তরুণ-তরুণীরা। তাদের মনে-মগজে-মননে অন্তত যুক্তিবাদের বীজ বপন করার ব্যবস্থা হলে যৌক্তিক বৌদ্ধিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনযাপন প্রবণতা বাড়বে। তখন বণ্টনে বাঁচাই আমজনতা শ্রেয়স বলে সহজেই বুঝতে পারবে এবং বিবেকী তাড়নায় লাভ-লোভ-স্বার্থ চেতনা হ্রাস পাবে। শোষিত মানবমুক্তি এভাবেও সহজ ও সম্ভব হবে হয়তো।

দিশেহারা জনতার ক্লিষ্ট ও রুগ্ন সমাজ

ঢাকা শহরে শিক্ষিত লোকদের মন বদলানোর, মত পরিবর্তনের, দলছুট হওয়ার হিড়িক দেখে মনে প্রশ্ন জাগে— এ দেশে কি সত্যিই দেশপ্রেমী মানবসেবী আত্মমর্যাদা সচেতন চরিত্রবান আদর্শনিষ্ঠ কোনো শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোক নেই? উকিল-লেখক-ডাক্তার-শিক্ষক-সাংবাদিক যেন আজকাল যতটা সুযোগ-সুবিধে সন্ধানী, স্বার্থপর, সরকার-ভীরু ও সরকার-ঘেঁষা কিংবা ভবিষ্যৎসচেতন, ইতোপূর্বে ততটা ছিলেন না। নৈতিক চেতনাসম্পন্ন, আদর্শনিষ্ঠ চরিত্রবান কিছু লোক ক্ষতির, জেল-জরিমানার, মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে সামাজিক-সরকারী অন্যায়ের প্রতিবাদে, প্রতিকারে, প্রতিরোধে এগিয়ে আসত দলে দলে, নামত রাস্তায়, যোগ দিত সভায় ও মিছিলে। এখন বিপদের ঝুঁকি থাকলে নিতান্ত দলনিষ্ঠ কিংবা ভাড়াটে না হলে কেউ অন্যায়ের প্রতিবাদে, প্রতিকারে, প্রতিরোধে মুখ খোলে না, কলম চালায় না, বিবৃতিতে সই দেয় না। সবাই যেন নতুন করে 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' নীতিতে দৃঢ় আস্থাবান হয়ে উঠেছে। তাই জোর-জুলুমের ও শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সেক্যুলার বাঙলার সমর্থক ও নির্ভেজাল বাঙালীসত্তা সচেতন প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা থেকে বর্তমানে অতিক্রান্ত যৌবন, প্রৌঢ় এবং যুবা কেউ লড়ে না। ন্যায়ের জন্যে, সরকারের বিভ্রান্তিকর ছদ্ম ইসলামপ্রীতিজাত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে কেউ কথা বলে না। স্বাধীন-সার্বভৌম বাঙলাদেশ নামের রাষ্ট্রের গ্রামীণ গণমানবের সেবার, সাহায্যের এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞরূপে তাঁরা সরকারী নীতিই-প্রস্তাবই সমর্থন করে আসেন, তাঁরা নিজেদের সন্তানদের জন্যে ইংরেজি মাধ্যম এবং আমজনতার সন্তানদের জন্যে বাঙলা মাধ্যম চালু রাখার পক্ষপাতী। বাঙলা মাধ্যমে পড়ুয়ারা মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পরীক্ষায় পাস করে ইংরেজিতে কাঁচা বলে কাজ পায় না কোথাও। আমরা এখানেও গা-পা বাঁচিয়ে বিপদমুক্ত সভা-মিছিল করি বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ করার জন্যে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে সব বিষয়ে এ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করি না। যেমন কাশ্মীর ছিল চিরকালই স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। এ পার্বত্য রাজ্য ব্রিটিশ সরকার জয় করেও প্রত্যক্ষ শাসনে রাখেনি। বিক্রয় করে দিয়েছিল ডোগরা রাজা গোলাপ সিংহের কাছে আশি লাখ টাকায়। আমরা জানি ১৯৪৭ সন থেকেই কাশ্মীর আন্তঃরাষ্ট্রিক কিংবা আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে রয়েছে। তাই তা ভারতের অভ্যন্তরীণ প্রাশাসনিক সমস্যা নয়। আমরা কাশ্মীরের পাকিস্তানভুক্তি কিংবা ভারতভুক্তি চাই না। আমরা স্বাধীন কাশ্মীর রাজ্যের সমর্থক এবং এ সমস্যার রাজনীতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাধানের প্রত্যাশী। কিন্তু ঢাকায় কাশ্মীর কিংবা বসনিয়া অথবা চেচনিয়া প্রভৃতিতে গণমানব হত্যার, বিতাড়নের, নির্যাতনের, দহনের, ধর্ষণের, লুণ্ঠনের প্রতিবাদে এগিয়ে আসা নৈতিক, মানবিক কিংবা আদর্শিক বিবেকী দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে অনুভব করি না, যদিও দহন-ধর্ষণ-হনন-লুণ্ঠন প্রভৃতির বয়ান ও দৃশ্য আমরা রেডিও-টিভি আর সংবাদপত্রে দেখি। এমনি ঔদাসীন্যে বাস্তবে আমাদের মানসিক অবক্ষয়ের লক্ষণ বা রূপই প্রকট করে।

আমরা স্বদেশবাসীর দুর্দশার সময়ে তাদের পাশে দাঁড়াই না, সাহায্যের হাত প্রসারিত করি না। দেশে এত দীর্ঘ সময় ধরে অধিকাংশ মানুষ বন্যা কবলিত জীবনযাপন করল, আমরা দেখলাম শুনলাম আর জানলাম মাত্র। নিজেদের কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে কি-না ভেবে দেখলাম না। ত্রাণ কার্যে স্বেচ্ছাসেবী হওয়া উচিত কি-না, তাও বিবেচনা করলাম না বিবেকী তাগিদে।

আমাদের শহুরে শিক্ষিতজনেরা বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনেকেই সরকারের কৃপা-করুণা প্রাপ্তির জন্যে সরকারী দলের চাটুকারে তাঁবেদারে পরিণত হচ্ছেন। ফায়দাও কেউ কেউ প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে পাচ্ছেন। কেউ কেউ ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার জন্যে সম্ভাব্য বিজয়ী দলেও যোগ দিচ্ছেন। আসন্ন নির্বাচনে দাঁড়াবেন কারা? যাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যজাত অঢেল টাকা আছে তাঁরা এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনানীরা বাকি জীবনে রাজনীতিক ফায়দা লক্ষ্যে এ দলে ও দলে যোগ দিচ্ছেন, যোগ দিচ্ছেন উঁচু পদের সিভিল সার্ভেন্টরাও। আর এনজিওগুলোও ক্রয় করছে উচ্চ মূল্যে হাজার হাজার ও লাখ টাকা মাসিক বেতন দিয়ে প্রভাবশালী শক্তিমানদের, তাই এনজিও বিরোধী মেলে না– সমর্থক মেলে লাখে লাখে। আমরা এভাবে স্বদেশেই পরমুখাপেক্ষী পরাজিত পরানুগৃহীত হয়ে বাস করছি– সরকারী বেসরকারী সবাই কাঙাল মনের লোক হয়ে গেছি যেন। আমাদের হায়া-শরম-সংকোচ সব ঘুচে গেছে। আমরা বড় বেশি লাভ-লোভ-স্বার্থবাজ হয়ে পড়ছি। তাই সমাজে এখন আত্মমর্যাদা বোধহীন বেহায়া-বেশরম-বেলেহাজ-বেদরদ-বেদানাই-বেআক্কেল ও বেল্লিক লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে বয়সনির্বিশেষে। বেকারত্ব, আর্থিক জীবনে অনিশ্চিতি, নৈতিক চেতনার অভাব, যৌক্তিক-বৌদ্ধিক-বিবেকী জীবনে অনাকর্ষণ এবং উচ্চাশীর কৃপা-করুণা যোগে বড় হওয়ার প্রয়াস-প্রযত্ন, তাদের স্বদেশী-বিদেশী নির্বিশেষে অর্থবান-ক্ষমতাবান লোকের অনুগামিতা ও আনুগত্য আমাদের দেশপ্রেমী ও জনসেবী হওয়ার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, আমরা বিত্তবান হওয়ার চেষ্টায় রত, চিত্তবান হওয়ার সাধনাবিমুখ। এ জন্যে আমরা গ্লানিবোধও করি না, লজ্জিতও হই না। তাই স্বদেশ আজ দুর্দশাগ্রস্ত সর্ব প্রকারে এবং সমাজও সমস্যা-সঙ্কট ক্লিষ্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিশু শ্রমিক ও দরিদ্রতম দেশের সমস্যা

দেশে-কালে জীবনযাত্রার ধারা বদলায়। আমরা অনেক সময়ে তা টেরও পাইনে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান না হলে। পরিবেশের প্রতিবেশের দরুন জীবনযাত্রার উপকরণ-উপাদানের অভাবে কিংবা সদ্ভাবে এবং প্রতুলতায় খাদ্যে, পোশাকে, ঘরে-তৈজসে-আসবাবে পরিবর্তন আসে। মগজ-মনন-মনীষা খাটিয়ে মানুষের বহুলতায় ও প্রাচুর্যে বৈচিত্র্যে উৎকর্ষ সাচ্ছল্য স্বাচ্ছন্দ্য আসে জীবনযাপন পদ্ধতিতে যন্ত্রের, প্রযুক্তির, প্রকৌশলের নতুন নতুন উদ্ভাবনে আবিষ্কারে ও উৎকর্ষ সাধনের ফলে। এভাবে দেশে-কালে সমাজে এসেছে ক্রমবিবর্তন। তার সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অজ্ঞাত-অপরিচিত দেশ-দ্বীপ-অঞ্চল-মহাদেশ প্রভৃতির উন্নত-অনুন্নত জনগণের সঙ্গে পরিচয়ের সংযোগের লেনদেনের ফলে নতুন পশু-পাখি, তরুলতা-ফল-চারু-কারু শিল্পের ও খাদ্যের পরিবর্তনও এসেছে। আজ বিজ্ঞানের বদৌলত যন্ত্রের, প্রযুক্তির-প্রকৌশলের ও চিকিৎসা, বিজ্ঞানের আর রাজনীতিক, সামাজিক, নৈতিক, শাস্ত্রিক-আদর্শিক নানা কিছুর প্রভাবে মানুষের ব্যবহারিক ও মানসিক জীবনে দ্রুত পরিবর্তন আসছে। এ পরিবর্তন অপ্রতিরোধ্য কারণ এর সঙ্গে দেশ-কাল-জীবন, জীবিকা পদ্ধতির, বিজ্ঞানের ও বাণিজ্যের, জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা-বিবেকের ও উপযোগচেতনার ঘনিষ্ঠ সংযোগ বা সম্পৃক্ততা রয়েছে।

তাই একালে সেকালের মতো গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক, আঞ্চলিক জীবনের প্রতি নৈতিক দায়িত্বের বন্ধনচেতনা এবং আবশ্যিক কর্তব্যবোধ নেই। দিনে দিনে ভাই-বোন-সন্তানের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা কমে যাচ্ছে দূরে দূরে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করার ফলে। উল্লেখ্য যে, আগের কালের অজ্ঞ-অনক্ষর বিচিত্র হাতিয়ার-যন্ত্রহীন মানুষ দলবদ্ধ হয়েই পারস্পরিক সহযোগিতায় জীবিকা অর্জন করত। একাকী একা করার মতো কাজ জীবিকা ক্ষেত্রে কিংবা পথিক জীবনে একাকী চলার মতো পরিবেশ ছিল না অসহায় মানুষের, সবক্ষেত্রেই যৌথজীবনই ছিল নির্ভরতার-নিশ্চিন্ততার ভিত্তি। প্রকৃতির, পশুর, শ্বাপদের, সরীসৃপের, কীটের কাছে অসহায় মানুষের একক জীবনে একা বিচরণ ছিল বিপদসঙ্কুল।

এখন সেদিন নেই। দেশ-কাল-জীবন-জীবিকা পদ্ধতি এবং নিত্যকার জীবনযাত্রার ধরন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আবিষ্কৃত ও পরিচিত, সংযুক্ত, সম্পৃক্ত বিজ্ঞানে-বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রিত পৃথিবীতে এখন সুখ যৌথজীবনে নয়, একান্নবর্তী পরিবারে নয়, সুখ স্বাতন্ত্র্যে, সুখ বিচ্ছিন্নতায়, সুখ স্বনির্ভরতায়, সুখ নৈতিক-সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য মুক্তিতে ও অস্বীকৃতিতে।

একালে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য চেতনা দুর্লভ। একালে তৃতীয় বিশ্বের উঠতি বুর্জোয়া সমাজে, সরকারে রাষ্ট্রে মানব প্রজাতির প্রাণী ব্যক্তি মানুষে মানবিক গুণ সুলভ নয়, একে অপরের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যেন শত্রুই। এজন্যে প্রতিটি দ্বিতীয় ব্যক্তি যেন সন্দেহভাজন ও ভাবী শত্রু আর প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিযোগী। একালে কেউ কাউকে সরল বুদ্ধিতে বিশ্বাস করে না। মানুষের প্রতি ব্যক্তি মানুষ আস্থা হারাচ্ছে দ্রুত। এ জন্যেই উন্নত বিশ্বে যেমন মানবতা, মানবিকগুণ, মনুষ্যত্ব বহু মানুষে সুলভ, অন্যদিকে উঠতি-পড়তি-ঝরতি ভুঁইফোঁড় লুম্পেন বুর্জোয়ার তৃতীয় বিশ্বে তা দুর্লভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও দুর্লক্ষ্য। উন্নত বিশ্বের কোনো কোনো সমাজে কেবল মানবহিতৈষী নয়, প্রাণিজগতের জীব-উদ্ভিদ প্রভৃতির প্রতিও দায়িত্ব-কর্তব্য-প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ওদের বাঁচিয়ে-টিকিয়ে রাখার জন্যে কোটি কোটি অর্থ ব্যয়ে সংরক্ষণের, স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা দানের এবং ওদেরও রোগচিকিৎসার জন্যে গবেষণায় রোগের নিদান ও প্রতিষেধক আবিষ্কারে মানুষ জীবন উৎসর্গ করেছে, করে এবং করছে। তাদের মনুষ্যত্ব মানবিকগুণ নিজেদের অনুশীলনে ও চর্যায় অর্জিত বলেই হয়তো তার মধ্যে স্বাভাবিক ভারসাম্য রয়েছে। যেমন সরকারী প্ররোচনায় ও বাহ্যিক স্বার্থে কোনো কোনো বিজ্ঞানী মারণাস্ত্র তথা লক্ষ কোটি মানুষ এক সঙ্গে মারার অস্ত্র আবিষ্কারে উদ্ভাবনে গবেষণায় প্রাণপণ করেছে, তেমনি একটি রোগের নিদান ও প্রতিষেধক ঔষধ তৈরির জন্যেও করেছে সরকারের প্রবর্তনায় গবেষণা কাজে জীবন উৎসর্গ। দুটোই বাস্তব এবং মানবিক শক্তির বিকাশ-বিস্তারের সাক্ষ্য-প্রমাণমাত্র। আজ বলতে গেলে জল-স্থল-নভ প্রবেশ, সমুদ্রের তলদেশে, অরণ্যের গভীরে, পর্বতের কন্দরে ও চূড়ায় আর নভজগতে বিচরণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, হচ্ছে। উন্নত দেশের, কম্যুনিস্ট দেশের মানুষ, আর মর্ত্যজীবনবাদী যুক্তিনিষ্ঠ উপযোগ সচেতন আধুনিক বিবেকী মানুষ এমনি মানসিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থায় ও অবস্থানে বাস করছে। যদিও সেসব দেশে আদি ও আদিমকালের লৌকিক-অলৌকিক-অলীক অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তিতে গাঢ়-গভীর আস্থা বশে কিছুলোক গুরুবাদ অঙ্গীকার করে রজনীশ, বালকব্রহ্মচারী, শাস্ত্রী, পীর-দরবেশ-সন্ত-শ্রমণ-পাদরী-রাব্বীর পেছনে ঘোরে রোগে বা শোকে আত্মহারা হয়ে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ও প্রতারকের খপ্পরে পড়ে। মানুষ আজো প্রাণ দিচ্ছে ও প্রাণ নিচ্ছে বিশ্বাস-ভয়-ভক্তি-ভরসা বশে।

আমাদের বাঙলাদেশে যেন কাল, জীবন ও জীবিকাপদ্ধতি আর জীবনযাত্রা স্থির হয়ে রয়েছে। এদেশে লিবারেলিজমে, র‍্যাশন্যালিজমে এবং বিজ্ঞানে-বাণিজ্যে গুরুত্ব চেতনা চিকিৎসাবিজ্ঞানে আগ্রহ এবং মানবিকগুণের অনুশীলন কিংবা বিবেকীচর্যা কোনোভাবেই প্রসার লাভ করছে না। যদিও য়ুরোপীয় বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-প্রকৌশল-যানবাহন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, শিক্ষা, যন্ত্র সব কিছুই ব্যবহারিক জীবনে গ্রহণ করেছি সাগ্রহে, তবু মানস জীবনে রয়েছে এসবের প্রতি ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা, মগজ-মনন-মনীষা আমাদের সুপ্রাচীন বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-ভয়-ভক্তি-ভরসামুক্ত নয় বলেই।

তাই আমাদের আমজনতা আজো অজ্ঞতা-অনক্ষরতা-নিঃস্বতা-নিরন্নতা-দুস্থতা-দরিদ্রতা প্রভৃতির এবং অপুষ্টির ও অস্বাস্থ্যের শিকার। বলা হয়েছিল ব্রিটিশ বিতাড়নে আমাদের দুঃখ ঘুচবে, অভাব মোচন হবে, ভারত বিভাগে মিলবে নিরুপদ্রব নিরাপদ বিদ্যাবিত্ত-বেসাতঋদ্ধ জীবন-জীবিকা। বিধর্মী গেল, বিভাষীও বিতাড়িত হল পরে। কিন্তু অজ্ঞতা-নিরক্ষরতা, নিঃস্বতা, নিরন্নতা, দুস্থতা, দরিদ্রতা কমল না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতিজনিত কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যও বাড়লই কেবল। আমজনতার অবস্থার ও অবস্থানের কোনো-উন্নতি হল না, বরং দুর্দিন-দুর্যোগ-দুর্দশা বেড়েই চলেছে। দরিদ্রের ও বেকারের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে।

এক শ্রেণীর ধনিক-বণিক-শাসক-প্রশাসকের সমাজ গড়ে উঠেছে বটে, এ কিন্তু স্বাধীনতার দান-অবদান নয়, পরাধীনতার কালেও শাসকগোষ্ঠীর কৃপায়-করুণায়-দয়ায় দাক্ষিণ্যে, সহযোগিতায়, আশ্রয়েপ্রশ্রয়ে এবং শাসকগোষ্ঠীর সেবক দালাল সমর্থক সহচর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহযাত্রী তৈরির গরজে একটি ধনিক-বণিক-শাহ-সামন্ত-চাকরিজীবী গড়ে তুলতেই হয়-গড়ে ওঠেই।

আমাদের দুস্থতার দরিদ্রতার অজ্ঞতার সুযোগে গণতান্ত্রিক সরকার বাস্তবে শাহ-সামন্তের মতো প্রভু, স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে, প্রতিনিধিরা গণসেবক থাকে না। আমাদের রাষ্ট্র এখন নির্বাচিত সরকারশাসিত বটে, কিন্তু বাস্তবে কার্যত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের শাস্ত্র প্রভাবিত অগণতান্ত্রিক শাসনই চালাচ্ছে। ফলে সংখ্যালঘুরা জিম্মি হিসেবে অসম্মানের লাঞ্ছিত জীবনই যাপন করে। তাদের নাগরিক সমাধিকার, বাঙালীত্ব এবং সেক্যুলারত্ব সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ধর্মকে সাংবিধানিক স্বীকৃত দিয়েই বিলুপ্ত করা হয়েছে। এখন সরকার এবং সরকারের বিদেশী হিতৈষী মুরুব্বীরা দেশের মানুষের আর্থিক অবস্থা উন্নত হয়েছে বলে প্রচার ও প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। হয়তো এর মধ্যে তথ্য ও সত্য আছে, কিন্তু এ অর্থসম্পদ অর্জন ও আয়ত্ত করেছে ধনিক-বণিক-চাকুরে ও ব্যবসায়ীরা। কিন্তু গাঁয়ের বর্গাচাষী, মাঝারি চাষী, ক্ষেতমজুর কিংবা শহুরে কুলি-মজুর-কল শ্রমিকরা, গার্মেন্টস কর্মীরাও আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছে কি-না জানা-শোনা-বোঝা যাচ্ছে না। অর্থাৎ আমজনতার মধ্যে পূর্ববৎ নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ, দরিদ্র ও ভিক্ষাজীবী রয়ে গেছে তো বটেই, কারো কারো হিসেবে ও মতে চার কোটির মতো মানুষ মানবেতর স্তরে বাস করে। অর্ধাহারে-অনাহারে মাঝে মধ্যে দিন কাটাতে হয় সব দিন কাজ পায় না বলে, বেকার থাকতে হয় বলে। ভিক্ষাজীবীই তো অনেক এবং তাদের পোষ্য সংখ্যাও হয়তো হবে কোটি খানেক। এদিকে জাতিসঙ্ঘের নামে মানবতার, মানবিকতার, মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়ে শিশুশ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করছে পরাশক্তি। ওই পরাশক্তির তাঁবেদার বা মুৎসুদ্দী সরকার বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থতহবিল এবং সেভেন গ্র্যান্ট থেকে দানে, অনুদানে, ঋণে ও ত্রাণে টিকে থাকে বলে ওদের আদেশ-নির্দেশ-পরামর্শ-হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলাকে গুরুত্ব না দিয়ে পারে না, তাই তাদের নির্দেশে তথাকথিত শিশুশ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করতেই হবে। এসব শিশুশ্রমিক নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র ঘরের সন্তান, অনেকেই অনাথ-অনাথা। গার্মেন্টস কারখানায় ওরা কর্মচ্যুত হলে গৃহভৃত্যের কাজ নেবে কিংবা কৃষিকাজে শ্রম বিক্রয় করবেই। অথবা টোকাই বা ছিঁচকে চোর হবে। মানবতাপ্রসূন এ নিষেধ বাঁচার গরজেই, পরিবারকে বাঁচানোর দায়েই লঙ্ঘন ও উপেক্ষা করবেই পদচ্যুত শিশুশ্রমিকরা। নইলে যে অনাহারে মরবে! এদিকটা কি দেশের সরকার ভেবে দেখছেন? এরা কি সরকারী ভাতা পাবে? এরা কি বিদ্যালয়ে পড়ার এবং খোরপোষের সুযোগ পাবে? সরকার কি সে-ব্যবস্থা করতে পারবে? তা হলে বিদেশী মুরুব্বীদের সরকার দেশের ও সমাজের বাস্তব সমস্যা বুঝিয়ে বলে না কেন? হুকুম মানার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে কি করে? দায়িত্ব কার বা কাদের এসব সমস্যা-সঙ্কটের কথা ভেবে দেখার? গণমানব কি কেবলই প্রাণী? এবং পরিণামে শহরে বন্দরে, ঝুপড়ি-খুপরিবাসী হবেই ছিন্নমূল হয়ে? শিশুশ্রম বন্ধ করতে পারে ধনী রাষ্ট্র কয়টি এবং কম্যুনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো। আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে নতুন ষড়যন্ত্র

শিক্ষায় ও চাকরিতে 'বৈষম্য প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিষদ' নামের এক পরিষদের এক দাবিনামা ও আবেদন আমাদের হাতে পেলাম সেদিন। তাতে যা যা আছে, তা পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এখানে অবিকল মুদ্রণের জন্যে উদ্ধৃত করলাম।

"আমরা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ সমূহের স্নাতক, স্নাতকোত্তর প্রথম পর্ব, স্নাতকোত্তর শেষ পর্ব, স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ ও এমফিল পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী। স্নাতকোত্তর শেষ পর্ব পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস করা সত্ত্বেও আমরা বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারসহ অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর সরকারী পদে নিয়োগের সুযোগ হতে বঞ্চিত। কিন্তু ১৯৮২ সনের পূর্ব পর্যন্ত পাস কোর্সের দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তরগণ উক্ত পদসমূহে নিয়োগের সুযোগ পেত। ১৯৮২ সালে পিএসপি'র এক কালাকানুনের মাধ্যমে পাসকোর্সের দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তরদের উক্ত পদসমূহে প্রতিযোগিতা করার অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। অথচ পাস ও অনার্স উভয় কোর্সের শিক্ষার্থীরা স্নাতক হতে স্নাতকোত্তর শেষ পর্ব পর্যন্ত একই সময়ে, একই পাঠক্রমে, একই বিষয়ে সমপরিমাণ নম্বরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

তাই আমরা বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারসহ প্রথম শ্রেণীর সকল সরকারী পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাস কোর্সের দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তরদের অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদানসহ ৪ দফা দাবির সমর্থনে এক অহিংস ও অরাজনৈতিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি।

আমাদের ন্যায় সঙ্গত ৪ দফা দাবিসমূহ:

১. বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারসহ প্রথম শ্রেণীর সকল সরকারী পদে পাস কোর্সের দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তরদের নিয়োগের সুযোগ দিতে হবে।

২. ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হতে মাস্টার্স প্রিলিমিনারী উচ্ছেদ ষড়যন্ত্র চিরতরে বন্ধ করতে হবে।

৩. সকল বিষয়ে শিক্ষা ক্যাডার চালু করতে হবে।

৪. শিক্ষিত বেকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ইতোপূর্বে আমাদের ৪ দফা দাবিসমূহ আদায়ের লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন সভা-সমাবেশ করেছি এমনকি কর্মসূচির অংশ হিসেবে ভিসি (ঢাঃ বিঃ), পিএসসি'র চেয়ারম্যান, শিক্ষামন্ত্রী, সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রীসহ সরকারী উচ্চ মহলে স্মারকলিপি দিয়েছি। এছাড়া আমাদের ন্যায্য নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছি।

অতএব, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রবক্তা হিসেবে আপনার/আপনাদের নিকট আরজ, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ (পাস কোর্সের) ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায্য অধিকার পুনরুদ্ধার এবং শিক্ষায় চাকরিতে বৈষম্যহীন নীতি চালুর দাবিতে আমরা যে অহিংস-অরাজনৈতিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি তাতে আপনি/আপনারা সমর্থন ও সহযোগিতা করবেন বলে আশা করি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ব কথা

মধ্যযুগে তথা তুর্কী-মুঘল যুগে এবং ইংরেজ আমলে আমজনতার মধ্যে শিক্ষার তেমন প্রসার ছিল না। মধ্য যুগে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বাবধি ইংরেজ আমলেও অফিস-আদালতের তেমন বিস্তার ছিল না। গ্রামীণ জীবনে জনগণ ঘরানা পেশায় জীবিকা অর্জন করত এবং তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি ছিল ন্যূনতম চাহিদার। লোক থাকত খালি গায়ে ও খালি পায়ে। ঘর হত আঞ্চলিকভাবে প্রাপ্ত উপাদানে। নাড়ার, পাটখড়ির, নলখাগড়ার, বাঁশের, শনের, মাটির এবং পরবর্তীকালে কৃচিৎ য়ুরোপ থেকে আমদানি-করা টিনের। কাজেই ভাতই ছিল নিত্যদিনের অপরিহার্য চাহিদা। নগ্ন গা-পা দিয়েই মানুষ জীবন কাটাত। পার্বণিক পোশাক লাগত বিয়েতে বরযাত্রীর, শ্রাদ্ধে চাচর ব্রাহ্মণের খালি গা-পা অক্ষুণ্ন থাকত, জেয়াফতে মুসলিমদের একটা অঙ্গরাখা বা কামিজ দরকার হত। হিন্দুর মির্জাই বা চাদর হলেই চলত। গ্রামীণ পরিবেশ ছিল এমনিই শূন্য বা স্বল্প চাহিদার। আমজনতার সোনায়-রূপায় অধিকারই ছিল না স্বীকৃত। বলা বাহুল্য দেশী মানুষের মধ্যে বর্ণ হিন্দুরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও সৎশূদ্ররা আর মুসলিমদের মধ্যে কাজী-খোন্দকার-মোল্লা-মৌলবী আর ফারসী জানা মুনশী নামের উকিল ও চাকুরেরাই ছিল এ কালীন তাৎপর্যে ভদ্রলোক। আর সব ছিল অবজ্ঞেয় ছোট ও সমাজ বহির্ভূত স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য জনমানব। এভাবে দেশজ অর্থাৎ হিন্দু-বৌদ্ধ থেকে দীক্ষিত মুসলিমদের মধ্যেও ছিল এক প্রকারের বর্ণে বা খান্দানে বিন্যস্ত ও বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন শ্রদ্ধেয় ও অবজ্ঞেয় অপাঙক্তেয় সমাজ। এভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত সমাজ বিন্যস্ত ও বিচ্ছিন্ন ছিল। যুদ্ধকালীন বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক প্রভাব যখন গাঁয়ে গঞ্জে শহরে বন্দরে ছড়িয়ে পড়ল এবং জীবনযাত্রায় ও জীবিকাক্ষেত্রে এল পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য, তখন তথাকথিত ছোটলোক অস্পৃশ্য-স্পৃশ্য পেশাজীবীদেরও কর্মক্ষেত্র আর ঘরানা পেশায় নিবদ্ধ রইল না। এর আগে ইংরেজি শিক্ষিত চাকুরেদের মধেও ছুঁৎমার্গ চালু ছিল। সমাজ বাহ্যত কর্মক্ষেত্রে ভেঙে একাকার হয়ে গেল। আমাদের সমাজ বিবর্তনের ধারায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং রাজনীতি ক্ষেত্রেও এর প্রভাব অসামান্য, যা স্বাধীনতা দান বা প্রাপ্তি আবশ্যিক ও জরুরি করে তুলেছিল। আর একটি কথা সেকালে চিকিৎসাবিজ্ঞানের এত দ্রুত উন্নতি হয়নি। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হত শম্বুক গতিতে। ঝড়-ঝঞ্ঝা-বন্যা-খরা আর কলেরা-বসন্ত-ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর-প্লীহা-যক্ষ্মা-সন্নিপাত প্রভৃতি হত মহামারীর আকারে গণমৃত্যুর, সবংশ বিনাশের কারণ। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেত না। মোটামুটিভাবে ১৯৫৫ সালের পর থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভাবিত উন্নতির ও উৎকর্ষের ফলে মৃত্যুর দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। শিশু-প্রসূতিমৃত্যু প্রতিরোধ ব্যবস্থা, কলেরা-বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর বিলুপ্তি, যক্ষ্মা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, হৃদরোগ, সন্নিপাত প্রভৃতির চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ নিতান্ত সহজ ও সাধারণ ঘটনা। ফলে জন্যসংখ্যা বাড়ছে জ্যামিতিক নিয়মে, শিক্ষার প্রসারও ঘটছে অতি দ্রুত ও শিক্ষিতের সংখ্যাও হচ্ছে বিপুল। আর সে-সঙ্গে বিজ্ঞানের বদৌলত নানা ভোগ্য ও বিলাস সামগ্রী, প্রযুক্তি-প্রকৌশল, যন্ত্র-যানবাহন, তার-বেতার আমজনতার জীবনে স্বপ্ন ও সাধ বৃদ্ধি করেছে, মানুষ ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ-আরাম আনতে উৎসাহী। এর ফলে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে মানুষ এখন গৃহবদ্ধ থাকতে ও ঘরানা পেশায় জীবনযাপনে রাজি নয়, জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে চায়। এ জন্যে এখন প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র ও তীক্ষ্ণ এবং উচ্চাশী মানুষ এখন স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার জন্যে সংগ্রামে অবতীর্ণ। আগের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা, নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি, ভয়-ভক্তি-ভরসা সব পরিহার করে মর্ত্যজীবনের গুরুত্ব ও সুখ-সুবিধে কিংবা বঞ্চনা-প্রতারণা অনুভব-উপলব্ধি করে আপন প্রাপ্য অধিকার আদায় করার জন্যে বুকের লাল রুধির দানে প্রস্তুত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপূর্ব ব্রিটিশভারতে চাকরি-চাকুরে তথা আমলা বেশি ছিল না। দফতর ও চাকরি বাড়ল যুদ্ধকালে এবং বাড়তেই রয়েছে আজ অবধি সভ্যতা-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান-বাণিজ্য বৃদ্ধির এবং সেগুলোর দ্রুত উৎকর্ষের ফলে। জীবনসচেতন মানুষের ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ এখন স্থূল সামগ্রীতে সীমিত নয়। এখন ফোন-ফ্যান-ফ্রিজ-এ.সি, রেডিও, টিভি, ভিসিআর, ডিস অ্যান্টেনা, ফ্যাক্সমেশিন, স্টোভ, কম্প্যুটার, ফোম-স্প্রিঙের খাট, সোফা প্রভৃতি আসবাব ও তৈজস আবশ্যিক সামগ্রী। নানাপ্রকার কোল্ডড্রিঙ্ক এখন প্রায় সার্বক্ষণিক ভোগ্য-উপভোগ্য। মাছে-মাংসে-ডালে সীমিত নয় খাদ্যও।

এখনকার কথা

ব্রিটিশ আমলে লোকে লেখাপড়া করত বিশেষ করে ইংরেজি বিদ্যালয়ে চাকরি পাবার লক্ষ্যে। স্বাধীন হবার পরেও আমাদের সে-আশা ও লক্ষ্য রয়ে গেছে। যেই লেখাপড়া করে সেই চাকরি খোঁজে। সে অনন্যোপায়ও বটে, সে গরীব, পুঁজি নেই, ব্যবসায় বাণিজ্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। দেশে কলকারখানার প্রত্যাশিত মাত্রার বিকাশ-প্রসার-প্রতিষ্ঠা হল না আটচল্লিশ বছরেও। অথচ শিক্ষিতের হার প্রতি বছর বেড়েই চলেছে। ফলে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে আশঙ্কাজনকভাবে। আশ্চর্য আমাদের ভুঁইফোঁড় উঠতি লুম্পেন বুর্জোয়ারা মূলত গৃহস্থ সন্তান হলেও শুনে শুনে বাদশাহর জাত হিসেবে মনোভাবে শাহ-সামন্ত মনোভাবই বেশি পোষণ করে। ফলে নিজেদের অজ্ঞাতেই কিংবা অবচেতন প্রেরণাতেই আমজনতাকে পাকিস্তান আমল থেকেই বিভ্রান্ত করতে থাকে। তখন বলেছে দেশ এখন স্বাধীন– গোলাম নয়, রাষ্ট্র ভাষা এখন উর্দু এবং পরে বাঙলাও। কাজেই ইংরেজির আদর-কদর কমাও। সে-সময়েই পূর্বেকার সপ্তম শ্রেণীর মানের কবিতা-গল্প-নিবন্ধ পড়ানো শুরু হল ইংরেজি ভাষা সাহিত্যের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য সংকলিত গ্রন্থ থেকে। ক্ষতি হল গাঁ-গঞ্জের আমজনতার সন্তানদেরই। কারণ শাসক-প্রশাসক-রাজনীতিক-ব্যবসায়ী প্রভৃতি শহুরে ধনিক-বণিক সাংসদ মন্ত্রী সেনানী আমলা শাসক প্রভৃতি নিজেদের সন্তানদের প্রকাশ্যে ক্যাডেট স্কুল-কলেজ মাধ্যমে এবং গোপনে ঘরে সন্তানদের ইংরেজি পড়িয়ে 'এ' এবং 'ও' লেভেল পরীক্ষা পাস করিয়ে আমজনতার সন্তানদের চেয়ে নিজেদের সন্তানদের যোগ্যতর ও বিদ্যাবত্তায় শ্রেষ্ঠতম করে তুলতে থাকে।

অন্যদিকে সরকারী-বেসরকারী বিদ্যালয়ে ইংরেজি রাখা হল হল বটে, কিন্তু গুরুত্ব নেই বলে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে শিক্ষার্থীদের ও শিক্ষকদের ইংরেজি শেখায় ও শেখানোতে অবহেলাপরায়ণ করে তুলল এবং ব্রিটিশ আমলে বার্ষিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণদের পরবর্তী উচ্চ শ্রেণীতে পড়তে দেয়া হত না। স্বাধীনতা আমলে ওই লুম্পেন বুর্জোয়ারা সবাইকেই যাচাই-বাছাই-ঝাড়াই না করেই দশম শ্রেণী অবধি অবাধে তথাকথিত পড়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকার দেয়ার ব্যবস্থা করল। এবং নবম-দশম শ্রেণীর এরূপ অশিক্ষিত সাক্ষর শিক্ষার্থীদের কোচিং ক্লাস করে শিক্ষকরা বেশ কিছু রোজগার করেন। উল্লেখ্য যে নকলের উদ্ভব-বিকাশ-প্রসার ঘটে ও জনসমর্থন মেলে এভাবেই। এর সঙ্গে একটা সরকারী নীতিও ছিল যুক্ত। স্কুলে-কলেজে উন্নয়নের জন্যে সরকার অর্থ মঞ্জুর করতে থাকে এবং কিছু শর্তও আরোপ করে। ফল ভালো হওয়া চাই। শিক্ষার্থীদের ফল ভালো করানোর জন্যে স্কুলে-কলেজে শিক্ষকরা এবং তাদের প্রভাবে অভিভাবকরা সবাই শিক্ষার্থীদের নকলে পাসের হার বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় নামে দেশের সর্বত্র। কয়েক বছর আগে অবধি কিছু স্কুল ও কলেজ এজন্যে দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিল এবং পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষাকেন্দ্র বদলের অনুমতি নিয়ে সেসব স্কুলে-কলেজেই ভিড় করত। এখনো তা একেবারে বন্ধ হয়নি– কমেছে হয়তো। এভাবে গাঁ-গঞ্জের অজ্ঞ অনক্ষর এবং সাক্ষর দুস্থ-দরিদ্র আমজনতার সন্তানদের যেরূপে লিখতে ও পড়তে শিখিয়ে অশিক্ষিত অবিদ্বান রাখা হল, তাতে তাদের কোথাও লেখাপড়ার চাকরি জোটেনি। এরূপ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক তৃতীয় বিভাগে বা নকলে দ্বিতীয় বিভাগে পাস তথাকথিত শিক্ষিতরা চতুর্থ শ্রেণীর চাকুরে হতে বাধ্য হল। বঞ্চিত রইল করণিক বা কেরানীর চাকরি থেকে। অথচ আমরা জানি সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে পড়েও ব্রিটিশ আমলে প্রবেশিকা পরীক্ষা না দিয়ে বা পরীক্ষায় ফেল করেও অফিসে আদালতে কেরানী হত। তেমন লোক ১৯৫০-৬০ সালেও অফিসে করণিক ছিলেন।

অতএব রাজনীতিকরা, সাংসদরা, শাসক-প্রশাসকরা, শিক্ষানিয়ন্ত্রকরা, বুদ্ধিজীবীরা প্রথমেই এভাবে ইংরেজির গুরুত্বচেতনা হরণ করে, নকলে উৎসাহ দিয়ে, অটো-প্রমোশনের ব্যবস্থা করে নিম্নবর্গের, নিম্নবিত্তের ও অজ্ঞ-অনক্ষর নিম্নবর্ণের কোটি কোটি পরিবারের ক্ষতি করলেন। নিজেদের সন্তানদের দেশে-বিদেশে বিশেষ যত্নে ও ব্যবস্থায় শিক্ষা দিয়ে ডাক্তার প্রকৌশলী উকিল ব্যারিস্টার আমলা সেনানী ব্যবসায়ী সাংসদ করে দেশের অর্থসম্পদের, মান-যশ-খ্যাতির, প্রভাব-প্রতিপত্তির, দর্পদাপটের, ভোগের উপভোগের সম্ভোগের একচেটে অধিকার রক্ষায় সচেতনভাবে প্রয়াসী রয়েছেন। তাই ঢাকায় এসব শ্রেণীর লোকের সন্তানদের জন্যে রয়েছে ব্যয়বহুল অনেক ইংরেজি মাধ্যমে পাঠ দানের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল। এসব শ্রেণীর লোকেরা সন্তানদের ভারতে-যুক্তরাজ্যে-যুক্তরাষ্ট্রে-অস্ট্রেলিয়ায় এবং য়ুরোপের অন্যত্র পাঠায় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে। এদের সন্তানদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কেবল চাকরির কিংবা ওকালতির, ডাক্তারির ক্ষেত্রে নয়, ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রেও সম্ভব নয় আমজনতার তথাকথিত শিক্ষিত স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাস সাধারণ ঘরের সন্তানদের। এভাবে শ্রেণীস্বার্থে আমাদের শহুরে শক্তিমানেরা জনগণের সন্তানদের 'বাঙালী' করে রাখতে 'বাঙালী' থাকতে সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র জাল পেতেছে দেশময়, যাতে ওরা তাদের সন্তানদের প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ হয়ে না ওঠে।

সাধারণত একটা রাষ্ট্রে জাত-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-অঞ্চল নির্বিশেষে নাগরিকদের জন্যে একটা সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি থাকে। এবং সে-শিক্ষানীতির লক্ষ্য হয় স্ব-কালের দেশ-জাতি-মানুষের তথা নাগরিকের সমকালীন জীবন-জীবিকার চাহিদা অনুগ আধুনিকতম বা সমকালীন বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক জীবনযাপন পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ এখন জীবন বলতে গেলে বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির প্রভাবে ও প্রসাদে দেশে ও দুনিয়ায় অভিন্ন। ঘরের সন্তান ঘর ছেড়ে বিদেশে ঘর বাঁধছে, বাঁধতে বাধ্য হচ্ছে কালের ও জীবন-জীবিকার দাবি মেটানোর প্রেরণায়। এ অবস্থায় আধুনিক চিন্তা-চেতনা প্রয়োগে উপযোগ ও প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা নাগরিক মাত্রেরই জন্যে গ্রহণ ও চালু করা আবশ্যিক ও জরুরি। কিন্তু আগেই বলেছি, উচ্চ ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ বিরুদ্ধ বলে তা আমাদের দেশে আজো সম্ভব হল না। অজ্ঞ-অনক্ষর গৃহস্থের সন্তানদের মাদ্রাসা শিক্ষার, সাধারণ নিম্নবিত্তের নিঃস্বদের দুস্থ-দরিদ্রের সন্তানদের জন্যে বাঙলা মাধ্যমে নির্লক্ষ্য শিক্ষার এবং শহুরে শাসক-প্রশাসক-সাংসদ-মন্ত্রীর এবং ব্যবসায়ীর ও নানা পেশার বুদ্ধিজীবীর ও আমলার সন্তানদের ক্যামব্রীজী পদ্ধতিতে শিক্ষায় উৎসাহিত করছে সরকার। এ ক্ষেত্রে সরকার মতলব গোপন রেখে নিরপেক্ষতার ও উদার ঔদাসীন্যের ভান করছে। মাদ্রাসায় ইদানীং দুই মেরুর অস্বাভাবিক ও অসম্ভব সংযোগ ও সমন্বয় প্রয়াস চলছে। মাদ্রাসায় শাস্ত্র শিক্ষার সঙ্গে পার্থিব ও য়ুরোপীয় আধুনিক বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও সামাজিক বিজ্ঞান পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। একে সোনার পাথর বাটি তৈরির প্রয়াস-প্রযত্নের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এভাবে চলতে থাকলে পরিণামে মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল দুটো শ্রেণী অচিরে প্রবল হয়ে জীবন-জীবিকার নয় কেবল, রাজনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান বাণিজ্য প্রভৃতির সর্বক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত বাধাবে, যা পরিণামে গৃহযুদ্ধের রূপ নেবে এবং এর পরিণতি পৃথিবীর নানা রাষ্ট্রে কি মারাত্মক ও জানে-মালে বৈনাশিক হয়ে দেখা দিয়েছে ও দিচ্ছে, ঠেকে ও ঠকে না শিখে তা দেখেই আমাদের সাবধান ও সতর্ক হওয়া আবশ্যিক ও জরুরি।

AMARBOI.COM

সরকার অকারণে হয়তো অসচেতনতার দরুনই আর একটা বিধ্বংসী শ্রেণী সংগ্রামের উস্কানি দিচ্ছে। সেটি এই: আমাদের শিক্ষানীতিও জ্ঞান-বিজ্ঞান-বাণিজ্য প্রতীচ্য বিদ্যার মতো য়ুরোপীয় নীতি-নিয়মের রীতি-রেওয়াজের প্রথা-পদ্ধতির আদলে কিন্তু ক্রটিবহুল হয়ে তৈরি হয়। আমরা জানি স্নাতক হচ্ছে স্ট্যাডার্ড বিদ্যা। এ বিদ্যা দিয়েই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্যান্য সব লেখাপড়ার ও বিদ্যার কাজ চলে। ব্রিটিশ আমলে ২০/২১ বছরেই আইসিএস প্রভৃতি পরীক্ষা দিতে হত বলে অনেক আইসিএস, আইপিএস প্রভৃতি কেবল বিএ, বিএসসি পাসই দিলেন এবং অনেকেরই অনার্স ছিল না। গ্র্যাজুয়েশন বা স্নাতক পাস যে-কোনো ব্যক্তি যে-কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দানের যোগ্য ছিলেন এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে যে-কোনো পদে নিয়োগ পেতেন। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে আভিজাত্যটাও বিবেচিত হত সেই শাহ-সামন্ত এবং উপনিবেশিকতার ও সাম্রাজ্যবাদের যুগে।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কেবল গ্রন্থপাঠজাত বিদ্যা বিতরণের আলয় নয়, নতুন দৃষ্টির, নতুন চিন্তা-চেতনার ও নতুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রসূন নতুন বিদ্যা সৃষ্টিরও আগার। সেজন্যে সেখানে গভীর ও ব্যাপক জ্ঞানের ও গবেষণাশক্তির প্রয়োজন। অনার্স এমএ, এমএসসি এমএসএস এবং ডক্টরেট প্রভৃতি সেখানে বিদ্বান তৈরির জন্যে দরকার।

তাই বলে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বোর্ডের মতো 'স্নাতক' পরীক্ষা গ্রহণের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় নামে বোর্ড গঠনের প্রয়োজন ছিল কি? তার নাম বোর্ড না রেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিদ্যালয় রাখার যৌক্তিকতাই বা কি? উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিও প্রতীচ্য আদলে প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাখা নাম। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চার বছরী অনার্স কিংবা অনার্স পাস শিক্ষার্থীদের জন্যে দু'বছরী স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করার বিষয় বিবেচনা করছেন বলে পত্র-পত্রিকা মাধ্যমে প্রচার করেছেন। এত বিদ্যা কোন প্রয়োজনে কাদের জন্যে? সবাই কি কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও গবেষক হবে?

আজকাল ঘরের বাইরে পাঠিয়ে একটা সন্তানকে স্কুলে-কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর ন্যূনতম ব্যয় অন্তত হাজার/বারোশ' টাকা। গরীব চাষী গৃহস্থ কিংবা করণিক ও স্কুল শিক্ষক শ্রেণীর নিম্নবেতনের শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে ঘরের বাইরে শহরে-বন্দরে স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্তান পাঠানো সম্ভব কি? তাঁদের আর্থিক সামর্থ্য আছে কি? এমকি মধ্যবিত্ত পরিবারেরও একাধিক সন্তানকে একই সময়ে শহরে-বন্দরে পাঠিয়ে শিক্ষিত করার স্বপ্ন ও সাধ পূরণের আর্থিক সামর্থ্য আছে কি? এ অবস্থায় উপাচার্য কাদের স্বার্থে এ ব্যবস্থা চালু করার কথা ভবছেন?

অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীতে পাস তরুণ-তরুণীরা পি-টিতে ভর্তি হওয়ার অধিকার হারিয়েছে। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার অযোগ্য হয়ে তারা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হতে বাধ্য হয়।

এখন নয়, ১৯৮২ সন থেকেই অনার্স না-পড়া স্নাতকোত্তরদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় নিজেদের জ্ঞানের ও যোগ্যতার পরিচয় দেয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আর সাধারণ 'স্নাতক' তো শিক্ষিত বলে স্বীকৃতই নয়, অথচ এককালে গান্ধী-জিন্নাহরা প্রবেশিকা পাস করেই ব্যারিস্টার হতেন, আর অধিকাংশ ডেপুটি-মুন্সেফরা তো ছিলেন মাত্র স্নাতক। আজো হাইকোর্ট-সুপ্রীম কোর্টের অনেক বিচারপতি ও অসংখ্য প্রখ্যাত অ্যাডভোকেট তো বিএ-বিএসসি-বিকম-বিএল মাত্র। আমাদের মতে যে-কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস স্নাতক মাত্রকেই যে-কোনো উচ্চপদের জন্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে স্ব স্ব জ্ঞানের ও যোগ্যতার পরিচয় দেয়ার নাগরিক অধিকারে স্বীকৃতি দেয়া সরকারেরই নৈতিক দায়িত্ব। আগেই বলেছি 'গ্রাজুয়েশনই স্ট্যান্ডার্ড' বিদ্বানের যোগ্যতা বলে স্বীকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর স্নাতকোত্তর বিদ্যা তো অফিসে-আদালতে সর্বত্র প্রয়োজনাতিরিক্ত বিদ্যাই। সন্তানদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের সুযোগের, সুবিধের ও আর্থিক সামর্থ্যের পার্থক্য অস্বীকার করে সমাজের কোটিতে নয় লাখ নিরানব্বই হাজার নয়শ' জনকে নাগরিকের জন্মগত অধিকার থেকে সুকৌশলে বঞ্চিত রেখে উচ্চবিত্তের ও বিদ্যার লোকদের দেশের অর্থসম্পদে ও রাজনীতিক-প্রাশাসনিক ক্ষমতায় কায়েমী অধিকার আয়ত্তে রাখার এ ষড়যন্ত্র দ্রুত বর্ধিষ্ণু সাক্ষর ও শিক্ষিত আমজনতা সহ্য করবে না, বঞ্চনার ক্ষোভ-ক্রোধ ও দারিদ্র্য আর বেকারত্ব তাদের যথাসময়ে এবং শিগগির দ্রোহী করে তুলবে– এখনই দেশব্যাপী বেকার শিক্ষিত যুবকরা মস্তান-গুণ্ডা-খুনী-চাঁদাবাদ ও রাহাজান হয়ে উঠেছে। দেশপ্রেমী ও জনসেবী বুদ্ধিজীবীদের গুরুত্ব সহকারে এক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করার আবেদন জানিয়ে আমাদের কথা শেষ করছি। রাষ্ট্রে সবার জন্যে অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা এবং গ্রাজুয়েশনকে বাঞ্ছিত মানের ও প্রয়োজনের বিদ্যা বলে স্বীকার করা দেশের গণমানবের ও আমজনতার স্বার্থেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকারের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। শ্রেণী স্বার্থে সর্বক্ষেত্রে দেশের নিয়ন্ত্রকরা লাভে-লোভে-স্বার্থে, ভয়ে-ভক্তিতে-ভরসায়, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে অযৌক্তিক ও অবৌদ্ধিক কিছু করলে পরিণাম হবে ভয়াবহ। কেননা যুগ পালটে যাচ্ছে।

তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র রাষ্ট্রে রাজনীতি

এক আড্ডায় অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন উঁচুপদের আমলার কাছে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম। জিজ্ঞাসাটা ছিল এরূপ: আপনার যোগ্যতম সন্তানটি যখন চাকরি, উৎপাদিত ও নির্মিতপণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং রাজনীতি এ তিন পেশার যে-কোনটি আপনার অভিপ্রায়, পরামর্শ ও নির্দেশ অনুসারে গ্রহণ করতে রাজি, আপনি তাকে কোনটি গ্রহণ করতে বলবেন? সবাই একই উত্তর দিলেন, উত্তরটি হল চাকরি করাই শ্রেয়। কেননা চাকরিটি নির্ঝঞ্ঝাট, যদিও উপরওয়ালার নির্দেশে তাকে প্রায়ই বিবেক-বিরোধী কাজ করতে হয়।

আর পণ্যে ভেজাল মেশানো, চোরাকারবারি, দুর্নীতি ও অসততা প্রভৃতি শিল্প কারখানায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে সওদাগরের নিত্যকার ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের সঙ্গী। ব্যতিক্রম এক্ষেত্রে আলোচ্য নয়। বেসাত অর্থ-বিত্ত অর্জনে ও বৃদ্ধিসাধনে প্রলুব্ধ করে। এর ফলে ব্যবসায় ঝামেলা অনেক। ধূর্ততায় পাকা এবং স্নায়ুশক্তিতে প্রবল না হলে ব্যবসা-বাণিজ্য করা সহজ হয় না। লোকে বলে ব্যবসার জগৎ নাকি দু'নম্বরী লোকের কালো জগৎ। আর তৃতীয় বিশ্বে কারা কোনো অযোগ্যতার, অদক্ষতার কিংবা কোনো মহৎ ও ব্যক্তিগত স্বার্থে বারোমেসে রাজনীতি করেন, তা বোঝা যায় না, কারণ এদের মধ্যে মান, যশ, খ্যাতি, ক্ষমতা, অর্থসম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দর্প-দাপট অর্জনের, বৃদ্ধির ও প্রদর্শনের এক প্রচণ্ড আগ্রহ দেখা যায়। এঁদের অধিকাংশই লুম্পেন বুর্জোয়া প্রকাশ্যে কোনো প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াই যেন এঁরা রাজনীতি করে বেড়ান। অর্থাৎ জনগণের স্বার্থে তাদের স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ করার ও রাখার সংগ্রামে এঁরা সদাব্যস্ত থাকেন, তবু যথাসময়ে এঁরা সংসার পাতেন, গাড়ি-বাড়ির মালিক হন শহরে। তবে এঁদের সংখ্যা বেশি নয়। তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতির ফায়দা লোটেন ধনিক-বণিক এবং অবসরপ্রাপ্ত সামরিক চাকুরেরা। এঁরাই সাংসদ-মন্ত্রী হন আকৈশোর বা আযৌবন রাজনীতিক কর্মী হিসেবে কোনো ভূমিকা বা অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও। তৃতীয় বিশ্বেই সামরিক বাহিনী নিজেদের সরকারী চাকুরে ভাবেন না, তাঁরা নিজেদের রাষ্ট্রের ও সরকারের অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক বলেই জানেন। তাই ঘন ঘন নজরদারির, খবরদারির, তদারকির অছিলায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজেদের হাতে নেন। তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সর্বত্র জঙ্গী নায়করাই এক তথাকথিত কৃত্রিম গণতন্ত্র নামের শাসনপদ্ধতি চালু করে রাজত্ব করেন। এঁদের কেউ কেউ দীর্ঘতম কাল ধরে, কেউ কেউ স্বল্পকালের জন্যে রাষ্ট্রক্ষমতা ভোগ-উপভোগ করেন। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে জান-মাল-গর্দান হারানোর অনিশ্চিতি ও অস্বস্তি থাকে সার্বক্ষণিক।

কম্যুনিস্ট বা বামপন্থী নামের আর একদল, দেশপ্রেমী ও মানবসেবী রাজনীতিক কর্মী থাকেন, সোভিয়েত রাশিয়ার বিলুপ্তির পরে তাঁদের মত-পথ-মন-মনন বিভিন্ন বাঁকে ঘুরপাক খাচ্ছে। অনেকে দলছুট হয়ে তওবা করে স্বধর্মে ফিরে গেছেন এবং বুর্জোয়াদের ক্ষমতার রাজনীতিক দলে ভিড়েও গেছেন। কেউ কেউ মার্কসবাদে আজো দৃঢ় আস্থা রাখেন। সমাজ পরিবর্তন যে আবশ্যিক ও জরুরি তা তাঁরা মনে-প্রাণে বুঝে স্বীকার করেন। বিপ্লবই যে একমাত্র পন্থা তাও তাঁরা জানেন, বোঝেন ও মানেন। গোড়ার দিকে সোভিয়েত বিপ্লবের সাফল্য দেখে আমাদের ব্রিটিশ বাঙলার এম এন রায়, মুজাফফর আহমদ প্রমুখ মার্কসবাদের মাহাত্ম্য-মহিমা-প্রয়োজনীয়তা জানানো-বোঝানো ও মানানোর জন্যে প্রয়াসী হন। এম এন রায় সুদূর চীন অবধি বিদেশে এবং মুজাফফর আহমদ, দাঙ্গে প্রভৃতি স্বদেশে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু প্রায় সত্তর বছর আগে শুরু হলেও, নজরুল ইসলাম থেকে সুকান্ত-সুভাষ-বিষ্ণু দে হয়ে আজকের এ মুহূর্তেও অসংখ্যক কবি এবং গোপাল হালদার-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে বহু বহু গল্প উপন্যাস লেখক আর কম্যুনিস্ট প্রাবন্ধিক শত চেষ্টা করেও শোষিত-বঞ্চিত-পীড়িত-প্রতারিত নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র অজ্ঞ-অনক্ষর-স্বাক্ষর শিক্ষিত আমজনতাকে তাঁদের মতে দীক্ষিত করার কাজে এবং তাঁদের পথে চলার প্রেরণা দানে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে যে আমজনতাকে শোষণমুক্ত করে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ করার জন্যে জীবনপণ সংগ্রাম করে চলেছেন কিছু বামপন্থী, সে-আমজনতাই কম্যুনিস্টদের এড়িয়ে চলে—ওরা তাঁদের কথায় ভরসা পায় না, বরং তাঁদের ভয়ই করে। কাজেই বুঝতে হবে এ প্রয়াসের কোথাও কোনো একটি ত্রুটি রয়েছে। প্রায়স-প্রযত্ন নতুন কোনো ফলপ্রসূ পন্থায় চালিত করতে হবে।

বর্গাচাষী-মজুর-মিল শ্রমিক আপাত লাভে-লোভে কম্যুনিস্ট কর্মীর অনুগত হয়ে বেতন বাড়ানোর বা অন্য কোনো সুবিধে আদায়ের জন্যে মাঝে মাঝে আন্দোলন করে বটে কিন্তু মার্কসবাদে আস্থাবান হয়ে কম্যুনিস্ট দলভুক্ত হয় না সংগ্রামের সংকল্প নিয়ে।

আজ তৃতীয় বিশ্বের আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার সর্বত্র বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক নীতি হিসেবে আর্থ-বাণিজ্যিক-মহাজনী সাম্রাজ্যবাদী ধনী রাষ্ট্রগুলো তাদের পণ্যের বাজারে সুনিশ্চিত রাখার লক্ষ্যে ঋণে-দানে-অনুদানে-ত্রাণে কৃতজ্ঞ করে মুক্তবাজার অর্থনীতি নামের আড়ালে নতুন পুঁজিবাদী শোষণনীতি প্রয়োগে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোকে শোষণের স্থায়ী ব্যবস্থা করছে। গ্যাট প্রভৃতি নানা নামের আঞ্চলিক সংস্থা ছাড়াও দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোতে তথাকথিত সেবক ও সাহায্য সংস্থা নামের ‘এনজিও’ দিয়ে দরিদ্র দেশগুলো আকীর্ণ করে তোলা হয়েছে। এরা দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোকে স্বনির্ভর-স্বয়ম্ভর হয়ে উঠতেও দেবে না, আবার দরিদ্র রাষ্ট্রের নিঃস্বদের অনাহারে মরতেও দেবে না। এ হচ্ছে এক ‘দিল্লি কা লাড্ডু’ যে গেলে সে-ও পস্তায়, যে পায় না সেও পস্তায়। একে ছাড়তে গেলে মরার আশঙ্কা জাগে, একে রাখতে গেলে স্বাধীনতায় সার্বভৌমত্বে হামলার ঘা লাগে। খাতককে মহাজনের হুকুম-হুমকি, ধমক-ধমকি শুনতেই নয় মনিবের গৃহভৃত্যের মতো। কৃচ্ছ্রসাধনায় রাজি না থাকলে দরিদ্র রাষ্ট্রের স্বনির্ভর হওয়ার অন্য কোনো উপায় থাকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতএব তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম রাষ্ট্র বাঙলাদেশেও রাজনীতি বিদেশীর বুদ্ধি-পরামর্শ-সালিশ-সাহায্য-নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব তথা নজরদারি, খবরদারি ও তদারকি ছাড়া যেন অচল হয়ে পড়ছে। এতে আত্মসম্মানের কথা ভাবা নিরর্থক; কেননা দেশের অভ্যন্তরে আমজনতা সেবা-সাহায্য পাচ্ছে এনজিও থেকে। ওরাই যেন সেবা-সাহায্যের ইজারাদারি পেয়েছে সেই আঠারো শতকের সাত দশকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী প্রাপ্তির মতোই। তাই বোধ হয় বিশ্বব্যাঙ্কের বাঙলাদেশ মিশনের প্রধান পিয়েরে ল্যান্ডেন মিলস্ নাকি বলেছেন, বাঙলাদেশের উন্নয়নের জন্যে 'এনজিও'র কাজের তথা সেবার এলাকা আরো বাড়াতে হবে এবং 'এনজিও'র জবাবদিহিতা থাকবে অর্থের জোগানদাতা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে। এদেশের সরকারের কাছে 'এনজিও'র জবাবদিহিতার কোনো প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ এনজিও স্বাধীনভাবেই কাজ করবে। (ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ১৯৯৫ সনের ছয়ই জুন সংখ্যা, অনুবাদ নয় মূলকথার উল্লেখ মাত্র।) অতএব, মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে এ সূত্রে উল্লেখ্য যে আর্থ-বাণিজ্যিক-মহাজনী সাম্রাজ্যবাদীদের তথা পুঁজিবাদীদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্যেই, পতন রোধ করার গরজেই ওরাই কায়রোতে, কোপেনহেগেনে ও বেইজিঙে সমাজের নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি বদলানোর ও গণমানবের অভ্যুত্থানবোধ কল্পে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য ঘোচানোর উপায় উদ্ভাবনে সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। কাজেই পুঁজিবাদীরা আজ বাহ্য আস্ফালন বা ঠাট বজায় রেখেছে বটে, কিন্তু মনে জ্ঞানে বিপ্লব-বিবর্তন আসন্ন। কারণ একালে মানুষের চোখ-কান খোলা। মন-মনন শত্রু-মিত্র সম্বন্ধে সচেতন।

AMARBOI.COM

বর্বরতা নেই কোথায়? তবু

সভ্যতা-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্বের বড়াই করার অধিকার কি সত্যিই মানুষের আছে? বর্বরতা কোথায় নেই? কোন রাষ্ট্রে নেই? সভ্য-অসভ্য নির্বিশেষে ক্ষোভে-ক্রোধে-রিরংসায় হিংস্র হয়ে ওঠে ব্যক্তিগতভাবে নয় শুধু, সরকারীভাবে, সামরিকভাবে এবং রাষ্ট্রিকভাবেও। আধাবর্বরের রুয়েন্ডা-বুরুন্ডি রাষ্ট্রে লাখে লাখে নরহত্যা চলে, তেমনি সভ্যভব্য সার্বরা হত্যা করে হাজারে হাজারে বিধর্মী, বিতাড়িত করে ভিন্নগোত্রের বা ভিন্নমতের ও ধর্মের লাখ লাখ মানুষকে, উৎখাত করে বাস্তু থেকে, দহনে-হননে-লুণ্ঠনে সভ্য-অসভ্য কারো মধ্যে কোনো সংযম, সহিষ্ণুতা ও সৌজন্য লক্ষ করা যায় না। ক্রোয়াটরা বিতাড়িত করছে সার্বদের, সার্বরা বিতাড়িত করছে বিধর্মী জাতিদের, কেড়ে নিচ্ছে তাদের অর্থ-সম্পদ এবং প্রাণ। যথাসময়ে যথাস্থানে যথাপ্রয়োজনে যথাপাত্রকে দহনে-হননে-লুণ্ঠনে-বিতাড়নে কেউ কোথাও বিরত থাকে না। কোনো মহাদেশেই কেউ আজ অবধি যথাশাস্ত্র যথানীতি সংযত, সহিষ্ণু, সুজন, সজ্জন হতে দেখা যায় না। বিল ক্লিনটন এতকাল বসনিয়ার জন্যে মায়াকান্না কেঁদেছেন, অস্ত্র সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের হুমকিও দিয়েছেন, এখন তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কংগ্রেস ও সিনেট যখন নিষেধ তুলে নেয়ার জন্যে সম্মত, তখন তিনি প্রয়োগ করেন ভিটো। কূটনৈতিক ছল-চাতুরীর কখনো অভাব হয় না, খোঁড়াযুক্তিও হয়ে যায় অনুগত রাষ্ট্রগুলোর সমর্থনে যৌক্তিক ও ন্যায্য। সাদ্দামের মেয়ে জামাই পালায়– সমর্থনে-সাহায্যে-অভয় দানে এগিয়ে আসেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি। তিনি জর্ডানকে করেন নিশ্চিন্ত সাহস জুগিয়ে, সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে।

ইয়েলৎসিনের দরদ সার্বদের ও সার্বিয়ার প্রতি। আবার য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলো মুখে খুব মানবিক চেতনার পরিচয় দিচ্ছে রাদাভন কারাদিচ প্রভৃতিকে নরহন্তা বলে আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের হুমকি উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করে, যদিও জানে যে ওদের বিচার করার সাধ্য আদালতের নেই। একবার পানামার রাষ্ট্রপতিকে মার্কিন সরকার স্বদেশের শাসনপাত্রের মতোই স্বাধীন সার্বভৌম পানামা থেকে তুলে নিয়ে গেল। পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলো রইল নির্বাক, নিষ্ক্রিয় দর্শক ও শ্রোতা, কারণ সবাই মার্কিন সরকারের ধার ধারে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে নানাভাবে এবং ডরায় তার দানবিক শক্তিকে।

ইয়েলৎসিন যখন ককেশীয় মুসলিম ও খ্রীস্টান অধ্যুষিত রাষ্ট্র চেচনিয়া জোরে-জুলুমে দখল করে নিতে চায়, তখনো জাতিসঙ্ঘ কিংবা কোনো বৃহৎ শক্তিমান রাষ্ট্র এ জোর-জুলুমের প্রতিবাদ করে না। সর্বত্র নরহত্যা চলে নির্বিচারে, বাস্তুত্যাগ চলে অবাধে, দহন-হনন-লুণ্ঠন চলে সরকারের সমর্থনে ও সহযোগিতায়। আজ বসনিয়ার মুসলিম উদ্বাস্তু, ক্রোয়াট-হাঙ্গেরিয়ান উদ্বাস্তু, সার্ব উদ্বাস্তু সমভাবে এক অমানবিক-দানবিক পীড়ন-বঞ্চনা-প্রতারণার, দহনের, হননের, লুণ্ঠনের শিকার। মানুষে মানুষে কি জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-নিবাস-গোত্র অনুসারে প্রাণের মূল্যের পার্থক্য থাকে? জাপানে-টিউনিসিয়ায়-কাশ্মীরে-আসামে-ত্রিপুরায়-শ্রীলঙ্কায়-কুর্দীস্তানে-আফগানিস্তানে চলছে নিজেদের মধ্যে হনন-উৎসব।

শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি-শাস্ত্র-মনুষ্যত্ব-মানবিকতা-মানবতা প্রভৃতির প্রভাব কি ও কোথায় এবং কার বা কাদের মধ্যে মেলে এ লাভ-লোভ-স্বার্থ, ক্ষোভ-ক্রোধ-প্রতিহিংসা-রিরংসা চেতনার সময়ে? আয়ুর্বিজ্ঞান যখন মানুষের আয়ু দীর্ঘতর করেছে, তখনই মানুষ মানুষ মারছে বেশি করে। এতকালের মনুষ্যসাধনা এ দানবিক-পাশবিক-শ্বাপদসুলভ আচরণের সময়ে কেন বিলুপ্ত বা অদৃশ্য হয়ে যায়? মানুষ তখন প্রাণী মাত্র? তা হলে কি জানতে, বুঝতে ও মানতে হবে যে মানুষ চিন্তায়-মগজে-মননে-মনীষায় যতই মানবিকতার-মানবতার-মনুষ্যত্বের মহৎ বুলি, আপ্তবাক্য উদ্ভাবন করুক না কেন প্রয়োজনের সময়ে তা কাজে লাগায় না কেউ? যেমন আমাদের রাজনীতিক দলগুলোর আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে-লালনে-পালনে-পোষণে কেবল রাজনীতিক কর্মীদের মধ্যেই নয়, দেখাদেখি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারী শৈথিল্য দেখে ঘরে-বাইরে, গাঁয়ে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, পাড়ায়-মহল্লায় সামান্য কারণে রোজ বেপরওয়া নরহত্যা চলছে। আমরা বাধ্য হচ্ছি এক জাঙ্গলিক ও গাড্ডলিক জীবনযাপনে। গোটা পৃথিবীতে চলছে ত্রাসের রাজত্ব। জনজীবন বিপন্ন সামাজিক ও রাজনীতিকভাবে। তবু আমরা মানবিক গুণের প্রত্যাশা করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোষিত গণমানবমুক্তি ও বিশ্বপরিস্থিতি

ব্যক্তিগত বা পরিবারগত জীবনে যেমন নানা প্রকার সমস্যা-সঙ্কটের মোকাবিলা করতে হয় সাফল্যের বা ব্যর্থতার সঙ্গে, তেমনি সামাজিক, রাজনীতিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক জীবনেও দেশে-কালে নানা সমস্যা-সঙ্কটের সমাধান সন্ধান করতেই হয়। কিন্তু সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রিক জীবনে সমাধান পাওয়া সহজ হয় না। কারণ ব্যক্তিক পারিবারিক জীবনে যেমন সমস্যার সঙ্কটের কারণ-কার্য নিরূপণ ঋজু চিন্তায় ও চেতনায় সম্ভব হয়, সামষ্টিক জীবনের বা রাষ্ট্রিক কিংবা জাতিক জীবনে আয়ুর্বিজ্ঞানের নিদানের মতো তা নিরূপণ সহজ হয় না। বিভিন্ন মতের, পথের, শাস্ত্রের, সম্প্রদায়ের, দলের, শ্রেণীর মানুষের মনে-মগজে-মননে ভিন্ন ভিন্ন কারণ-ক্রিয়া প্রতিভাত হয় নিজ নিজ স্বার্থ-জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি ও বিবেক-বিবেচনা অনুসারে। স্থূলবুদ্ধির ও সূক্ষ্মবুদ্ধির মানুষের দৃষ্টি যেমন তারল্যে ও গভীরতায়, প্রাতিভাসিকতায় ও তাৎপর্যে পৃথক হয়, তেমনি জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-শ্রেণী ও অজ্ঞতা-বিজ্ঞতা ভেদে মত-মন্তব্য-সিদ্ধান্তও হয় বিভিন্ন।

এবার স্বদেশের ইতিবৃত্ত থেকেই দৃষ্টান্তযোগে এ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য অনুভব-উপলব্ধির চেষ্টা করা যাক। উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি নির্জিত বাঙালী মুসলিমরা (যাদের প্রায় সবাই নিম্নবর্ণের, নিম্নবর্গের, নিম্নবিত্তের ও নিম্নবৃত্তির বৌদ্ধ-হিন্দু থেকে ইসলামে দীক্ষিত মুসলিম) দেখল জমিদার হিন্দু, মহাজন হিন্দু, উকিল-ডাক্তার-শিক্ষক-হাকিম-কেরানী-দোকানী সবাই হিন্দু। শাসিত-শোষিত দুস্থ দরিদ্র, অজ্ঞ অনক্ষর ভূমিহীন চাষী-মজুরদের প্রায় সবাই অন্তত অধিকাংশ মুসলিম। ব্রিটিশ সরকার ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে ভিত্তিহীন কিস্‌সা বানিয়ে একদিকে তুর্কী-মুঘল আমলে দহনে ধর্ষণে-হননে লুণ্ঠনে, জোরে-জুলুমে মুসলিম বানিয়ে শোষণে-পীড়নে সাড়ে ছয়শ' বছর ধরে হিন্দুর অস্তিত্ব বিপন্ন এবং হিন্দুজীবন ত্রস্ত রেখেছিল বলে যেমন হিন্দু মনে ক্ষোভের, ক্রোধের ও প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়েছিল, অন্যদিকে এক কালের বাদশার জাত মুসলিমদের অজ্ঞতার অনক্ষরতার দুস্থতার দরিদ্রতার নিঃস্বতার নিরন্নতার জন্যে দীক্ষিত মুসলিম বংশধরদের বাস্তব অবস্থার ও অবস্থানের সাক্ষ্যে হিন্দুরাই যে দায়ী এ ধারণা উঠতি শিক্ষিত মুসলিম মনে দৃঢ়মূল করেছিল। বিশ শতকে ১৯০৫ সাল থেকেই হিন্দু মনে সে-আগুন যেমন নতুন বাতাস পেল রাজনীতিক ও আর্থিক প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার আর বঞ্চনার ও কায়েমী স্বার্থের টানাপড়েনে, তেমনি মুসলিম মনেও হিন্দুদ্বেষণা বঞ্চনার প্রতিশোধ প্রেরণারূপে দাবি আদায়ের ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের রূপ নিল। ব্রিটিশ প্রায় দু'শো বছর ধরে লুট করার পরেও বিতাড়িত হবার মুহূর্তে ভারত ভাগ করে দিল ধর্মের ভিত্তিতে। এ ছিল পার্টিং কিক।

তখনকার সামন্ত-বুর্জোয়া নেতারা তাদের শ্রেণীস্বার্থেই ব্রিটিশের প্রতারণামূলক এ সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা মেনে নিয়ে কৃতার্থবোধ করল, যা আমজনতার পক্ষে হল ছিপে ধরা মাছের মতো মারাত্মক। আসলে সে-সমস্যাটা ছিল বঞ্চক-বঞ্চিতের, শোষক-শোষিতের এবং তাতে হিন্দু-মুসলিম জমিদার-মহাজন-উকিল-ডাক্তার শিক্ষক-কেরানী-দোকানী প্রভৃতি অর্থসম্পদের মালিক ও নিয়ন্ত্রক শ্রেণীর শোষণে-বঞ্চনায় তফশীলী স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দু প্রজার ও মুসলিম প্রজার মধ্যে কোনো প্রভেদ ছিল না। সে-কথা অজ্ঞ আমজনতার ধারণায় আসেনি, যদিও বাঙলায় ১৯৩৭-৪৭ সালের পরিসরে প্রজাস্বত্ব আইন, ঋণ সালিশী আইন, প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস, জমিদারী বিলুপ্তি প্রয়াস প্রভৃতি আমজনতার তথা নির্বিশেষ গণমানবের স্বার্থেই করা হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বা ধর্মীয় জাতীয়তার শিকার হল সামন্ত-বুর্জোয়ার রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান লীগ-কংগ্রেস। পৃথিবীর অজ্ঞ মানুষ আজো মরীচিকামুগ্ধ। ফলে নেতার নির্দেশই মেনেছে জনগণ পরিণাম না-জেনে ও না-বুঝে। যা হতে পারত শ্রেণী সংগ্রাম, তা হয়ে গেল শাস্ত্রেবিশ্বাসীর দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতের কারণ। কার স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে? নিশ্চয়ই নয়। কারণ তারা আজো বঞ্চিত-শোষিত, দলিত-দমিত, দাবি আদায়ে ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় উপমহাদেশের সর্বত্র অসমর্থ। লাভ, লোভ, স্বার্থ চরিতার্থ হল সামন্ত বুর্জোয়াদের। পরে দেখা গেল পশ্চিম পাঞ্জাবে ও বাঙলাদেশে মুসলিমরা এবং বিহারে-উত্তর প্রদেশে হিন্দুরাই শিক্ষিত ও ব্যবসায়ী হয়ে অর্থসম্পদ-মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্প-দাপট-প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হল। বিদেশী-বিধর্মী-বিভাষী শাসন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে আমজনতা নেতাদের সমর্থন করেছিল। এখন সেই স্বদেশী নেতা শ্রেণীরাই বিদেশী বিধর্মী বিভাষীর চেয়েও বেশি শোষক ও দুঃশাসক। গণমানবমুক্তি মেলেনি কোথাও পৃথিবীর নতুন রাষ্ট্রগুলোতে। অজ্ঞ-অনক্ষর, আদিবাসী-উপজাতি-জনজাতি আর নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র চাষী-মজুর রইল পূর্ববৎ সুযোগবঞ্চিত আত্মোন্নয়নের পন্থারিক্ত দিশেহারা। বরং ওই শ্রেণীর লোকদের বাস্তু ত্যাগের ফলে দুর্দশা-দুর্গতি-দুর্ভোগ বাড়ল। যাতে শোষক-শোষিত, বঞ্চক-বঞ্চিত চেতনার উন্মেষ বিকাশ বিস্তার না ঘটে, সেজন্যে উপমহাদেশের ছোট বড় মাঝারি তিনটে রাষ্ট্রের সামন্তসংস্কৃতির গৌরব-গর্ব-পুঁজিবাদী খানদানী ও উঠতি মুসলিমরা প্রচার করে বেড়ায় এবং উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-সংস্কৃতি প্রভৃতির মূল্য মর্যাদায় আজো গুরুত্ব দিয়ে থাকে আর ছিটেফোঁটা কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য উদারভাবে উচ্চারিত বুলি-ভাষণ মাধ্যমে বিলিয়ে আশ্বস্ত রাখতে চায় বঞ্চিতদের। নিজেদের শোষণ-শাসন বজায় রাখার জন্যেই সবাইকে আয়ত্তে রাখতে চায়, কাউকেও সঙ্গত কারণেও স্বাধীন হতে দেয় না। ভারতে কাশ্মীরীরা, শিখরা পূর্ব ভারতে ঝাড়খণ্ডী আদিবাসীরা স্বায়ত্তশাসনকামী, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা ও ত্রিপুরার-মণিপুরের ও প্রাক্তন অসমের রাজ্যগুলোর মোঙ্গলরা আজ স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত। দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়েরা ভাষার প্রশ্নে ক্ষুব্ধ। পাকিস্তানেও সিন্ধি-বালুচ-পাঠানেরা পাঞ্জাবী দৌরাত্ম্যে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। এমনকি বাঙলাদেশেও পার্বত্য চট্টগ্রামে মোঙ্গলরা স্বাধীনতা-স্বায়ত্তশাসনকামী এবং দ্রোহী। সামন্ত মানসিকতায় আচ্ছন্ন পুঁজিবাদী সামন্ত-বুর্জোয়া শাসকরা সে-দাবি মানছে না, লড়াইয়ে দ্রোহীরা এবং সরকারি সৈন্যরা সমভাবেই মরছে, বিপর্যস্ত হচ্ছে জনজীবন। বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদও ভয়ঙ্কর এবং মারাত্মক। শেষাবধি ন্যায্য দাবি– দ্রোহ ঠেকানো যায় না, যায়নি কখনো ইতিহাস পাঠে ও স্বকালে চোখে দেখেও এবং জেনেও বৃথা রক্তক্ষরা ও প্রাণহরা লড়াই চালিয়ে যায় সাম্রাজ্যবাদী সরকার। এখন যে মানুষ স্বসত্তার মূল্য-মর্যাদা-সচেতন হয়ে উঠেছে, এখন যে ব্যক্তি মানুষ বা সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রিক মানুষ কারো অধীনে, আয়ত্তে থাকতে নারাজ, এখন সমকক্ষ হয়ে সম ও সহস্বার্থে সংযমে সহিষ্ণুতায় সৌজন্যে সামবায়িক সম্পর্ক-সহযোগিতায় পণ্য বিনিময়ে মানুষ সহাবস্থানেই মাত্র রাজি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং এ লক্ষ্যে আগে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েই ফেডারেশনে বা কনফেডারেশনে সংস্থা-সমিতি-সঙ্ঘ সদস্য রূপেই অর্থসম্পদের তথা জীবিকার ক্ষেত্রে সহযোগী হয়ে বাঁচতে ও বাঁচাতে সম্মত যে কোনো গোত্র, জাতি, উপজাতি পৃথিবীর যে-কোনো অঞ্চলে, এ তথ্য শোষকগোষ্ঠী স্বীকার করে না। প্রভু-ভৃত্যে বন্ধুত্ব হয় না। সমানে সমানে হয় দোস্তী। বনজ, খনিজ, জলজ, কৃষিজ উৎপাদিত ও নির্মিত পণ্য বিনিময়ও হবে সমস্বার্থেই। তাই আজ পৃথিবীর সর্বত্র রাষ্ট্রপুঞ্জ সমিতি-সংস্থা-সঙ্ঘ গড়ে তুলেছে, তুলছে, এমনকি প্রাক্তন ন্যাটোজোটও অভিন্ন স্বার্থে অভিন্ন আর্থ-বাণিজ্যিক রাষ্ট্র গঠনে সম্মত স্ব স্ব গুণ-গৌরব-গর্ব পরিহার করে, জাতীয় অহঙ্কার-ঐতিহ্য বর্জন করে।

কায়রো-কোপেনহোগেন-বেইজিঙের সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় থেকে বোঝা যায়, পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া সমাজ আজ সঙ্কটের সম্মুখীন, তাই বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায়-জীবন-জীবিকা চেতনায় কিছু পরিমার্জন-পরিবর্তন এনে জনগণের অভ্যুত্থান ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে পুঁজিবাদী বৃহৎ শক্তিগুলো। এভাবে সমাজবাদের ও সমাজতন্ত্রের চিন্তা-চেতনা বিলুপ্তি করতে চায় ওরা। কিন্তু মার্কসবাদের আজো বিকল্প নেই, তাই মার্কসবাদেরও বিলুপ্ত নেই। শীতকালীন ঔষধির মতো আপাত সুপ্ত, গুপ্ত ও লুপ্ত বলে অনেকে মনে করলেও, মার্কসবাদ গণতন্ত্র অঙ্গীকার করে, লেনিন-মাওসেতুঙের জবরদস্তীর শাসন ব্যবস্থা পরিহার করে আবার দেশে দেশে শোষিত মানবমুক্তি আনবেই। বিশ্বের শোষিত-বঞ্চিত জাগ্রত জনতা একালে আর বুর্জোয়ার মায়াজালে আকৃষ্ট হবে না, আত্মকল্যাণেই আপন প্রাপ্য অধিকার আদায়ের জন্যে বুকের লাল রুধির ঢালবে পথে-প্রান্তরে, বনে-বাদাড়ে। এবার আর আজাদীর মরীচিকা নয়– শোষণমুক্তিই মিলবে। শত্রু একবার চিহ্নিত হলেই, আত্মরক্ষার জন্যে তাকে এড়িয়ে চলার কৌশল ও বুদ্ধি আসে আয়ত্তে, আর জাগে মোকাবিলা করার উপায়-সন্ধিৎসা। আজো জোর-জুলুম ও বর্বর যুগের নরহত্যা চলছে বটে, কিন্তু বিশ্বের দিকে দিকে সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধও চলছে। পৃথিবীর সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা দেশ-কাল-জীবন-জীবিকার প্রয়োজনেই দ্রুত বদলাবে। জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-গোত্র-ভাষা-নিবাস-অঞ্চল ভেদ স্বীকারে নয়, সাম্প্রদায়িকতায় নয়, মুক্তি নিহিত শ্রেণীহীন সমাজে বণ্টনে বাঁচার অঙ্গীকারে ও ব্যবস্থায়।

রাষ্ট্রের কল্যাণের কথা

'যার যার ধর্ম তার তার। কিন্তু রাষ্ট্র সবার।' এর তাৎপর্য হচ্ছে ব্যক্তিকজীবনে ব্যক্তি স্বাধিকারে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন, কিন্তু রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সে সম সুযোগ-সুবিধে ও অধিকার প্রাপ্তির অংশীদার। উপমা প্রয়োগে বলা যায়, চাঁদের ও সূর্যের মতো রাষ্ট্রও একটি বটে, চাঁদকে, সূর্যকে অর্থাৎ চাঁদের জ্যোৎস্না এবং সূর্যের আলো ও রোদ যেমন প্রত্যেকে নিজের চাহিদা মতো পায় নির্বিবাদে ও নির্বিরোধে চাঁদ-সূর্যকে খণ্ডিত না করেই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমনি রাষ্ট্র সর্বজনীন হওয়া সত্ত্বেও যে-কোনো নাগরিক তার যথাপ্রয়োজনে যথাসময়ে যথাস্থানে তার প্রাপ্য অধিকার প্রয়োগের সুযোগ-সুবিধে পাবে নির্বিরোধে ও নির্বিবাদে। অর্থাৎ সরকারের দৃষ্টিতে ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যায়-শিক্ষায়-ধনে-মানে-যোগ্যতায়-দক্ষতায় কিংবা জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-গোত্র-অঞ্চল নির্বিশেষে লঘু-গুরুর হিসেব নিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নাগরিক মাত্রই সমান। এ স্বীকৃতিই আধুনিকতম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। এর যথাযথ বা অনুপুঙ্খ প্রয়োগই আদর্শ বা বাঞ্ছিত 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' রূপে স্বীকৃত হবার শর্ত। আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি, শাসন-প্রশাসন পদ্ধতি, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র ও বুর্জোয়াবাদ প্রভৃতি সবটাই অনুকৃত। এমনকি সংস্কৃতি ও রাজনীতিক সংস্কৃতি চেতনাও অনুকৃত ও অনুসৃত, অনুভূত-উপলব্ধ কিংবা আত্তীকৃত, সাঙ্গীকৃত, স্বীকৃত, আত্মীকৃত নয়। ফলে আমাদের নৈতিক চেতনা, আদর্শবোধ, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণ প্রভৃতি সবকিছু ভেজালে ভর্তি। আমরা জাতি হিসেবে কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, গন্তব্য কিংবা আদর্শ ভ্রষ্ট। 'যখন যেমন তখন তেমন' আচরণ ও নীতি গ্রহণই আমাদের চারিত্রিক লক্ষণ, আমরা শিক্ষায় অর্থে-বিত্তে-বেসাতে শাসনে-প্রশাসনে এবং বিভিন্ন পেশায় প্রায় ক্ষেত্রেই ভুঁইফোঁড় বলেই হয়তো আমরা সহজেই নীতি-নিয়ম, আইন-কানুন, সততার সীমা লঙ্ঘন করে অপরাধে-অপকর্মে আসক্ত হই। তাই আজ অবধি আমরা রয়ে গেছি লুম্পেন বুর্জোয়া বিদ্যা-বিত্ত অর্জন করেও, পার্ষদ, পারিষদ, সাংসদ, মন্ত্রী, আমলা, সেনানী, এবং নানা পেশার বুদ্ধিজীবী হয়েও। আমাদের মধ্যে উকিল ও ডাক্তার অনেক। তাঁদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল যুক্তিনিষ্ঠা, ন্যায্যতাবোধ ও সততা তথা বিবেকী আচরণ, কেননা উক্ত দুই পেশা হচ্ছে যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক ন্যায্যতাভিত্তিক, কারণ-কার্য নির্ধারণই এ দুই পেশার মুখ্য লক্ষ্য। ডাক্তার রোগলক্ষণ নিরূপণ, রোগের উৎপত্তির কারণ এবং নিবারণের উপায় উদ্ভাবন ও প্রতিষেধক প্রয়োগ করে থাকেন যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগেই। তেমনি উকিল যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে অনুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণে বিরোধ-বিবাদের কারণ নিরূপণ করেন এবং নৈতিক চেতনাপ্রসূন প্রচলিত আইন-কানুনের নিরিখে ন্যায়-অন্যায়-অপরাধ-অপকর্ম নিরূপণ করার কাজে বিচারকের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। কিন্তু স্বভাবগত হয় না তাঁদেরও বৈষয়িক জীবনে এ যৌক্তিক-বৌদ্ধিক আচরণ ও কর্ম। আমাদের অজ্ঞ অনক্ষর নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্রবহুল দেশে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে লাভ-লোভ-সচেতন ধূর্ত ব্যক্তিমাত্রই মতলববাজ-দুর্নীতিবাজ, প্রতারক-প্রবঞ্চক, তাই কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর ভাষায় 'রাজনীতিকের ধমনী শিরায় সুবিধাবাদের পাপ। আর বুদ্ধিজীবীর রক্তে স্নায়ুতে সচেতন অপরাধ।'

অথচ আমরা সাংসদ, মন্ত্রী, আমলা, রাজনীতিক, শিক্ষক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসেবে জাগ্রত মুহূর্তগুলোতে প্রায় সর্বক্ষণ মহৎবুলি আওড়িয়ে থাকি। যেমন– 'অন্ধকার ভেদ করি আসুক আলোক/ অন্ধকার মোহ হতে আঁখি মুক্ত হোক।' (রবীন্দ্রনাথ) বঙ্কিমচন্দ্র কথিত আদর্শে 'সংবাদপত্র লেখক হবে রাজার মন্ত্রী, প্রজার বন্ধু এবং সমাজের শিক্ষক।' অথবা বিভিন্ন সমাজ পরিবর্তন ও বিন্যাস বিষয়ক বা অর্থ-সম্পদ বণ্টন বিষয়ক নীতি আদর্শ বা 'ইজম' নিরপেক্ষভাবেও জনহিতৈষী গুণী-জ্ঞানীরা যে বলেন– আমরা দেশ-কাল-জীবনের-জীবিকার দাবি অনুগ জীবন রচন ও যাপন করব। আমরা উপযোগরিক্ত আচার-আচরণ-পালা-পার্বণ-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-রক্ষণশীলতা ও অভ্যাস বর্জন করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যা কিছু কল্যাণকর সুন্দর তা গ্রহণ, বরণ ও অর্জন করব– করব আচরণে-কর্মে রূপায়িত। আমাদের চিন্তায়-চেতনায় মধ্যযুগের জীবন-জীবিকা ধারণার রেশ ও লেশ রয়ে গেছে। তাই আমরা সমকালীন জীবন ও জগৎ সচেতন হতে পারিনি, পারিনি বিজ্ঞান ও বাণিজ্য-মনস্ক হতে। পারিনি রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ আয়ত্ত করতে। এখনো আমরা জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-গোত্র-অঞ্চল সচেতন। আমাদের রাষ্ট্রিক জাতীয়তাচেতনা আত্তীকৃত আত্মীকৃত করতেই হবে দৈশিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক স্বার্থে। এ জন্যে আমাদের সংবিধান হতে হবে সেক্যুলার অর্থাৎ রাষ্ট্র বা সরকার নেবে নাগরিকের মর্ত্যমানবিক জীবনের সর্বপ্রকার সর্বার্থক ও সর্বাত্মক চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব, পারত্রিক কল্যাণের কোনো দায়িত্ব নয়। সরকারের তথা রাষ্ট্রের কর্তব্য ও দায়িত্ব থাকবে নির্বিশেষ নাগরিকের সেবা ও সুশাসন সুবিচার। নাগরিকেরা যার যার ধর্ম ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সম্প্রদায়গতভাবে ও সামাজিকভাবে পালন করবে। কিন্তু সরকারী স্বীকৃতি থাকবে না কোনো ধর্মের, কোনো সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যার গুরুত্ব বা লঘুত্ব সরকারের কাছে গুরুত্ব পাবে না। সরকারের কাছে নাগরিক মাত্রই জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-গোত্র-ভাষা-নিবাস, শিক্ষিত-সাক্ষর-নিরক্ষর, ধনী-দরিদ্র, যোগ্য-অযোগ্য, দক্ষ-অদক্ষ নির্বিবেশে চিহ্নিত হবে কেবল 'ব্যক্তি-মানুষ' হিসেবেই। এ জন্যে অর্থাৎ যথার্থ নিখাদ নিখুঁত সুষ্ঠু অভেদ অভিন্ন দৈশিক রাষ্ট্রিক জাতি-চেতনা অর্জনের জন্যে আমাদের সংবিধান হবে সেক্যুলার– যার উৎস ও ভিত্তি মানবতা। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো হবে ধর্মনিরপেক্ষ, আমাদের রাজনীতিক দলে থাকবে সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ, অন্তত বুর্জোয়া লিবারেলিজম আবশ্যিক ও জরুরি আপাতত। আমাদের মধ্যে মুক্তচিন্তার চর্চা বা অনুশীলন আবশ্যিক ও জরুরি, আমাদের মুক্তচিন্তকরা বা ফ্রিথিঙ্কার্স যখন সমাজে বাঞ্ছিত সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবেন, তখন তাঁদের প্রভাবে প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার মারাত্মক দ্বন্দ্ব লোপ পাবে, জনগণ সম্মত থাকবে স্ব স্ব মত নিয়ে নির্বিরোধে ও নির্বিবাদে সহযোগিতায় সহাবস্থানে। আমাদের রাজনীতিক সঙ্কট-সমস্যা বিদূরণের সহায়ক হবে এখনই যদি আমরা একটি সেক্যুলার রাজনীতিক দল গঠন করি হিন্দু-বৌদ্ধ-আদিবাসী-জনজাতি ও মুসলিম প্রভৃতি সর্ব ধর্মের ও গোত্রের লোক নিয়ে। যেমন সাঁওতাল, মুন্ডা, নাগা-কুকি-ত্রিপুরা-চাকমা, মার্মা প্রভৃতির প্রতিনিধি নিয়ে ছয়জনের প্রেসিডিয়াম করি। এবং তাতে একজন হিন্দু, একজন বৌদ্ধ, একজন খ্রীস্টান, একজন মুসলমান আর আদিবাসী-জনজাতি থেকে নিই দু'জন এবং প্রতিজন দু'মাস করে থাকবেন চেয়ারম্যান বা প্রেসিডিয়ামের সভাপতি। তাহলে সংখ্যালঘুর হীনম্মন্যতা ঘুচবে, স্বদেশে, স্বভিটায়, স্বরাষ্ট্রে নিজেকে একজন স্বাধীন নাগরিক হিসেবে ভাবতে পারবে, মানবিকভাবে অনিশ্চিতির অনিরাপত্তার ও অসমতার ভীতিমুক্ত হয়ে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে স্বদেশ সেবায় সামাজিক, আর্থিক ও রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে হবে আগ্রহী। এখনকার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের বৃহত্তর ও গাঢ়-গভীর স্বার্থেই এ ব্যবস্থা চালু হওয়া দরকার। আপাতত মার্কসবাদ প্রয়োগ সম্ভব হবে না। এখন মুক্ত চিন্তক ও সেক্যুলারিজম অনুরাগী প্রগতিবাদী লোক চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুশতী সেনের রচিত 'বিভূতিভূষণ'

সবাই জানে এবং সবাই বলে যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতিপ্রেমী লেখক। প্রকৃতি তাঁর প্রাণ-মনের সঙ্গী, তাঁর জীবনানুভূতির আবশ্যিক অঙ্গ। সবাই এ-ও জানে এবং মানে যে বিভূতিভূষণ কখনো সাহিত্যশিল্প সৃষ্টির জন্যে আড়ম্বর-উদ্যোগ-আয়োজন নিয়ে লোক-উপকারহেতু সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশ লক্ষ্যে লেখনী ধারণ করেননি। তিনি নিতান্ত অনাড়ম্বর ভাষায় ভঙ্গিতে বাকে-বাক্যে বয়ান করেছেন প্রকৃতিনির্ভর ও প্রকৃতিবেষ্টিত নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ, দরিদ্র অসহায় শোষিত পীড়িত অবহেলিত মানুষের প্রাত্যহিকতায় ম্লান ও বৈচিত্র্যহীন সচল জীবন এবং প্রয়োজনসচেতন হৃদয়হীন মানুষের নিজেদের অজ্ঞাতেই প্রকৃতি-পীড়ন। মানবমনের ওপর প্রকৃতির প্রভাব যে অপ্রতিরোধ্য তা আমরা অনুভব করি রৌদ্রোজ্জ্বল কিংবা মেঘলা বা বর্ষণ মুখর দিনে। ওয়ার্ডসওয়ার্থে-রবীন্দ্রনাথে-জীবনানন্দে-বিভূতিভূষণে এবং সব লিখিয়ের মধ্যেই আমরা কম-বেশি প্রকৃতিমুগ্ধতা দেখি। প্রাকৃতিক প্রতিবেশের প্রভাব কেউ এড়াতেই পারে না। তবে বিভূতিভূষণ প্রকৃতিগত প্রাণ, প্রকৃতির সঙ্গে রয়েছে তাঁর হার্দ্যিক সম্পর্ক, নাড়ীর টান।

আসলে বিভূতিভূষণ ছিলেন প্রচ্ছন্ন কিন্তু তীক্ষ্ণ তীব্র অনুভবের, উপলব্ধির এবং অনুপুঙ্খ দৃষ্টির এক অনন্য মানুষ। তাঁর আশৈশবের নানা দুঃখ-যন্ত্রণার, সঙ্কট-সমস্যার অনুভূতি, উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা তাঁকে আর দশজন লেখকের মতো দৃষ্টিগ্রাহ্য পেশার ও নেশার সাহিত্যশিল্পী রূপে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে অনুপ্রাণিত করেনি। তিনি কেবল বয়ান করেছেন। আরম্ভে যেমন নেই চমক, সমাপ্তিতেও নেই তেমনি কোনো মহৎ ও বৃহৎ গাঢ়-গভীর তাৎপর্যের সচেতন দ্যোতনাদানের প্রয়াস।

তাই তাঁর সাহিত্যে প্রয়াস-প্রযত্ন-পরিচর্যা-পরিশ্রমের স্বাক্ষর প্রকট নয়। তিনি যখন গল্প বলেন, তখন তারও শুরু ও শেষ কিংবা আদি মধ্য অন্ত মনে হয় বৈশিষ্ট্যহীন, অযত্ন বয়ানে করেন শেষ। শিল্প থাকল, কি সাহিত্য হল তা দেখা যেন তাঁর দায়িত্বের ও কর্তব্যের বিষয় নয়। এক কথায় বাহ্যত এবং তাঁর জীবৎকালে দৃশ্যত তিনি ছিলেন পাল থেকে পলাতক, উদাসীন, অপরিচ্ছন্ন পোশাকের, প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনে অসমর্থ, পারিবারিক দায়িত্বের কর্তব্যের চাপে ক্লিষ্ট প্রায় দিশেহারা এক নিঃসঙ্গ পথিক। তাই বলে তিনি গ্রাম্যতাদুষ্ট নন, আধুনিক সর্বাত্মক ও সর্বার্থকভাবেই।

বিভূতিসাহিত্যে আমরা এক শতকের বাঙলা-বিহারের বিভিন্ন শ্রেণীর শোষক-শোষিত-বঞ্চক-বঞ্চিত-শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষের শাস্ত্রিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক জীবনের উঠতি-পড়তি-ঝরতির তথা বিবর্তনধারার একটা ইতিবৃত্তান্ত প্রচ্ছন্ন অনুষঙ্গ হিসেবে বিধৃত দেখতে পাই। তাঁর উপন্যাসগুলোতে তা অবিকল এবং খণ্ড খণ্ড চিত্র পাই তাঁর গল্পেও। ঠিক বঙ্কিমচন্দ্রও বিগত শতকে তাঁর রচনায় মৃণালিনী আনন্দমঠ দেবীচৌধুরানী সীতারাম রাজসিংহ বিষবৃক্ষ রজনী ইন্দিরা কমলাকান্ত লোকরহস্য প্রভৃতি গ্রন্থে তেরো শতকের উষাকাল থেকে উনিশ শতকের কোলকাতার জীবন অবধি অঙ্কিত করেছিলেন জানা ইতিবৃত্তের আলোকে। বিভূতিভূষণের রচনায় গ্রাম ভাঙছে, মানুষ দরিদ্র হচ্ছে, শহুরে হচ্ছে, জমিদার-মহাজন-নীলকুঠিয়াল-বেনিয়া-ফড়িয়া-গোমস্তা-দেওয়ান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রেণীর দর্পদাপট প্রভাবপ্রতিপত্তি বাড়ছে। আপাত উদাসীন বিভূতিভূষণের দৃষ্টি এড়ায়নি কিছুই। তিনি নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ, দরিদ্র, উদ্বাস্তু, মানুষের জীবনযন্ত্রণা ও জীবিকাসমস্যা হৃদয় দিয়ে অনুভব-উপলব্ধি করেন, তেমনি মাটির মানুষ বিভূতিভূষণ মাটিলগ্ন গৃহগত জীবনের যন্ত্রণায় অভিজ্ঞ বলেই তাঁর দেহ-প্রাণ-মনের সঙ্গী উদ্ভিদ জগতের সদা অত্যাচারিত তরুলতার সৌন্দর্যে নয় কেবল, যন্ত্রণায়ও অন্তরে অস্থির ও অভিভূত। আরণ্যকের ম্যানেজার সত্যচরণের উক্তিতে তাই জঙ্গল মহালের অর্থলিপ্সু জমিদারের হুকুমে বৃক্ষ হননে, দহনে, বৃক্ষশাখা ছেদনে যে অমানবিক অপরাধজনিত পাপ হয়েছে, তার জন্যে অনুশোচনা প্রকাশ পেয়েছে। আমরা যে যাই বলি না কেন, আসলে বিভূতিভূষণ এক দুর্লভ চাপা স্বভাবের প্রমূর্ত মানবতার প্রতীক। জীব-উদ্ভিদ নির্বিশেষে প্রাণিমাত্রেরই প্রতি আত্মার আত্মীয়তা অনুভব-উপলব্ধি করতেন তিনি। একে প্রকৃতিপ্রেম বলে হালকাভাবে দেখা চলে না। বিভূতিভূষণ আমাদের ঘন ঘন কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থকে স্মরণ করিয়ে দেন। বিভূতিভূষণের সাহিত্য হচ্ছে মর্ত্যের দুস্থ প্রাণিপ্রেমিকের দীর্ঘশ্বাসের, হাহাকারের, অব্যক্ত অসহ্য যন্ত্রণার ইতিবৃত্ত। তিনি যা কিছু লিখেছেন সে-সব তরুলতার প্রাণের অব্যক্ত যন্ত্রণার মতো তাঁর হৃদয়ের তাজা রক্তক্ষরা চাপা যন্ত্রণারই শীতল ভাষিক অভিব্যক্তি।

কয়লার মধ্যে যেমন হীরক খণ্ড মেলে, সামুদ্রিক ঝিনুকের মধ্যে যেমন মুক্তা সুলভ, বিভূতিভূষণের ভাবে-ভাষায়-ভঙ্গিতে-বয়ানে আপাত অযত্নে লেখা সাহিত্যেও আমরা গাঢ়-গভীর ব্যঞ্জনা, অনুভব-উপলব্ধি, তীক্ষ্ণ-তীব্র দৃষ্টি, অনুপুঙ্খ বয়ান অবহেলায় এখানে ওখানে অযত্নে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দেখতে পাই। এসব কারণেই আমাদের বিভূতিভূষণকে স্বরূপে জানতে ও বুঝতে সময় লাগছে। আমরা সবাই তাঁর ভক্ত, কিন্তু তাতে গুণ-মান-মাপ ও মাত্রা ভেদ থাকছে। অত মনোযোগ দিয়ে আমরা তাঁকে জানতে বুঝতে প্রয়াসী হইনি কখনো। তিনি আমাদের সবার প্রিয়। তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে তিনি অন্যতম। বিভূতিভূষণ জীবনকে তাঁর আবাল্যের অভিজ্ঞতা থেকেই সংগ্রাম রূপেই জানতেন, জীবন যে বিরুদ্ধ প্রতিবেশে প্রতিরোধ এবং পরাজয় বা আপোস নয় জীবনের লক্ষ্য, নিষ্কৃতি নেই আপোসে আত্মসমর্পণে, তা তাঁর জানা ছিল। এ দৃষ্টিতে পথের পাঁচালী, অপরাজিত, আরণ্যক প্রভৃতি পাঠ করলে তাঁর চেতনার, চিন্তার ও জীবনদর্শনের সন্ধান মেলে। আদর্শ হিন্দু হোটেল, ইছামতী কিংবা অশনি সংকেতও কি অসচেতন, অসতর্ক, উদাসীন, দায়িত্বরিক্ত ও উদ্দেশ্যহীন কোনো লোকের অবসর বিনোদনের স্বাক্ষর মাত্র। বিভূতিভূষণ শহরবিমুখ ছিলেন না; কিন্তু গ্রামের প্রতি ছিল স্বভাবগত নস্টালজিয়া– প্রায় জীবনানন্দের মতোই। গ্রাম ভাঙছে, দারিদ্র্য বাড়ছে, শহর গড়ে উঠছে। গ্রামে উচ্ছন্ন বিরান ভিটে-বাড়ি অন্তরে যে দীর্ঘশ্বাস জাগায়, তা বিভূতি-রচনায় বিশেষ করে গল্পে সুলভ। আমরা বিভূতিভূষণকে ও তাঁর লেখাকে কখনো অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বীক্ষণ, পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ, সমীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করিনি। এ জন্যেই আমরা পাঠক মাত্রই বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে একটি সামান্যীকৃত ধারণা পোষণ করে এসেছি। বিশিষ্ট বলেছি, ভালো বলেছি কিন্তু বৈশ্বিক বৈচিত্র্যসচেতন আধুনিক শিল্পী বলতে দ্বিধা করেছি।

রুশতী সেন রচিত 'বিভূতিভূষণ: দ্বন্দ্বের বিন্যাস' নামের গ্রন্থে রয়েছে লেখকের ও লেখার অন্তরাত্মার বিশ্লেষণমূলক চারটি প্রবন্ধের সংকলন। গ্রন্থটি আমার মনে নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল জাগিয়েছে। তিনি সাহিত্য নয়, এর অন্তর্গত তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করেছেন। এ কারণেই সম্ভবত দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারছি যে রুশতী সেন বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে আমার অনুভবের, উপলব্ধির ও ধারণার পরিসর বাড়িয়ে দিয়েছেন।

তাঁর রচনাগুলো গতানুগতিক নয়। রুশতী সেন লেখকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান আরণ্য জীবনযাত্রা ও জীবিকা অর্জনের সংগ্রাম থেকে শুরু করে আরণ্যকের জঙ্গল-মহালের ভৌগোলিক অবস্থান এবং ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির বাস্তবতাও সরেজমিন পরীক্ষণের বিশ্লেষণের জন্যে শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন বিভূতি-সাহিত্যের বাস্তব জীবনলগ্নতা চোখে আঙুল দিয়ে পাঠককে দেখিয়ে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে। এ প্রয়াস নতুন এবং প্রশংসনীয়, রুশতী সেন জেনেছেন 'বিভূতিভূষণের থাকত শ্রবণের বিপুল সঞ্চয় আর অফুরন্ত দেখে যাওয়ার চোখ।' এবং বিভূতিভূষণ 'খণ্ড খণ্ড বিশেষকে ঘিরে জীবনভর তাঁর যে অভিজ্ঞতা, যে মুগ্ধতা, যে যন্ত্রণা, যে জিজ্ঞাসা তাকে শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্তিতে গেঁথে গেঁথেই তাঁর সাহিত্যিক উৎকর্ষের সীমাকে স্পর্শ করতে পেরেছেন'– এ-ই হচ্ছে রুশতী সেনের মত, মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত। কিন্তু তিনি যখন বলেন 'বিভূতিভূষণ তো এমনই শিল্পী যিনি ক্ষতের অভ্যন্তর থেকেই সেই ক্ষতের উপশম খুঁজতে চাইতেন। বিভূতিভূষণ তো এমনই সাহিত্যিক যে তিনি যখন যন্ত্রণাকে কি দ্বন্দ্বকে শিল্পে গেঁথেছেন, সে শিল্পেরও যেমন উদ্বৃত্ত, আবার যখন বানিয়েছেন উপশম, উপশমের শিল্পও তেমন উদ্বৃত্ত থেকে বিচ্যুত হয়নি,' তখন তাঁর উক্তি আমাদের কাছে কোনো পষ্ট ধারণা দেয় না বরং হেঁয়ালী হয়ে ওঠে।

আবার রুশতী সেন যখন বলেন, 'হাহাকারের নীরব-সরব ব্যঞ্জনায় বিভূতিভূষণ তাঁর সমকালীন সংসার সমাজ দেশের দীর্ঘ স্বরূপ দেখতেও পারেন, দেখাতেও পারেন' তখন সমঝদার পাঠক মাত্রই তাঁর সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করবেন। আমরা আগেই বলেছি বিভূতিভূষণের বাহ্য ঔদাসীন্য অন্তরের ঐকান্তিক নিষ্ঠাকে ও যন্ত্রণাকে এবং বাস্তবানুগত্যকে পাঠকের দৃষ্টি থেকে আবৃত করে রেখেছিল। বিভূতিভূষণ শুধু লেখাচিত্র ও রেখাচিত্র দিয়েছেন, মত-মন্তব্য-সিদ্ধান্ত কণ্টকিত করার মতো মনীষা বা বিজ্ঞতা প্রদর্শন ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। তিনি সে-তাৎপর্যে শহুরে সাহিত্যিক নন, কিন্তু অবশ্যই আধুনিক জীবনসচেতন ঔপনিবেশিক ভারতে প্রতীচ্য প্রভাবজ বিবর্তনধারার নিবিষ্ট নিরপেক্ষ কিন্তু বেদনাক্লিষ্ট রূপকার। আমরাও আগেই বলেছি বিভূতিভূষণ জীবনকে Struggle বলেই, Resistence বলেই জানতেন। Failure বা Compromise বলে মানতেন না। কেননা 'জীবনের প্রতি তাঁর ছিল মর্মান্তিক অনুরাগ' (রুশতী সেন)। বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাসগুলো বাহ্যত ভাষায় ভঙ্গিতে বয়ানে সাদামাঠা কিন্তু যন্ত্রণাগ্রস্ত দুঃখী মানুষের দুর্বহ জীবন চিত্রই যেন এক একটি, সেখানে সান্ত্বনা কেবল প্রকৃতিপ্রেম।

নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ, দরিদ্র অসহায় মানুষের মতো তরুলতাও ছিল বিভূতিভূষণের কাছে আত্মার আত্মীয় অচল প্রাণী। তাই দুস্থ মানবতাপ্রীতি ও প্রকৃতিপ্রেম বিভূতিভূষণে অভিন্ন হয়ে উঠেছে 'আরণ্যক'-এ। আরণ্যক এক অর্থে উনিশ-বিশ শতকের আরণ্য মানুষ ও প্রকৃতি বিষয়ক মহাকাব্য। তাই রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের চোখে এবং অনুভবে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপলব্ধিতে 'আরণ্যের কথা আর মানুষের কথা এক হইয়া গিয়াছে।' এখানে মানুষের ও তরুলতার যন্ত্রণা অভিন্নরূপে দেখেছেন লেখক।

রুশতী সেন 'আরণ্যপদ ও মানবগাথা' প্রবন্ধে তাঁর অনন্য বিশ্লেষণ শক্তি, তথ্যানুরাগ, মনোবিজ্ঞান প্রবণতা প্রভৃতি প্রয়োগে 'আরণ্যক' উপন্যাসের অসামান্যত্ব প্রমাণ করেছেন বলেই আমাদের ধারণা। তিনি লেখকের সঙ্গে লেখাকে এবং লেখার সঙ্গে লেখককে সম্পৃক্ত করেছেন, ফলে লেখা ও লেখক অভিন্ন মূল রশুনের মতোই আত্মজ ও আত্ম হয়ে স্বরূপে আত্মার প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'অনুবর্তনের বাদ-প্রতিবাদ' সম্বন্ধে আমাদের বলার কিছুই নেই, তবে রুশতী সেনের সন্ধিৎসায় ধৈর্যের, অধ্যবসায়ের ও তথ্যনিষ্ঠার এবং শ্রম ও সময় ব্যয়ের জন্যে তাঁর তারিফ করতেই হয়। 'একটি অনিবার্য মৃত্যু', 'ভাঙাবাড়ি' 'ভাঙাপেশা ভাঙাজীবন' এবং পরিশিষ্ট সম্বন্ধে আমাদের মত-মন্তব্য প্রকাশ করার মতো কোনো তথ্য সত্য ও তত্ত্ব জানা নেই বলে আলোচনায় অনধিকারী বলেই নিজেদের মনে করি।

তবে বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পরে অনেক প্রবন্ধে, বহু গ্রন্থে এবং গল্প উপন্যাসের সব ইতিহাসে, আলোচনা গ্রন্থে বহু বিচিত্র ভাষায় ভঙ্গিতে এবং দৃষ্টিতে বিভূতিসাহিত্য আলোচিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ধারণা রুশতী সেন লেখক ও লেখার সম্পৃক্ততা আত্ম ও আত্মজর সম্বন্ধের মতো করে জানা, বোঝা এবং শিল্পসাহিত্যরসের সঙ্গে মাটিলগ্ন বাস্তব জীবনের ছায়া দর্শন সম্বন্ধে আমাদের নতুন করে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। এবং তাই এ গ্রন্থ গুরুত্বপূর্ণ এবং রুশতী সেন অভিনন্দনের দাবিদার।

AMARBOI.COM

প্রশ্নোত্তরে কিছু আত্মকথা

[আহমদ শরীফ সম্প্রতি বাংলাদেশের এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাত, সাম্রাজ্যবাদ, মৌলবাদ, ফ্যাসিবাদ এবং স্বৈরতন্ত্র বিরোধী প্রতিটি আন্দোলনের পুরোধা তিনি। মুক্তিযুদ্ধে এবং এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক আহমদ শরীফের জন্ম ১৯২১ সালে চট্টগ্রামের সুচক্রদন্ডী গ্রামে। 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' (দুখণ্ডে) তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এছাড়া, 'মানবতা ও গণমুক্তি' 'সাম্প্রদায়িকতা ও সময়ের নানাকথা' 'স্বদেশ অন্বেষা' 'প্রত্যয় ও প্রত্যাশা', 'মধ্যযুগের সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা' 'কালের দর্পণে স্বদেশ', 'বাউলতত্ত্ব' 'বাঙালীর চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন আগে বাংলাদেশের মৌলবাদীরা তাঁর মৌলবাদবিরোধী ভাষণ ও নাস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন, তাঁর ফাঁসির দাবিতে পালিত হয়েছে হরতাল– তবু তিনি অবিচল, ঋজুতায় দেদীপ্যমান। তিনিই বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বুদ্ধিজীবী। অতি সম্প্রতি ঢাকায় তাঁর ধানমন্ডীর বাড়িতে টানা বারোদিন ধরে নেওয়া দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি টেপ রেকর্ডার থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলে দেওয়া হল। এর মধ্যে উঠে এসেছে এক পণ্ডিত ও দ্রোহীর আত্মপ্রতিকৃতি, তাঁর মনন ও মন, বোধ ও বোধির উজ্জ্বল আলোর দীপশিখা অনির্বাণ জ্বলছে নির্মল দীপ্রতায়। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন প্রথমা রায়মণ্ডল। উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কবিতীর্থ-২৫তম সংখ্যা, একাদশবর্ষ, জানুয়ারি ১৯৯৩ সন, কলিকাতা।]

পাঠকদের অবগতির জন্যে শুরুতেই দু'একটা প্রাথমিক প্রশ্ন রাখা হল

প্রশ্ন: আপনার ছেলেবেলা ও ছাত্রজীবন সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর: আমার জন্ম ১৯২১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী রোববার, চট্টগ্রামের পটিয়া থানালগ্ন সুচক্রদণ্ডী গ্রামের পৈত্রিক বাড়িতে।

আমি চিরকালই উঁচুমানের মাঝারি ছাত্র। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে (১৯৩৮) এবং অবশিষ্ট, বাদবাকীগুলোতে বিরতিহীনভাবে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছি। কাজেই কৃতীছাত্রের দাবিদার হওয়ার কোনো যোগ্যতা আমার ছিল না এবং অন্য কোনো ক্ষেত্রেও আমি কৃতিত্বের দাবিদার হতে পারিনি। সারাজীবন, সবক্ষেত্রেই আমি নিতান্ত মাঝারি।

প্রশ্ন: আপনার পারিবারিক দিক থেকে শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত পটভূমি কেমন ছিল? পারিবারিক কোনো ঐতিহ্য কি আপনার সাহসী মনন ও মুক্তচিন্তার কায়া গঠনে সহায়তা করেছে? যদি করে থাকে তবে তা কিভাবে?

উত্তর: আমার ছয় পুরুষ আগে থেকেই বাড়িতে লেখাপড়া চালু ছিল। তার প্রমাণ ১৭৬০-৬৫ সনের দিকে আমার সুচক্রদণ্ডী গ্রামের প্রথম পুরুষ কাদির রাজা কর্তৃক লিপীকৃত 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী' নামের কাজী দৌলতের রচিত কাব্যের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি। আমার ছয় পুরুষের মধ্যে অনেকেই স্বাধীনচেতা ও জেদী লোক ছিলেন। প্রমাণ : শুধু, বিরুদ্ধপক্ষের সঙ্গে জেদাজেদীর মামলা-মোকাদ্দমা নয়; বস্-এর বকুনিতে আমার পিতামহ জজ আদালতের কেরানী হিসেবে তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে চাকরী হারিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ তাঁর তখনকার বস্ আই ই এস খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ'র প্রতি উদ্ধত উক্তির জন্যে চাকরী হারাতে বসেছিলেন। তখন জনাব হবীবুল্লাহ বাহার ও শামসুন নাহার মাহমুদের মাতামহ খান বাহাদুর আবদুল আজিজের অনুরোধক্রমে পদচ্যুতি থেকে অব্যাহতি পান।

আমিও সারাজীবন কোনো তদ্বিরে বিশ্বাস করিনি। এবং জেদের বশে কারুর প্রতি আনুগত্যও প্রদর্শন করিনি। গোঁয়ার হিসেবে এখনও আমার দুর্নাম রয়েছে। স্পষ্টবাদিতা এবং মুখের ওপর সত্য কথা বলা আমার একটা অসৌজন্যমূলক সামাজিক দোষ।

প্রশ্ন: আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের দ্বারা আপনার জীবন কিভাবে এবং কতটা প্রভাবিত হয়েছে?

উত্তর: সাহিত্যবিশারদ সম্পর্কে আমার কাকা হলেও আবাল্য সন্তানবৎ তাঁর ঘরেই আমি বড় হয়েছি এবং সে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক আমৃত্যু তিনি বজায় রেখেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সততা, মানবতা, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি, মানবসত্তার মর্যাদাবোধ সম্ভবত পরোক্ষভাবে আমাকে প্রভাবিত করেছে। সচেতনভাবে কিছু অনুকরণ করেছি বলে মনে হয় না। তবে লেখার এবং বই পড়ার আগ্রহটা নিশ্চয়ই তাঁর এবং তাঁর গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল।

প্রশ্ন: আপনার ছাত্রজীবনে তখনকার শিক্ষাব্যবস্থা কেমন ছিল?

উত্তর: আমাদের সময়ে প্রাইমারী থেকেই ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়ার ব্যবস্থা ছিল। এবং আমাদের শেষ সময়েই বাঙলা মাধ্যম চালু হয়। শিক্ষিতের সংখ্যা সেকালে হিন্দুর মধ্যেও খুব বেশি ছিল না। আর মুসলমানের মধ্যে তখন শিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমে বেড়ে উঠছিল। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারই তার প্রমাণ।

প্রশ্ন: ছেলেবেলায় বা স্কুল জীবনে পাঠ্য বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে কি আপনার বিশেষ ঝোঁক ছিল? যদি থেকে থাকে তো সেই ঝোঁক বা প্রবণতা কি পরবর্তী কালেও বজায় থেকেছে?

উত্তর: স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি ক্লাসে যে কিছু মাতব্বর ছাত্র থাকে আমি তাদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই একজন ছিলাম। চট্টগ্রাম কলেজে আমি তখন মুসলমান ছাত্রদের একজন নেতা-ই ছিলাম। কিন্তু কোনো খেলা-ধুলায় আমার কোনো আগ্রহ-ই ছিল না। আমার চিরকালের আকর্ষণ হচ্ছে আড্ডাবাজীতে, তর্ক-বিতর্কে। এ কারণেই আমি Class Six/Seven-এর ছাত্রাবস্থাতেই স্কুলের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় এবং অন্যত্রও অংশ গ্রহণ করেছি। আমার জীবনের প্রথম বক্তৃতা দিই আমার গাঁয়েরই এক সামাজিক সভায় ইঁচড়েপাকা বালক হিসেবে; তখন না বুঝেও, শুনে শুনে গ্রাম্য টাউটদের নিন্দে করি। সে সভায় সভাপতি ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ আর শ্রোতা ছিলেন গাঁয়েরই মানুষজন। তারপর কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কখন যে কিভাবে বক্তা হয়ে উঠলাম, নিজেই স্মরণ করতে পারছি না। সে বক্তৃতা, কেউ ডাকলেই আজো দিয়ে থাকি এবং অভ্যাসদোষে, আমার নিয়মিত আড্ডায়ও অসতর্ক মুহূর্তে প্রায়ই বক্তা হয়ে উঠি।

প্রশ্ন: সমাজের প্রথাবদ্ধ সংস্কার, ধর্ম ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে আপনার বিদ্রোহ আপনি কিভাবে প্রকাশ করেন? এসব করতে গিয়ে আপনি যে একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্বে চিহ্নিত হচ্ছেন জেনেও...?

উত্তর: আমি চিরকালই একজন অবিমৃষ্যকারী ব্যক্তি। লাভ-ক্ষতির এবং নিন্দা-প্রশংসার কথা আমি কখনো আগে-ভাগে বিবেচনা করতে পারি না। কারণ মনেই জাগে না। এ কারণেই ভয় আমাকে, আমার চিন্তাকে আড়ষ্ট করতে পারে না। যা মনে জাগে তা কেবল মুখে উচ্চারণ করি না, আমার লেখায়ও এসে যায়। কিন্তু কারো দলে থাকি না বলে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থবশে কিছু করি না বলে সরকার আমাকে সহ্য করে। আমার শ্রোতা ও পাঠক আমার ওপর চটে থাকে বটে, কিন্তু যেহেতু আমি শক্তিহীন একজন সাধারণ ব্যক্তিমাত্র সেজন্যেই আমাকে সবাই সহ্য করে। তাছাড়া শিক্ষিত লোকের মধ্যে প্রবন্ধ পাঠকের সংখ্যা যেহেতু নিতান্ত নগণ্য, সেহেতু আমার সমাজ ও শাস্ত্রবিরোধী এক কথায় আস্তিক্যবিরোধী লেখাগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠক-শ্রোতার চোখ-কানের বাইরেই থেকে যায়। অতএব আমার নির্ভীকতা এবং স্পষ্টবাদিতা আমার অবিমৃষ্যকারিতারই প্রসূন।

প্রশ্ন: আপনি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন। যাকে জনবিরোধী বলে মনে করেছেন, তাকেই আঘাত করেছেন বরাবর। রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে এও জন্য আপনাকে সমালোচনা বা বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি কখনো? যদি হয়, কিভাবে?

উত্তর: আমি কখনো আমার কোনো লেখার বা বক্তৃতার অন্যায় সমালোচনার কিংবা ভুল ব্যাখ্যার প্রতিবাদ সাধারণত করিই না। কারণ আমি যা বলি বা লিখি তা আত্মপ্রত্যয়ী হয়েই লিখি। এবং মনে করি, এসব ক্ষেত্রে পরিণামে সত্য এবং তথ্যই কেবল টিকে যাবে। আর আমি কোনো রাজনৈতিক দলে থাকি না বলে আমার বিরূপ মন্তব্যেও অন্যদের ক্ষতি-বৃদ্ধির কারণ ঘটে না। তাই আমার কথার কোনো রাজনৈতিক গুরুত্ব দেয়া হয় না হয়তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। ব্যতিক্রম অবশ্য সবক্ষেত্রেই হয়।

প্রশ্ন: আপনার জীবনের একটা বড় সময় ব্যয় হয়েছে মধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্য অনুশীলন ও মূল্যায়নের কাজে এবং সে কাজের জন্যে আপনি সারা বাঙলায় আজো অদ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছেন। এ দুরূহ কাজে ব্রতী হবার সাহস ও প্রেরণা পেলেন কিভাবে?

উত্তর: আমার জন্ম হয় এক বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে। ১৯২২ সালে আমার জন্মের প্রায় বছর দেড়েক পরে আমার পিতা-পিতৃব্যরা আমার পিতামহ ও পিতামহী বেঁচে থাকা অবস্থায় পৃথগন্ন হয়ে যান। তখন অপুত্রক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এবং তাঁর স্ত্রী, আমার বড়ফুফু বদিউন্নিসা শূন্যঘর পূর্ণ রাখার জন্যে আমাকেই স্নেহে-যত্নে এবং অন্নে লালন করতে থাকেন। 'শিশু নেই ঘরে হাসি নেই/বুড়ো নেই ঘরে শ্রী নেই'– এ ধারণাবশে, বিশেষ করে সাহিত্যবিশারদ চিরকালই একটা না-একটা শিশু সকালে-বিকেলে কোলে-পিঠে না করে সুখ-স্বস্তি পেতেন না। এভাবেই আমার এক বড়বোন, দুই চাচাতো বোন এবং আমি ওঁদের ঘরে লালিত হই। ওঁরা মেয়ে বলে পরের ঘরে চলে গেলেন। আমি ছেলে বলে তাঁদের জীবিতকালে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী করি ১৯৫৩ সন অবধি তাঁদের স্নেহের পাত্র থেকেই ধন্য হই।

মোটামুটিভাবে ১৮৯৪ সন থেকে সাহিত্যবিশারদ প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহে-সংরক্ষণে, পরিচায়নে এবং সম্পাদনায় জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি ব্যয় করেছেন। তাঁর সেই নিষ্ঠার, সাধনার প্রভাব পড়েছিল হয়তো আমার অবচেতন মনেই। তাই তিনি যখন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র আগ্রহে শেষ জীবনে তাঁর সমস্ত পুঁথির সম্ভার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বিক্রি করতে নয়, নিঃশর্তে দান-ই করতে চাইলেন– আমি তখন পাকিস্তান রেডিও'র ঢাকা স্টেশনে কাজ করি। এবং আমার নিজের আগ্রহেই সাহিত্যবিশারদকে জানাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁথি পড়ুয়া কোনো লোক নেই। কাজেই তাঁরা যদি আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে শিক্ষক করে নেন, তাহলে পুঁথি পড়ার এবং চর্চার একজন লোক মিলবে। সে-সময়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(১৯৪৯-৫০) কোনো পদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্টি করা সরকারী অনুমতি সাপেক্ষ ছিল। সেজন্য আমাকে তক্ষুণি লেকচারার না করে কিছুকালের জন্যে রিসার্স এ্যাসিস্ট্যান্ট বা গবেষণা সহকারী রূপে নিযুক্ত করতে রাজি হলেন। আমিও সাহিত্যবিশারদের অসমাপ্ত কাজে সমাপ্তিদানের বিবেকীদায়িত্ববোধে এবং ভবিষ্যতে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগের আগ্রহে আর পদোন্নতির আশ্বাস পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলাম ১৮ ডিসেম্বর ১৯৫০-এ। নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কথা রাখতে পারেননি, আমাকে ছয়/সাড়ে ছয় বছর (মাঝখানে একবছর ছুটিজাত লেকচারার পদে কাজ করতে দিয়ে) রিসার্স এ্যাসিস্ট্যান্টের পদে আটকে রাখে– যদিও এ সময়েও আমি কিছু কিছু ক্লাস নিয়েছি, তবু অব্যাহত ও অবিচ্ছিন্নভাবে পুঁথি পড়ার, পাণ্ডুলিপি তৈরি করার এবং সম্পাদনা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। সে কাজ আমি ১৯৭৮ সন পর্যন্ত চালিয়ে গেছি। এখন শারীরিক কারণেই সে কাজ বাদ দিয়েছি।

আমার কোনো প্রবন্ধ কখনো অমনোনীত হয়ে কোথাও কোনো কাগজ থেকে ফেরত আসেনি। কলেজে পড়ার সময় থেকে আজ অবধি সমাজ, স্বদেশ, মানুষ এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমি অবিচ্ছিন্নভাবে বহু প্রবন্ধ লিখেছি। গবেষণামূলক প্রবন্ধও অনেক আছে। এভাবে হিন্দু-মুসলমানের গুরুত্বপূর্ণ পুঁথিগুলো সম্পাদনা ও প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে। আর অন্যান্য বিষয়ে লেখা প্রবন্ধ-সংকলন গ্রন্থগুলো প্রকাশিত হওয়ায় গ্রন্থ সংখ্যা হয়েছে অনেক। এরমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করেছি বলে মনে করি। তাহলো মধ্যযুগের দুই বাঙলার বাঙলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ও বিশ্লেষণমূলক ইতিহাস রচনা। আমার আগে অন্যদের রচিত সব ইতিহাস গ্রন্থ ছিল বিভিন্ন কবির রচনা– পরিচিতির দিক থেকে অসম্পূর্ণ।

AMARBOI.COM

প্রশ্ন: শিক্ষকতা ছাড়াও অতীতে অন্য কোনো পেশায় কি আপনি কখনো যুক্ত ছিলেন? শিক্ষকতাকেই কেন শেষ পর্যন্ত বেছে নিলেন?

উত্তর: বাঙলায় এম. এ. করেছিলাম বাঙলাসাহিত্য পড়তে ভাল লাগত বলে। যদিও ইতিহাস ও দর্শন আজো আমার প্রিয় পাঠ্য বিষয়। তাই শিক্ষকতা আমার প্রিয় পেশাই ছিল। প্রথম জীবনে আমি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সৃষ্ট Preventive Officer-এর চাকরী পাই। এবং তাতে যোগ দেয়ার আগেই এখনকার কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার অন্তর্গত নওয়াব ফয়জুন্নেসা ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজে মাসিক একশ' টাকার চাকরী নিয়ে প্রথম শিক্ষকতার স্বাদ গ্রহণ করি। পরে সেখানে সাড়ে তিন বছর থাকার পর ফেনী ডিগ্রী কলেজে ছয় মাস অধ্যাপনা করি। এরপর ১৯৪৯ সালের জুন মাসে রেডিও পাকিস্তান-এর ঢাকা কেন্দ্রে কর্মসূচী নিয়ামক হিসেবে কাজ করি। সেখান থেকে ১৯৫০ সালের ১৮ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে গবেষণা সহায়ক (Research Assistant) হিসেবে যোগদান করি এবং ১৯৮৩ সালে অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করি।

জীবনে অন্য পেশায় থাকলে হয়তো লেখক/গবেষক হতাম না। শিক্ষকতার পেশা আমাকে ঠকায়নি। অপরিমেয় অবসরঋদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষকতা আমাকে মধ্যযুগের কাব্য সম্পাদনার কঠিন শ্রম ও অধ্যবসায়সাধ্য কাজের সুযোগ দিয়েছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা লিখিতভাবে প্রকাশের সুযোগ, বক্তৃতা-বিবৃতি মাধ্যমে জনসেবার, জনগণকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করার সুযোগ ও সুবিধে। সর্বোপরি নিরুপদ্রব, নির্বিরোধ, নিরাপদ আনন্দিত জীবন উপভোগের সুযোগ পেয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদীর্ঘকাল শিক্ষকতা জীবনে। কাজেই এ পেশায় আমার দুঃখের কোনো কারণ ঘটেনি। আনন্দিত জীবনের স্মৃতি ও সঞ্চয় এ বার্ধক্যে রোমন্থন-সুখের সম্বল হয়ে রয়েছে।

এবার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে যাই

প্রশ্ন: সাম্প্রদায়িকতার বিষ ইদানীং মানুষের সম্পর্ককে তিক্ত করে তুলছে, সমাজদেহে গড়ে উঠছে বিভেদের প্রাচীর। এই বিষবৃক্ষের শিকড় কিভাবে এদেশের মাটিতে বিস্তার লাভ করেছে এবং কিভাবেই বা তা সমূলে উৎপাটন সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: আমি জানি এবং অন্য সবাই জানে আস্তিক মানুষমাত্রই স্বধর্মকে সত্য ও শ্রেষ্ঠ বলে জানে ও মানে। আর অন্যের যে কোনো ধর্মকে ভুলত্রুটিপূর্ণ অসম্পূর্ণ অথবা মিথ্যে বলে মনে করে। সে কারণে স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার এবং পরধর্মের অপকর্ষের দরুন বিধর্মের ও বিধর্মীর প্রতি ঘৃণা, অবজ্ঞা এবং অবিশ্বাস মনের মধ্যে কখনো জাগ্রত, কখনো সুপ্ত, কখনো বা গুপ্ত থাকে। যেমন আমার চেয়ে যে বিদ্যায়-বুদ্ধিতে-ধনে-মানে-শিক্ষায় হীন, তার প্রতি আমাদের মনের গভীরে একটা তাচ্ছিল্য থাকে। কিন্তু এইজন্যে তার প্রতি আমরা কখনো ঝগড়া-বিবাদ না হলে ঘৃণা-অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা কিংবা নিন্দা প্রকাশ করি না। তেমনি ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও কোনো বিশেষ কারণে, বিশেষ স্থানে ধর্মসম্পৃক্ত কোনো বিবাদ প্রাচীন ও মধ্যযুগে ঘটে থাকলেও তা ঘরোয়া জীবনে সংঘটিত ঝগড়া-বিবাদের মতোই স্বল্পক্ষণের মধ্যেই স্থানিকভাবে মিটে যেত, কখনো দীর্ঘস্থায়ী বা দুই ধর্ম-মতবাদীর মধ্যে বিস্তার লাভ করত না। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই ব্রিটিশ যখন স্থির করল যে তারা এদেশ শাসনও করবে, শোষণও করবে এবং বাণিজ্যও করবে, তখন তারা ভেদনীতির আশ্রয় নিয়ে হিন্দুস্থানী সব অমুসলমানকে হিন্দু এবং তুর্কী-মুঘল ও দেশজ মুসলিমকে মুসলিম নামে আখ্যাত করে বিকৃত ইতিহাস রচনায় ও প্রচারণার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক চেতনাবিষ নিষ্ঠার সঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে থাকে। অথচ তারা নিজেরা খ্রীস্টান হল না, ব্রিটিশই রইল। এই সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো যে ব্রিটিশেরই দান, তার প্রমাণ সতের শতকের শেষাবধি আমাদের দেশে মানুষ নিবাসের নামেই ছিল পরিচিত। যেমন মারাঠী, মদ্রাজী, গুজরাটী, দেহলভী, সমরখন্দী, বুখারী, পার্সী, ইংরেজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ফিরিঙ্গী কিংবা গোত্রীয় দিক থেকে কুষাণ, হূন, শক, খলজী, তুঘলক, লোদী, সৈয়দ প্রভৃতি নামে পরিচিত হত। কাজেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ব্রিটিশ শাসনের ভেদনীতির প্রত্যক্ষ অপদান। তাদের রোপা বিষবৃক্ষের ফল ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়ার ফলে আরো গভীর এবং ব্যাপকভাবে দেশের আবহাওয়াকে বিষাক্ত এবং মানবিক সম্পর্ককে আরো তিক্ত করে তুলছে।

সব মানুষ কখনো নাস্তিক হবে না, কাজেই প্রতিকারের চিন্তা সেভাবে করা যাবে না। সাম্প্রদায়িকতা বিলুপ্তির পথ তিনটি– এক. যথার্থ সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠন। দুই. সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং তিন. আঞ্চলিক ভিত্তিতে অর্থ-সম্পদে ঋদ্ধ হওয়ার জন্য জাত-জন্ম-ভাষা নির্বিশেষে আঞ্চলিক Confederation গঠন।

প্রশ্ন: সাম্প্রদায়িকতা বিলুপ্তির উপায় হিসেবে এইমাত্র আপনি সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠনের কথা বললেন। কিন্তু এই রাষ্ট্রিক সেক্যুলারিজম বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?

উত্তর: এ-যন্ত্র যুগে ও যন্ত্রনির্ভর জীবনে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের রাষ্ট্রের ভৌগোলিক ব্যবধান একেবারেই ঘুচে গেছে। ফলে পৃথিবীতে হেন রাষ্ট্র পাওয়া যাবে না যেখানে বিভিন্ন ধর্মের, রক্তের, গোত্রের, গোষ্ঠীর, স্বার্থের ও শ্রেণীর মানুষ কম-বেশি বাস করে না। শাহ্-সামন্ততন্ত্রের যুগে শাসকের বা সরকারের সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক ছিল কেবল লেন-দেনের, শাসক-শাসিতের, শোষক-শোষিতের, দাসের ও প্রভুর। সেখানে রাজধর্মই প্রাধান্য পেত। প্রজার মন-মত কিংবা তার আর্থিক বা মানসিক দুঃখ-যন্ত্রণা-বেদনার সঙ্গে রাজার যোগ ছিল না। আধুনিককালে প্রতিটি মানুষই সত্তার স্বাতন্ত্র্য, মূল্য ও মর্যাদা সচেতন। এযুগে প্রবলের বা সংখ্যাগুরুর কিংবা শাসকের মত-পথ-সংস্কৃতি ও শাস্ত্রিক আচার ভিন্ন মতের-পথের মানুষের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া চলে না। সে-জন্যেই আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তথা সরকার ও শাসনব্যবস্থা চালু রাখা আবশ্যিক ও জরুরি।

সেক্যুলারিজমের তাৎপর্য হচ্ছে এই– আস্তিক বা বিশেষ ধর্মমতের লোকের দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হলেও কোনো ধর্মের অস্তিত্ব সরকার কথায় ও কাজে এবং আচরণে স্বীকারই করবেন না। ধর্ম আছে কি নেই– সে বিষয়ে কোনো মত ও মন্তব্য প্রকাশই করবেন না। সরকার যে-কোনো ধর্মবিশ্বাসের ধর্মীয় পালা-পার্বণ সম্পর্কে থাকবেন উদাসীন এবং নিরপেক্ষ। আর সে কারণেই সরকারী লোকেরা সরকারের পক্ষে ধর্মীয়-সামাজিক পালা-পার্বণে যোগ দেবেন না। রাষ্ট্রের সরকার এবং প্রশাসকেরা আঁধা-কানা-খোঁড়া, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধন, জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস নির্বিশেষে মানুষকে কেবল মানুষ হিসেবে জানবে, বুঝবে এবং মানবে। তার যোগ্যতা হিসেবে তাকে কাজ দেবে অথবা কাজে অসমর্থ হলে তাকে ভাতা দেবে। সব মানুষকে সমান নাগরিকের মর্যাদা দেবে।

প্রশ্ন: বিচ্ছিন্নতাবাদ ও মৌলবাদ– ভারতীয় উপমহাদেশে এখন প্রধান সমস্যা। এ দুই অশুভ শক্তির মোকাবিলা করা কিভাবে সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: মৌলবাদ কথাটি একালে ফরাসী-মার্কিন-ইংরেজদের সৃষ্ট। শব্দটির আক্ষরিক অভিধা ভালই। শাস্ত্রের মূল শিক্ষার বা বাণীর বা দেশনার অনুগত থাকাই হচ্ছে মৌলবাদ। এখন রাজনীতিক কারণে মৌলবাদ ধর্মান্ধতা, পরমত অসহিষ্ণুতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা নির্দেশক হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ-শব্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন নিন্দা, ঘৃণা ও ধিক্কারব্যঞ্জক। শব্দটির উৎপত্তি ইংল্যান্ডে হলেও কাজে লাগিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। এশিয়া ও আফ্রিকায় তার রাজনীতিক প্রভাব সুষ্ঠু ও দৃঢ় রাখার মতলবে বিভিন্ন ধর্মীয় দলকে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ্বে ও সংঘর্ষ-সংঘাতে বিভক্ত রাখাই এর লক্ষ্য। এবং তাতে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সফলও হচ্ছে। কাজেই মৌলবাদ এখন প্রকৃত অর্থে ধর্ম সম্পৃক্ত নয়, রাজনীতিক প্ররোচনায় উদ্ভূত।

এ যুগে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় যন্ত্রের দ্রুত উদ্ভাবনের, আবিষ্কারের ও নির্মাণের ফলে জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষ করে তার-বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে খোলা আকাশের বায়ুবাহী হয়ে ঘরে-বসা মানুষের পৃথিবীর সর্বপ্রকার চিন্তা-চেতনা এবং ঘটনা চোখে-কানে-মনে জাগ্রত মুহূর্তে ক্ষণে ক্ষণে ধরা দিচ্ছে। ফলে দাসত্বে ও আনুগত্যে চির অভ্যস্ত পৃথিবীর অজ্ঞ-নিরক্ষর মানুষেরা আকস্মিকভাবে এই যন্ত্রনির্ভর জীবনে প্রায় আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। তাদের জেগেছে স্বসত্তার, মূল্য ও মর্যাদাবোধ। ফলে গৌষ্ঠীক-গৌত্রিক-ভাষিক-আঞ্চলিক এবং বার্ণিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার চেতনা তাদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। এ জন্যেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতার স্বাদ পেতে চায়। এ কারণেই আমার ধারণা রাশিয়ার মতো, কুর্দীদের মতো ভারতে-চীনে-পাকিস্তানে-যুগোস্লাভিয়ায় এবং পৃথিবীর আরো কয়েকটি এরূপ গৌষ্ঠীক-গৌত্রিক-বার্ণিক ও ধার্মিক সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতার সংগ্রাম প্রতিরোধ করা যাবে না।

www.amarboi.com

প্রশ্ন: এইরকম বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কোনো রাষ্ট্রের টিকে থাকা কি আদৌ সম্ভব?

উত্তর: না, আমি তা মনে করি না। একালে অর্থাৎ যন্ত্র যখন পৃথিবীকে একটা বাজারকেন্দ্রী জনপদে পরিণত করেছে, একই বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে পণ্য বিনিময় আবশ্যিক ও জরুরী করে তুলেছে, তখন স্বাধীন ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলোর বিচ্ছিন্নতায়, স্বাতন্ত্র্যে বাঁচা কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই একালে সম্ভব হচ্ছে না, হবে না। তাই আঞ্চরিকভাবে Confedaration তৈরি করে বহু রাষ্ট্রের একত্রে সহযোগিতায় সহাবস্থান করতেই হবে। অতএব প্রথমে বিচ্ছিন্নতা ও স্বাধীনতা এবং পরিণামে গরজে পড়েই বিভিন্ন সমকক্ষ রাষ্ট্রের সহযোগিতামূলক শিথিল Confedaration গড়ে উঠবে বলে আমার ধারণা। পৃথিবীতে একালে মিশরের গামেল আবদুল নাসের-ই এরূপ আরব রাষ্ট্রের সংহতির স্বপ্ন দেখতেন। এখন যেমন ন্যাটোজোটের য়ুরোপীয় Common মার্কেট গড়ে উঠছে এবং বিস্তৃতি লাভ করছে এবং একক মুদ্রাব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব বিবেচিত হচ্ছে বাঁচার তাগিদেই।

প্রশ্ন: ধর্ম সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

উত্তর: নৃবিজ্ঞানীরা এবং দার্শনিকেরা বলেন, ভয় থেকেই ভগবানের উৎপত্তি। আত্মরক্ষার প্রয়াসে অজ্ঞ-অসহায় মানুষের বিস্ময়-কল্পনা-ভয়-ভরসাজাত বিশ্বাস-সংস্কার থেকেই ভূত-প্রেত-পিশাচ-যক্ষ-রক্ষ-ড্রাগন প্রভৃতি মিত্র ও অরিদেবতা শক্তির অস্তিত্বচেতনার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে। মন্দ এবং সৎ শক্তির প্রতীকরূপে অরি ও মিত্রদেবতার উদ্ভব। আদি ও আদিম মানবের সর্বপ্রাণবাদ, যাদু বিশ্বাস, টোটেম-ট্যাবু সংস্কার প্রভৃতির ক্রমবিকাশে মনন-মনীষার উৎকর্ষের ফলে মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেশ্বরবাদী এবং নাস্তিক হয়েছে। আর সমাজ মানুষকে দেশনা দানের, বিধি-নিষেধ নির্দেশ করার নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজের অলিখিত সমষ্টির নাম হল শাস্ত্র। পরে সেগুলো লিখিতরূপ পেয়ে যায়। জন্মমুহূর্ত থেকে পারিবারিক এবং সামাজিক প্রতিবেশে মগজধোলাই হয় বলেই বিশেষ করে আত্মার অস্তিত্বে এবং অমরত্বে আস্থাবান মানুষের পরলোকে প্রসৃত জীবনচেতনাই তাকে সারাজীবন আস্তিক রাখে। আসলে আজ অবধি কোনো মানুষ সৃষ্টি-স্রষ্টা-আত্মা সম্পর্কে কিছুই জানেও না, বোঝেও না, কেবল অনুমানে এবং আন্দাজে এসবের অস্তিত্বে আস্থা রাখে। প্রমাণ– ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, নারী কি পুরুষ, তার স্থিতি কোথায়, তার সৃষ্টির, আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কি– এ সম্পর্কে পৃথিবীর কোনো দুটো শাস্ত্রের, কোনো দু'জন মনীষীর বা দার্শনিকের মধ্যে ঐক্য নেই। বরং মতের ও সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য ও বৈপরীত্বই বেশি। এ কারণেই শুরু থেকে এ পর্যন্ত দেশে-দেশে, কালে-কালে ধর্মমতের জন্ম-মৃত্যু, উদ্ভব এবং বিলুপ্তি ঘটেছে। এবং বারবার পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়েছে– মতৈক্য মেলেনি কোথাও। এতেই বোঝা যায় স্রষ্টা, সৃষ্টি এবং শাস্ত্রতত্ত্ব দেশে-দেশে, কালে-কালে সামাজিক প্রয়োজনে বা যৌথজীবনে সহযোগিতায় ও নির্বিরোধ-নির্বিবাদ-নিরুপদ্রব-নির্বিঘ্ন-নিরাপদ সহাবস্থানের গরজে মানবহিতৈষী মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিরা দেশে-দেশে, কালে-কালে, দেশ-কালের প্রয়োজনে তৈরি করেছেন।

AMARBOI.COM

প্রশ্ন: বিশ্বমানবাত্মার মুক্তির জন্য আপনি কোন রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষপাতী? বিশ্বজুড়ে যে সমাজতন্ত্রের দেউটি এখন নিভন্তে বসেছে, তা কি মার্কসবাদের তত্ত্বগত ভ্রান্তির পরাজয়ে, নাকি নেতৃত্বের সঙ্কট?

উত্তর: পৃথিবীতে প্রাগ্রসরতম চিন্তা-চেতনার ফসল হচ্ছে মার্কসবাদ। এর থেকে উৎকৃষ্ট কোনো মতবাদ বা পদ্ধতি তো উদ্ভাবিত হয়ইনি, মার্কসবাদের সমান বিকল্পও এ মুহূর্তে কল্পনাতীত। সেজন্যে ত্রুটি মার্কসবাদের নয়, মার্কসবাদীদের প্রশাসনিক অযোগ্যতার, চরিত্রের এবং বিভিন্ন রকমের দুর্নীতির, অব্যবস্থার বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হয়েও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমন কি শুধু অস্ত্রে নয়, আকাশ প্রতিযোগিতায়ও অবতীর্ণ হওয়ার ফলে বঞ্চিত জনগণের দ্রোহ মার্কিন ও তার চেলা রাষ্ট্রগুলোর প্ররোচনায় ত্বরান্বিত হল। পূর্ব য়ুরোপ ও রাশিয়া ভাঙল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন ভাঙারও পাঁয়তারা করছে বিগত কয়েক বছর ধরে।

আমি মনে করি শাহ্-সামন্ত-বেণে শাসনে কোনো মানুষরই বেঁচে থাকার, কাজ পাওয়ার, অসমর্থের ভাতা পাওয়ার জন্মগত অধিকার স্বীকৃত নয়। এক কথায় মার্কসবাদের নতুনত্ব ও গুরুত্ব এই যে, মা-বাপের যেমন সন্তান লালন-পালন অবশ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য, তেমনি রাষ্ট্রবাসী-সক্ষমজনগণকে জীবিকা অর্জনের সুযোগ করে দেয়া এবং অক্ষমদের ভাতা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বই হচ্ছে রাষ্ট্রের ও সরকারের। বাঁচার অধিকার হচ্ছে জন্মগত অধিকার। রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে ভাতে-কাপড়ে বাঁচিয়ে রাখা। আড়াই হাজার বছর আগে একবার বর্ধমান মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ মশা-মাছি-কীটপতঙ্গ থেকে তিমি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতির সহাবস্থানের অধিকার স্বীকার করেছিলেন। আর কার্ল মার্কস মানুষ নির্বিশেষের বাঁচার অধিকার ঘোষণা করেছিলেন গত শতকে।

আমার যুক্তি এবং বুদ্ধি অনুসারে মানুষ পৃথিবীর সর্বত্র সমাজতন্ত্র চালু করবার আন্দোলনে নামবে অদূর ভবিষ্যতে। কেননা বাঁচার এবং বাঁচানোর জন্যেই আর্থিক সুবিচারের ব্যবস্থা রাখতেই হবে এবং সে সুবিচার সম্ভব কেবল পণ্যের উৎপাদনে-নির্মাণে-বন্টনে, দেশি এবং বিদেশি বাজারে চালানোর ওপরেই নির্ভরশীল এ-যন্ত্রযুগে। এবং সমবেতভাবে প্রতি রাষ্ট্রেরই জাতীয় স্তরে সম্পদ বৃদ্ধির অনবরত প্রয়াস চালাতে হবে।

প্রশ্ন: আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে একজন বুদ্ধিজীবী হিসেবে আপনি আপনার দায়িত্ব কিভাবে পালন করেছিলেন? ঐ সময়ে বাঙলা ভাষা নিয়ে সরকারী অপপ্রয়াস রোধে আপনার ভূমিকা কি ছিল?

উত্তর: আমি চিরকালই দেশের ও জনগণের স্বার্থের প্রশ্নে সব সময়েই সরকার-বিরোধী। বাঙলা ভাষার পক্ষে আমি লিখেছি। আমার বিভিন্ন প্রবন্ধ সংকলনের বেশি কিছু প্রবন্ধেই, ভাষাই যে জাতীয়তার ভিত্তি, তা নানাভাবে পরিব্যক্ত করেছি। আইয়ুব খাঁর শাসনের দশ বছরের মধ্যে আমরা তমদ্দুনওয়ালাদের সর্বপ্রকার প্রভাব তথা ইসলামী সংস্কৃতি ও ইসলামপন্থী সাহিত্যের প্রভাব খর্ব বা বিলুপ্ত করে ভাষায় সংস্কৃতিতে এবং সাহিত্যে প্রগতিশীল ও প্রাগ্রসর সেক্যুলার চিন্তা-চেতনার প্রচার ও বিকাশ ঘটিয়েছি। আমার নিজের সেই সময়কার প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থগুলোই আমার ভূমিকার ও মনন-চিন্তনের সাক্ষ্য-প্রমাণ বহন করে। সেই সময়কার বিচারপতি হামাদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে আমরা বিবৃতি ও বক্তৃতা দিয়েছি। এবং যখন বাংলা একাডেমীর ব্যবস্থাপনায়, আইয়ুব খানের শাসনামলে তার অগ্রগতির দশ বছর উৎসব পালন করা হচ্ছিল সপ্তাহকালব্যাপী, তখন আমি, সিকান্দার আবুজাফর, হাসান হাফিজুর রহমান 'মহাকবি স্মরণোৎসব' নাম দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে উক্ত স্মরণোৎসবের পরোক্ষ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠি। তারপর উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের সময় আমরা মেঠোবক্তৃতায়, কাগজে বিবৃতিতে এবং মিছিলে যোগ দিই। এভাবে যে আন্দোলনের শুরু তা লঘু-গুরুভাবে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠা অবধি চলে।

উল্লেখ্য যে লেখকদের প্রলুব্ধ করে বশে রাখার জন্যে আইয়ুব খাঁ প্রথমে যে 'Writers Guild' করেছিলেন, তাতে আমি প্রথম তিন বছর যোগ দিইনি। পরে যখন ওটা সরকার বিরোধী হয়ে ওঠে, তখন আমি 'Writers Guild'-এ যোগ দিই এবং তার কোষাধ্যক্ষ হই। এই সময়ে সিকান্দার আবুজাফর, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ 'Writers Guild' এর পরিচালনামণ্ডলীতে ছিলেন।

প্রশ্ন: জাতিভেদ এবং জাতপাতের রাজনীতি সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি? মানুষ কিভাবে জাতপাতের আধি থেকে মুক্ত হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: আমি জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-নিবাস-ভাষা প্রভৃতি কোনো কিছুর মূল্য ও পরিচিতি স্বীকার করি না। আমি মনে করি, জাতপাত প্রভৃতির উর্ধ্বে উঠে বৈশ্বিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবচেতনা অর্জনের ও দানের জন্যে কেবল নির্বিশেষ মানুষ হিসেবে ভাবতে হবে। তার প্রথম পরিচয় সে মানুষ, তার শেষ পরিচয়ও সে মানুষ। ইহুদী-খ্রীস্টান-হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান থাকা মানুষের লক্ষ্য হতে পারে না। মানুষ হওয়াই তার লক্ষ্য বলে আমি মনে করি। এবং এ জন্যে আজ অবধি আমি তিনটে পন্থার অন্তত যে-কোনো একটি গ্রহণীয় বলে মনে করি– (১) স্রষ্টা স্বীকার করেও শাস্ত্র না মানা; (২) নাস্তিক হওয়া; এবং (৩) কম্যুনিস্ট বা সাম্যবাদী কিংবা ইহজাগতিক সর্বপ্রকার পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে সেক্যুলার হওয়া।

মানুষের সেবা করতে হলে মানুষকে ভালবাসতে হয়। যারা মানবপ্রেমী নয়, অথচ মান-যশ-অর্থ-সম্পদ-খ্যাতি-ক্ষমতার জন্যে দেশসেবী রাজনীতিক হয়, তারা সবসময়ে নিজ নিজ স্বার্থেই ভোট জোগাড়ের লক্ষ্যে অধিকাংশ ভোটারের মন জোগানোর মতলবে থাকে। তারাই জাতপাত ও সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব জাগিয়ে সুযোগ-সুবিধে সৃষ্টি করে, ফায়দা লোটে এবং দাঙ্গা বাধায়।

প্রশ্ন: আশির দশকে বাঙলাদেশের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে রবীন্দ্রমূল্যায়ন করতে গিয়ে আপনি একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্বে চিহ্নিত হয়েছিলেন। আপনি কি মনে করেন আপনার ঐ মূল্যায়ন যথার্থ? অথচ আইয়ুবী আমলে রবীন্দ্রনাথ যখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আক্রান্ত হয়েছিলেন তখন তো আপনিই রবীন্দ্রপক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। তাহলে পরবর্তীকালের মূল্যায়নে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি কেন গ্রহণ করলেন?

উত্তর: দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কাজেই স্বাধীনতা-উত্তরকালে ইসলাম, মুসলিম এবং ইসলামী সংস্কৃতিপ্রীতি অবাঞ্ছিতভাবে বেড়ে যায়। এবং সে-পরিমাণেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতভীতি ও হিন্দুবিদ্বেষ বাড়তে থাকে। তখন 'হিন্দু রবীন্দ্রনাথকে'ও নানাভাবে বাদ দেয়ার ষড়যন্ত্র চলে, সৈয়দ আলী আহসানের সেই কুখ্যাত উক্তি এখানে স্মর্তব্য। শুধু তা নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীত তখন সরকারীভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথকে মহান মানবতাবাদী হিসেবে বাঙলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করেছি আমি লিখিতভাবে আমার ৫/৭ টি প্রবন্ধের মাধ্যমে। ঐসব প্রবন্ধে আমি রবীন্দ্রনাথকে মানবতার ধারক-বাহক ও প্রচারক হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁর সাহিত্যকে আমাদের বুর্জোয়া মনের বিকাশের জন্যে আবশ্যিক ও জরুরি বলে মন্তব্য করেছি।

কিন্তু বাঙলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যখন সরকার ও সংবিধান সমাজতন্ত্রকে অঙ্গীকার করে নিল এবং রবীন্দ্রনাথকে আমাদের মুক্তিসংগ্রামের প্রেরণার উৎস বলে স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমানও স্বীকার করে নিলেন, কেবল তখনই আমি প্রতিবাদ উচ্চারণ করলাম: 'রবীন্দ্রনাথ সমাজতন্ত্রবাদী সংগ্রামীর প্রেরণার উৎস হতে পারেন না– তিনি আমাদের ঐতিহ্য, এ ক্ষেত্রে সম্পদ নন। আমাদের প্রেরণার উৎস সুকান্ত।' এ কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলাম বাঙলাদেশ টেলিভিশনের এক অনুষ্ঠানে। কারণ আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ সুশাসন চাইতেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ব-শাসন চাননি। এবং জাতীয়তা ও স্বাধীনতার কথা তাঁর রচনায় দুর্লক্ষ্য। আর তিনি কম্যুনিজমে বা সমাজতন্ত্রে আস্থা রাখতেন না। কাজেই সমাজতন্ত্রকামীর সংগ্রামের বা মুক্তিযোদ্ধার তিনি প্রেরণার উৎস হতেই পারেন না। তাছাড়া অসামান্য-অনুপম কবি মনীষী হলেও রবীন্দ্রনাথ যে একজন আস্তিক রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন, স্বপ্নে-প্ল্যানশেটে এবং তিথি-লগ্নের শুভাশুভে আস্থা রাখতেন সেই রক্তমাংসের ব্যক্তিটিকে নিখাদ-নিখুঁত-নির্দোষ গুরুদেবতা করে তুলে স্তুতি-প্রশস্তি করা আমি কখনো সমর্থন করতে পারিনি। তাই যখন ঢাকার কম্যুনিস্টেরাও রবীন্দ্র-স্তাবকতায় মুখর হয়ে উঠল, তখন আমি দুই বঙ্গেরই রবীন্দ্র-অন্ধভক্তদের এবং কম্যুনিস্টদের জানিয়ে দিতে চাইলাম যে রবীন্দ্রনাথ সত্তর বছর বয়সে কোলকাতায় কম্যুনিস্টদের প্রাবল্য দেখে গণমানবচেতনায় ও সহানুভূতিতে ওদের সঙ্গে তাল ঠুকে চলতে চাইলেন। অথচ জমিদার হিসেবে কিংবা লেখক হিসেবে পদ্মাপারের ভাগ্যহত মানুষদের প্রতি কোনো সহানুভূতি তাঁর আচরণে ও লেখায় প্রকাশ পেয়েছে বলে প্রমাণ নেই। ত্রিশের দশকে কবিরা একবার, পঞ্চাশের দশকে কম্যুনিস্টরা আর একবার রবীন্দ্রনাথের সীমাবদ্ধতার কথা কিছু কিছু বলতে চেয়েছিলেন। আশির দশকে আমি এসব কথা বলতে গিয়েই নতুন করে রবীন্দ্রভক্তদের ধিক্কারের পাত্র হলাম মাত্র। ভক্তরা পীর-গুরু-নেতার কোনো দোষ দেখে না। আমি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দোষে-গুণে মানুষ অথচ অনন্য-অসামান্য শক্তিধর কবি-মনীষী রবীন্দ্রনাথকে জানতে বুঝতে চেষ্টা করেছি মাত্র। এবং আমার সবকথাই ছিল তথ্যনির্ভর।

প্রশ্ন: কোন যুক্তির ভিত্তিতে বঙ্কিমকে আপনি অসাম্প্রদায়িক বলতে চান? বঙ্কিম সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন আমরা জানতে আগ্রহী। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বিপন্ন বঙ্কিমকে টিকিয়ে রাখতে কিংবা তুলে ধরতে আপনার ভূমিকা কি ছিল?

উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স অবধি নাস্তিক ছিলেন। শোভাবাজারের রাজবাড়িতে হেস্টির (স্কটিশচার্চের) হিন্দুকে ও হিন্দুয়ানীকে বিদ্রূপ করতে শুনে হিন্দুসন্তান বঙ্কিমের আত্মসম্মানে ঘা লাগে। মুখ্যত হিন্দুশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য তুলে ধরার অভিপ্রায়ে তিনি শাস্ত্রচর্চা শুরু করেন। ফলে তিনি ভক্তিবাদী-আস্তিক নন কেবল– হিন্দু ধর্মই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে থাকেন। আর এর ফলেই তাঁর মধ্যে হিন্দুজাতীয়তাবাদ প্রবল হয়ে ওঠে। এবং তাঁর জীবনের শেষ বারো বছর তিনি হয়ে উঠলেন হিন্দুর ও হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণবাদী। স্ব-জাতিপ্রীতিই তাঁর ভাব-চিন্তা-কর্মের প্রেরণা জুগিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে বিশ শতকের তৃতীয় দশকের আগে ভারতবর্ষে হিন্দুজাতি, মুসলমান জাতি এবং খ্রীস্টান জাতি ছিল। এগুলো সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচিত হত না। কেননা দৈশিক ও রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ জাগানোর চেষ্টা করে গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসই। এ তাৎপর্যে উনিশ শতকের লেখক বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িক লেখক বলা চলবে না। এই অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক ছিলেন না, ছিলেন হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী। তাছাড়া তিনি মানুষকে ভালবাসতেন এবং মানুষকে মানুষ হিসেবে তাঁর সাহিত্যে গ্রহণ করেছিলেন। এজন্যেই কুন্দনন্দিনী-রোহিণী-হীরা-সীতারাম-জেবউন্নিসা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শৈবলিনী তাঁর মানবিক সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র যে সাম্প্রদায়িক ছিলেন না তার মুখ্য প্রমাণ তাঁর 'প্রবন্ধাবলী' তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর', তাঁর 'লোকরহস্য' এবং 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে শুরু করে সব উপন্যাস। অবশ্য বাস্তবে হিন্দুয়ানী প্রমাণের জন্য 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' এ দু'টি উপন্যাস এক্ষেত্রে বাদ যাবে। আর 'রাজসিংহ' উপন্যাসটি হিন্দুর বাহুবল প্রদর্শনের জন্যে লিখিত হলেও শেষাবধি মবারকের বাহুবলই প্রাধান্য পেয়েছে– অতএব পরিণামে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। আর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি গোড়াতে ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচার লক্ষ্যে শুরু হলেও চাকুরে বঙ্কিমচন্দ্র চাকরী রক্ষার খাতিরে তাকে নেড়ে মুসলমান তুর্কী-মুঘল বিতাড়ন চিত্রে পরিণত করে এবং ইংরেজ তোষণে সমাপ্তি দান করে নিজেই নিন্দিত হয়েছেন একালের হিন্দুর কাছেও। যদিও এরই জন্যে 'ঋষি' হয়েছিলেন বিপিন পাল-অরবিন্দ'র কাছে এবং স্বীকৃত হয়েছিলেন বাঙালী মাত্রেরই কাছে।

প্রায় সব মুসলমানই না পড়েই শতবছর ধরে শুনে শুনেই বঙ্কিমকে মুসলিম বিদ্বেষী বলে জানে ও মানে। তাই প্রথম দিকে পাকিস্তানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্কিম'-পড়ানো অনেকের কাছে আপত্তিকর ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখককে কোনরকমেই বাদ দেয়া সম্ভব হয়নি। আমার 'বঙ্কিমবীক্ষা' এবং আরো অনেকগুলো প্রবন্ধে আমি বঙ্কিম-সাহিত্যের বিভিন্ন স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

পূর্ব পাকিস্তানে এবং বাঙলাদেশে আমিই প্রথম বঙ্কিম সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখি। পরে কেউ কেউ লিখেছেন। এক হিসেবে রবীন্দ্র ও বঙ্কিমচর্চা তখন প্রায় বন্ধই ছিল। আমি এ দু'জন সম্পর্কে অধিকসংখ্যক প্রবন্ধ সে সময়ে লিখেছি।

AMARBOI.COM

প্রশ্ন: 'অপসংস্কৃতি' শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে আজকাল মতভেদ দেখা দিচ্ছে। 'অপসংস্কৃতি' কথাটিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর: প্রথম কথা, কোনো চিন্তা-চেতনা-আচরণ নতুন হলেই অপসংস্কৃতি প্রসূন বলে মনে করা চলে না। কেবল অকল্যাণকর হলেই– তা অবশ্য রুচি-মন-মত ও সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ, তাকে সাধারণভাবে অপসংস্কৃতি বলে কিছুদিনের জন্যে আখ্যাত করা চলে। কারণ কোন রীতি-রেওয়াজ, নীতি-নিয়ম, প্রথা-পদ্ধতি সমাজে চালু হয়ে গেলে এবং ব্যক্তি মানুষের চোখ-সহা, মন-সহা এবং গা-সহা হয়ে গেলে অর্থাৎ মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গেলে তা আর অপসংস্কৃতি থাকে না।

কোথাও কোথাও রক্ষণশীলতা, যেমন শাস্ত্রিক আচার ক্ষেত্রে পরিবর্তন অপসংস্কৃতি বলে চোখে ঠেকে। যেমন স্যুট পরা একজন পূজারী বামুনের ঠাকুরঘরে উপস্থিতি অথবা স্যুটপরা একজন ইমামের মসজিদে ইমামতি। ঐ দুটোকে এখনো জনসাধারণ অপসংস্কৃতি বলে আখ্যাত করবে। যেমন এক সময়ে সহশিক্ষা কিংবা অফিস-আদালতে নারীর অবাধ বিচরণকে অপসংস্কৃতি বলে অভিহিত করা হত; এখন তা হয় না। উল্লেখ্য এক সময়ে ঠাকুরবাড়ির বউ-ঝিদেরও পালকীতে পুরে গঙ্গাস্নান করানো হত পুরোনো সংস্কৃতি রক্ষার অজুহাতে। এখন বোরখা পরা এবং পালকীতে পুরে গঙ্গাস্নান– দুইই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপসংস্কৃতির সাক্ষ্য হিসেবে নিন্দিত হবে। অতএব নতুন হলেই অপসংস্কৃতি হয় না– কেবল চোখসহা-মনসহা-গাসহা না হলেই ঐ অভিধায় অভিহিত হয় মাত্র।

প্রশ্ন: একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আপনি কোথায় ছিলেন, কেমন ছিলেন এবং সে সময়ে কিভাবে আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন?

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ারও আগে ১৯৬৯-এর দুর্বার গণ-আন্দোলনের কাল থেকে বক্তৃতা, বিবৃতি ও মিছিল মাধ্যমে আন্দোলনকারী হিসেবে সাধ্যমত আমি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি। এবং ১৯৭১-এর মার্চ মাসে শিক্ষক-লেখক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে শহীদ মিনারে শপথবাক্য পাঠ করানোর মাধ্যমে ভাবী মুক্তি আন্দোলনে ও যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করবার চেষ্টা করেছি এবং মার্চ মাসের তেইশ বা চব্বিশ তারিখে 'ভবিষ্যতের স্বাধীন বাঙলা' নামের সেমিনার অনুষ্ঠানে প্রধান ভূমিকা পালন করেছি। 'ভবিষ্যতের বাঙলা' নামে একটা ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম। পরবর্তীকালে আমার কোনো বইয়ে সেটি সংকলিতও হয়েছে। ২৫ মার্চ রাত্রে ন'টা সাড়ে ন'টার সময়ে পাকিস্তানী বাহিনীর আকস্মিক হামলার প্রস্তুতির খবর আমার দুই আত্মীয়ের থেকে ফোনে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঐ দুর্যোগের মধ্যেই লোক পাঠিয়ে সলিমুল্লাহ হল এবং ইকবাল হল-এর ছাত্রদের সম্ভাব্য হামলার খবর জানাই। এই হল মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আমার শেষ কর্তব্য পালন। তারপর আমার স্ত্রী-পুত্র এবং আত্মীয়-স্বজনেরা আমার সর্বপ্রকার পরনির্ভরতার, আনাড়িপনার, অজ্ঞতার ও অসহায়তার বিষয় তাঁদের জানা ছিল বলে, তাঁরা আমাকে অন্য অনেকের পরামর্শ ও সহায়তা দানের আগ্রহ সত্ত্বেও আমাকে দেশের সীমান্ত অতিক্রম করতে দেননি। ফলে আমাকে ঢাকা শহরে আত্মীয়-স্বজনের বাসায় জায়গা বদল করে নয় মাস ধরে আশ্রিত থাকতে হয়েছে। ১৭ ডিসেম্বর (৭১) সকাল থেকে প্রথম খোলা আকাশের নীচে আলো-বাতাস উপভোগ করি।

AMARBOI.COM

প্রশ্ন: বাঙলাদেশের দাঙ্গা ও ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে আপনার ভূমিকা কি?

উত্তর: 'লেখক শিবির', 'মানবাধিকার সংরক্ষণ ও আইনের সাহায্য কমিটি'র সহসভাপতি ও সভাপতি হিসেবে বক্তৃতা, বিবৃতি, মিছিল, সেমিনার লেখা- লেখি প্রভৃতির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী, দাঙ্গাবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সম্প্রসারণবাদ বিরোধী, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন তো গত চল্লিশ বছর ধরে চালিয়ে এসেছি, চালাচ্ছি এবং যতদিন গায়ের ও গলার জোর থাকবে ততদিন চালিয়ে যাব।

প্রশ্ন: এরশাদের শাসনকালে আপনি কি ধরনের প্রতিবাদী ভূমিকা নিয়েছিলেন?

উত্তর: এরশাদের ক্ষমতা দখল করার পর প্রথমে আমি আমাদের ভাষা সমিতির পক্ষ থেকে সম্পাদক অধ্যাপক মনসুর মুসাসহ এরশাদ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে বিবৃতি দিই। এ বিবৃতির বিষয় ছিল– প্রথম শ্রেণী থেকে আরবী ও ইংরেজি পড়ানোর বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ। এ বিবৃতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এর প্রতিবাদ প্রতিরোধ যে আবশ্যিক তা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এবং শিক্ষিত সাধারণের স্বীকৃতি পায়। আমি নিজে বহু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তি প্রয়োগে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখি। তা দৈনিক সংবাদ-এ বক্স করে প্রকাশিত হয়। তার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে আন্দোলন তীব্র এবং তীক্ষ্ণ হয়ে মারাত্মক রূপ ধারণ করে। ছাত্র-পুলিশ-সরকারের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়, তাতে একটি ছাত্র মারা যায়। এবং এরই পরিণামে এরশাদী শিক্ষানীতি পরিহার করা হয়।

এরশাদের আমলে আমার গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম রূপে গ্রহণের বিরোধিতা। এই সময় আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিবাদ সভায় তীব্র ভাষায় সরকারের এই হীন কাজের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আহ্বান জানাই। একে আমি উচ্চকণ্ঠে শিক্ষা-সুরুচি-সংস্কৃতি ও আধুনিক গণতন্ত্রবিরোধী মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলেই অভিহিত করি প্রকাশ্য সভায়।

এরশাদের সময়ে আমার তৃতীয় প্রতিবাদী ভূমিকার বিষয় ছিল সরকারী তথা ইসলামী সংস্কৃতি চালানোর জন্যে সৈয়দ আলী আহসানের নেতৃত্বে গঠিত সংস্কৃতি কমিটি এবং তাদের প্রকাশিত Report-এর বিরোধিতা। আর যে সব ছোটখাট ঘটনা ঘটেছে সেইসব সম্পর্কে আমার 'ভাষা সমিতি'র পক্ষ থেকে, 'মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্রে'র পক্ষ থেকে এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে এবং অন্যদের গণবিবৃতিতে সই দিয়ে আমার প্রতিবাদ জানিয়েছি। এবং কোনো কোনো বিষয়ে কারো কারো আয়োজিত সভায় প্রতিবাদী কণ্ঠে বক্তৃতাও দিয়েছি।

প্রশ্ন: বাঙলাদেশে 'বাঙালী' ও 'বাঙলাদেশী' নামের একটি তীব্র-তীক্ষ্ণ এবং এ মুহূর্তেও অমীমাংসিত বিতর্ক রয়েছে। এ বিতর্কের কারণগুলো একটু বুঝিয়ে বলবেন?

উত্তর: আমরা সবাই জানি ওয়াহাবী ও সিপাহী বিদ্রোহের অসাফল্যের ফলে নৈরাশ্যে নিমজ্জিত ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানদের অধিজন হিন্দুদের থেকে মুসলিম স্বার্থ রক্ষণের জন্যে স্যার সৈয়দ আহমদ দেহলভী (১৮১৭-৯৮) তাঁর পরামর্শে এবং নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধিতা পরিহার করে ব্রিটিশসমর্থনে মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করেন এবং যথাশীঘ্র ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণেরও পরামর্শ দান করেন। ইংরেজি শিক্ষিত মাত্রেই মোটামুটিভাবে স্যার সৈয়দ আহমদ, নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, নওয়াব আলী চৌধুরী প্রমুখের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রিটিশ সমর্থক হয়ে যান। এখানে আবদুল্লাহ্ রসুল প্রভৃতির ভিন্ন মত ও পথ ব্যতিক্রম হিসেবেই বিবেচ্য। উল্লেখ্য যে আরবী শিক্ষিত মৌলভীরা ইংরেজি জ্ঞানের অভাবে অফিস-আদালতের জীবিকা ক্ষেত্রে হিন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না বলে তারা চিরকাল স্বাধীনতাপ্রিয় ও ব্রিটিশবিরোধী থেকে যায় এবং পরবর্তীকালে অর্থাৎ খিলাফত আন্দোলন কাল থেকেই কংগ্রেস সমর্থক হয়ে যায়। এভাবে ১৮৬০ থেকে ১৯৪৭ সন অবধি সাধারণভাবে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমান স্বাধীনতা আন্দোলন না করে হিন্দুর কবল থেকে মুসলমানের চাকরী এবং অন্যান্য স্বার্থ আদায়ে ও রক্ষায় প্রয়াসী থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে কংগ্রেস ব্রিটিশের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতা দানের জন্যে ব্রিটিশকে আন্দোলনের মাধ্যমে প্রবলভাবে চাপ দিতে থাকে। ব্রিটিশ স্বাধীনতা দানে বাধ্য হবে তা যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল, তখন কবি ইকবালের এবং চৌধুরী রহমতুল্লাহ'র স্বপ্ন ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪০ সনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলিমদের স্বতন্ত্র জাতীয়তা-সংস্কৃতি-ধর্ম প্রভৃতির যুক্তি প্রয়োগে মুসলমানের দ্বি-জাতি তত্ত্বের অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান দুই-ই ভিন্নমুখী, ভিন্ন জাতি- ব্রিটিশগ্রাহ্য এই যুক্তি পেশ করে যেসব অঞ্চলে মুসলমানেরা অধিজন, সেসব অঞ্চল নিয়ে মুসলমানদের জন্যে ভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনে সম্মতিদানের ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে ব্রিটিশ সরকারের কাছে দাবি জানায়, ব্রিটিশ সরকারও ভাবী রাজনৈতিক-কূটনৈতিক-বাণিজ্যিক স্বার্থে এ-ভেদনীতি সাগ্রহে ও সানন্দে গ্রহণ করে। যদিও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্যে এবং ব্রিটিশ সরকারের ছদ্ম নিরপেক্ষতা প্রমাণের জন্যে শেষাবধি লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন দ্বি-জাতি তত্ত্ব কার্যত প্রয়োগ করলেও মৌখিকভাবে অস্বীকার করেন। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। মূল প্রস্তাবে একাধিক রাষ্ট্রের কথা থাকলেও একটি পাকিস্তান তথা একটি মুসলিম রাষ্ট্রই সৃষ্টি হয়।

যদিও পূর্ববঙ্গে বা পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু মানুষের বাস, তবু অর্থে-সম্পদে ও বিদ্যায় প্রবল উত্তরভারতের, পাঞ্জাবের এবং অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের শাসনে-শোষণে, বঞ্চনায় ও প্রতারণায় অল্পকালের মধ্যেই বাঙালী মুসলমানেরা প্রথমে মনে মনে, পরে রাজনৈতিকভাবে দ্রোহী হয়ে উঠতে থাকে এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ও বাঙালীর স্বার্থরক্ষার দাবি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে থাকে। এভাবেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি আওয়ামী লীগের ছয় দফার মাধ্যমে উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হতে থাকে।

এ সময়ে আবার পূর্বের দ্বি-জাতি তত্ত্ব বাঙালী মুসলিম মনে লোপ পেতে থাকে এবং বাঙালীসত্তার মূল্য-মর্যাদা এবং ভাষা-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যচেতনা ক্রমশ প্রবল হতে থাকে যার পরিণামে ১৯৬৯ সন থেকে কার্যকরভাবে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে যার পরিসমাপ্তি ঘটে।

এ স্বাধীনতা বাঙলাভাষী বাঙালীর অর্জিত বলে নিজেদের এরা বাঙালী জাতি বলে আখ্যাত করতে গর্ববোধ করতে থাকে। যদিও দেশের নাম বাঙলাদেশ এবং এখানে সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া, ত্রিপুরা, চাকমা, মার্মা প্রভৃতি গোষ্ঠীর উপজাতিও বাস করে, যাদের ভাষা, ধর্ম এবং আচার ও বিশ্বাস ভিন্ন। কাজেই বাঙলাভাষী মাত্রেই জাতিসত্তায় 'বাঙালী' এবং বাঙলাদেশ এই স্বাধীন রাষ্ট্রের নির্বিশেষ অধিবাসী মাত্রেই পাসপোর্ট-ভিসা ক্ষেত্রে এবং জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতিতে রাষ্ট্রিক পরিচয়ে 'বাঙলাদেশী'।

প্রথম বিজেতা তথা স্বাধীন বাঙলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা সরকার আওয়ামী লীগ গোটা রাষ্ট্রবাসীকেই বাঙালীজাতি অভিধায় আখ্যাত করতে এ মুহূর্তেও আগ্রহী, কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা মোশতাকের ও জিয়ার হস্তগত হওয়া মাত্রই তাঁরা মুসলিমসত্তায় গুরুত্ব দিয়ে এবং বাঙালীসত্তা বিলোপলক্ষ্যে বাঙলাদেশ বেতারকে রেডিও বাঙলাদেশ, রাষ্ট্রপতিকে প্রেসিডেন্ট, ইসলামী আচার-আচরণের প্রবর্তন প্রয়াস এবং পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু থেকে বাঙলাদেশের বাঙলাভাষী মুসলিমকে পৃথক ভাবতে শেখানোর কু-মতলবে বাঙালী জাতীয়তার পরিবর্তে বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদ সরকারী নির্দেশেই চালু করেন এবং 'জয় বাঙলা'র স্থলে চালু করেন 'বাঙলাদেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিন্দাবাদ'। সেক্যুলার সংবিধানে যুক্ত করেন 'বিসমিল্লাহ' আর রাজাকার নিযুক্ত করে চালু করেন শাসন-প্রশাসন।

তবে সত্য কথা এই, শেখ মুজিবের আমলেও মুখে বাঙালী জাতীয়তাপ্রীতি পরিব্যক্ত হলেও তারাও যে অন্তরে অন্তরে মুসলিম বাঙালী বা বাঙালী মুসলিম ছিল এবং রয়েছে, তার মুখ্য প্রমাণ চুরুলিয়ার কাজী নজরুল ইসলামের বহুল প্রতিষ্ঠা এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ মুহূর্তেও রাষ্ট্রিক ও সামাজিকভাবে উৎসাহের অভাব। আর ভারতের সাহায্যে ও রাশিয়ার সমর্থনে স্বাধীন বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠা সহজ ও সম্ভব হলেও এ মুহূর্তেও বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে প্রতিবেশী অমুসলিমদের প্রতি প্রত্যাশিতমাত্রায় প্রীতির, সহানুভূতির, সাহায্যের সহযোগিতার অভাব। এবং অমুসলিম বাঙলাদেশীও এ কারণেই হয়তো কিংবা তাদের মানসিক ধর্মীয় প্রবণতার জন্যেও সুযোগ পেলেই বাঙলাদেশ ছেড়ে চলে যায়। এভাবে তাদের মধ্যে মাটি ও মানুষপ্রীতি দুর্লক্ষ্য হয়ে উঠছে। বর্তমানে মানববাদী সমাজবাদী নিরীশ্বর-নাস্তিক হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীস্টানেরাই কেবল নির্বিশেষ খাঁটি মাটি ও মানুষপ্রীতি বাঙালী। অন্যরা হয় 'বাঙালী মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান' অথবা 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান-মুসলিম বাঙালী'। এ কারণেই বাঙলাদেশে এখনও দৈশিক বা রাষ্ট্রিক জাতীয়তা সম্বন্ধে ঐকমত্য গড়ে ওঠেনি। আওয়ামী লীগ ও সি পি বি দলীয়রা বাঙালী জাতীয়তায়, অন্যরা বাঙলাদেশী জাতীয়তায় আস্থাবান।

আমার নিজের মতে, পৃথিবীর বাঙলাভাষী মাত্রেই বাঙালী জাতিসত্তায় ও জাতীয়তায় এবং রাষ্ট্রিক পরিচয়ে বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের অন্যভাষী অধিবাসী সমেত আমরা বাঙলাদেশী জাতীয়তায় আস্থাবান।

প্রশ্ন: আপনি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ছিলেন না বা এখনও নেই। কিন্তু প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে রাজনীতিকদের ক্রিয়া-কর্মে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন কি?

উত্তর: শেখ মুজিবের আমলে যখন 'জাসদ' নামে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গড়ে ওঠে, তাদের সভাগুলোতে বক্তৃতা দিয়ে গোড়া থেকেই সাহায্য সহযোগিতা করে আসছি। আ স ম আবদুর রবের সঙ্গে ঐসময় আমার যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। তারপর 'অরণি' 'বাসদ' প্রভৃতির অনুষ্ঠানেও বক্তৃতা দিয়েছি। পরে এক সময়ে সাতাশটি সাংস্কৃতিক দলের জোট গঠিত হলে আমি সভাপতি পদ গ্রহণ করি। ১৯৮৪ সনে প্রখ্যাত হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হবার পরে এই জোটের বিলুপ্তি ঘটে। তবে আমি প্রায় দশ বছর ধরে বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাই। আমার ৩৭ নম্বর ফুলার রোডের বাসায় এবং পরে ১২৬ নম্বর নিউ ইস্কাটন রোডস্থ বাসায় বামপন্থী নেতাদের প্রায় দশ/বারটা বৈঠকের ব্যবস্থা করি। এই সব সভায় সর্বজনাব মোহাম্মদ তোয়াহা, বদরউদ্দীন উমর, রনো, রাশেদ খান মেনন, শান্তি সেন, দেবেন শিকদার প্রমুখ ১২/১৪ জন নেতা উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে আমার প্রয়াস কখনো সফল হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল ধরে, প্রায় ৮/৯ বছর ডীন থাকাকালে কিংবা সিনেট-সিন্ডিকেট সদস্য থাকাকালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ছাত্রদের মধ্যে উদ্ভূত রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমার চিন্তা-চেতনা নানা কমিটি বৈঠকে প্রকাশ করি। আজও যেমন দৈনিক-সাপ্তাহিক পত্রিকায় নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংকট-সমস্যা সম্বন্ধে আমার মত-মন্তব্য ও মীমাংসার উপায় পরিব্যক্ত করে থাকি।

আমার জীবনে আমি এইসবের গুরুত্ব দিই না। আমার কাছে আমার সাহিত্য কর্মের গুরুত্ব বেশি। আমার সুখ ও আনন্দের উৎস ওতেই নিহিত।

প্রশ্ন: ঠিক আছে, আপনার আনন্দের উৎসেই আবার প্রশ্নের মোড় ঘোরাই। আপনি 'শিক্ষা' বিষয়ে অনেকগুলো প্রবন্ধ লিখেছেন। সেগুলোতে আপনার প্রধান বক্তব্য কি ছিল? নতুন কোনো মত-পথের সন্ধান দিয়েছেন কি?

উত্তর: আমি 'শিক্ষা' বিষয়ে অনেকগুলো প্রবন্ধই লিখেছি। সেগুলো আমার বিভিন্ন বইয়ে সংকলিত হয়েছে। এই শিক্ষা-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলোর আলোচ্য বিষয় ছিল আধুনিক স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ, শিক্ষকের বিদ্যা, দায়িত্ব ও কর্তব্য, শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক, বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় সৃষ্ট, শিক্ষাঙ্গনের ছাত্রসৃষ্ট নানা সংকট-সমস্যা, রাজনৈতিক চেতনার এবং সক্রিয়তার প্রসার, ছাত্র ও শিক্ষকের নৈতিক ও চারিত্রিক বিবর্তন ও পরিবর্তন প্রভৃতি। তাছাড়া গণশিক্ষা ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বের কথাও পুনঃ পুনঃ আলোচনা করেছি। শেষবার অধ্যাপক নাজমা জেসমিন চৌধুরী স্মারক বক্তৃতায় সেকালের ও একালের শিক্ষাব্যবস্থার পরিচিতি ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছি। সেই সঙ্গে জ্ঞানের সংজ্ঞা, একালের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি, শিক্ষাদান ও গ্রহণের নীতি-আদর্শের যুগোপযোগী পরিবর্তনের ত্রুটি, শিক্ষাদান ও গ্রহণের নীতি-আদর্শের যুগোপযোগী পরিবর্তনের কথা, তথা ছাত্র-শিক্ষকের সনাতনী সম্পর্কের ও ধারণার পরিবর্তনের কথা আলোচনা করেছি। কাজেই আমার সব প্রবন্ধেই এমন কিছু কথা বলেছি যা সহজেই মতের-পথের বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে। এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় সমকালীনতা আনয়নের প্রয়োজনে এ বিতর্ক ব্যাপকভাবে শুরু হওয়া আবশ্যিক বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন: 'সংস্কৃতি' সম্পর্কে আপনার প্রবন্ধের সংখ্যাও অনেক। একটি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সময়ে এত প্রবন্ধ কেন লিখেছেন?

উত্তর: সাধারণ মানুষের ধারণা বুনো-বর্বর-ভব্য এবং সব দেশের, সব গোত্রের-গোষ্ঠীর-ভাষীর এবং আঞ্চলিক অধিবাসীর আর সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ সংস্কৃতি রয়েছে এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য মাত্রেই গৌরবের ও গর্বের। তাই একেবারে আদি ও আদিম স্তরের বুনো মানুষও– আমাদের চোখে যাদের কোনো সংস্কৃতিই নেই, তারাও স্ব-সংস্কৃতির গৌরব করে থাকে এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে সদা সতর্ক থাকে। তারা এবং সভ্য মানুষেরা মনে করে সংস্কৃতি যেন বদ্ধ জলের জিয়েল মাছ। তাকে সযত্ন লালন করতে হয়। আমি ঐতিহ্যের এবং সংস্কৃতির এই ধারণা ও গুরুত্বের চিরবিরোধী। আমি ঐতিহ্যকে কখনো প্রেরণার উৎস বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিনি। কারণ ঐতিহ্য যদি প্রেরণার উৎস হত, তাহলে মিসরের, গ্রীসের, রোমের জাতিগুলোর পতন ঘটত না, আর যাদের কোনো ঐতিহ্য নেই, তাদেরও উত্থান বা আত্মবিকাশ সম্ভব হত না। ঐতিহ্য যে প্রেরণার উৎস নয়, এটিই তার প্রমাণ।

আর আমার ধারণা সংস্কৃতির উন্মেষ, বিকাশ, প্রসার নির্ভর করে বিশ্বমানবের পারস্পরিক পরিচয়ে, মানবিক আবিষ্কারের ও উদ্ভাবনের আদানে-প্রদানে, চিন্তা-চেতনা-মনীষার বিনিময়ে। কাজেই সংস্কৃতির ভিত্তিই হচ্ছে বিশ্বমানবিক উত্তরাধিকার। স্বাতন্ত্র্যে কখনো সংস্কৃতির বিকাশ হতে পারে না। তার প্রমাণ: রক্ষণশীল আদিবাসী, উপজাতি এবং বিভিন্ন মহাদেশের ও দ্বীপের আদি ও আদিম বুনো মানুষের এ মুহূর্তেও প্রাণিসুলভ জীবনযাত্রার অস্তিত্ব।

এসব কথা বলার জন্যে নানা দৃষ্টান্তযোগে আমি সারাজীবন ধরে 'সংস্কৃতি' বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছি। আমার শেষ সুদীর্ঘ বক্তৃতামালার বিষয় (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি মতিয়ার রহমান খান বক্তৃতামালার-৩টি) ছিল 'সংস্কৃতি'। এতে আমি সংস্কৃতির সংজ্ঞা, শাস্ত্রিক সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি, দৈশিক সংস্কৃতি, অপসংস্কৃতি এবং ভবিষ্যতের সংস্কৃতির রূপ সম্পর্কে আমার মত-মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত পরিব্যক্ত করেছি। যদিও আমি জানি, আমার মত সবার সমর্থন পাবে না। আমি এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে এবং যন্ত্রনির্ভর জীবনে বিশ্বমানবের অভিন্ন মানসিক ও ব্যবহারিক সংস্কৃতির বাস্তবায়ন সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখি।

প্রশ্ন: একটা অপ্রিয় প্রশ্ন। 'লোকসংস্কৃতি'কে একদা অক্ষমের সাহিত্য বলে মনে করতেন। এখনও কি তা-ই ভাবেন? কেন?

উত্তর: আমি লোকসংস্কৃতিকে আমাদের অজ্ঞতার, অসামর্থ্যের, অশিক্ষার সাক্ষ্য ও নিদর্শন হিসেবে গণ্য করি। লোকসংস্কৃতি মানে প্রাকৃতজনের সংস্কৃতি। গান্ধী যেমন অস্পৃশ্য-শূদ্রকে 'হরিজন' নামে মান দিতে গিয়ে অপমানিত করেছেন, তেমনি মানুষকে 'ভদ্রলোক' ও 'লোক' নামে বিভক্ত করে প্রাকৃতজনকে অপূর্ণ মানুষ হিসেবে অবজ্ঞা-ই প্রদর্শন করা হয়। কাজেই সব মানুষ শিক্ষিত হলে লোকসাহিত্য এবং লোকসংস্কৃতি তার পরিচয় ও অস্তিত্ব হারাবে। আমরা এখনও প্রায় সব মানুষকে অজ্ঞ-অনক্ষর-নিঃস্ব-নিরন্ন রেখেছি বলে শহুরে-শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা তাদেরকে তোয়াজের ভাষায়, আসলে প্রবঞ্চনার ভাষায় তুষ্ট, তৃপ্ত ও হৃষ্ট রাখতে চায়। আমি অবশ্য অতীতের সভ্যতা-সংস্কৃতির এক কথায় ফোকলোরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও মূল্য স্বীকার করি। কিন্তু তার আধুনিক লালন-অনুশীলন এবং টিকিয়ে রাখার প্রয়াসকে ঘৃণা করি। নিজেরা য়ুরোপীয় আদলে রুচি-সংস্কৃতি, আসবাব তৈজস প্রভৃতির ও যন্ত্রনির্ভর জীবনের চর্চা করবে আর গাঁয়ের লোকগুলোকে অশিক্ষিত রেখে লোকসংস্কৃতির চর্চা চালু রাখবে এটা অমানবিক চিন্তা-চেতনার ফল। আমার বিশ্বাস লালন ফকির শিক্ষিত হলে কবিত্বে হয়তো বা রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ হতেও পারতেন। শতকরা নব্বইজন লোক অশিক্ষিত থাকাতেই আমাদের মননে-চিন্তনে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, আবিষ্কারে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্ভাবনে, শিল্পে-সাহিত্যে-স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে-বিজ্ঞানে-দর্শনে আমাদের উন্নতি প্রত্যাশিত মাত্রায় হয়নি, হচ্ছে না।

প্রশ্ন: শেষ প্রশ্ন। আপনার প্রবন্ধের ভাষা কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে? কেনই-বা এ-বিবর্তন?

উত্তর: আমি গুরুত্ব দিই আমার বক্তব্যের ওপর। অর্থাৎ আমার চিন্তা-চেতনার নিখুঁত, নিখাদ ও পূর্ণরূপে অভিব্যক্তি দিতে চাই প্রতিটি বাক্যে। সেজন্যেই আমি বাক্যে সূচিত শব্দের সুবিন্যাসের দিকে কিংবা বাক্যের সরলতা ও সহজতার দিকে দৃষ্টি দিই না। আমার মনোভাবের পূর্ণ প্রকাশের জন্যে এবং ত্রুটিহীনভাবে অভিব্যক্তি দানের জন্যে প্রায় সদৃশ্য অর্থের একাধিক শব্দও বাক্যে ব্যবহার করে থাকি। তাই সাধারণ পাঠক আমার ভাষাশৈলী তথা বাক্‌ভঙ্গি পছন্দ করেন না। এবং আমার কোনো চিন্তার সূক্ষ্মতার ও প্রাগ্রসরতার জন্যে অনেক পাঠকই আমার প্রবন্ধ পড়ে বক্তব্যের মর্ম উদ্ধার করতে ব্যর্থ হন। আমার সম্পর্কে এ-সব অনুযোগ ও অবজ্ঞা আমি কারো কারো মুখে শুনে থাকি। কিন্তু আমি আত্মপ্রত্যয়ী বলেই অন্যের এসব বিরূপ মন্তব্যের গুরুত্ব দিই না।

আমার চিন্তা-চেতনাকে রূপদান করার জন্যে আমি অনেক সময় অন্যের কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে প্রতিভাত হলেও একাধিক শব্দ, অনুপ্রাস এবং ধ্বনি সাম্য রক্ষা করার জন্যে 'য়িক' (ষ্ণিক) প্রত্যয়ান্ত শব্দ বেশি করে ব্যবহার করি। এজন্যেও আমার নিন্দা রয়েছে।

বছরের পর বছর অনুশীলনের ফলে যে-কোনো লেখকেরই ভাষার আড়ষ্টতা ও জড়তা মুক্ত হয়েই থাকে। তাছাড়া সচেতন বা অবচেতন মনে লেখক তাঁর ভাষাকে প্রাঞ্জলতা ও সৌন্দর্য দান করার চেষ্টা করেন। আমি প্রথম জীবনে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছি। পরে নানা চিন্তামূলক প্রবন্ধের চর্চা করেছি। সম্প্রতি দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকার পাঠক লক্ষ্যে স্বদেশের-স্বকালীন জীবনযাত্রার, সংস্কৃতির ও রাজনীতির নানা বিষয়ে লিখি বলে ভাষাকে সহজ ও নিরাভরণ করার চেষ্টা করি। কাজেই এ-ভাষায় বক্তব্য থাকে, সারল্য থাকে, সৌন্দর্য থাকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বদেশ চিন্তা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রঞ্জনা হোসেন

ইফ্ফাত হোসেন

অমিত ও ভাস্কর

—এ চারজনের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার স্মারক হয়ে থাক এ বইটি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ না প্রাণী ঃ কোন পরিচয় মুখ্য!

আমাদের মতো যাঁরা ইতিহাসে ও মানব সংস্কৃতি-সভ্যতার স্থানিক বিচ্ছিন্ন বিবর্তনে অজ্ঞ, তাঁরা মনে করেন মানুষের জন্যেই নিখিল জগৎ ও জগতের সবকিছু সৃষ্ট। মানুষ আছে বলেই তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্যেই দুনিয়ার যাবতীয় জীব-উদ্ভিদ সৃষ্ট ও লালিত হচ্ছে। মানুষের প্রয়োজনেই, তাদের আত্মা আছে বলেই, তাদের জন্যে স্বর্গ-নরকরূপ চিরন্তন আবাসও তৈরি হয়েছে লোকান্তরে। সেখানেই সৎ লোকের জন্যে রয়েছে সুখ, আনন্দ, নির্বাণ, মোক্ষ, যেমন আছে বদ লোকের জন্যে নরকের আগুনে অনন্তকাল দহন। এসব বিশ্বাসের ও বিশ্বাসীদের জগতের কথা। এবং আমরা জানি মানুষ মাত্রই পারিবারিক সূত্রে বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার সংক্রামিত উত্তরাধিকার পায় অর্থ-সম্পদ-গৌরব-গর্বের মতোই। মানুষ যে প্রাণী মাত্র নয়, বিধাতার বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বিশেষ জীব, তা প্রমাণের, বোঝার, বোঝানোর, জানানোর, শোনানোর প্রয়াস চলছে অন্তত স্থূলভাবে হলেও গোড়ার দিকে সাত-আট হাজার বছর ধরে এবং চার হাজার বছর ধরে নানা যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতা প্রয়োগে পৃথিবীর বিশেষ করে এশিয়ার নানা অঞ্চলে বিভিন্নভাবে। গোত্রগুলোর বিচ্ছিন্নভাবে পারস্পরিক অজ্ঞাতবাসের ফলে সংস্কৃতি-সভ্যতার, চিন্তা-চেতনার অসম বিকাশ-বিস্তার ঘটেছে বাস্তবে উনিশ শতকের মধ্যকাল অবধি। এরপরে গোটা পৃথিবীর সবটাই ভৌগোলিকভাবে এবং জনজাতিরূপে দেখা-জানা-বোঝা-শোনা সম্ভব হল। কিন্তু তাই বলে শ্রেয়বোধের প্রাবল্যের অভাবে ভালোকে, কল্যাণকে গ্রহণের আগ্রহ জাগল না পিছিয়ে পড়া গোত্র-গোষ্ঠীর মধ্যে, তারা স্বাতন্ত্র্যেই স্বাস্থ্য-চেতনা বৃদ্ধির মধ্যেই অস্তিত্ব রক্ষার উপায় সন্ধান করল। এভাবে আজো গৌত্রিক, গৌষ্ঠীক, জাতিক, বার্ণিক, ভাষিক, আঞ্চলিক, আচারিক স্বাতন্ত্র্যচেতনানিষ্ঠ থেকে একে অপরকে শত্রু কিংবা সম্ভাব্য শত্রু বলে মেনে দ্বেষণার মধ্যেই আত্মরক্ষার কুঞ্জি খোঁজে।

এদিকে সাহিত্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রশিল্পে, চারু-কারু প্রভৃতি শিল্পে এক কথায় নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রভৃতি চৌষট্টি কলায়, দর্শনে, বিজ্ঞানে, আয়ুর্বিজ্ঞানে, যন্ত্রে, প্রযুক্তিতে, প্রকৌশলে মানুষ আজ অসামান্য ও বিস্ময়কর আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃষ্টি শক্তির পরিচয় দিয়েছে। আজ অরণ্য-পর্বত-সমুদ্র নয় কেবল, নভোমণ্ডলও মানুষের আয়ত্তে।

এসব সত্ত্বেও গুণে-গৌরবে ঋদ্ধ সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সর্বপ্রকারের শিল্পী ও বিদ্বান-বুদ্ধিমান ব্যক্তি বা এ শ্রেণীর সমাজ, সরকার, সেনানী ও রাষ্ট্র ক্ষোভের-ক্রোধের-কামের এবং লাভের-লোভের-স্বার্থের বশে নিতান্ত প্রাণী-সুলভ আচরণ করে বৃত্তি-প্রবৃত্তির শিকার হয়ে। তখন মানুষ করে না হেন অমানবিক অপরাধ-অপকর্ম নেই। তাই জ্ঞানে-বিজ্ঞানে যন্ত্রে-প্রযুক্তিতে-প্রকৌশলে, দর্শনে-সমাজবিজ্ঞানে, শিল্পে-সাহিত্যে-রুচিতে-সংস্কৃতিতে উঁচুমাত্রার উৎকর্ষে শ্রদ্ধেয় যাঁরা, তাঁরা অক্রোধের অক্ষোভের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঈর্ষার বা অদ্বেষণার সুসময়ে হৃদয়বৃত্তির বিকাশের ও মানস-উৎকর্ষের প্রসাদে স্থলের পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ এবং জলজ প্রাণীদের সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করেন সরকারি খরচে ও ব্যবস্থায়। আড়াই হাজার বছর আগে মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ মশা-মাছি-পিঁপড়ে-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি সব স্থলজ ও জলজ প্রাণীরও মানুষের মতো এ পৃথিবীতে সহাবস্থানের জন্মগত অধিকার স্বীকার করে গেছেন। তবু তা বাণীর সত্য হয়েই রইল, জীবনের প্রাত্যহিক আচরণের সত্যে বাস্তবায়িত হল না।

তাই মানুষ-ব্যক্তি মানুষ, গোত্র নামী মানুষ, রজনীতিক দলীয় মানুষ, সেনানী মানুষ, সরকার ও রাষ্ট্রবিরোধ-বিবাদ-দাঙ্গা-লড়াই-কালে মন্দির-মসজিদ-গির্জা-বিহার-সিনাগগ ভাঙে, নির্বিচারে নরহত্যা করে, আজো বিধর্মী-বিভাষী-বিজাতি-বিদেশি তাড়ায়, আজো রাজনীতিক প্রয়োজনে বসনিয়ায়, ইসরাইলে, ভারতে মসজিদ ভাঙে সরকারি প্রশ্রয়ে, সেক্যুলার ভারতে গোহত্যা নিষিদ্ধ হয়, যা অহিন্দুর খাদ্য। বাঙলাদেশের রমনায় কালী মন্দির তৈরির অনুমতি মেলে না। কোনো শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ, কোনো নীতিকথা, কোনো আদর্শচেতনা, কোনো নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি মানুষকে সংযত, পরমত-পরকর্ম-পরআচরণ সহিষ্ণু, যুক্তিনিষ্ঠ, ন্যায়বান, বিবেকানুগত সম্পূর্ণ সজ্জন সৃজন করতে পারল না। মানুষ আজো কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য প্রশমনে অসমর্থ। মানুষের শক্তির বিকাশ ও উৎকর্ষ ঘটছে, কিন্তু মনুষ্যত্বের বা মানবিক গুণের মানবতার ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বপ্রকাশ কৃচিৎ প্রত্যক্ষ করা গেলেও, প্রাণীর মানব প্রজাতির মধ্যে সামগ্রিক, সামূহিক ও সামগ্রিকভাবে প্রাণিত্বই প্রবল, মানবিক গুণ অলক্ষ্য, দুর্লভ, দুর্লক্ষ্য। তাই আজো সভ্য-অসভ্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে পুরুষ আরো অসংযত কামুক এবং গোটা পৃথিবীর সর্বত্র, রাস্তা-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে নির্জনে নয় কেবল, জীবিকাস্থলে, দফতরে, স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে-হলে- হোস্টেলে, পরিবারে ও গৃহকোণে নারী ধর্ষিতা ও নির্যাতিতা। সম্ভোগ্যা প্রাণী রূপেই তার এ মুহূর্তেও প্রথম ও প্রধান পরিচয় বিদ্যা-বিত্ত-যোগ্যতা নির্বিশেষে। তাই কায়রো-বেইজিং সম্মেলনেও নারীর অধিকার, নারীর ন্যায্য দাবি স্বীকৃত হয় না। সুসভ্য সার্ব সৈন্যরা নয় কেবল, শিক্ষিত নাগরিকরাও শত্রুপক্ষের নারী ধর্ষণ করে। হরণে-হননে-দহনে-ধর্ষণে-লুণ্ঠনে শত্রুর বিনাশ বিপর্যয়ে উল্লাস বোধ করে। পৃথিবীর সর্বত্র যেখানেই দাঙ্গা-লড়াই চলে, যেখানেই কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানি চলে, সেখানেই নারীধর্ষণ যেন একটা আবশ্যিক ও জরুরি কর্ম। এ-কালে সব অপকর্মে ধনিক-বণিক-সভ্য শিক্ষিত নাগরিকেরা, রাজনীতিকরা, সেনানীরা, সরকারেরা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে প্ররোচিত করে ও প্রশ্রয় দেয়। দেশের নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্ররা অজ্ঞ অনক্ষর লোকেরা এসব পাশব কর্মে সাহসই পায় না। বাঙলাদেশে ১৬-১৮ সেপ্টেম্বরে হরতাল চলছিল। লোকে বলে– রটনা কিনা জানি না– সরকারই গণমনে হরতালওয়ালাদের প্রতি ঘৃণা জন্মানোর লক্ষ্যে লোক দিয়ে এক অজ্ঞাত ব্যক্তিকে উলঙ্গ করিয়েছিল সাড়ে চারশ' পুলিশ-বিডিআর প্রভৃতির উপস্থিতি সত্ত্বেও। তাই এ কাজ সম্ভব হয়েছিল। এতেই বোঝা যায়, রাজনীতিক স্বার্থে রাজনীতিকরা ও সরকারি দল করে না এবং পারে না হেন অপকর্ম নেই, বস্তুত গোটা পৃথিবীতেই জনগণের জান-মালের বিনিময়ে ফায়দা লুটারই অপর নাম রাজনীতি। এ নীতি বিরোধী দল, সরকার ও রাষ্ট্র স্বদেশে-বিদেশে মানুষের ধন-প্রাণের ক্ষতির কথা বিবেচনা না করেই করে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতএব ব্যক্তি মানুষ, রাজনীতিক, কামুক, ব্যবসায়ী, সরকার বা রাষ্ট্র ষড়রিপুর তাড়নায় যে-কোনো মুহূর্তে আদি ও আদিম প্রাণীর মানব-প্রজাতি রূপে বৃত্তি-প্রবৃত্তি পরবশ হয়ে কেবলই প্রাণী হয়ে যায়। তবে ঋজু মেরুদণ্ডের উঁচু শির হাতওয়ালা প্রাণীর চিন্তা-কর্ম-আচরণ বিস্ময়করভাবে বিচিত্র ও দুর্বোধ্য। এ মানুষই মানুষকে রোগ থেকে বাঁচানোর জন্যে রোগের নিদান ও প্রতিষেধক আবিষ্কারে জীবন উৎসর্গ করে, আবার এ মানুষই পৃথিবী বিধ্বংসী মারণাস্ত্র উদ্ভাবনে ও নির্মাণে সমভাবে উৎসাহী ও উৎসর্গিত প্রাণ। মানুষের কোন্ গুণের বা শক্তির তারিফ করব আমরা অজ্ঞ-অসহায়রা। মানুষের মমতা বেশি না হিংস্রতা অধিক। কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য গুণ প্রবল, না কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য দোষই মানুষের চালিকাশক্তি। মানুষ কি এবং কেমন? মনোবিজ্ঞান ও দর্শন কি বলে, কি সাক্ষ্য দেয় ইতিহাস!

বিরোধ-বিবাদের আদি অবিলুপ্ত কারণ

আমরা স্বপ্নে মৃত আত্মীয়স্বজন, শত্রুমিত্র, পরিচিত মানুষের সাক্ষাৎ পাই, কথাও হয় কিংবা লঘু-গুরু ঘটনা ঘটে। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ-আলাপ-বিবাদ প্রভৃতি ঘটে আমাদের এ মর্ত্যজগতেরই-এ মাটির পৃথিবীরই চিরচেনা পরিবেশে প্রতিবেশে ও বিষয়ে। মৃত ব্যক্তির মরণোত্তর জগৎ ও জীবন, অবস্থা ও অবস্থান এ সাক্ষাতে, আলাপে, বিবাদে কখনো দেখা-জানা-বোঝা যায় না। অতএব মৃতজনদের আমরা আমাদের পূর্বস্মৃতির সঞ্চয়ের ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই নিদ্রায় স্মরণ বা প্রত্যক্ষ করি, অর্থাৎ চেতনার গভীরে নানাসূত্রে ও প্রসঙ্গে সঞ্চিত, বিধৃত ও মগজে মুদ্রিত এবং আপাত-বিস্মৃত কোনো দৃশ্যই অগভীর নিদ্রায় সিনেমার ফিতায় ফুটে ওঠে মাত্র। কাজেই স্বপ্নে দেখা মৃতজনের সাক্ষাৎ আত্মার অমরত্বের সাক্ষ্য-প্রমাণ নয়। জীবন্ত ব্যক্তির জগৎ-জীবন সম্পৃক্ত ঘটনার বা দৃশ্যের প্রদর্শনমাত্র ফটো রূপে নয়, আলেখ্যরূপে।

আবার পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী জন্ম-জীবন-মৃত্যুর ধারায় অবসিত হয়। মানুষ এ যাবৎ অন্য জীব-উদ্ভিদের মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ওদের আত্মার বা চেতনার অবিনশ্বরত্ব স্বীকৃত নয়। কেননা মানুষের ধারণা স্রষ্টা কেবল মানুষকেই আবর্তিত জীবন দিয়ে তার জন্যেই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন, আসমানের ও জমিনের মধ্যেকার আর সব গুপ্ত, সুপ্ত জ্ঞাত-অজ্ঞাত জীব-উদ্ভিদ ও পদার্থ মানুষের প্রয়োজনের জন্যে, মানুষের কল্যাণের জন্যেই নির্মাণ করেছেন। কাজেই আত্মা আছে কেবল মানুষের এবং তা লোকে লোকান্তরে আবর্তিত হয়, জন্মান্তর পায়, প্রেত হয়ে থাকে, কিংবা ইহজগতে কৃত পুণ্য বা পাপ কর্মের মাপে যথাক্রমে 'ইল্লিইন'-এ ও 'সিজ্জিন'-এ থাকবে হাসরের পূর্বাধি সব মৃত ব্যক্তিই। এ হচ্ছে বিচারাধীন কয়েদির উত্তম ও অধম শ্রেণীর হাজতবাস। মৃত্যুর পরে কেউ কেউ পুণ্য কর্মের জন্যে ভবযন্ত্রণা মুক্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করে অর্থাৎ পঞ্চভূতে বিলীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে যায় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে, কেউ কেউ মোক্ষ পায়, কেউ কেউ স্বর্গসুখ ভোগ করে অনন্তকাল, কেউ হতে থাকে নরকানলে দগ্ধ। আবার লোকায়তিক নাস্তিক্য মতে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার বা চেতনার বিলুপ্তি ঘটে, দেহ হয় খাদ্যে, ভস্মে বিলুপ্ত কিংবা পচে হয় মাটির রূপ। অতএব কারো কাছে মৃত্যু হচ্ছে লোকান্তর বা ইন্তেকাল তথা বদলি, কারো কাছে অনস্তিত্বে বিলুপ্তি, কারো কাছে আত্মা স্বর্গে, নরকে কিংবা প্রেতলোকে বাস করে ও করবে চিরকাল অথবা স্রষ্টার ক্ষমা পেয়ে সবাই হবে স্বর্গবাসী কারামুক্ত অপরাধীর মতোই। মৃত্যু সম্বন্ধে আজো মানুষ বিভিন্ন মত পোষণ করে। তাই তাদের উচ্চারণে আমরা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ, শেষ শয্যা গ্রহণ, দেহত্যাগ, প্রয়াণ, লোকান্তর, তিরোভাব, নির্বাণ, জান্নাত বা স্বর্গবাস, অনন্তযাত্রা, সমাধি লাভ, চিরনিদ্রা, ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি, বাকাবিল্লাহ হওয়া প্রভৃতি নানা মতের ও তত্ত্বের আর সিদ্ধান্তের আভাস পাই। কেউ কেউ মরে, অবজ্ঞায় অক্কাও পায়, পটল তোলে। শ্রেণী ও সম্মান-সম্পদ ভেদে কারো হয় গোর, কারো হয় কবর, কারো মাজার, কারো দরগাহ, কারো সমাধি, কারো রওজা। যেহেতু মানুষ 'ওয়র্স নট উইথ দ্য ডেড', সেহেতু সবারই শেষকৃত্য অন্তে ইষ্টক্রিয়া বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া রূপে পোড়ানো-গাতানো-ভাসানো এবং কুকুর-কাক-শকুনের খাদ্য রূপে বিলানোকেই নির্দেশ করে শাস্ত্রিক বিধিবিধান প্রয়োগে। অতএব স্বপ্নের মতো মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণাও মানুষের আবেগী ও মগজী অনুমান ও কল্পনাপ্রসূন।

একত্ববাদী কিংবা বহুত্ববাদী অথবা ইষ্টদেবত্ববাদী হলেও সবাই আস্তিক। এবং আস্তিকমাত্রই ইহলোকে-পরলোকে প্রসৃত অনন্তজীবনে এবং আত্মার অমরত্বে আস্থাবান। সবাই স্রষ্টা মানে। কিন্তু বিভিন্ন শাস্ত্রপন্থীর স্রষ্টাসম্পৃক্ত ধারণার মধ্যে স্থূল সাদৃশ্য অনেক থাকলেও অভিন্নতা নেই। এ জন্যে কোনো দুটো শাস্ত্রের উদ্ভব অভিন্নস্থানে এমনকি কালে হলেও কোনো দুজন স্রষ্টাই সর্বপ্রকারে সদৃশ বা অভিন্ন নন। যেমন সেমিটিক বা সামীয় যেহোভা বা ইলাহি ইহুদী, খ্রিস্টান, মুসলিম শাস্ত্রে গুণে ও পাপ-পুণ্য নিরূপণে অভিন্ন নন। ভারতে ব্রাহ্মণ্য, জৈন, বৌদ্ধ কিংবা লোকায়তিক ধারণায় ভিন্নতা, বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য অত্যন্ত প্রকট, স্রষ্টার নামেও রয়েছে পার্থক্য। মিশরে-গ্রীসে-ব্যাবিলনে-ইরানে আমরা এমনি বৈচিত্র্যের সন্ধান পাই। ইরানে ও মধ্য এশিয়ায় মানী, মজদকী ও জোরথুস্ত্রীয় ধারণায় পার্থক্য সামান্য নয়। পূর্ব এশিয়ার প্রেতলোকবাসী মৃত আত্মীয়পূজায়ও ধারণাগত পার্থক্য দেখা যায়। অতএব, অপৌরুষের তথা আসমানী বাণী সংকলিত ও সম্বলিত নানা গ্রন্থ বেদ-বাইবেল প্রভৃতি থাকা ও মানা সত্ত্বেও গুরুপন্থী সম্প্রদায়েও রয়েছে মত-পথ-লক্ষণগত আচারিক ও দার্শনিক পার্থক্য। তাই কোনো দুই শাস্ত্রিক সম্প্রদায়ের বা মতবাদীর উপাস্য সদৃশ হলেও অভিন্ন নন। এ মতপার্থক্যেই রয়েছে আদি ও আদিম কাল থেকে গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, গোত্রে-গোত্রে স্থায়ী বিচ্ছেদের, বিরোধের, বিবাদের, মারামারির, কাড়াকাড়ির, হানাহানির মূল কারণ নিহিত। কারণ তাদের মতে অদৃশ্য নানা অরি-মিত্রশক্তিই মানুষের পার্থিব জীবন-জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করেন, কেবল স্রষ্টাই জীবন-জীবিকা সংক্রান্ত কল্যাণ-অকল্যাণের সবটার নিয়ন্তা নন, তাই ধারণার ও আদর্শের পার্থক্য ব্যক্তিজীবনের মঙ্গলামঙ্গল, চাওয়া-পাওয়া প্রভাবিত করে বিভিন্নভাবে। অতএব বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার ভিন্নতা কোনো আস্তিক উপেক্ষা করতে পারে না। দ্বেষ-দ্বন্দ্বের উৎস হয় মতপার্থক্য, স্বাতন্ত্র্য চেতনারও কারণ হয়ে দাঁড়ায় ধারণার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিন্নতা। মতভেদ পথভেদের কারণ হয়, কাজেই হিংসা, ঘৃণা, অবজ্ঞা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সম্প্রীতি নষ্ট করে, সহযোগিতায় সহাবস্থান মাঝে মধ্যে ব্যাহত হয়। বাধে বিরোধ-বিবাদ, বাধে দাঙ্গা-লড়াই। অর্থসম্পদ চেতনা যখন ছিল না, যখন মুদ্রাব্যবস্থাও ছিল না, তখনো ঈশ্বরবাদীদের মধ্যে এবং ঈশ্বর-নিরীশ্বরবাদীদের মধ্যে দাঙ্গা-লড়াই চলত, কারণ অদৃশ্য অরিমিত্র শক্তিই জীবননিয়ন্তা বলে আজকের মতোই সব মানুষ বিশ্বাস করত। কাজেই এ প্রত্যয়দৃঢ় আদর্শিক ও দার্শনিক ধারণার ক্ষেত্রে আপোস ও সহিষ্ণুতা সম্ভব ছিল না অজ্ঞ অনক্ষর অসহায় অদৃশ্য মিত্রশক্তির কৃপা করুণা দয়া দাক্ষিণ্য নির্ভর কিংবা অরি শক্তির ক্ষোভ-ক্রোধ কবল ভীত অসহায় মানুষের পক্ষে। তাছাড়া মর্ত্যজীবনের পরিসমাপ্তি মৃত্যুর সঙ্গেই হচ্ছে না, অনন্তকাল ধরে হয় স্বর্গসুখ, নয়তো নরকযন্ত্রণাই জীবনের পরিণাম বলে নিশ্চিত বিশ্বাস।

এ কালে এর সঙ্গে স্বার্থ তথা অর্থ সম্পদ ক্ষমতা প্রভাব প্রতিপত্তির দ্বন্দ্ব- দ্বেষণার সঙ্গে শাস্ত্রিক সম্প্রদায়গত ও রাজনীতিক দলগত দ্বন্দ্ব-দ্বেষণাযুক্ত হয়েছে মাত্র এবং এর ফলে সংঘাত-সংঘর্ষ-দাঙ্গা-যুদ্ধবহুল হয়েছে জনজীবন। জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস দেশ আচার সংস্কৃতি প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্যচেতনাও হিংসা-প্রতিহিংসার, জিঘাংসার আনুষঙ্গিক কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর সর্বত্র, যে-কোনো রাষ্ট্রে যে-কোনো শ্রেণীগত পেশাগত বর্ণগত ধর্মমতগত সংখ্যালঘুমাত্রই নানাভাবে বঞ্চিত, পীড়িত, অধিকারহৃত হয়ে হীনমন্যতায় ভোগে, তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ও বিকাশ ব্যাহত হয়। এর প্রতিকার হতে পারে সব মানুষ নিরীশ্বর নাস্তিক হলে, কেবল মর্ত্যজীবনবাদী হলে, একান্তভাবে অভিন্ন মানবসংস্কৃতিবাদী হলে, সরকার সেক্যুলার জীবনবাদী হলে, সাম্যপ্রবণ সমাজবাদী হলে, আর ফ্রি থিঙ্কার রূপে যৌক্তিক বৌদ্ধিক অধিকার অনুগ জীবনযাপন অঙ্গীকার করে মানুষ মাত্রকেই জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা পেশা নির্বিশেষে মানুষরূপে গ্রহণ-বরণ করার মতো উদার সমাজবাদী হলে সমাজের অধিকাংশ মানুষ বিশেষ করে শাসক-প্রশাসক-সরকার ও রাষ্ট্র। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' এ তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থাবান হলে, মুক্তবুদ্ধির যুক্তিবাদী মানুষ হলে, তবেই মানুষের হাতে মানুষের পীড়ন লাঞ্ছনা বঞ্চনা অবশ্যই কমবে। তবে ব্যক্তিগত লাভ লোভ স্বার্থ ও হিংসা ঘৃণা ক্রোধ ব্যক্তি-পর্যায়ে কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি জিইয়ে রাখবে চিরকাল।

স্বাতন্ত্র্যচেতনা, দ্বেষণা ও দাঙ্গা-লড়াই

আদি ও আদিমকাল থেকে লোকসংখ্যার স্বল্পতার দরুন এবং যানবাহনের অভাবের কারণে আর পৃথিবীর পরিধি সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে মানুষ পাহাড়ে পর্বতে অরণ্যে ও সমতলে গৌষ্ঠীক ও গৌত্রিক জীবনই যাপন করত স্বনির্ভর ও স্বয়ম্ভর হয়ে। ফলে অপিরিচিতি ও অজ্ঞতার দেয়ালঘেরা জীবন ছিল গোড়ায় পৃথিবীব্যাপী সর্বত্র প্রায় প্রকৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালিত স্থূল ও স্বল্প হাতিয়ার এবং তৈজসনির্ভর প্রাণীর ঋজু মেরুদণ্ডের উঁচুশির মানবপ্রজাতি। দুটো হাতের বদৌলত তারা খাদ্য সংগ্রহে ছিল একে অপরের সহকারী ও সহযোগী। এভাবেই অন্যপ্রাণীর চেয়ে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাদের মধ্যে। গৌষ্ঠীক ও গৌত্রিক ঐক্যই তাদের ভাষা সৃষ্টির ও আগুন প্রভৃতি আবিষ্কারের সহায় হয়েছিল। ক্রমে জিজ্ঞাসার, কাঙ্ক্ষার ও অন্বেষার প্রেরণা-প্রণোদনা তাদের প্রকৃতি-নির্ভর সহায়তা কমাতে থাকে এবং সেই অনুপাতে তারা প্রকৃতিকে দাস ও বশ করে এবং প্রকৃতির মেজাজ মর্জি বুঝে তার সঙ্গে আপোস করে, আসন্ন ও আপন্ন বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক থেকে গৌষ্ঠীক ও গৌত্রিক জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী ও পরিবেশ অনুগ জীবনযাপন পদ্ধতি গ্রহণ করে। মন-মগজ-মনন অনুশীলনে ও প্রয়োগে যারা বিশেষভাবে জ্ঞান-বুদ্ধি-অভিজ্ঞার সঞ্চয় ও সম্পদ বৃদ্ধি করে আত্মোন্নয়নে জীবনযাপন পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধনে উদ্যমশীল ও উদ্যোগী হয়েছে তারা দ্রুত এগিয়েছে, অন্যরা যাপন করেছে উদ্যমহীন উচ্চাশারিক্ত আবর্তিত জীবন। ফলে আজো বুনো-বর্বর আরণ্য পার্বত্য দ্বৈপায়ন মানুষ আদিম স্তরের প্রাণীর মতো প্রকৃতির কৃপা-ক্রোধ নির্ভর, অদৃশ্যশক্তির তথা নিয়তির নিয়ন্ত্রিত জন্ম-জীবন-মৃত্যুর পরিসরে ভয়-ভক্তি-ভরসাচালিত জীবনচেতনায় আবর্তিত জীবনই যাপন করছে।

আবার সংস্কৃতি-সভ্যতায় প্রাগ্রসর হয়ে আজ যারা সমুদ্রের তলদেশ, পর্বতের কন্দর, অরণ্যের অন্দর, মাটির অন্তরের সম্পদ আর নভোলোক আয়ত্তে এনেছে বিজ্ঞানের প্রসাদে, প্রকৌশল-প্রযুক্তি প্রভৃতি সর্বপ্রকার যান্ত্রিকশক্তি আবিষ্কারে উদ্ভাবনে ও নির্মাণে, তারাও তাদের গুণগৌরবের এবং অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার ক্ষেত্রে সচেতন ও সক্রিয়। এ বিষয়ে তাদেরও চেতনা-চিন্তা-যুক্তি-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা-বিবেক প্রভাবিত করে না, তারাও Race Religion region ও Language-এর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা আবশ্যিক ও জরুরি বলে জানে ও মানে। এক্ষেত্রে কেউ Rational ও Liberal নয়, বিচ্ছিন্নতার ব্যবধানে সযত্ন সতর্কতায় স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব বজায় রাখতেই সচেষ্ট। এখানে আবেগ কাজ করে Reason মনে মগজে মননে প্রবেশপথ পায় না। এ দুর্গ আজো অভেদ্য। তাই পৃথিবীর সর্বত্র জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস এবং পেশা ও অর্থবিত্তসামর্থ্যগত স্বাতন্ত্র্যচেতনা মানুষের মধ্যে শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা আর দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংকট-সংঘাত-দাঙ্গা-লড়াই-কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানি জিইয়ে রেখেছে। আগে অস্ত্র ছিল মাটির ঢেলা, পাথরের টুকরা, বর্শা-লাঠি-ছুরি-তরবারি, এখনকার আগ্নেয়-বিষাক্ত বিচিত্র মহাশক্তিধর মারণাস্ত্রসব জলযানে স্থলযানে ও বায়ুযানে মৌজুত থাকে। আগে যুদ্ধে মরত কয়েকজন বা কয়েকশত। এখনকার যুদ্ধে মরে লক্ষ, কোটি। ফলে বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য, সত্য প্রয়োগ আমাদের জীবনে একাধারে ও যুগপৎ সম্পদ ও বিপদ, জীবনের ও মৃত্যুর কারণ, রোগনিরূপণে ও প্রতিষেধক আবিষ্কারে আমাদের অকাল মৃত্যুরোধ করে আমাদের যেমন দীর্ঘায়ু করেছে, তেমনি দ্বেষ-দ্বন্দ্বপ্রসূ স্বার্থবুদ্ধি-বিরোধ বিবাদকালে মারণাস্ত্র প্রয়োগে মানুষ বিজাতি বিধর্মী বিভাষী-বিদেশি বিশ্রেণীর মানুষ হত্যা করে হাজারে হাজারে লাখে লাখে। মানুষ মন-মগজ-মনন-মনীষা প্রয়োগে মনের ও মর্মের বিকাশ ঘটিয়েছে দর্শনে সাহিত্যে শিল্পে তথা চৌষট্টি কলায় সংস্কৃতি-সভ্যতার উৎকর্ষ ও বিস্তার ঘটিয়েছে বিচিত্রভাবে। কিন্তু জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-নিবাস-শ্রেণীর ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য চেতনাজাত দ্বেষণা তাকে আদি ও আদিম প্রাণীর স্তরেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিহিংসাপরায়ণ হিংস্র রেখে দিয়েছে। এমন অযৌক্তিক অবৌদ্ধিক জীবনাদর্শের কিংবা জীবনযাপন পদ্ধতির কারণ রয়েছে অনেক। তাদের কয়েকটি আমাদের আন্দাজে-অনুমানে নিম্নরূপ:

১. মানুষ জন্মমুহূর্ত থেকে পারিবারিক ও সামাজিক সূত্রে যে-সব শাস্ত্রিক, লৌকিক, অলৌকিক অলীক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা দেখে শুনে জেনে আস্থাবান হয়, তা জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-প্রজ্ঞা বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে যাচাই-বাছাই-ঝাড়াই না করেই সারাজীবন গতানুগতিক বা যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করে। ফলে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে অসঙ্গত অসমন্বিত স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্যদুষ্ট জীবনই যাপনে অভ্যস্ত হয়ে যায়। যৌক্তিক বৌদ্ধিক জীবন থাকে অনায়ত্ত। এ মানুষেরা নিজেদের শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাকে সত্য বলে জানে, বোঝে ও মানে এবং অন্যের শাস্ত্র-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাকে মিথ্যা, ভুল, বানানো বলে জেনে অন্তরে পরধর্মের প্রতি নীরব নিষ্ক্রিয় অবজ্ঞা পোষণ করে।

২. অস্তিত্ব রক্ষার অবচেতন প্রেরণায় অধমের ও মধ্যমের স্বাতন্ত্র্য চেতনা থাকে প্রবল। এ জন্যেই আদিবাসী, উপজাতি, জনজাতি, অরণ্যবাসীর জীবনদর্শন, জীবননীতি ও জীবনযাপন পদ্ধতি আদিম স্তরে থাকা সত্ত্বেও তারা উন্নত জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবননীতি গ্রহণে অনীহ। কূর্মের মতো তারা স্বসমাজে স্ব স্ব অতীতে ও ঐতিহ্যে প্রীতি রেখে স্বস্থ ও সুস্থ থাকতে চায়। অনুকরণে অনুসরণে গ্রহণে বরণে আত্মোন্নয়ন চায় না। এ গ্রহণবিমুখতা অবশ্যই আত্মহননের নামান্তর এবং নিন্দনীয় আধি মাত্র। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো এবং এক শ্রেণীর সংস্কৃতিসেবী আঁকিয়ে-লিখিয়ে-নাটুকে লোকেরা তাদের মন জোগানোর ও ভোট পাওয়ার লোভে তোয়াজের ভাষায় তাদের স্ব স্ব সংস্কৃতির মহিমা-মাহাত্ম্য বয়ান করে তাকে ধরে রাখার জন্যে উৎসাহিত করে।

৩. কাজেই আস্তিক্যের স্বাতন্ত্র্য, সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য, গোষ্ঠীর, গোত্রের, ভাষার, খাদ্যের স্বাতন্ত্র্য ও আঞ্চলিক জীবনযাপন পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্যপ্রীতি মানুষে মানুষে বিরোধের, বিবাদের, বিচ্ছেদের, বিদ্বেষের ব্যবধান জিইয়ে রাখে, মিলন ময়দান তৈরি করে না। ১৯৯৬ সনের এ শেষ দিনে পৃথিবীর মানুষ প্রাণী সুলভ অননুশীলিত অপরিশীলিত অসংযত সেই সহজাত বৃত্তিপ্রবৃত্তি চালিত হয় ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে লাভে-লোভে-স্বার্থে। এর চেয়ে মানবিক ব্যর্থতা আর কি হতে পারে? সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র ক্ষেত্রে নিরক্ষর, নাস্তিক, সেক্যুলার, কম্যুনিস্ট, সংযত, পরমত-কর্ম-আচরণ সহিষ্ণু যুক্তিবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ আত্মসত্তার মূল্যমর্যাদা সচেতন বিবেকানুগত যুক্তিনিষ্ঠ সুজন সজ্জনই কেবল সমাজে শান্তি-স্বস্তি-সুখ বৃদ্ধি করতে পারে। এ ভাবেই আমরা জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা শ্রেণী অঞ্চলভেদের শিকার হয়ে গৌষ্ঠীক গৌত্রিক সাম্প্রদায়িক উপসাম্প্রদায়িক, শাস্ত্রিক, বার্ণিক, জাতিক, উপজাতিক, ভাষিক, শ্রেণীক, আঞ্চলিক, দৈশিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, বিরোধ-বিবাদ, বিচ্ছিন্নতার ব্যবধান চালু রেখেছি, যুগোপযোগী কালের দাবি মেটানোর জন্যে আমরা সর্বমানবিক বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে, বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক চেতনায় প্রবুদ্ধ হয়ে অভিন্ন মানব-সমাজ চেতনায় আত্মোন্নয়নে সমর্থ হইনি। তাই আজো সর্বত্র বিধর্মী বিভাষী বিজাতি বিদেশি বিগোত্রের বিগোষ্ঠীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিসম্প্রদায়ের বিমতের বিপথের লোকেরা পরস্পর হননে দহনে ধর্ষণে লুণ্ঠনে বিতাড়নে বঞ্চনায় লিপ্ত। ঈর্ষা হিংসা ঘৃণা অবজ্ঞা অসহিষ্ণুতা অসংযম পরিব্যক্ত করে। বুনো বর্বরের মতো ভব্য-সভ্য মানুষ বা জাতি-গোত্র গোষ্ঠী শ্রেণী নির্বিশেষে বাস্তবে ব্যক্তিজীবন ও ব্যক্তিমানুষ অবচেতন প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপ্ররোচিত জিগীষাপ্রবণ এবং তাই জিঘাংসায় উগ্র। অতএব ব্যক্তিমানুষ চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক জাত রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ প্রভাবিত কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য চালিত একদিকে এবং অন্যদিকে হার্দ্যিক অনুভূতির ও মগজী উপলব্ধির প্রভাবে স্নেহ-মমতা-প্রেম-প্রীতি হিতৈষণা-ত্যাগ-তিতিক্ষা-ক্ষমাপ্রবণ, তাই বিরোধ বিবাদ দাঙ্গা হাঙ্গামা লড়াই বঞ্চনা সত্ত্বেও পৃথিবী আজো সহযোগিতায় সহাবস্থানযোগ্য।

সাম্প্রদায়িকতা-জাতীয়তা আর বৈশ্বিকস্তরে আন্তর্জাতিকতা

AMARBOI.COM

আমরা আজো জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা যোগ্যতা নিবাস পেশা শ্রেণী প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য চেতনা এবং লাভ-লোভ-স্বার্থগত ভিন্নতা প্রসূত ঈর্ষা-হিংসা-ঘৃণা বা দ্বেষণা-প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা বশে পরস্পর বিরোধ-বিবাদ-দাঙ্গা-হাঙ্গামা-লড়াই-যুদ্ধ প্রভৃতিতে নিরত। প্রাণিপ্রবৃত্তির প্রশ্রয়জাত এ বিরোধ-বিবাদের উৎস ঈর্ষা-হিংসা-ঘৃণা বা বৈর অন্যকে পর ও শত্রু এবং প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবতে শেখায় যা মনের কোনে সুপ্ত ও গুপ্ত থাকে মাত্র, লুপ্ত হয় না কখনো বিবেকী অনুশীলন ছাড়া। স্বরাষ্ট্রে ইদানীং আমরা একে গৌষ্ঠীক গৌত্রিক, বার্ণিক, ধার্মিক বা শাস্ত্রিক, ভাষিক, নৈবাসিক বা বিত্তগত কিংবা পেশাগত স্বাতন্ত্র্য ও স্বার্থ চেতনাভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা বলেই অভিহিত করি এবং বিরোধ বিবাদ ঈর্ষা হিংসা ঘৃণা প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রসূন কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানি মাঝে মধ্যে এখানে সেখানে আকস্মিকভাবে ঘটে যায় বলেই আমরা সম্প্রীতির কথা বলি, প্রীতির অনুশীলনের কথা নিরর্থক জেনে উচ্চারণ করি না। এ জন্যে সম্প্রীতি একটা যোগরূঢ় শব্দ যার তাৎপর্য 'আপোসে সহাবস্থান'। অতএব 'আপন্ন' বিরোধের বিবাদের দাঙ্গার আশঙ্কা প্রতিরোধে কিংবা দাঙ্গা-উত্তর আপোস মীমাংসার নাম হচ্ছে সম্প্রীতিতে অবস্থান।

কাজেই প্রীতি হচ্ছে হৃদয় উত্থিত আবেগজড়িত অনুরাগ, আসক্তি বা ভালো লাগা, ভালোবাসা, আর সম্প্রীতি হচ্ছে সংযত সহিষ্ণু হয়ে স্বাধিকারে স্বস্তিতে থেকে বৈষয়িক সামাজিক-রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে সহযোগিতায় সহাবস্থান করা। স্বস্তি-শান্তি-সুখ-সম্পদ-আনন্দ-আরাম নিশ্চিত নিরাপত্তা ও নিরুপদ্রবতাবিরোধী বলেই স্বদেশে বা স্বরাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতা নিন্দিত এবং পরিহার্য। কেননা সাম্প্রদায়িকতা সংখ্যালঘুর জীবন-জীবিকার, মানসিক ও দৈহিক অস্বস্তির এবং অনিরাপত্তার সার্বক্ষণিক কারণ। এক কথায় সংখ্যালঘু মাত্রই পীড়িত বঞ্চিত শোষিত প্রতারিত হয় জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে বাস্তবে সংখ্যাগুরুর বৈষম্যমূলক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের ফলে। নাগরিক হিসেবে ওরা বুনো-বর্বর-ভব্য-সভ্য-ধনী-নির্ধন কোনো সমাজেই কোনো রাষ্ট্রেই সম ও স্বাধিকারে নিশ্চিন্তে ও নিশ্চিত নিরাপত্তায় নিরুপদ্রবে নাগরিক জীবন মানসিকভাবে হীনমন্যতা পরিহার করে মাথা উঁচু করে উপভোগ করতে পারে না। শুধু তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রে নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা য়ুরোপেও কোনো রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুর স্বস্তি সুখ স্বাধিকার উপেক্ষিত হয়ই। এমনকি নারীও তো পুরুষপ্রধান সমাজে আজো গৃহভৃত্যের মতো গৃহকাজে ও সন্তান উৎপাদনে নিযুক্ত পুরুষসম্ভোগ্যা প্রাণী মাত্র পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র।

সাম্প্রদায়িকতা তেমন একটা মানসিক অসহিষ্ণুতা, সংকীর্ণতার, অসূয়ার আর জন্মগত বৈরীভাবের বিষাক্ত ফুল ফল ফসল। ফুল-ফল-ফসল বললাম এ জন্যে যে, সংখ্যাগুরু দল সংখ্যালঘুকে দলনে-দমনে-পীড়নে-শোষণে-বঞ্চনায় অনুগত ও শায়েস্তা রাখা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক স্বার্থে প্রয়োজনীয় বলে জানে ও মানে। কারো কারো বিবেচনায় সংখ্যালঘুরা শাস্ত্রিকভাবেই 'পবিত্র জিম্মি' মাত্র এবং এ মনোভাবকে চরম উদারতা ও পরম সুবিচার বলেই ওরা জানে। যেন ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিলেই সবদায়িত্ব পালন করা হল। সমান নাগরিক অধিকার তাদের প্রাপ্য নয়, এ ধারণা খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ মুহূর্তেও প্রবল।

সাংবিধানিকভাবে নির্বিশেষে নাগরিকের সমান নাগরিক অধিকার যেসব রাষ্ট্রে স্বীকৃত, সেসব রাষ্ট্রের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়েও কিন্তু তা আজো সমাজ-সম্মত বা মানসস্বীকৃত হয়ে ওঠেনি। এর পরিণামে কোথাও সংখ্যালঘুরা স্বদেশকে দেশপ্রেমীর মতো ভালোবাসে না, কারণ সে গৃহভৃত্যের মতো স্বঘরে, স্বভিটেয় সর্বক্ষণ অনিশ্চিতির মধ্যেই বাস করে মানসিকভাবে। প্রতিবেশীকে সে অভয় শরণরূপে নিঃসংশয়ে পরিপূর্ণ আস্থায় গ্রহণ করতে পারে না। তাই জাতীয়সংগীত ও জাতীয়পতাকাও তার গৌরব-গর্বের নয়, আপনত্বের দাবি অন্তরের গভীরে দৃঢ় ও সুনিশ্চিতভাবে প্রোথিত নয় বলে। তাই এ মুহূর্তে পাঁচ মহাদেশব্যাপী সব রাষ্ট্রেই উনজনের সংখ্যালঘুর আত্মসত্তার দৈন্য মোচনের লক্ষ্যে, স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার দাবি আদায়ের সংগ্রামে নেমেছে লঘু-গুরুভাবে। সংগ্রাম চলছেই, চলবেই, কেননা সংখ্যাগুরুরা তাদের কায়েমী স্বার্থ ছাড়বে না, মুখে সংখ্যালঘুর অধিকার স্বীকার করেই ছলেবলে কৌশলে তাদের আয়ত্তে ও অধীনে রাখার প্রয়াসী থাকবে এবং প্রবল-দুর্বলের লড়াইয়ে দুর্বল লড়াকু হয়েও সহজে কখনো স্থায়ীভাবে স্বাধিকারে স্বস্তিত্বে স্বপ্রতিষ্ঠ থাকতে পারবে না। পরোক্ষ হামলার আশঙ্কা থেকেই যাবে। কাড়ার-মারার-হানার হামলাও ঘটবে মানুষ আজো যুক্তিবাদী হয়নি, হতে চায় না বলেই। যুক্তির, বুদ্ধির ও বিবেকের অনুশীলন করে না বলেই আশৈশব দৃষ্ট, শ্রুত, লব্ধ ও প্রাপ্ত অদৃশ্য লৌকিক অলৌকিক অলীক ভৌতিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আচার-আচরণ গতানুগতিক অভ্যস্ত জীবনে বিনা সন্দেহে, জিজ্ঞাসায় ও অন্বেষায় নির্বিচারে সত্য ও কেজো জেনে মেনে চলে। এর ফলে আমাদের মনীষীদের তথা আঁতেল বলে দাম্ভিকদেরও চিন্তা-চেতনায় ধরা পড়ে না যে আমরা যে-সম্প্রদায়িকতাকে অনভিপ্রেত বলে জানি, বুঝি ও মানি, তারই যে উল্টোপিঠ হচ্ছে জাতীয়তা। এ তথ্য কখনো আমাদের মনশ্চক্ষে দেখি না, যাচাই করি না মগজ খাটিয়ে। আমরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে পর ও সম্ভাব্য শত্রু ভাবি প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী বলে। তাই প্রতিবেশী বড় ও ঋদ্ধ রাষ্ট্রকে ঈর্ষা করি। ছোট রাষ্ট্রকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করি অবজ্ঞা, মিত্র ভাবি না কখনো। পররাষ্ট্রের প্রতি বৈরভাব পোষণ করা, পররাষ্ট্রের থেকে সতর্ক সযত্ন প্রয়োগে স্বাতন্ত্র্য, দূরত্ব বজায় রাখাই যথার্থ খাঁটি নিখাদ নিখুঁত ও সুষ্ঠু জাতীয়তাবোধ বা স্বাজাত্য চেতনা। কূপমণ্ডূকতা কূর্মস্বভাব বশে কল্যাণকে শ্রেয়কে গ্রহণ না করে নতুনকে বর্জন করেই আমরা জাতীয় স্বতন্ত্র সত্তা, অস্তিত্ব বজায় রাখাই হচ্ছে জাতীয়তা বোধের পরিচায়ক, জাতীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক বলে জানি, সাম্প্রদায়িকতার ও জাতীয়তার জন্ম যে একই উদরে, পরস্পর যে সহোদর, একই ঈর্ষা অসূয়া থেকেই যে এর অবৌদ্ধিক ও অযৌক্তিক এবং প্রাবৃত্তিক উন্মেষ-উদ্ভব বিকাশ ও বিস্তার তা আমরা ক্বচিৎ কেউ আচমকা ভাবি, অনুভব ও উপলব্ধি করি। কাজেই জাতীয়তাবোধ বৈশ্বিক স্তরে আন্তর্জাতিকতায় উন্নীত না হলে স্বদেশে সাম্প্রদায়িকতা উচ্ছেদ কখনো সম্ভব হবে না। আমাদের একাধারে ও যুগপৎ স্বাভাবিক, স্বাশাস্ত্রিক, স্বাসামাজিক, স্বারাষ্ট্রিক এবং বৈশ্বিক আন্তর্জাতিক নাগরিক হতে হবে। এতে কোনো স্ববিরোধিতা বা বৈপরীত্য নেই। এ অনেকটা একাধারে ও যুগপৎ কারো বাবা, কারো ভাই, কারো চাচা, কারো মামা, কারো স্বামী, কারো স্ত্রী থাকার মতো, এভাবেই আমরা 'বসুধৈবকুটুম্বকম' তথা বিশ্ব মানবের কটুম্ব তত্ত্বে আস্থাবান হতে পারি মানব প্রজাতি রূপে মানবতার সুষ্ঠু বিকাশে ও অভিব্যক্তিতে।

এ জন্যে মানসঅনুশীলনকে চর্যা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। মানুষকে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-যোগ্যতা-পেশা নির্বিশেষে কেবল 'মানুষ' হিসেবে স্বপ্রজাতির প্রাণী হিসেবে আপন ভাবতে হবে। তার প্রতি প্রীতি রাখতে হবে আত্মীয় বন্ধুর মতো। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অন্তরে বুঝতে হবে যে, মানুষের প্রতি প্রীতিই সব সুখের মূল। ফুল আপনার জন্যে ফোটে না, পরের জন্যেই প্রীতির কুসুম ফোটাতে হবে। এর জন্যে প্রয়োজন ফ্রিথিঙ্কার হওয়া, যুক্তিবাদী হওয়া, বৌদ্ধিক জীবনযাপনের অঙ্গীকার করা এবং বিবেকানুগত হওয়া। পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতি বা মানবিকতা ষড়াঙ্গিক: সংযম, পরমত-পরকর্ম-পরআচরণ সহিষ্ণুতা, যুক্তিবাদিতা, মুক্ত চিন্তা-চেতনাজাত ন্যায্যতাবোধ, বিবেকানুগত্য ও সৌজন্য। এসব গুণের পূর্ণতাই পরিপূর্ণ মানবতা বা মনুষ্যত্ব। এ সংস্কৃতি আয়ত্তে যার, সেই সংস্কৃতিমানই হতে পারে উদারতায়, মনস্বিতায়, সংযমে, সহিষ্ণুতায়, সুবিবেচনায়, বিবেকানুগত্যে, সৌজন্যে যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবনযাপনে সমর্থ। এমনি মানুষ যখন কোনো সমাজে প্রত্যাশিত সংখ্যায় গড়ে ওঠে বা সুলভ হয়, তখনই সমাজ সংস্কৃতি আর সরকার হয় বাঞ্ছিত গুণের, মানের, মাপের ও মাত্রার।

অর্থোডকসি ও মৌলবাদ বন্ধ্য ও গ্রহণবিমুখ

শৈশবে-বাল্যে মানুষ পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে কাল্পনিক, লৌকিক, অলৌকিক, অলীক, অযৌক্তিক, অবৌদ্ধিক, অসমঞ্জস বিশ্বাস সংস্কার ধারণা, আচার-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচরণ প্রভৃতি যেসব দৃষ্ট, শ্রুত, লব্ধ ও অভ্যস্ত প্রত্যয়ে ও রীতিরেওয়াজে জীবনযাপন করে, সচেতন যৌক্তিক অনুশীলনের, পরীক্ষণের, সমীক্ষণের, পর্যবেক্ষণের ও উপযোগ যাচাইয়ের অভাবে তাতে রয়ে যায় স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্য চিন্তায় চেতনায় মনে মগজে ও মননে। এ জন্যেই শাস্ত্রমানা মানুষের কেতাবিধর্মে ও আচরিকধর্মে পার্থক্য ও বৈপরীত্য থেকে যায় সুস্পষ্টভাবে। যেমন ইহুদী খ্রীস্টান মুসলিম হিন্দু বৌদ্ধ প্রভৃতির শাস্ত্রিক ধর্ম ও আচরিক ধর্ম অভিন্ন নয়। মত-পথের, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বৈচিত্র্যে উদ্ভব হয়েছে নানা মতবাদী সম্প্রদায়ের ও উপসম্প্রদায়ের। এর মধ্যে দেশের, কালের, বিধর্মীর, পূর্ব প্রজন্মের এবং প্রবল উন্নত প্রতিবেশী সমাজেরও প্রভাব থাকে। ফলে স্বীকৃত মূল শাস্ত্রগ্রন্থের বিধি-নিষেধে সীমিত থাকে না শাস্ত্রিক আচার-আচরণ, পালা-পার্বণ ও নীতি-নিয়ম। তবু আত্মার অমরত্বে শাস্ত্রের অপৌরুষেয়তায়, দেহাধারে নিবদ্ধ ও ভবযন্ত্রণায়কাতর চৈতন্যের বিদেহী আত্মার বা চৈতন্যের পরলোকে প্রসৃত সুখ-দুঃখময় চিরন্তন অস্তিত্বে আস্থাবান মানুষেরা সাধারণভাবে এবং শাস্ত্রনিষ্ঠরা বিশেষভাবে পারত্রিক জীবনের সুখে বা যন্ত্রণামুক্তিতেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ফলে তারা মর্ত্যজীবনের অসারতায় এবং অনন্তকালের সুখ প্রত্যাশায় অথবা আত্মার মোক্ষ ও চৈতন্যের নির্বাণ প্রত্যাশায় দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে একান্তভাবে শাস্ত্রনিষ্ঠ জীবনযাপনে সযত্ন সতর্ক প্রয়াসী হয়। এদেরই আমরা গোঁড়া রক্ষণশীল শাস্ত্রনিষ্ঠ ধার্মিক বা মৌলবাদী ধর্মধ্বজী নামে অভিহিত বা চিহ্নিত করি। এদের এভাবে শাস্ত্রসম্মত ও শাস্ত্রাচারনিষ্ঠ জীবনে অর্জিত অলৌকিক শক্তিতে আমরা সাধারণভাবে আস্থা রাখি। সন্ত সাধু ফকির দরবেশ শ্রমণ ভিক্ষু পীর দরগাহ প্রভৃতির প্রভাব তাই আজো কুসংস্কারের মতো পৃথিবীর সর্বত্র আস্তিক সমাজে প্রবল। এ সঙ্গেই চালু রয়েছে সমান গুরুত্বে ঝাড় ফুঁক বাণ উচ্চাটন, তুকতাক, মন্ত্র-মাদুলি, তাবিজ-কবচ, মন্ত্রপূত পানি ধূলি তাগা গুড় চিনি প্রভৃতিও। এ কালের পরিভাষায় গোঁড়া শাস্ত্রনিষ্ঠদের বলা হয় অর্থোডক্স আর গোঁড়া শাস্ত্রবাদীদের বলা হয় মৌলবাদী বা ফান্ডামেন্টালিস্ট। সবাই সাধারণভাবে শাস্ত্রের চিরন্তন প্রয়োগ সাফল্যে, সত্যতায় এবং জীবনের সর্বপ্রকার সঙ্কট-সমস্যার সমাধানের, মুক্তির উপায় বলেই জানে, বোঝে ও মানে। তারা তুকতাক-মন্ত্র-মাদুলি-পাথরের প্রভাব ও কার্যকারিতা স্বীকার করে, স্বীকার করে জীবন-জীবিকায় গ্রহনক্ষত্র তিথির রাশিচক্রের প্রভাব।

অতএব কোনো আস্তিকই আত্মার বিলুপ্তি স্বীকার করে না, কেউ কেউ বিবর্তন আবর্তন মানে বটে। আর বৌদ্ধরাও চৈতন্যের সহজ অবসান পন্থা জানে না। নির্বাণ অর্জনে শত সহস্র জন্মের ও ভবযন্ত্রণা ভোগের প্রয়োজন হয়।

শাস্ত্র চিরন্তন সত্যের ও প্রয়োজনে প্রয়োগসাফল্যের আকর, আত্মা অমর ফলে আস্তিক মাত্রই পারত্রিক জীবনে সম্ভাব্য যন্ত্রণার বিভীষিকা ও ভীতি সচেতন না হয়েই পারে না পড়তি বয়সে। আত্মরতিবশে কেউ কেউ কৈশোর ও যৌবন থেকেই পারত্রিক কল্যাণ লক্ষ্যে জীবনাচার, জীবনের ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ নিয়ন্ত্রণ করে। এমনকি বৈরাগ্যে আত্মবঞ্চনা করে।

যারা আক্ষরিকভাবে শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মেনে চলে তাদের আমরা শাস্ত্রনিষ্ঠ আদর্শ এক আস্তিক ও শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে ভক্তি শ্রদ্ধা করি। এমনকি তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে আমরা অলৌকিক শক্তিধর ঈশ্বরের প্রসাদপুষ্ট ব্যক্তি বলে মানি। বাহ্যত ও কার্যত এরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থোডকস, এরা অনেকটা রোবটের মতোই, এদের ত্যাগ, কৃপা, করুণা, দয়া-দাক্ষিণ্য, পরার্থপরতা, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সবটাই আন্তরিকভাবে শাস্ত্রনির্দিষ্ট নিয়মে সীমিত ও পার্বণিক, এর সঙ্গে হৃদয়াবেগের সম্পর্ক থাকে না। দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের সযত্ন প্রয়াস থাকে মাত্র। মর্ত্যজীবনকে এরা তুচ্ছ বলে মানে, পারত্রিক জীবনের সুখ স্বস্তির নিশ্চিত লক্ষ্যেই এদের জাগ্রত মুহূর্তগুলোর ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রিত। অবশ্য রক্ত-মাংসের মানুষের প্রাণিসুলভ প্রাকৃতিক ভোগবাঞ্ছা অন্তরে কতটুকু সংযত ও নিষ্ক্রিয় নিবৃত্ত থাকে, তা জানা বোঝা অন্যের পক্ষ্যে সম্ভব নয়। তবু আমরা ধরে নিই যে প্রবৃত্তিকে এরা প্রশ্রয় দেয় না, নৈবৃত্তিক গুরুত্ব দিয়ে সংযমসাধনায় এরা সিদ্ধ মানুষ। এরা নিঃসন্দেহে সজ্জন, তবে অনুদার এবং কিঞ্চিৎ ও কৃচিৎ অসহিষ্ণু। মৌলবাদীরা তথা ফান্ডামেন্টালিস্টরা ঠিক আচারে-আচরণে মর্ত্যজীবনে বিমুখ নয়, তারা আদর্শ হিসাবে শাস্ত্রকেই পার্থিব জীবনের নিয়ন্ত্রক হিসেবে সমাজে-সরকারে শাসনে-প্রশাসনে-আইনে-কানুনে নীতি-নিয়মে স্বীকৃত রাখতে চায় মাত্র। এর মধ্যে একটা স্বধর্মের, স্বশাস্ত্রের, স্বসমাজের ও স্বসংস্কৃতির অভিমান এবং গুণ- গৌরববোধ কাজ করে। এ হচ্ছে একটা আদর্শিক ও নৈতিক সাধারণ স্বীকৃতি মাত্র, লাভ-লোভ-স্বার্থের ক্ষেত্রে, ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগের ক্ষেত্রে, মর্ত্যজীবনের নানা কালিক, দৈশিক, আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এ সব আদর্শিক-নৈতিক নীতিনিয়ম যে উপেক্ষা বা লঙ্ঘন করা যায় না-করবে না, তা নয়। এ তাৎপর্যে মৌলবাদীরা বা ফান্ডামেন্টালিস্টরা গোঁড়া রক্ষণশীল বা অর্থোডকস নয়। এরা স্বাশাস্ত্রিক স্বাজাতিক গৌরবগর্বী মাত্র। যেমন যিশু-বুদ্ধের অনুগামীরা নরহত্যা করে, যুদ্ধ করে। কেননা রাজাদের জোরে-জুলুমে পররাজ্য কাড়ায় পাপ আছে বলে কোনো শাস্ত্র বলে না– কাজেই শাহ-সামন্তের নরহত্যায় অবাধ অধিকার রয়েছে। মানুষের রক্তে মাটি ভেজানো তাই সরকারি বা রাষ্ট্রীয় স্তরে আবশ্যিক ও বৈধ বলে সর্বজন স্বীকৃত।

একালে মৌলবাদ পৃথিবীর সর্বত্র সবধর্ম সম্প্রদায়ে, রাজ্যে, রাষ্ট্রে, গোত্রে ও জাতিতে সংক্রমিত হয়েছে সংক্রামক রোগের মতোই। তবু হিন্দুরা যেহেতু কোনো এক ও অভিন্ন দেবতার উপাসক নয়, তাদের মৌলবাদ গাঢ়-গভীর কোনো তত্ত্বের উৎসের ও ভিত্তির সন্ধান দেয় না। এটি অনেকটা হিন্দু নামে পরিচিত ও অভিহিতদের রাজনীতিক ঐক্য সৃষ্টির প্রয়াসজাত। খ্রীস্টান বা ইহুদীর মৌলবাদ অনুদার কর্মঠবৃত্তিই উৎসাহিত করবে মাত্র। তবে বিজাতি বিভাষী বিধর্মী বিদেশি দ্বেষী হয় এরা। কিন্তু মুসলিমদের মৌলবাদের প্রকৃতি ও শক্তি ভিন্ন। এরা অসহিষ্ণু ও উগ্র। এরাই যুক্তিবাদী প্রায় দু-লক্ষ মুতাজিলাকে হত্যা করেছিল। এককালের নাস্তিক ইমাম আল গাজ্জালি মুমিন হয়েই গ্রীক বিদ্যার চর্চা মুসলিম সমাজে পরিহার করিয়ে ছিলেন।

আমরা জানি, পৃথিবীর ইহুদীর খ্রীস্টানের হিন্দুর ও বৌদ্ধের শাস্ত্র সংগৃহীত সংকলিত ও লিপিবদ্ধ হয়েছে প্রবর্তকের প্রয়াণের দুই, তিন, চার, পাঁচশরও বেশি বছর পরে। কিন্তু 'কুরআন' সংগৃহীত, সংকলিত, বিন্যস্ত ও লিপিবদ্ধ হয়েছে রসুলের প্রয়াণের মাত্র পঁচিশ বছর পরে। তখনো রসুলের সমকালের শতে সত্তর জন লোক অন্তত জীবিত ছিল। কাজেই তাদের সাক্ষ্যে ও স্বীকৃতিতে লিপিবদ্ধ কুরআনের প্রতিটি বর্ণে-শব্দে-বাক্যে দৃঢ় আস্থা প্রজন্মক্রমে মুসলিম মনে সুনিশ্চিত প্রত্যয়ে কেবল দৃঢ়তরই হয়েছে আল্লাহ্‌র সহি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অহিরূপে। এ কারণেই জন্মসূত্রে পাওয়া শাস্ত্রে বিশ্বাস কোনো মুসলিম মনে সন্দেহের, জিজ্ঞাসার, সন্ধিৎসার, কৌতূহলের, উপযোগরিক্ততার, সত্যাসত্য যাচাইয়ের বাসনা জাগার সূত্র যোগায় না। ফলে মুসলিম সমাজে নতুন চিন্তার চেতনার নতুন জিজ্ঞাসার নতুন কৌতূহলের এককথায় মন মগজ মনন মনীষা প্রয়োগে মুক্ত চিন্তার তথা ফ্রিথিঙ্কিঙের কোনো প্রয়োজন হয় না, অবকাশ বা সুযোগ মেলে না। তাই ইসলামে সাহিত্য সৃষ্টি নিষিদ্ধ ছিল বলে আরবি ভাষী মুসলিমরা এ সেদিন অবধি সাহিত্যরিক্ত ছিল, গ্রীক বিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা বোগদাদ সরকার অনুমোদন করলেও গ্রীক সাহিত্য কাব্য-নাটক প্রভৃতি শিল্পের অনুবাদ বা অনুকরণ ছিল নিষিদ্ধ। ফলে আরবি ভাষীরা চৌষট্টি কলার অনুশীলন বঞ্চিত ছিল বলেই তাদের হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষ ঘটেনি কখনো। শাস্ত্রনির্দেশিত বাঁধা নিয়মে, বিধিবদ্ধ পথে তাদের মানবিক গুণ ও মানবতা, তাদের শাস্ত্র নির্দেশিত দায়িত্ব ও কর্তব্য হৃদয়াবেগশূন্য যান্ত্রিকভাবে পালিত হয়েছে। শিয়া ইরাকি/ইরানিরা বৌদ্ধ প্রভাবে গুরুবাদী ও বেদান্তদর্শনের প্রভাবে অদ্বৈতবাদী হয়ে সাহিত্য ও দর্শন চর্চা করেছে, হয়েছে পীরবাদী সুফী।

আজো তাই অর্থোডকসরা-মৌলবাদীরা কোনো প্রকারেই সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, চিত্রে, নাচে-গানে-বাজনায়, ভাস্কর্যে তাদের সৃষ্টিশীলতার স্বাক্ষর রাখতে পারে না। সবটাই যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ পাপ কর্ম। একজন অর্থোডক্স বা মৌলবাদী নাচের নতুন মুদ্রা বা ভঙ্গি বা প্রতীক-প্রতিম সৃষ্টি করবে না। গান বাঁধবে না ফাসেকি বলে। বাদ্যে নতুন তাল-লয়-বোল তৈরি করবে না পাপ কর্ম বলে। অভিনয় করবে না, নাটকও লিখবেই না। চিত্রাঙ্কন তার পক্ষে নিষিদ্ধ ফুল-পাখি- প্রেম-প্রকৃতি হৃদয়ের নানা মর্ত্যবাসনা প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় বলেই। দর্শনশাস্ত্র নিরপেক্ষ হলেই বিশ্বাসের শেকড় ছিঁড়ে যায়, বিজ্ঞানের আবিষ্কার-উদ্ভাবনের তথ্য প্রায়ই শাস্ত্রের সত্য, তত্ত্ব ও তথ্যবিরোধী হয়।

সিনেমা-নাটক অভিনয় প্রভৃতিও অপকর্ম। শাস্ত্রের চিরন্তন সত্যতা ও উপযোগ ক্ষুণ্ন হয় বলেই মানুষের কোনো নতুন চেতনা, নতুন চিন্তা, নতুন সৃষ্টি, নতুন নতুন কালিক ও দৈশিক প্রয়োজনজাত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ-রুচি-সংস্কৃতি শাস্ত্রের ও শাস্ত্রীর অনুমোদন পায় না। কাজেই অর্থোডকসি ও মৌলবাদ সংস্কৃতি-সভ্যতার, আবিষ্কার-উদ্ভাবনের, নতুন চিন্তা-চেতনার, নতুন দৃষ্টির এবং সৃষ্টির, প্রগতির ও প্রাগ্রসরতার, মানুষের গুণ-গৌরবের, মানবিকগুণের, মানবতার-মনুষ্যত্বের বিকাশের পথে অলঙ্ঘ্য বাধামাত্র, এ জন্যে পরিত্যাজ্য। কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে সরকার সরকারি অর্থে নারী সমাজেও মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ঘটাচ্ছে। ফলে অর্থোডকসের ও মৌলবাদীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে বাঙলাদেশে।

চিত্তের প্রসার-বিকাশ ঘটে না বলেই অর্থোডক্স ও মৌলবাদীরা জীবনের ও জীবিকার যে কালগত বিবর্তন ও চাহিদা আছে, তা স্বীকার করে না। ফলে তাদের সমাজ জরা-জীর্ণতা-জড়তাদুষ্ট হয়ে টিকে থাকে, প্রাণবন্ত হয়ে অগ্রগতিকে পুঁজি-পাথেয় করে বেঁচে থাকে না। তাদের একটা ভুল ধারণা কিছুতেই কাটে না, তা হচ্ছে ইসলামের উন্মেষ যুগে আরবদের ইমানের জোরে উন্নতি। যুক্তিযোগে বুঝবার চেষ্টা করলে, তারা উপলব্ধি করত যে, সে-যুগে সাহস ও শক্তি থাকলেই বিশ্ববিজয়ী হওয়া যেত। এ কালে জ্ঞান-বিজ্ঞান যন্ত্র, যান্ত্রিক যান-বাহন, প্রযুক্তি-প্রকৌশল প্রভৃতি সর্বপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের, উৎকর্ষ সাধনের ও প্রয়োগের শক্তি অধিক না হলে কারো অতীত ও ঐতিহ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্রিত হয়ে বৈষয়িক বা মানসিকভাবে স্বকালের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোনো জাতি সম্প্রদায় বা রাষ্ট্র প্রত্যাশিত অবস্থায় ও অবস্থানে গর্বে ও গৌরবে বেঁচে থাকতে পারে না। এসব কারণেই বন্ধ্য অর্থোডকসি ও মৌলবাদ অবশ্য পরিহার্য আত্মকল্যাণ লক্ষ্যেই। এবং আগ্রহে, আয়াসে ও প্রয়াসেই কেবল আত্মোন্নয়ন সম্ভব।

অতীতমুখিতা বনাম জীবনের প্রয়োজনমুখিতা

শাস্ত্রের আদি ও অকৃত্রিম বিধি ও নিষেধলগ্নতা, অতীত ও ঐতিহ্যপ্রীতি এবং শাস্ত্রের সার্বত্রিক ও সর্বাত্মক চিরন্তন কল্যাণকর সঙ্কট-সমস্যামুক্ত উপযোগে দৃঢ়বিশ্বাস মানুষকে গতানুগতিক আচার-আচরণে-বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায়, পালা-পার্বণনিষ্ঠায় আশৈশব অভ্যস্ত জীবনযাপন পদ্ধতিতে আবদ্ধ রাখে। ফলে জীবন কালের চাকার মতো কিংবা লাটিমের মতো সচল থাকে বটে, কিন্তু চেতনায়, চিন্তায়, আবিষ্কারে, উদ্ভাবনে, সৃষ্টিতে, জিজ্ঞাসায়, অন্বেষায়, সংস্কৃতিতে, সভ্যতায় এগোয় না, বিবর্তন পরিবর্তন পায় না, রোবটের মতোই জীবন নির্দিষ্ট ছকে চলে, মন-মগজ-মনন-মনীষা থেকে যায় সুপ্ত, হয়ে যায় বন্ধ্য অপ্রয়োগে অননুশীলনে। জীবন মগজী চর্যা ও চর্চা দাবি করে। সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতা অনুশীলনে নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুন জিজ্ঞাসার, নতুন অন্বেষার ফুল-ফল-ফসল দাবি করে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে সমকালীনতা ও সমকক্ষতা রক্ষার গরজে। চিন্তা-চেতনার প্রবহমানতা থেকেই সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতা-মানবিকতা-মানবতা কিশলয়ের মতো বিকাশ-বিস্তার ও উৎকর্ষ লাভ করে। কাজেই শাস্ত্রের, অতীতের, ঐতিহ্যের মূলানুগত্য তথা মৌলবাদিতা জীবনবিমুখতার, অতীতমুখিতার, পিছুটানে বাঁধাপড়ার নামান্তর মাত্র। এ মৌলবাদিতা বা অতীতে ও ঐতিহ্যে, পুরোনো দিনের শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধে লগ্নতা দেশ-কাল-জীবন-জীবিকা বিরোধিতার নামান্তর মাত্র। কেননা সাড়ে তিন হাজার, তিন হাজার, আড়াই হাজার, দু'হাজার, দেড়হাজার কিংবা পাঁচশ বা একশ বছর আগেকার জীবন ধারণপদ্ধতির চিহ্নমাত্র নেই, খোল-নলচে বদলে গেছে। আজকের বিজ্ঞানের প্রসাদে প্রাপ্ত যন্ত্র, যানবাহন, প্রকৌশল, প্রযুক্তি, আয়ুর্বিজ্ঞান, তারে-বেতারে-যন্ত্রে সংযুক্ত পৃথিবীরূপ জনপদে আজ জনজীবন নিয়ন্ত্রণ করে। এ পরিবর্তিত পরিবেশে ও প্রতিবেশে আগের কালের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা, ভয়-ভক্তি-ভরসার অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তিরূপ জীবননিয়ন্তা আজ জিজ্ঞাসু ও অন্বিষ্ট মানুষের যৌক্তিক বৌদ্ধিক যাচাইয়ে-বাছাইয়ে অস্তিত্ব হারিয়েছে, যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগের ফলে প্রমাণাভাবে আন্দাজ-অনুমান-কল্পনা ভিত্তিহীন বলেই হয়ে গেছে অগ্রাহ্য।

অতএব শাস্ত্রানুগত্য, অতীত-ঐতিহ্যপ্রীতি গতানুগতিক নীতিনিয়মে, রীতিরেওয়াজে, প্রথায়পদ্ধতিতে জীবনযাপন অভ্যাস আমাদের কালানুগ কোনো প্রেয়সের বা শ্রেয়সের সন্ধান দিতে পারে না। তা সত্ত্বেও যারা উপযোগ যাচাইয়ে মগজ না খাটিয়ে নির্বিচারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরোনোর অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত এবং কিছুই বর্জনে এবং নতুন কিছু অর্জনে মানসিক জীবনে অনীহ, যারা ঝালাই করে, মেরামত করে পুরোনোকে মমতাবশে স্বকালের উপযোগী করার সযত্ন প্রয়াসী, তারাই একালে পৃথিবীর সর্বত্র মৌলবাদী রূপে অভিহিত এবং নিন্দিত প্রগতিবাদীদের কাছে। এ মৌলবাদীরা পুরোনোকে ঝালাই, বাছাই ও মেরামত করে তার চিরন্তনতা প্রমাণে উৎসুক। এদের পুরোনোর ময়লা-ম্লানিমা মুছে পুনরুজ্জীবিত এবং নিজেদের পুনর্জাগ্রত করার প্রয়াসী বলেও চিহ্নিত করা যায়। কাজেই এরা হচ্ছে শাস্ত্রের, অতীতের, ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনবাদী এবং নিজেদের এভাবে পুরোনো দেহে নতুন প্রাণের পুনর্জাগরণবাদী। এরা শাস্ত্রের চিরন্তনতায় চিরকল্যাণকরতায় আস্থাবান আর অতীতের ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনবাদী বলেও তাদের অভিহিত করা চলে। এরা শাস্ত্রের চিরন্তনতায় চিরকল্যাণকরতায় আর অতীত ও ঐতিহ্য শরণেই জীবনের ঐহিক-পারত্রিক নিরাপত্তা নিহিত বলে দৃঢ় আস্থা রাখে। এদের মানসিক জীবনে নতুন তত্ত্ব, তথ্য ও সত্যভীতি প্রবল। এদেরকে ইংরেজিতে রিভাইভ্যালিস্ট বলা হয়। আর যারা চেতনার চিন্তার কিশলয়ের মতো নব নব উন্মেষশীলতায় আস্থা রাখে, তারা নতুনের পিয়াসী ও প্রয়াসী, তাদের কাঙ্ক্ষা, জ্ঞান-পিপাসা, সৃষ্টির আকুলতা, জীবনতৃষ্ণা তাদের জিজ্ঞাসায় অন্বেষায় উদ্যম জোগায় উদ্যোগী করে। যারা মগজের চর্যার ও চর্চার আবশ্যকতা অনুভব উপলব্ধি করে, জিজ্ঞাসায় ও অন্বেষায় জীবনের সামগ্রিক সামূহিক ও সামষ্টিক বিকাশে-বিস্তারে ও উৎকর্ষে দৃঢ়প্রত্যয়ী, পুরাতনে তারা অনাসক্ত, আস্থাহীন উপযোগরিক্ত বলে, সমকালীনতা নেই বলে।

যারা মগজ-মনন-মনীষা প্রয়োগে সংস্কৃতির সভ্যতার বিবর্তনে, গতিশীলতায় বা জলস্রোতের মতো প্রবহমানতায়, প্রগতিতে ও প্রাগ্রসরতায় বিশ্বাস রাখে, তারাই বিজ্ঞানে, আয়ুর্বিজ্ঞানে, আবিষ্কারে, উদ্ভাবনে, সৃষ্টিতে, নির্মাণে, মানুষের দেহ-প্রাণ মনের স্বাস্থ্য রক্ষায়, ব্যবহারিক ও মানসিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য, সাচ্ছল্য, সুখ, শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা ও বিকাশ আনয়নে সফল হয়। এরাই রেনেসাঁস বা জীবনে-জগতে নতুন অনুভবে উপলব্ধিতে জাগরণ ঘটায়। রিভাইভ্যালিস্টরা অতীতমুখী, নবজীবন ও নবজাগরণ বিমুখ, আর রেনেসাঁস কর্মীরা জীবনে চিন্তায় চেতনায় কর্মে আচরণে নিত্যনতুনত্ববাদী, প্রগতিবাদী, বিবর্তনবাদী, উৎকর্ষবাদী জীবনে-সমাজে-সংস্কৃতিতে ও সভ্যতায়। রেনেসাঁসবাদীরা মুক্তচিন্তক বা ফ্রিথিঙ্কার, মর্ত্যজীবনবাদীও। আজ শোষিত গণমানবের মুক্তি সম্ভব হবে সমাজে মুক্তচিন্তকের আধিক্যে।

রেলগাড়ির যাত্রী ও সমাজজীবন

রেলগাড়িকে সমাজের প্রতিরূপ কিংবা সমাজকে রেলগাড়ির প্রতিচ্ছবি বলে সহজেই বয়ান ও বিশ্লেষণ করা যায়। মানুষের বৈষম্য কণ্টকিত পার্থিব জীবনের সঙ্গে রেলগাড়ির যাত্রীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের সহজেই তুলনা করা চলে। ডক্টর ভূপেন হাজারিকার রেলগাড়ির রূপকে মানুষের সমাজজীবন নিয়ে একটি চমৎকার গান আছে। সে রূপক গভীর তথ্যের, সত্যের ও তত্ত্বের প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ। হাজার কয়েক বছরের মানবসমাজকে যদি দৈহিক ও মগজী চিন্তাচেতনাশক্তিভেদে এবং প্রাকৃতিক আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্যভেদে মনে মনে বিন্যস্ত করে একটি মানস আলেখ্য বা চিত্র অঙ্কন করি, তাহলে মনে ও মর্মে আমার একটা রেলগাড়ির বাস্তব চিত্র জেগে ওঠে। রেলগাড়িতে থাকে স্যালুন, প্রথম শ্রেণী, উচ্চতর শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণী, আর মালগাড়ি। সেসব মালবগিতে থাকে নানা পণ্য, জিনিসপত্র এবং পশু প্রভৃতি। এদিকে মানুষের জন্যে রয়েছে যেসব বগি সেগুলোর নিম্নশ্রেণীগুলোতে থাকে লোকের শ্বাসরুদ্ধকর ভিড়। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ পাদানিতে হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে, কেউ কেউ বগির ছাদে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে বসে। ট্রেন রেলে চলতে থাকে। স্যালুনে চলে মহাসম্মানিত সুবিধেভোগী পদ-পদবীর বা অনন্যবিত্তের লোকেরা, উচ্চতর শ্রেণীর কোচে, চেয়ারকারে কিংবা সাধারণ প্রথম শ্রেণীতে চলে অর্থবিত্তবান পদ-পদবীতে বিশিষ্টজনেরা, ভিড় এড়িয়ে একটু আরামে যাবার জন্যে সচ্চল কিংবা রুগ্ন-বৃদ্ধ লোকেরা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট কেনে, আর অন্য নিঃস্ব-দুস্থ-দরিদ্রের জন্যে রয়েছে তৃতীয় শ্রেণী। তারা সমাজেও নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ দরিদ্র দলিত, দমিত, বঞ্চিত, প্রতারিত প্রাণীবিশেষ। মানুষের মর্যাদা তারা পায় না, বিত্ত-বিদ্যা-পদ-পদবিহীন অজ্ঞ অনক্ষর অবিশেষ 'গণ' বলেই। আমরা জানি রেলের বগি দুর্ঘটনায় পড়ে, ঋজু লোহার বর্ত্মচ্যুত হয়। মাঝে মধ্যে দস্যুকবলিত হয়, হননে-লুণ্ঠনে হারায় ধন-প্রাণ। রেলগাড়ি যেমন সাধারণভাবে পরিণামে গন্তব্যে পৌঁছে, মানুষও তেমনি জন্ম-জীবন-মৃত্যু পরিসরের জীবন বৈষম্যের পীড়ক-পীড়িত, শোষক-শোষিত, শাসক-শাসিত, বঞ্চক-বঞ্চিত শ্রেণীতে বিভক্ত থেকেই ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে কিংবা নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ, দরিদ্র দাস-ভৃত্য-মজুর দলিত হিসেবে দুঃখ-দুর্দশায় কাটায়।

এখন আমাদের সমাজটাকেও যদি রেলগাড়ির সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে রেলগাড়ির বিভিন্ন কামরায় যেমন সব শ্রেণীর লোক মেলে, তেমনি পৃথিবীর সর্বত্র মেলে সামন্ত-বুর্জোয়া-বুনো-বর্বর-সভ্য-ভব্য সমাজে এমন অসম শ্রেণীতে বিন্যস্ত সমাজ। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো অবশ্যই ব্যতিক্রম। আমরা বাসের-রেলের ভিড়ের, অব্যবস্থার, যানজটের অনিরাপত্তার, দুর্ঘটনার কথা বলাবলি করি, বিপন্ন মানুষের জন্যে সহানুভূতিও প্রকাশ করি। কিন্তু গোটা সমাজ যে হাজার হাজার বছর ধরে দাস-ক্রীতদাস-ভূমিদাসরূপে বাহুবলে, ধনবলে, জনবলে বলীয়ান মানুষের হাতে পীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত-প্রতারিত-বিপর্যস্ত জীবনযাপন করছে, তা দেখে-শুনে-পড়েও সমাজ পরিবর্তনে আগ্রহী হই না, পীড়নের-বঞ্চনার-শোষণের প্রতিবাদে-প্রতিকারে-প্রতিরোধে এগিয়ে আসি না, এমনকি নিজেরাও এর শিকার হলেও। আমরা ভাববাদী, নিয়তিবাদী অদৃশ্য শক্তিতে ভয়-ভক্তি-ভরসা রাখি বলে আমরা অক্ষোভে, অক্রোধে, অদ্রোহে অবিচল আস্তানায় ও আস্থায় এ জীবন-জীবিকা ব্যবস্থায় প্রবলকবলিত। দুর্বলের আনুগত্যের, শ্রমের ও সময়ের পুঁজি প্রয়োগে বিত্তে-বিদ্যায় বাহুশক্তিতে বুদ্ধিতে প্রবলদের জীবন ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে ধন্য করার, কৃতার্থ হওয়ার সুযোগকে আসমানি লীলাময় অদৃশ্য শক্তির অভিপ্রায় অনুগ বলে মেনে নিই আমরা বিনা সন্দেহে, জিজ্ঞাসায়, অন্বেষায়। ফলে আমাদের রেলগাড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতোই শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা-প্রতারণা-অবিচার-অনাচার জর্জরিত অমানবিক বৈষম্যের এবং মানবিক অধিকারে বঞ্চিত জীবনযাপনে বাধ্য থাকছে মানুষ। সমাজ কি আমাদের দেশের রেলগাড়ির মতোই থাকবে আজো? এর কি কোনো ভাবী পরিবর্তন সম্ভব নয়? বাঞ্ছিত নয়? আবাল্যের শাস্ত্রিক, সামাজিক, নৈতিক, লৌকিক, অলৌকিক, অলীক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আচারনিষ্ঠা বিমুক্ত জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগে অনাসক্ত স্বাধীন যৌক্তিক- বৌদ্ধিক বিচারে-বিশ্লেষণে যদি আমরা মুক্তচিন্তক বা ফ্রিথিঙ্কার রূপে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেষ্টা করি, কোনো মত-পথ-দৃঢ়প্রত্যয় গ্রহণে আগ্রহী হই তাহলে আমরা এ বৈষম্যের, বঞ্চনার ও গণশোষণের ও অবমাননার প্রতিকারে প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে কি পারি না শোষিত গণমানবমুক্তির দিশারী ও লড়িয়ে হিসেবে? এ অবিচারের প্রতিকারে আমাদের মতো শিক্ষিত লোকদের সংযম, সহিষ্ণুতা, যুক্তিনিষ্ঠা, ন্যায্যতাবোধ, বিবেকানুগত্য আর দায়িত্ব ও কর্তব্য চেতনাসম্পন্ন সুজন সজ্জন ব্যক্তিদের নীরব-নিষ্ক্রিয় দর্শক থাকা কি লজ্জার কথা নয়?

দোজখ

AMARBOI.COM

দুনিয়াটা গরিবের লাগ্যা ভালা নয়– দোজখ, ধনীর লাগ্যা ভালা– বেহেস্ত। এ-ই দিনমজুর রহমত আলীর ধারণা। তার উক্তিতে ও অনুভূতিতে স্থূলতা আছে পুরু বাকলবহুল কলাগাছের মতো, কিংবা খোসাবহুল নারকেলের মতো। কিন্তু শাঁসের মতো সত্যের সারও রয়েছে হীরের টুকরোর মতো। আদি ও আদিম কাল থেকেই স্থূলবুদ্ধির ও দুর্বল দেহ-প্রাণ-মনের মানুষ অপরের হুকুম-হুমকির, জোর-জুলুমের শিকার হয়েই দাস-ক্রীতদাস-ভূমিদাসরূপে আত্মাহীন গৃহপোষ্য শ্রমিক ও হুকুম তামিলদার হিসেবেই পৃথিবীব্যাপী হাজার হাজার বছর কাটিয়েছে, কাটাচ্ছে প্রজন্মক্রমে। জন্মগতভাবেই অভাবের মধ্যে জীবনযাপন করতে হয় বলে তারা অর্থে সম্পদে সম্ভাব্য অভাব-চিন্তায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দুস্থ ভদ্রলোকদের মতো অস্বস্তিকর উদ্বেগে জীবনযাপন করে না। সেই যে কথা আছে, 'সাগরে শয়ান যার, শিশিরে কি ভয় তার'-এ-ও হচ্ছে সে-বৃত্তান্ত। অভাবের মধ্যেই যার জন্ম-জীবন ও মৃত্যু, যার দিনরাতের প্রতিটি মুহূর্ত অন্নের, বস্ত্রের, চিকিৎসার অনিশ্চিতির মধ্যে কাটে, তার ভয়ের-ভরসার কিছুই থাকে না। বিপন্ন অনিশ্চিত জীবনে তারা আশৈশব অভ্যস্ত বলেই তাদের চিত্ত ও মুখাবয়ব ভাবনাহীন। মৃত্যুর জন্যে, ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করার জন্যে, অনাহারে ও অচিকিৎসায় অপমৃত্যু বরণের জন্যে তারা মানসিকভাবে অনন্যোপায় বলেই সদা প্রস্তুত, তাদের আমরা পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে স্বাভাবিক ও নিশ্চিন্ত মনের মানুষ রূপেই সাধারণভাবে দেখি, অবশ্য অন্তরঙ্গ আলাপে তাদের দুঃখ-সমুদ্রের অকূলতা ও অতলতা মুহূর্তেই অনুভব ও উপলব্ধি করতে পারি।

আমাদের শতে সত্তরভাগ লোকই দারিদ্র্যসীমার নিচে মানবেতর জীবনযাপন করে– এখবর আমরা শহর-বন্দরের শিক্ষিত সচ্ছল লোকেরা জানি। বৈঠকে, আড্ডায়, কাগজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবৃতিতে, মেঠো বক্তৃতায় এবং পার্বণিক মিছিলে শ্লোগান বা জিকির-জিগিররূপে উচ্চকণ্ঠে পরিব্যক্তও করি। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য, অনুভব-উপলব্ধি এরপরেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই শোষিত-শাসিত-পীড়িত-বঞ্চিত-প্রতারিত-নিঃস্ব-নিরন্ন-দরিদ্র-অজ্ঞ-অনক্ষর মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার অবসান ঘটে না দুনিয়ার বড়-ছোট-মাঝারি ধনবাদী কোনো রাষ্ট্রেই। তবু অজ্ঞ-অনক্ষর ও সাক্ষর-শিক্ষিত বদ্ধমনের ও বন্ধ্যমগজের যুক্তিপ্রয়োগে অসমর্থ মানুষ শাস্ত্র মানে না বলে কম্যুনিস্টদের সহ্য করে না। তারা মানুষকে আত্মীয়স্বজনের মতোই গাঢ়-গভীরভাবে ভালোবাসে বলেই তারা জীবনের সুখ-শান্তি-আনন্দ-আরামকাঙ্ক্ষী না হয়ে সর্বত্যাগী হয়ে দুঃখ-কষ্ট-পীড়নবহুল ও মৃত্যুর ঝুঁকিপূর্ণ সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। তাদের এ ভালোবাসার গুরুত্ব, গভীরতা, তাদের মানবপ্রেম, দুস্থ মানুষের মুক্তির এ সংগ্রাম ধনবাদী স্বার্থপর মনুষ্যত্বে দীন জনগণ স্বীকার করে না। ওরা কম্যুনিস্টদের এ মহাপ্রাণতা, মানবতা বোঝেই না কায়েমী স্বার্থ রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলেই। আমাদের দেশের বর্তমান রাজনীতিক সমস্যা ও সঙ্কট একটি প্রকৃষ্ট ক্ষমতাপ্রিয় বুর্জোয়া রাজনীতির সাক্ষ্য ও প্রমাণ। প্রায় পৌনে দুবছর ধরে হাসিনার নেতৃত্বে বিরোধী দল পাছে আসন কম পায়, এ ভয়ে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় সংসদ নির্বাচন দাবি করছে এবং একই কারণে অর্থাৎ পাছে আসনসংখ্যা হারায় এ ভয়ে ও অনুমানে সংবিধানের পবিত্রতার মর্যাদার দোহাই কাড়ে সরকার। বর্তমানে উভয় দলই, বিরোধী ও সরকারি দল জেদাজেদির, রেষারেষির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, এখন তাদের দ্বন্দ্ব রাজনীতি স্তরে নেই। তবু দাবি ছাড়ে না কোনো দল। হাসিনা যখন কথা বলেন, তখন তা হয় দলেরও কথা এবং সে সূত্রেই বারো কোটি নাগরিকের কথাও। এ হিটলারি কায়দা খালেদারও আয়ত্তে। খালেদা যা বলেন, তা বিএনপিরই বক্তব্য, তা বারো কোটি বাঙলাদেশীরই বক্তব্য। হিটলারই বলতেন, আমার উচ্চারিত কথা একাধারে ও যুগপৎ ফুয়েরারের ও জার্মানির আর জার্মানদেরও। অর্থাৎ হিটলারই একাধারে ও যুগপৎ রাষ্ট্রের, জার্মানের ও জার্মানির ভাগ্যবিধাতা। এ রোগ হাসিনা-খালেদা উভয়কেই পেয়ে বসেছে। যদিও তাঁদের দলীয় স্বার্থ সর্বার্থেই এবং সর্বাত্মকভাবেই আমজনতার ও রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী, জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর অর্থে-সম্পদে, জানে-মালে, জীবনে-জীবিকায়। আর্থবাণিজ্যিক মহাজনী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অ্যাজেন্ট 'এনজিও' নামের বেসরকারি জনসেবক সংস্থাগুলো এখন কম্যুনিজম বিলুপ্তি লক্ষ্যে আর এক মোক্ষম চাল চালছে, এনজিওরা 'তৃণমূল জন সংগঠন' নামে গ্রামীণ দরিদ্র নরনারীর আর্থিক সঙ্কটমুক্তি সঙ্ঘ গড়ে তুলেছে। এরা গ্রামীণ মানুষের ভাত-কাপড় জোগায়, তাদের সন্তানদের সাক্ষর করে, কাজেই এভাবে সর্বত্যাগী কম্যুনিস্টদের বাণীর আবেদন ও প্রভাব প্রতিরোধ করা হবে সহজ। এনজিওর নতুন পাথুরে দুর্গে ফাটল ধরানো অসম্ভব হবে অর্থরিক্ত কম্যুনিস্টদের বাণীর তীরে-বর্শায়, তা যতোই যৌক্তিক-বৌদ্ধিক আর বাস্তব সাক্ষ্যপ্রমাণ সম্মত হোক না কেন!

যারা গতানুগতিক ব্যবস্থায় অভ্যস্ত নিশ্চিত জীবনযাপন করে, যারা কায়েমী স্বার্থের ধারক, বাহক ও প্রচারক, তারা সমাজ পরিবর্তন চায় না। তারা চায় যন্ত্রের প্রয়োগে তাদের বিলাসী জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যের, আয়েশের ও আরামের উৎকর্ষ ও উন্নয়ন। যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞার অনুশীলন রিক্ত, বদ্ধমনের ও বন্ধ্য মগজ-মননের শোষিত বঞ্চিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতারিত অজ্ঞ-অনক্ষর লোকেরা খাদ্যে-পোশাকে-শয্যায়-দালানে বঞ্চিত হলেও তারা এতো অভাবে– এমন ভাত-কাপড়ের সঙ্কটে সমস্যায়ও আত্মহত্যা করে না, কারণ তারা নিদ্রার, যৌনসুখের ও নিয়তিনির্ভরতার (নাড় দিয়েছেন যিনি, আহার জোগাবেন তিনি) আশ্বাসে বাঁচতে চায়।

এ শোষিত-শাসিত-বঞ্চিত-প্রতারিত দাসপ্রায় শ্রমজীবী মানুষ শাস্ত্র না-মানা কম্যুনিস্টদের তাদের মুক্তিদাতা বলে, সহযোদ্ধা বলে ভাবতে পারে না। তাদেরকে ঐহিক-পারত্রিক জীবনের শত্রু বলেই মানে। কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাদের ছদ্ম হিতৈষী সেজে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে, পিঠ চাপড়ে মিষ্টি কথায়-শাস্ত্র কথায় ভোলায় আর তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে তাদের শ্রমের ফল ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ করে চিরকাল। কিন্তু এ তত্ত্ব বোঝে না বলেই আত্মীয়ের মতো মানববাদী কম্যুনিস্ট হয় তাদেরও ঘৃণার ও ভয়ের পাত্র। আর শোষক শ্রেণীই হয় তাদের বল-ভরসার অভয়শরণ। তাই গণমানবের দুঃখ ঘোচে না। মুক্তি আসে না। তাই পৃথিবী আজো গরিবের চোখে দোজখ।

বঞ্চনামুক্ত সমাজচিন্তা

AMARBOI.COM

এখন দেশ-রাষ্ট্র-সরকার-রাজনীতিক দলগুলো এবং সর্বোপরি দেশের গণমানব আমজনতা গণতন্ত্রের নামে একটা মহাসঙ্কট-সমস্যার শিকার হয়ে উদ্ধারের-নিস্কৃতির প্রয়াসে অনিশ্চিতির ক্লান্তির ও নৈরাজ্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। আমরা নগণ্য অপাংক্তেয় জন, আমাদের পক্ষে ক্ষমতার গদি দখলের ও হারানোর আশা-আশঙ্কা বিজড়িত এ রাজনীতির মারপ্যাঁচ জানা-বোঝা এবং তার সমাধান দেয়া সম্ভব নয়। কাজেই আমরা সে অপচেষ্টায় শ্রম-সময় ও মগজ ব্যয় করব না।

কিন্তু আমরা দেশবাসী, আমরা রাষ্ট্রের নাগরিক। আমাদের জন্যেই রাষ্ট্র ও সরকার, শাসক-প্রশাসক তৈরি হয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ও জীবিকার সর্বপ্রকার চাহিদা মেটানোই হচ্ছে রাষ্ট্রের, সরকারের, শাসক-প্রশাসকের সব শাখার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। কাজেই দেশবাসী হিসেবে নাগরিকের অধিকার প্রয়োগে আমজনতার পক্ষে কথা বলার, দাবি করার ও দাবি আদায়ের প্রয়াসী হওয়ার, প্রয়োজনে সরকারি অপকর্মের প্রতিকার চাওয়ার, প্রতিবাদ করার, প্রতিরোধে ক্ষোভ-ক্রোধ নিয়ে লড়াকু হয়ে রাস্তায় নামার, প্রচলিত অর্থে দ্রোহী হওয়ার আর কাগুজে বিবৃতির, মেঠো বক্তৃতার ও সড়কি মিছিলের আয়োজনে মেতে ওঠার দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায় স্বার্থে ও পরার্থে সমভাবে সচেতন শিক্ষিত শহুরে 'বুদ্ধিজীবী' নামের বিভিন্ন পেশার লোকদের ওপর।

এ-শ্রেণীর লোকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে এ-হাজার হাজার বছরের অসঙ্গত, অসমঞ্জস, অযৌক্তিক, অমানবিক শাহ-সামন্ত-বুর্জোয়া নীতি-নিয়মের বাঁধনে আটকেপড়া দুর্বলের পীড়ন-শোষণ এবং দুর্জনের পালন-পোষণ ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি ও ব্যবস্থা পাল্টানো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনারা আজকাল কম্যুনিজমের কথা শোনামাত্র উপহাসে উড়িয়ে দেন, সমাজতন্ত্রও আপনাদের মনোপূত নয়। নিরীশ্বরতা আপনাদের ক্রুদ্ধ ও মারমুখো করে। নাস্তিক্য আপনাদের অসহ্য। আর জঙ্গি-অজঙ্গি একনায়কত্ব কোনো লোকেরই পছন্দ নয়, দানবিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে সব শ্রেণীর মানুষের দিবারাত্রির স্বস্তি-শান্তি নষ্ট করে সদা সন্ত্রস্ত রাখে বলেই।

এসব কারণেই নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র অজ্ঞ অনক্ষর সাক্ষর শিক্ষিত সবাই একঘেঁয়ে প্রাজন্মক্রমিক গতানুগতিক অভ্যস্ত নীতি-নিয়মে, রীতি-রেওয়াজে, প্রথা-পদ্ধতিতে জীবনযাপনকেই স্বাভাবিক মনে করে। এতেই খুঁজতে থাকে স্বস্তি ও শান্তি, সন্ধান করে নিশ্চিতি ও নিশ্চিন্তি। এ ধারণা নির্বোধের স্বর্গের না হোক ভুলের কিংবা স্বপ্নের জগতের তো বটেই নিঃসন্দেহে। কেননা ছায়া-মায়া কিংবা কঙ্কাল হিসেবে জানা পৃথিবীর মানুষের সাত-আট হাজার বছরের প্রামাণিক ও আনুমানিক ইতিবৃত্তান্তে মানুষের সমাজে অশনে-বসনে-আবাসে কখনো সর্বজনীন অভাবমুক্তির নিশ্চিতির নিশ্চিন্তির কোনো খবর কিংবা আভাস মেলে না। দাস-ক্রীতদাস-ভূমিদাস প্রথায় এবং ঝড়-খরা-বন্যাজাত আকাল কবলিত নিঃস্ব-নিরন্ন-দুর্বল-দুস্থ-দরিদ্র মানুষের সবংশ মৃত্যু কিংবা দাসত্বে আত্মবিলুপ্তি ছিল অবধারিত।

কাজেই আজ অবধি চিরাচরিত নীতি-নিয়মে-রীতি-পদ্ধতিতে মানুষের জীবনে জীবিকায় নিশ্চিতি ও নিশ্চিন্তি মেলেনি, মার্কস নির্দেশিত ব্যবস্থায় ছাড়া। আমরা ব্যর্থ বলে উপহসিত সোভিয়েত-চীন-মার্কা সমাজতন্ত্রের কথা বলব না। কিন্তু এ-গতানুগতিক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মৌল মানবাধিকারের স্বীকৃতিতে ব্যক্তিকে খেয়েপরে বাঁচার অধিকার দানের জন্যে, স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ রাখার জন্যে, অসমর্থ পাগল পঙ্গু শিশু বৃদ্ধ রুগ্নদের ভাতা দিয়ে এবং সমর্থদের কাজ দিয়ে পৃথিবীতে নিরাপদে নিরুপদ্রবে বেঁচে থাকার, স্ব স্ব রুচিমতো জীবনোপভোগে জন্মগত অধিকার ভোগ করার ব্যবস্থা করা কি এ-কালে সরকারের তথা রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব-কর্তব্য নয়?

তাহলে কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচারের বা সুবিচারের প্রয়োগ করার লক্ষ্যেই সমাজ নতুন করে গড়ে তোলা যে আবশ্যিক ও জরুরি, তা স্বীকার করতে এ-কালের শিক্ষিত লোকেরাই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে রয়েছে। যদিও তারাও প্রত্যেক ব্যক্তির অশন-বসন-আবাস-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা-কর্মসংস্থান-ভাতা প্রভৃতি জীবনে অপরিহার্য বা আবশ্যিক চাহিদাগুলো মেটানো সমাজের, সরকারের ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব-কর্তব্য বলে কপট উচ্চারণে স্বীকার করে, কিন্তু বাস্তবে ব্যবস্থা গ্রহণে নারাজ। এ-জন্যে দেশের অর্থসম্পদ যারা নিয়ন্ত্রণ করে, যারা সাংসদ, আমলা, বুদ্ধিজীবী হিসেবে সমাজ-মানসের কাণ্ডারী, তাদের ফ্রিথিঙ্কার বা মুক্তমনের চিন্তক, উদার ও বিবেকী সুজন-সজ্জন হতে হবে নইলে আর্থিক সুবিচারে সমাজপরিবর্তনে শোষণ-পীড়ন ও প্রবঞ্চনা-প্রতারণা মুক্ত মানবিক গুণের-মানবতার-মনুষ্যত্বের প্রসাদপুষ্ট সমাজ গড়া, রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব হবে না কখনো। এমনি সমাজেই জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-গোষ্ঠী-গোত্র-ভাষা-যোগ্যতা নির্বিশেষে 'মানুষ' মাত্রই কেবল 'মানুষ' নামে বিকল্পে 'নাগরিক' আখ্যায় অভিহিত হবে। স্বসত্তা-সচেতন মানুষ মাত্রই পাবে সাধ্যমতো আত্মবিকাশের সুযোগ অঙ্গে ও অন্তরে এবং কর্মে ও আচরণে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতির রূপান্তর

যন্ত্রবিজ্ঞানের ও প্রকৌশলের প্রসারের ও উৎকর্ষের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন গোষ্ঠীতে, গোত্রে আঞ্চলিক সমাজে বিভিন্নভাবে গড়ে-ওঠা জীবনযাপনের, সহাবস্থানের গরজে নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ প্রথা-পদ্ধতি আজকাল দ্রুত বদলাচ্ছে, ক্রমে গোটা পৃথিবীতে মানসসংস্কৃতি ও আবাস, আসবাব-তৈজস- পোশাক-খাদ্য-আদব-কায়দা প্রভৃতিও শহুরে শিক্ষিত সমাজে অভিন্ন হয়ে উঠেছে মানব সভ্যতায়-সংস্কৃতিতে যে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা দেখা যেত বা এখনো যায় অধিকাংশ গোষ্ঠীতে, গোত্রে, আঞ্চলিক ও শাস্ত্রিক সমাজে কিংবা জাতিতে তার কারণ বিভিন্ন: জীবিকা অর্জনের সীমাবদ্ধতা, জমির উর্বরতা-অনুর্বরতা, বন্ধুরতা, আবহাওয়ার আনুকূল্য কিংবা প্রতিকূল্য, অন্য উন্নত সমাজের সান্নিধ্যগত প্রভাব কিংবা অন্য গোত্রের সঙ্গে পরিচয়ের অভাবে অজ্ঞ অসমর্থগোত্রের আবিষ্কার-উদ্ভাবনরিক্ত গতানুগতিকতা প্রভৃতি এবং অজ্ঞ-অসহায়-অসমর্থ মননহীন গোত্রের ও সমাজের কাল্পনিক অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির, নিয়তির অহেতুক লীলাময়তায় বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা প্রভৃতি।

আমাদের নিজেদের দেশেই দেখতে পাই আদি ও আদিমকালে দাসের, ক্রীতদাসের, ভূমিদাসের নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র অজ্ঞ-অনক্ষর বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা চালিত মানুষের আত্মাই-মনুষ্যত্বই স্বীকার করা হত না এ ভারতবর্ষে, গ্রীক দেশে এবং পৃথিবীর আরো বহু বহু দেশে। আমাদের ব্রাহ্মণ্য সমাজে দেবকল্প মানুষ ছিল, ছিল কেবল ব্রাহ্মণই। তাদের প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকায় অপরিহার্য সহযোগী হিসেবে কিছু লোক তাদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় পেয়েছে মাত্র, যেমন ক্ষত্রিয় এবং বৈদ্য-কায়স্থ প্রভৃতি সৎশূদ্র-যাদের ছোঁয়া ব্রাহ্মণকে অপবিত্র করে না, অন্যরা যারা নমঃশূদ্র-স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য চাঁড়াল-চামার-কামার-কুমার-নাপিত-ধোপা-হাড়ি-ডোম-মেথর-বাগদী প্রভৃতি ছত্রিশ জাতের মানুষকে মানুষ কিংবা পুরো মানুষ বলে এ সেদিন পর্যন্ত এমনকি বিশ শতকের শেষপাদ অবধি স্বীকার করার লোক উঁচুবর্ণের হিন্দুর মধ্যে বেশি নয় এবং নিগ্রোদের পুরো মানুষ বলে স্বীকৃতিদানে অনেক শিক্ষিত শ্বেতকায় লোকের বিবেকে রুচিতে বাধে।

ব্রাহ্মণ্যবাদ মানুষকে মানুষ বলে স্বীকৃতি দানে নারাজ, কায়েমীস্বার্থেই সব মানুষকেই ব্রাহ্মণেরা নিজেদের দাস ও সেবক রূপে আসমানি দোহাই দিয়ে পদপ্রান্তে কিংবা পাড়ায়-মহল্লায় ঠাঁই দিতেও ছিল অসম্মত। তাই তাদের সকালবেলা চেহারা দেখা, তাদের ছায়া গায়ে লাগা, তাদের ছোঁয়া লাগা প্রভৃতি এবং বেদাদি শাস্ত্র ওদের এবং নারীর পক্ষে শোনাও ছিল মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। এর ফলেই পরিবারের সবাই ছিল বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজনের কাছে দাসানুদাস বা দাসী। এ কারণেই ঘরোয়া সম্পর্কেও ছিল সন্তানও সেবক, দাস, চরণাশ্রিত, খাদেম, খাকসার, কোনো প্রিয়জন নয়। পূজ্যপাদ শ্রীচরণেষু, পাককদম মুবারকেষু, কদমবুসি, পায়ের বুড়ো আঙুলের ধূলি মাথায় মাখা ছিল বিনয়ের, আদবের, আনুগত্যের, সংস্কৃতির, সুরুচির, শোভন আচরণের আদর্শ আচারিক রূপ 'যা আজো রয়েই গেছে সমাজে', হিন্দুর প্রভাবে দেশি মুসলিম সমাজেও। বিধবাকে হয় সহমরণে কিংবা বাল্যবিধবাকেও সারাটি জীবন বিধবা থাকতে হত, তাকে পুরুষ সম্ভোগ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাণী মনে করা হত বলে, মানুষ বলে মানতে হত না কখনো। এ সেদিন পর্যন্ত অর্থাৎ পঞ্চাশের দিকে জমিদারী প্রথা উঠে যাওয়া অবধি জমিদারেরা, তালুকদারেরা, তরফদারেরা, জায়গীরদারেরা অর্থাৎ ভূম্যধিকারী মাত্রই রায়ত-প্রজাকে এবং খানাবাড়ির প্রজাকে বা ক্রীতদাসকে বা গোলাম গোষ্ঠীকে কখনো অন্তরে মানুষের মর্যাদা দিত না, সবাইকে দাস ও অনুগত অধীন দাসকল্পরূপেই ভাবত। বাড়ি ভিটেয়ও প্রজার অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এককথায় জমিদার মাত্রই স্বপ্রজার মধ্যেকার সচ্ছল গৃহস্থকে কিংবা ব্রিটিশ সরকারে ডেপুটি-মুন্সেফের চাকরিরত প্রজাকেও তার সামনে বসার অধিকার দিত না। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বড় চাকুরে ও বড় ধনী প্রজারা এ কারণে জমিদারের কাছে হীনমন্যতায় ভুগত প্রজন্মক্রমে। মনুষ্যসত্তার স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা সচেতন হয়ে, কখনো আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে মাথা উঁচু করে জমিদারের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে কিংবা প্রতিবাদী হতে সাহস পেত না। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাঙলাদেশের বারো কোটি মানুষ ভাতে কাপড়ে না হোক, অন্তত মনের দিক দিয়ে দেহে-প্রাণে-মনে মুক্ত ও স্বাধীন। এভাবে স্বসত্তার মূল্য-মর্যাদার সন্ধান পাওয়া যে কতো বড় পাওয়া, এ যে দৈশিক স্বাধীনতার চেয়ে হাজার লক্ষ গুণে বড় পাওয়া, তা প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে কাউকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। এভাবে প্রবলের দৌরাত্ম্যের জন্মগত অধিকার এক নীরব অবচেতন বিপ্লবের মাধ্যমে অবসিত হয়েছে, হচ্ছে, হবে আরো গভীর ও ব্যাপকভাবে।

আজ ঘরে-বাইরে কোথাও সমাজে চিরাচরিত নিয়মের লোকব্যবহার দেখা যায় না, শিক্ষিত ভদ্রলোক তথা সাফকাপুড়ে লোক দেখলেই আগে অপরিচিত অশিক্ষিত লোকেরা সালাম দিত, জমিদারের প্রভুত্ব প্রভাবে তারা এমনি অকারণ আনুগত্য প্রকাশে ছিল অভ্যস্ত। আজ কোনো রিকশাওয়ালা শিক্ষিত বৃদ্ধ ভদ্রলোককেও সোয়ারি হিসেবে কোনো সম্মান দেখায় না, পয়সার বিনিময়ে সোয়ারির কাছে শ্রম বিক্রয় করে মাত্র। তেমনি ধনী দোকানদারেরা অন্যের তথা ক্রেতার-সম্মান-সালাম পায় না। এখন এক কথায় দিনমজুর, ক্ষেতমজুর, মিনতি-কুলি নিঃস্ব দুস্থ দরিদ্র কেউ এখন কারো প্রজা ভৃত্য পোষ্য কিংবা হুকুম-হুমকির দাসরূপ প্রাণী নয়। সবাই 'মানুষ' এবং বাহ্যত শিক্ষা ও ধন বা সংস্কৃতি বৈষম্য সত্ত্বেও সব মানুষই রাস্তায়-বাসে-হাটে-মাঠে-ঘাটে সমান। যদি চাঁদার জন্যে, চাকরির জন্যে কিংবা উপকার বা সাহায্য সহায়তার জন্যে যেতে না হয়, তা হলে একালে যতোবড় চাকুরে হোন, যতো বড় শিল্পপতি হোন, যতোবড় ব্যবসায়ী হোন কেউ কারো সালামের-সম্মানের পাত্র নন। অবশ্য অনন্যগুণে, দানে কর্মে কেউ যদি শ্রদ্ধেয়, সম্মানীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন জীবন-জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে, সাহিত্যে-শিল্পে-বিজ্ঞানে-দর্শনে-আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে, তা হলে তাঁর প্রতি গুণগ্রাহী কৃতজ্ঞচিত্ত মানুষ শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্মান দেখাতে কখনো কার্পণ্য করবে না। অতএব মানুষের মনোজগতে একটা বিপ্লব ঘটেই গেছে, যাচ্ছে এবং আরো যাবে। আজ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এ স্বাধীনসত্তাচেতনা ভাব-কর্ম-আচরণে ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষের মধ্যে। আমি যখন কারো খাই না, পরি না, আমি কারো ধার ধারি না, আমি কেন অকারণে নিজেকে অন্যের চেয়ে হীন মনে করব? দীন হলেই কি হীন হতে হবে? এ জিজ্ঞাসা, এ অন্বেষা জেগেছে, জাগছে চির অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিত, অবজ্ঞাত গণমানবের মনে-মর্মে-মননে। মানুষের জয় হোক। হোক মনুষ্যসত্তার আত্মবিকাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনুষ্যসত্তার বিকাশ দ্রুততর হচ্ছে

বিশ্বব্যাপী দাস-ক্রীতদাস-ভূমিদাস-ভৃত্য-চাকুরে-কৃষক-শ্রমিক-আমলা-বণিক সবার জীবনেই এ যন্ত্রযুগের বদৌলত স্ব স্ব সত্তার মূল্য, মর্যাদা এবং অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা জাগছে নতুন করে। এ জন্যেই সর্দার-মাতব্বর-গোষ্ঠীপতি-নেতা কারুর পক্ষে এককভাবে স্বজনদের ও শাসিত-পোষিত-পালিতজনদের হুকুমে-হুমকিতে-আদেশে-নির্দেশে চালিত করা এ কালে সম্ভব হচ্ছে না। সেদিন অপগত। এখন যথার্থই সবাই দেহে-প্রাণে-মনে স্বাধিকারে স্বাধীনভাবে জীবন ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ করতে চায়। নানা শাস্ত্রকথায়, তত্ত্বকথায়, ন্যায়-নীতির দোহাই দিয়ে ভুলিয়ে রাখার দিন অবসিত-প্রায়। তাই উত্তর আয়ারল্যান্ড হাতছাড়া হচ্ছে ব্রিটিশ সরকারের, কুইবেক ছুটে যাচ্ছে কানাডা সরকারের কবল থেকে, অস্ট্রেলিয়া আর ব্রিটিশ জাতিত্বের বন্ধনে আটকা থাকতে চাইছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালোরা আর কোনো ক্ষেত্রেই বর্ণবৈষম্য সহ্য করবে না। নিগ্রোরা সুদানে আলাদা হতে চাইছে। উত্তর-পূর্ব ভারত গৌত্রিক, ভাষিক ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের যুক্তিতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যে সংগ্রাম করছে, লড়ছে শিখেরা আর কাশ্মীরী মুসলিমরা, মধ্য এশিয়ায় কুর্দিরা, মায়ানমারে কারেনেরা, ইন্দোনেশিয়ায় তিমুররা। শোষিত-বঞ্চিত দুর্বল অসহায় নির্জিত মানবেরা পৃথিবীর সর্বত্র শোষণমুক্ত হবার জন্যে, স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার জন্যে লড়ছে পৃথিবীর সর্বত্র। আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকায় এবং পূর্ব য়ুরোপে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও থেমে যায়নি, লঘু-গুরুভাবে চলছেই। একালে মানুষ যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে যৌক্তিক-বৌদ্ধিক জীবন যাপনে আগ্রহী। তবু ফ্রি থিঙ্কারের সংখ্যা বেশি নয়, স্বাধীন বা মুক্ত মনের চিন্তক সংখ্যা বাড়লে রাজনীতিক চিন্তায় চেতনায় উৎকর্ষ আসত।

অন্যদিকে বিজ্ঞানীর বদৌলত জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তথ্য ও সত্যভিত্তিক জ্ঞান-প্রজ্ঞা অর্জনের ফলে চিরাচরিত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-কল্পনা-আন্দাজ-অনুমান এবং শ্রেয়স ও প্রেয়স চেতনা যাচ্ছে দ্রুত বদলে। এখন ব্যক্তিক জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, সাংস্কৃতিক জীবনে পুরোনো নীতি নিয়ম, রীতি রেওয়াজ, প্রথা পদ্ধতি, আচার-আচরণ উপযোগরিক্ত বলেই পরিত্যক্ত হচ্ছে বৃক্ষের জীর্ণ বিবর্ণ পাতার মতোই। এ পরিবর্তন ঘরে ঘরে চালু হয়েছে, হচ্ছে অলক্ষ্যেই। অসচেতনভাবে যেন অনেকটা প্রাকৃতিক নিয়মেই। আগেই বলেছি, ফ্রি থিঙ্কিং বা যৌক্তিক চিন্তাচেতনানিষ্ঠা সমাজ জীবনোন্নয়নে সহায় হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৬৩ সালে নিগ্রোদের দাসত্বমুক্তি ঘটে, কিন্তু পীড়ন- শোষণ-বঞ্চনামুক্তি ঘটেনি। তারা ছিল উন্নাসিক শ্বেতাঙ্গদের বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায় মনুষ্যাকৃতির প্রাণীমাত্র– ওরাংওটাং শিম্পাঞ্জি-বুনোমানুষের জ্ঞাতি, বড়জোর আধামানুষ– পুরোমানুষ নয়। ফলে নিগ্রোরা-আফ্রিকানরা শ্বেতাঙ্গদের কাছে ঘৃণ্য অস্পৃশ্য অবজ্ঞেয় কিন্তু অবশ্য পোষ্য কেজো প্রাণী। তাই তাদের সেবা ও শ্রম আবশ্যিক ও জরুরি বটে, তবে তাদের সামাজিক সান্নিধ্য অবাঞ্ছিত ও অসহ্য। তাদের আবাস পৃথক, সমাজ পৃথক, স্কুল পৃথক, হাসপাতাল পৃথক অনেকটা বর্ণেবিন্যস্ত ভারতীয় সমাজের মতোই। কালোরা প্রয়োজনীয়, কিন্তু অস্পৃশ্য অপাঙ্ক্তেয় এমনকি আদালতি বিচারেও রয়েছে বৈষম্য। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেই হাজারে হাজারে প্রতিনিধি এসে রাজধানী ওয়াশিংটনে সমবেত হয়ে তারা বর্ণনির্বিশেষে নাগরিকের সমান অধিকার জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে দাবি ও আদায় করার জন্যে লড়াকু মেজাজে আন্দোলনের ও সংগ্রামের সংকল্প ঘোষণা করে গেল এ সপ্তায়। বিশ্বব্যাপী শোষিত-বঞ্চিত-প্রতারিত মানুষের এ জাগরণ মানবিক মূল্যবোধেরই উৎকর্ষ বলে মানব, দ্রোহ বলে জানব না। এ হচ্ছে প্রজন্মক্রমে হাজার হাজার বছর ধরে নির্জিত মানবতারই জাগরণ, মনুষ্যসত্তারই বিকাশ আমাদের চোখে। তবু আজো প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বও সমভাবে চালু রয়েছে। কায়রো-কোপেনহেগেন-বেইজিং সম্মেলনে প্রগতিশীলতার ও প্রতিক্রিয়াশীলতার এ চিরন্তন দ্বন্দ্বের স্বরূপ নতুন করে আন্তর্জাতিকভাবে বৈশ্বিক স্তরে প্রকট হয়ে উঠল। গোটা পৃথিবীতে এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও মৌলবাদ আজ প্রসারমান।

মৌলবাদ মাত্রই প্রগতিবিমুখ, অতীত ও ঐতিহ্যমুখী, গ্রহণে অনীহা এর বৈশিষ্ট্য, সম্মুখদৃষ্টি এর নেই, অতীতপ্রীতি এবং নতুনভীতি এর চারিত্র লক্ষণ। মানুষের মনের-মগজের-মননের-মনীষার যে বাঞ্ছিত ও শ্রেষ্ঠ অবদান নতুন চিন্তা, নতুন চেতনা, নতুন আবিষ্কার, নতুন উদ্ভাবন, নতুন নির্মাণ, তা থেকে মৌলবাদ মানুষকে বঞ্চিত রাখে, বন্ধ্যা রাখে মন-মগজ-মনীষা। লাটিমের মতো কিংবা কালের চাকার মতো জীবনযাত্রা এবং মন-মনন, নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি কেবলই গতানুগতিক ধারায় আবর্তিত রাখতে চায় মৌলবাদ। এগুতে দেয় না জিজ্ঞাসায়-অন্বেষায়, সংস্কৃতিতে-সভ্যতায়, নব নব উন্মেষে কিশলয়ের মতো মানুষের মনুষ্যত্বকে-মানবতাকে-মানবিক গুণকে বিকশিত হতে দেয় না বলেই 'মৌলবাদ' আমাদের কাছে মানবতারই বিপরীত তত্ত্বরূপে প্রতিভাত। এ জন্যেই আমরা মৌলবাদের প্রসারে আতঙ্কিতই হই। মৌলবাদের বিস্তার প্রকারান্তরে মানবতারই বিনাশ মাত্র। কাজেই প্রগতিশীলতার ও প্রতিক্রিয়াশীলতার দ্বন্দ্ব আজো সর্বত্র তীব্র। প্রগতিশীলতার ও প্রতিক্রিয়াশীলতার পার্থক্য দুই মেরুর ব্যবধানের ও বৈপরীত্যের মতো।

যৌক্তিক-বৌদ্ধিক চিন্তার সূচনাকাল

উনিশশতকের প্রথমপাদে যৌক্তিক-বৌদ্ধিক জীবনচেতনার ও জীবনযাপন পদ্ধতির প্রথম প্রবক্তা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর বৈষয়িক জীবনের এবং আচারিক জীবনের যে-সব সংবাদ আমরা পেয়েছি তাতে মনে হয় তিনি হয় নাস্তিক কিংবা অজ্ঞেয়বাদী অথবা সংশয়বাদী ছিলেন। সাধারণত ধার্মিক বলতে যা বোঝায়, তিনি তা ছিলেন না, কিন্তু সমাজের সাধারণ মানুষের জন্য তিনি ধর্মশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন। তাই ব্রাহ্মণ সন্তান হিন্দুয়ানী সম্পৃক্ত রেখে তাঁর পৌত্তলিকতা বিরোধী নতুন মতবাদ প্রচার করেন ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদকেই তাঁর মতবাদের উৎস ও ভিত্তি করে। কুরআনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইবেলের একেশ্বরবাদ তিনি এড়িয়ে গেছেন সম্ভবত হিন্দুসমাজই তাঁর প্রচারের লক্ষ্য ছিল বলে। পৌত্তলিকতায় ও পুরাণ কাহিনীতে অনাস্থাই তাঁর মুক্তবুদ্ধির ও যুক্তিবাদিতার পাথুরে প্রমাণ, এসূত্রে তাঁর ফরাসী গ্রন্থ তোফাতুল মুহায়েদীন অবশ্য স্মর্তব্য। কেননা এ রচনাতেই তিনি চিন্তায়-চেতনায় যুক্তির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

নিরীশ্বর নাস্তিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রাচীন ও মধ্যযুগের তথা অন্তত পনেরো শতকে অবসিত সাহিত্য-দর্শন সংস্কৃত কলেজে পড়েও, ডিরোজিয়োর ছাত্র না হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু কলেজের যে-কোনো প্রগতিবাদী দ্রোহী নাস্তিক মল্লিক-মুখার্জিদের চেয়েও বেশি মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিব্যদনিষ্ঠ হলেন। হিন্দু কলেজের দ্রোহী প্রগতিবাদীরা পরিণত বয়সে ও জীবনে নিষ্ঠ খ্রীস্টান, ব্রাহ্ম ও হিন্দু হয়ে গেলেন, ক্বচিৎ কেউ অজ্ঞেয়বাদী, প্রত্যক্ষবাদী, সংশয়বাদী ও নাস্তিক রইলেন। দায়ে পড়ে বিদ্যাসাগরের পাঠ্যবইয়ে আস্তিক ঘরের সন্তানদের জন্যে ঈশ্বরের কথা লিখতে হল। বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরও ছিলেন 'নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' এ ঈশ্বর সেমেটিকও নন, ঔপনিষদিকও নন। একে জেহোভা-আল্লাহ-ব্রহ্ম গুণের ঈশ্বর বলা যাবে না। উল্লেখ্য যে, উনিশশতকে বহুভাষাবিদ বিদ্বান অক্ষয় কুমার দত্ত মৃত্যুর কিছু পূর্ব কাল অবধি ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম জীবনে ছিলেন নাস্তিক, শেষজীবনে আস্তিক হলেও যুক্তিলগ্নতা কিছুটা ছিল।

বিশশতকে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিম সমাজে সংক্রমিত হলো যুক্তিবাদ। এ ক্ষেত্রে প্রথম যৌক্তিক-বৌদ্ধিক জীবনবাদিনী হলেন উর্দুভাষী পরিবারের কন্যা ও বধূ স্বশিক্ষিতা বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন। [১৮৮০-১৯৩২] ইনিও অন্তরে ছিলেন নিরীশ্বর নাস্তিক। তাই প্রকাশ্যেই ইংরেজি শিক্ষিত-বিরল মুসলিমসমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে প্রশ্ন করেছিলেন পৃথিবীর সব অঞ্চলে নবী-অবতার আবির্ভূত হলেন না কেন? নারী নবী-অবতারই বা নেই কেন? ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষরচিত বিধিব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে, শাস্ত্র পুরুষের বানানো, অপৌরুষের নয়। [নবনূর ১৩১১ ভাদ্র, নবনূর, ২বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১২৯৬/৯৮] এ সব প্রশ্নের যৌক্তিক জবাব মেলেনি। তিনিও জবাব প্রত্যাশা করেননি, কেবল দ্রোহ প্রকাশই, অনাস্থা জানানোই ছিল লক্ষ্য। পুরুষপ্রধান সমাজে শাস্ত্র যে পুরুষ-বানানো, তা বলাই ছিল উদ্দেশ্য।

বিশশতকের প্রথমপাদের আর একজন মুক্তবুদ্ধি যুক্তিবাদী এবং সম্ভবত অন্তরে নিরীশ্বর নাস্তিক কিন্তু মুসলিম সমাজের উন্নতিকামী স্বসমাজের হিতকামী রামমোহনের মতোই এবং রামমোহন-অনুপ্রাণিত ছিলেন সৈয়দ আবুল হোসেন [১৮৯৬-১৯৩৮] যৌবন প্রভাবে অভীক কিন্তু আস্তিক আরো কয়জন তাঁর সঙ্গে জুটেছিলেন তাঁর মতবাদের বা মুক্তবুদ্ধির সমর্থক রূপে। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিদ্যায় ও মননেশ্রেষ্ঠ কাজী আবদুল ওদুদ [১৮৯৮-১৯৭১], কাজী মোতাহার হোসেন [১৮৯৭-১৯৮১], কাজী আনোয়ারুল কাদির, 'আবদুল্লাহ' উপন্যাস রচক কাজী ইমদাদুল হক [১৮৮২-১৯২৬] সাময়িকভাবে এঁদের প্রভাব পড়েছিল কয়েকজন ছাত্রের উপর। ছাত্রদের মধ্যে [পরবর্তীকালে ওদুদ জামাতা] শামসুল হুদাই ছিলেন দ্রোহী নাস্তিক। আবুল ফজল [১৯০১-৮৩] ও আবদুল কাদির [১৯০৬-৮৪] শিখার ও মুসলিম সাহিত্য সমাজের কর্মী হওয়া সত্ত্বেও অন্তরে মুক্তবুদ্ধি বা যুক্তিবাদী হতে পারেননি, এঁদের রচনাবলিই তার প্রমাণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশশতকের প্রথমার্ধে ফ্রিথিঙ্কার বা মুক্তচিন্তক হিসেবে যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক চিন্তা-চেতনার গুরুত্ব সযত্ন প্রয়াসে জানানোর বোঝানোর মগজীশক্তি ও সাহস রাখতেন আর একজন ব্যক্তি, তিনি কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী [১৯০৩-৫৬]

রোকেয়ার মতিচুর, অবরোধবাসিনী, সুলতানার স্বপ্ন, পদ্মরাগ, আবুল হোসেনের প্রবন্ধ, গল্প, কাজী ওদুদের প্রবন্ধাবলি ও ব্যক্তিত্ব চরিতাবলি, কাজী মোতাহার হোসেনের সঞ্চরণ, মোহাম্মদ বরকতউল্লাহর [১৮৯৮-১৯৭২] মানুষের ধর্ম, মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সংস্কৃতি কথা, সভ্যতা। মুসলিম সমাজে সম্ভবত প্রথম উদার অসাম্প্রদায়িক বাঙালি মুসলিম লেখক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ [১৮৭১-১৯৫৩], কাজী নজরুল ইসলাম [১৮৯৯-১৯৭৬], ডাক্তার লুৎফর রহমান [১৮৮৯-১৯৩৬], আর এস শেখ ওয়াজেদ আলী [১৮৯০-১৯৫১] [তাঁর ভবিষ্যতের বাঙলা গ্রন্থে] অসাম্প্রদায়িক মানবিক চিন্তা-চেতনার অনুসারী। একালে অধিকাংশ মুসলিম লেখকই উদার অসাম্প্রদায়িক প্রগতিবাদী হলেও সকলেই ফ্রিথিঙ্কার নন। নাস্তিক নিরীশ্বর বা কম্যুনিস্ট না হলে কেউ মুক্তচিন্তক হতে পারে না, আর মুক্তচিন্তক না হলে নতুন চেতনার চিন্তার উন্মেষ ঘটে না, ফলে আবিষ্কারে উদ্ভাবনে সৃষ্টিতে জিজ্ঞাসায় অন্বেষায় জাতি ঋদ্ধ হয় না, বন্ধ্য থাকে মগজ। রেনেসাঁস-প্রগতি-বিবর্তন প্রাগ্রসরতা থাকে না সংস্কৃতি-সভ্যতায়।

AMARBOI.COM

বৈশ্বিকস্তরে জীবন-জীবিকা পদ্ধতি ও সংস্কৃতি

বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্য, তত্ত্ব ও সত্য আমাদের অবচেতন মনেও আমাদের অজ্ঞাতেই তার প্রভাব ফেলছে। আবিষ্কৃত উদ্ভাবিত নির্মিত যন্ত্রের বৈচিত্র্য, বহুমুখী প্রয়োগ, রোগের প্রতিষেধক, প্রকৌশল-প্রযুক্তির বিস্ময়কর উৎকর্ষ, আমাদের জীবন-জীবিকা পদ্ধতি প্রতিদিনই বদলে দিচ্ছে, আমাদের আগেকার কল্পনা-বিস্ময়-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা একালে অমূলক বলে প্রমাণিত হচ্ছে, আমাদের পূর্বেকার অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির ভয়-ভক্তি-ভরসা উবে যাচ্ছে। এখন নিয়তি নেই, দৈব নেই, আছে কারণ-কার্য তত্ত্ব ও তথ্যমাত্র। এখন জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা নির্ভর মানুষ আত্মসত্তার শক্তিতে সামর্থ্যে আস্থাবান হচ্ছে, কেবল দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনুশীলনেও যে মানুষ বিচিত্র ও বিস্ময়কর শক্তির, কৌশলের ও কর্মের অধিকারী হতে পারে, তেমনি মন-মগজ-মনন-মনীষার নিয়মিত নিষ্ঠ অনুশীলনে অনন্য অসামান্য জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-অনুভব-উপলব্ধির আধার ও আকর হতে পারে ব্যক্তি মানুষ। ইদানীং পূর্বকালে অন্যকথায় এ শতকের আগে পৃথিবীর অজ্ঞ অনক্ষর অসহায় ব্যক্তিরা তো বটেই, এমনকি সাক্ষর শিক্ষিতরাও ভূত-প্রেতাদি অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির নিয়ন্ত্রিত, নিয়তিচালিত, পাপ-পুণ্য প্রভাবিত, অদৃশ্য নিয়ন্তার কৃপায় করুণায় দাক্ষিণ্যপুষ্ট রোষ-শাসন পীড়ন ক্লিষ্ট মর্ত্যজীবনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আস্থা রাখত। এখন এসব আসমানী অরি-মিত্র শক্তি রূপকথার জগতের বিষয় হয়ে যাচ্ছে। এখন মানুষ সমুদ্রের তলদেশের, অরণ্যের ভেতরের, পর্বতের কন্দরের, নভোমণ্ডলের, আবহাওয়ার, ভূকম্পের, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের তত্ত্ব জেনে গেছে। ফলে দেব-দৈত্যের শারীর বা নিরাকার অস্তিত্বে আমাদের আস্থা বিলুপ্ত হয়েছে, হচ্ছে। তিনটে অপদেবতা– ওলা-শীতলা-ষষ্ঠী আমাদের মনে মর্মে অস্তিত্ব হারিয়েছে নিঃশেষে। বিজ্ঞানীদের সব আবিষ্কারই, নির্মিত সব যন্ত্রই এখন মানুষকে বাস্তববাদী, যুক্তিবাদী, অদৃশ্যশক্তির প্রতি ভয়-ভক্তি-ভরসাহীন করে তুলেছে। ফলে মানুষ এখন যন্ত্রনির্ভর যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রজগতে মাটির মানুষরূপে মর্ত্যজীবনকেই বাস্তব ও সত্য বলে মানছে, এ অবস্থায় যান-বাহনের বদৌলত সংহত ক্ষুদ্র পৃথিবীতে মানুষ জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে যন্ত্রের প্রয়োগ করছে।

এ অবস্থায় আগেকার অজ্ঞাত-অপরিচিত অগম্য ও দুর্গম পৃথিবীতে যেমন গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক, জাতিক, আঞ্চলিক, দৈশিক জীবন আর বিচ্ছিন্নতার ব্যবধানের দরুন অজ্ঞাত দৈপায়ন কিংবা আরণ্যক কিংবা পার্বত্য ছিল, এখন আর তেমন নেই। এখন পৃথিবীকে, পৃথিবীর জনসম্পদকে সর্বক্ষণ চোখে দেখা সম্ভব, মানুষের কথা কানে শোনা সহজ, যে-কোনো ব্যক্তির সঙ্গে তারে-বেতারে আলাপ হচ্ছেই, এখন কবির ভাষায় আক্ষরিক অর্থেই দূর পেয়েছে চোখে কানে দেখা শোনার নৈকট্য, আর পরও হয়েছে, হচ্ছে একবাজারের পণ্য বেচা-কেনার চেনাজন, রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যের দেয়াল থাকা সত্ত্বেও আজ মানুষ হয়ে উঠছে একক সমাজের লোক বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক লেন-দেনের এবং সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক আর্থ-বাণিজ্যিক আর জ্ঞান-বিজ্ঞান-যন্ত্র, প্রযুক্তি প্রকৌশল খেলাধুলা খাদ্য পোশাক ভাস্কর্য স্থাপত্য সাহিত্য চিত্রশিল্প সংগীত প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে। আমরা অবশ্য জানি, আমাদের উপর্যুক্ত মত, মন্তব্য, ধারণা অনেকেই স্বীকার করবেন না। কারণ তাঁরা আমাদের মতো সচেতনভাবে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-মন-মগজ-মনন-মনীষার প্রভাব আমজনতার মধ্যে প্রকট দেখেন না, আমরাও সবার মধ্যে তথা বন্ধ্যমনের-মগজের-মননের মানুষের গতানুগতিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে তা প্রত্যক্ষ করি না বটে, তবে চেতনার একটা অদৃশ্য বা ফল্গুধারা পদ্মার পার ভাঙার মতোই বিভিন্ন প্রজন্মের ও পরিবেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষের অভ্যস্ত মন, মত ও মনন নিত্যই ভেঙে ভেঙে নতুন করে গড়ে তুলছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। প্রাজন্মিক ও কালিক ব্যবধানে তা অনুভূত, উপলব্ধ ও দৃশ্যমান হয়। আমরা বিরল প্রমাণে এবং আন্দাজে তা ধারণাগত করে আনুমানিক সিদ্ধান্তে আস্থা রাখি কল্যাণকামীর আকুল আবেগ বশে।

জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-মন-মগজ-মনন-মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অনেক কাল থেকে বলেই আসছেন যে, মানুষের জীবনের সমাজের রাষ্ট্রের কল্যাণ নিহিত রয়েছে Rationalism-এ Secularism-এ Liberalism-এ এবং Socialism-এ এবং গণতন্ত্রে নয়। জাত-জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা পেশা-শ্রেণী নির্বিশেষে পঙ্গু পাগল শিশু, রুগ্ন বৃদ্ধ নারী-পুরুষ অবিশেষের ভাতে কাপড়ে খেয়ে-পরে মর্ত্যজীবন ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগের জন্মগত অধিকার স্বীকৃতির ভিত্তিতে জনগণতন্ত্রেই রয়েছে মানুষমাত্রেরই অঙ্গে-অন্তরে মুক্তি ও সর্বজনীন মানবকল্যাণ। অবশ্য না বললেও চলে যে, আশৈশব দৃষ্ট, শ্রুত ও লব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা ও অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির ভয়-ভক্তি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভরসা নিঃশেষে বর্জন করতেই হয়, তাহলেই একজন ব্যক্তি ফ্রিথিঙ্কার হতে পারে এবং উঁচুমানের মগজী ফ্রিথিঙ্কারই কেবল Rationalism, Secularism, Liberalism এবং Socialism-এর আবশ্যিকতা ও গুরুত্ব সহজেই অনুভব-উপলব্ধি করতে পারেন। একজন লোক Rational হলেই যুক্তি-বুদ্ধি প্রজ্ঞা প্রয়োগে Secular হয়ই, আর Secular হলে Liberal হতেই হয়, এবং Liberal মানুষমাত্রই মানবতা বশে গণমানবের সর্বপ্রকার শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনামুক্ত জীবন কামনা করেই, কাজেই তার পক্ষেই নির্দ্বিধায় জনগণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সমর্থক হওয়া সম্ভব ও সহজ।

এখনো আমাদের পৃথিবীতে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতের কারণ হচ্ছে Social, Regional, Religious এবং Linguistic স্বাতন্ত্র্যচেতনা ও তার সংরক্ষণ প্রয়াস। অস্তিত্বরক্ষার অবচেতন ঈহা থেকেই এ স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি গুরুত্ব পায়, এর মধ্যে রয়েছে সংকীর্ণচিত্ততা, গ্রহণবিমুখতা, বিচ্ছিন্নতার ও নিরাপত্তার স্বস্তি। সবটাই মূলত আধিমাত্র কর্মঠস্বভাবেরই সাক্ষ্য ও প্রমাণ। যুক্তিবাদীর ও শ্রেয়সবাদীর পক্ষেই সম্ভব মানবিক গুণের বিকাশ সাধন, মানবতার অনুশীলন। এ অনুশীলনে ও চর্যায় ব্যক্তির মধ্যে ষড়-আঙ্গিক সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে। ব্যক্তি সংযত, পরমত-কর্ম-আচরণ সহিষ্ণু, যুক্তিনিষ্ঠ, ন্যায়বান, বিবেকানুগত ও পরার্থপর সুজন হয়। এ ষড়গুণের মানুষই হয় পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতিমান মানববাদী। তখন তার মুখেই বুকের সত্য, মনের মর্মের খাঁটি অনুভব ও উপলব্ধিপ্রসূন উচ্চারিত হয়: এ মর্ত্যজীবনই সত্য এবং মানুষের চেয়ে বড় কিছুই নেই, নেই কিছু মহীয়ান এবং এ অনুভব-উপলব্ধিই ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস পেশা শ্রেণী নির্বিশেষে মানুষকে মানুষ রূপে আত্মীয়-কুটুম্ব-বন্ধুরূপে বরণ করা, মানুষ অবিশেষের প্রতি প্রীতি রাখা, এবং বসুধৈবকুটুম্বকম ভাবা আর স্বাতন্ত্র্যের বাধা-ব্যবধান-বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে দিয়ে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক অভিন্ন সংস্কৃতিতে আস্থাবান হয়ে বিশ্বমৈত্রীচেতনায় ঋদ্ধ হওয়া। কেননা, আমরা সংকীর্ণচিত্তের, বদ্ধচেতনার, বন্ধ্যমন-মগজ-মনন-মনীষার লোক হওয়ার ফলেই বুঝতে পারি না যে, আমরা স্ববিরোধিতায় এবং একাধারে ও যুগপৎ বিপরীত চেতনায় আর অসঙ্গত, অসহিষ্ণু আচরণে নিত্যকার জীবনে দিশা হারাই। যেমন স্বদেশে বা স্বরাষ্ট্রে বিভিন্ন জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষার-নিবাস-পেশা-শ্রেণীর লোকের দ্বেষণা-হিংসা-ঘৃণা-অবজ্ঞা-শোষণ-বঞ্চনা সম্পৃক্ত রেষারেষি-কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানিকে বলি অনভিপ্রেত সাম্প্রদায়িকতা। আবার একই কারণে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি দ্বেষণা, অপ্রীতি ও অমৈত্রীকে বলি আদর্শ জাতীয়তা। স্বরাষ্ট্রে যে দোষ, ভিন্নরাষ্ট্র সম্পর্কে তা গুণ। যেমন জার্মানী একই গোত্রের, ভাষার ও ধর্মমতের লোকের রাষ্ট্র। গ্রেট ব্রিটেন তা নয় বলে একক শাসনে রাখার গরজে স্কচ রাজা এনে লন্ডনে সিংহাসনে বসায়, ওয়েলসের লোকের তুষ্টির জন্যে যুবরাজকে প্রিন্স অব ওয়েলস বলে, আয়ারল্যান্ড কোনো বন্ধন সূত্র খুঁজে না পেয়ে দ্রোহী ও বিচ্ছিন্ন হয়। ভিন্নমতের, গোত্রের বর্ণের ধর্মের ও চেতনার লোককে জোরে জুলুমে শাসনে রাখলে জাতীয় পতাকায়, জাতীয়সঙ্গীতে কিংবা তথাকথিত সংস্কৃতিতে ও স্বার্থে তাদের আন্তরিক সাড়া-সমর্থন মেলে না। একাল ব্যক্তিসত্তার মূল্যমর্যাদায় স্বীকৃতি দানের কাল, একালজাতি, উপজাতি, আদিবাসী জনজাতিকে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে দেয়ার কাল, একাল হচ্ছে জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে নাগরিক মাত্রকে যোগ্যতা অনুসারে তার প্রাপ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়ার কাল। এককথায় পাড়ায়-মহল্লায়, গাঁয়ে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, রাষ্ট্রে, বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে সর্বত্র সর্বপ্রকার পণ্য বিনিময়ে, সংস্কৃতি বিনিময়ে, সামবায়িক আদর্শে ও সহযোগিতায় সমান নিরাপদ সহযোগিতার কাল। বিশ্বশান্তি এভাবেই সম্ভব। সহযোগিতার, সমমর্তিতার, অভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতি গ্রহণের বরণের কিছু নিদর্শন এখনো মেলে। এখন বৈশ্বিকস্তরে আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি, পোশাক স্যুট, সন তারিখ খ্রীস্টাব্দ, খাদ্য পাঁচতারা হোটেলের, আর নাচে-গানে-বাদ্যে অভিনয়ে, সুরে তালে-রাগে উচ্চশ্রেণীর মানুষের সাহিত্য শিল্পচর্চায়, ঘরে আটপৌরে জীবনযাপন পদ্ধতিতে, তৈজসে-আসবাবে অভিন্নতা প্রকট। সিনেমা, ক্যাসেট, রেডিও, টিভি, ডিস অ্যান্টেনা, কম্প্যুটার-ফ্যাক্স-স্যাটেলাইট মাধ্যমে তারে-বেতারে বৈশ্বিক জীবনসংলগ্নতা সার্বক্ষণিক হয়ে উঠেছে একজন গৃহবন্দী শয্যাশায়ী ব্যক্তিরও। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-প্রকৌশলের প্রসাদে মানুষের জগৎচেতনা ও জীবনভাবনা এর মধ্যেই আমূল পরিবর্তন হতে শুরু করেছে- ভবিষ্যতে এর উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য কল্পনা করার, অনুমান করার সাধ্যও আমাদের নেই। পরপ্রজন্মে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক মানবিক সম্বন্ধ-সম্পর্ক যে একেবারেই ভিন্নরূপ ধারণ করবে, তাতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের কারণ নেই। তখন জগৎজুড়ে এক জাতি থাকবে, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে ও জীবন-জীবিকায় সাংস্কৃতিক অভিন্নতায় সে-জাতির নাম হবে অভিন্ন মানুষ জাতি।

AMARBOI.COM

কম্যুনিস্টরা ও আমরা

আমার জন্ম ১৯২১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে। শুনেছি সেই সন থেকেই বাঙলায় কম্যুনিস্ট দল গড়ে ওঠে এবং ১৯২৬ সনে তা ব্রিটিশভারতে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। আমরা জানি, কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ও সংগ্রামের নাম যদিও নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র অজ্ঞ অনক্ষর শোষিত বঞ্চিত প্রতারিত পীড়িত দলিত শ্রমিক-কৃষকের মুক্তিআন্দোলন আর এ সংগ্রাম হবে এবং সংগ্রামে সাফল্য আসে ও আসবে শ্রমিক-কৃষক-সর্বহারার নেতৃত্বে ও সংগ্রামে। কিন্তু বাস্তবে আমরা গোটা বিশশতক ধরেই পৃথিবীর সর্বত্র দেখে আসছি কম্যুনিস্টরা ও কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নেতারা সবাই সাক্ষর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের, নিম্নমধ্যবিত্তের এবং উচ্চবিত্তের লোক। মানবদরদী মানবিকগুণের ও হৃদয়ের মানববাদীরাই হয় কম্যুনিস্ট। শোষিত-বঞ্চিত-প্রতারিত দলিত-অবজ্ঞেয় অস্পৃশ্য মানুষকে মানবমর্যাদায় ও অধিকারে সমাজে ও রাষ্ট্রে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে যোগ্যতানুসারে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ করাই হচ্ছে কম্যুনিস্টদের লক্ষ্য। এ জন্যে সমাজের গতানুগতিক অযৌক্তিক অসঙ্গত নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি বদলে নতুন বৈষম্যের সশেকড় উচ্ছেদসাধন করে নতুন সাম্যের ও ন্যায়ের শাসন ও সমাজ প্রতিষ্ঠাই কম্যুনিস্টদের লক্ষ্য, যার এ কালিক নাম জনগণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা। একই পরিবারের সদস্যদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো মমতায় ও বণ্টনে, সহযোগিতায়, সহমর্মিতায় ও সহাবস্থানে স্বস্তিতে নিরাপদে নির্বিরোধে বাঁচা। অতএব একজন মানবদরদী যুক্তিবাদী-শক্তিমান সাহসী পরার্থপর ত্যাগ-তিতিক্ষা-প্রবণ-ভোগবিমুখ-পদপদবী-মান-খ্যাতি-সুখ-শান্তি-আনন্দ-আরামে অনীহ কষ্টসহিষ্ণু এবং প্রাণ হারাতে সদাপ্রস্তুত অনন্য নারী বা পুরুষ হয় কম্যুনিস্ট। আর আমরা হলাম বিপরীত মেরুর মানুষ।

আমরা বাল্য-কৈশোর থেকেই বিদ্যায়-বিত্তে, পদে-পদবীতে, সমাজে-রাষ্ট্রে মান যশ খ্যাতি ক্ষমতা দর্প দাপট প্রভাব প্রতিপত্তি লাভের স্বপ্ন ও সাধ নিয়েই অনন্যচিত্তে ও লক্ষ্যে জীবন চালিত করি। এতে কারো সাফল্য আসে, কারো আসে না। জীবনে সাফল্য-ব্যর্থতা থাকেই। আমরা নিজের ও পরিবারের জন্যেই বাঁচি। আমাদের কাজ-অকাজ, সুকর্ম-দুষ্কর্ম সবটাই ওই নিজের এবং স্ত্রী-সন্তানের সুখের লক্ষ্যেই করে থাকি। অন্যদিকে একজন কম্যুনিস্ট জীবন-যাপন করে স্বস্তি-শান্তি-নিরাপত্তাহীনভাবে, সে হয় নিশাচর পরপোষ্য, পরাশ্রিত। কেননা ধরা পড়ার ভয়ে সে লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে বেড়ায়। তাই পেচকের মতো রাতই তার জাগ্রত কর্মবহুল কাল। সে থাকে আলোভীত আঁধারে প্রীত। তার মিত্র দুস্থমানবতা আর শত্রু হচ্ছে পরস্বভোগীরা, কায়েমীস্বার্থবাদীরা যারা মানুষকে শোষণ-শাসন-পেষণ-পীড়ন-দলনযোগ্য প্রাণীই ভাবে মাত্র এবং তাদের অন্নে-বস্ত্রে তথা খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার স্বীকারই করে না। এমন এক কালও ছিল যখন দাসের ও নারীর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হত না, এখন যেমন শাস্ত্রপন্থীরা মানুষ ব্যতীত অন্যপ্রাণীর প্রাণের ও জীবনের মূল্য স্বীকারই করে না জিন বর্ধমান মহাবীরের কিংবা গৌতমবুদ্ধের উচ্চারিত স্বীকৃতি সত্ত্বেও। মানুষের আত্মাই অবিনশ্বর, মানুষেরই কেবল পারত্রিক জীবন, মোক্ষ, ত্রাণ, নির্বাণ কিংবা অনন্ত সুখ-দুঃখের জীবন রয়েছে, অন্য প্রাণী-উদ্ভিদের নেই, কেননা মানুষই স্রষ্টার সৃষ্টির লক্ষ্য, অন্যসব সৃষ্ট হয়েছে তাদের প্রয়োজনে নানাভাবে লাগবে বলেই। এমন ধারণা অদ্ভুত অযৌক্তিক অবৌদ্ধিক অসঙ্গত হলেও আজো তা শাস্ত্রপন্থীদের মর্মমূলে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। আমরা এ ধারণার পোষক ও লালক। আমাদের দলে আছে লাখে নিরেনব্বই হাজার নয়শ নিরেনব্বই জন, হয়তো তারও বেশি। এ জন্যেই ওই সর্বত্যাগী ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগসুখ বিমুখ কম্যুনিস্ট মাত্রই আমাদের চোখে সমাজের উপসর্গ-উপদ্রবস্রষ্টা সন্ত্রাসী গলাকাটা ডাকাত। এখন যেমন 'রগ' কাটা জামায়াত-ই-ইসলামীর ছাত্র শাখার শিবির সদস্যরা জনধিকৃত ঘৃণ্য সন্ত্রাসী ওরাও তেমনি দুষ্ট।

আমরা জানি পৃথিবীতে চিরকালই শাহ-সামন্ত-ধনী-মানীরা ছিল সংখ্যায় করগণ্য, আর নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র অজ্ঞ অনক্ষর দাস-ক্রীতদাস-ভূমিদাস-গৃহভৃত্য, মজুর শ্রেণীর কিংবা স্বল্প আয়ের ঘরানা পেশায় নিযুক্ত চাঁড়াল-চামার-কামার-কুমার-নাপিত-ধোপা-হাড়ি-ডোম-জেলে-নিকেরী-মুলুঙ্গি প্রভৃতি ছত্রিশ জাতের বা শতপেশার দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ, এরা অস্পৃশ্য বা পৃশ্য হলেও এক কথায় ঘৃণ্য ছোটলোক, দেব-দ্বিজেরও কৃপা-করুণা বঞ্চিত, পূর্বজন্মের কর্মফলে পতিত। কাজেই আল্লাহ-ঈশ্বর-ব্রহ্ম-যেহোভা যাদের প্রতি অকরুণ, তাদের দুঃখ-যন্ত্রণা-বঞ্চনা-দমন-দলনমুক্ত করার প্রয়াসীরা প্রত্যক্ষভাবেই ঈশ্বর-শত্রু, দ্রোহী। ধর্ম, শাস্ত্র ও নীতিভ্রষ্ট না হলে কেউ কি কম্যুনিস্ট সমর্থক হতে পারে? এ-ই হচ্ছে আমাদের মতো লাভ-লোভ-স্বার্থচেতন, আত্মরতিসর্বস্ব কায়েমী স্বার্থবাদী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুবিধেবাদী সুযোগসন্ধানী নগদজীবী মানুষের জগৎচেতনা ও জীবনভাবনাজাত প্রজ্ঞাপ্রসূত অভিমত। অতএব কম্যুনিস্টের মতো অপবুদ্ধির অমানুষ চোর ডাকাত খুনি গুণ্ডা মস্তান বদমায়েশ লম্পট প্রবঞ্চক প্রতারকরাও নয়, তাই তাদের সামাজিভাবে সহ্য করা হয়। ঈশ্বরও তাদের নাকি শেষাবধি ক্ষমাই করেন, কিন্তু কম্যুনিস্টকে নৈবচ নৈবচ। এ জন্যে দুনিয়ার কোনো ধনবাদী পুঁজিবাদী-মুক্তবাজার অর্থনীতিবাদী সরকার, সমাজ বা রাষ্ট্র কম্যুনিস্টকে সহ্য করে না। যদিও কম্যুনিস্ট মাত্রই সংস্কৃতিমান হৃদয়বান এমনকি চিত্তবানও, তবু শিল্পী-সাহিত্যিক-রাজনীতিক বিশিষ্ট ও নতুন চেতনা-চিন্তার উদ্ভাবক প্রবর্তক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক প্রমুখ সবাই দুনিয়ার সব মানুষের সব অপকর্ম অপরাধ সহ্য ও ক্ষমা করতে পারেন পরম উদারতায়, কেবল সহ্য করেন না, করতে পারেন না কম্যুনিস্টকে, মার্কসকে ও মার্কসবাদকে। আমরা মাথাগুণতি সংখ্যায় সাড়ে পাঁচশ কোটি মানুষের মধ্যে চারশ কোটিরও বেশি, কাজেই কম্যুনিস্টরা আমাদের কাছে অমানুষ অপাঙ্‌ক্তেয়, তারা হননযোগ্য শত্রু। যেখানেই তাদের পাও, ধর, মার, হান, অন্তত তাড়িয়ে দাও। তাই চেগুয়েভারা, সিরাজ সিকদার, চারু মজুমদার, গঞ্জালো প্রমুখ বড়-ছোট-মাঝারি যে-কেউ পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তের হোক তাঁদের যেখানে পাও, যেমন করে পাও হত্যা কর। উৎখাত কর মার্কসীয় মতবাদ, বিলুপ্ত কর এদের দল। কম্যুনিস্ট, কম্যুনিজম ও মার্কসবাদের প্রতি দুনিয়াব্যাপী শাস্ত্রপন্থী সমাজের ঘৃণা ও ভীতি এতো প্রবল যে, সংবাদপত্রে এদের কোনো শোকসভার সংবাদ ছাপা হয় না। আমাদের বাঙলাদেশে কোনো দৈনিক কাগজই আমাদের এতোগুলো কম্যুনিস্টদলের বা সঙ্ঘের কারো কোনো সভার খবর অন্তত সভা হয়েছিল, তা শোকসভা কিংবা স্মরণসভাই হোক, সে-খবরও দিতে রাজি নয়। ঢাকায় কম্যুনিস্টদেরও প্রকাশ্য রাজনীতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে সভা হয়, সভার বিবরণ প্রকাশিত হয় না। পাছে তাদের সন্তানেরা-স্বজনেরা পথভ্রষ্ট হয়, প্রভাবিত হয়, এ ভয়েই সম্ভবত তারা বিবরণ মুদ্রণে প্রচারে বিরত থাকে।

AMARBOI.COM

কম্যুনিজমের দেহ-প্রাণ-মন-মত বিলুপ্ত করেছে ভেবে যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তারই প্রয়োজনে তারই অর্থে, প্রেরণায়, প্রণোদনায় প্রবর্তনায় গজিয়ে-ওঠা ও প্রবল-হওয়া মৌলবাদ যখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে খ্রীস্টান বিরোধীরূপ নেয়ার আলামত প্রকটিত হতে থাকে, উত্তর-আফ্রিকায় ও পশ্চিম এশিয়ায় তেলে চাঙ্গা-হওয়া আর প্রতীচ্যশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ হওয়া মুসলিম রাজনীতি-কূটনীতি, তখন শঙ্কিত য়ুরোপ-আমেরিকার খ্রীস্টান রাষ্ট্র মৌলবাদ বিরোধী হয়ে ওঠে মৃদু-মন্দভাবে, ঠিক সেই সময়েই আবার শীতশেষের বাসন্তী হাওয়ায় প্রাণ-পাওয়া ঔষধি তরুলতার মতো গজিয়ে ওঠা কম্যুনিস্টরা বুলগেরিয়ায়, পোল্যান্ডে, জর্জিয়ায়, কাজাকিস্তানে এবং খাস রাশিয়ায় ক্ষমতার গদি কবলিত করছে দেখে আতঙ্কিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের ক্ষুদ্ররাষ্ট্র বাংলাদেশেও কম্যুনিস্ট ঠেকানোর কাজে মনোযোগী হয়ে উঠেছে, মৌলবাদ ঠেকানোর গরজ অবশ্য এখানে তারা তেমন অনুভব করে না। তাই 'তৃণমূল সংগঠন' নামে দরিদ্র জনতার এক আন্দোলনধর্মী বা প্রচারধর্মী ও দারিদ্র্য বিলুপ্তি সঙ্ঘ গড়ে তুলেছে এবং পয়লা জানুয়ারিতেই NGO নেতৃত্বে গ্রামীণ লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষের সম্মেলন হয় মানিকমিয়া অ্যাভিন্যুতে। আপাতত এটি আসন্ন নির্বাচন পূর্বকালে বিএনপি সরকারের মিথ্যা উন্নয়নের জোয়ার প্রচারণার স্বরূপ উদ্ঘাটনমূলক প্রতিবাদী সম্মেলনরূপে প্রতিভাত ও প্রচারিত হলেও এ যে গাঁয়ে-গঞ্জে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম্যুনিস্ট কর্মীদের প্রভাব ও প্রচারের আবেদন প্রতিরোধ করার সূক্ষ্ম ও সক্রিয় প্রয়াস, তা বুদ্ধিমানদের বুঝতে সময় লাগবে না। একেতো NGO-রা দেশের অজ্ঞ-অনক্ষর নিঃস্ব বেকার ও দুস্থ দরিদ্র আমজনতাকে দুর্ভিক্ষমুক্ত রাখার দায়িত্ব ইজারারূপে নিয়েইছে, আমাদের আর্থ-বাণিজ্যিক-মহাজনী সাম্রাজ্যবাদ কবলিত রাখার জন্যে এবার আবার নতুন করে পরম আগ্রহে আয়াসে ও প্রয়াসে আর বিপুল অর্থ ব্যয়ে এ তৃণমূল সংগঠন গড়ে তুলেছে। এরা আমাদের মরতেও দেবে না, উঠতেও দেবে না। উর্ধ্বচাপ ও নিম্নচাপ বজায় রাখবেই। দুঃখের কথা, এসব কাজে মুৎসুদ্দি সরকারের এবং বুদ্ধিজীবী নামের নানা পেশার শহুরে শিক্ষিত লোকদেরও সোল্লাস সমর্থন আছে। কারণ আমাদের বুদ্ধিজীবীরা এখন সাধারণভাবে নৈতিক ও সামাজিক চেতনাভ্রষ্ট সুবিধেবাদী, সুযোগসন্ধানী ও নগদজীবী হয়ে উঠেছে নির্লজ্জভাবে, অতএব এখন দেশের বড় দুর্দিন। কম্যুনিস্টের অপরাধ সে মানুষকে আত্মীয়-স্বজনের মতো ভালোবাসে, তার অপরাধ সে শোষিত বঞ্চিত দলিত মানুষদের শোষণ পীড়ন বঞ্চনা প্রতারণা দলন থেকে মুক্ত করতে চায়, বর্ণেতে-শ্রেণীতে-ঘরানা পেশাতে প্রজন্মক্রমে হাজার হাজার বছর ধরে বিভক্ত ও বন্দী, দাসত্বে ও দারিদ্র্যে, নিঃস্বতায় ও নিরন্নতায় লৌহ কঠিন সামাজিক ও শাস্ত্রিক নিয়মের দ্বারহীন খাঁচায় বদ্ধ। এরা প্রজন্মক্রমে হাজার হাজার বছর ধরে ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, সুখের ঘর, সাধের খাদ্য ও বস্ত্র থেকে বঞ্চিত। আমাদের জ্ঞাতি সাধারণ চাষী-মজুরও পিতৃঋণের বোঝা বয়েই জন্ম থেকে মৃত্যুকাল অবধি জীবন কাটায়, যে-ঋণের ভার আরো বাড়িয়েই হয়ত সন্তানকে নিঃস্বতায় ও অসহায়তায় রেখে যায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষায় :

ওই-যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূকসবে, ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী, স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ
তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটিঅন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।
এমন কি! সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধনিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।

কবি তো শোষণ-পীড়নের হৃদয়গ্রাহী বয়ান দিয়েই তাঁর দায়িত্ব-কর্তব্য শেষ করেন। এমনকি মানুষের মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করেই কবি শোষক-পীড়ক-বঞ্চক শ্রেণীর সমাজেই আরামে আয়েশে সুখের জীবনযাপন করেন। তাঁর নির্দেশিত পথে ওদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুঃখ যন্ত্রণা মোচন লক্ষ্যে যারা সর্বত্যাগী হয়ে স্বেচ্ছায় সানন্দে দেহ-প্রাণ-মনের চাহিদাবিমুখ হয়ে মৃত্যু-নির্যাতনের ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আপোসহীন বিরামহীন অনিশ্চিত ফল সংগ্রামে, তারাই নিন্দিত, ধিকৃত হয় কেন শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতার শত্রু বলে?

যারা "অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান লক্ষ মুখ দিয়া", তাদের থেকে অর্থসম্পদ কেড়ে নিয়ে শোষিত বঞ্চিতদের ন্যায্য প্রাপ্য মিটিয়ে দেয়া কি অপরাধ?

অথচ কম্যুনিস্টদের অপরাধ তারা কার নির্দেশ মতো 'এই সব মূঢ়ম্লান মূক মুখে ভাষা' দেয়ার জন্যে 'এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে' আশা জাগানোর জন্যে, শোষিত বঞ্চিত অজ্ঞ অনক্ষর নিঃস্ব বিপন্নদের এককাট্টা হয়ে শোষক-শাসক বঞ্চক প্রতারক কায়েমীস্বার্থবাদদের রুখে দাঁড়ানোর আহবান জানাচ্ছে। অন্যায় প্রতিরোধকল্পে সংগ্রামে অনুপ্রেরণা, প্রণোদনা, উদ্দীপনা, উত্তেজনা ও প্রবর্তনা দান কি অপরাধ? আমরা মুখে গরীবের প্রতি সহানুভূতি পরিব্যক্ত করি, অন্তরে কামনা পুষি তাদের শ্রম, সময়, অর্থ-বিত্ত-যোগ্যতা দক্ষতা লুণ্ঠনের কিংবা সস্তায় ক্রয়ের। আমরা কপট, আমরা হৃদয়হীন স্বার্থপর। আমরা কাড়তে জানি, ছাড়তে জানি না, আমরা দিতে নারাজ, পেতে আগ্রহী। অতএব কম্যুনিস্টমাত্রই আমাদের জানিদুশমন।

অতএব কায়েমীশোষণ চিরন্তন হয়ে থাক। ধনবাদীদের মুক্তবাজার অর্থনীতি জিন্দাবাদ। কম্যুনিজম বিলুপ্ত হোক। কম্যুনিস্টরা মুর্দাবাদ।

AMARBOI.COM

নতুন আশার ও আশ্বাসের আলো

পক্ষীমাতা সন্তান উৎপাদন লক্ষ্যেই ডিম সংরক্ষণের ও ডিমের ওপর তাপ দেয়ার জন্যেই নীড় তৈরি করে। শাবক লালন পেয়ে পেয়ে পাখায় ফর গজানোর পরেই উড়তে শেখে এবং তার পরেই পক্ষীশাবক হয় স্বনির্ভর। তখন নীড় যায় ভেঙে, পক্ষীমাতার সঙ্গে সম্বন্ধ-সম্পর্ক ছিন্ন হয় স্বাবলম্বী শাবকদের। বিস্তীর্ণ আকাশ হয় পাখিদের বিচরণভূমি। একালে যন্ত্র প্রকৌশল-প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত জীবনে জীবিকার ক্ষেত্র হয়েছে বিস্তৃত, বিভিন্ন, বিচিত্র ও সরার মতো ক্ষুদ্র ধরায় হয়েছে জগদ্ব্যাপী। ঘরের লোক, পরিবারের পরিজন এখন পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ছে জীবিকার্জনের গরজে। আগের মতো গৌত্রিক ঐক্য, দলীয়জীবন একালে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এমনকি বেদের জীবনে এসে গেছে গৌত্রিক বন্ধনমুক্তি ও পেশান্তর। আদিকালে গৌষ্ঠীক ও গৌত্রিক জীবন ছিল জীবিকার্জনের ও নিরাপত্তার গরজে আবশ্যিক ও জরুরি। সেকাল বহু আগেই অবসিত হয়েছে সভ্যতর সমাজে। আজো সেকালের রেশ ও লেশ রয়ে গেছে অজ্ঞ-অনক্ষর-দুস্থ-দরিদ্র-নিঃস্ব-নিরন্ন আদিবাসীর, জনজাতির ও আরণ্য মানুষের মধ্যে। আফ্রিকায় এ গৌত্রিক-গৌষ্ঠীক জীবন ও দ্বেষ-দ্বন্দ্ব আজো প্রবল শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রসারের মন্থরতার দরুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের গাঁয়ে-গঞ্জেও পারিবারিক বন্ধন শিক্ষিত চাকুরেদের ও অশিক্ষিতদের মধ্যে দৃঢ় ছিল পুরোনো সামাজিক-নৈতিক-আদর্শিক নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ ও প্রথাপদ্ধতির প্রতি অনুরাগ, অনুগামিতা ও আনুগত্য প্রবল ছিল বলে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাদের সে বন্ধন ও প্রত্যয় শিথিল করে দিল। এখন মা-বাবারা নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে। কেননা ছেলে-মেয়েরা জীবিকার্জনের জন্য আজকাল দেশে-বিদেশে অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করছে। কেউ কেউ কর্মস্থলেই স্থায়ী আবাস গড়ে তুলেছে। ফলে ভাই-বোনের মধ্যেও অদর্শন ও বিচ্ছিন্নতাজাত স্নেহ-মমতার সম্বন্ধ সম্পর্ক হয়ে যাচ্ছে শিথিল। যদিও কোথাও কোথাও কারো কারো মধ্যে পুরোনো আত্মীয়তা-কুটুম্বিতার সংস্কারানুগত্য রয়ে গেছে বাহ্যত। আত্মীয়তার উষ্ণতা নেই, আগের মতোই প্রথা রক্ষার গরজে ব্যবহারিক সৌজন্য রক্ষা করে চলতে হয় মাত্র। আশৈশব দৃষ্ট, শ্রুত, লব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার এবং নৈতিক-আদর্শিক-সামাজিক নীতি-নিয়মের রীতিরেওয়াজের ও প্রথাপদ্ধতির প্রতি এ কালিক আনুগত্যে গাঢ়-গভীরতার অভাব আমজনতাকে নৈতিক-আদর্শিক-সামাজিক জীবনের দায়িত্ব-কর্তব্য উপেক্ষায়, লঙ্ঘনে ও ঔদাসীন্যে প্রভাবিত করেছে। যেহেতু সাধারণ মানুষের ক্বচিৎ কারো মধ্যে মানবিকগুণের অনুশীলন প্রবণতা দেখা যায়, অন্যরা তাৎপর্যবোধহীন অনুকরণে ও অনুসরণে প্রাণী হিসেবেই তা সামাজিক জীবনে ও জীবিকাক্ষেত্রে যান্ত্রিকভাবে মেনে চলে মাত্র। ফলে তারা যতোটা মানব নামের প্রাণী প্রজাতি, ততোটা মানবিকগুণে ঋদ্ধ নয়। এ মানুষই সমাজে নিষ্ঠুর অবিবেকী মস্তান-গুণ্ডা-খুনী-প্রতারক-প্রবঞ্চক বেপরওয়া অপরাধপ্রবণ। এ মানুষ হয় বেহায়া, বেশরম, বেদানাই, বেলেহাজ, বেদেরেক, বেদরদ, বেইমান, বেআদব, বেআক্কেল, বেল্লিক। আমরা সমাজে এখন এমনি মানুষের সংখ্যাই বেশি দেখতে পাই। এ জন্যেই আমাদের সমাজ এ মুহূর্তে জাঙ্গলিক ও গ্যাঙডলিক প্রায় সর্বার্থকভাবে। দারিদ্র্য, আর্থিক জীবনে অনিশ্চিতি, জীবিকা ক্ষেত্রের অভাব প্রসূত বেকারত্ব প্রভৃতিও জীবন-জীবিকার নিরাপত্তাহীনতার নৈরাশ্যে মানুষের নৈতিক-আদর্শিক-সামাজিক আনুগত্য হরণ করেছে। ফলে সমাজে এখন সুজনের সজ্জনের চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের অভাবজাত বিপর্যয় ও অস্থিরতা বিকট-বীভৎস হয়ে উঠেছে। সংবাদপত্রে পরিবেশিত খবরগুলোই তার প্রমাণ। উন্নততর, সভ্যতর, শিক্ষিততর সংস্কৃতিমান সমাজেও দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতীর অভাব নেই। কিন্তু সেখানে সংযত, পরমত-পরকর্ম-পরআচরণ সহিষ্ণু, যৌক্তিক-বৌদ্ধিক জীবন চর্যানিষ্ঠ, বিবেকানুগত শ্রেয়বাদী চিত্তবান সুজন লোকের আধিক্যই নীতি-নিয়ম ও দায়িত্ব-কর্তব্য সচেতনতা জিইয়ে রাখে সমাজে। মানবিক গুণের সচেতন সযত্ন-সপ্রয়াস অনুশীলন তাদের মানবতা, মানবিকতা, এককথায় প্রত্যাশিত মাত্রার মনুষ্যত্ব অর্জনের সহায় হয়। তারা যে কেবল মানবপ্রেমী, দুস্থ মানবতার সেবী হয় তা নয়, জীব-উদ্ভিদ নির্বিশেষে প্রাণের মূল্য স্বীকার করে তাদের টিকিয়ে রাখার, বাঁচিয়ে রাখার এবং তাদের সেবার ও চিকিৎসার ব্যবস্থায়ও দরদী মানুষ জীবন উৎসর্গ করে। এ জন্যে উন্নততর, শিক্ষিততর, সভ্যতর সংস্কৃতিমান ও হৃদয়বান মানুষের প্রভাবে আধুনিক য়ুরোপীয় অনেক রাষ্ট্রেই মানুষ জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নিরাপদ-নিরুপদ্রব জীবনযাপনে আশ্বস্ত থাকে। যদিও উন্নততর সভ্যতার রাষ্ট্রে সরকার ও সেনাবাহিনী যুদ্ধ ও নরহত্যাপ্রবণ, তবু আমজনতা যুদ্ধবিরোধী ও হত্যাভীরু সাধারণভাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশৈশব লব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণামুক্ত যুক্তি-বুদ্ধিনিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক স্তরে মানব-নির্বিশেষকে সমদৃষ্টিতে দেখতে ও ধীরবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারে। আস্তিক মানবিকতাবাদী ও মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ রক্তকবরী, অচলায়তন, মুক্তধারা, রথেররশি কিংবা গোরা উপন্যাসে অত্যন্ত উঁচুমানের মানবিক চিন্তা-চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু তাতে সমাজ তেমন প্রভাবিত হয়নি, কারণ এসব নাটক-উপন্যাস উঁচুমানের সাহিত্য-শিল্প হিসেবেই গৃহীত হয়েছে। এগুলো যদি আশৈশব লব্ধ-শ্রুত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণামুক্ত যুক্তি-বুদ্ধিনিষ্ঠ যৌক্তিক-বৌদ্ধিক জীবনযাপনপ্রিয় মানববাদীর মানস-প্রসূন হত, অর্থাৎ কোনো কম্যুনিস্ট বা নিরীশ্বর-নাস্তিকের রচনা হত, তা হলে এসব রচনার পরিসমাপ্তি ঘটত ভিন্নরূপে, তাতে পাঠক মনে জাগত বর্তমান সমাজব্যবস্থা দ্রোহিতা, জাগত শোষণপীড়নমুক্ত সমাজ গড়ার আগ্রহ, মানুষকে তার জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-যোগ্যতা অবিশেষে কেবল স্বপ্রজাতির প্রাণী হিসেবেই অন্তরে ঠাঁই দিতে পারত বিবেকী বিবেচনায়। ফলে মানুষ অবিশেষের বাঁচার, শোষণমুক্ত থাকার জন্মগত অধিকার সমাজ স্বীকৃত হত। কায়েম হতে পারত সমাজবাদীর সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা।

সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে পড়েছিল দুঃশাসনের ও নায়কতন্ত্রের পীড়নে ও বঞ্চনায়। ভাঙার পরে আজ রাশিয়ার ও ওয়ারস-চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ, দরিদ্র, বেকার অসহায় অসমর্থ নারী-পুরুষের আকস্মিক অভিঘাতে কিছুকাল হতভম্ব থেকে উপলব্ধি করল, করছে এবং ক্রমে জুয়াড়ির ঝুঁকি নিয়ে গড়ে-ওঠা ভাগ্যবান ধনীরাও উপলব্ধি করবে যে, সমাজতন্ত্রে অন্ততঃ অন্ন-বস্ত্রের ও চিকিৎসার ভাবনা ছিল না, নিরাপত্তাও নিশ্চিত ছিল। তাই কেবল বুলগেরিয়ায় নয়, পোল্যান্ডে নয়, খাস রাশিয়ায়ও আজ কম্যুনিস্ট প্রাবল্য দেখা যাচ্ছে। এতেই বোঝা গেল, মার্কসবাদের কোনো বিকল্প আজো অলভ্য। নাফতা, ন্যাটো জোটের ইইসি বা অভিন্ন মুদ্রা, 'ইউরো', আসিয়ান, গ্যাট, বাজার বা মুক্ত অর্থনীতি কোনোটাই বৈষম্যভিত্তিক পুঁজিবাদী সমাজ টিকিয়ে রাখতে পারবে না। মার্কসকথিত পুঁজিবাদের নাভিশ্বাস এখন দৃশ্যমান উক্ত সব আর্থ-বাণিজ্যিক-মহাজনী সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রয়োগে নয় কেবল, কায়রো, কোপেনহেগেন ও বেইজিং সম্মেলনে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনপ্রয়াসেও তা সুপ্রকট। পৃথিবীর বঞ্চিত শোষিত মুক্তিকামী মানুষের মনে আবার নতুন আশা ও আশ্বাস জাগবে।

শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি

ইতিহাসের সাক্ষ্যে দেখা যায় ব্যক্তির ও পরিবারের আর্থিক-শৈক্ষিক উন্নতির সঙ্গে সুরুচি-সংস্কৃতির উন্মেষ-বিকাশ-উৎকর্ষ অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে জড়িত। তেমনি রাজনীতিক উন্নতির, জাতীয় উন্নতির সঙ্গেও কারণ-কার্যরূপেই যেন সংস্কৃতির প্রসার ও উৎকর্ষ সম্পৃক্ত। স্বীকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতেই হয় দারিদ্র্যে সুরুচির সংস্কৃতির অনুশীলন ও অভিব্যক্তি বাস্তব কারণেই সম্ভব হয় না। এ দারিদ্র্য দ্বিবিধঃমানসিক ও সামাজিক বন্ধ্যত্ব এবং অর্থ-সম্পদরিক্ততা।

অতএব, রাষ্ট্র স্বাধীন ও সার্বভৌম হলেও রাষ্ট্রবাসী যদি বিদ্যায় বিত্তে ঋদ্ধ না হয়, সৌন্দর্যপিপাসু না হয়, সুরুচির ও সৌন্দর্যের নতুন চিন্তা-চেতনা নিয়ে সচেতন, সযত্ন সপ্রয়াস অনুশীলনে আগ্রহী না হয়, তাহলে সে-জাতির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয় না। আমাদের বাঙলাদেশে এ মুহূর্তে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় প্রকট রূপ ধারণ করেছে শহুরে শিক্ষিত ধনীমানীদের সবাই নানা পেশায় ও নেশায় বাহ্যত ব্যস্ত বটে, কিন্তু মগজে ও হৃদয়ে যথাক্রমে উপলব্ধির ও অনুভবের ক্ষেত্রে নৈতিক-আদর্শিক-বিবেকী প্রভাবশূন্যতা তাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণকে লাভ-লোভ-স্বার্থসর্বস্ব করে তুলেছে। ফলে মানবিকগুণের অভাব এবং প্রাণী প্রবৃত্তির প্রভাব মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধকে নিতান্ত যান্ত্রিক করে তুলেছে। মগজী উপলব্ধি কিংবা হার্দ্যিক অনুভূতি বাঞ্ছিত মাত্রায়, মাপে, মানে ও গুণে উন্মেষ ও প্রসার লাভ করলে সমাজ-সদস্য হিসেবে ব্যক্তিচরিত্রে তা মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতির প্রতি তাদের দায়িত্বচেতনা ও কর্তব্যবুদ্ধি হিতৈষণার, ন্যায়-নিষ্ঠার, যুক্তিবাদিতার, বিবেকানুগত্যের আর সৌজন্যের আকারে প্রকাশমান থাকত। যুক্তিবাদে আস্থায়, যুক্তির প্রয়োগে বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আবেগমুক্ত চেতনার ও চিন্তার অনুশীলনে সংযমে পরমত-কর্ম-আচরণ সহিষ্ণুতায়, ন্যায়নিষ্ঠায়, বিবেকানুগত্যে আমাদের মন-মগজ-মনন-মনীষা বিকাশের অন্তরায় হচ্ছে অতীত ও ঐতিহ্য প্রীতি, গতানুগতিক নীতি-নিয়মের রীতি-রেওয়াজের প্রথা-পদ্ধতির অনুসরণ। অভ্যস্ত ধারায় জীবনযাপন প্রভৃতি জাতীয়, সামাজিক এবং মনন জীবনে জরা, জড়তা ও জীর্ণতা বাড়ায়। দেহে-প্রাণে-মনে-মগজে-মননে বাসন্তী হাওয়ার আমেজ মেলে মুক্ত ও যৌক্তিক চিন্তায় ও চেতনায়। জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেকানুগত্য মানুষকে আত্মপ্রত্যয়ী, সাহসী ও শক্তিধর করে। আমাদের দৈশিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, নৈতিক, আদর্শিক, শৈক্ষিক জীবন বদলাতে হলে আমাদের অবশ্যই পুরোনো প্রীতি পরিহার করতে হবে সচেতনভাবে, গ্রহণ বরণ করতে হবে সমকালীন জীবন কল্যাণপ্রসূ করার লক্ষ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখা-প্রশাখার তথ্যকে, তত্ত্বকে ও সত্যকে। আমাদের শিক্ষিত মাত্রকেই জিজ্ঞাসু ও সন্ধিৎসু হতে হবে। জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা আমাদের অনেককে করবে গবেষক আবিষ্কারক উদ্ভাবক এবং সৃষ্টিশীল মননশীল। মুক্তচিন্তক তথা ফ্রিথিঙ্কারই কেবল হতে পারে রেনেসাঁসের জনক। পুরোনো সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলো এবং আধুনিক প্রতীচ্য সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎস ও কেন্দ্রগুলো আমাদের এ সত্যই স্মরণ করিয়ে দেয়। মগজের হৃদয়ের সপ্রয়াস অনুশীলনেই জাতির বৈষয়িক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সম্ভব। মগজী উপলব্ধি, হার্দ্যিক অনুভূতিই মানবিক গুণের, মানবতার, মনুষ্যত্বের, এক কথায় ব্যক্তি মানুষেরও অঙ্গের ও অন্তরের, দেহের ও মনের বিকাশ সাধনের জন্যে আবশ্যিক ও জরুরি। বিজ্ঞান-বাণিজ্য-যন্ত্র-প্রকৌশল-প্রযুক্তি-আয়ুর্বিজ্ঞান নির্ভর আমাদের প্রাত্যহিক মর্ত্যজীবন, আমাদের একালের জীবিকায় উপজীবিকায় তাই পুরোনো শাস্ত্রিক-ঐতিহ্য-অতীতাশ্রয়ী নীতি-রীতি অচল। আমাদের বিজ্ঞানের প্রসাদনির্ভর বাণিজ্যপ্রধান জীবনে সংস্কৃতি অবশ্যই হতে হবে মানবিক ও সেক্যুলার এবং যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবনযাপনের সহায়ক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ বিষয়ে দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ করার উপায় কাগুজে রচনা ও বিবৃতি নয়, মেঠো বক্তৃতাও নয়, কিংবা প্রচারপত্র বা মিছিল নয়। এর প্রকৃষ্ট উপায় বা পন্থা হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শিক্ষায় মানুষের প্রাণীবৃত্তি-প্রবৃত্তির সংযমন, সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন সম্ভব নয়, কেননা ওই দুই বিদ্যা কেবল তথ্য জানায়, প্রয়োগনৈপুণ্য শেখায়, গুণের উন্মেষ-বিকাশ-উৎকর্ষ ঘটায় না। মানুষকে অন্য জীবেতর গুণের ও শক্তির আধার করে যেসব চিন্তা-চেতনা-মনন-মনীষা-অনুভব-উপলব্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি সে-সব মেলে সাহিত্যে, দর্শনে, ইতিহাসে, সমাজবিজ্ঞানে এবং বিভিন্ন কলায়। এ জন্যেই চিন্তা- চেতনার নিত্য লালনে ও প্রসারে অনুভব উপলব্ধির মানসজগৎকে নভোমণ্ডলের মতো অসীমে ছড়িয়ে দিতে হয়। যারা পারে তাদেরই আমরা অনন্য, অসামান্য, শক্তিধর মনীষী, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, চিন্তক এবং আবিষ্কারক, লোকসেবক, মানবহিতৈষী বলে জানি ও মানি। এ মানুষই যা কিছু দেখতে, শুনতে, করতে, বলতে কুৎসিত তা পরিহার করতে এবং যা কিছু চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বকের আরামদায়ক, যা কিছু দলবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ জীবনে সহযোগিতায় সহাবস্থানের সহায়ক সেগুলোর সৃষ্টি, আয়োজন, স্থিতি ও সরবরাহই হচ্ছে সংস্কৃতির লাক্ষণিক সাক্ষ্য-প্রমাণ। প্রবৃত্তির নিবৃত্তির ভারসাম্যমূলক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে আমজনতাকে নিয়ন্ত্রিত রাখাই হচ্ছে সমাজের দায়িত্ব। তা-ই রাষ্ট্রেরও কর্তব্য।

কাজেই সংস্কৃতি সুষ্ঠু ও নির্ভেজাল হলে রাজনীতি ও দুর্নীতি, অসততা, অমানবিক বা দানবিক নিষ্ঠুরতা ও বঞ্চনামুক্ত থাকবে, রাজনীতি কার্যত সেবা ও কল্যাণমূলক হলেই আমজনতা উপকৃত হয়। রাজনীতিকের চিন্তায় চেতনায় নৈতিক-আদর্শিক কোনো বন্ধন যদি না থাকে, সে হবে লাভ-লোভ-স্বার্থচালিত চরিত্রহীন। তাকে দিয়ে লোকহিত সম্ভব নয় কখনো। কাজেই জনজীবনের সর্বস্তরে সাংস্কৃতিক জীবনে উৎকর্ষই রাজনীতিকের জীবনে কর্মোৎকর্ষ সাধনের সোপান। এ তত্ত্ব তথ্য ও সত্য হিসেবে গ্রাহ্য করা যায়। আবার বলি, জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক আর যৌক্তিক-বৌদ্ধিক জীবনানুরাগ, জীবনানুগামিতা ও জীবনানুগত্য জাগানোর লক্ষ্যে শৈশব-বাল্য-কৈশোরকাল থেকেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করাই হচ্ছে সরকারের ও অভিভাবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা, শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি আর জনজীবন-জীবিকা মূলত কার্যত অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের ও সম্বন্ধের। তাই যুক্তিগ্রাহ্য, সেক্যুলার, মানবিক ও উদার মগজী উপলব্ধি ও হার্দ্যিক অনুভূতি হবে শিক্ষার বিষয়। শিক্ষা হবে যুক্তিবাদিতা ও সেক্যুলার মানবতাপ্রসূ। সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি হবে মানবতাজাত সুরুচি, সৌন্দর্যবুদ্ধি ও সৌজন্য। রাজনীতি হবে গণসেবামুখী ও মানবকল্যাণপ্রসূ। এ অবস্থা ও অবস্থান আমাদের কবে হবে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতিও শিখতে হয়

সব পেশার ও নেশার একটা নীতিনিয়ম ও রীতিরেওয়াজ আছে। সবকিছুই পৃথিবীতে শিখতে হয়, জানতে হয় এবং অনুশীলন করতে হয়। রাজনীতিও আকৈশোর সচেতনভাবে মানসিক ও ব্যবহারিকভাবে অর্থাৎ ভাবে, চিন্তায়, কর্মে, আচরণে, অনুশীলনের মাধ্যমে শিখতে হয়। অন্য পেশার সফল যোগ্য দক্ষ নিপুণ লোকের মতো রাজনীতিককেও স্বপেশায় জনদরদে, জনহিতৈষণায়, জনসংযোগে, জনপ্রিয়তায়, উপচিকীর্ষার উপায় ও পন্থা উদ্ভাবনে মনোযোগী দক্ষ, নিপুণ, সুরুচিপূর্ণ, প্রয়োজনসচেতন দেশপ্রেমী ও মানবসেবী হতে হয়। আত্মীয়-স্বজনেরা বিশ্রী ঘা-পাঁচড়ার ক্ষত রোগীর সেবা যে করতে পারে, সে তো শুধু প্রিয়জন বলেই। অতএব ভালোবাসার পাত্র না হলে কেউ কারো সেবা করবার জন্যে উৎসাহ পায় না, ধৈর্যও রক্ষা করতে পারে না। মা যেমন সন্তানকে ভালোবাসে বলেই তার জন্যে প্রাণ দিতেও রাজি থাকে, তেমনি যারা দেশকে ভালোবাসে, মানুষকে ভালোবাসে তারাও দেশের স্বাধীনতার জন্যে দেশের মানুষের সেবার জন্যে মঙ্গলের জন্যে নিজের জীবনের সুখ, শান্তি, আনন্দ, আরাম ও ধন-সম্পদ বিসর্জন দিয়ে সর্বত্যাগী হয়ে এমনকি প্রয়োজনে প্রাণ দেয়ার ঝুঁকি নিয়ে দেশের এবং মানুষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করে। আমাদের দেশেও সেই মানুষের অভাব কখনো ছিল না, এখনো নেই। যেমন এখনো আমাদের দেশে কয়েক হাজার সর্বত্যাগী কমিউনিস্ট আছে। দেশের স্বাধীনতার জন্যে যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী ব্রিটিশ আমল থেকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কাল অবধি হাজারে হাজারে স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে প্রাণ দিয়েছে। এ-ও জানি এরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতেও প্রাণ দেবে। প্রকাশ্যে সাংবিধানিক রাজনীতিতেও যারা অংশগ্রহণ করে, তাদেরও গভীর দেশপ্রেম এবং মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা আর সেবার আগ্রহ থাকা আবশ্যিক ও জরুরি। আমাদের সঙ্কট ও সমস্যা এই যে, যাঁরা গণতন্ত্রের নামে সাংবিধানিক নিয়ম অনুসারে রাজনীতি করেন, তাঁরা নৈতিক চরিত্রে ও আদর্শিক প্রত্যয়ে ঋদ্ধ নন। যাঁরা ক্ষমতার রাজনীতি করেন অর্থাৎ ক্ষমতার গদি দখলের লক্ষ্যেই রাজনীতি করেন এবং যাঁরা এই সুযোগেই মান-যশ, খ্যাতি-ক্ষমতা, দর্প-দাপট, প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থ-বিত্ত-বেসাত অর্জন করে প্রজন্মক্রমে পারিবারিক ধনী ও মানী থাকতে চান। তাঁদের দেশের প্রতি বা মানুষের প্রতি কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্য চেতনা নেই। তাই তাঁরা নিজের এবং আত্মীয়-স্বজনের লাভ-লোভ ও স্বার্থ হাসিলে সদা নিরত থাকেন। এই জন্যেই আমাদের দেশের সামরিক শাসন, জঙ্গী নায়ক শাসন এবং গণতন্ত্রের আদলে ভোটে বিজয়ী তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসনমাত্রই স্বৈরাচার ও দুর্নীতিদুষ্ট হয়। আমাদের রাজনীতিকদের মধ্যে দেশকে ভালোবাসার, মানুষকে সেবার অভ্যাস বা অনুশীলন করার কোনো গরজবোধের রীতিনীতি চালু নেই। অথচ তারা বিনা অনুশীলনে, অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য হয়েও টাকার জোরে এবং দলের সমর্থনে ইউনিয়ন কাউন্সিলের, নানা পরিষদের ও সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং কোনো নীতি-আদর্শের অনুশীলন না করেই নিজেকে একজন যোগ্য, দক্ষ রাজনীতিবিদ ও রাজনীতিক বলে মনে করেন এবং দাবিও করেন। এই কারণেই আমাদের রাজনীতিকদের মধ্যে কোনো রাজনীতিক সংস্কৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যে সংস্কৃতিমনা থাকা প্রয়োজন, সংযম, পরমত-কর্ম-আচরণ-সহিষ্ণুতা, আমজনতার স্বার্থ ও কল্যাণ চেতনা, নৈতিক-আদর্শিক লক্ষ্য ও আত্মমর্যাদা বোধ ও বিবেকানুগত্য থাকা প্রয়োজন তা তাঁরা অনুভবও করেন না। ফলে তৃতীয় বিশ্বের অন্যত্র যেমন, আমাদের দেশেও তেমনি রাজনীতি কাড়াকাড়ি, মারামারি ও হানাহানিবহুল হয় এবং কথায় কথায় হনন, দহন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন এবং ভাঙন নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক অঙ্গনে এই কাজ করে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এবং বেকার যুবকেরা। ফলে গণতন্ত্র আমাদের দেশে স্বরূপে স্থিতি পায় না। স্বেচ্ছাচার-স্বৈরাচার এবং দুর্নীতিবহুল হয় শাসন-প্রশাসন। ফলে গাঁয়ে-গঞ্জে-পাড়ায়-মহল্লায়-শহরে-বন্দরে চলে জোর-জুলুমের রাজত্ব। মানুষের ব্যক্তিক, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন-জীবিকা নিরুপদ্রব ও নিরাপদ থাকে না। অজ্ঞ-অনক্ষর দুর্বল-অসহায়-নিঃস্ব-নিরন্ন-দুস্থ-দুর্বল মানুষ হয় শোষিত বঞ্চিত প্রতারিত ও পীড়িত প্রশাসকদের ধনবান-বলবান প্রতিবেশীদের কিংবা মস্তান-খুনী-গুণ্ডাদের হাতে। প্রতিকার মেলে না কোথাও। প্রতিবাদের কিংবা প্রতিরোধের জন্যেও কেউ থাকে না, দুর্বল দুর্ভোগ ভোগে, দুর্জনের জয় হয় সর্বত্র। শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে উন্নত ধনবাদী-পুঁজিবাদী-বুর্জোয়ার সমাজে ও গণতন্ত্রে ধন-মানগত বৈষম্য থাকলেও এক প্রকার পরিশীলিত রুচির সৌজন্য থাকে, তাতে উদার মানবতার অনুশীলন, প্রকাশ ও প্রয়োগ থাকে। এ জন্যেই যথার্থ জনগণতন্ত্র না হলেও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের গণপ্রতিনিধিরা জনগণের ইচ্ছার অনুগত থাকেন, প্রভু হন না। ভোটারদের অজ্ঞতার ও নিঃস্বতার সুযোগে আমাদের দেশে যতোদিন গদি দখলের লক্ষ্যে রাজনীতি করবেন আমাদের রাজনীতিকেরা, নিজেদের মধ্যে নৈতিক বা আদর্শিক চরিত্র গড়ে তোলার প্রয়াসী হবেন না, দেশকে ও মানুষকে অন্তরের সঙ্গে মনে-মর্মে আপনজন হিসেবে বরণ করবেন না, ততোদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে গণতন্ত্র আমজনতার ও গণমানবের কোনো উপকারে আসবে না। তাঁরা নির্বাচিত হয়ে প্রভুই হবেন, গণমানবের ইচ্ছার অনুগত প্রতিনিধি থাকবেন না। আমাদের এই মুহূর্তের সংসদীয় সংকটের মূলেও রয়েছে আমার মনে হয় রাজনীতিকদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সুরুচি, মানবকল্যাণচেতনা হীনতা, দেশপ্রেম ও মানবসেবা প্রবণতার অননুশীলনজাত শূন্যতা। আমাদের দেশে সাধারণত টাকাওয়ালা ধনিকেরা, বণিকেরা, ঠিকাদারেরা এবং অবসরপ্রাপ্ত আমলা ও সেনানীরা টাকার জোরে দলের সমর্থনে ভোট জোগাড় করে সাংসদ হন। অথচ তাঁদের কোনো রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার, প্রশিক্ষণের, অনুশীলনের অভিজ্ঞতা, কৃতি বা ঐতিহ্যের সম্পদ থাকে না। ফলে, তাঁরা জনহিতৈষণার কোনো সুষ্ঠু চিন্তা করতে কিংবা পন্থা আবিষ্কারে সমর্থ হন না। এ লোকদের হাতেই এখন রয়েছে শাসনক্ষমতা, এভাবে চললে ভবিষ্যতেও অনভিজ্ঞ, অপ্রেমী ও সেবাবিমুখরাই দেশশাসন করবে। আমজনতা মতলববাজদের দুর্নীতির শোষণের জোর-জুলুমের লুণ্ঠনের শিকারই থাকবে। দুঃশাসন থেকে মুক্তি মিলবে না, দেশের সামুহিক, সামগ্রিক ও সামষ্টিক কোনো উন্নতি এ অবস্থায় আশা করা হবে বাতুলতা। আমাদের রাজনীতিকদের জীবনের শুরু থেকেই রাজনীতিকে পেশা হিসেবে বরণ করার লক্ষ্যে শিক্ষাদীক্ষা প্রশিক্ষণ নিতে হবে, হতে হবে দেশপ্রেমী, মানবদরদী, গণসেবী গণকল্যাণকামী, জনসংযোগে সদা উৎসাহী, গণ চাহিদার গুরুত্ব সচেতন বিবেকী ন্যায়নিষ্ঠ যুক্তিবাদী সুজন ও সজ্জন। নইলে কখনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণতন্ত্রমনস্ক হতে পারবেন না। কেবল তাঁরা ভোটে গণপ্রভু হবেন মাত্র, গণস্বার্থ সচেতন গণঅনুগত গণপ্রতিনিধি হবেন না কখনো। গণতন্ত্র হবে গণবিচ্ছিন্ন স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র।

পুরাণ-ইতিহাসের আলোকে আমাদের অবস্থা ও অবস্থান

সাঁওলীমিত্র 'নাথবতী অনাথবৎ' নামে দ্রৌপদীর বিড়ম্বিত জীবন সম্বন্ধে নতুন চেতনায় ও নতুন তাৎপর্যে কথকতার আঙ্গিকে এক অনন্য অসামান্য নাটক রচনা করেছেন, ক্যাসেটে তা ঘরে ঘরে শোনা সহজ। নাথবতী অনাথবৎ নামটি মহাভারত রচক স্বয়ং কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের দেয়া। এ নামও তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা দ্রুপদ রাজকন্যা দ্রৌপদীর ছিল পাঁচ পাঁচটা স্বামী। তা সত্ত্বেও ধর্মপুত্র নামে শ্রদ্ধাস্পদ অথচ দায়িত্বহীন জুয়াড়িশ্রেষ্ঠ স্বামী যুধিষ্ঠির তাঁকে বাজি রেখে পাশাখেলায় মেতে ওঠেন। এসব হারজিতের খেলায়, যতোই হারে তাতোই জেদ চাপে, ততোই হিসেবে ভুল হতে থাকে, আর ততোই হারের মাত্রা ও সংখ্যা বাড়তে থাকে সেলোকের। হারের ক্ষতির যন্ত্রণা হারের অপমানের জ্বালা এবং আত্মধিক্কারের মাত্রা যখন বাড়তে থাকে তখন কেউ আর শ্রেয়-প্রেয়-চেতনাজ্ঞান নিয়ে স্থির মস্তিষ্কে ও ধীর বুদ্ধিতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না।

পাঁচ পাঁচটা স্বামী থাকা সত্ত্বেও রাজকন্যা রাজঘরের বধূ অনাথা। করদ-সামন্ত রাজন্যদের উপস্থিতিতে গান্ধারী ভ্রাতা শকুনির কূটচালে ও ধূর্ততায় আর কাপট্যে পঞ্চপাণ্ডব হেরে হেরে দাসে হলেন পরিণত, শেষ সম্বল ও সম্পদ হিসেবে বাকি ছিল দ্রৌপদী তাঁকেও অবশেষে বাজি রেখে হারালেন। ঘরের বউকে বাজি রাখতে আত্মগ্লানিতে দিশেহারা যুধিষ্ঠিরের আত্মসম্মানে কিংবা নৈতিক চেতনায় অথবা বিবেকে বাধেনি। এমন ন্যক্কারজনক কাজের জন্যে মহাভারতের কাহিনী-জানা ব্যক্তিমাত্রেরই কাছে যুধিষ্ঠির নিন্দিত এবং সেদিন অনাথা-অধবা-বিধবা সামান্য নারীর মতো দুঃশাসন প্রভৃতির হাতে চরম লাঞ্ছনা পেলেন, এতো বড়ো দরবারের রাজা-রাজড়া বীর পুঙ্গব কেউ এগিয়ে এল না নারীর-নারীত্বের ইজ্জত রক্ষার জন্যে-বরং ইতরের মতো অট্টহাস্যে মুখর করে তুলেছিল 'দরবারগৃহ'। মাত্র ভীমই দরদে যন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন খাঁচাবদ্ধ বাঘের মতো। সেদিন লজ্জা পাবার মতো, জননী-জায়া-জাতার কথা স্মরণ করে বিবেক-দংশন অনুভব করার মতো কাউকে পাওয়া যায়নি ধনিক-বণিক-সৈনিক-শাসক-সামন্ত সমাজে। দ্রৌপদী নাথ থেকেও অনাথা। "এমন একটা সময় পৃথিবীতে আসে যখন সব জ্ঞানী-গুণীরা চুপ করে থাকে। আর যে অত্যাচারিত হয়, সে হয়েই যায়, হয়েই যায়।" কারণ দুঃশাসনেরা মানবিক গুণরিক্ত হয়েই প্রাণিপ্রবৃত্তি চালিত হিংস্র কামুক পশু হয়ে যায়। তাই জননী-জায়া-জাতা রূপা নারীকে বিবস্ত্র করতে, ধর্ষণ করতে তার বাধে না। জনজীবনে এবং জ্ঞানী-গুণী, করদ ও সামন্ত শাসকদের রাজপরিবারে এমন মানবিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুণের, নৈতিক চেতনার, দায়িত্বজ্ঞানের, কর্তব্যবুদ্ধির এবং বিবেকী বিবেচনার অভাব হওয়ার ফলেই পরিণামে কুরুক্ষেত্রে গৃহযুদ্ধে স্বজন হত্যার উৎসব চলতে থাকে আঠারো দিন ধরে। পরিণামে রাজ্য হল লোকাভাবে শ্মশানবৎ। ধ্বংস হল কুরু-পাণ্ডব বংশ- যাদের স্বয়ং নররূপী নারায়ণ কৃষ্ণও বাঁচাতে পারলেন না।

আরো একটি বৃত্তান্ত আছে। এটি পুরাণ কথা নয়। এবার একটি পাথুরে ইতিহাসের বয়ান করছি। ১৭৫৭ সাল থেকে ক্লাইভের গর্দভ মীর জাফর আলী খানের আমল থেকে ১৭৬৯ সালের মন্বন্তর (ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ) অবধি তেরো-চৌদ্দ বছর ধরে চলে বাঙলাদেশে নৈরাজ্য, হঠকারিতা, বিশ্বাসঘাতকতা, নীতিহীনতা। ক্লাইভ হত্যা করাল মীরনকে পাটনায়, মীর জাফরের জামাতা মীর কাসিম পাঁচ কোটি টাকা ক্লাইভদের ঘুষ দিয়ে শ্বশুর থেকে কেড়ে নেয় নওয়াবী। রক্ষিতাপুত্র নিরক্ষর সম্রাট জাহন্দর শাহ থেকে সুবাহ-ই বাঙ্গলার দেওয়ানি ইজারা নেয় নগদ বায়ান্ন লক্ষ টাকা দিয়ে এবং বার্ষিক ছাব্বিশ লাখ খাজনা দিল্লী সম্রাটকে দেয়ার শর্তে। চলতে থাকে দ্বৈতশাসন। নিজামতের সঙ্গে সম্পর্ক রইল না কোম্পানির দেওয়ানির। এ ছিল নৈরাজ্যের কাল। হরণের, হননের, দহনের, ধর্ষণের, লুণ্ঠনের বিতাড়নের কাল বাস্তবে, আর কাগজে-পত্রে 'দ্বৈতশাসন কাল' গোটা ভারতবর্ষে ১৭৪০ সালে নাদির শাহর ও ১৭৬০ সালে আহমদ শাহ আবদালীর লুণ্ঠনের ফলে নেমে এসেছিল অবক্ষয়ের অমানিশার স্বার্থপরতার ও বিশ্বাসঘাতকতার এবং বিভিন্ন ক্ষীয়মাণ শক্তির বিরোধ-বিবাদের কাল। তাই বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষী পর্তুগীজ-দিনেমার-ওলন্দাজ-ইংরেজ-ফরাসিরাই একালের NGO-র মতো হয়ে ওঠে শক্তিমান বেণে এবং সশস্ত্র শক্তি হিসেবে ওরা আসে সেকালে বেণে হিসেবে 'সওদা' করতে, এখন NGO এসেছে 'সেবা' করতে। দুটোই শোষণমুক্ত বাণিজ্যিক-মহাজনী-সাম্রাজ্যিক নীতি কালিকরূপের ভিন্নতায়। আজ রাষ্ট্রের গ্রামগুলো শাসন-শোষণ-পালনের দায়িত্ব নয়, ইজারা পেয়েছে সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থে চালিত NGO গুলো, মুঘল-মারাঠা আমলে আমরা দেখেছি য়ুরোপীয় সওদাগরেরা বিশেষ করে ইংরেজ-ফরাসিরা মদদ যোগাত রাজ্যগুলোর বিরোধে-বিবাদে, প্রাসাদষড়যন্ত্রে, যুদ্ধে। এ ভাবেই পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই নামমাত্র যুদ্ধে, 'অধীনতামূলক মিত্রতা' ও 'দত্তকপুত্র গ্রহণ নিষিদ্ধ' নীতির মাধ্যমে গোটা ভারত ইংরেজের অধিকারে এসে গেল। এখনো চক্ষুষ্মানেরা দেখছে সেবাকারী NGO-রা দেশের সরকারকে ও আমদানি-রফতানি বাণিজ্যিকে পরোক্ষে অন্তরালে থেকে দাতাদেশগুলোর স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করছে অদৃশ্যভাবে। এসব NGO হচ্ছে বাহ্যত মানবতার সেবক বিশ্বহিতৈষী, কার্যত সেবার আড়ালে সাম্রাজ্যবাদীদের সাম্রাজ্যিক-বাণিজ্যিক মহাজনী প্রভাব-প্রতিপত্তির রক্ষক। ওরা আমাদের অনাহারে অচিকিৎসায় মরতেও দেবে না, আবার আমাদের স্বনির্ভর স্বয়ম্ভর হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আর্থিক-সামরিক-বাণিজ্যিকভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতেও দেবে না। – এ মতলবই হচ্ছে সর্বপ্রকার ঋণ-অনুদান-দান-ত্রাণ-সাহায্য-সহানুভূতির উৎস ও ভিত্তি। যেমন সুদের ব্যবসায়ী ব্যাংকই যথার্থ অর্থে গ্রামীণ ব্যাংক, এ ব্যাংক উচ্চহারের সুদে লগ্নি করে টাকা এবং নিঃস্ব ঋণীর সুদ-আসল মাফ-মওকুফও করে না। কিন্তু মার্কিন প্রচারণায় বিশ্বের দুস্থ দরিদ্র নিঃস্ব নিরন্ন মানুষের মুক্তিপ্রতীক রূপে প্রখ্যাত হয়ে উঠছে মার্কিন মাতব্বরী কবলিত তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতেও এ গ্রামীণ ব্যাংক। আর এর প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর মুহম্মদ ইউনূস হয়ে উঠেছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বের একজন মানব মুক্তিদাতা মহান পুরুষরূপে, যিনি এ সপ্তাহ থেকে দেশের রাজনীতিতেও প্রাধান্য পাচ্ছেন। দুটো প্রবচন এ ক্ষেত্রে স্মরণ করা যাক: (১) 'অকথা কথা হয় লোকে ঘোষিলে/অদারু দারু হয় শিলায় পিষিলে।' (২) লোকমুখে জয়/লোকমুখে ক্ষয় আমাদের হুজুগে স্বভাবের লোকের মধ্যে যে-কোনো কিছু প্রচারে-প্রচারণায় নিঃসংশয়ে গৃহীত বা বর্জিত হয়। যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে যৌক্তিক-বৌদ্ধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমরা সাধারণভাবে অনীহ, অনভ্যস্ত। বিশ্বাসেই আমরা আশ্বস্ত ও স্বস্থ থাকতে চাই। তাই গ্রামীণ ব্যাংক হচ্ছে 'শুভঙ্করের ফাঁকির ফাঁক' কিংবা পুরাকালের ভানুমতীর খেলা অথবা একালের জাদুকরের চাল। পৃথিবীর আদিকালের সাহিত্যগুলো নারীঘটিত কাহিনী কাব্য বা মহাকাব্য বা ধ্রুপদী সাহিত্য। হেলেন হরণে ট্রয় হয় ধ্বংস, সীতা হরণে লোপ পায় স্বর্ণলঙ্কার রাবণ বংশ। আমাদের একালে দেশে নারী ধর্ষণে নারী হত্যায় লোপ পেয়েছে আমাদের নৈতিক চেতনা-মনুষ্যত্ব-সংস্কৃতি।

দ্রৌপদীর বিপন্নতায়, লাঞ্ছনায় সেদিন সাড়া-সাহায্য মেলেনি ধনী-মানী রাজা-রাজড়ার, গুণী-জ্ঞানীর। মধ্যযুগে মুঘল-মারাঠা আমলে সমকালীন জ্ঞানী-গুণী-শাহ-সামন্ত-জমিদার-জায়গীরদারদের কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্য বুদ্ধি জাগেনি, বিদেশী বিভাষী বিজাতি বিধর্মী ইংরেজের পদলেহী হল মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরাও সানন্দচিত্তে। আজ এ মুহূর্তে লুম্পেন বুর্জোয়া-মুৎসুদ্দী রাজনৈতিক দলগুলো আত্মমর্যাদা খুইয়ে এমেকো-নিনিয়ান-রবিন-রাফেল-মার্কিন দূত প্রভৃতির কাছে নালিশ জানিয়ে তাদের মালিশ কামনা করছে। এর সঙ্গে যদিও দেশবাসীর কোনো সম্বন্ধ-সম্পর্ক নেই। অবশ্য দেশে আইন-শৃঙ্খলা একেবারেই না থাকার মতো শিথিল অবস্থায় থাকার ফলে শহুরে ও গ্রামীণ শ্রমিক-মজুর-বেপারি-কামার-কুমার-জেলে-নিকেরী এবং ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পেশার লোকেরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে যা দাবার চাল, তা-ই নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র জনগণের কাছে মৃত্যুবাণ।

এ অবস্থায় আমাদের শিক্ষিতসমাজ একেবারে নীরব নিষ্ক্রিয় উদাসীন দর্শক শ্রোতা এবং আড্ডায় রসিক আলোচক মাত্র। জনগণবিচ্ছিন্ন, জনগণের স্বার্থচেতনাহীন, আত্মপ্রতিষ্ঠামুখী রাজনীতিকদের এ রাজনীতিতে প্রতিযোগিতার-প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিকার-প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করার জন্যে দেশপ্রেমী মানবদরদী আঁতেল বা বুদ্ধিজীবী সমাজের কি কোনো দায়িত্ব-কর্তব্য নেই? পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা যখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বুদ্ধিজীবীদের এ নীরবতার নিষ্ক্রিয়তার বয়ান পড়বে, তখন কি আমাদের ১৭৫৭-৭০ সালের কিংবা ১৮৫৭ সালের নীরব-নিষ্ক্রিয় ব্রিটিশ পদলেহী অনুগ্রহজীবীদের মতো ঘৃণা করবে না। উল্লেখ্য যে, এ মুহূর্তে আমাদের অনুন্নত বাংলাদেশে যতো ইংরেজি শিক্ষিত লোক আছে, অতো শিক্ষিত লোক ১৯৪৭ সন অবধি ব্রিটিশ ভারতে ছিলই না। এ নিষ্ক্রিয় নীরবতা ঔদাসীন্য আমাদের বন্ধ্য মন-মগজ-মনন-মনীষার নয় শুধু, আমাদের মানবিক গুণেরও শূন্যতার লক্ষণ। তাই আমাদের অবক্ষয়কাল দীর্ঘস্থায়ী হবে। তাছাড়া বিদ্যা-বিত্ত-সংস্কৃতি-মনন চর্চা ও মগজ প্রয়োগ ক্ষেত্রে আমাদের ভুঁইফোঁড়ত্ব এর জন্যে বিশেষভাবে দায়ী। তবু আশার কথা, পতন-উত্থান বন্ধুর পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-জাতির অবস্থা ও অবস্থান কখনো চিরস্থায়ী হয় না, আমাদের তৃতীয়-চতুর্থ প্রজন্মে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবেই অর্থাৎ আরো প্রতীক্ষা করতে হবে রেনেসাঁসের জন্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শত বছর আগের কোলকাতা, শত বছর পরের ঢাকা

আমাদের আজকের বাঙলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও আইন-শৃঙ্খলা সম্পৃক্ত অবস্থার সঙ্গে উনিশ শতকের অন্তত শেষ দশকের আর্থ-সামাজিক ও প্রাশাসনিক শৈথিল্যের যেন আক্ষরিক মিল রয়েছে। পুরো এক শতকের ব্যবধানে ব্রিটিশ শাসিত বাঙলার বা কোলকাতার সঙ্গে স্বাধীন সার্বভৌম এবং শিক্ষিতবহুল বাঙলাদেশের মিল বা সাদৃশ্য অস্বাভাবিক ও লজ্জাজনক কিংবা মানবস্বভাবের ও আচরণের আবর্তিত রূপেরই সাক্ষ্য, তা বিজ্ঞ পাঠকেরই বিচার্য।

১৮৯১ সনের আদমশুমারী অনুসারে কোলকাতা শহরের লোকসংখ্যা ছিল সাত লাখ একচল্লিশ হাজার একশত চুয়াল্লিশ জন। এদের মধ্যে বিশ হাজার একশ ছাপ্পান্ন জন ছিল বেশ্যা। ছাত্ররাও বেশ্যাসক্ত ছিল। এর জন্যে সেকালের সমাজহিতৈষী রক্ষণশীল নীতিবিদরা রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটার হলগুলোকে- স্টার, সিটি, মিনার্ভা, এমারেল্ড, রয়েলবেঙ্গল প্রভৃতিকে দায়ী করতেন। কেননা যে-কোনো নাটকে নারীর ভূমিকায় থাকত গণিকারাই। এখন যেমন একইভাবে আমাদের নীতিবিদ রক্ষণশীল সমাজহিতৈষীরা হলিউড, বোম্বাই ও দেশী সিনেমাকে, সিএনএন, স্টার এবং সহশিক্ষা প্রভৃতিকে আর বোরখাহীনতাকেই দায়ী করে। হাটে-বাজারে পতিতালয় না থাকায় এখন গণিকাবৃত্তি ভিক্ষাবৃত্তির মতোই পার্কে, ফুটপাতে, মাঠে, বিউটি পার্লারে, লেকের ধারে, সদরঘাটে, কমলাপুর রেল স্টেশনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে। আজকের ঢাকা শহরের জামাতে ইসলামির কিংবা রক্ষণশীল মোল্লা-মৌলবী-পীর-পরহেজগারদের মতো ঠিক শতবছর আগে কোলকাতার রক্ষণশীল সমাজপতিরাও, 'শাস্ত্রানুগত্যেই মুক্তি' সন্ধান করেছিলেন, তাঁরা বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, জাতিভেদ, প্রাচ্যশিক্ষার পুনঃপ্রচলন এমনকি সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধকরণের আন্দোলনও শুরু করেছিলেন সভা ও প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে।

১৮৯০ সনে স্যার চার্লস এলিওট (১৮৩৫-১৯১১) বেঙ্গলপ্রেসিডেন্সির লেফটেন্যান্ট গভর্নর হন। তিনিই প্রথম ছাত্রদের তাঁর সরকার সমর্থক বানানোর লক্ষ্যে ১৮৯২ সনের জুলাই মাসে কোলকাতার কলেজগুলোর প্রায় চারশ শিক্ষার্থীকে তাঁর বেলাভেডিয়ার প্রাসাদে টি-পার্টিতে আমন্ত্রণ করেন। সগিন্নি তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপে তাদের মুগ্ধ ও ধন্য করেন। প্রতি বছরই তিনি ছাত্রদের সঙ্গে নানা উৎসব মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতেন। এলিওটের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ রাজত্বকে বাঙলায়-ভারতে চিরন্তন অন্তত সুদীর্ঘকালীন করা। সেদিক দিয়ে তাঁর স্বাজাত্য ও স্বদেশপ্রীতি তারিফযোগ্য। এমনি উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আজম খানের, মোনেম খানের, জঙ্গী রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমানের ছাত্রপ্রীতি অবশ্য স্মরণীয়। সরকারের ছাত্র নিয়ে রাজনীতির এলিওট থেকে আজকের রাজনীতিক দলগুলোর ছাত্রযুবা অঙ্গ-দলের স্থিতি অবধি শতবর্ষ পূর্ণ হয়ে গেল।

১৮৯৩ সনের ১১ই জুন তারিখের 'সমাজ ও সাহিত্য' পত্রিকায় 'আমরা কোথায়' নামের নিবন্ধে লেখক লিখেছেন, 'আমরা নরকে আছি.... আমরা মহরাণী ভিক্টোরিয়াকে অনুরোধ করি, হয় তিনি সমস্ত কোলকাতাবাসীকে গুলি করে হত্যা করুক, নতুবা তাদের জন্যে এমন কিছু করুক যাতে আমাদের জীবনের নিরাপত্তাবোধ আসে, আমাদের ধর্ম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজ ও মহিলাদের ইজ্জত রক্ষা পায়। জান-মাল-মান-সম্মানের আর নারীর ইজ্জতের কি অস্বস্তিকর অনিশ্চিতি, অনিরাপত্তা, বিপন্নতা, ত্রস্ততা প্রভৃতির বাহুল্য ঘটলে এমন লেখা ব্রিটিশ গভর্নর ও প্রশাসক শাসিত কোলকাতার পত্রিকায় মুদ্রিত হয়, তা অনুমান করা কঠিন নয়।

আজকের বাঙলাদেশের বা ঢাকার মতোই ১৮৯০ সনের পরেও খাস কোলকাতায় চোর, ডাকাত, রাহাজানী, গাঁজা-চন্ডু-চরস-আফিমখোর আর ইংরেজাদি পশ্চিমাদের বেপরোয়া পীড়ন-হামলা-হনন-দহন-লুণ্ঠন-ধর্ষণ আমজনতাকে সদাশঙ্কিত, ত্রস্ত ও বিপন্ন রাখত। মস্তান-খুনী-গুণ্ডা-রাহাজান কবলিত বাঙলাদেশ।

এখন যেমন হিরোইন, কোকেন, মারিজুয়ানা, প্যাথেড্রিন নেশাখোরদের অবলম্বন। উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ সরকার এদেশীদের প্রতীচ্যশিক্ষা গ্রহণে উৎসাহও দেয়নি, বাধাও দেয়নি, তাদের প্রাশাসনিক প্রয়োজনে সীমিত সংখ্যার স্কুল-কলেজের ব্যয় বহন করেছে মাত্র। তবে ইংরেজি ভাষায় লিখিত কোনো শাখার কোনো বই পড়ার সুযোগ থেকে, কোনো শাখার বিদ্যার্জন থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিতও করেনি। ফলে ব্রিটিশ আমলে হিন্দু কলেজ, বা তার আগের ব্যক্তিক ঘরোয়া স্কুল চালুর কাল থেকে ১৯৪৭ সন অবধি বাঙলায় বা ভারতে ইংরেজি শিক্ষা বিশেষ প্রসার লাভ করেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারগুলো তার প্রমাণ। এলিওট কোলকাতায় মাত্র প্রায় চারশ শিক্ষার্থী পেয়েছিলেন। ১৮৯২ সনের ২০শে জুলাই মাসে সব কলেজে ছাত্র ছিল সংখ্যায় চারশ মাত্র। তা ছাড়া পূর্বাঞ্চলের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত এফ-এ পরীক্ষায় ১৯০৭ সনে পরীক্ষার্থী ছিল মাত্র দুই হাজার চারশ চৌত্রিশ জন। এখনকার একটি বড়ো কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী থাকে পাঁচ-সাত হাজারের বেশি। বাস্তবে ১৯৪৭ সনের পরে স্বাধীন উপমহাদেশে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে অতি দ্রুতভাবে। কিন্তু আমাদের মানবিক গুণ, মানবতা, নৈতিকতার বিশ্বাস প্রভৃতি সে-পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। সমাজ হয়েছে অবক্ষয়গ্রস্ত। আমাদের উন্নতি যে কোন পথে, তা আজো সন্দিৎসার বিষয়। অতএব, আমাদের ঢাকা শহরে তথা বাঙলাদেশে যে নৈরাজ্য চলছে, তা একশ বছর আগেকার পরাধীন ভারতের রাজধানী কোলকাতা শহরের নৈরাজ্যকেও লজ্জা দেয়। আজ রাজনীতিক হালচাল জনজীবন-জীবিকার নিশ্চিতি-নিশ্চিন্তি হরণ করেছে, গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে-পাড়ায়-মহল্লায়-নারীর ইজ্জত ও জীবন বিপন্ন করে তুলেছে, দারিদ্র্য নারী ও শিশু পাচার অবশ্যম্ভাবী ও সহজ করে তুলেছে। বেকারত্ব শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষকে বেপরোয়া গুণ্ডা-খুনী-মস্তান-ডাকাত-রাহাজান করে তুলেছে, চাকুরেদের করেছে দুর্নীতিবাজ, রাজনীতিকদের করেছে মতলববাজ, কামুক বেকারদের আধিক্যে এবং পত্নীসঙ্গ বঞ্চিত সিপাহিদের কাছেপিঠে পতিতালয়ের অভাবে ধর্ষণে বেপরোয়া করে তুলেছে তাদের গাঁয়ে ও শহরে। আজকের বাঙলাদেশীরা আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক, পারিবারিক জীবনে প্রায় সর্বপ্রকারে বিপন্ন শঙ্কিত ত্রস্ত জীবনই যাপন করছে। এ নষ্ট সময়ের নষ্ট সমাজ, নষ্ট রাজনীতি এবং প্রাশাসনিক শৈথিল্যজাত অনিশ্চিতিও রাষ্ট্রকে আমজনতার স্বস্তিতে শান্তিতে নিরুপদ্রবে বাসের অযোগ্য করে তুলেছে। জনচরিত্রের ও জনজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে অমানবিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতরপ্রাণীসুলভ সব দোষ। এর থেকে সহজে মুক্তি মিলবে কি? ('পর্বান্তরের বিষয় কলকাতা' প্রতাপ মুখোপাধ্যায় রচিত গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্য নিয়ে লিখিত)

আমরা যেহেতু শাহ-সামন্ত-বুর্জোয়া মানসিকতাবশে আজো দেশ বলতে, জাতি বলতে, নাগরিক বলতে, রাষ্ট্র বলতে কেবল শহুরে শিক্ষিত ভদ্রলোকদেরই জানি, বুঝি ও মানি, সেহেতু রাজধানীই আমাদের রাষ্ট্রের ও সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস ও কেন্দ্র। রাজধানীতেই থাকে শিক্ষার, শাসন-প্রশাসনের নীতি-নিয়মের ও নিয়ন্ত্রণের উৎস ও কেন্দ্র। ব্যাংকের, কলকারখানার, পুঁজির, ব্যবসাবাণিজ্যের প্রধান দফতরের ও মালিকের স্থিতিও থাকে রাজধানীতে। সংসদ ভবনও থাকে রাজধানীতে, মন্ত্রীর ও রাষ্ট্রপতির বা রাজার আবাসও থাকে রাজধানীতেই। ফলে সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস-সমাজবিজ্ঞান-অর্থবিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চাও সাধারণভাবে রাজধানীতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা কলেজে কিংবা নানা প্রতিষ্ঠানেই বেশি করে হতে থাকে। সংবাদপত্রের ও অন্যান্য মাসিক-সাপ্তাহিক পত্রিকারও প্রকাশনা ক্ষেত্র হয় প্রধানত রাজধানীই। আর পুলিশ, প্যারামিলিশিয়া, স্থল-জল-বায়ু বাহিনীর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রকরাও থাকেন রাজধানীতে। অতএব আমাদের ঢাকা শহরই আমাদের গোটা জাতির অন্ন-বস্ত্র-আবাস-
শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা-সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-অর্থবিজ্ঞান-আয়ুর্বিজ্ঞান-সংস্কৃতি এবং চৌষট্টিকলার আর জলজ, বনজ, খনিজ, কৃষিজ উৎপাদিত ও নির্মিত পণ্য উৎপাদক মালিক শ্রেণীর আবাস এবং ভেতরের বাইরের আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। সর্বোচ্চক্ষমতার মন্ত্রীদের, আমলাদের এবং মর্ত্যজীবনের সর্বপ্রকার নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর এবং মানসিক চাহিদার, বিনোদনের, বিলাসের, আরামের, আনন্দের, সুখের, স্বস্তির, নিরাপত্তার, নিরুপদ্রবতার যোগানদাতা সব শাখার ও শ্রেণীর লোকের কর্তাব্যক্তিদের, নিয়ন্ত্রকদের, পরিচালকদের, হুকুমদাতাদের স্থিতি হচ্ছে রাজধানী ঢাকা শহরই। কাজেই শোষণের, পীড়নের, বঞ্চনার, প্রতারণার, ভেজালের, ঘুষের, দায়িত্বে ও কর্তব্যে অবহেলার, সর্বপ্রকার দুর্নীতিবাজের এবং সর্বপ্রকারের সু-কুখ্যাত নেকমায়েশের ও বদমায়েশের উদ্ভবও রাজধানী শহরেই প্রথমে ঘটে, পরে এদেরই প্রয়োজনে আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে ও সহযোগে দেশের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়ায়। এক কথায় আমাদের আজকের উন্নতি ও অবক্ষয়, আমাদের সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি, আমাদের চরিত্রবানতা ও চরিত্রহীনতা প্রভৃতি সবকিছুর শুরু ও উদ্ভব ঘটে প্রথমে রাজধানী ঢাকা শহরেই। ফারসী উপসর্গযোগে যেসব বাঙলা, ফারসী, আরবী শব্দ দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতী-দুষ্টজন চিহ্নিত করার জন্যে ব্যবহৃত হয়, সবগুলোই আমাদের আজকের অবক্ষয়প্রাপ্ত ভদ্রলোকদের (ভালো মানুষদের নয়) সম্বন্ধে প্রযুক্ত হতে পারে। এখানে বেহায়া, বেশরম, বেলেহাজ, বেআদব, বেদরদ, বেইমান, বেআকুব, বেইনসাফ, বেদীল, বেরহম, বেদানাই, বেরসিক, বেহিম্মত, বেআক্কেল, বেবুঝ, বেল্লিক প্রভৃতির সংখ্যাধিক্যই আমাদের সর্বপ্রকার না হোক, অন্তত পার্থিব জীবনের নিত্যকার অধিকাংশ দুঃখ-যন্ত্রণা-বঞ্চনার কারণ। কাজেই দুর্নীতির ও দুর্জনের দমনের, দলনের, শায়েস্তাকরণের ও উচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে হবে ঢাকা শহর থেকেই। এ দায়িত্ব এখন সজ্জন সুজন দেশপ্রেমীর ও মানবসেবীর। কারণ ষড়গুণের অধিকারী না হলে কেউ প্রত্যাশিত মাত্রার মানবিকগুণের অধিকারী হয় না। এ ছয়টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবিকগুণ হচ্ছে সংযম, পরমত-কর্ম-আচরণ সহিষ্ণুতা যুক্তিনিষ্ঠা, ন্যায্যতাপ্রীতি, সৌজন্য এবং বিবেকানুগত্য। এসব গুণ থাকলেই ব্যক্তি আত্মমর্যাদাসচেতন সংস্কৃতিমান মানুষ হয়, তার মধ্যে জাগে মানবহিতৈষণা, পরার্থপরতা। মানবিকতা, মানবতা বা মনুষ্যত্ব তারই কর্ম-আচরণে অভিব্যক্তি পায়। এমনি মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসেই সামাজিক মানুষের মধ্যে নীতি নিয়ম আদর্শ ও যুক্তি-নিষ্ঠা সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব। এ কাজ সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবী নামে পরিচিত বা অভিহিত শ্রেণীর কাছেই প্রত্যাশিত। কিন্তু নানা প্রত্যক্ষ বাস্তব কারণে বুদ্ধিজীবীরা, বিদ্বানেরা লাভে-লোভে-স্বার্থে সুবিধেবাদী, সুযোগসন্ধানী ও নগদপ্রাপ্তিজীবী হয়ে গেছেন, ব্যতিক্রম বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। তাই আমরা অবক্ষয়গ্রস্ত সর্বক্ষেত্রে ও সর্বপ্রকারে বিপন্ন। মানবতাকে সমাজকে বিপর্যয় থেকে বাঁচানোর জন্যে রাষ্ট্র ও সমাজ-নৌকোর 'কে ধরিবে হাল, কে উড়াবে পাল/কার আছে হিম্মত'? এ-ই আমাদের এ মুহূর্তে জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা।

রাজনীতি ও গণমানবের স্বার্থ

দাদা ছিলেন ব্রিটিশ আমলে দিনমজুর। নাম ছিল রহিম বখশ। বাবাও ছিলেন ক্ষেতমজুর পাকিস্তান আমলে। নাম ছিল বাদশাহ মিয়া। মা-বাবা ছেলের নাম বাদশাহ রেখেছিল, হয়তো মনের কোনো একটি ক্ষীণ আশা ছিল ছেলে সচ্ছল হবে, বাদশাহ যে হবে না তা জানা ছিল। বাঙলাদেশ আমলে বাদশাহর ছেলে রাজা মিয়া গাঁয়ের ভিটেও হারিয়ে এখন নালা-নর্দমার ধার ঘেঁষা ঝুপড়ি-খুপরিবাসী। বাদশাহ কিংবা রাজা নামের আরো আগে খোদাবখশ নামের কোনো ফজিলত মেলেনি এ পরিবারের। ব্রিটিশ গেল, কতোজন কতোভাবে ধনী-মানী হল, পাকিস্তান ভাঙল, কতোজন কতোভাবে গাড়ি-বাড়ির মালিক হল, কতোজন ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে অফিসে চতুর্থ-তৃতীয় শ্রেণীর চাকুরে বানাল, কারো কারো জেহেনী ছেলে ডেপুটি-মুনসেফ-উকিল-ডাক্তার-শিক্ষক-সাংবাদিক হল, বাদশাহর রাজার সে-সাচ্ছল্য ছিল না। সবদিন কাজ জোটে না দিনমজুরের, ক্ষেতমজুরের। তাই বাদশাহ নাম ব্যর্থ হল, রাজা নামও হল হাস্যকর। বাঙলাদেশে অজ্ঞ-অনক্ষর নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র মানুষের সংখ্যা আজো শতে সত্তর জন। এরা আন্তর্জাতিক মাপে-মানে-মাত্রায় দারিদ্র্যসীমার নিচে মানবেতর স্তরে জীবনযাপন করে। স্বাধীনতা, বিজয় দিবস, জাতীয়তা, স্বদেশী-স্বজাতি-স্বধর্মীর শাসন এদের কাছে অর্থহীন, এরা এতে অনধিকারী। আমরা জানি বর্গাচাষী, প্রান্তিকচাষী সবাই দিনে আনে দিনে খায়, কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ বাঁচিয়ে রাখে মাত্র এবং পৈত্রিক সম্পত্তি সন্তানদের মধ্যে প্রজন্মক্রমে ভাগ হয়ে যায় বলে এবং জনসংখ্যাও অবাধে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে, আর মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে আয়ের সমতা রক্ষা সম্ভব হচ্ছে না বলে সাধারণ গৃহস্থ ও নিম্নআয়ের ভদ্র পরিবারও এখন গোটা দেশে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত। যদিও আমরা জানি একটা বৃহৎ ধনিক-বণিক-আমলা শ্রেণীও গড়ে উঠেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠছে দ্রুত। এ শ্রেণী ক্রমে স্ফীতও হচ্ছে, তাই সর্বত্র গাড়ির বাড়ির এমন চোখ ধাঁধানো বিস্তার দেখা যায়। দেশ ধনবান হচ্ছে। দেশের বা রাষ্ট্রের উন্নতি হচ্ছে। কেননা দেশ বলতে, জাতি বলতে, মানুষ বলতে, নাগরিক বলতে আমরা শহুরে শিক্ষিত চাকুরে উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, দোকানদার, ব্যবসাদার, কারখানাদার প্রভৃতি অর্থ-বিত্ত বেসাতের মালিক ও নিয়ন্তাদেরই জানি ও বুঝি। অন্য মানুষ শাহ্-সামন্ত-ধনবাদী বুর্জোয়া সমাজে মানুষ হিসেবে স্বীকৃত নয়, শ্রমিক-মজুর হিসেবেই, প্রয়োজনীয় প্রাণী হিসেবে আবশ্যিক বলেই বিবেচিত। অথচ এ মানুষকেই কায়েমী স্বার্থবাদী ভদ্রলোকেরা রাজনীতিক আন্দোলনে সভায়, মিছিলে ব্যবহার করে ভাড়াটে জন রূপে। মুক্তিযুদ্ধ করার উত্তেজনা-উদ্দীপনা দেয়, মারামারি-হানাহানির সময়ে এদেরই ডাক পড়ে। এদের মাথায় হাত বুলিয়ে এদেরই পিঠ চাপড়ে, এদেরই স্তোকবাক্যে তুষ্ট করে, এদের মনে মিথ্যা আশা ও আশ্বাস জাগিয়ে এদের দুস্থাবস্থা ঘোচানো ও অর্থসম্পদ প্রাপ্তি সম্বন্ধে, ওই ভদ্রলোকেরা পূর্ববৎ চিরকালীন নিয়মে ওদেরই মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায়। ওদেরই শাসনে-শোষণে-হুকুমে-হুমকিতে-বঞ্চনায়-প্রতারণায় চিরকালই অন্তত আজ অবধি পদাশ্রিত করে রেখেছে, মানুষের, নাগরিকের অধিকার দেয়নি, দেবার ইচ্ছাও পোষণ করে না।

আমাদের দশ-এগারো কোটি মানুষ নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ, দরিদ্র, অজ্ঞ, অনক্ষর, শাসিত, শোষিত, পীড়িত, বঞ্চিত ও চিরপ্রতারিত বলেই নগদ প্রাপ্তিতে আস্থাবান, আশা-আশ্বাসে ভরসা রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তারা তাদের মুক্তিযোদ্ধা কম্যুনিস্টদের কথায় ও কাজে ভরসা পায় না। তাদের সঙ্গে সহযোগিতাও করে না, পাছে ইহকাল পরকাল দুটোই হারায় এই ভয়ে। অথচ কম্যুনিস্টরা হচ্ছে মানববাদী, মানবদরদী, তারা মানুষ মাত্রকেই আত্মীয় এবং স্বজন ভাবে। এই জন্যেই নিজের জীবনের সুখ-শান্তি, আনন্দ-আরাম, ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ বাঞ্ছা পরিহার করে সর্বত্যাগী হয়ে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে নিঃস্ব শোষিত জনমানবের মুক্তির জন্যে জীবনব্যাপী সংগ্রাম করে ভোগবিমুখ বিপন্ন জীবনে নিশাচর হয়ে। তবু আমাদের নিঃস্ব অজ্ঞ মানুষেরা ওদের আহ্বানে সাড়া দেয় না ওদের আশ্বাসে ও সাফল্যে আস্থা রাখে না বলেই। বিড়ম্বনা আর কাকে বলে!

এই সুযোগ নিয়েই একালের আর্থ-বাণিজ্যিক-মহাজনী সাম্রাজ্যবাদী অ্যাজেন্টেরা যারা এনজিও নামে পরিচিত, দেশের সর্বত্র সেবা ও সাহায্যের বিনিময়ে, নগদ দানপ্রাপ্ত গণমানবের বিশ্বাস ও ভরসার পাত্র হয়ে উঠেছে। শহরের মুৎসুদ্দী সরকারও বিদেশী ঋণ, দান, অনুদান ও ত্রাণদাতা প্রভু শক্তির নির্দেশে এনজিওকেই সারা দেশটা ইজারা দিয়ে দিয়েছে। এ কারণেই ১৮ শতকের দেওয়ানী প্রাপ্ত ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির মতোই এরা এখন দেশের রাজনীতিতেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে। এমেকো-নিনিয়ান-র‍্যাফেল-মেরিল প্রমুখ একদিকে, অন্যদিকে এনজিওরা তৃণমূল জনসংগঠন নামে দুস্থ মানুষের সঙ্ঘ গড়ে তুলে রাজধানী ঢাকা শহরে সদাপট আন্দোলন ও সভা করতে সাহস পায়, তখন মনে সঙ্গতকারণেই প্রশ্ন জাগে বাঙলাদেশ কি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র?

আজ এই মুহূর্তে আমাদের বাঙলাদেশে রাজনীতি রেষারেষির ও জেদাজেদির স্তরে পৌঁছে গেছে, দেশপ্রেমও মানব সেবার স্তরে নেই। এখন মীমাংসার শেষ আশাও সম্ভবত বিলুপ্ত হয়ে গেল। দেখা দিল মারামারির হানাহানির অমোঘ আশঙ্কা। এখন হনন-দহন-ধর্ষণ-লুণ্ঠন-ভাঙন চলবে, এতেই বোঝা যাচ্ছে আমাদের রাজনীতিকদের কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতিক সংস্কৃতি-চেতনা নেই, নেই দেশের বারো কোটি মানুষের প্রতি কোনো মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ। নিজেদের গদি দখলে রাখার ও কাড়ার লড়াইকে জেদাজেদির ও রেষারেষির পর্যায়ে নিয়ে দেশবাসীর জান-মাল-গর্দান বিপন্ন করা, অর্থ-বাণিজ্য-পণ্য ও সম্পদ প্রভৃতির ক্ষতির কারণ হওয়া রাজনীতিক দলগুলোর অপরাধ নয় কি? সরকারি চাকুরে নন এবং কোনো রাজনীতিক দলের সদস্যও নন এমন শহুরে শিক্ষিত লোকদের জাতির এমনি সঙ্কটকালে কি কোনো দায়িত্ব কর্তব্য নেই? তারা কি প্রতিবাদে প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে পারেন না রাজনীতিক দলগুলোর জেদাজেদি থামানোর লক্ষ্যে?

জাতীয় সমস্যা-মুক্তির পন্থা

আমরা রাজনীতিক অঙ্গনে এ মুহূর্তে ঘোলা পানির মাছের মতো দিশেহারা হয়ে মুক্তির পথ হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছি। আমাদের সমস্যা গাঢ়-গভীর। আমাদের সঙ্কটের আপাত সমাধান আমাদের স্থায়ী সমস্যার সমাধান দিতে পারবে না। কাজেই আমাদের এখন ঠাণ্ডা মাথায় স্থির ও সুস্পষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্য নিরূপণ-নির্ধারণ করে লক্ষ্যে পৌঁছার-পৌঁছানোর পথ ধরে এগিয়ে চলতে হবে। এর জন্যে আমাদের দেশ-মানুষ-রাষ্ট্রের গুরুত্ব-চেতনা সদা বহমান রাখতে হবে যুগপৎ ও একাধারে। ১৯৭২ সনে আমাদের জন্যে একটা আদর্শ, সুষ্ঠু ও শ্রেষ্ঠ সংবিধান রচিত হয়েছিল, তা বাস্তবে প্রয়োগ ও অনুসৃত হয়নি। অল্পকালের মধ্যেই বাকশাল তা বানচাল করে দেয়। পরে জিয়াউর রহমান 'বিসমিল্লাহ' বসিয়ে এক গুলিতে বাঙালি জাতীয়তা, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ফুটো করে দিলেন। ফলে 'বাঙলাদেশ' নামের সংখ্যাগুরু অধিবাসীর এক নতুন মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভব হল সেই 'মুসলিম রাষ্ট্র' আবার দৃঢ়ভিত্তিক হল ও স্থায়ী স্বীকৃতি পেল 'ইসলাম' রাষ্ট্রধর্মরূপে সংবিধানে ঠাঁই পাওয়ার ফলে। মুহূর্তেই অমুসলিমরা নাগরিক অধিকারচ্যুত হয়ে পরিণত ও পরিচিত হল অনুচ্চারিত কিন্তু বাস্তবে আক্ষরিকভাবে সত্য 'জিম্মি' রূপে। যারা এতে ইসলামের জয় ও মুসলিমদের কল্যাণ দেখে তাদের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া বা বিরোধে-বিবাদে নামা নিরর্থক। কেননা সবারই স্বাধীন মত পোষণ করার, মন্তব্য প্রকাশ্যে পরিব্যক্ত করার এবং অনুসরণীয় আদর্শ ও পথ বেছে নেয়ার মৌল মানবাধিকার রয়েছে। যারা মগজের অনুশীলন করে না, যৌক্তিক-বৌদ্ধিক মতে ও পথে জীবনযাপনে রাজি নয়, বরং আশৈশব দৃষ্ট, শ্রুত ও লব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণায় ও আচারে-আচরণে আর উপযোগরিক্ত দেশ-কাল নিরপেক্ষ গতানুগতিক অভ্যস্ত নীতি-রীতি অনুসরণে জীবনযাপনে স্বস্তি ও শান্তিকামী, তাদের মন-মগজ-মনন-মনীষার পাথুরে দুর্গে কোনো যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা প্রবেশ করানো যাবে না সযত্ন প্রয়াসেও। তারা অতীত ও ঐতিহ্যনির্ভর নিশ্চিন্ত নিশ্চিত পথের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাত্রী। তারা নতুন চেতনা-চিন্তার, নতুন নীতি-নিয়মের রীতি-রেওয়াজের নতুন প্রথা-পদ্ধতির প্রভাব সযত্ন সতর্ক প্রয়াসে এড়িয়ে চলার, নতুন নতুন তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য পরিহার করার আদর্শে আহ্বান। তারা অতীতের ও ঐতিহ্যের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত বলেই তারা প্রগতির ও প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক পর্যায়ে বড় বাধা। এ সূত্রে বিশ্বব্যাপী অর্থোডকস্‌দের ও মৌলবাদীদের উগ্রভূমিকা স্মর্তব্য। এ কালে গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক, ভাষিক, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি প্রবল হয়ে উঠেছে, ফলে এখন মানুষ আর সুশাসনে তুষ্ট, তৃপ্ত ও হৃষ্ট নয়, এখন স্বশাসনে গর্বিত হতে চায়, সে-জন্যে গোটা বিশ্বে নানা জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতি-অঞ্চলের পার্থক্যের ও স্বাতন্ত্র্যের সম্মানজনক স্বীকৃতি চায় সংখ্যালঘুরা। আমাদের বাঙলাদেশেও রয়েছে সে-সমস্যা। তবে আমাদের সমস্যা তেমন মারাত্মকভাবে গুরুতর নয়। এখানে নাগরিক নির্বিশেষকে যোগ্যতা অবিশেষে 'মানুষ' বলে স্বীকার করে বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের সরকার যথাপ্রাপ্য সুবিচার করলেই কোনো সমস্যা থাকবে না। এতে সংখ্যাগুরু সমাজের বিপদের বা ন্যায্য প্রাপ্য হারানোর কোনো আশঙ্কা দেখি না। তবু সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অন্যায্য অনুদারতা, বিধর্মীদ্বেষণা ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রভীতি সরকারকে অকারণ অবিচারে প্ররোচিত করে ভোট যোগাড় লক্ষ্যে। দুধের পরিমাণ যা-ই হোক, এক ফোঁটা চোনা কিংবা অম্লরস পড়লেই তা বিকৃতি পায়, তেমনি রাষ্ট্রে যে-কোনো একটা নীতি-নিয়ম-আইন বা বিধিনিষেধ ন্যায্যতা বিরোধী হলেই তার প্রভাব পরোক্ষে-প্রত্যক্ষে সর্বব্যাপী হয়। কেননা তা সম্প্রদায়ের বা শ্রেণীর স্বার্থে লাগে বলে, অধিকারে ঘা দেয় বলে তা মন ভাঙে, মান কাড়ে, বিরূপ করে, ক্রোধ-ক্ষোভ সৃষ্টি করে। প্রীতির ও সহযোগিতার শেকড় ছেঁড়ে।

কাজেই আমাদের প্রয়োজন সেক্যুলার সংবিধানের। এ সংবিধানই জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-নিবাস-গোত্র-গোষ্ঠী-জাতি-উপজাতি-জনজাতি নিরপেক্ষ এক বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের একক জাতি গড়ে তুলতে পারে সবাইকে 'মানুষ' রূপে স্বীকৃতি দিয়ে, অভিহিত করে, সমান নাগরিক অধিকারে ও সুবিচারে সুপ্রতিষ্ঠ রেখে। আর নাগরিক মাত্রকেই অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে যোগ্যতার ভিত্তিতে যথাপাত্রে যথাপ্রাপ্য দিয়ে তুষ্ট বা তৃপ্ত রাখা সম্ভব রাষ্ট্র বা সরকার গণতন্ত্রসম্মত 'সমাজতন্ত্র' বাস্তবায়িত করলে। অর্থাৎ এ প্রোলেতারিয়েতের একনায়কতান্ত্রিক গণতন্ত্র বা শাসনব্যবস্থা হবে না। বুর্জোয়া পদ্ধতির ভোটাধিকার ভিত্তিক জবাবদিহিতামূলক গণতান্ত্রিক শাসনাধীন সমাজতন্ত্র হবে। রাষ্ট্র বা সরকার রাষ্ট্রবাসী নির্বিশেষের মর্ত্যজীবনের চাহিদাই মেটাবে, তাদের পারত্রিক কল্যাণ সম্বন্ধে থাকবে অসম্পূর্ণ উদাসীন, নিরপেক্ষ ও নিষ্ক্রিয়। তা হলেই যুগোপযোগী রাষ্ট্রিক জাতীয়তা গড়ে উঠবে এবং ধর্মবিশ্বাসের ওপরেই ঠাঁই পাবে নির্বিশেষে মানুষের প্রতি নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য চেতনা, দেশপ্রেম ও মানবসেবা হবে অকৃত্রিম। ধর্ম-ভাষা-শ্রেণী-যোগ্যতা প্রভৃতির পার্থক্য রেষারেষির, কাড়াকাড়ির, মারামারির, হানাহানির কারণ হবে না। দেশকে পুঁজি খাটিয়ে যুগোপযোগী শিল্পে-বাণিজ্যে; মূলধন বা উদ্বৃত্তধন বিদেশে নিরাপত্তা, লক্ষ্যে পাচার করবে না কেউ। আমাদের জলজ, খনিজ, বনজ, কৃষিজ, শিল্পজ উৎপাদিত ও নির্মিত কাঁচা-পাকা সর্ব প্রকারের পণ্যবাজার দেশী-বিদেশী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আয়ত্ত করে ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দখলে রেখে আমরাও অর্থে-সম্পদে ঋদ্ধ একটা আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারব, হব স্বনির্ভর ও স্বয়ম্ভর। ঋদ্ধ রাষ্ট্র তখন জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের চর্চার জন্যে, আসমান-জমিনের, অরণ্য-পর্বত-সমুদ্রের সবকিছুর সম্বন্ধে গবেষণার জন্যে অর্থ ব্যয়ে হবে সমর্থ। আয়ুর্বিজ্ঞানে রোগ নিরূপণের ও প্রতিষেধক আবিষ্কারের ও উদ্ভাবনের এবং শিল্পে-বাণিজ্যে-চিকিৎসার প্রয়োজনে এমন সব যন্ত্র আবিষ্কারে উদ্ভাবনে অন্তত অনুকৃত যন্ত্র ও যুদ্ধের প্রয়োজনে মারণাস্ত্র নির্মাণেও আমরা স্বয়ম্ভর হতে পারব জল-স্থল-বায়ু সেনার প্রয়োজনীয় সব যান-বাহন ও যন্ত্র আর অস্ত্র নির্মাণ করতে। 'দশজনে পারে যাহা তুমিও পারিবে তাহা' তত্ত্বে ও প্রবচনে বা আপ্তবাক্যে আস্থা রেখে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে, হিম্মত সঞ্চয় করে, অঙ্গীকারপুষ্ট হয়ে উদ্যমী উদ্যোগী মানুষ কাজে নামলে সাফল্য পরিণামে সুনিশ্চিতভাবে অর্জিত হয়ই। শেষবারের মতো স্মরণ করি, আমাদের জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় জীবনে সর্ব প্রকারের সমস্যা-সঙ্কটের স্থায়ী সমাধানের জন্যে আবশ্যিক ও জরুরি হচ্ছে নতুন চেতনা-চিন্তামুখিতা বা মুক্তমনের যুক্তিবাদ ও বুদ্ধিবাদপ্রীতি, অনুকরণে অনুসরণে কল্যাণকর সবকিছু গ্রহণে বরণে আগ্রহ আর রাষ্ট্রিক জাতীয়তা, সেক্যুলারিজম ও উদার বুর্জোয়া আদলের গণতন্ত্রসম্মত সমাজতন্ত্র আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভরতা।

AMARBOI.COM

গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব লক্ষ্যে

দেশপ্রেমী ও মানবসেবী আলাদা কোনো সামাজিক প্রাণী নন। তাঁরা সমাজ থেকেই গড়ে ওঠেন মানবিকগুণের আধিক্যে ও মানসপ্রবণতার প্রাবল্যে। সব মানুষ নেকমায়েশ হয় না, সব মানুষ হয় না বদমায়েশও। ব্যক্তিক মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণও বিবিধ ও বিচিত্র। অধিকাংশ অর্থাৎ অন্তত শতে একান্নজন ব্যক্তি যদি সংযত, সহিষ্ণু, যুক্তিনিষ্ঠ, ন্যায্যতাপ্রিয়, বিবেকানুগত, সৎ ও সুজন হয়, তা হলে সে-সমাজে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা-সৌজন্য, সততা, ন্যায্যতা প্রভৃতির প্রাধান্য থাকে। সে সমাজকেই আমরা কাম্য বলে জানি ও মানি। এর জন্যে সংযম, পরমত-পরকর্ম-পরআচরণ সহিষ্ণুতা, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধির অনুশীলন, বিবেকানুগত্য, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতির সচেতন সযত্ন সপ্রয়াস চর্চা বা অনুশীলন আবশ্যিক ও জরুরি। এসবের গুরুত্বচেতনা আমাদের মধ্যে এখনো দুর্লভ। আমাদের জীবনে প্রতীচ্য সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি প্রভৃতির সচেতন মগজী অনুশীলন প্রসূত প্রত্যাশিত মানের ও মাত্রার প্রভাব পড়েনি। আমরা প্রতীচ্য আদলে দেহ-প্রাণ-মন-মনন-রুচি-সংস্কৃতির পরিচর্যায় বাহ্যত নিত্য আগ্রহী হলেও, অন্তরে প্রতীচ্য আদলে মানবিকগুণের ও আদর্শের অনুশীলনে উৎসাহী নই। তাই প্রতীচ্যে নৈতিক-সামাজিক-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাংস্কৃতিক নানা বিকৃতি আমজনতার মধ্যে সুলভ হলেও, উঁচুমানের মগজী চিন্তা-চেতনায় কিংবা দর্শনে-বিজ্ঞানে-সাহিত্যে, নানা ললিত ও বিভিন্ন কারুকলায় আর প্রকৌশল-প্রযুক্তি সম্পৃক্ত যন্ত্রের আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে, উৎকর্ষে, আয়ুর্বিজ্ঞানে, চিকিৎসায় ও প্রতিষেধকে নিত্যনতুন গবেষণালব্ধ উন্নতিতে এবং সামগ্রিক, সামূহিক ও সামষ্টিকভাবে সমাজে বিভিন্ন পেশায় ও নেশায় মহৎ মানুষের, গুণী-জ্ঞানী মনীষী মানুষের বহুলতা য়ুরোপকে আমাদের অনুকৃত ও অনুসৃত বিদ্যা-বুদ্ধি আদর্শের এবং যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎস করে রেখেছে। কিন্তু আজো কোনোটাই আমাদের মেধা-মজ্জাগত সম্পদ হয়নি বলেই আমাদের সাধ-স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়নি, ঘোচেনি আমাদের মানসদৈন্য।

আজ আমরা আমাদের রাজনীতি, রাষ্ট্র ও সমাজবোধ সম্বন্ধেই আমাদের আলোচনা নিবদ্ধ রাখব। আমরা 'গণতন্ত্র' কামী হয়েছি প্রতীচ্য রাষ্ট্রগুলোর অনুকরণে, কিন্তু যে-মানস সংস্কৃতিটিও সম্পদ হলে গণতন্ত্রের রাষ্ট্রে বা সমাজে বাস্তবায়ন সম্ভব, তা আমাদের আয়ত্তে আসেনি। ফলে আমরা গণতন্ত্রের নামে এক প্রকার স্থূল ও অনুকৃত ভোটতন্ত্রকেই গণতন্ত্র নামে চালিয়ে দিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এজন্যেই আমাদের তৃতীয় বিশ্বে আজো সেনানীনায়ক শাসকের সর্বময় ক্ষমতার ছায়ায় এক 'ভোটতন্ত্র' চালু রয়েছে এবং তা দইয়ের স্বাধ ঘোলে মেটানোর মতোই 'গণতন্ত্র' নামে উপভোগ্য ও স্বীকৃত। এ বাস্তবে টবের গাছে বাগানের শোভা উপভোগের মতোই কৃত্রিম। এ কারণে আমাদের গণতন্ত্র নামের ভোটতন্ত্রও বাস্তবে স্বৈর-স্বেচ্ছাতন্ত্র মাত্র। জনপ্রতিনিধি বাহ্যত নির্বাচিত সেবক হলেও কার্যত শাসক-শোষক, মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্প-দাপট-প্রভাব-প্রতিপত্তি আর লাভ-লোভ-স্বার্থ সচেতন বিত্ত-বেসাত অর্জনকামী প্রভু মাত্র।

কোনো মতাদর্শ, আচার-আচরণ, রুচি-সংস্কৃতি কেবল অঙ্গাবরণের আভরণের মতোই অনুকৃত ও অলঙ্কৃত হয়ে থাকলে, আত্তীকৃত, আত্মীকৃত, সাঙ্গীকৃত ও চিত্তগত না হলে, তা কোনো শ্রেণীর মানুষেরই স্বভাব-চরিত্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি বদলাতে পারে না। বিত্তবান যেমন বিনা অনুশীলনে চিত্তবান হয় না, এ-ও তেমনি পোশাকীই থেকে যায়, ত্বকের মতো শরীরের এবং নীতি আদর্শের মতো চিত্তের অবিচ্ছেদ্য অংশ বা সম্পদ হয় না। আমাদের দেশে গণতন্ত্রকে আমাদের স্বভাব-চরিত্রের, জীবন-যাপন পদ্ধতির অপরিহার্য অংশ করতে হলে আমাদের যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবনের অনুশীলনে নিষ্ঠ হতে হবে। এর অভাবেই আমাদের শাস্ত্রানুগত আস্তিক আমজনতার অধিকাংশই লাভে, লোভে, স্বার্থে করে না হেন অপরাধ-অপকর্ম নেই। অথচ য়ুরোপে আমরা মানবিকগুণে ঋদ্ধ বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সাহিত্যিক, চিত্রী প্রভৃতির মধ্যে নয় শুধু, রাজনীতিকদের মধ্যেও মহামনীষী নিরীশ্বর নাস্তিক দেখেছি, যাঁরা নিরপেক্ষ নৈতিক চেতনায়, আদর্শ নিষ্ঠায়, বিবেকানুগত্যে এবং যৌক্তিক-বৌদ্ধিক জীবনযাপনে, পরার্থপরতায় আর মানুষ ও প্রাণী-প্রকৃতি প্রেমে মানুষ মাত্রেরই শ্রদ্ধেয় হয়ে রয়েছেন। এ ধরনের মানুষ আমাদের দেশে ও সমাজে বিরলতায় দুর্লভ-দুর্লক্ষ্য।

শোষণমুক্তসমাজবাদীর কিংবা গণকল্যাণবাদীর গণতন্ত্রই যদি আমাদের কাম্য হয়, তা হলে আমাদের সচেতন সযত্ন প্রয়াসে গণতন্ত্র চর্চা করতে হবে। আমাদের রাষ্ট্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণতন্ত্রকে স্বরূপে পেতে হলে নিঃস্ব নিরন্ন অজ্ঞ অনক্ষর দুস্থ দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমাতে হবে। আমাদের আমজনতার মধ্যে দেশপ্রেম ও মানবসেবা এ দু'টোকে মানসপ্রবণতা অনুসারে সার্বক্ষণিক নেশার ও পেশার বিষয় করে নিতে হবে। যারা রাজনীতি করবেন, তাঁরা আকৈশোর রাজনীতিক কর্মী হিসেবে শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ নেবেন বাস্তবে কর্মে ও আচরণে আর ভাবে-চিন্তায়-কল্পনায়-পরিকল্পনায়। প্রেয়স নয়, শ্রেয়সই হবে তাঁদের সার্বক্ষণিক লক্ষ্য। এখন আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা শাসক-প্রশাসক-আমলা-সাংসদ-মন্ত্রীদের রাজনীতি হচ্ছে মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্প-দাপট-প্রভাব-প্রতিপত্তি-বিত্ত-বেসাত অর্জনের সহজ মাধ্যমমাত্র। এবং এ পেশা ও নেশা হচ্ছে তাঁদেরও খণ্ডকালীন মৌসুমী তথা নির্বাচনকালীন পেশা ও নেশামাত্র। তাই আমাদের সাংসদ-মন্ত্রীর অধিকাংশ এখন অব সেনানী-সওদাগর-ঠিকাদার ও অব আমলা। তাঁরা তাই স্বৈর ও স্বেচ্ছাচারী। তাঁদের মধ্যে সাংবিধানিক কিংবা বিবেকী জবাবদিহিতা নেই গণমানবের কাছে। অতএব অবসেনানী, সওদাগর ও ঠিকাদারমুক্ত করতে হবে রাজনীতিকে ও নির্বাচিত পর্ষদ, পরিষদ ও সংসদকে। অবশ্য সেনানী-সওদাগর-ঠিকেদার মাত্রই বাদ যাবেন না। যাঁরা নানাগুণে পরিচিত মহলে শ্রদ্ধেয় তাঁরা অবশ্যই বাঞ্ছিত ব্যক্তি হবেন পর্ষদে, পরিষদে ও সংসদে। কিন্তু এখন যেমন নানাভাবে অর্জিত বিপুল অর্থের মালিক হিসেবে নির্বাচনকালে ঢাকা শহরে এসে থোক টাকার বিনিময়ে 'মনোনয়ন' ক্রয় করে মফস্বলে নির্বাচন এলাকায় গিয়ে থলেভরা টাকা দিয়ে 'ভোট' কেনার প্রতিযোগিতায় নামেন, জনগণের অচেনা-অজানা কিংবা দোষদুষ্ট হাড়ে হাড়ে চেনা অবসেনানী সওদাগর ঠিকাদার আমলা প্রার্থীরা, এ প্রথা চালু থাকলে তৃতীয় বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রেই 'গণতন্ত্র' কখনো প্রতিষ্ঠা পাবে না, আর সামরিক বাহিনীর নায়করাও নিজেদের রাষ্ট্রে, অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক বলেই ভাববেন, নিজেদের বেতনভুক চাকুরে বলে জানবেন না, সুযোগ-সুবিধা মতো তাঁরা তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে নজরদারি, খবরদারি ও তদারকির অধিকার প্রয়োগে রাষ্ট্রক্ষমতা 'ক্যু' করে দখল করবেন 'গণতন্ত্র' স্বরূপে স্বপ্রতিষ্ঠ না হলে।

স্বখাত সলিলে মজালে এ কনক বাঙলা

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য মানুষের বৃত্তি প্রবৃত্তির এ ছয়টি অসংযত প্রকাশকে রিপু বা শত্রু বলা হয়। এদের লোকে ষড়রিপু বলেই জানে, বোঝে ও মানে। এ ছয়টির যে-কোনো একটির প্রতি অসংযত আসক্তি জাগলেই তা অপ্রতিরোধ্য হয় এবং পরিণামে তাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারে পার্থিব জীবনে। এ ব্যক্তিক অসংযম তার পরিবারকে এমনকি সে-ব্যক্তি যদি শাহ-সামন্ত-জঙ্গীনায়ক কিংবা রাজনীতিক নেতা, সরকার পরিচালক প্রধান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তি হন, তা হলে দেশকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে পর্যন্ত ধ্বংস করার কারণ হতে পারেন। এ অসংযত প্রবৃত্তিকে বহ্নি বা আগুনের সঙ্গেও তুলনা করা হয়। রূপবহ্নি বা রূপানুরাগ কামবহ্নি প্রজ্বলিত করে, কাম প্রেমে উন্নীত না হলে, ব্যর্থকাম মানুষকে উন্মত্ত হননপ্রবণ প্রাণীতে পরিণত করে এবং সেই কামাসক্ত অথচ কাম চরিতার্থ না হওয়ায় অপরিতৃপ্তির জ্বালায় বেপরওয়া মত্তহস্তীর মতো আচরণ করে। সীতারাম উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম চরিত্র এভাবেই চিত্রিত করেছেন। আবার রূপবহ্নি ও কামানল গোবিন্দলালের মতো সজ্জনকে ভ্রষ্টচরিত্র করেছিল। রূপবহ্নি প্রেমে উন্নীত হলেও মিলনে বা পরিণয়ে পরিণত না হলে তা 'চন্দ্রশেখর'-এর শৈবলিনী-প্রতাপ-এর মতোই প্রণয়বহ্নির বেদনা-মধুর অনুভূতিতে যন্ত্রণাকাতর করে রাখে সারাটা জীবন।

সঙ্গতকারণে ক্রুদ্ধ হলেও আকস্মিক আবেগ সংযত করতে না পারলে যৌক্তিক-বৌদ্ধিক ও বিবেকী বিবেচনায়, সেই ক্রোধবহ্নি মানুষকে এমন অবিমৃষ্য কর্মে-আচরণে প্রণোদনা ও প্রবর্তনা দেয় যে তা তখন উত্তেজনা-প্ররোচনা বলে মনেই হয় না, বরং যথোচিত কর্ম-আচরণ-ব্যবস্থা-সিদ্ধান্ত বলেই প্রতিভাত হয় ক্রুদ্ধজনের চেতনায়-চিন্তায়-মনে-মগজে-মননে। প্রতিহিংসার আগুন অপকর্ম বা অন্যায় আচরণ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ক্রোধমুক্ত মনে মগজে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড দানের অনুশোচনা জাগায় স্বস্থ জনের মনে, তখন আবার বিবেকীযন্ত্রণা জাগে, বৈষয়িক ক্ষয়ক্ষতির জন্যে আফসোস হয়। কিন্তু তখন আর সংশোধনের উপায় থাকে না। ভাঙা হাঁড়ি জোড়া লাগে না। ক্রোধবহ্নি এমনিভাবে মর্ত্যজীবনে কখনো কখনো হত্যাদি করিয়ে ব্যক্তিক বা পারিবারিক জীবনে সর্বনাশ ঘটায়।

অসংযত ভোগলিপ্সার, প্রাপ্তিলোভে অনধিকার চর্চার নাম লোভ। লোভবহ্নি সর্বনাশ ডেকে আনে, এজন্যেই উপনিষদের ঋষি বলেছেন 'মা গৃধঃ- লোভ করো না' কারণ লোভে পাপ বা অপরাধ তথা অকল্যাণ। এবং পাপের ও অপরাধের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ শাস্তি আছেই– আশু কিংবা বিলম্বিত, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, এ প্রবচনিক সত্য, তত্ত্ব ও তথ্য আমাদের সবার জন্যে। কাজেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র। লিপ্সাবহ্নিতেও মানুষ জ্বলে ঐহিক ও পারত্রিক চেতনা প্রবল থাকলে। কারণ লিপ্সু বা লোভী মানুষ লিপ্সাতাড়িত হয়ে অনধিকার চর্চা করে, পরস্বাপহরণে প্রলুব্ধ থাকে, সুযোগ-সুবিধা পেলেই দুর্বলের ধন কাড়ে, জোরে জুলুমে পরস্ব আত্মসাৎ করে। লোভী মানুষ পরিচিত জনের অনাস্থাভাজন ঘৃণ্য, নিন্দিত, পাপী ও অপরাধী বলে সমাজে অবজ্ঞেয়, আবার পাপী বলে পারত্রিক শাস্তির কবলিত। লোভী মানুষ বার্ধক্যে আসন্নমৃত্যুর ভয়ে ভীত ত্রস্ত থাকে, হয় অনুশোচনায় দগ্ধ, অস্বস্তির মধ্যেই কাটে তার মৃত্যুপূর্বের ভগ্নস্বাস্থ্যের কাল।

আর মোহ তো মানুষকে হিতাহিত বোধশূন্য করে। মোহ হচ্ছে পতঙ্গের আগুনে-আলো বা অগ্নিশিখা প্রীতির মতো অমোঘ অনুরাগ-রাগ, যা মানুষকে কিংবা পতঙ্গকে অনন্যচিত্ত অসংযত, অবিমৃষ্য করে তোলে। মোহাবিষ্টকে মোহমুক্ত করা যায় না- আদেশে নির্দেশে হুকুমে হুমকিতে কিংবা উপদেশে পরামর্শে। মোহমুক্তি ঘটে মোহের অবলম্বন বা পাত্র-পাত্রী বা ব্যক্তি থেকে প্রত্যাঘাত প্রাপ্তির ফলে বা কারণে, তখন ক্ষয়-ক্ষতি পুষিয়ে নেবার, আত্মসংযমে আত্মশোধনে আত্মস্থ হবার সময় প্রায় ফুরিয়েই যায়, কাজেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহবহ্নির কোনো সাধারণ প্রতিকার ব্যবস্থা নেই, মোহমুক্তির জন্যে অপেক্ষা করতে হয়-মোহমুদগর এ ক্ষেত্রে কাজে লাগে না।

মদ মানে দম্ভ, নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা, অলীক অহঙ্কার, অস্মিতা, আত্মম্ভরিতা, হামবড়াভাব প্রভৃতি। এ হচ্ছে নির্বোধের স্বর্গে বাস করা মানুষের নিজের দোষ-গুণ-অজ্ঞতা-যোগ্যতা সম্বন্ধে ভুল ধারণাবশ্যতার কিংবা ধারণাশূন্যতার লাক্ষণিক রূপ। এ মদমত্ত অর্থসম্পদশালী ঘরের অযোগ্য নির্বুদ্ধি সন্তান অবশ্যই পরিণামে সর্বস্ব হারিয়ে দুর্দশার শিকার হয়। হয় সমাজে উপহাস্য ও অবজ্ঞেয়। অন্তরে মানবিক গুণের অভাব থাকলেই 'মদ' ব্যক্তির সম্বল হয়।

আর মাৎসর্য মানে ঈর্ষা-হিংসা। পরশ্রীকাতর ব্যক্তি মাত্রই হয় মৎসর, অকারণে অপরের উন্নতিতে, ঐশ্বর্য বৃদ্ধিতে হিংসার-ঈর্ষায় জ্বলে, পুড়ে। এ হচ্ছে অক্ষমেরই অধিবহ্নি এবং ঔষধ নেই, চিকিৎসা নেই। আবার অন্য রকমের বহ্নি আছে, যে-বহ্নিতে আত্মবিসর্জন নন্দিত হয়। যেমন জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে, পরিবারের নিরাপত্তা বিধানের জন্যে, অন্যায় অবিচার শোষণ পীড়ন বঞ্চনা প্রতারণা থেকে গণমানবকে মুক্ত করার জন্যে সর্বত্যাগী হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রাণকে পণ করে, ভোগ উপভোগ সম্ভোগতৃষ্ণা বর্জন করে, আনন্দ-আরাম-আয়েশ বাঞ্ছা পরিহার করে দেশের, মানুষের রোগীর সেবার জন্যে, রোগের প্রতিষেধক সন্ধানে, মানুষকে সুবুদ্ধি দানে, মনুষ্যত্বে প্রবুদ্ধ ও ঋদ্ধ করার জন্যে মানুষ একপ্রকারের উৎসাহ-উৎসর্গরূপ বহ্নিতে আত্মসমর্পণ করে। আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা পার্থিব জীবনে ভোগবিমুখ কর্মকুণ্ঠ অলস বৈরাগ্যবাদী বিয়ে না-করা ভেকধারী, পরান্নজীবী অনন্তকালের পারত্রিক মোক্ষ, নির্বাণসুখকামী সাধু সন্ত সন্ন্যাসী শ্রমণ শ্রাবক ব্রহ্মচারী বৈরাগী ফকির দরবেশ পাদরী প্রভৃতি যাযাবর জীবনে অরণ্য পর্বত পর্যটক কিংবা গির্জা-মন্দির-বিহার-আখড়া-খানকা আশ্রিত বা বাসী এবং তারা রিপুর প্রভাব বিমুক্তির সাধক অধ্যাত্মসিদ্ধির প্রত্যাশী।

অতএব ষড়রিপু মানুষকে, ব্যক্তিকে এক মানসবহ্নিতে হৃৎ-অগ্নিতে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে। ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই এতে। তাই এ ছয়টি প্রবৃত্তিক দোষকে প্রবৃত্তিপ্রসূনকে সহজাতবৃত্তিকে মানুষের চরম শত্রু বা রিপুরূপে চিহ্নিত করা হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতায় সুপ্রাচীন কাল থেকেই। এবং এ বিষয়ে কারো কখনো কোথাও দ্বিমত ছিল না, আর আজো নেই। ষড়রিপুর প্রভাব মানুষের চিত্তের, মানবিকগুণের ও মানবতার বিকাশ ও উৎকর্ষ ব্যাহত করে। তাই এগুলো রিপু-বন্ধু নয়, দুখের কারণ, সুখের উৎস নয়। রিপুর প্রভাব এড়িয়ে চলা, রিপু জয় করাই, সংযম সাধনা করাই হচ্ছে মনুষ্য সাধনা-মনুষ্যত্বের সাধনা।

আমাদের আজকের রাজনীতিক দলগুলোর অধিকাংশ রাজনীতিকই এ রিপুর কবলিত। তাঁরা এখন দলাদলি, রেষারেষি, জেদাজেদি, ক্ষোভ, প্রতিহিংসাপরায়ণতার শিকার। তাঁরা প্রেয়স বোঝেন, শ্রেয়স জানেন না, বোঝেন না অথবা মানেন না। তার কারণ বোধহয় তাঁদের অনেকের অন্তরে রাজনীতি প্রীতি নেই, রাজনীতিক শিক্ষাদীক্ষা প্রশিক্ষণ নেই আকৈশোরের, আযৌবনের, তাঁদের অধিকাংশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঢেল অর্থের মালিক হয়ে অবসেনানী রূপে, সফল ব্যবসায়ী বা সওদাগর রূপে কিংবা ঠিকাদার বা শিল্পপতি রূপে, [এদের মধ্যে অনেকের অর্থ আবার অসদুপায়ে অর্জিত] মান যশ, খ্যাতি-ক্ষমতা, দর্পদাপট, বিত্তবেসাত ও প্রভাবপ্রতিপত্তি অর্জনের জন্যেই মৌসুমী রাজনীতিক। গণমানবের, আমজনতার কল্যাণ চিন্তার, মানবহিতৈষণার, সমাজসেবার কিংবা রাষ্ট্রচিন্তার কোনোই অঙ্গীকার নেই অন্তরে। সে-সামর্থ্যও হয়তো তাঁদের মধ্যে এখনো সুপ্ত বা অনুন্মেষিত। ফলে তাঁদের মধ্যে যেমন রাজনীতিকসুলভ শিক্ষাদীক্ষা, প্রশিক্ষণ, সেবাপ্রবণতা, হিতৈষণাবুদ্ধি, কল্যাণ-অকল্যাণ চেতনা এবং অভিজ্ঞতা ও রাজনীতিক সংস্কৃতি দুর্লভ, রাজনীতিকসুলভ ভাব চিন্তা কর্ম আচরণ অলভ্য বা বিরল, তেমনি আমাদের অজ্ঞ-অনক্ষর-নিঃস্ব-নিরন্ন-দুস্থ-দরিদ্র শহুরে কিংবা গ্রামীণ মানুষের রাজনীতি-কূটনীতিচেতনা না থাকায় শহুরে কোনো প্রধান-প্রবল রাজনীতিক দল থেকে মৌসুমে অর্থাৎ নির্বাচনকালে অবসেনানী, আমলা, সওদাগর, ঠিকাদার এক থোক টাকা দিয়ে সংসদে প্রার্থিতার মনোনয়ন নিয়ে গাঁয়ে নির্বাচনী এলাকায় বহু থলে ভরা টাকা ছিটিয়ে ছড়িয়ে ভোট ক্রয় করেন। সফল হলে সাংসদ হয়ে অর্থবিত্তবেসাত মান যশ খ্যাতি ক্ষমতা দর্পদাপট প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করে সমাজে একজন স্বনামধন্য শ্রুতনাম ব্যক্তি হয়ে আনন্দে আরামে গৌরবে গর্বে বিলাসে বিনোদনে দিন কাটান এবং মৃত্যু হলে পত্রপত্রিকায় সচিত্র পরিচিতি মুদ্রণের মতো গুরুত্ব পান, এবং পরিবার প্রজন্মক্রমে এ নামের গৌরবে গৌরবান্বিত ও সম্মানিত থাকেন। এমনি গুণের ও মানের রাজনীতিক ও সাংসদরা আমাদের জান-মাল-গর্দানের মালিক। আমরা দেশ বা রাষ্ট্রবাসী যেন তাঁদের গৃহপোষ্য ভেড়া, আমাদের লাভ-ক্ষতির, চাওয়া-পাওয়ার উপকার-অপকারের কথা ভাবার গরজ বোধ করেন না তাঁরা। কেননা তাঁদের মনে-প্রাণে-হৃদয়ে আমাদের প্রতি কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্য চেতনা নেই। এ জন্যেই তাঁদের গদিদখলের-ক্ষমতার রাজনীতির মধ্যে গণমানব বা আমজনতা নেই, কেবল তাঁদের রাজনীতিক দলীয় স্বার্থ, লাভ-ক্ষতি, মান-অপমান, জয়-পরাজয়, হার-জিত চেতনাই তাঁদের মুখ্য বিবেচ্য হয়ে তাঁদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করছে।

এখন এ মুহূর্তে বিরোধীদল ও সরকারিদল তীব্র তীক্ষ্ণ বৈরীচেতনা নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে মারমুখো হয়ে, ফলে সংঘর্ষ-সংঘাত তথা মারামারি হানাহানি অনিবার্য হয়ে উঠেছে। অবশ্য মরবে ভাড়াটে লোক কিংবা অঙ্গদলের ছাত্রযুবারা, তাঁদের অধিকাংশ আবার নিম্নবিত্তের কিংবা নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। রাজনীতিকদের বা তাদের আত্মীয়-স্বজনের গায়ে আঁচড়টাও লাগবে না। অর্থসম্পদের ক্ষয়ক্ষতিও সাধারণত তাঁদের হয় না। হায়রে ক্ষমতার লড়াই, হায়রে গদিসর্বস্ব রাজনীতি তৃতীয় বিশ্বের। এখন আমরা বিপন্ন জানে, মালে ও জীবিকা ক্ষেত্রে উপার্জনে। আমাদের ঘরে-বাইরে কোথাও নিরাপত্তা ও নিরুপদ্রবতা নেই। আমরা হুমকি পাচ্ছি ভোটার রূপে, আমরা শাঁখের করাতের কবলিত। আমাদের রাজনীতিক দলগুলো স্বয়ং বিপন্ন, কিন্তু টের পাচ্ছে না। দলগুলো স্বখাত সলিলে ডুবছে। বলতে ইচ্ছে হয় কবির ভাষার আদলে: 'মজালে এ কনক বাঙলা (মজিলা আপনি)'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁচার গরজেই মুক্ত চিন্তা-চেতনা আবশ্যিক

পূর্বলব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা মুক্ত হয়ে, স্বাধীন ও মুক্ত চেতনা-চিন্তার অনুশীলনে আগ্রহী হয়ে জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগে যুক্তিবাদী হয়ে যৌক্তিক-বৌদ্ধিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত ব্যক্তিরাই কেবল মানবিক গুণে ঋদ্ধ হয়ে মানববাদে, মানবতায় ও মনুষ্যত্বে অন্যদের প্রভাবিত করতে পারে। এ জন্যে মুক্তমনের, মুক্তবুদ্ধির তথা স্বাধীন চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন মানুষের আধিক্য প্রয়োজন সমাজে। ফ্রি থিঙ্কার বা মুক্তচিন্তক লোকের সংখ্যা সমাজে বৃদ্ধি না পেলে একালে কোনো সমাজই সমকালীন যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে উন্নত রাষ্ট্রের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবে না স্বচ্ছন্দে ও সাচ্ছল্যে। উল্লেখ্য যে, একালের পৃথিবীর উন্নত-অনুন্নত রাষ্ট্র নির্বিশেষে সবগুলোই বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বাত্মক ও সর্বাত্মকভাবে প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে সম্পৃক্ত। এ যুগে কেউ, কোনো সমাজ বা রাষ্ট্র বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে টিকে থাকতে পারে না, পারবে না। যানবাহনের, তার-বেতারের উৎকর্ষের ফলে পৃথিবী এখন একটা ক্ষুদ্র জনপদ মাত্র। তাই জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-অর্থসম্পদ-নিবাস-যোগ্যতা নির্বিশেষে ব্যক্তিমানুষ এবং রাষ্ট্র অন্য মানুষের ও রাষ্ট্রের ওপর নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যবিনিময় ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে নির্ভরশীল। এ অবস্থায় স্থানিক-রাষ্ট্রিক জীবন ও বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক জীবন যুগপৎ ও একাধারে প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য।

আমরা যদি এ বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক জীবনসম্পৃক্ততার গুরুত্ব স্বীকার করি, তাহলে আমাদের মানতেই হবে যে, আমাদের শাস্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, আমাদের শিক্ষানীতি, আমাদের অতীত ও ঐতিহ্যপ্রীতি, আমাদের গ্রহণবিমুখতা, আমাদের আশৈশবপ্রাপ্ত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা অনুগ রক্ষণশীল জীবনযাপনে অভ্যস্ততা অবশ্যই পরিহার ও সচেতন অনুশীলনে বর্জন করতে হবে আত্মোন্নয়ন লক্ষ্যে। আমাদের সমাজে মুক্তচিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে হবে অন্তত সহিষ্ণুতার আবরণে। যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবনই হবে আমাদের উচ্চশিক্ষিত সমাজের বাঞ্ছিত। মুক্ত মন-মগজ-মনন-মনীষাযোগে ও প্রয়োগে যৌক্তিক- বৌদ্ধিক জীবনযাপনে আগ্রহী মানুষই হবে বাস্তবে মানববাদী ও মানবতার ধারক আর মনুষ্যত্বের আধার, কেননা নির্ভেজাল মানবিক গুণের উন্মেষ-বিকাশ-উৎকর্ষই তো মনুষ্যত্ব। আমাদের সরকারি প্রয়াস হচ্ছে রাষ্ট্রের সংখ্যাগুরু নাগরিকদের শাস্ত্রনিষ্ঠ মুসলিম রাখা, দেশবাসীকে কেবল বাঙালি রাখা, আর বেকার দেশবাসীকে বিদেশে মজুরি করতে পাঠানো। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাদানের জন্যে মক্তব-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ, বাঙলা মাধ্যমের প্রাথমিক-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা শেখানোর ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যামাত্রই যেখানে য়ুরোপ থেকে বইয়ের মাধ্যমে আমদানি করা, সেখানে মাতৃভাষা বাঙলায় লেখাপড়া করায় উৎসাহ দান শিক্ষার্থীদের পরোক্ষে অশিক্ষিত রাখার অপকৌশল মাত্র। কেননা বিদ্যার উৎস হচ্ছে য়ুরোপীয় ভাষাভুক্ত বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস-সাহিত্য-শিল্প-আয়ুর্বিজ্ঞান-প্রকৌশল-প্রযুক্তি প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্ঞান। একালে সর্বপ্রকার যন্ত্রের, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবন, সর্বপ্রকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য-দর্শন-শিল্পকলা, অর্থবিজ্ঞান, বাণিজ্যবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান-যন্ত্রবিজ্ঞান এবং বিভিন্ন শাখার রসায়ন, গণিত, পদার্থ, ভূমি, প্রাণী, মৃত্তিকা, ভূ-জীবাণু ও শারীরবিজ্ঞান মাত্রই য়ুরোপ-আমেরিকার দান। কাজেই য়ুরোপীয় কোনো ভাষায় (আমাদের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে) ব্যুৎপত্তি ব্যতীত কারো পক্ষেই কোনো বিষয়ে প্রত্যাশিত গুণের, মানের ও মাত্রার জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। উল্লেখ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যাবিতরণের ক্ষেত্র নয়, বিদ্যাবিস্তারের, সৃষ্টির ও বিদ্যার উৎকর্ষ সাধনের আলয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় হচ্ছে কেবল অবোধদের শেখানোর জন্যেই, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লক্ষ্য জানানো আর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে বোঝানোর ও বিদ্যাসৃষ্টির আর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে-তাৎপর্যে-টীকা ভাষ্যে মগজের মননের মনীষার উৎকর্ষ সাধনের আগার। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, সংস্কৃতিচর্চা, বিদ্যানুশীল ও বাণিজ্যব্যবস্থা প্রতীচ্য আদলে বিন্যস্ত করা আবশ্যিক ও জরুরি।

মর্ত্যজীবনের চাহিদা পূরণই সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

AMARBOI.COM

একালে গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে নাগরিকের মর্ত্যজীবনের ও জীবিকার পরিচর্যা করা। পার্থিব জীবনের সর্বপ্রকার নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদার যোগান দেয়া, ব্যবস্থা করা, জনগণের অশন-বসন-আবাস-স্বাস্থ্য-শিক্ষার ও জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করা আমজনতার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক জীবন উন্নয়নের লক্ষ্যে। তা ছাড়া একালে সরকারের জরুরি দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে খনিজ, কৃষিজ এবং প্রাকৃতিক অন্যান্য সম্পদকে দেশী বিদেশী বাজারের উপযোগী করে উৎপাদিত, নির্মিত, সৃষ্ট পণ্যে পরিণত করে জনগণের জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করা, আর্থিক উন্নয়নে সাচ্ছল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য দান, সরকারের প্রাত্যহিক এবং সার্বমুহূর্তিক কাজ হচ্ছে দেশের সর্বত্র আইনের শাসন চালু রাখা অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলা বজায় রেখে সযত্ন সতর্ক প্রয়াসে জনজীবনে নিরাপত্তা ও নিরুপদ্রবতা নিশ্চিত করা। দফতরে দফতরে ঘুষের জন্যে জনগণকে যে তাদের ন্যায্য কাজ উদ্ধারেও দিনের পর দিন, মাসের পর মাস হয়রানির শিকার করা হয়, সে-দুর্নীতিবাজ কর্মচারীদের পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে শায়েস্তা রাখা, আমজনতার দুর্ভোগ মোচন করা। হাসপাতালে একালের চিকিৎসার জন্যে আবশ্যিক ও জরুরি সব যন্ত্রের এবং সর্ব প্রকার রোগের চিকিৎসার জন্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা রাখা, আর মেডিক্যাল কলেজে যোগ্য অধ্যাপক নিয়োগ করা। শুনতে পাই মফস্বলের অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল কলেজে সব রকমের আবশ্যিক যন্ত্রের এবং বিশেষজ্ঞ যোগ্য শিক্ষকের অভাব রয়েছে, যেমন প্রয়োজনীয় সংখ্যার অধ্যাপক নেই সাধারণ শিক্ষার কলেজগুলোতে। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্যে লাখ লাখ শিক্ষক নিয়োগ দরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকার 'প্রাথমিক শিক্ষা' বাধ্যতামূলক করেছে বলে প্রচার-প্রচারণা চালালেও আজো প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। অথচ আন্দোলনের ও দাবির মুখে শতে শতে পদোন্নতির ব্যবস্থা হচ্ছে উঁচু পদের ও পদবীর প্রশাসকদের। জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতেও নেই ডাক্তার বা ওষুধ। সর্বত্র একটা ফাঁকির ফাঁক থেকেই যাচ্ছে সরকারি ঘোষণায়, প্রচারণায় ও বাস্তব ব্যবস্থায়। এখন যেমন নির্বাচনপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্যে সর্বত্র নানা কাজের ও নতুন নতুন সেতুর, রাস্তার ও প্রতিষ্ঠানের শিলান্যাস চলছে, ওয়াদা ও আশ্বাস উচ্চারিত হচ্ছে জনগণের নানা অভাব মোচনের ও দাবি পূরণের। রাজনীতিকদের এবং সরকারের এসব মনভোলানো চোখ জুড়ানো কিংবা চোখ-কান ধাঁধানো নানা কথার অবতারণা করতেই হয়, পৃথিবীর সর্বত্র সব রাজনীতিক দল ও সরকার তা করে থাকে। তবু দায়িত্ব ও কর্তব্য এড়িয়ে বেশিদিন টেকা চলে না।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে, আমাদের নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র অজ্ঞ অনক্ষর জনগণের অজ্ঞতার, সারল্যের, অসহায়তার, অসজ্ঞবদ্ধতার সুযোগ নিয়ে সরকার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের তথা অধিকাংশ ভোটারের মন জয় করার জন্যে তাদের ঐহিক জীবনের নিত্যদিনের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট না হয়ে অথবা আর্থিক অসামর্থ্যের দরুন অক্ষম হয়ে তাদের পারত্রিক জীবনে সুখ-শান্তি-আনন্দ পাওয়ার পথ বাতলাতে, উপায় সন্ধানে সাহায্য করতে তৎপর সোৎসাহে। প্রমাণ সরকারি কাজেকর্মে সাংসদ-মন্ত্রী-আমলার ভাষণে এবং রেডিও-টিভি প্রভৃতিতে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের পারলৌকিক কল্যাণ চিন্তা-চেতনার ঘন ঘন ঘোষণায় প্রকট হয়ে উঠেছে। মর্ত্যজীবনের চাহিদাপূরণই সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। অথচ আমাদের ভিখিরীদের ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণের কোনো ব্যবস্থা নেই, যদিও ভিখিরীরা, ঝুপড়ি-খুপরিবাসীরা, টোকাই নামের ছিন্নমূল এতিমরা নিঃস্ব নিরন্ন অনক্ষর বেকারেরা, দুস্থ দরিদ্ররা সবাই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ভুক্ত। সংখ্যালঘুদের এমন নিঃসহায় নিরন্ন দেখা যায় না রাস্তাঘাটে। সংখ্যাগুরুর দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-কষ্ট-নিরন্নতা-দরিদ্রতা ঘোচানোর জন্যে হিতৈষণার আন্তরিক প্রয়াস প্রযত্ন না করে তাদের পারত্রিক কল্যাণ লক্ষ্যে বিনাব্যয়ে বা স্বল্পব্যয়ে নানা কাজ করে তাদের দরদী সেজে তাদের ভুলিয়ে রাখা কি রাজনীতিক চাল বা প্রবঞ্চনা নয়? এভাবে গোঁজামিলে কি ফাঁকির ফাঁক ঢাকা যায়? আমরা রাজনীতকদের মধ্যে মানবিকগুণের আধিক্য চাই রাজনীতিকদের জনসেবক রূপে দেখতে চাই, স্বার্থে নয়, পরার্থে কাজ করার আগ্রহ দেখতে চাই। নইলে মানুষের, নাগরিকের, সরকারের ও রাষ্ট্রের কোনো কল্যাণে আসবে না রাজনীতিকদের ক্ষমতা কাড়ার ও রাখার লড়াইসর্বস্ব রাজনীতি। ঘুচবে না মানুষের, নাগরিকের ও রাষ্ট্রের দুর্দশা দুর্দিন। দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রের স্বার্থে অন্তত সদ্বুদ্ধি জাগুক এ-ই আমাদের কাম্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভাব আমাদের চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের

অর্ধশতক আগে আমাদের অধিকাংশ শহুরে শিক্ষিত লোক নিরক্ষর স্বল্পসাক্ষর কিংবা মুন্‌শি-মোল্লা-ভূঁইয়া-কাজী-খোন্দকার-চৌধুরী প্রভৃতি সচ্ছল পরিবারের ও নলখাগড়ার, বাঁশের বেড়ার, মাটির ও টিনের ঘরের সন্তান ছিলাম বটে, কিন্তু এ আটচল্লিশ বছরে আমরাও শিক্ষায়-সম্পদে-সম্মানে ও পদে-পদবীতে দুই প্রজন্ম অতিক্রম করে তৃতীয় প্রজন্মে পড়েছি। এখন আমরা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক। এখন অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের এবং জলজ, কৃষিজ, খনিজ, বনজ, শিল্পজ সর্বপ্রকার উৎপাদিত কাঁচাপাকা ও নির্মিত পণ্যের মালিক। আমাদের গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে লেখা-পড়া দ্রুত প্রসারমান। এখন আমাদের শিক্ষিতের ও সাক্ষরের সংখ্যা কোটি কোটি। বাস্তবে সাক্ষর-শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা শতে ৭০/৮০ জনে পৌঁছে গেছে। আমাদের সমাজে এখন ধনী-মানীর সংখ্যাও কয়েক লাখ। অন্তত এখন আমাদের মধ্যে যতো 'স্নাতক' শিক্ষিত রয়েছে ১৯৪৭ সনে গোটা ব্রিটিশ ভারতে তার পাঁচ ভাগের একভাগও ছিল না। আমাদের জনসংখ্যা তিন/চার গুণ বেড়ে গেছে যেমন, তেমনি আমাদের জীবিকা সংগ্রহের ক্ষেত্রও হয়েছে গোটা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত লঘু-গুরুভাবে। যন্ত্রের, প্রযুক্তির, প্রকৌশলের, যানবাহনের উৎকর্ষে ও ব্যাপ্তিতে আর আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর বৈচিত্র্যে এবং ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ চাহিদার প্রসারে আমাদের জীবনযাপনও চাহিদাবহুল এবং কিছুটা জটাজটিল আর সমস্যাবহুল হয়ে উঠেছে। তবু সামগ্রিক, সামূহিক ও সামাজিকভাবে আমাদের জীবন-যাত্রার মান বিজ্ঞানের বদৌলত প্রযুক্তির প্রসাদে অভাবিতভাবে উন্নত হয়েছে। এখন দূর হয়েছে নিকট বন্ধু, পর হয়েছে ভাই। এখন দেশে দেশে আমরা ঘরও খুঁজে নিচ্ছি ও পাচ্ছি। তা হলে আপাতদৃষ্টিতে আমাদের উন্নতিই হয়েছে সর্বক্ষেত্রে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠেছে প্রতীচ্য-ধনীদের মতো অশেষ। সবটাই আমাদের অঙ্গ ও অন্তর চেতনার, বিত্তবানতার ও চিত্তবানতার সাক্ষ্য ও প্রমাণ। আমরা এখন ফুলের সমাদর করতে জানি, আমরা এখন ললিতকলার, চৌষট্টিকলার সবশাখারই অনুশীলনে অধিকসংখ্যায় আগ্রহী এবং সবাই সমঝদার। এককথায় আমরা য়ুরোপীয় আদলে জীবনবোধ জাগ্রত করার ও জীবনযাপন পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়াসী। অতএব আধুনিক জীবনের সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে আমরা সমকালীন জীবনচেতনায় ঋদ্ধ, আমরা সংস্কৃতিমান সভ্য ভব্য জাতি ও সমাজসম্মত মানবিক গুণের, মানবতার ও মনুষ্যত্বের প্রত্যাশিত স্তরে উন্নীত। তা হলে আমাদের অভাব কি? উচ্চাশী হলে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-শক্তি-সাহস প্রয়োগে আমরাও সে কালের ইংরেজের মতো কিংবা এ কালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো পৃথিবীর অধীশ্বর হতে পারি। আমাদের পক্ষে ধনে-মানে-শক্তিতে জাপান-জার্মানীর মতো হওয়া সম্ভব। কেন না, আমাদেরও বিজ্ঞানের সর্বশাখায় অধীত বিদ্যা আছে, কেউ কেউ অনুশীলনে গবেষণায়ও আগ্রহ-আয়াস-প্রয়াসের পরিচয় দেন। যন্ত্র নির্মাণে, প্রযুক্তির-প্রকৌশলের প্রয়োগেও তাঁরা নিপুণ বা দক্ষ। এ কালের আয়ুর্বিজ্ঞানও তাঁদের আয়ত্তে, কম্প্যুটারও এখন প্রায় সর্বক্ষেত্রে তাঁদের নিত্যসঙ্গী ও হাতিয়ার। আমাদের বাঙালীরা য়ুরোপ-আমেরিকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কৃতী ও কীর্তিমান হচ্ছেন। তা হলে আমাদের অভাব কোথায়, কিসের ও কি? আমাদের অতীত ও ঐতিহ্যপ্রীতি আমাদের একশ্রেণীর (এবং তারা সংখ্যায় বিপুল) নাগরিকদের মনে-মননে গতানুগতিক নীতিনিয়মে, রীতিরেওয়াজে, প্রথায়পদ্ধতিতে স্বস্তি, শান্তি ও কল্যাণ সন্ধানের প্রবণতা জাগিয়েছে। তারা নতুন কিছু গ্রহণে বিমুখ এবং সে-কারণে তারা রক্ষণশীল, গোঁড়া অসহিষ্ণু, উগ্র, রোবটের মতো যান্ত্রিক ও গতানুগতিক জীবনে তৃপ্ত তুষ্ট হৃষ্ট ও অভ্যস্ত, ফলে তারা প্রতিক্রিয়াশীল। শিক্ষিতদের এ শ্রেণীকেই আমরা অর্থোডক্স ও ফান্ডামেন্টালিস্ট বলে অভিহিত করি। এরা এখন গোটা পৃথিবীরই এবং সব জাতিরই প্রগতির, কল্যাণের ও শ্রেয়সের বাধা, শত্রু ও সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা উগ্র অসহিষ্ণু সন্ত্রাসী, তাই সহাবস্থানে অসমর্থ বা অসম্মত নতুনে ভীত, পুরাতনে ও শাস্ত্রনিষ্ঠায় প্রীত। বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-হিন্দু-মুসলিম প্রভৃতি সব শাস্ত্রিক সমাজে-সম্প্রদায়ে-উপসম্প্রদায়ে এরা লঘু-গুরুভাবে এক নতুন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরূপে উদ্ভূত হয়েছে এবং হচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান যতোই আমাদের নতুন নতুন তত্ত্বের, তথ্যের ও সত্যের সন্ধান দিচ্ছে, প্রতিক্রিয়াশীলতাও যেন বিজ্ঞানের আবিষ্কার-উদ্ভাবনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সম কিন্তু উগ্র-অসহিষ্ণু মাত্রায় বেড়েই চলেছে আশঙ্কাজনকভাবে। অর্থোডক্সরা ও মৌলবাদীরা তাই নতুন চিন্তা- চেতনা-বঞ্চিত বন্ধ্য মগজের ও মননের মানুষ। তবু অর্থোডকসদের রোবটের মতো হলেও একটা শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধ প্রীতিজাত আদর্শবোধ ও নীতিনিষ্ঠা আছে। ফান্ডামেন্টালিস্ট নামের রাজনীতিসচেতন শাস্ত্রপন্থীদের এ ক্ষেত্রে নিষ্ঠার ও সততার অভাব থাকে, কূটবুদ্ধি তাদের সম্পদ ও সম্বল। এ দল বৃদ্ধি পাচ্ছে নারী-পুরুষের মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসারে। আর এক দল শিক্ষিত প্রতিক্রিয়াশীল আছে, যারা সামন্ত মনের ও বুর্জোয়া নীতির ধারক, বাহক ও প্রচারক, ফলে তারা মানব সাম্যে ও সমানাধিকারে আস্থা রাখে না, ভরসা রাখে পুঁজিবাদে। এ জন্যেই আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর উন্নতি নানা ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে হলেও আমাদের দেশে নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ, দরিদ্র, অজ্ঞ, অনক্ষর লোক আজো অনাহারে অর্ধাহারে অকালে অপমৃত্যু বরণ করে। চৌর্য ও ভিক্ষাবৃত্তি তো রয়েছেই এবং বেকারত্বের দরুন ছিনতাই-ডাকাতি বেড়েই চলেছে। ফলে সমাজে সম্পদ অর্জনে ও বন্টনে সবলে-দুর্বলে জটাজটিল বৈষম্য আর সমস্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজবাদের প্রভাব এরাই সচেতনভাবে প্রতিরোধ করে নানা কূটকৌশলে, ধূর্ততায়, সরকারি মদদে এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে।

সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে আছে শিক্ষিতশ্রেণীর লাভ-লোভ-স্বার্থ চেতনাজাত সুবিধাবাদের সুযোগসন্ধানের ও নগদপ্রাপ্তিজীবীদের প্রসার। এ সুবিধাবাদী, সুযোগসন্ধানী ও নগদজীবীরা কোনো নৈতিক, আদর্শিক, মানবিক বাধা-বন্ধন মানে না। এরা বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক জীবনের অনুরাগী, অনুগত ও অনুগামী নয়। ডারউইন-মার্কস-ফ্রয়েড উনিশ-বিশ শতকে যে মনুষ্যকল্পনায়-বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায়-শাস্ত্রে-সমাজে-ব্যক্তিক জীবনে যেভাবে বৈনাশিক বিপর্যয় ঘটিয়ে মানুষের চেতনায়-চিন্তায়-কর্মে-আচরণে বৈপ্লবিক বিবর্তন ও যুগান্তর ঘটালেন, তার প্রভাব এসব লেখাপড়া জানা কিন্তু অশিক্ষিতজনদের মানবিক গুণের, চেতনার, মানবতা- বোধের বিকাশের ও উৎকর্ষের এমনকি উন্মেষেরও সহায়ক হয়নি। তাই আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, প্রাশাসনিক, সাংস্কৃতিকজীবনে সংকট-সমস্যা সামগ্রিক, সামূহিক ও সামাজিকভাবে বেড়েই চলেছে। আমরা আস্তিক তবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাপভীতিহীন এবং অপকর্মপ্রবণ। তাই আমাদের মধ্যে নীতি-আদর্শ চেতনা যেমন নেই, তেমনি নেই আত্মমর্যাদা বোধ, ফলে আমরা ঘৃণা-লজ্জা-ভয়মুক্ত। আমরা অধিকাংশ শিক্ষিতজন লাভে-লোভে-স্বার্থে বেহায়া, বেশরম, বেলেহাজ, বেদানাই, বেদরদ, বেচশম, বেবুঝ, বেল্লিক। তাই আজ আমাদের সব দুঃখের, কষ্টের, যন্ত্রণার, দুর্নীতির, দুষ্কৃতীর, দুর্ভোগের, দুরবস্থার মূলে রয়েছে আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানবিক গুণ-গৌরবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ববান শক্তিতে-সাহসে-চরিত্রে অনন্য মানুষের বিরলতা, দুর্লভতা কিংবা অলভ্যতা। আমাদের মধ্যে সৎ মানুষ আছে। তাদের সততার মূলে রয়েছে ভীরুতা, শাস্তিভীরুতা ও পাপভীরুতা। আমাদের অভাব নিন্দাভীরু নেতার। আমরা চাই উন্নতশির আত্মসম্মানচেতনায় ঋদ্ধ নৈতিক-আদর্শিক মূল্যে দৃঢ়প্রত্যয়ী জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক আর শক্তি-সাহস-চরিত্র সম্পদে অসামান্য জনহিতৈষী নেতা।

শিক্ষা সমস্যা

AMARBOI.COM

বাঙলাদেশ যখন হল, তখন আমাদের স্বল্পবুদ্ধি, অদূরদর্শী আবেগচালিত রাজনীতিক, বিভিন্ন স্তরের ও পেশার বুদ্ধিজীবীরা অজ্ঞ আমজনতাকে জানিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, আমরা বাঙালী হয়েছি, ইংরেজের ও পাকিস্তানের দাসত্বমুক্ত হয়েছি, কাজেই এখন ইংরেজি-উর্দু আমাদের জন্যে ফজুল ভাষা, আমরা এখন রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করব কেবল মাতৃভাষা বাঙলাভাষাকেই। এর মধ্যে কেবল অদূরদর্শিতা ছিল না, ছিল কাপট্যও। কারণ তারা সবাই সন্তানদের নিজেরা কিংবা গৃহশিক্ষক মাধ্যমে ইংরেজী মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা দিয়ে 'এ' লেবেল 'ও' লেবেল পরীক্ষা পাস করিয়ে পুরো ইংরেজের বাচ্চাতুল্য করে ইংরেজী শেখালেন। এ দ্বিমুখী নীতির ও প্রচারণার ফল হল এই–

১. একদিকে গোটা দেশের গাঁ-গঞ্জের এবং শহর-বন্দরের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজীর গুরুত্বচেতনা বিলুপ্ত হল, হয়তো তবু বিলুপ্ত হত না; খ. যদি পূর্বের মতো বার্ষিক পরীক্ষায় প্রত্যাশিত মানের নম্বর না পেলে শিক্ষার্থীদের অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করে তাকে একই শ্রেণীতে আটকে রাখা হত। প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ওঠার জন্যে কোনো বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন যখন রইল না, তখন অজ্ঞ-অনক্ষর গৃহস্থ ঘরের সন্তানেরা সত্যই সাক্ষর হল মাত্র, শিক্ষিত হলই না।

২. আবার গোদের ওপর বিস্ফোট এই যে, সরকার এক সময়ে সদুদ্দেশ্যেই স্কুল-কলেজের উন্নয়ন ও গৃহনির্মাণ খাতে অঢেল টাকা দেয়ার ব্যবস্থা করল। শর্ত দিল এই, শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হলেই আরো অর্থসাহায্য দেয়া হবে। এর বৈনাশিক ফল হল এই যে স্কুল-কলেজের শিক্ষকরাই ফল ভালো করানোর জন্যে পরীক্ষার্থীদের নকল করার সুবিধে দিতে লাগলেন। শিগগির তা শিক্ষার্থীদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবারে সংক্রমিত হল- 'চুঙ্গা' ফুঁকে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রশ্নের উত্তর বলে দেয়া, বাইরে থেকে লিখিত খাতা সরবরাহ করা প্রভৃতি রাজধানীর কলেজেও চালু হল প্রায় প্রকাশ্যে সর্বজনবিদিত হয়েই। কিন্তু প্রতিবাদের-প্রতিকারের-প্রতিরোধের ব্যবস্থা হয়নি। এ খেলা চলেছে বহু বছর ধরে।

৩. এর ফলে যারা নকলেও ব্যর্থ হল, তারা সাক্ষর হয়ে শিক্ষাভিমানী বেকার হয়ে মস্তান-গুণ্ডা-খুনীতে পরিণত হয়েছে গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে-পাড়ায়-মহল্লায়। যারা নকলে নকলে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক এমনকি স্নাতক পাস হল তারাও ইংরেজীতে একেবারে কাঁচা থাকায় তাদের চাকরি হল না। এদের অনেকেই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, দোকানের সেলসম্যান কিংবা ঠিকাদারের কাজের খবরদারি, নজরদারি, তদারকি করে ভাত-কাপড় যোগাড়ের চেষ্টায় রত থাকে।

৪. সাতের দশকে পাকিস্তান সরকারই ইসলামী উম্মাহচেতনা দানের জন্যে এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু করল, অজ্ঞ-অনক্ষর গৃহস্থ ঘরের ছেলেমেয়েদের মাদ্রাসায় উচ্চশিক্ষিত করে মুসলিম ঐক্যচেতনায় নিবদ্ধ রেখে পাকিস্তানে অনুরাগ, অনুগামিতা ও আনুগত্য দৃঢ়মূল রাখার প্রয়াসী হল। ইসলাম-পছন্দ বাঙলাদেশ সরকারও সে-নীতি বজায় রাখল। এ কারণে আজ দুতিন লাখ নারীও মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে।

৫. কাজেই বাঙলাদেশে শিক্ষা ত্রিবিধ : ক. ভুঁইফোঁড় উঠতি লুম্পেন বুর্জোয়াদের তথা বিদ্যায়-বিত্তে ঋদ্ধ শহুরে ধনিক-বণিকরা সন্তানদের দেশে-বিদেশে ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষাদান করছে- ওরাই দেশে ফিরে এলে আমলা, সাংসদ, মন্ত্রী, কারখানাদার-দোকানদার হবে, বিজ্ঞানে-বাণিজ্যে দেবে নেতৃত্ব- এক কথায় দেশের অর্থসম্পদের ও রাজনীতির নিয়ন্তা থাকবে ওরাই একটা বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী হিসেবে। খ. আমজনতার সন্তানেরা ভালো-মন্দ-মাঝারি আয়ের করণিক-শিক্ষক-সাংবাদিক প্রভৃতি নানা পেশায় থাকবে নিয়োজিত। কারণ বাঙলাপ্রধান শিক্ষায় আধুনিক বিজ্ঞান-বাণিজ্য-দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান আর সাহিত্য প্রভৃতির আকরগ্রন্থের জ্ঞান থাকে এদের অনায়ত্ত।

৬. মাদ্রাসা শিক্ষায় প্রাধান্য দিয়ে গৃহস্থ ঘরের ছেলেমেয়েদের মুমীন রাখার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে অতীত ও ঐতিহ্যচেতনা জাগিয়ে রাখাই হচ্ছে লক্ষ্য, যাতে তাদের চেতনায়-চিন্তায় যেন আধুনিক, বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক চিন্তাচেতনার ও সংস্কৃতির তথা মন-মগজ-মনন-মনীষার ছোঁয়া না লাগে। ফলে শিক্ষাব্যবস্থা হয়েছে ত্রিমুখী। ক. বিদেশমুখী উদার-অবাধ মনন চর্চামুখী, খ. গতানুগতিক রক্ষণশীল যৌক্তিক বৌদ্ধিক চেতনাবিরহী বন্ধ্য মন-মগজ-মননহীন বাঙলায় সীমিত সংকীর্ণ বিদ্যামুখী, গ. আর অতীত-ঐতিহ্য শাস্ত্রানুগ ইসলামী বিদ্যার সর্বকালীন উপযোগে প্রত্যয়মুখী। পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রে এমন বিশৃঙ্খল শিক্ষানীতি আছে কি-না আমাদের জানা নেই।

৭. একটা কথা ব্রিটিশ আমল থেকেই চালু রয়েছে যাতে একবিন্দুও সত্য নেই। তা হচ্ছে, ব্রিটিশ সরকার আমাদের শিক্ষিত করার স্কুল করেনি, কেরানি করার কল তৈরি করেছিল মাত্র। আসলে অর্থব্যয় হবে বলে লুটেরা কোম্পানি সরকার ও পরবর্তীকালে রাজসরকার আমাদের দেশে শিক্ষার বিস্তারের ব্যবস্থা করেনি বটে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কোনো বিদ্যা থেকেই তারা আমাদের বঞ্চিত করেনি। তখনকার স্কুল-কলেজ থেকে পাস করেই যে কেউ লন্ডনে-অক্সফোর্ডে ভর্তি হতে পারত উচ্চশিক্ষা গ্রহণের বা গবেষণার জন্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে কেউ বার-অ্যাট-ল হতে পারত।

৮. লর্ড ম্যাকলে যে আরবী-ফারসী-সংস্কৃত ভাষায় যে-স্তরের বিদ্যা সঞ্চিত রয়েছে, তাকে তার সমকালের য়ুরোপীয় জ্ঞানের এক তাকের বইয়ের সমান বলে তাচ্ছিল্য করেছিলেন, তাতে আমাদের আত্মসম্মানে ঘা লেগেছিল। তাই আমরা ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু এতে কি তথ্যের ভুল ছিল? আমরা ওই তিন ভাষার সব বিদ্যা পরিহার করে য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস-সমাজবিজ্ঞান-রাষ্ট্রবিজ্ঞান-অর্থবিজ্ঞান-আয়ুর্বিজ্ঞান এবং য়ুরোপীয় মন-মগজ-মনন-মনীষার প্রসাদ গ্রহণ করে ধন্য ও কৃতার্থ হইনি? বস্তুত ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য জন ম্যাকলে বলেছিলেন যে, ব্রিটিশের ভারত সাম্রাজ্য চিরকাল থাকবে না, ব্রিটিশজাতির গুণ-গৌরব-গর্ব চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্যে ব্রিটিশের উচিত ভারতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো ছড়ানো (হাতের কাছে বই নেই, তাই অবিকল কথা বলা গেল না, তবে তাৎপর্যের নির্যাস দেয়া গেল)। অর্থব্যয়ে রাজি ছিল না বলে ব্রিটিশ আমলে বাঞ্ছিত মাত্রায় শিক্ষার প্রসার ঘটেনি, কিন্তু কোনো বিদ্যা থেকেই জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত করা হয়নি।

৯. স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে শিক্ষা কমিশন বসেছে বারবার, সবগুলোই হয়েছে নিষ্ফল। কারণ জ্ঞানবিজ্ঞানে রয়েছে মানব উত্তরাধিকার। বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য যে-কোনো ধর্মাবলম্বী লিখলেই একই রকম থাকবে, যেমন থাকবে গণিত, ভূগোল প্রভৃতি। পরীক্ষাপদ্ধতি ও প্রশিক্ষণপদ্ধতি বদলাতে গিয়ে এখন যে 'প্রশ্নব্যাঙ্ক' করা হয়েছে তাতে অশিক্ষার অন্ধকার আরো বেড়েছে। ফলে 'সোনা ফেলে আঁচলে গিরা' দেয়াই হয়েছে- ভালো পাস করে সবাই কিছু জ্ঞান অর্জন না করেই।

১০. বিদ্যালয়ে-কলেজে ভালো শিক্ষকের অভাব, এখন শিক্ষকও বিশ্ববিদ্যালয় অবধি শেখান কেবল পরীক্ষায় সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর এবং শিক্ষার্থীরাও শেখে কেবল প্রশ্নোত্তরই, কেউ পুরো বই পড়েন না। বাজারেও তাই প্রশ্নোত্তরের বই চালু রয়েছে শতে শতে। এমনকি বাঙলাবাজার ও জনকণ্ঠ নামের দৈনিক পত্রিকা কাগজের কাটতি লক্ষ্যে প্রশ্নোত্তর ছাপে, ভর্তি পরীক্ষার জন্যেও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে রাস্তার মোড়ে মোড়ে। তাছাড়া রাজনীতিকরা ছাত্রদের দলের লেঠেল হিসেবে ব্যবহার করে। তাদের কোনো শাস্তিই দেয়া চলে না। ফলে যারা পরীক্ষায় পাস করতে চায় বা যাদের অভিভাবক গরীব অথচ সন্তানের বিদ্যার্জন আবশ্যিক মনে করেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা ধনী তাঁরা সারা বছর গৃহশিক্ষক রাখেন কয়েকজন। যাঁরা দরিদ্র তাঁরা সন্তান পাঠান টিউটোরিয়াল বিদ্যালয়ে কম খরচে, তাই অসংখ্য টিউটোরিয়াল কেন্দ্র বা স্কুল-কলেজ এমনকি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ও ব্যাঙের ছাতার মতো সর্বত্র গড়ে উঠেছে, উঠছে। এ বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্টিরই ফল। কোনো কোনো স্কুলে নাকি 'ত্রিশ মিনিটে' এক একটা পিরিয়ড হয় অনেক শিফটে পড়ানো হয় বলে।

১১. 'প্রশ্নব্যাঙ্ক' পদ্ধতির পরীক্ষা একটা গোঁজামিলের ব্যবস্থাসঞ্জাত। তাই সবাই পাস করেছে, করছে। কলেজে ভর্তির ঠাঁই মিলছে না, ফলে নতুন নতুন ব্যবসায়িক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠান হিসেবে অবাঞ্ছিত কলেজ গজাচ্ছে। প্রতিবাদের প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থা করে না সরকার। সম্প্রতি প্রশ্নব্যাঙ্ক বাতিল করা হয়েছে।

১২. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষার ফল ধরে কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা হলে বোর্ডের প্রতি ও বোর্ডের পরিচালিত পরীক্ষার প্রতি আস্থার সাক্ষ্য মেলে। আবার ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা বোর্ডের প্রতি ও বোর্ডের পরিচালিত পরীক্ষার ফলে অনাস্থারই নামান্তর মাত্র। নকল হয় সবাই জানে। তাছাড়া ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে কলেজে সবাইকে ঠাঁই দেয়া সম্ভব নয় বলে- একে 'থিওরি অব এলিমিনেশন' প্রয়োগ বলা চলে। আগে যখন পঞ্চাশের/ষাটের দিকে শিক্ষার্থী মিলত না, তখন আধাফেল-আধাপাস রেফার্ড শিক্ষার্থীদেরও পুরো পাস সাপেক্ষে ভর্তি করা হত, এখন ভর্তি ফি ও ফরম বিক্রির কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বিরাট অঙ্কের আয়ের উৎস। ভর্তি পরীক্ষার পত্র ও খাতা দেখাও এখন শিক্ষকদের বিপুল আয়ের কারণ হয়ে উঠেছে।

১৩. বর্তমানে উদ্ভূত ভর্তি সমস্যার একটা সহজ ও আপাত সমাধান বাতলেছেন শিক্ষাসচিব। এ হচ্ছে মন্দের ভালো, কিন্তু পরিণাম হবে ক্ষতিকর। কেননা শিক্ষার ও বিদ্যার মান কমে যাবে এতে ভালো কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়েও। কারণ নকল বন্ধ করা যায়নি পরীক্ষার।

১৪. এক এবং অভিন্ন আধুনিক উদার ও বিজ্ঞান-বাণিজ্য-সাহিত্য-দর্শন-সমাজবিজ্ঞান সমন্বিত পাঠ্যসূচি অনুগ শিক্ষাপদ্ধতি সর্বজনীন না করলে এবং পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজি অবশ্য পাঠ গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হিসেবে গ্রাহ্য না হলে আমাদের জাতীয় জীবনে সরকারি শিক্ষানীতি কেবল আমাদের কানাগলিরই সন্ধান দেবে- মানুষ হতে দেবে না। নতুন শাসক শ্রেণীকেও আমজনতার সমাজভুক্ত করা যাবে না। এখনকার শিক্ষাব্যবস্থা দেখুন, জানুন, ভাবুন এবং মুক্তির পথ সন্ধান করুন- এ আবেদন রইল। তবে শিক্ষার মান বাড়ানোর শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পূর্বের মতো কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল ইংরেজী মাধ্যমেই পড়া-পড়ানো এবং লেখা-লেখানো।

বিশ্ব মুসলিমে-খ্রীস্টানে কূটনীতিক-রাজনীতিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব

আজকাল স্নায়ুযুদ্ধের মতোই আফ্রো-এশিয়ার শিক্ষিত সচেতন মুসলিমের ও য়ুরোপ-আমেরিকার খ্রীস্টানদের মধ্যে একটা তীব্র-তীক্ষ্ণ, স্থূল-সূক্ষ্ম মানস দ্বেষ-দ্বন্দ্ব চলছে। যদিও বাহ্যত দুনিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রের সরকারগুলো সাধারণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও তাঁবেদার মিত্র, খ্রীস্টান রাষ্ট্রশক্তির ভক্ত ও অনুগত। আমরা সবাই জানি আফ্রো-এশিয়ার জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা গোত্র গোষ্ঠী নিবাস নির্বিশেষে সবার ষোল শতকের উষাকাল থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি খ্রীস্টীয় য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক শাসনে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোষণে-লুণ্ঠনে-পীড়নে-অবজ্ঞায়-অবমাননায়-বঞ্চনায়-প্রতারণায় প্রজন্মক্রমে সঞ্চিত ক্ষোভ ক্রোধ ঈর্ষা ঘৃণা প্রতিহিংসা প্রতিশোধ প্রতিরোধমূলক বৈরিতা মনে ও মর্মে, মগজে ও হৃদয়ে দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে। তার আগের ইতিহাসও জাতিবিদ্বেষণারই ইতিবৃত্তান্ত। বিশেষ করে ক্রুসেডের কাল থেকেই আর ১৯১৮ সনে তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের পরে মুসলিমদের খ্রীস্টান বিদ্বেষ মানসিকভাবে চরম পর্যায়ে পৌছে। কিন্তু পনেরো শতকের শেষ দশকে স্পেন থেকে মুসলিম বিতাড়নের পর থেকে বিশেষ করে জনবহুল য়ুরোপ পৃথিবীর বাজার ও জমি দখল লক্ষ্যে পৃথিবীর সীমা আবিষ্কারে অভিযাত্রী হয়ে অসীমসাগরে যেদিন থেকে জাহাজ ভাসাল জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, সেদিন থেকেই একদিকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-মননে-মনীষায়-রেনেসাঁসে মানসিকভাবে, অন্যদিকে অর্থসম্পদে ও সাম্রাজ্যবিস্তারে তারা কেবলই ঋদ্ধ হচ্ছিল। ফলে একাধারে ও যুগপৎ বিত্তবান ও চিত্তবান হওয়ায় খ্রীস্টান য়ুরোপ-আমেরিকা সর্বপ্রকারে পিছিয়ে পড়া ও দ্রুত পতন ও পচনশীল মুসলিম বিশ্বের প্রতি বিদ্বেষে নয়– অবজ্ঞায় তাচ্ছিল্যে উন্নাসিক হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সর্বপ্রকারে রিক্ত হৃত গুণ-গৌরব অসমর্থ অযোগ্য অবিদ্বান মুসলিমরা জীবন-জীবিকার ও রাষ্ট্রক্ষমতার সর্বক্ষেত্রে সমকালীন খ্রীস্টান জগতের কাছে হার মেনে হীনমন্যতা ঢাকবার বৃথা প্রয়াসে অতীতের ও ঐতিহ্যের গৌরব-গর্বের আস্ফালনে এবং খ্রীস্টান বিদ্বেষে মনের জ্বালা জুড়োবার চেষ্টায় অলস জীবনযাপন করছিল অসহায়ভাবে। মুসলিমরা যতই য়ুরোপীয়দের শাসনে শোষণে পীড়নে লুণ্ঠনে প্রবঞ্চনায় ও প্রতারণায় হৃতসম্পদ ও হীনবল হচ্ছিল, ততই দিশেহারা হয়ে ইসলামের উন্মেষযুগের মক্কা-মদিনার আরবদের উত্থান ও আত্মবিস্তার স্মরণ করছিল আর ভাবছিল ইসলামই বুঝি মুসলিম সমাজের জাগতিক জীবননে উন্নতির পুঁজি পাথেয়। বস্তুত ইসলাম জগজ্জয়ে প্রবুদ্ধ ও আত্মপ্রত্যয়ী করেছিল কেবল মক্কা-মদিনার আরবদেরই, ইরাক-ইরান-মধ্য এশিয়া-উত্তর আফ্রিকা এমনকি ভারতও ইসলাম বরণ করে দৈশিক স্বাধীনতা ও জাতীয় সত্তার গৌরব-গর্ব হারিয়ে ছিল মাত্র। আমরা যেমন আমাদের স্বদেশের ও পূর্ব প্রজন্মের অমুসলিম ভাব-চিন্তা-আচার-ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে সচেতনভাবে বর্জন করে, বিস্মৃত হয়ে সযত্ন প্রয়াসে ও আয়াসে আরব-ইরানী ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে স্মরণ ও শরণ করে গৌত্রিক অস্তিত্ব হারিয়েছি সাগ্রহে। তাই বিশ্বমুসলিমরা মোটামুটিভাবে সতেরো শতক থেকে আত্মোন্নয়নের দিশা ও প্রেরণা খুঁজছিল শাস্ত্রে। ইমানের জোরেই যেন মুসলিমরা আবার পৃথিবীতে আত্ম-প্রতিষ্ঠায়, দর্পে দাপটে প্রভাবে প্রতিপত্তিতে জেগে উঠবে। কাজেই স্রষ্টাতে ও শাস্ত্রে সমর্পিত চিত্ত হলেই যেন মুসলিম সমাজে ইসলামের উন্মেষ যুগের আরবের ও বোগদাদী গৌরবের ও দাপটের পুনঃ প্রাপ্তি সম্ভব- এমন এক ভ্রান্তধারণা বিশ্বের মুসলিম সমাজে এ মুহূর্তেও প্রবল। এ লক্ষ্যেই আরবে মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব, ভারতে শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তাঁর পুত্ররা ও শিষ্যরা, মুহম্মদীয়া তথা ওয়াহাবী মতবাদী সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, তীতুমীর, ফরায়েজী শরীয়ত উল্লাহ ও তাঁর পুত্র মহসিনউদ্দীন, বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যবাদী জামালউদ্দীন আফগানী, গোলাম আহমদ কাদিয়ান, মৌলানা মওদুদী আর দেওবন্দী নদভী মতবাদ প্রভৃতি মুসলিম মনে ইসলামী শাস্ত্রানুগত্যে পুনরুজ্জীবনবাদীই ছিলেন এবং আজো তাঁদের মতানুবর্তীরা রয়েছেন। আঠারো-উনিশ শতকে যা ছিল দিশেহারা হতাশায় নির্জিত মানুষের চিন্তা-চেতনা-আবেগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসূন, তা-ই ভিন্ন তাৎপর্যে য়ুরোপীয় শিক্ষায়-চেতনায়-জীবনযাপন পদ্ধতিতে ঋদ্ধ উচ্চাশী মুসলিমদের ভাব-চিন্তা-কর্ম প্রয়াসের অবলম্বন ও লক্ষ্য। এ-ও বিভ্রান্তির, বিকৃতচিন্তার, অধীর বুদ্ধির ও অস্থির বিশ্বাসের ফল। এখন যে যুগান্তর ঘটেছে, জীবন ও জগৎ যন্ত্রনির্ভর ও যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত হয়েছে, বিজ্ঞানের প্রসাদে যানবাহনে বিচিত্র ও বিস্ময়কর যন্ত্রের প্রয়োগে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎকর্ষ অকালমৃত্যু প্রতিরুদ্ধ হয়েছে, ধরা যে হয়েছে সরার মতো ক্ষুদ্র, পৃথিবীর বিভিন্ন জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষার মানুষ যেমন সর্বপ্রকার স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য নিয়েও একটি জনপদবাসী হয়ে উঠেছে দূরত্বের, স্বাতন্ত্র্যের, অপরিচয়ের ও অসংযোগের, অসহযোগের ও অবিনিময়ের বাধা-বিঘ্ন ঘুচিয়ে, তা তাদের উপলব্ধি ও অনুভূতিগত না হওয়ায় আর জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে, বর্ণবৈষম্য ভিত্তিক পুঁজিবাদী সমাজের জীবিকা ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা সমস্যা যে অসামাধ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা অনুধাবনের মগজীশক্তি-রিক্ততার কারণে তারা আগের মতোই অবক্ষয়ের সমস্যাজর্জর ও অভাবপীড়িত। এর থেকে উত্তরণের পন্থা বা উপায় তাদের কাছে একটিই তা হচ্ছে স্রষ্টার ও শাস্ত্রের শরণ। তাই আজকের পৃথিবীর সর্বত্র মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মানুষ অধিক সংখ্যায় কেবল অর্থোডকস ও মৌলবাদী হয়ে উঠছে, য়ুরোপীয় আদলে যন্ত্রনির্ভরতা ও যন্ত্রপ্রীতি বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও, য়ুরোপীয় খ্রীস্টানের আদলে প্রাত্যহিক ঘরোয়া জীবনযাপনে উৎসাহ সত্ত্বেও, ফোন-ফ্রিজ-ডিস অ্যান্টেনা-রেডিও-টিভি-ভিসিআর-ক্যাসেট-ফ্যাক্স-কম্প্যুটার-তার-বেতার-যানবাহন প্রয়োগে ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে আগ্রহ বৃদ্ধি সত্ত্বেও তাদের অতীত ও ঐতিহ্যাশ্রয়ী বন্ধ্য মন্দ মগজ, মনন, মনীষা কেবল অতীতমুখী, শাস্ত্রমুখী। এবং আধুনিকতা ও সৃষ্টিশীলতা, আবিষ্কার-উদ্ভাবন-নির্মাণ য়ুরোপীয় বলেই, তা জীবনে ব্যবহার ও প্রয়োগ করেও য়ুরোপীয় নিত্যবিকাশ ও উৎকর্ষমুখী য়ুরোপীয় চিকিৎসা গ্রহণে আগ্রহী হয়েও, তারা স্বসংস্কৃতি নামের অদৃশ্য অকেজো, সমকালে উপযোগরিক্ত মাকাল ফলের কিংবা সোনার পাথরবাটির অনুরাগ ত্যাগ করতে পারে না। স্বপ্নের ও সাধের স্বসংস্কৃতির ধারণা যদিও শূন্যের কোঠায়, তবু সংস্কৃতিচর্চার নামে স্বসংস্কৃতি রক্ষণে, তার উৎকর্ষসাধনে, তার সেবায় আত্মোৎসর্গের মহৎ উদ্দেশ্য মন্ত্রীর বুদ্ধিজীবীর শিল্পীর-সাহিত্যিকের কথায় ও লেখায় অভিব্যক্তি পায় পার্বণিক অনুষ্ঠানে ও ভাষণে।

এখন পশ্চিম এশিয়ার মুসলিমদের গায়ে চর্বি, মগজে উচ্চাশা এবং অন্তরে অহমিকা জন্মেছে তেলবেচা সম্পদের প্রাচুর্যে ও য়ুরোপীয় বিদ্যার প্রসারে। তাই তারা এখন ইসলামকে ক্রিশ্চিয়ানিটির এবং মুসলিমদের খ্রীস্টানদের প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগীরূপে ভাবা শুরু করেছে। খ্রীস্টানরা বিজ্ঞানের প্রসাদ এবং জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক বিবেচনার আলোকপ্রাপ্ত। কাজেই তাদের মধ্যে নাস্তিক নিরীশ্বর অনেক, সমকামী নারী পুরুষও বর্ধিষ্ণু। খ্রীস্টধর্মের প্রতি প্রীতি তাদের মুসলিমদের মতো গাঢ়-গভীর ও একমুখী নয়, কিন্তু খ্রীস্টান নামের এক শাস্ত্রিক জাতিচেতনার শেকড় দৃঢ়মূল অবশ্যই, যেকারণে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী য়ুরোপের মাটিতে মুসলিম রাষ্ট্রের বিলুপ্তিকামী। ফলে নবজাগ্রত ও পুনরুজ্জীবিত পশ্চিম এশিয়ার, মধ্য এশিয়ার, উত্তর আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে ক্রুসেডের কালের মুসলিমশত্রুর মতো মারাত্মক বৈনাশিক বৈরী রূপে ভাবতে শুরু করেছে খ্রীস্টান-প্রতীচী, ইদানীং য়ুরোপ আতঙ্কিত ও হুঁশিয়ার হচ্ছে, প্রতিরোধের কূটনৈতিক ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনৈতিক উপায় সন্ধানে আত্মনিয়োগ করছে। কিন্তু মুসলিমরা যেহেতু বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা ও অতীত-ঐতিহ্য প্রীতিমুক্ত চিন্তা-চেতনার মগজী প্রয়োগে সমকালীন যৌক্তিক-বৌদ্ধিক জীবন বরণে বিমুখ, সেহেতু তারা গোঁড়ামিতে, রক্ষণশীলতায়, আক্ষরিক ও অযৌক্তিকভাবে শাস্ত্রানুগত্যে তৃপ্ত, তুষ্ট ও হৃষ্ট আর আত্মত্রাণের একমাত্র ও চিরন্তন পন্থারূপে শাস্ত্রনিষ্ঠাকেই জেনেছে তারা। তাই বিজ্ঞানে, দর্শনে, যুক্তিবাদে, মুক্তচিন্তায় উদারমানবতায় আবিষ্কারে উদ্ভাবনে সৃষ্টিতে তাদের উৎসাহ নেই। এ পন্থাই যে আত্মোৎকর্ষের পন্থা তাতেও তাদের ইমানবিরোধী বলে আস্থা নেই। তাই তারা মৌলবাদী, অর্থোডক্স।

পৃথিবীর অন্যসব শাস্ত্রিক সমাজ, সম্প্রদায় ও জাতি এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জীবনে দেশের কালের দাবি সহজে মেনে চলে ও চলবে। কিন্তু শাস্ত্রে আক্ষরিকভাবে দৃঢ়প্রত্যয়ী মুসলিমরা সাধারণভাবে বিশ্বাসে গোঁড়া রক্ষণশীল বা অর্থোডক্স বা মৌলবাদী বলে কর্মে আচরণে বাস্তবজীবন ও জীবিকা ক্ষেত্রে দুষ্ট, দুর্জন, দুর্বৃত্ত, দুষ্কৃতী হলেও অন্তরে পাপে-পুণ্যে আস্থাবান। বয়োধর্মে লাভে লোভে স্বার্থে জেনে বুঝে অপকর্ম অপরাধ করলেও অপ্রতিরোধ্য প্রলোভনবশে, বার্ধক্যে ভয়ে অনুশোচনায় কাতর হতে দেখা যায় তাদের। অবশ্য মৃত্যু আসন্ন জেনে বার্ধক্যে ও পারত্রিক শাস্তি ভয়ে ভীত থাকেই অন্যান্য ধর্মে বিশ্বাসীরাও। পৃথিবীর আর আর শাস্ত্র দুশ চারশ হাজার বছর ধরে শ্রুতি-স্মৃতিরূপেই ছিল চালু, পরে লিপিবদ্ধ হয়েছে, এ জন্যে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যুক্তি প্রয়োগে, সন্দেহে, অবিশ্বাসে, জিজ্ঞাসায় ও অন্বেষায় অনেকখানি স্বাধীনতা পায় মানসিকভাবে। কিন্তু হযরত মুহম্মদের মৃত্যুর মাত্র পঁচিশ বছর পরেই কিছুটা ব্যক্তিক প্রয়োজনে লিপিবদ্ধ এবং অধিকাংশ লোকস্মৃতিতে ও লোকশ্রুতিতে বিধৃত কুরআনের আয়াতগুলো সভা করে তর্কেবিতর্কে সন্ধানে সমর্থনে যাচাই-বাছাই-ঝাড়াই করে খলিফা উসমানের নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে আক্ষরিকভাবে নিখাদ, নিখুঁত সহি, ঠিক এবং সত্য আর অবিকৃত বলে গৃহীত এবং সর্বজন স্বীকৃত হয়। যাঁরা সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন এবং অনুপস্থিত যাঁরা নির্ভেজাল বিশুদ্ধ পূর্ণাঙ্গ ও স্থির সংকলন গ্রন্থরূপে লিপিবদ্ধ কুরআনকে দৃঢ়প্রত্যয়ে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত অবলম্বনরূপে জীবনে চলার পথের পুঁজি-পাথেয় রূপে গ্রহণ বরণ করেন, তাঁদের প্রায় শতে সত্তর/পঁচাত্তর জনের জীবৎকালেই রসুল জীবনের শেষ তেইশবছর ব্যাপী নাজেল হয়েছিল ওহি। কাজেই তারা মনে কুরআনকে আল্লাহর বাণী হিসেবে মানবজীবনের সর্বার্থক ও সর্বাত্মক কল্যাণের অবিকল্প এবং চিরন্তন প্রয়োগের ও উপযোগের নির্দেশনা গ্রন্থরূপে মুসলিম মাত্রই বিশ্বাস করে। তাই মুসলিম মনে শাস্ত্র সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ, অবিশ্বাস, প্রশ্ন, উপযোগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা, যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কোনো সন্ধিৎসা, প্রয়োগে ও অনুসরণে সাফল্য সম্বন্ধে যাচাই-বাছাইয়ের কোনো অন্বেষা জাগতেই পারে না। জীবনে যা কিছু জ্ঞাতব্য কুরআনে তার সবকিছু মেলে, জীবনে ন্যায়ানুগ জীবনযাপনের সরলপথের নির্দেশ রয়েছে, আপদ-বিপদ-সঙ্কট-সমস্যা মুক্তির পন্থাও হয়েছে নির্দেশিত। তাই ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপন বিধান। এ বিশ্বাসের ফলেই মুমীন কখনো মগজ প্রয়োগে নতুন চিন্তার, নতুন চেতনার, নতুন কিছু সৃষ্টির প্রয়াসী হয় না শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলেই। বোগদাদী খলিফাদের আমলে গোড়ার দিকে গ্রীক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞান, আয়ুর্বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতির আলোচনা ও অনুবাদ সম্ভব হলেও প্রথমে নাস্তিক পরে প্রাণবাঁচানোর গরজে আস্তিক ও মুমীন প্রখ্যাত বিদ্বান ইমাম গাজ্জালী গ্রীক বিদ্যার চর্চা ইসলাম ও ইমান বিরুদ্ধ বলে ফতোয়া দিলে গ্রীকবিদ্যার চর্চা মুসলিম সমাজে চিরকালের জন্যে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। উল্লেখ্য মুসলিমরা গ্রীক কাব্য-নাটকাদি সাহিত্য কাল্পনিক তথা মিথ্যা বলেই বর্জন করে চলেছিল, পাঠ করেনি, অনুবাদ করেনি, যুক্তিবাদী মুতাযিলারা হারুন অর রশীদের ও আলমামুনের প্রশ্রয়-আশ্রয় পেলেও এঁদের পরে প্রায় দু'লক্ষ মুতাযিলা হত্যার ফলে মুতাযিলাদের যুক্তিবাদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। নতুন চিন্তার ও নতুন চেতনার যারাই অভিব্যক্তি দিয়েছেন, তাঁরা সবাই পীড়িত, লাঞ্ছিত বা নিহত হয়েছেন। তবু মাঝে মধ্যে নতুন চিন্তা-চেতনা দেখা দিয়েছে ব্যক্তিবিশেষে এবং তাঁর প্রভাবে অন্যদের মনে ও মর্মে প্রজন্মক্রমে রয়েই গেছে এবং তাদের মধ্যে গড়ে-ওঠা মতবাদী সম্প্রদায়গুলোকেও বিলুপ্ত করা সম্ভব হয়নি, বিভিন্ন সুফীমতবাদী সম্প্রদায় তার সাক্ষ্য ও প্রমাণ। মুসলিম হামাদান সম্প্রদায়ের মতবাদ এবং মৌলানা জালাল উদ্দীন রুমীর মসনবী শরাবিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ইরাকে-ইরানে ও আরববহির্ভূত মুসলিম জগতে আজো সমাদৃত, ওমর খৈয়ামের রুবাইয়ে পরিব্যক্ত ভাব-চিন্তাও বর্জন করা যায়নি, ইবনুল আরাবীর দর্শনও আক্ষরিকভাবে কুরআন অনুগ নয়। তবু গোড়া থেকেই নতুন চিন্তা-চেতনার অভিব্যক্তিদানের জন্যে ইবনে সিনা [মৃত্যু ১০৩৭ খ্রীঃ] ইবনে রুশদ [১১২৬-৯৮] হন নির্যাতিত এবং শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দীকে (গাজী সালাহুদ্দীনের নির্দেশে মিশরে) আবু মুসা ইবনে মনসুর হল্লাজকে নিহত হতে হয়েছিল।

আজো মুসলিম বিশ্বে হত্যাকাণ্ড অবিরল, সালমান রুশদী ও তসলিমা নাসরীনের বিপন্ন জীবন এ সূত্রে স্মর্তব্য। এমনি অসহিষ্ণুতা ও পীড়ন ইহুদী খ্রীস্টান ও ব্রাহ্মণ্য সমাজেও ছিল, এখন নেই। মধ্যযুগের পোপ-পাদরী পীড়নক্লিষ্ট সমাজেও তবু ১৫৫৫ সনে, ১৫৯৮ সনে, ১৬০১ সনে, ১৬১৪ সনে, ১৬৭২ সনে রেনেসাঁস প্রভাবিত য়ুরোপে পরমত সহিষ্ণুতা ধর্মনিরপেক্ষতা প্রত্যক্ষে পরোক্ষে পরিব্যক্ত করার কারণ ঘটেছিল। এ সূত্রে আমরা গ্রীক দর্শনের ধারাবাহিকতায় দার্শনিক দেকার্তের (১৫৯৬-১৬৫০) ও হিউমের [১৭১১-৭৬] প্রভাবিত মন্টেস্কু, রুশো, ভলতেয়ারের ও ফরাসীদেশের enlightenment-এর যুগ স্মরণীয়, তারপর থেকে পোল্যান্ডবাসী কোপানিকাস [১৪৭৩-১৫৪৩], ইটালীর গ্যালিলিও [১৫৬৪-১৬৪২], লিউনার্দো ব্রুনো [১৫৪৮-১৬০০] প্রমুখের প্রভাবে এককথায় বিজ্ঞানের ও দর্শনের আর সাহিত্যের চর্চার প্রসারে হবস, দেকার্তে, স্পিনোজা, লক, হিউম, কান্ট, হেগেল, নিটসে, রাসেল, সার্ত্র, নিউটন, মার্লো, ইবসেন, বার্নাডশ, সেক্সপীয়ার, মার্কনি, গ্যালভানি, অ্যাডিসন, আইনেস্টাইন, হকিং, মার্কস, ডারউইন, গ্যাটে, টলস্টয়, ভিক্টরহিউগো, ফ্রয়েড প্রমুখ বহু মনীষীর মনীষাপুষ্ট য়ুরোপ এখন নিরক্ষরতা, সর্বপ্রকার আচারভ্রষ্টতা, নাস্তিকতা, সর্বপ্রকার মতসহিষ্ণুতা সমকামিতা প্রভৃতি সবকিছু সহ্য করে ডস্টফয়ভস্কি, রমারলা। কিন্তু মুসলিম বিশ্ব এ মুহূর্তেও সাড়ে তেরোশ' বছর আগেকার আরব মরুর জীবনাদর্শে সেভাবে জীবনযাপন পদ্ধতি চালু করার আগ্রহে, আয়াসে ও প্রয়াসে উগ্রভাবে আত্মনিয়োগ করেছে যার নাম দেশ-কাল-পরিবেশ-প্রতিবেশ এবং বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক জীবনচিন্তা ও চেতনাবিরোধী অযৌক্তিক অসম্ভব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থোডকসি বা মৌলবাদ। কাজেই এ অবস্থায় ও অবস্থানে মুসলিমরা খ্রীস্টানদের কাছে অবশ্য হার মানবে। ওরা মনে-মগজে-মনীষায় মুক্ত। আর মুসলমান মাত্রই মনে-মগজে-মননে-মনীষায় বদ্ধ ও গতানুগতিক জীবনচেতনায় অভ্যস্ত ও নিশ্চিন্ত। তারা অর্থোডকসির অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত। বিজ্ঞানে-বাণিজ্যে-দর্শনে, যন্ত্র উদ্ভাবনে, নির্মাণে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে, মারণাস্ত্র উদ্ভাবনে নির্মাণে, প্রকৌশল-প্রযুক্তির উৎকর্ষসাধনে ও বৈচিত্র্য দানে অসমর্থ। মুসলিমরা অজ্ঞ অসমর্থ নিষ্ক্রিয় অনুকারক ও অনুসারক মাত্র। তারা কি করে খ্রীস্টানদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শক্তিতে-সাহসে পাল্লা দিয়ে চলবে? অতএব, তাদের দ্বেষ-দ্বন্দ্বে হার ও বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

এ প্রসঙ্গেই মুসলিমমনের সাধারণ ভ্রান্তির কিংবা মুসলমানদের ভুল ধারণার কিংবা তাদের বিষয়ে দু-চারটে কথা বলতে চাই। হযরত মুহম্মদের জন্ম আরবে। কুরআনও নাজেল হয় আরবী ভাষায় আরবে, মুসলিম সাম্রাজ্যের শুরু মদিনায়, স্থিতি ইরাকের বোগদাদে। ফলে দরবারী ও প্রাশাসনিক ভাষারূপে এবং কুরআনের ও উপাসনার ভাষা হিসেবে আরবীই হয়ে উঠল অবশ্য শিক্ষণীয়। এভাবে একালের ইংরেজীর মতোই শাস্ত্রিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও আয়ুর্বিজ্ঞানের বিষয়, ইতিহাস ভূগোল রাজনীতি লিখিত হতে থাকে রাষ্ট্রের ভাষা ও শাস্ত্রের ভাষা আরবীতে। ফলে আরব, আরবী ও ইসলাম অভিন্ন সত্তায় অজ্ঞজনগণের মনে-মগজে ও মর্মে স্থিতি পায়। এ জন্যেই ইসলামি সংস্কৃতি-সভ্যতা, মধ্যযুগ অবধি মুসলিম মাত্রেরই আরবী ভাষায় লিখিত কৃতি-কীর্তি আরবদের কৃতি কীর্তিরূপে পরিচিত, আলোচিত ও অভিহিত। অথচ আমরা জানি, বিদ্বান বলে খ্যাত জাফর সাদেক ও বিজ্ঞানী বলে খ্যাত ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল-কিন্দী (৮১৩-৭৪) ব্যতীত কেউ আরব ছিলেন না। উল্লেখ্য যে, বোগদাদে গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চা শুরু হয় বোগদাদের এক খ্রীস্টান ও এক ইহুদী পরিবারেই। সব কয়জন মযহাবী ইমাম আবু হানিফা, আহমদ, হাম্বল, সাফী ছিলেন অনারব। স্পেন-মরোক্কো-তিউনিসিয়া-আলজিরিয়া-লিবিয়া-সুদান-মিশর-ইরাক-ইরান-মধ্য এশিয়ায় ও তুর্কী-মুঘল ভারতে অবধি যা কিছু আরবী ভাষায় লিখিত মুসলিম অবদান, সবটাই আরব সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রসূন রূপে স্বীকৃত। অথচ ইসলামি সংস্কৃতি বলে কিংবা আরব সভ্যতা-সংস্কৃতি বলে নির্ভেজাল তথা অবিমিশ্র কোনো সভ্যতা-সংস্কৃতির অস্তিত্বই নেই, ছিল না কখনো। বোগদাদের আরবসাম্রাজ্যের কিংবা তুর্কীসাম্রাজ্যের জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা কেউ আরব রক্ত সম্পৃক্ত ছিলেন না। কাজেই বিভিন্ন গোত্রের, ভাষার ও অঞ্চলের লোকের মননে গবেষণায় আবিষ্কারে উদ্ভাবনে, নির্মাণে, সৃষ্টিতে, অঙ্কনে, রুচিতে, সৌন্দর্যচর্চায় গড়ে-ওঠা সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, স্থাপত্য, চিত্রশিল্প, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতিকে ইসলামি বা আরবী আখ্যায় অভিহিত করা অযৌক্তিক নয় শুধু, তথ্যের, তত্ত্বের ও সত্যের বিকৃতিও বটে। সুফীমতবাদ যে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য মতবাদ ভিত্তিক তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এটি আরব বহির্ভূত অঞ্চলে উদ্ভূত গুরুবাদী মতবাদ ইরানে ভারতে ফারসী উর্দু হিন্দি প্রণয়োপাখ্যানগুলোও সুফীমতের শৈল্পিক রূপক মাত্র বিভিন্ন কালের, স্থানের গোত্রের মানুষের প্রশ্রয়ে ও অবদানে গড়ে-ওঠা এক মিশ্র ভাব-চিন্তা-কর্ম-রুচি-সৌন্দর্যবুদ্ধি-মন-মনন-মনীষার ফল ও ফসল। এ সভ্যতা-সংস্কৃতি তাই মিশ্র সংস্কৃতি-সভ্যতা-ককটেলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতোই। এর প্রকৃত নাম মুসলিম সংস্কৃতি। পীর দরগাহ্ কদমরসুল ও হযরতবাল আজো বৌদ্ধ ঐতিহ্যের অম্লান সাক্ষ্য বহন করছে। আমাদের বাঙলার বাউল দরবেশী মারফতী সাধনা বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনারই ঈষৎ বিকৃত রূপ। মুসলিমসংস্কৃতি মুখ্যত দ্রোহী মুসলিমদেরই দান। অতএব মুসলিম সংস্কৃতি-সভ্যতা ছিল, আছে, ইসলামি বা আরব সংস্কৃতি সভ্যতা বলে মুসলিম নির্বিশেষের কোনো ঐতিহ্য ছিল না কখনো মুসলিম সংস্কৃতিতে সভ্যতায়।

একদিকে তেলবেচা পয়সায় চাঙ্গা হয়ে এবং আধুনিক প্রতীচ্যবিদ্যায়-মননে এবং প্রযুক্তিতে প্রকৌশলে উদ্বুদ্ধ, প্রবুদ্ধ, আত্মশক্তিতে উচ্চাশী হয়ে খ্রীস্টানদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও প্রতিহিংসায় পাল্লা দেয়ার হিম্মত অর্জনে আগ্রহী হয়েছে যেমন উত্তর আফ্রিকার ও পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম শিক্ষিত ধনী-মানীশ্রেণীর লোকেরা তেমনি জনবাহুল্যের দরুন সচেতন আধুনিক দুস্থ দরিদ্র নিঃস্ব লোকেরা পার্থিব জীবনে বঞ্চিত ধন-মান-সুখ-শান্তি-আনন্দ-আরাম বঞ্চিত হয়ে শাস্ত্রানুগত্যে শাস্ত্রাশ্রিত হয়ে ঐহিক জীবনকে পারত্রিক জীবনে বঞ্চনামুক্ত সুখ-শান্তি-আনন্দ-আরাম অনন্তকাল ধরে উপভোগের স্বপ্নে ও সাধে জীবনে-সমাজে-রাষ্ট্রে কুরআন ও সুন্নাহ অনুগ বিধিনিষেধ নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন পদ্ধতি কামনা ও দাবি করছে। এটা যে আধুনিক গণতন্ত্র তত্ত্বের বিরোধী, তা তারা মানতে চায় না, মুসলিমদের মধ্যে কুরআনে আনুগত্য অভিন্ন হলেও সুন্নাহ অভিন্ন নয় শিয়ায়, সুন্নীতে, নানা মযহাবিতে। কাজেই কুরআনসম্মত শাসনে কোনো মুসলিমের আপত্তি না থাকলেও সুন্নাহ প্রয়োগে মতবাদী সম্প্রদায়ে উপসম্প্রদায়ে বিবাদ-বিরোধ-অনিবার্য হয়ে উঠবে। উল্লেখ্য ইসমাইলিয়া (আগাখানি) সম্প্রদায়ের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার আইন ব্রাহ্মণ্য ধর্মসম্মত, ইসলামি নয়। অমুসলিম অধ্যুষিত সংখ্যাগুরু মুসলিমশাসিত রাষ্ট্রে সে-অবস্থায় অমুসলিম শাসনপাত্ররা হবে জিম্মি তথা গৃহপোষ্য প্রাণীর মতো প্রিয় আমানত বা সংরক্ষিত সম্প্রদায়। সে-অবস্থায় তাদের জাতীয় পতাকার প্রতি জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি ও স্বদেশের প্রতি কোনো অনুরাগ, অনুগামিতা ও আনুগত্য থাকবেই না। এ ব্যবস্থা তাই দেশের কালের প্রয়োজন ও দাবিবিরুদ্ধ, উপযোগরিক্ত অমানবিক ব্যবস্থা বলেই স্বীকার্য ও বর্জনীয়। একাল হচ্ছে নাগরিক মাত্রেরই সম অধিকারচিন্তার উন্মেষ-বিকাশ-উৎকর্ষ ঘটানোর কাল, মুক্তচিন্তার, যুক্তিবাদিতার, পরমত-কর্ম-আচরণ সহিষ্ণুতার কাল, উপযোগরিক্ত পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা পরিহারের কাল, মানবিক গুণের গৌরবের, মানবতার প্রসারের, গণহিতৈষণার, শোষিত-পীড়িত অবজ্ঞাত-বঞ্চিত মানুষ নির্বিশেষের মুক্তিকামিতার কাল। এ কালে মধ্যযুগীয়-চিন্তাচেতনা লজ্জাকর অমানবিক ও দেশকালবিরোধী বলেই পরিহার্য। য়ুরোপ-আমেরিকার খ্রীস্টানদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নামতে হলে মুসলিম মাত্রকেই সমকালীন চিন্তা-চেতনা-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা সম্পন্ন হয়ে নিজেকে যুক্তিবাদের, মুক্তচিন্তা-চেতনার উদারমানবতার অনুগত করতে হবে এবং আধুনিকতম বিজ্ঞান-বাণিজ্য-যন্ত্র-প্রযুক্তি-প্রকৌশল-মারণাস্ত্র আয়ত্ত করতে হবে আর সর্বপ্রকার সম্পদে ও মানবিক গুণে গৌরবে ঋদ্ধ হতে হবে। কেননা প্রতিপক্ষের সর্বপ্রকারে সমকক্ষ না হলে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে টিকে থাকা বা জয়ী হওয়া যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-ও স্মর্তব্য যে, গোটা পৃথিবীর সর্বত্র মুসলিমরাই ছিল অন্য ধর্মাবলম্বীদের শাসক, প্রভু ও প্রতিবেশী। একারণেই তাদের নিন্দক ও হিংসক প্রাজন্মক্রমিকভাবে পৃথিবীর ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে রয়েই গেছে। আজো তাই কোথাও কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আকারে সে-দ্বেষণার সামাজিক ও রাজনীতিক বিস্ফোরণ ঘটে।

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণজাত বিপন্ন জীবন

এককালে মানুষ পশুপাখি-কীটপতঙ্গের মতো ছিল প্রকৃতিলালিত প্রকৃতিনির্ভর প্রাণী। তখনো জীব-উদ্ভিদ কারো জীবন নিরাপদ ছিল না। ঝড় ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-মারী-কম্পন-আগুন সর্বপ্রকার প্রাণীর জীব-উদ্ভিদের জীবন বিপন্ন ও বিপর্যস্ত রাখত। অসহায় প্রাণী রোদ-বৃষ্টি-শৈত্যের, ভূকম্পনের, ঝড়ের, খরার ও মারীর কবলিত ছিল। আজো এক শ্রেণীর পাখি শৈত্য সহ্য করতে পারে না বলে গ্রীষ্মাঞ্চলে আশ্রিত হয় প্রতি শীতের মৌসুমে। সেদিনও অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষ প্রতিকারহীন প্রতিরোধহীন প্রতিষেধকহীন অসহায় শিকার ছিল অপমৃত্যুর অকালমৃত্যুর। মানুষ ব্যতীত আজো বুনো কীটপতঙ্গ থেকে স্থলভাগে হাতি অবধি এবং সব জলজপ্রাণী আজো প্রকৃতির কৃপাজীবী।

মানুষ বিগত সাত-আট হাজার বছরের সযত্ন প্রয়াসে মন-মগজ-মনীষা প্রয়োগে জীবনের ও জীবিকার এক কৃত্রিম জগৎ সৃষ্টি করেছে, অন্যান্য জীব-উদ্ভিদকে আয়ত্তে এনে, স্বকাজে ও স্বসেবায় নিয়োগ করে, প্রকৃতির মেজাজ-মর্জির সন্ধান নিয়ে তার আর্তব রূপ-স্বরূপ বুঝে তাকেও দাস-বশ করেছে, সতর্ক সযত্ন প্রয়াসে তার সঙ্গে আপোস করে কিংবা তার রোষ এড়িয়ে চলার, তার হামলা থেকে আত্মরক্ষার কৌশল আয়ত্ত করে। তাই আজো মানুষ ঝড়-বৃষ্টি-বন্যা-খরা-মারীতে যতোটা বিপন্ন হয়, যে-সংখ্যায় প্রাণ হারায়, তার চেয়ে হাজারগুণ বেশি বিপন্ন ও মৃত্যুর শিকার হয় অন্যান্য জীব-উদ্ভিদ জলে স্থলে আকাশে। ঝড়ের সময়ে দালানের দরজার-জানালার ধারে বসে আমরা দেখতে পাই গাছগুলো আর পাখিগুলো কতো বিপন্ন হয়, হয় জীবন-বিনাশী হামলার শিকার। বন্যার সময়ে পিঁপড়েগুলোর জীবনে ঘটে প্রলয়। দালানে-বৃক্ষে আশ্রিত হয়ে কতোই বা আর বাঁচে।

মানুষ স্বচ্ছন্দ সচ্ছল আরামের, সুখের ও স্বস্তির আনন্দিত সুদীর্ঘ জীবন যাপনের জন্যে মন-মগজ-মনন-মনীষা খাটিয়ে নব নব জ্ঞান-অভিজ্ঞতা অর্জন করে। নব নব হাতিয়ার যন্ত্র-কৌশল-প্রযুক্তি আবিষ্কার-উদ্ভাবন-নির্মাণ করে করে আজকের এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে, আয়ুর্বিজ্ঞানে, পদার্থবিজ্ঞানে, গণিতে, রসায়নে, ভূবিজ্ঞানে মানুষ-জীব-উদ্ভিদের শারীরবিজ্ঞানে এবং সমুদ্র-পর্বত-অরণ্য তত্ত্বে-তথ্যে ব্যক্তিমানুষ জ্ঞানী হয়ে নতুন নতুন আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-নির্মাণে সে-জ্ঞান জীবনযাত্রার উন্নয়ন সাধনে কাজে লাগিয়ে আজ মানুষ আবার ভিন্নরকমের সঙ্কট-সমস্যার মুখোমুখি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়িয়েছে। কথায় বলে 'সুখে থাকলে ভূতে কিলায়'। মানুষও এ-সুখ একা ও বেশি ভোগ করার লক্ষ্যে প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামল। এক সময়ে মানুষ জীবনযাত্রার আবশ্যিক সামগ্রী সহজে উৎপাদন, নির্মাণ ও বিনিময়ের জন্যে শ্রম ক্রয়-বিক্রয়ের, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধে হবে বুঝে বহু মনের মগজের মননের মনীষার পুঁজি প্রয়োগে 'মুদ্রা' ব্যবস্থা চালু করে। আজ সে-সম্পদপ্রতীক অর্থব্যবস্থা কতো জটিল হয়ে পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার, দুস্থতার-দরিদ্রতার-অনাহারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তেমনি বিজ্ঞানের প্রসাদে, ইলেকট্রিক-ইলেকট্রোনিক যন্ত্রের অধিক প্রয়োগে, অ্যাটমিক, হাইড্রোজেনিক, ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রনযোগে তৈরি মারণাস্ত্র ব্যবহারে আজ জল-স্থল-নভোমণ্ডল বিপন্ন। সমুদ্রের জীব-উদ্ভিদ স্থলের মানুষ অন্যান্য জীব-উদ্ভিদ আর আকাশের আবশ্যিক আচ্ছাদনরূপ ওজোন আজ বিপন্ন। বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত-নির্মিত ও প্রযুক্ত ইলকট্রন-প্রোটন-নিউট্রন প্রভৃতিযোগে নির্মিত যন্ত্র আজ পণ্য উৎপাদনে, আবার প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু নিধনে সমভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তার ফলে পরিবেশ হচ্ছে জীবনবিনাশী শক্তিতে বিষাক্ত। প্রকৃতিও আজ স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টিতে ও রক্ষায় অসমর্থ। শুধু জীব-উদ্ভিদ নয়, এমনকি পাথুরে বাড়িঘরও দ্রুত আয়ু হয়ে আজ (যেমন তাজমহল) ধ্বংসের মুখে। আম-কাঁঠাল খাব, তার খোসা-ভূতির গন্ধ এড়াব, মাছ-মাংস খাব তার বর্জিত অংশের পচন এড়াব, তা হয় না, তাও করতে কিছু পুঁজি খাটাতে, কিছু ব্যয় করতে ও কিছু ক্ষতি স্বীকার করতেই হয়।

যন্ত্রচালিত যানবাহন, কলকারখানা আজ প্রাণিজগতের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় আমরা কি বিজ্ঞানের প্রসাদ বর্জন করতে পারি? সমুদ্রের তলে যাওয়ার, নভোমণ্ডলে বিচরণ করার, সমুদ্র-পর্বত-অরণ্য লঙ্ঘনের, শ্রম ও সময় বাঁচানোর এ সুবিধে, শত্রু নিধনের এমন কেজো মারণাস্ত্র, প্রয়োজনে পর্বত বিদীর্ণ করার, সমুদ্রগর্ভে বিচরণ করার ও আত্মগোপন করার এ অর্জিত শক্তি কি মানুষ হাতছাড়া করবে, বর্জন করে কি পূর্বের মতো অসহায় প্রাণী হতে রাজি হবে? কাজেই প্রতিষেধক আবিষ্কার চেষ্টাই হবে মানুষের কাজ।

যে রূপের পিপাসায় প্রেম হল জীবন অধিক

পৃথিবী রূপময়, কবির ভাষায় নিসর্গ শোভা এরূপ :

অপার ভুবন উদার গগন শ্যামল কাননতল
বসন্ত অতি মুগ্ধমুরতি, স্বচ্ছ নদীর জল
বিবিধবরণ সন্ধ্যানীরদ, গ্রহতারাময়ী নিশি
বিচিত্র শোভা শস্যক্ষেত্র প্রসারিত দূর দিশি
সুনীল গগনে ঘনতরনীল অতিদূর গিরিমালা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারি পরপারে রবির উদয় কনককিরণ-জ্বালা
চকিততড়িৎ সঘন বরষা, পূর্ণ ইন্দ্রধনু
শরৎ-আকাশে অসীম বিকাশ জোৎস্না শুভ্রতনু!

এ রূপের আকর্ষণেই পৃথিবী এতো প্রিয়, মৃত্যু তাই এতো ভীতিকর। তাই কবি বলেন:

'রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল;
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান
অন্তরে অন্তর কান্দে কিবা করে প্রাণ।

এবং বিশ্বমানবের এ 'রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর', তাই রূপসীর প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ এবং রূপসীর গুণে থাকে মন ভোর। ফলে 'হিয়ার পরশ লাগি হিয়া কান্দে' পরাণ পিরীত লাগি স্থির নাহি বান্ধে এবং সেই পিরীতি নিজেকে এবং নিজের জীবনানুভূতিকে ও জীবন উপলব্ধিকে তিলে তিলে নতুন করে তোলে। এ রূপতৃষ্ণাজাত প্রীতি বা প্রেমই জীবনে অম্বিষ্ট। এ রূপের পিপাসায় তখন প্রেম হয় জীবন অধিক। কাম করে মানুষকে নিষ্ঠুর প্রাণী। রিরংসা মানুষকে করে প্রতিহিংসাপরায়ণ হন্তা। আর প্রেম করে সংযমে, ত্যাগে, ক্ষমায়, তিতিক্ষায় মহৎ। প্রেম মানবিকগুণের বিকাশ ঘটায়, কাম দেহের চাহিদা মেটায়, প্রেম অনুভবের জগৎ উন্নত ও প্রসারিত করে। কাম ক্ষুধার অবলম্বন পেলেই তুষ্ট, তৃপ্ত, হৃষ্ট, তাই অপ্রাকৃত ও প্রাণীসুলভ। প্রেম এক বিশেষ নারীকে বা পুরুষকে কেন্দ্র করে লতিয়ে ওঠে, প্রণয়ে নারীর বা পুরুষের বিকল্প মেলে না। প্রেম বিশেষজনের সঙ্গে বিশেষ জনের মধ্যে গড়ে ওঠে, রূপে ও গুণে প্রেমমাত্রই একের সঙ্গে একের অবিকল্প যোগ।

এমনি প্রেমই ব্যক্তিকে তিলে তিলে মনুষ্যত্বে নতুন করে তোলে, অর্থাভাব, দুশ্চিন্তা ও রোগমুক্ত মানুষের চোখে পৃথিবী সুন্দর, মধুর। তাই তার কাছে 'এজীবন মধুময় মধুময় পৃথিবীর ধূলি'। মধ্যযুগের কবি বলেন :

সখি কি পুছসি অনুভব মোয় ঃ
সে সোই অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নতুন হোয়,
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল–

লাখ-লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলেও তবু হিয়া জুড়ায় না! অতৃপ্তি চিরন্তন হয়ে থাকে। এ রূপসাগরের, এ রূপতৃষ্ণার, এ প্রণয়পিপাসার শেষ নেই, সীমা নেই, তৃপ্তি নেই, অশেষ ও অতৃপ্তির ব্যাকুল-বেদনা বহুল। তাই চিরকাল কাঁদিছে বাঁধা হৃদয় কুটিরে। একালের কবিদেরও এমনি আকুলতা দেখি, অক্ষয় কুমার বড়ালের এষা, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের উদ্ভ্রান্ত প্রেম, বিহারী লাল চক্রবর্তীর বঙ্গসুন্দরী, সরদামঙ্গল, সাধের আসন এমনি নারী ও মর্ত্যজীবন প্রেমের আকুলতাজাত অভিব্যক্তিক। বিহারীলালের পত্নীমুখের সৌন্দর্যমুগ্ধতা পরিণামে বিশ্বরূপচেতনায় পরিণতি পায়। দেবেন্দ্রনাথ সেনও বলেন, চিরদিন চিরদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপের পূজারী আমি রূপের পূজারী; কেননা কবি কীটসের ভাষায় A thing of beauty is a joy forever. মোহিত লাল মজুমদারও দেহাত্মপ্রেমী মর্ত্যজীবনের সুখবাদী ভোগবাদী, তিনিও বলেন 'রূপসীরে করে পূজা, প্রেয়সীরে ভালোবাসে কবি।' রূপ থেকে প্রেম এবং প্রেম থেকেই জাগে মর্ত্যজীবন প্রীতি, সে-জন্যেই বিহারী লাল চক্রবর্তীর কাছে 'স্বর্গীয় সুখ' অনন্ত যন্ত্রণার কারণ- সুখের নয়- 'স্বরগে অনন্ত সুখ আহো একি যাতনা;' তাঁর মতে প্রেমধন্য মর্ত্যজীবনের সুখানুভবের জন্যেই স্বয়ং নারায়ণ কৃষ্ণরূপে মর্ত্যজীবন যাপন করেছিলেন। মধ্যযুগের কবির মুখেও শুনি, কৃষ্ণ রাধাকে বলছেন, 'সুন্দরী আমারে কহিছ কি, তোমারি লাগিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া বিভোর হইয়াছি' 'তোমার লাগিয়া মর্ত্যে আমার স্থিতি' রাধা ও কৃষ্ণ অর্থাৎ প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের চোখে 'এক অঙ্গে এতো রূপ নয়নে না হেরি। নীল শাড়ি পরা রাধা আর বংশী হাতে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো কৃষ্ণ জগৎ মোহন রূপে অনন্য। আমাদের আধুনিক কবিও জেনেছেন যে 'আঁখির তৃষা মিটলে পরে তখন খুঁজে মন, তাই তো প্রভু সবার আগে রূপের আকিঞ্চন'।

রূপ বায়বীয় নয়, রূপ অবায়বিক। তাই যেখানেই রূপ, সেখানেই আকর্ষণ, এবং ভালো লাগলেই ভালো বাসতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাই বলেছেন, 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র' বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক-নায়িকারা সাধারণভাবে রূপবহ্নির শিকার। এক প্রেমিকার আকুল আবেদন শুনি প্রেমাস্পদের কাছে, তার প্রার্থনা,

'বধূ আগে দাঁড়াইও। দুই নয়নের সাধ গেলে তবে তুমি যাইও।'

AMARBOI.COM

রবীন্দ্রনাথের 'সুবদাসের প্রার্থনা' কবিতায় রূপাকর্ষণের তীব্রতা ও অমোঘতা সুপ্রকট:

'আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে, ফুল মোরে ঘিরে বসে
কেমনে না জানি জ্যোৎস্নাপ্রবাহ সর্বশরীরে পশে,
ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে ভুবনমোহিনী মায়া,
যৌবনভরা বাহুপাশে তার বেষ্টন করে কায়া।

এ জন্যে মর্ত্যজীবন এতো প্রিয়, এতো মধুর। পৃথিবীতে মানব-মানবীর দুটো সমাজ-শাস্ত্র বিরুদ্ধ পরকীয়া প্রেম প্রথমে নিন্দিত এবং পরে নন্দিত হয়েছে শুধু নয়, জীবনে আধ্যাত্মসাধনার শাস্ত্র ও দর্শন এবং চর্যার অবলম্বন হয়েছে। নায়ক দুজনেরই ছিল ভুবন মোহন রূপ, নারীর কুল-কাড়ারূপ; একজন কৃষ্ণ, অন্যজন ইউসুফ। একটা মিশরীয় কাহিনী, মিশরের নপুংসক রাজা আজিজমিসির (মিসরের প্রধান) নামের এক ফেরাও বিয়ে করেছিলেন জুলায়খা নামের রাজকন্যাকে। রাজকন্যা অবশ্য বিয়ের আগে পরমসুন্দর চেহারার হবু স্বামীকে স্বপ্নে দেখেছিলেন, ভেবেছিলেন মিশররাজ এমনি সুন্দরই হবেন, কিন্তু দেখলেন স্বামী স্বপ্নে দৃষ্ট রূপের নন। পরে ক্রীতদাস নবীপুত্র ইউসুফের মধ্যে পেলেন স্বপ্নে দৃষ্ট রূপবানকে। ইউসুফ ছিলেন অনন্য অসামান্য অপরূপ অপ্রতিম অতুল্য রূপের যুবক। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের ভিড়ে যখন রাজধানীতে তিলপ্রমাণ শূন্যস্থান নেই, খাদ্য প্রার্থীরা যখন উচ্ছৃঙ্খল জনতা, তখন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইউসুফ নগ্নদেহে এসে দাঁড়ালেন এক উঁচু স্থানে। বুভুক্ষু উচ্ছৃঙ্খল জনস্রোত মুহূর্তে রূপমুগ্ধ হয়ে আত্মবিস্মৃত পাষাণ মূর্তিবৎ নীরব নিথর হয়ে গেল। মোহিতলাল মজুমদার ইউসুফের রূপের প্রভাব বয়ান করেছেন নারীমাত্রেরই ঘর ছাড়ানো-কুল হারানো প্রাণেশ্বর রূপে:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'য়ুসুফের রূপ দিনদিন যে গো ফুটে ওঠে
কুমারী ধরম-শরম যে তার পায়ে লোটে।
জুলায়খার ঐ আবরু এবার গেল টুটে
ইজ্জত রাখা ভার হল সেই লজ্জিতার'।

প্রথমে জুলায়খা হলেন নিন্দিতা, পরে দেখা গেল মিশরী যুবতী মাত্রই তার দর্শনে হয় মূর্ছিতা-মুগ্ধা, কাজেই জুলায়খা হলেন নন্দিতা, তবু ইউসুফের উপেক্ষিতা, সমাজনিন্দিতা বিড়ম্বিতা থেকে সুদীর্ঘকাল পরে ইউসুফের প্রণয় পেয়ে হলেন ধন্যা। ইরানে ফারসী সাহিত্যে-সুফীতত্ত্বের তথা জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক হিসেবে ইউসুফ-জুলায়খার প্রণয় ও পরিণয় কাহিনী হল জনপ্রিয় ও পৃথিবীখ্যাত। আজো তা একাধারে ও যুগপৎ রূপের, প্রেমের এবং অধ্যাত্ম সাধনার ও চর্যার আদর্শ হয়ে রয়েছে মুসলিমজগতে বিশেষ করে সুফীদের ও প্রণয়োপাখ্যান পাঠকদের কাছে।

কুলবধূ রাধা যদিও বলেছিলেন 'আমার সোয়ামী শ্যামল সুন্দর দেহা/নান্দের ঘরের গরু রাখোয়াল তার সনে কি মোর নেহা।' কিন্তু অচিরে কৃষ্ণের বাঁশীর সুরে, কৃষ্ণের রূপে কৃষ্ণ রাধার 'আঁখ উপরি রচলহি আসন।' এবং নয়নের মাঝখানে নিল ঠাঁই। মেঘনীল দেহের সৌন্দর্যে এবং ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমরূপে আকৃষ্ট হয়ে ঘর ছাড়লেন, হলেন কলঙ্কিতা, নিন্দিতা, সমাজ পরিত্যক্তা 'রাধা বলে কেহ শুধাইতে নাই দাঁড়াব কাহার কাছে,' তার পরে মথুরা-বৃন্দাবনে নারী মাত্রই হল কৃষ্ণের রূপে-গুণে-বাঁশীর সুরে আকৃষ্টা এবং অনুরাগিণী। সবগোপীরই যখন এ অবস্থা, তখন রাধার কলঙ্ক রটাবে কে? তাকে ঘৃণা করবে কে? তখন প্রিয়া ও পৃথিবী, ভূমি ও ভূমা এমনি অধ্যাত্ম প্রেম সাধকের কাছে একাকার হয়ে যায়। জুলায়খা ও রাধা প্রেমিকার আদর্শ। অবশ্য নারীর কাছে প্রেম চিরকালই জীবন অধিক। তাই Man's love is of mans's life, a Thing apart. It is Woman's Whole existence. এভাবে রাধা হলেন নন্দিতা নয় কেবল, জীবাত্মাপ্রতীক পরমাত্মার প্রিয়া। ভারতেও বিশেষ করে চৈতন্যোত্তর ভারতে রাধা-কৃষ্ণ হলেন জীবত্মা-পরমাত্মা প্রতীকে ধর্মসাধনার ও চর্যার উৎস, ভিত্তি ও অবলম্বন। 'সেই মহা (রাধা) ঠাকুরানীভাব যার মনে উপজয়। বেদধর্ম তেজি সে কৃষ্ণকে ভজয়।' বাঙলাদেশে বিহারে উড়িষ্যায় একদীর্ঘ শতাব্দী ধরে এমন অবস্থা ছিল যখন 'কানু ছাড়া গীত নাই/রাধা ছাড়া সাধা নাই/' এবং এ অঞ্চলে সাহিত্যরচনার অন্য বিষয়ও ছিল না প্রায় শত বছর কাল যাবৎ।

কুলবধূর পরকীয়াপ্রেম এবং গৃহত্যাগ পরিণামে ধর্মতত্ত্বের রূপক হয়ে সাধনার পন্থা হয়ে পার্থিব-অপার্থিব প্রেমের প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ হয়ে অসামান্য মর্যাদায়, মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে ধন্য হল, রইল চিরন্তন হয়ে, সুফীতত্ত্বের রূপক ফারসী ইউসুফ-জুলায়খা তত্ত্বের প্রভাব চৈতন্যদেব প্রচারিত কৃষ্ণপ্রেমের বা কৃষ্ণভক্তির জীবাত্মাপ্রতীক রাধা চেতনায় যে প্রতিফলিত, তা বৈষ্ণবদের স্বীকৃত রাধা-কৃষ্ণের যুগলাবতার শ্রীচৈতন্য তত্ত্বেই প্রকট, তাছাড়া আমরা অন্যত্র দেখেছি ও দেখিয়েছি যে চৈতন্যমতে ছিল সুফীতত্ত্বের প্রভাব গাঢ় ও গভীর। সুফীতত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে ইরাকে-ইরানে-মধ্য এশিয়ায়-মিশরে বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনের প্রভাবে। বৌদ্ধজ দীক্ষিত মুসলিমদের মধ্যে পূর্বপ্রজন্মের মানস ঐতিহ্যের রেশ ও লেশ অবিলুপ্তির কারণে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সুফী-বৈষ্ণব-বাউলেরা আদর্শে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈরাগ্যবাদী হলেও বাস্তবে জীবনবিমুখ বা ভোগবিমুখ নয়, কেবল কর্মবিমুখ মাত্র। ফলে আর্থ-সামাজিক জীবনে তারা সমাজের সম্পদ নয়, দায় মাত্র।

এ সূত্রে এ-ও স্মর্তব্য যে সখি কে বলে পিরীতি ভাল/হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া কান্দিতে জীবন গেল।' প্রেমে-সাফল্য জীবনকে সুন্দর, দেহ-প্রাণ-মন-মর্মকে মানবিকগুণে পরিশীলিত করে, জীবনাভূতিকে ও উপলব্ধিকে প্রসারিত করে, জীবনকে সার্থক করে তোলে, তেমনি অসাফল্য বা ব্যর্থতা বিচ্ছেদ বিরহ জীবনযন্ত্রণার কারণ হয়। অন্তত অতৃপ্তির অতুষ্টির অহৃষ্টির দরুন জীবন হয় নিরানন্দ। তবে রূপতৃষ্ণা অনুশীলনে স্মরজিৎ মানুষের কাছে কেবলই সৌন্দর্য ও আনন্দস্বরূপ হয়, যেমন ঋষ্যশৃঙ্গ পর্বতের স্মরজিৎ ঋষি যৌবনবতী চপলা রূপসীকে বলছেন, 'তোমার পরশ অমৃত সরস/তোমার নয়নে দিব্য বিভা,' রবীন্দ্রনাথের রচিত- কামপ্ররোচক 'উর্বশী' ও কামপ্রতিরোধক 'বিজয়িনী' কবিতা দুটো এ সূত্রে স্মর্তব্য। আমরা যদি আনুভূতিক তাৎপর্যে জীবনের লাভ-লোভ-স্বার্থকেও রূপতৃষ্ণার ও প্রেমপিপাসার প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূরূপে গ্রহণ করি, তা হলে এর আত্যন্তিকতাকে ও তীব্রতাকে বহ্নির সঙ্গে তুলনা করতে পারি। বাঞ্ছিতজনকে, ধনকে, মানকে, যশকে, খ্যাতিকে, ক্ষমতাকে, বিদ্যাকে, বিত্তকে, বেসাতকে কি সবাই পায়? পায় না। পায় ক্বচিৎ কোথাও কেউ, অন্যরা লঘু-গুরুভাবে ব্যর্থ বা স্বল্পপরিমাণে সফল-সার্থক হয় মাত্র। তখন মানুষের বাঞ্ছাগুলো বহ্নি হয়ে রূপবহ্নি ধনবহ্নি মানবহ্নি যশবহ্নি খ্যাতিবহ্নি ক্ষমতাবহ্নি দর্প-দাপটবহ্নি, প্রভাব-প্রতিপত্তিবহ্নি এককথায় লাভ-লোভ-স্বার্থবাঞ্ছা রূপ বহ্নি হয়ে মানুষকে সারাজীবন দগ্ধই করে- সুখ দেয় না। প্রেম মরীচিকা হয়ে প্রতারিত-প্রবঞ্চিত করে, দিশারীর ছদ্মরূপে দিশেহারা করে তোলে। জীবন হারায় দিশা, হয় নির্লক্ষ্য, বেতাল। মানুষ তো বটেই মনে হয় প্রাণীমাত্রই ভোগবহ্নির ও সুখবহ্নির পতঙ্গ মাত্র, তবু পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ চাহিদা দেহ প্রাণ মন মর্ম মনন টানে। যেমন ফুল কাড়ে দৃষ্টি, গান বাজে কানে, পৌঁছে মনে ও মর্মে। তাই ফুলে আর গানে বিরূপতা নেই মানুষের। রূপ-গুণ-সুর শেষাবধি মানুষের মনে লাগে, মর্মে লাগে। অবসরে মনে মর্মে বাজেও।

প্রত্যেক কিছুর স্থূল ও সূক্ষ্ম দুটো রূপ থাকে। সূক্ষ্ম মননশীলের দৃষ্টিগ্রাহ্য অনুভব উপলব্ধিগত হয়, স্থূলটা প্রাকৃত জনের জন্যে। মানুষের সমাজ-সংস্কৃতি-মন-মগজ-মননের স্তরভেদ থাকে, তাছাড়া জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা শক্তিতে কখনো সব মানুষ সমান হয় না। তাই অধিকাংশ মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা অনুশীলন আর মগজী ও বাহ্যিক শক্তি প্রভৃতির অভাব থাকে, তারা প্রাণীর জীবনই যাপন করে। এ মানুষই লাখে নিরেনব্বই হাজার নয়শ নিরেনব্বইজন। এরা যখন যেমন যা জোটে তা দিয়েই উদরের ক্ষুধা নিবৃত্ত করে, ভোজনবিলাসী হয় না, কামক্ষুধাও তেমনি যৌন মিলনেই তাদের মিটে যায়, তারা প্রণয়বিলাসী হয় না। তাই সবাই যেমন ভোজনবিলাসী হয় না, তেমনি সব মানুষ প্রণয়প্রিয় থাকে না। চোখসহা, গাসহা ও মনসহা হলেই দাম্পত্য শান্তিপূর্ণ ও স্থায়ী হয়। অধিকাংশ নারী-পুরুষ এমনি দাম্পত্যজীবনেই তুষ্ট, তৃপ্ত ও হৃষ্ট থাকে। সেতুরূপে সন্তান রূপ ও কাম নিরপেক্ষ অভিন্ন স্বার্থের আত্মীয়তাবন্ধন সৃষ্টি করে দম্পতির মধ্যে। পত্নী সন্তানদের মাধ্যমে পরিবারে আত্মীকৃত ও আত্তীকৃত হয় পরস্পরে। তাই বিপর্যয়-বিচ্ছেদ আমাদের দেশে কমই, অবশ্য মানসিকভাবে সবারই থাকে রূপানুরাগ। তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে আকৃতি আকুলতায়-চঞ্চলতায় অস্থির করে তোলে না। শরম-সংকোচ-সমাজ তার প্রবৃত্তিকে সংযত রাখে। কেননা ইউসুফের ও বৃন্দাবনী কৃষ্ণের ভুবন মোহন রূপ নারী মাত্রকেই প্ররোচিত করত কুল ত্যাগে। এমনি রূপানুরাগই, এমনি রূপের পিপাসায় প্রেম হয় জীবন অধিক কোনো কোনো নারী-পুরুষের কাছে। সাহিত্যে-শিল্পে তাই আমরা প্রেমের মহিমাই বিঘোষিত দেখি। প্রেমিক-প্রেমিকা হয় আমাদের সম্মানের ও সহানুভূতির পাত্রপাত্রী। কাম হয় প্রেমে উন্নীত। প্রেম হয় কামাতীত দেহাতীত মাধুর্যানুভবের বিষয়।

আত্মসেবী নাগরিকের নিরপেক্ষতা দোষ না গুণ !

একজন শহুরে শিক্ষিত নাগরিক যে-কোনো পেশায় জীবিকার্জন করেন। তিনি যে- কোনো রাজনীতিক মত বা পথ পরিহার করে চলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি নিরীহ। তাঁকে কোনো রাজনীতিক মত প্রকাশ করতে কিংবা কোনো দল সমর্থন করতে দেখা যায় না, অথচ তিনি ভোটার। এবং তিনি রাজনীতিতে পাকা, শাসনে দক্ষ, সততায় শ্রদ্ধেয়, ন্যায্যতাবোধে ও সুবিচারে নির্ভরযোগ্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধীরবুদ্ধির, সুপারিশে অবিচল, অনুরোধ প্রত্যাখ্যানে দৃঢ়চিত্ত। নীতিনিয়ম মেনে চলা তাঁর স্বভাব, আবার সুশাসনে ন্যায্য প্রজাহিতৈষণায় তিনি উৎসর্গিত প্রাণ, রাষ্ট্রে সরকারি দায়িত্ব ও কর্তব্য এমন সুনিপুণভাবে তিনি পালন করেন যে তাতে আমজনতা তুষ্ট, বিরোধ-বিবাদের প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যারা জেতে তারা তৃপ্ত, যারা হারে তারাও নিরপেক্ষতায় প্রবোধ পায়। আর তাঁর কর্ম-আচরণের তারিফ শুনে নাগরিকরা হৃষ্ট ও তাঁর তারিফে মুখর। এতগুলো গুণ-গৌরব-গর্ব নিয়ে তাঁরা সমাজে পা-পা বাঁচিয়ে চলতে জেনেছেন বলেই তাঁরা সমাজের আস্থাভাজন শ্রদ্ধেয় সুজন ও সজ্জন। বিনা আহবানে তাঁরা রাষ্ট্রের, সরকারের, দেশের, আমজনতার গণমানবের সেবায় স্বার্থরক্ষায় উপচিকীর্ষা নিয়ে এগিয়ে আসেন না। সরকারে ও রাষ্ট্রে সঙ্কট-সমস্যা দেখা দিলেই কেবল এসব শ্রেষ্ঠ দক্ষ সজ্জন লোকের ডাক পড়ে এবং তাঁরা সাহায্য-সহায়তাদানে রাষ্ট্রকে, সরকারকে ও দেশের সর্বস্তরের নাগরিকদের সঙ্কট-সমস্যামুক্ত করতে দ্বিধা করেন না। এ আত্মসেবী নিরীহ নাগরিকের নিরপেক্ষতা দোষ না গুণ?

তাঁরা সজ্জন, সুজন, দক্ষ, প্রশাসক, বিদ্বান-বুদ্ধিমান যুক্তিঋদ্ধ সুনিপুণ কর্মকুশল ব্যক্তি বলে পরিচিত স্ব-স্ব পেশার, চাকরির তথা জীবিকাক্ষেত্রে। কারো কখনো সাতে-পাঁচে আপদে-বিপদে না থেকে স্বকর্মে, দায়িত্বে ও কর্তব্যে নিষ্ঠ থেকেই তাঁরা সুনাম অর্জন করেছেন সেনানীরূপে, আমলারূপে, আইনজ্ঞরূপে, শিক্ষকরূপে, সাংবাদিকরূপে অথবা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার কারখানার সওদাগররূপে। এভাবেই তাঁরা নিরীহ নিরপেক্ষ সজ্জন সুজনরূপে শহুরে শিক্ষিতদের অর্থ-বাণিজ্য-রাজনীতি নিয়ন্ত্রকদের আস্থাভাজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছেন। অতএব নিরীহ নিরপেক্ষের সংজ্ঞা ও সংজ্ঞার্থ হল কারো সুখে-দুঃখে, বিপদ-আপদে, আনন্দে-বেদনায় নিজেকে না জড়ানো, আত্মকল্যাণে, আত্মস্বার্থে, আত্মরক্ষায় ও আত্মবিস্তারে নিজেকে নিয়োজিত রাখা, কারো সাতে-পাঁচে না থাকা, কারো নিন্দায়-তারিফে যোগ না দেয়া, ভালো-মন্দ-মাঝারি কিংবা দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতী প্রভৃতি কোনো ধনিক-বণিক-মস্তান-গুণ্ডা-খুনীর, বিদ্বানের, বুদ্ধিজীবীর, আমলার সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য না করা, সবার সঙ্গে সবিনয়, সহৃদয় সমিষ্ট ভাষায় কথা বলা, মন ভাঙে, চটে এমনভাবে কোনো পেশারই শক্তিমান প্রভাবশালী লোকের সঙ্গে কথা না বলা, কাজ না করা প্রভৃতিই হচ্ছে নিরীহ নিরপেক্ষ দক্ষ সর্বজনের আস্থাভাজন ব্যক্তির লাক্ষণিক রূপ, এমনি পরমন যোগানো, পরহৃদয় গলানো, পর প্রশংসা কুড়ানো কর্ম-কথা-আচরণই হচ্ছে নিরীহতার ও নিরপেক্ষতার, অফিসে-আদালতে-দফতরে-ব্যবসায়ে যোগ্যতার, নৈপুণ্যের, সততার ও সুজনতার সাক্ষ্য ও প্রমাণ। এবং এভাবেই তাঁরা জীবনে ও জীবিকা ক্ষেত্রে স্ব-স্ব পেশায় সুনাম ও গণশ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। পদ ও পদবী লাভে আত্মোন্নয়নে স্বসমাজে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন, তাঁদের গুণ-গৌরব ছড়িয়েছে দেশে। বাস্তবে যাঁরা নিরীহ-নিরপেক্ষ গুণীজ্ঞানী যোগ্য দক্ষ শাসক পরিচালক ব্যক্তি বলে গণ্য হচ্ছেন এবং হন, তাঁরা নিজের ও পরিবারের স্বার্থেই আত্মনিয়োগ ও আত্মোৎসর্গ করেন। পদে পদবীতে অর্থে বিত্তে বেসাতে মানে খ্যাতিতে ক্ষমতায় দর্পে দাপটে প্রভাবে প্রতিপত্তিতে সপরিবার স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। তাই তাঁরা কোনো ঝামেলায় যান না, নির্বিঘ্ন লাভে- লোভে স্বার্থে গা বাঁচিয়ে দশজনের মন যুগিয়ে মানরক্ষা করে শংসিত হয়ে জীবনযাপন করতে চান। মিত্রতা তাঁদের কাম্য নয়, বাঞ্ছিত হচ্ছে শক্তিমানের প্রসন্ন দৃষ্টি এবং শত্রুসৃষ্টিতে তাঁরা অনীহ বরং সে-অবস্থায় ক্ষতিস্বীকারে সম্মত। তাঁরা বাস্তবে স্বার্থপর, পরার্থপর নন। আমরা যাঁদের মধ্যে নিরীহতা ও নিরপেক্ষতা খুঁজি এবং পাই, তাঁরা আসলে কারা? যিনি ঘরোয়া বৈঠকে বা আড্ডায়ও রাজনীতি আলোচনা করেন না, রাজনীতির গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে মত-মন্তব্য-সিদ্ধান্ত কখনো পরিব্যক্ত করেন না, তিনিই রাজনীতিতে সরকার পরিচালনায় যোগ্য বিবেচিত হন, সেনানী বা বিচারপতি বলেই রাষ্ট্রনায়ক হবার যোগ্য, রাষ্ট্র বা সরকার পরিচালনায় দক্ষ বলে স্বীকৃত হন। নির্বাচন কমিশনার হওয়ার কিংবা তদন্ত কমিশনের নেতৃত্ব করার জন্যে তাঁরাই গণআস্থাভাজন বলে সর্বজনীন ধারণা। অথচ আমরা উকিল থেকেই বিচারপতি হতে দেখি এবং আমরা অনেক বিচারপতিকে রাজনীতিক ও সরকারি মন্ত্রী রূপে দেখেছি, আমাদের দেখা-শোনা-জানার কিংবা অভিজ্ঞতার ও ধারণার স্মৃতি রোমন্থন করলেও অনন্য-অসামান্য কিছু পাই না, দোষেগুণে মনে-মগজে-মননে-মনীষায় অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেও মনে হয়নি কখনো কোথাও। যিনি অরণ্য-পর্বত-সমুদ্র দেখেনইনি, তিনি বনজ, খনিজ, কৃষিজ, জলজ সম্পদ রক্ষার, বৃদ্ধির ও পণ্যরূপে দেশে-বিদেশে বাজার বিস্তারের দায়িত্ব পান। শিক্ষকমাত্রই কি শিক্ষাবিদ, শিক্ষানীতিআদর্শ বিশেষজ্ঞ? ব্যবসায়ী হলেই কি দৈশিক, বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশেষজ্ঞ হন? সেনানী মাত্রই কি সরকার পরিচালনায় অভিজ্ঞ ও নিপুণ হন? অতএব, প্রশ্ন জাগে নিরীহ নিরপেক্ষ হওয়া কি গুণ? যাঁরা বা যিনি দেশের মানুষের, গণমানবের, আমজনতার প্রতি জোর-জুলুমের প্রতিকার লক্ষ্যে প্রতিবাদ করলেন না, প্রতিরোধে এগিয়ে এলেন না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকারের কোনো ভুল সিদ্ধান্তের পরিণাম কথায় বা লেখায় পরিব্যক্ত করে সংশোধনের বা পরিহারের পরামর্শ দিলেন না, কোনো আকালে গণমানবের সাহায্যে এগিয়ে এলেন না, কোনো মারীর কালে কিংবা ঝড়-বন্যা-খরা কবলিত মানুষের দুঃখ মোচনের জন্যে মগজী বুদ্ধিও জনগণকে বা সরকারকে যোগালেন না, তিনি বা তাঁরাই হলেন ভয়-ভক্তি-ভরসা-আস্থার আকর, তাঁরাই নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক-অভিভাবক পরিচালক সরকারের কর্ণধার, উপদেষ্টা বা কর্তৃপক্ষ হবেন। তাঁদের নিরপেক্ষ নজরদারিতে, খবরদারিতে, তদারকিতে, কর্তৃত্বে ও সুপরিকল্পিত পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হবে নির্ভেজাল, নির্বিরোধ, সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ সুশৃঙ্খল সংসদীয় নির্বাচন। তারপর তো শুরু হবে সংখ্যাগুরু দলের শাসন এবং যা তৃতীয় বিশ্বে হয় স্বেচ্ছাচারীর লুটেরার বঞ্চনার দলনের দুঃশাসন।

আমরা সাহিত্যে দেখি সৎ মানুষ কেবল বিবাগী-বিরাগী-সাধু-সন্ত-সন্ন্যাসী-শ্রমণ-ভিক্ষুক-ফকির-দরবেশ-ব্রহ্মচারীতে মেলে। গৃহীমাত্রই দুষ্ট-দুর্জন-দূর্বৃত্ত-দুষ্কৃতী যেন। একালে আমাদের নিরীহ নিরপেক্ষ সজ্জন সুজন মেলে রাজনীতি ক্ষেত্রে কেবল বড় পদ-পদবীর বিত্তবেসাত ঋদ্ধ আত্মরতিপরায়ণ স্বার্থনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরই মধ্যে।

আমরা জানি তৃতীয় বিশ্বে নামে গণতন্ত্র হলেও ভোটতন্ত্রের মাধ্যমে কিংবা জঙ্গীনায়কের জবরদখলের মাধ্যমে কার্যত স্বৈর-স্বেচ্ছাচারীর জোর-জুলুমের, লুণ্ঠনের, ক্ষমতার অপব্যবহারের, আইনের অপপ্রয়োগের, দলনের, দমনের, বঞ্চনার, প্রতারণার শাসনই চলে। আমাদের বাঙলাদেশেও ভোটতান্ত্রিক স্বৈর- স্বেচ্ছাচারী লুটেরার শাসনই চলে থাকে। বিগত উনচল্লিশ বছর ধরে তা-ই দেখছি জঙ্গী-অজঙ্গী শাসন নির্বিশেষে। সাংসদ-মন্ত্রীর জনহিতৈষণায় সজ্জনতায় সুজনতায় যখন আমাদের আস্থা নেই, লুটেরা বেপরওয়া বিবেকহীন ক্ষমতালিপ্সু ক্ষমতার অপপ্রয়োগপ্রবণ সাংসদ-মন্ত্রীর নির্ভেজাল সভেজাল নির্বাচনে আমজনতার, গণমানবের লাভ-ক্ষতি কি? উঠতি কিন্তু রাজনীতিক সংস্কৃতিচেতনা ও প্রশিক্ষণ রিক্ত বুর্জোয়ার নির্বাচন, শাসন প্রভৃতির সঙ্গে গণমানবের শোষণমুক্তির কিংবা সমাজের বাঞ্ছিত পরিবর্তনের কোনো পরোক্ষ প্রত্যাশার আভাস-আশ্বাস থাকে না। কেবল রাজনীতিক প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর স্বার্থই নিহিত থাকে। আমজনতার এ ব্যবস্থায় সহায়তা, সমর্থন ও উল্লাস লজ্জার কারণ ও সমকালীন দেশের কালের চাহিদার চেতনারিক্ততারই সাক্ষ্য-প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়।

অথচ নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারে উপদেষ্টা হবেন যাঁরা তাঁরা সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতেই পারবেন না। এটি প্রথম ও প্রধান শর্ত, তাহলে আমলা হিসেবে যাঁরা সৎ এবং বিদ্বান-বুদ্ধিমান দক্ষ অভিজ্ঞ প্রশাসক কিংবা সচিব ছিলেন, তাঁদের নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন কি অযৌক্তিক? একজন ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মানসম্পন্ন ব্যক্তি কি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে পক্ষপাতিত্ব করে আত্মসম্মান বর্জন করেন বিবেকের বাধা অতিক্রম করে?

যাঁরা চিরকাল দেশপ্রেমী, মানবসেবী হিসেবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক অঙ্গনে জীবন কাটাচ্ছেন, যাঁরা শাসিত-শোষিত পীড়িত দলিত বঞ্চিত প্রতারিত গণমানবের মুক্তিলক্ষ্যে রাজনীতিক আন্দোলন করেন, এমন কি ক্ষমতার গদি দখলের জন্যে গণতন্ত্রের নামে ভোটতান্ত্রিক বুর্জোয়া রাজনীতি করেন, তাঁদের মধ্যে গান্ধী-জিন্নাহ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জওহরের মগজ-মনীষা-ব্যক্তিত্বের লোক অলভ্য হলেও কি গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় নির্ভরযোগ্য সৎ রাজনীতিক কি সত্যই দুর্লভ? দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন বিবেকবান আত্মসত্তার মূল্য মর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো ন্যায়বুদ্ধি চ্যুত হয়ে আত্মঅবমাননা করে না, তেমন মানুষের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা না রাখলে সংসার বা সরকার চলবে না।

মর্ত্যজীবন বিনোদন চায়

মানুষের ব্যক্তিক, পারিবারিক কিংবা সামাজিক জীবনে যে বিনোদন অন্ন-বস্ত্রের মতোই আবশ্যিক ও জরুরী, তা পৃথিবীর কোনো শাস্ত্রই স্বীকার করে না সরাসরি। সব শাস্ত্রেই সুর করে ভজনের, উপাসনার, স্তবের-স্তুতির প্রশস্তির ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু তাতে বিনোদন হয় না, ভয়-ভক্তি-ভরসাই প্রকাশ পায় মাত্র। বৈষ্ণবেরা গানের-বাজনার-নাচের মাধ্যমে সাধন ভজন করে বটে, কিন্তু তা-ও তাদের পক্ষে বিনোদন নয়, ঈশ্বর-ঈশ্বরীর তথা রাধা-কৃষ্ণের ভজনমাত্র, তাতে হৃদয়নিঃসৃত ভক্তির সুগভীর অভিব্যক্তি থাকে, প্রণয়-গীতির মাধুর্য বা হাস্যরস থাকে না। অবশ্য অবৈষ্ণব রাধা-কৃষ্ণ পদ মানবিক প্রণয়গীতিরূপে উপভোগ করতে পারে এবং করেও, তবু তাও এক সরু-সঙ্কীর্ণ পরিসরে এককভাবের পুনরাবৃত্তির দরুন রসগ্রহণে বৈচিত্র্যহীনতার বাধা থেকেই যায়- 'রাধা ছাড়া সাধা নেই / কানু ছাড়া গীত নেই'। এ তত্ত্ব ও তথ্য প্রণয়রসগ্রহণে বিঘ্ন ঘটায়।

শাস্ত্রিক পালা-পার্বণ উৎসব বটে, তবে তা নিছক নিরুদ্দিষ্ট নির্লক্ষ্য বিনোদন-উৎসব নয়, তা পুণ্যার্জনলক্ষ্যে নিবেদিত পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশেষ, তাতে মুক্ত চিন্তা-চেতনার কিংবা যথেষ্ট আচরণের অধিকার থাকে না কারো।

বিনোদন লক্ষ্যে নাচ-গান-বাদ্যের শাস্ত্রিক সম্মতি ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রেও নেই। দেবতার তৃপ্তি, তুষ্টি ও হৃষ্টি সাধনের জন্যে দেবদাসীর কিংবা কোনো পূজকের নাচ-গান-বাজনার ব্যবস্থা থাকেই-থাকতই। তার সঙ্গে নাচ-গান-বাজনা-নাট্যের রঙ্গালয়-রঙ্গমঞ্চের বা নাট্যমঞ্চের লক্ষ্য ও আদর্শগত পার্থক্য ও ব্যবধান হচ্ছে দুই মেরুর কিংবা আসমান-জমিনের।

বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রেও নাচ-গান-বাজনা নিষিদ্ধ, যেমন নিষিদ্ধ সেমেটিক নবীদের শাস্ত্রে। 'নচ্চ গীত বাদিত বিসূক দর্শনা বেরমনি শিক্ষাপদম্-' এ হচ্ছে শিক্ষাপদের একটি।

এ সূত্রে আমাদের মনে পড়ে সুকুমার রায়ের রামগড়ুরের ছানার কথা। হাসতে মানা, ঠাট্টা করতে মানা, রঙ্গ-রসমূলক রসিকতা করতে মানা। ধার্মিক হতে হলেই গুরু-গম্ভীর চেহারা করার সাধনা করতে হয়। এখানেই শেষ নয়, শাস্ত্রী-মোল্লা-পুরোত-পাদরী-ভিক্ষু-শ্রমণ-রাব্বী হতে হলে চলনে বলনে আচারে আচরণে পোশাকে আহারে সর্বক্ষণ সযত্ন সতর্ক প্রয়াসে গাম্ভীর্য ও নীতিরীতি প্রথাপদ্ধতি মেনে, বজায় রেখে চলতে হয়। এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যতিক্রম ঘটলে ব্যক্তিবিশেষকে আর ধার্মিক বলে স্বীকার করা হয় না। এবং মোল্লা-পুরোত-পাদরী-ভিক্ষু-শ্রমণ-রাব্বীর মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখা গেলে তাকে সমাজে ঘৃণ্য, ধিক্কৃত ও পতিত রূপে চিহ্নিত করা হয়। এ জন্যেই সাধু-সন্ত, ফকির-দরবেশ, সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী, নিষ্ঠাবান মোল্লা-পুরোত-ভিক্ষু-শ্রমণ-পাদরী-রাব্বীকেই আদর্শ ও অভিপ্রেত সজ্জন বলেই সংজ্ঞার্থে গ্রহণ করা হয় এবং তাঁরাই আমজনতার আস্থাভাজন পুণ্যাত্মা অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধ বলে স্বীকৃতি পান, তাঁরাই সুখী সংসারী মানুষের আপদে-বিপদে, রোগে-শোকে বল-ভরসার অবলম্বন বাস্তবজীবনে ও সাহিত্যে, তাই তাঁদের ভূমিকা সর্বত্রই নন্দিত। গৃহী-সংসারী মানুষের সততায় ও পরার্থপরতায় আস্থা রাখে না মানুষ। সাহিত্যে তাই লোকনন্দিত ও লোকবন্দিত মানুষ হচ্ছেন সন্ত-সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-ভিক্ষু-শ্রমণ-পাদরী-রাব্বী-ফকির-দরবেশ প্রভৃতি বিবাগী ও বৈরাগী মানুষই।

আগেই বলেছি সুরে-সঙ্গীতে মধুরকণ্ঠে স্তব-স্তুতি-প্রশস্তি-ভজনা-উপাসনার ও বিলাপের রীতি সুপ্রাচীন বটে, কিন্তু তা কেবল উপাস্যের, ইষ্টদেবতার কিংবা অপদেবতার কৃপাপ্রাপ্তির, রোষমুক্তির অথবা অন্তরের ভগবৎ প্রেমের, ভক্তির আকুতি প্রকাশের বা আকুল ব্যাকুল হয়ে জীবনের নিয়ন্তাশক্তির কাছে আত্ম নিবেদনেই থাকে সীমিত।

আমরা মানি যে মর্ত্যজীবনের সার্থক-অসার্থক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের ও ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগের পরিণামে-পরিণতিতেই স্বর্গে কিংবা নরকে বাস করতে হয়, মোক্ষ নির্বাণ মেলে বা ভবযন্ত্রণা ভোগের জন্যে জন্মান্তর ঘটে। মানুষের পারত্রিক জীবনে অনন্ত সুখপ্রীতি কিংবা চিরন্তন দহনভীতি মানুষকে মর্ত্যজীবনের প্রাধান্য ও গুরুত্বচেতনা অস্বীকারে প্ররোচিত করে। তাই তারা প্রবৃত্তির, ভোগবৃত্তির নিবৃত্তির ও অবদমনের দেশনায় গুরুত্ব দেয়। ফলে নিশ্চিত মৃত্যুভীতি এবং অনুমতি আত্মার অমরত্ব ও তার মৃত্যু-উত্তর সুখ-শান্তির কাল্পনিক ধারণা তাকে জীবনের আনন্দ-আরাম সুখ-শান্তি ভোগ-উপভোগ সম্ভাবনা প্রভৃতির কাঙ্ক্ষাপূর্তি প্রয়াসের চেয়ে মৃত্যুর পরেরকার পারলৌকিক অশেষ যন্ত্রণার আশঙ্কায় কাবু রাখে। এভাবে বাস্তব জীবনের ভোগ-উপভোগ হয় নিন্দিত আর সংযম অবদমন ও নিবৃত্তি নন্দিত তথা জীবন হয় তুচ্ছ, মিথ্যা, মৃত্যু পায় প্রাধান্য ও হয় সত্য। জীবন আছে বলেই দলবদ্ধ জীবন বিরোধ-বিবাদহীন করার ও রাখার লক্ষ্যে সম ও সহস্বার্থে, পরমত-পরকর্ম-পরআচরণ সহিষ্ণুতায় শ্রম ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিনিময়ে সহযোগিতায় সম্প্রীতিতে নিরাপদে নিরুপদ্রবে সহাবস্থানের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্যে নীতিনিয়ম রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি তথা বিধি-নিষেধ অবশ্যই মেনে চলতে হয়। এ নিয়মগুলোর লঙ্ঘন ও উপেক্ষা নিরোধকল্পেই জ্ঞানী-গুণী-যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতা ঋদ্ধ শ্রদ্ধেয় জনগণের স্বীকৃতি আস্থাভাজন প্রতাপে প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সমাজপতি, সর্দার, মাতব্বর ব্যক্তিরা স্থানিক ও কালিক প্রয়োজনে নানা লৌকিক, অলীক অদৃশ্য অরি-মিত্র নিয়ন্তাশক্তির অস্তিত্বে, সার্বক্ষণিক ও সার্বত্রিক স্থিতিতে এবং নজরদারি-খবরদারি-তদারকিতে বিশ্বাসের বীজ মানুষের শৈশবে বা কৈশোরে প্রজন্মক্রমে বপনের মুখে মুখে কানে কানে ব্যবস্থা রেখে যৌথজীবনে সামাজিক-শৃঙ্খলা রক্ষায় সফল হয়েছেন। এই স্থানিক লৌকিক অলীক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার সমষ্টিক সামূহিক ও সামগ্রিক নাম হচ্ছে শাস্ত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌথজীবনে বিরোধ-বিবাদের কণ্টক কমানোর জন্যে পরিকল্পিত অদৃশ্য স্থানিক কালিক লৌকিক অলৌকিক অলীক বিশ্বাস সংস্কার-ধারণাই পেল পরিণামে প্রাধান্য। জীবন হল গৌণ, মৃত্যুর পরেরকার জীবন হল অনন্ত বলেই সত্য। জীবনের সুখ-শান্তি-আনন্দ-আরামের, ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগের কাঙ্ক্ষা মর্ত্যজীবনকেন্দ্রী না হয়ে হয়ে উঠল মর্ত্যজীবনের কল্পজগৎ ভিত্তিক। বিড়ম্বনা আর কাকে বলে!

শাস্ত্রমানা আস্তিকের জীবনে এভাবে 'বিনোদন' হল বর্জনীয়। ভূতে-ভগবানে বিশ্বাস-ভক্তি ও ভয় রেখে সর্বক্ষণ ভগবানে অনুরাগ, তার অভিপ্রায়ের ও আদেশের অনুগামিতা ও তাঁর প্রতি আনুগত্যই হচ্ছে শাস্ত্রমানা আস্তিকের জাগ্রত মুহূর্তগুলোতে প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। ভোগবিমুখতা, নাচে-গানে-বাজনায়- খেলায়-ঠাট্টায়-হাসিতে-তামাশায় অনীহাই হচ্ছে শাস্ত্রানুগত্য ও ধার্মিকতা। মর্ত্যলোক আছে বলেই, প্রাণিজগৎ আছে বলেই, মানুষ দলবদ্ধ, যুথবদ্ধ, সমাজবদ্ধ জীবনযাপন করে বলেই, মর্ত্যজীবনে সহযোগিতায় নির্বিরোধ জীবনযাপন করার, করানোর লক্ষ্যেই নিবৃত্তিতে, সংযমে ও অবদমনে এতো গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই বাস্তবজীবনের অতিপ্রয়োজনীয় অপরিহার্য ও জরুরী বিনোদন নিষিদ্ধ হয়েছে অধিকাংশ শাস্ত্রে। এভাবে জীবন হল যন্ত্র ও যন্ত্রণাস্বরূপ। এ অস্বাভাবিক শাস্ত্রিক নিষেধ-দ্বেষণা মেনে চলা কোনো শাস্ত্রপন্থীর পক্ষেই সম্ভব হয়নি জীবনের জৈব ও জাগতিক দাবিবিরোধী বলেই। শাস্ত্রের নিষেধ লঙ্ঘন ও উপেক্ষা করেছে সবকালেই সকলেই এবং শাস্ত্রেরও তাই জন্মমৃত্যু ঘটে কালে কালে দেশে দেশে প্রজন্মে প্রজন্মে।

মর্ত্যজীবনের প্রাবৃত্তিক ও প্রাকৃতিক চাহিদা বিরোধী কোনো বিধি-নিষেধ টেকে না। মক্কা-মদিনায় শাস্ত্রে অননুমোদিত সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। এমনকি গ্রীক নাটকও প্রথম যুগে অনূদিত হয়নি। কিন্তু অন্যত্র সাহিত্য-দর্শনচর্চা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি, ইসলাম বহির্ভূত সূফীতত্ত্ব অঙ্গীকার করে গান-বাজনা এবং মানুষের ও ঈশ্বরের প্রেমের রূপক জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রেমকাহিনীরূপে অনেক প্রণয়কাহিনী রচিত হয়েছে ইরাকে-ইরানে-মধ্য এশিয়ায়-ভারতে ও অন্যত্র।

মানুষের মনে-মর্মে-মগজে যে-সব জিজ্ঞাসা জাগে, যে-ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ স্পৃহা উদ্ভূত হয়, লাভে লোভে স্বার্থে ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগের যে কাঙ্ক্ষা-তৃষ্ণা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, সেসবের পূর্তি সন্ধানে ও বাঞ্ছাপূরণে মানুষ যদি সর্বপ্রকার মানসিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, নৈতিক, আদর্শিক, শাস্ত্রিক বাধাবিঘ্ন মুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে মুক্ত মন-মগজ-মনীষা প্রয়োগে বুদ্ধি-যুক্তি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতা-বিবেক সমর্থিত জীবনপন্থাপদ্ধতি গ্রহণ-বরণ করে, তাহলে তা অপ্রতিরোধ্য হবেই। এ মানুষই মানুষের সংস্কৃতি-সভ্যতার স্রষ্টা ও সংরক্ষক। শাস্ত্রনিষ্ঠ ধার্মিক মানুষ কখনো মুক্তবুদ্ধি প্রয়োগে সমর্থ নয় বলে তারা সৃষ্টিশীল নয়, পৃথিবীতে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য-মহিমা বয়ানেও বাকজাল মায়াজালে পরিণত করে অযৌক্তিক, অবৌদ্ধিক ও অসঙ্গত অসমঞ্জসভাবে। স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্যই হচ্ছে এর জটাজটিল বৈশিষ্ট্য।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মর্ত্যজীবনকে তুচ্ছ বলে জানা, পঞ্চইন্দ্রিয়ের চাহিদাকে প্রাবৃত্তিক ও প্রাকৃতিক অসংযম অনাচার পাপাচার বলে মানা, জীবনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দ-আরামকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইন্দ্রিয়জসুখ ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগকে পরিহার্য ও অহিতকর ভাবা সর্বাগ্রেই এবং সর্বাত্মকভাবেই মর্ত্যজীবনকে অস্বীকার করার নামান্তর মাত্র। মর্ত্যজীবন বাস্তব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আর পারলৌকিক জীবন মগজী আন্দাজ-অনুমান-কল্পনাপ্রসূত। তাই এ সম্বন্ধে কোনো কালেই কোনো প্রজম্মেই কোনো স্থানেই কোনো অভিন্নমত গড়ে ওঠেনি। একই কারণে কোনো দুই শাস্ত্রিক জাতির ঈশ্বরচিন্তা-চেতনায়, ঈশ্বরের রূপে-গুণে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে সামান্য সাদৃশ্য থাকলেও অভিন্নতা নেই, আছে মেরুর ব্যবধান ও আসমান-জমিনের পার্থক্য। কারো ঈশ্বর সাকার, কারো ঈশ্বর নিরাকার, কারো ঈশ্বর একাধিক, কেউ দ্বৈতবাদী, কেউ অদ্বৈতবাদী, কেউ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, কেউ বা বিশিষ্ট, কেউ বা অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদী এবং গোড়া থেকেই লোকায়তিক, আজীবিক, চার্বাক ও বৌদ্ধরা নিরীশ্বর নাস্তিক। স্বর্গের-নরকের পরলোকের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। মর্ত্যজীবন যে বাস্তব, জাগতিক জীবনের যে চাহিদা আছে এবং তা যে পূরণ করতেই হয় এ সম্বন্ধে কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই। অন্য সব অদৃশ্য অপ্রমাণিত, অদেখা জগৎ-জীবন নিয়ন্ত্রক শক্তি আন্দাজ-অনুমান-কল্পনাপ্রসূন বলে সন্দেহ করলে কেউ, সেই সন্দেহ নিরসনের, সে-প্রকার জিজ্ঞাসার বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগে উত্তর দান আজ অবধি সম্ভব হয়নি।

লোকায়তিক, সংখ্যা, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, চার্বাক, আজীবিক এমনকি উমর খৈয়ামের রুবাইতে পরিব্যক্ত জিজ্ঞাসার ও অন্বেষার অবসান ঘটার মতো আজো কোনো সত্য আবিষ্কৃত হয়নি, বরং স্পিনোজা, কোঁতে, মিল, সার্ত্রে প্রমুখ দার্শনিকের নিরীশ্বরবাদ এবং হকিং প্রমুখ বিজ্ঞানীর নিরীশ্বরতত্ত্ব আস্তিক গণমানবের মনে একালে নানা সন্দেহ সংশয় জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা জাগাচ্ছে মাত্র। শাস্ত্রানুমোদিত না হলেও জীবনে বিনোদন আবশ্যিক জেনেই সমাজধিকৃত পন্থায় ভাঙে, গাঁজায়, চরসে, মদে, কোকেনে, হেরোইনে, রতিরমণে, জুয়ায় মানুষ বিলাসী জীবনযাপন করে। শাস্ত্রে নিষিদ্ধ পন্থায় নাচে-গানে-বাজনায়-নাটকে-উপন্যাসে-কবিতায়-ক্রীড়ায়-তামাশায় বিচিত্রভাবে জীবনরস আহরণ করে। অতএব, জীবনে বিনোদন ব্যবস্থা চাই-ই এবং তা পূরণ করছে চলচ্চিত্র, ক্যাসেট, রেডিয়ো-টিভি যোগে ডিস অ্যান্টেনা প্রভৃতি। উমর খৈয়ামিভাষায় বলা চলে, যেহেতু এ মর্ত্যজীবন বাস্তব ও সত্য, তাই 'নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাক। আর সববুলি মিছা, শুনহ গোপনে একটি কথা সত্যসার। যেফুল নিশীথে পড়িছে ঝরিয়া সে নাহি কখন ফুটিবে আর।' এ তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে এবং যৌক্তিক-বৌদ্ধিক বিবেকী জীবনে আস্থাবান লোকের সংখ্যা এ কালের পৃথিবীতে কম নয়, বেশিই। মর্ত্যজীবনকে তুচ্ছ জানা সোনা ফেলে আঁচলে গিরো দেয়ার নামান্তর মাত্র। বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে হাওয়াই সত্যে আস্থা রাখা, পারত্রিক জীবনের সুখবাঞ্ছায় ঐহিকসুখবিমুখ থাকা আত্মপ্রবঞ্চনারই শামিল। কারণ বিনোদন ও বিলাসবাঞ্ছাও নতুন চিন্তা-চেতনার, আবিষ্কারের উদ্ভাবনের সৃষ্টির প্রণোদনা দান করে। ঘটায় চোখের দৃষ্টির, সুরুচির, সৌন্দর্যবুদ্ধির মগজীশক্তির ও চিত্তবৃত্তির বিকাশ ও উৎকর্ষ। রক্ষণশীল গোঁড়া শাস্ত্রনিষ্ঠ লোকেরা অর্থাৎ যাঁরা আক্ষরিক অর্থেই শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ মেনে চলেন সেসব অর্থোডকসরা কখনো স্বাধীনভাবে মুক্তবুদ্ধি প্রয়োগে নিজেদের শাস্ত্রনিরপেক্ষ জীবনচেতনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও জগৎভাবনা কখনো কলাশিল্পচিত্রে, ভাস্কর্যে, গানে, নাচে, বাদ্যে, সুরে, তালে, মুদ্রায়, কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে, দর্শনে পরিব্যক্ত করতে পারেন না- পাপভীতির দরুন। এভাবেই আমরা বৌদ্ধ-জৈন প্রভৃতির কোনো অর্থোডকসের, মৌলবাদীর হাতে চৌষট্টিকলার কোনো শাখাতেই কোনো অবদানের সন্ধান পাইনে। এঁদের দেহ-প্রাণ-মন-মগজ-মনন-মনীষা কখনো সেক্যুলার আবহাওয়া পায় না।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয়ই জাতীয় জীবনে সর্বপ্রকার বিকৃতির কারণ

১৯৪৭ সন থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে, জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে হামলা শুরু হয়। স্বাধীনতার অহঙ্কারে কিংবা ব্রিটিশদ্বেষণার ফলে হঠাৎ ইংরেজি পাঠ্যসূচির মান নিম্নমুখী করে দেয়া হল। প্রায় সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যই নবম-দশম শ্রেণীর তথা প্রবেশিকা পরীক্ষার যোগ্য পাঠ্য বলে বিবেচিত হল। আবার স্বাধীনতার হাওয়া গায়ে লাগল বলেই হয়তো বিজ্ঞান নামে সর্বপ্রকার বিজ্ঞান চর্চায় শিক্ষার মান বিচিত্র ও উন্নত করার চেষ্টা করা হল। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ আমলেই চারের দশক থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে দেয়া শুরু হয়েছিল। তবু দুটো পত্রে দু'শ নম্বরের উঁচুমানের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদান সযত্ন প্রয়াসে ও গুরুত্বে অব্যাহত রাখা হয়েছিল এবং কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক সর্বপ্রকার বিষয় ইংরেজী মাধ্যমেই লেখানো, পড়ানো ও বলানো হত। ফলে সেই ইংরেজিতেই আইসিএস, পিসিএস, ডাক্তারি, ওকালতি, ব্যারিস্টারী, প্রকৌশল, বিজ্ঞান অর্জন ও আয়ত্ত করা সম্ভব ও সহজ হত।

ছয়ের দশকে তৃণমূল পর্যায়ে ভোট যোগাড়ের মুৎসুদ্দি নিয়োগের প্রয়োজনে আকস্মিকভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকারি চাকুরে করে দেয়া হল, সাব ডেপুটির পদ বিলুপ্ত করে সবাইকে বানানো হল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। অথচ প্রাথমিক স্কুল বানানোর কোনো প্রয়োজন স্বীকার করা হল না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাল থাকে তো বেড়া থাকে না, থাকে না বেঞ্চ, বোর্ড আর পড়ার-পড়ানোর কোনো নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা সময়। তবু কালিক প্রয়োজনে সাক্ষরতার ও শিক্ষার প্রসার ঘটেছে গোটা দেশব্যাপী। কেবল প্রত্যাশিত ও প্রয়োজনীয় গুণের, মাপের, মানের ও মাত্রার শিক্ষা পায়নি শিক্ষার্থীরা। ক্ষতি হল গাঢ় গভীর এবং ব্যাপক। জাতীয় জীবনে উৎকর্ষ না এসে নৈতিক আদর্শিক চারিত্রিক বিকৃতি বিপর্যয় অবক্ষয় এল এভাবেই এবং তা দিনে দিনে বছরে বছরে বাড়তেই থাকল।

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈনাশিক নীতি গৃহীত হল সেদিনই, যেদিন স্বাধীনতার গৌরব-গর্বীরা বাঙলাকে উচ্চ শিক্ষার-কলেজীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা দান-গ্রহণের, পরীক্ষা দান-গ্রহণের মাধ্যম রূপে চালু করে দিলেন। আমাদের সর্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হল প্রতীচ্যজগৎ, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই আমরা সেই জ্ঞান-স্তন্য পান করে বিদ্বান হতাম, আধুনিক মনের-মগজের-মননের-মনীষার মানুষ হতাম, হতাম ব্যবহারিক ও প্রাত্যহিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনে সমকালীন আচারের আচরণের জীবনযাপন পদ্ধতির মানুষ। গ্রামীণ নিরক্ষর দুস্থ দরিদ্র মানুষের সন্তানদের জন্যে নয় শুধু, নিম্নবিত্তের, নিম্নবৃত্তির, নিম্নআয়ের মানুষের জন্যেও সন্তানদের চাকরির যোগ্য হওয়ার মতো প্রয়োজনীয় শিক্ষাগ্রহণের বিদ্যালয় রইল না গাঁয়ে-গঞ্জে শহরে বন্দরে। বুদ্ধিমান ধনিক-বণিকরা কখনো কিন্তু নিজেদের সন্তানদের বাঙলা মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার কথা কল্পনাও করেনি, তারা দেশে-বিদেশে নানাভাবে বহু অর্থ ব্যয়ে ক্যাডেট স্কুলে-কলেজে, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়িয়েছে, A/O লেভেলে ব্রিটিশ-মার্কিন পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ও গ্রহণের ব্যবস্থা রেখেছে। এমনি স্বার্থপরতা, স্বজাতিবিদ্বেষণা ও অমানবিক অবিবেচনার তুলনা মেলে না। আরো এক ক্ষতি করলেন রাজনীতিক দলগুলো। জনকল্যাণে জনপ্রিয় হয়ে ভোট যোগাড় লক্ষ্যে অসংখ্য স্কুল-কলেজ দরিদ্র সরকারের পক্ষে সাধ্যতীত জেনেও সরকারি করা হল, অথচ প্রয়োজনীয় সংখ্যায় বইপত্র, যন্ত্রপাতি, শিক্ষক দিয়ে পড়া-পড়ানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা দেখা গেল না।

রাজনীতিক দলের 'ছাত্র-যুব' উপদল আবশ্যিক ও জরুরি বলে অনুভব-উপলব্ধি করে মস্তান-খুনী সৃষ্টির প্রতিযোগিতায় নামল রাজনীতিক দলগুলো আত্মপ্রসারের আত্মপ্রাবল্যের গরজে।

ফলে আজ স্কুলে-কলেজে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে বিশুদ্ধ সাধারণ ইংরেজী ভাষা-জানা লোক বিরল হয়ে উঠেছে। নতুন করে ইংরেজি শিক্ষাদানের গুরুত্ব স্বীকার করা হলেও শিক্ষকের অভাবে তা বাঞ্ছিত স্তরে উন্নীত করা দুঃসাধ্য থাকবে আরো অনেকদিন। বুদ্ধিমান সচ্ছল অভিভাবকরা নাকি ৬০/৭০/৮০ হাজার শিক্ষার্থী ভারতের নানা স্কুলে-কলেজে বহু অর্থ ব্যয়ে পাঠিয়েছে সুশিক্ষা গ্রহণের জন্যে। এতে কোটি কোটি টাকা বিদেশে চিরকালের জন্যে চলে যাচ্ছে, দেশ দরিদ্র হচ্ছে। বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত এসব নাগরিক বাস্তব কারণেই হবে স্বার্থপর, দেশপ্রেম তাদের মধ্যে সুলভ হবে না। যদিও উদারতা হয়তো মাপে মাত্রায় বাড়বে। এমনিতেই আমাদের ধনিক-বণিকদের দেশপ্রীতি নেই; তারা ধন ও সন্তান লন্ডনে-মার্কিন মুলুকে-কানাডায়-অস্ট্রেলিয়ায় চিরকালের জন্যেই পাঠিয়ে দিচ্ছে। ধানমন্ডিতে-গুলশানে-বনানীতে দেখা যাচ্ছে এমনি মা-বাবার মৃত্যুর পরেই সন্তানরা বাড়িভিটে বেচে দিচ্ছে আর গৃহনির্মাণ ব্যবসায়ীরা তাতে ছয়তলা ফ্ল্যাট করে বিক্রয় করছে মোটা মুনাফায়।

এদিকে বাঙলায় ও নকল প্রশ্নোত্তরে পাস মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক-স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সনদধারীরা যথার্থ বিদ্যার অভাবে প্রতিযোগিতায় যাচাইয়ে বাছাইয়ে ঝরে যাচ্ছে, চাকরি পাচ্ছে না, বেকার থাকছে, খাওয়া-পরার গরজেই, বেঁচে থাকার আগ্রহেই মায়ে তাড়ানো, বাপে খেদানো এসব তরুণ-তরুণীরা বখাটে হয়ে যাচ্ছে, কেউ নরহত্যায়, কেউ ছিনতাই পেশায়, কেউ প্রতারণা বৃত্তিতে, কেউ কেউ ব্যর্থ জীবন বিনাশের জন্যে পিতৃধনে নেশারু হচ্ছে।

এখন পরিস্থিতি সহ্যের ও আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, তাই আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জোর দাবি উঠেছে সর্বত্র। মস্তান-গুণ্ডা-খুনী আলাদাভাবে নির্মূল করা যাবে না। কারণ এদের উৎপাদনের কারখানা হচ্ছে স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে (১) ইংরেজী ভাষাবিহীন শিক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা, (২) প্রশ্নোত্তরে বাঙলা মাধ্যম শিক্ষাদান-গ্রহণ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরীক্ষাদান-গ্রহণ, কেননা এতে বিদ্যার্জন হয় না, বাছাবাছি করে কটি প্রশ্নের উত্তর না বুঝে জেনে নিলেই চলে, (৩) নকল করার করানোর প্রবণতা, (৪) রাজনীতিক দলের ছাত্র-যুবা মুৎসুদ্দি কর্মীর সার্বক্ষণিক নির্ভরতা ও ব্যবহার।

আইন-শৃঙ্খলা প্রবর্তন সময়-সাপেক্ষ, শিক্ষাক্ষেত্রে সুষ্ঠু শিক্ষাদান-গ্রহণেও সময়-সাপেক্ষ প্রতিষেধক হচ্ছে– (১) স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, হলে, হোস্টেলে, ছাত্র পরিষদ প্রভৃতির বিলুপ্তি, (২) উচ্চ মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর স্তর অবধি ইংরেজিকে লেখার, পড়ার, বলার ও পরীক্ষা দানের মাধ্যম করা কারণ ইংরেজিই বিদ্যার বাহন, (৩) ব্রিটিশ আমলের মতো গুরুত্ব দিয়ে উঁচুমানের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য প্রবেশিকাস্তরে গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো। এতেই দেশের, মানুষের নৈতিক আদর্শিক চারিত্রিক গুণ-মান-মাপ-মাত্রা বাড়বে। সাক্ষরতায় মানুষ হবে না, এখনই পাঁচ বছর অবধি শিশু ও নারী বাদ দিলে দেশে সাক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত লোক শতে সত্তর জনেরও উপরে রয়েছে। প্রকৃত শিক্ষায় নৈতিকমানের জাতি গড়ে উঠবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উজান স্রোতে কিছু আষাঢ়ে চিন্তা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

AMARBOI.COM

তিনমাস ব্যাপী আমার সেবার ও
চিকিৎসা ব্যবস্থার সার্বক্ষণিক সানন্দ ও
সাগ্রহ দায়িত্ব পালনের স্মারক রূপে বউমা
ইসমৎআরা কাজলের নামই এ গ্রন্থে
অঙ্কিত রাখলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচুর মতো কেউ ধম্ম ছাড়েনি

কোলকাতায় একটা গল্প শুনেছিলাম, এর লিখিত রূপও আছে এক বইতে সম্ভবত। গল্পটা এই– নিরক্ষর দরিদ্র পাঁচু যিশুর চেলা হয়েছিল উনিশ শতকে। সে সময়ে দুই শ্রেণীর লোক খ্রীস্টান হত। এক নমঃশূদ্র শ্রেণীর তথা অস্পৃশ্য নিঃস্ব, নিরন্ন লোকেরা পাদ্রীর বদৌলত আর্থিক সাচ্ছল্য লাভের জন্যে স্বধর্ম ত্যাগ করত, এদের মধ্যে নিম্নবর্ণের, নিম্নবিত্তের, তুচ্ছপেশার বিভিন্ন শ্রেণীর স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, বিভিন্ন শূদ্রশ্রেণীর লোক ছিল। আর এক শ্রেণীর লোক যারা ইংরেজি শিখে বা ইংরেজের বা ইংরেজ কোম্পানির চাকরি করে নানা দোষে সমাজে পতিত হচ্ছিল, তারাও খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করত। অবশ্য এদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য এবং এরা উচ্চবর্ণের ও উচ্চবৃত্তির লোক।

পাঁচুর গল্পে ফিরে আসি। পাঁচু এক রোববারে গীর্জায় যায়নি। পরদিন পাদ্রী রাস্তায় পাঁচুর দেখা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পাঁচু কালতো তুমি গীর্জাতে যাওনি।' পাঁচু উত্তর দিল, 'হুজুর কাল যে কালীপুজো ছিল'। আঁৎকে উঠে পাদ্রী বললেন, 'পাঁচু তুমি না যিশুর চেলা', পাঁচু পাদ্রীর মুখের উপরে বলে ফেলল, 'হুজুর যিশুর চেলা হয়েছি বলে কি ধম্ম ছেড়েছি?' কোন তত্ত্ব বোঝানোর জন্যে এই গল্প তৈরি হয়েছে জানি না, কিন্তু আমাদের চোখে পাঁচুর এই উত্তর আক্ষরিক অর্থে নিখাদ, নিখুঁত একটি সুষ্ঠু সত্য ভাষণ। কেননা আমরা সবাই ঘরে সংসারে আজো কেউ পাঁচুর মতো ঈশ্বরপ্রোক্ত শাস্ত্রের অনুসারী হয়েও সত্যিকার অর্থে ভয়, ভক্তি, ভরসা নির্ভর অসহায় প্রাণী হিসেবে মানসিকভাবে আদি ও আদিমকালের ভয়-ভরসার অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির আওতামুক্ত হতে পারিনি। ঐ অদৃশ্য শক্তিই বাস্তবে কার্যত আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। প্যাগান যুগের ভয় বিস্ময় ও কল্পনাজাত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা থেকে আমরা আজও মুক্ত নই, যদিও বা আমরা শাস্ত্রমানা জ্ঞান, বুদ্ধি, যুক্তিপ্রবণ মানুষ হিসেবে নিজেদের দাবি করি।

যেমন গোটা পৃথিবীব্যাপী মানুষ ঘরে ঘরে সর্বপ্রাণবাদের, জাদুবিশ্বাসের, টোটেম-ট্যাবু ধারণার আর গ্রহ-নক্ষত্র জাত শুভাশুভ, তিথি, ক্ষণ, লগ্ন, নিয়তি প্রভৃতি আজো অসত্য অবৈজ্ঞানিক আর কাল্পনিক জেনেও আমাদের জীবনে এগুলোর কাল্পনিক প্রভাব স্বীকার করি। জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র অভিন্ন নয়। ঈশ্বরপ্রোক্ত শাস্ত্র মেনেও আমরা জ্যোতিষ গণনায়, হস্তরেখা পরীক্ষায়, সামুদ্রিক গণনায় ভাবী জীবনের সুখ-দুঃখ নিরূপণে আস্থা রাখি। আজো সকাল-সন্ধ্যা, দিবা-রাত্র, শনি-মঙ্গলবার, বিশেষ মাস প্রভৃতির শুভ কিংবা অশুভ প্রভাব ভয় কিংবা বল-ভরসা জোগায়। আমরা শিক্ষিত লোকেরা Rationalism, Liberalism, Science এবং অশেষ মগজী শক্তিতে আস্থা রাখি বটে আলোচনা-সমালোচনায় ও তর্কে-বিতর্কে। কিন্তু বাস্তবে আশৈশব আবাল্য শ্রুত, দৃষ্ট ও লব্ধ বিশ্বাস, সংস্কার, ধারণা আচার-আচরণ, অনুষ্ঠান প্রভৃতির প্রভাবে বাস্তব দৈনন্দিন জীবনে কার্যত আবেগচালিত হই। যুক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিজ্ঞান, বিবেক বর্জন করে ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজন্ম লালিত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাবশে অসঙ্গত অসামঞ্জস্য স্ববিরোধী অনেক ভাব চিন্তা কর্ম আচরণ আবেগ চালিত হয়ে করেই থাকি ঘরে বাইরে। যেমন অনেকে বিশ্বাস করে যে নওয়াব সিরাজুদ্দৌলাহ্‌র বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করেছিল তাদের সবারই অপমৃত্যু ঘটেছিল। তেমনি আমরা অনেককে দৃঢ় প্রত্যয়ে বলতে শুনেছি যে পাকিস্তান ভাঙনের দরুন অভিশপ্ত হয়েই ভুট্টো, ইন্দিরা ও মুজিব নিহত হয়েছেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনাচরণ হচ্ছে স্ববিরোধিতার এবং বৈপরীত্যের সমষ্টি। ফলে আমাদের মনের মগজের মননের মনীষার যা কিছু ফসল তা সামষ্টিক, সামূহিক ও সামগ্রিকভাবে এক অসঙ্গত জীবনযাত্রারই আলেখ্য হয়ে ওঠে মাত্র। একারণেই আমাদের পারিবারিক সামাজিক সাংস্কৃতিক আচারিক রাজনীতিক শৈল্পিক সাহিত্যিক এমন কি নৈতিক আদর্শিক এবং দার্শনিক জীবনে থেকে যায় এক প্রকার ফাঁকির ফাঁক ও সুপ্রকট অসঙ্গতি। কাজেই আমরা সবাই পাঁচু, কেউ ধর্ম ছাড়িনি। ফলে আজো আমরা সংকীর্ণতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ পরিহার করে যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবন অঙ্গীকার করে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাত, জন্ম, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, পেশা, যোগ্যতা, মেধা নির্বিশেষে মানুষের মিলন-ময়দান তৈরি করতে পারিনি। আমাদের পাঁচুর মতো ধর্মনিষ্ঠ থাকলে চলবে না। আমাদের যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবন অঙ্গীকার করতে হবে। আমাদের 'Free thinkers' হতে হবে। মুক্তবুদ্ধির, যুক্তির ও বিবেকানুগত্যের অনুশীলন করতে হবে। নইলে আমরা জাত, জন্ম, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, অঞ্চল ও অভিজ্ঞতার, বিজ্ঞতার, দক্ষতার, নিপুণতার স্বাতন্ত্র্যে উন্নাসিক কিংবা অবজ্ঞেয় থাকব। থাকব ইহুদি, খ্রীস্টান, মুসলিম, হিন্দু, জৈন প্রভৃতি, কখনো নির্ভেজাল, নির্বিশেষণ মানুষ হব না, আজ কেবল মানুষ নামের পরিচিতিতেই আমাদের প্রয়োজন মানবিক বহু সমস্যা-সংকটের সমাধানের জন্যে।

AMARBOI.COM

মিথ্যা মাত্রই কি পরিহার্য?

মানুষ চিরকাল সৎ সত্যবাদী সামাজিক ও লৌকিক নিয়ম-নীতি মানা আদর্শবাদী মানুষকে আদর্শ নারী বা পুরুষ রূপে জানে ও মানে। তাদের কথায় মিথ্যা মাত্রই পরিহার্য এবং মিথ্যাবাদী মাত্রই চরিত্রহীন, ঘৃণ্য ও নিন্দিত ব্যক্তি। আসলে কি মিথ্যা মাত্রই ঘৃণ্য ও পরিহার্য? যেমন লোকে বলে আপনি আচরি ধর্ম, পরেরে শেখাবে। যেমন হযরত মুহম্মদ সম্বন্ধে কাহিনী রয়েছে। একবার এক মহিলা তাঁর অতি মিষ্টি-খেকো বালককে নিয়ে রসুলের কাছে আসেন, ওকে বেশি মিষ্টি খেতে বারণ করানোর জন্যে। তখন রসুলেরও মিষ্টি প্রিয় খাদ্য ছিল। সেই জন্যে রসুল ঐ মহিলাকে ছেলে নিয়ে এক সপ্তাহ পরে আসার জন্যে নির্দেশ দিলেন। তিনি মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করলেন কিংবা কমিয়ে দিলেন। পরে যখন ঐ মহিলা ছেলে নিয়ে এলেন, তখন তিনি ছেলেকে বললেন বেশি মিষ্টি খাওয়া ভালো নয়। তুমি তোমার মায়ের কথা মতো মিষ্টি কমই খাবে। এ গল্পে সৎলোকের আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাবে, এ নীতি কথার প্রতিফলন রয়েছে। কারণ যেমন সিগারেট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোর কোনো ধূমপায়ীকে যদি সিগারেট খেতে নিষেধ করে সে মুখের উপরই জবাব দেবে, ধূমপান যদি মন্দই হয় তবে তুমি ছাড়ছ না কেন? এ তো গেল সৎচরিত্রের ও সত্যভাষণের একদিক।

ইংরেজীতে White Lie বা নির্দোষ মিথ্যা বা হিতকর মিথ্যা বলে একটা কথা আছে, যেমন একজন মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ তার ঢাকায় শিক্ষার্থী ছেলেকে দেখতে চায়। এদিকে ইতোমধ্যে সেই ছেলে পুলিশের গুলিতে নিহত। মুমূর্ষু রোগীকে সন্তান নিহত হয়েছে খবর দেওয়া যায় না। হিতৈষীরা তাই বৃদ্ধকে বলে 'ছেলের এখন পরীক্ষা চলছে, তাই এখন আসতে পারছে না। পরীক্ষা শেষ হলেই আপনাকে দেখতে আসবে।' এ ধরনের মিথ্যা বলা কি অপরাধ? এ পাপের কি শাস্তি হবে? আরও একটা দৃষ্টান্ত দিই– এক মহিলার বারবার কন্যা সন্তান হয়। সে কারণে স্বামীর হাতে সে নির্যাতিত হয়। শেষবারও তার কন্যা সন্তান হল। তার নিজেরও শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। হৃদরোগে তার মৃত্যুর আশঙ্কা, যদি ডাক্তার বলে যে 'না, এবার তোমার ছেলেই হয়েছে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।' তা হলে কি ডাক্তারকে প্রতারণার দায়ে শাস্তি ভোগ করতে হবে? মিথ্যা ভাষণের পাপ কি তাকে স্পর্শ করবে?

আমরা জানি কোনো কোনো ছাত্র-ছাত্রী অত্যন্ত আবেগপ্রবণ, আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন হয়। প্রতি বছরই আমরা শুনতে পাই নকলে ধরা পড়ে কিংবা পরীক্ষায় ফেল করে কেউ কেউ আত্মহত্যা করে। এমনি আশঙ্কায় কোনো দরদী নজরদার কিংবা পরীক্ষক কারো সুপারিশে নকলকারীকে বহিষ্কার না করেন কিংবা পরীক্ষক কিছু নম্বর বাড়িয়ে পাস করিয়ে দেন নিতান্ত মানবিক ও বিবেকী বিবেচনায়, একে কি দুর্নীতি বলে নিন্দা করব, না করুণা বলে প্রশংসা করব?

লা মিজারেবল-এর নায়ক জাঁ ভালজাঁ গিরজায় আশ্রিত থেকে পরে যখন গিরজার মূল্যবান বাতিদান নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে স্থানীয় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। পুলিশ জানত সে বাতিদান গিরজার। তাই পুলিশ তাকে গিরজার পাদরীর কাছে নিয়ে চলল। পাদরী পুলিশ-ধৃত জাঁ ভালজাঁকে দেখেই তক্ষণাৎ তার মুক্তির জন্যে বুদ্ধি করে দ্বিতীয় বাতিদানটাও হাতে করে এগিয়ে এলেন। পুলিশ কিছু বলার আগেই চোরকে লক্ষ্য করে পাদরী বললেন, 'This too is meant for you.' পুলিশও নিশ্চয়ই বোকা ছিল না, তবু চোরকে ছেড়ে চলে গেল। পাদরীর এ কি ছলনা, চাতুরী, বা সুকৌশল মিথ্যা ভাষণ! পাদরীর চুরিকে প্রশ্রয় আর চোরকে মুক্ত করার জন্যে কি পাপ স্পর্শ করবে, এ কি শাস্তিযোগ্য অপরাধ! কর্কট রোগীর কাছে রোগের নাম গোপন করা কি ডাক্তারের কাছে অনৈতিক কর্ম? অথবা একটা দরিদ্র শিক্ষার্থীর পিতা পরীক্ষার ফি পাঠাতে যথা সময়ে ব্যর্থ হওয়ায় জীবনের বিপর্যয় এড়ানোর জন্যে যদি ছাত্রটির কাল-পরশু টাকা এলে শোধ দেবে জেনে বুঝে এই মিথ্যা ভাষণে টাকা ধার করা কি নৈতিক অপরাধ? কেননা দীর্ঘ মেয়াদে সাধারণত কেউ কাউকে টাকা ধার দেয় না। তাহলে মিথ্যারও মহিমা আছে। মিথ্যাতেও মানবিক গুণের প্রকাশ ঘটে। মিথ্যা ভাষণ জীবনে কখনো কখনো শ্রেয়সের ও কল্যাণের বাহক হয়। বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থেও আত্মরক্ষার জন্যে, প্রাণ বাঁচানোর জন্যে, পর উপকারের জন্যে মিথ্যা ভাষণ ঐশ্বরিক অনুমোদন পেয়েছে। মিথ্যা যদি ঘৃণা, ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিতার্থ করার জন্যে বলা হয় তা হলে তা নিশ্চয়ই অত্যন্ত ঘৃণ্য, অমানবিক এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ঘরে সংসারে পরিজনদের মধ্যে নানা বিষয়ে বিরোধ-বিবাদ এড়ানোর জন্যে এবং শিশুদের নানা আবদার ও বায়না সুকৌশলে এড়ানোর লক্ষ্যে সর্বক্ষণ ছোটখাটো মিথ্যা বলেই থাকি বা বলতে বাধ্য হই, যেমন– শিশু সঙ্গে যেতে চায় বাজারে কিংবা অফিসে, তাকে বলতেই হয় 'রিকশা নিয়ে আসছি।' এই রকম ফাঁকির আশ্রয় না নিলে বাস্তবে পারিবারিক বা সামাজিক জীবন কি চলে! এতে বোঝা যায়, কেবল সন্ত, সন্ন্যাসী, শ্রমণ, শ্রাবক, ব্রহ্মচারী, দরবেশ প্রভৃতি বিবাগী ও বিরাগী লোকেরাই কেবল সমাজবিচ্যুত নিঃসঙ্গ জীবনে তথাকথিত সৎ ও সত্যবাদী থাকে ও থাকতে পারে। অন্যদের জীবনে পানি মেশানো দুধ কিংবা দুধ মেশানো পানি সাদার ও জল রংয়ের বদৌলত দুধ ও পানি নামে অভিহিত হয় মাত্র। কিন্তু খাঁটি দুধ বা পানি হয় না। তেমনি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ঘরে বাইরে হাটে বাজারে মাঠে ঘাটে দফতরে আদালতে মানুষের সঙ্গে লেনদেনে আত্মরক্ষার ও স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে দেদার, অঢেল ও অজস্র বানানো কথার, কারণের ও যুক্তির আশ্রয় নিতেই হয়। নইলে হাজারো দায়-দায়িত্বের বিপন্ন জীবনে সমাজে তাল রেখে মান রেখে এবং স্বার্থ বজায় রেখে চলা দুঃসাধ্য বা অসাধ্য হয়ে ওঠে। এমনকি সরকার, রাজনীতিক দল প্রভৃতিও ডাহা মিথ্যা উচ্চারণ করে জনগণকে শাসনে শায়েস্তা ও অনুগত রাখে। সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণভাবে যা ঘটে তা গোপন রাখা হয় এবং বানানো তথ্য সত্যরূপে প্রচার করা হয়। কাজেই সোনা যেমন খাদ ছাড়া কাজে লাগানো যায় না, তেমনি মিথ্যার ভেজাল না মেশালে সংসারজীবন চলে না। বিশেষত অপরাধ গোপন ও অস্বীকার করা মানুষের প্রাণীসুলভ স্বভাব। তাছাড়াও সবাই জর্জ ওয়াশিংটনের বাবার মতো নয় যে, কেউ অপরাধ স্বীকার করলে তাকে ক্ষমা ও পুরস্কৃত করবে। সুতরাং বাস্তবে সদা সত্য কথা বলবে, এ নীতি বাক্যের প্রচার ও প্রয়োগ অবাস্তব ও ক্ষতিকর।

লোকে বলে বটে সত্যের জয়, মিথ্যের লয় অবশ্যম্ভাবী। "Truth shall prevail"। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাই মুসা, ঈসা, কৃষ্ণ, মহাবীর, গৌতম প্রমুখ যেসব ঈশ্বরভক্ত সত্য প্রচার করেছেন পৃথিবীব্যাপী, তাও সব মানুষের সত্য বলে গ্রাহ্য হয়নি। শুধু রাজশক্তির সমর্থন পেয়ে সেই সত্যগুলো অসংখ্য দল ও উপদল নামের নতুন নতুন সাম্প্রদায়িক দ্বেষণার ও স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করেছে মাত্র। কাজেই এই মুহূর্ত পর্যন্ত কোনো বিশ্বজনীন সত্য; সর্বজন গ্রাহ্য হয়ে চিরন্তন সত্যরূপে পৃথিবীতে কোথাও স্বীকৃত হয়নি। কাজেই সত্য কি এবং কোথায়?

সত্য কি আপেক্ষিক না নিরপেক্ষ? সত্য কি সব সময়ে সবার পক্ষে কল্যাণকর? সত্য কি নিরূপ কিছু? সত্যের প্রভাবই বা কি? সত্যই যদি মানুষের প্রিয় হবে, তা হলে আদিম ও আদিকাল থেকে মানুষ মিথ্যাবিনাশী সত্য প্রচারে এতো আগ্রহী কেন? সত্যবাদী নারী-পুরুষই বা শ্রদ্ধেয় কেন, মহৎ কেন? আমরা দেখতে পাই শোক সভায় ও সংবর্ধনা সভায় বক্তারা সৌজন্যবশে দেদার মিথ্যা ভাষণে মুখর হয়ে ওঠে। কারণ তখন তারা 'দোষ হর, গুণ ধর' নীতির পক্ষপাতী হয়। মানুষ মাত্রই দোষের ও গুণের আধার। কেবল দোষের বা গুণের মান-মাপ-মাত্রার পার্থক্য থাকে মাত্র। কাজেই শোক ও সংবর্ধনা সভায় নির্জলা স্তাবকতা কি কাপট্য বা মিথ্যা ভাষণ নয়? আমরা কি এর নিন্দা করি কখনো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসে যারা শাহ-সামন্ত-দিগ্বিজয়ী বীর রূপে বা সুশাসক রূপে অথবা মহৎ গুণের অধিকারী হিসেবে নন্দিত, তারা কার্যত কি পরস্ব হরণকারী, লোকহন্তা, শক্তিমত্ত, ক্ষমতাপ্রিয়, হিংস্র দস্যু প্রকৃতির নয়? পৃথিবীর কোনো কেতাবেই এদের পররাজ্য গ্রাস এবং সৈনিক নামের হন্তা দিয়ে হনন, দহন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন প্রভৃতিকে পাপ বলে, অন্যায় বলে, নিন্দা করা হয়নি। তার মানে "King can do no wrong" অর্থাৎ শক্তিমানের জোর-জুলুমই ন্যায়। তার স্বেচ্ছাচারিতাই সুবিচার ও সুশাসন। এই সূত্রে উল্লেখ্য পুরোনো কালে বহু অন্যায়কেই শাস্ত্র-সম্মত ও ন্যায়-সঙ্গত বলে প্রচার চালিয়ে জনগণের দ্বারা স্বীকার করিয়ে নেওয়া হয়েছে। যেমন রামের শূদ্রক হত্যা, সীতা বর্জন, শ্রীকৃষ্ণের সুকৌশলে জরাবন্ধ, জয়দ্রথ হত্যা এবং অশ্বত্থমা হত-ইতি-গজ কিংবা আত্মহত্যায় ভীষ্মকে প্রবর্তনা দান এ যুগে যৌক্তিক, বৌদ্ধিক ন্যায় সঙ্গত নয়, অবশ্য নিন্দিত রাজনীতিসম্মত বলে কিছুটা স্বীকার করা যায়। কারণ "There is nothing unfair in Love and war"

অতএব "সত্যের জয়, মিথ্যার ক্ষয়" সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী এই তত্ত্বে তথ্য ও সত্য নেই। একটা অবাস্তব, ভুল ধারণা চালু রয়েছে মাত্র। আসলে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তারের সমন্বয়ে যেমন বিদ্যুতের উদ্ভব, তেমন সত্যের ও মিথ্যার সমন্বয়েই জীবনের সাফল্য, সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎকর্ষ এবং সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রগতি ও প্রাগ্রসরতা নির্ভরশীল। আমাদের ধারণায় শতে ৬০ ভাগ সত্যনিষ্ঠা ও ৪০ ভাগ বা তার চেয়েও কম মিথ্যার মিশ্রণ মোটামুটিভাবে বাঞ্ছিত মাত্রায় সমাজ স্বাস্থ্যরক্ষা করে। অতএব মিথ্যা ঘৃণ্য ও নিন্দিত হলেও জীবনে অকেজো নয়, পরিহার্যও নয় বাস্তবে সচল জীবনে।

আসলে সত্য-মিথ্যার নিয়ামক, নিরূপক ও বিচারক হচ্ছে ব্যক্তির বিবেক। বিবেকানুগত ব্যক্তি জ্ঞাতসারে জ্ঞান, বুদ্ধি, যুক্তি ও প্রজ্ঞা বিবর্জিত কোনো মতে, কাজে কিংবা সিদ্ধান্তে নিজেকে জড়িত করে না। একটা পুরোনো দৃষ্টান্ত দিই। একবার কিছু লোক হাতেনাতে ধরা-পড়া এক জন ব্যভিচারীকে যিশুর কাছে নিয়ে আসেন বিচারের ও শাস্তি দানের জন্যে। সব শুনে যিশু বললেন "শাস্তি যে এর প্রাপ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু শাস্তি দেবার যোগ্য একমাত্র সেই ব্যক্তি যার চিন্তা-চেতনায় রূপতৃষ্ণা বশে পরনারীর প্রতি কামভাব জাগেনি।" যিশুর এ কথা শুনে কেউ আর শাস্তি দানে অগ্রসর হল না। কেননা কারুরই নিজের অজানা পাপ নেই। লোকটাকে শাস্তি দেয়ার লোক মিলল না।

কাজেই সত্য ও মিথ্যা আপেক্ষিক তত্ত্ব মাত্র। একে সরলীকরণ করা যায় না জীবনে ও সমাজে কোনো ক্ষেত্রেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মর্ত্যজীবনের দুঃখ-বিপদ কি জীবনবিরোধী উপসর্গ?

দুঃখেরে আমি ডরিব না আর
কন্টক হউক কণ্ঠের হার
জানি তুমি মোরে করিবে অমল
যতই অনলে দহিবে।

অথবা

মাঝে মাঝে ভাবি আজ নষ্ট হলো দিন নষ্ট হলো বেলা
নষ্ট হয় নাই প্রভু সেই সব ক্ষণ আপনি নিয়াছ তুমি
করিয়া বরণ।

কিংবা

যে নদী মরু পথে হারাইয়াছে ধারা
জানি তবু সে হয়নিকো হারা।

এই সব গাঢ়-জ্ঞানি হে গভীর অনুভব প্রসূন যতই তাৎপর্যপূর্ণ হউক না কেন ভাববাদীর এই সব তত্ত্ব তথ্য ও সত্য উপলব্ধি সাধারণ মানুষের বাস্তব মর্ত্যজীবনের কোনো ক্ষেত্রেই অন্তরে বাইরে কোনো উপকারে আসে না। এগুলো পড়তে লিখতে এবং আত্মপ্রবোধ পেতে ক্ষণপ্রভাব চমক মেলে বটে কিন্তু রূঢ় বাস্তবে ভাববাদের কোনো ঠাঁই নেই। নেই কোনো প্রয়োজন বা উপযোগ।

AMARBOI.COM

তবে কবি যখন বলেন,

এই করেছো ভালো নিঠুর,
এই করেছো ভালো
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো

কেননা,

আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছু নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছু আলো।

এর মধ্যে কিন্তু মর্ত্যজীবনের সর্বজন স্বীকৃত, অনুভূত ও উপলব্ধ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য পরিব্যক্ত হয়েছে। কেননা আমরা সহজে বুঝতে পারি দুঃখ আছে বলেই সুখ কাম্য, ক্ষতি আছে বলেই লাভের জন্যে প্রযত্ন। শত্রু আছে বলেই মিত্রের প্রয়োজন। বিদ্যুতের ধনাত্মক ঋণাত্মক তারের দ্বান্দ্বিক সহাবস্থানের ফলেই যেমন তড়িৎ-এর উদ্ভব, তেমনি সুখ-দুঃখের, লাভ-ক্ষতির, আনন্দ-বেদনার, মিলন-বিচ্ছেদের, মিত্রতা-শত্রুতার সার্বক্ষণিক আশঙ্কা ও সম্ভাবনা সঙ্কুল মর্ত্যজীবন তাই ভাব-চিন্তা-প্রয়াস-প্রযত্ন-সাফল্য লক্ষ্যে মানুষকে জাগ্রত মুহূর্তগুলোতে উদ্যমে, অঙ্গীকারে, উদ্যোগে ও আয়োজনে প্রেরণা, প্রণোদনা ও প্রবর্তনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দান করে। না হলে শুধু মানুষ নয় অন্য প্রাণীদেরও নিশ্চিন্ততায়, নিষ্ক্রিয়তায়, নিরাশায় ও নিরুদ্যমে জীবনের জাগ্রত মুহূর্তগুলো যাপন করা অসহ্য যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়াত। বস্তুত অভাব বোধ থেকে কাঙ্ক্ষার জন্ম। এবং কাঙ্ক্ষাপূর্তির প্রয়োজনে ও প্রেরণায় মানুষ শ্রম ও সময় জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তি প্রজ্ঞা অভিজ্ঞতা ও কৌশল প্রয়োগে উদ্যমশীল ও উদ্যোগী, আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন লক্ষ্যেই জীবনের জাগ্রত মুহূর্তগুলো কাজে লাগায়। কিন্তু কোনো প্রাণীই নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে পারে না। তার স্বপ্রজাতির সঙ্গীবিহীন জীবন যাপন সম্ভব হয় না। আমরা শিশুর এই প্রবৃত্তি দেখতে পাই, সেও সঙ্গী খোঁজে সমবয়সী জীবনকে সানন্দ অনুভব করার জন্যে। নিঃসঙ্গতায় যেমন জীবন কাটে না, তেমনি সঙ্গীর সঙ্গেও মনের মতের লাভের লোভের স্বার্থের সর্বক্ষেত্রে মিল থাকে না। ফলে ঐ সঙ্গীর সঙ্গেও সহাবস্থান করতে হয় কখনও সহযোগিতায়, কখনও বা বিরোধিতায়, কখনও প্রতিযোগিতায়, কখনও বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। কাজেই বিরোধে-বিবাদে, দ্বন্দ্বে-মিলনে, শত্রুতায়-মিত্রতায়, জয়ে-পরাজয়ে, লাভে-ক্ষতিতে, হারে-জিতে লাভ-ক্ষতি সঙ্কুল ও দ্বন্দ্ব-বহুল জীবনেই বিচিত্র অনুভবে, অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে বিপরীত রসের অনুভবে ও আস্বাদনে জীবন হয় বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চিত ভাণ্ডার। আমাদের স্থূল চেতনার মধ্যে দ্বান্দ্বিক জীবনের এই গুরুত্ব ধরা পড়ে না। তাই আমরা প্রকৃতিসৃষ্ট ভূ-কম্প, ঝড়, বন্যা, খরা, মহামারী প্রভৃতি যেমন অনভিপ্রেত বলে এড়িয়ে চলতে চাই, তেমনি গোষ্ঠীবদ্ধ গৌত্রিক সামাজিক রাষ্ট্রিক এবং জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিরোধ-বিবাদ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ সংঘাত প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ-উপসর্গ-উপদ্রব এড়িয়ে কেবলই লাগাতার সুখ শান্তি আনন্দ আরাম প্রেম মিলন প্রভৃতি রূপ নিরুপদ্রব নিরাপদ নির্বিঘ্ন একটানা স্বর্গ সুখ ভোগ-উপভোগ ও সম্ভোগ করতে চাই, যা বাস্তবে অবশ্যই অসম্ভব। তাছাড়া আগেই বলেছি নিরুপদ্রব নিরাপদ নিষ্ক্রিয়, নিশ্চিন্ত, নির্ভাবনার জীবন যে মনে-মগজে-মননে-অনুভবে-উপলব্ধিতে একটা শূন্যতার নিস্তরঙ্গ জীবন এবং সেই জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণার হওয়ারই কথা, তা আমরা ভাববার ও বুঝবার চেষ্টা করি না। আমরা আনন্দ ও উল্লাস অনুভব করি মাঝে মধ্যে জীবনে তা সার্বক্ষণিক ও সুলভ নয় বলেই। দুঃখের বিপদের বেদনার অভিঘাত আছে বলেই এবং সর্বক্ষণ তা অসতর্কতায় আসন্ন ও আপন্ন হয়ে ওঠে বলেই জীবন এমন মধুর এবং মানুষ সুখের শান্তির প্রীতির-ভালবাসার এমন আকুল প্রত্যাশী ও কাঙ্ক্ষী। অতএব আমাদের ধারণা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের-আরামের নিষ্ক্রিয়তার, নিরুদ্যমের নিরোগের নিরুপদ্রব ও নিরাপদ জীবন মর্ত্যজীবনের আকর্ষণ নষ্টই করে দিত। বৈচিত্র্যহীন, স্বর্গসুখের মতোই হয়ে উঠত অনুভূতিহীন সুখ, বেদনার বিপরীতে আনন্দ, বিচ্ছেদের বিপরীতে সংযোগ, বিরহের বিপরীতে মিলন, শত্রুতার বিপরীতে মিত্রতা, হীনম্মন্যতার বিপরীতে উত্তম্মন্যতা, রোগের বিপরীতে শারীর সুস্থতা, অনিদ্রার বিপরীতে নিদ্রা, আমাদের জাগ্রত জীবনকে প্রয়াসে, প্রযত্নে, উদ্যমে, উদ্যোগে, কাঙ্ক্ষায় আলোড়িত রাখে জাগ্রত মুহূর্তগুলোতে। আমাদের স্থূল চেতনায় কাম্য না হলেও চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেকার এই বাধাবিঘ্ন আমাদের মর্ত্যজীবনকে এমন আর্কষণীয় করে রাখে তাই আমরা আশা-নিরাশা প্রভৃতিকে সহ্য ও উপেক্ষা করেও "মরিতে চাহি না আমরা সুন্দর ভুবনে", রুগ্ন পঙ্গু দেহেও যন্ত্রণাগ্রস্ত দেহেও বাঁচতে চাই। অতএব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মর্ত্যজীবনে দুঃখ, বিপদ, যন্ত্রণা, বিরোধ-বিবাদ, জীবন উপভোগে আবশ্যিক ঋণাত্মক শক্তি। একে অবাঞ্ছিত বলা চলে না। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামই হচ্ছে জীবনপ্রেরণা ও জীবনানন্দ। অনুকূল ও প্রতিকূল প্রতিবেশে জীবনের চড়াই-উৎরাই জন্ম-জীবন-মৃত্যু পরিসরে অতিক্রম করাই-করার প্রস্তুতি ও সাহসই মর্ত্যজীবনের সামষ্টিক সামূহিক ও সামগ্রিক রূপ। আসলে ঘৃণা, অবজ্ঞা, ঈর্ষা, অসূয়া, হিংসা, প্রতিহিংসা বিবাদ-বিরোধ, স্নেহ-মমতা, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, ত্যাগ-তিতিক্ষা-কৃপা-করুণা, দায়-দাক্ষিণ্য, মৈত্রী প্রভৃতির দ্বান্দ্বিক-অনুভূতি প্রভৃতির নিত্যকার দ্বান্দ্বিক রসায়নই হচ্ছে প্রকৃত জীবনাভূতি। তাই পুনরাবৃত্ত করে বলতে হয় এই ঋণাত্মক বৃত্তি-প্রবৃত্তির এবং নিবৃত্তির নিরাসক্তির দ্বান্দ্বিক অনুভূতির সমষ্টিই হচ্ছে জীবন। কাজের ফাঁকে ছুটি বেশ উপভোগ্য। কিন্তু অভাবগ্রস্ত অলস বেকারের লাগাতার নিরানন্দ অবসর জীবন দুঃসহ যন্ত্রণার নামান্তর মাত্র। তেমনি নির্বিঘ্ন, নিরুপদ্রব সুখ-শান্তি-স্বস্তির জীবনানুভূতিও একঘেয়ে হয়ে যায়।

মানবিক শক্তিই বল-ভরসার আকর

AMARBOI.COM

প্রাণী মাত্রই বুদ্ধিকে পুঁজি ও পাথেয় করে জীবন যাপন করে। আর বুদ্ধি মাত্রই স্থূল বা সূক্ষ্ম যুক্তিযোগে প্রযুক্ত হয়। বুদ্ধিমত্তা অনৈতিক অন্যায় অপকর্মে প্রযুক্ত হলে তাকে বলে ধূর্ততা। অতএব বুদ্ধির ও ধূর্ততার উৎস অভিন্ন। কিন্তু প্রয়োগ ভিন্ন মাত্র। আবার প্রাণী মাত্রই অনুকূল পরিবেশে বা সুব্যবস্থায় জীবন-জীবিকায় নিশ্চিতির ও নিরাপত্তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেই আত্মপ্রসারে ও আত্মবিকাশে আত্মনিয়োগ করে। অতএব প্রাণীমাত্রই আত্মরক্ষণ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হলেই আত্মপ্রসারে মনোযোগী হয়, মানুষও প্রাণী। মানুষও তাই জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সুব্যবস্থায় সাধ্যমত আত্মনিয়োগ করে, অন্য কথায় দরিদ্র ধন অর্জন করতে নিজের পেশায় দক্ষ হওয়ার চেষ্টা করে, এবং দারিদ্র্য ঘুচলে নিজের নেশার তথা কাঙ্ক্ষার পূর্তির প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করে। অতএব প্রত্যেক মানুষই বুদ্ধিকে পুঁজি ও পাথেয় করে জীবন যাপন করে। এবং সাধারণ ভাবে মানুষ তার জীবিকা ক্ষেত্রে উন্নতির জন্যেই সর্বক্ষণ মগজ খাটায়, এই মগজ খাটানোর সীমাবদ্ধতার দরুন সে জীবনের বিচিত্র অনুভবের ও উপলব্ধির জন্যে কোনো জ্ঞানের, হৃদয়বৃত্তির, অভিজ্ঞতার গুরুত্ব দেয় না।

তাই সে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের উপযোগ বা প্রয়োজনীয়তা আছে কি নেই, সামাজিক নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতির যুগোপযোগী পরিবর্তন আত্মোন্নয়নের জন্যে, মানবিক গুণের বিকাশের জন্যে জরুরী কি-না কখনো ভেবে দেখে না। ফলে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে ছাড়া অন্যত্র আশৈশব শ্রুত, লব্ধ ও দৃষ্ট গতানুগতিক রীতি-নিয়ম মেনে জীবন যাপন করে। এ-গুলোর প্রয়োজন আছে কি নেই সেই সম্বন্ধে তার মনে কোনো প্রশ্ন জাগে না। ফলে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অপরিমেয় কায়িক ও মানসিক শক্তি সুপ্ত রয়েছে, তার কখনো আর প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে না কারো জীবনে। তাই লাখে নিরেনব্বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার নয়শ নিরেনব্বই জন গতানুগতিক ভাবে প্রাণীসুলভ সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত হয়েই অন্যান্য প্রাণীর মতোই বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিক ও আবর্তিত জীবন যাপন করে।

অন্যান্য প্রাণীরাও সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তিচালিত জীবন যাপন করে আঙ্গিক অসামর্থ্যের কারণে। যেমন মানুষের মতো দুটো হাত নেই বলে, মানুষের সহায়তা ছাড়া অর্থাৎ মানুষের কাছে প্রশিক্ষণ না পেলে কোনো প্রাণীই প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে আত্মবিকাশ ঘটাতে পারে না। যদিও আমরা পিঁপড়ে, উই, বোলতা, ভিমরুল, মৌমাছি প্রভৃতিকে এবং পশুর মধ্যে হাতি প্রভৃতিকে এবং কোনো কোনো পাখিকে দলীয় বা সামাজিক জীবন যাপন করতে দেখি। তাদের এই দলবদ্ধ জীবনে একজন দলপতি বা সর্দারও থাকে দেখা যায়। সে কায়িক শক্তিতে প্রবল হয়ে কিংবা বুদ্ধিমত্তায় অনন্য হয়ে দলের সর্দার হয়। যেমন মানুষের মধ্যে শাহ-সামন্তরা বুদ্ধি বলে অর্থ বলে লোকদের অনুগত করে পরের ধন-সম্পদ গ্রাম-রাজ্য হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে দখল করত। এবং এখনও ভোটের যুগেও সেইভাবে কোথাও কোথাও করে থাকে গোষ্ঠীবদ্ধ ও গোত্রীয় জীবনে। প্রশিক্ষণ পেলে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাণী যেমন মালিকের অভিপ্রায় মতো লড়াই প্রভৃতি নানা কর্মে বুদ্ধিমত্তার সুবিবেচনার দায়িত্ববুদ্ধির কর্তব্যচেতনার ও আনুগত্যের পরিচয় দিয়ে থাকে, মানুষও তেমনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিজ্ঞানের, বাণিজ্যের, দর্শনের, সাহিত্যের, চিত্রশিল্পের, সঙ্গীতের, স্থাপত্যের, ভাস্কর্যের, মনোবিজ্ঞানের, চিকিৎসা বিজ্ঞানের, সমাজের ও রাজনীতির নানা বিষয়ে অনুশীলনের এবং গবেষণার মাধ্যমে নতুন তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য আবিষ্কারের উদ্ভাবনের সৃষ্টির বিচিত্র অবদানে মানুষের সংস্কৃতি-সভ্যতার কল্পনাতীত বিচিত্র বিকাশ ও উৎকর্ষ ঘটাতে পারত, তা আমরা সহজে অনুমান করতে পারি। কারণ এই করগণ্য কয়জনের মননের মনীষার আবিষ্কারের উদ্ভাবনের ও সৃষ্টির ফলে বিজ্ঞানে দর্শনে সাহিত্যে যন্ত্রে প্রকৌশলে ও প্রযুক্তিতে যে-বিস্ময়কর উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে এই মুহূর্ত অবধি তা দেখে বোঝা যায় পৃথিবীর পাঁচশ কোটি মানুষের মধ্যে কোটি খানিক মানুষই যদি অনন্য মনীষার, শ্রমের ও সাধনার অবদান রাখতেন বা রাখেন তা হলেই আমাদের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নয় কেবল, আমাদের মানসজগতেও অসামান্য পরিবর্তন আসত। আমরা আজ যে জাত, জন্ম, বর্ণ, ধর্ম, গোষ্ঠী, গোত্র, ভাষা, নিবাস, খাদ্য-পরিচ্ছদ প্রভৃতির এবং আচার-আচরণের স্বাতন্ত্র্যের ও পার্থক্যের বিরোধের, বিচ্ছেদের, ব্যবধানের যে দেয়াল তুলে রেখেছি তার ফলে উন্নততর অবস্থাতে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিকভাবে কেবল মানুষ পরিচয়ে, নির্বিশেষ নরনারীর মানব প্রজাতি রূপে যে-মিলন ময়দান তৈরি হতে পারত তা আজো হয়নি। অবশ্য সে অবস্থাতেও মানুষে মানুষে ব্যক্তিগত ও পরিবারগতভাবে লাভ-লোভ-স্বার্থবশের ঘৃণা, অবজ্ঞা, হিংসা, প্রতিহিংসাজাত দম্ভ, সংঘর্ষ, সংঘাত থাকত বা থাকবে। কিন্তু আজকের মতো মানবিক গুণের বিরলতা মানবতার দুর্লভতা বিবেকের এমন অনুশীলনহীন সুপ্ত অবস্থা থাকত না বা থাকবে না। মানুষে মানুষে হার্দ্যিক সম্পর্ক আরও গাঢ় গভীর হত এবং হবে। পাঁচশ কোটি মানুষের মগজ জীবিকা-চিন্তার বাইরে অননুশীলিত থাকায় মানবিক শক্তির কি বিপুল অপচয় হচ্ছে তা ভাবলে মনে আফসোস জাগে। অসংখ্য মানুষের মগজ মানুষের জগৎভাবনার ও জীবনচেতনার বিকাশ সাধনে বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য আবিষ্কারে, বিচিত্র সব যন্ত্র নির্মাণে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে নিয়োজিত হলে, মানুষের জীবন অর্থাভাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাদ্যাভাব দুশ্চিন্তা ও রোগমুক্ত হলে, এবং থাকলে মানুষের আয়ু হত সুদীর্ঘ এবং জীবন হত কায়িক ও মানসিকভাবে সুখের শান্তির আকর। বাধা, বিঘ্ন, দুর্যোগ, দুর্দিন, দুর্ঘটনা মানুষকে বিশেষ ঘায়েল করতে পারত না, মানুষের মগজী শক্তি প্রকৃতির অমোঘ আঘাত ও প্রভাব যে প্রতিহত করতে পারে তার কিছু কিছু আভাস ইতোমধ্যে তো মিলেছে। অতএব আমরা মানবিক শক্তির উপরেই মানুষের জীবন-জীবিকার ভবিষ্যৎ যে নির্ভর করছে, কোনো অদৃশ্য অরি-মিত্র কাল্পনিক শক্তির উপর যে নয়, তা যুক্তি, বুদ্ধি, প্রয়োগে দৃঢ় প্রত্যয়ে গ্রহণ করবার জন্যে একালের শিক্ষিত যুক্তিবাদী, বুদ্ধিবাদী ও মানববাদী মানুষের কাছে আবেদন জানাই। মানবিক শক্তিই মানুষের চরম ও পরম ভরসার স্থল এই তথ্য উপলব্ধির দিন এসে গেছে। মনে হয় মগজের অনুশীলনে পরিশীলিত বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক এবং বিবেকানুগত জীবনচেতনা মানুষের মানবিক গুণের, মানবতার বিকাশ ঘটায় এবং বিচিত্র অনুভবে ও উপলব্ধিতে জীবন উপভোগ করা সহজে সম্ভব করে। এই অবস্থায় নিরীশ্বর, নাস্তিক যেমন আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে সমাজনির্ভর জীবন যাপন করে, তেমনি অন্যরা মানবশক্তিকে অসামান্য জেনে মানুষকে বল-ভরসার অবলম্বন করবে প্রাত্যহিক জীবন যাপনে। 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই। নাই কিছু মহীয়ান।' আর 'সবার উপরে মানুষ সত্য। তাহার উপরে নাই।'

AMARBOI.COM

প্রাণিজগতে আত্মার সন্ধানে

মানুষ অনেককাল ধরে দাসের ও নারীর আত্মা আছে তা স্বীকার করত না, এখন মানব প্রজাতির সবারই আত্মা স্বীকৃত হয়। কিন্তু অন্য জীব-জন্তুর পিঁপড়া থেকে হাতি ও তিমি অবধি কারো আত্মা স্বীকার করা হয় না। যুক্তিটা এই– স্রষ্টা পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের প্রয়োজনে আর সব জীব ও উদ্ভিদ সৃষ্ট হয়েছে। কাজেই ওদের মানুষের প্রয়োজননিরপেক্ষ কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। আজ মানুষের মগজী শক্তির অসামান্য ও অভাবিত বিকাশ ঘটেছে। মানুষ আজ নক্ষত্রলোকের, সমুদ্রের তলদেশের, পর্বতের কন্দরের এবং অরণ্যের সব খবর রাখে, তবু মানুষ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এবং স্রষ্টার সঙ্গে তাদের একান্ত সম্বন্ধের গৌরব এবং গর্ব করে চলে। আর অন্য জীব-উদ্ভিদ যেন তাদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার এবং অন্য প্রয়োজন মেটানোর জন্যে সৃষ্ট হয়েছে। জীব-উদ্ভিদের একালে প্রাণটা স্বীকার করা হয় বটে, কিন্তু আত্মা আজো স্বীকৃত হয় না, যদিও বা আমরা জানি ও বুঝি যে সব প্রাণীরই বুদ্ধি এবং অনুভূতি আছে। সব প্রাণীই বুদ্ধি ও অনুভূতি চালিত। তাদেরও রয়েছে সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা মিলন বিরহ বিচ্ছেদ জড়িত জীবন। তারাও আঘাতে আহত হয় শোকে বিহ্বল হয়। আনন্দে উল্লাসে মেতে ওঠে, হিংসায় প্রতিহিংসায় ক্ষোভে ক্রোধে চঞ্চল হয়, তাদের সেইরূপ অনুভূতির অভিব্যক্তি দান করে কর্মে ও আচরণে। শুধু তা নয় আমরা দেখছি ওরা আত্মরক্ষার জন্যে হয় পালায়, নয় রুখে দাঁড়ায়। এমনকি দলীয় বিবাদে বিরোধেও অংশ গ্রহণ করে। ক্ষুদ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাল পিঁপড়ে কিংবা উই সমাজবদ্ধ হয়ে সহযোগিতায় যৌথজীবন যাপন করে। মানুষের হাতে কাক নিহত হলে সব কাক মিলিত হয়ে হয় শোক অথবা প্রতিবাদ জানায় উচ্চকণ্ঠে। বুনো পশু পাখিদের যূথবদ্ধ জীবন রয়েছে দেখা যায়, এবং তাদেরও দলপতি থাকে। হাতি, বানর, ধান-খেকো পাখি দলবদ্ধ হয়ে বিচরণ করে। তাছাড়া আমরা পায়রার মধ্যে দাম্পত্যজীবন দেখি। শিম্পাজী প্রভৃতিও বড় বৃক্ষের শাখায় মাচা তৈরি করে পারিবারিক জীবন যাপন করে। কবুতর কাক প্রভৃতির মধ্যেও দেখি মাদী ও মদ্দা কাক-কবুতর এক সঙ্গে নীড় তৈরি করে। ডিমে তা ও পাহারা দেয় এবং বাচ্চা উড়ার যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত খাদ্য সংগ্রহ করে বাচ্চাদের খাওয়ায়। মানুষের সন্তানবাৎসল্যের সঙ্গে মাছ-মোরগের বাচ্চাপ্রীতির পার্থক্য কোথায় এবং আমরা জানি পায়রা, বাজ, কুকুর, ঘোড়া, হাতি, বানর এবং ডলফিন প্রভৃতি মানুষের অভিপ্রায় বোঝে। সার্কাসে বাঘ-সিংহও অনুগ্র অহিংস ও অনুগত হয় প্রশিক্ষণ পেয়ে। মানুষের বিপন্ন জীবনে সাধ্যমত সাহায্য ও সহায়তাও করে। এর পরেও কি বলা যাবে এরা কেবলই সহজাত প্রবৃত্তি চালিত, এদের জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, বিকাশ-বিস্তার সম্ভাব্যতা নেই? আমরা কাক ও ইঁদুর দিয়েও সিনেমা করতে দেখেছি। আর হাতি, ঘোড়া, কুকুর, বানর, পায়রা, ডলফিন প্রভৃতি দিয়ে অভিনয় করানো হয়। আমাদের অনুমান প্রশিক্ষণ পেলে অনেক সচল প্রাণীর সুপ্ত শক্তির ও বুদ্ধির বিস্ময়কর প্রকাশ ও বিকাশ ঘটবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মোরগের ও পায়রার লড়াই তো বিশ্বইতিহাসখ্যাত। এবং সাধ্যমতো তারা এদের বিচিত্র শক্তির প্রয়োগে সমর্থ হবে। ভাষার সাহায্য থেকে বঞ্চিত থেকেও কেবল ইঙ্গিত ও ধ্বনির মাধ্যমে মানুষের অভিপ্রায় বুঝে তার আদেশ নির্দেশ অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করে, অভিনয় করে নিখুঁতভাবে। বোকা মানুষের চেয়ে এইসব প্রাণীর বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি অনেক বেশি বলে মনে হয়। সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, প্রেম যদি মানুষের মতোই অভিন্ন হয় এবং নীতি-নিয়মও কখনো লঙ্ঘন করে, পশু-পাখির জগতে অন্তত ধর্ষণ করা হয় না, তারপরেও কি বলব এরা কেবলই যান্ত্রিক জীবন যাপন করে, যার নাম মৌমাছিতন্ত্র? বাস্তবে বিড়ালকে ও কুকুরকে পেটের পীড়ায় এক রকমের ঘাসের কচিডগা খেতে দেখা যায়। যেমন নকুল সাপের সঙ্গে লড়াই-এর ফাঁকে ফাঁকে বিষনাশক পাতার সাহায্য নেয়। আমাদের নিশ্চিত ধারণা, যদি মানুষের আত্মা থাকে এবং ইহ-পরকাল থাকে, তাহলে জীব-উদ্ভিদ সবারই আত্মা আছে এবং মানুষের আত্মা অবিনশ্বর হলে এদেরও আত্মা অবিনশ্বর হওয়ার কথা। এমনকি বৃক্ষেরও সুখ ও দুঃখবোধ আছে। অনেক বৃক্ষ সূর্যাস্তের ফলে ঘুমায়, পাতা সংকুচিত হয়। লজ্জাবতী লতার স্পর্শকাতরতা আমরা সবাই দেখি। কোনো কোনো বৃক্ষ পত্রযোগে পোকামাকড় প্রভৃতি খায়। উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা বলেন যে-লোক তরুলতার সেবা করে তার সান্নিধ্য পেলে বৃক্ষ প্রসন্ন হয়। যে-লোক বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কাটে বা ছেঁড়ে তার সান্নিধ্যে বৃক্ষ ভীতত্রস্ত হয়।

অবশ্য আমরা তর্কের খাতিরে আত্মার কথা বলছি। নিরীশ্বর-নৈরাত্ম্যবাদ ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন। লোকায়তিক-চার্বাকরা নিরীশ্বর-নৈরাত্ম্যবাদী ছিলেন। ভারতের অন্তত তিনটে দর্শনই নিরীশ্বর সাংখ্য-যোগ-বৈশেষিক আর বৌদ্ধ দর্শন তো বটেই। আমরা বৌদ্ধ দর্শনের দেহধারস্থ চৈতন্যকে আত্মা নামে অভিহিত করি বোঝা এবং বোঝানোর জন্যেই, আমরা জানি ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-বোম এ পঞ্চভূতে কিংবা জল, বায়ু, অগ্নি এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাটিযোগে যে দেহ গঠিত হয় এবং তজ্জাত দেহে চৈতন্য উদ্ভূত হয়। সেই চৈতন্য আবার দেহের অবসানে অর্থাৎ ঐ চার উপাদানের অসহযোগিতায় দেহ চৈতন্য হারিয়ে যে বিনষ্ট হয়, তাকেই সাধারণ ভাষায় আত্মা নামে অভিহিত করি। অবশ্য বৌদ্ধ দর্শনে একে জলস্রোতের মতো চেতনাস্রোত নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই চেতনা বিবর্তনশীল এবং প্রবহমান। বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন তাই এইভাবেই আত্মা নামের চৈতন্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এইজন্যে বৌদ্ধরা নির্বাণে আস্থা রাখে। নির্বাণ হচ্ছে প্রদীপের শিখার মতো। বাতাসে আগুন নিভে যায়। কোথাও তার অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি দেহস্থ চৈতন্য অনস্তিত্বে বিলীন হয়ে যায় এর নামই নির্বাণ। এখনকার চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুসারে রক্তই প্রাণ, জীবন বা আত্মা শর্করাযুক্ত রক্তই হচ্ছে প্রাণের ধারক, বাহক ও লালক, এবং শরীরে জলীয় পদার্থের এবং রক্তের ক্ষরণজাত অভাব ঘটলে মানুষ চৈতন্য হারায় অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুও ঘটে। তাহলে আত্মা বলে কোথায় কি থাকে শরীরে! এইজন্যে আমরা একালের যুক্তিতে বুদ্ধিতে আত্মার সন্ধান পাই না, আমাদের ধারণা মানুষ ও অন্য প্রাণীর মতো প্রাণীপ্রজাতির একটা শাখা। আঙ্গিক সৌকর্যের কারণে অর্থাৎ দুটো হাতের সুবিধে পেয়ে মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতায়, পরস্পরিক নির্ভরশীলতায়, বহু কিছু জীবনের অনুকূল আবিষ্কার উদ্ভাবন করে প্রকৃতিকে দাস, বশ, এবং প্রকৃতির সঙ্গে আপোস করে স্বনির্ভর কৃত্রিম জীবন যাপন করে। মানুষ এ ভাবে রোদ, বৃষ্টি, শৈত্য, ঝড়, বন্যা, খরা প্রভৃতি থেকে আত্মরক্ষা করে স্বরচিত জীবন যাপন করেছে। এরই নাম মানুষের সংস্কৃতি-সভ্যতা, যা মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণীর নেই। অবশ্য পরিবেশের প্রতিকূলতার ও অনুকূলতার কারণে এবং মানুষের মেধার ও প্রয়োজনচেতনার তারতম্যের ফলে সংস্কৃতি-সভ্যতার গোষ্ঠী ও গোত্রগত এবং অন্তর্গত গুণের মানের মাপের ও মাত্রার প্রভেদ ঘটেছে, তা আজো রয়ে গেছে। ফলে মানুষেরও বিকাশ হয়েছে অসম নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে।

তরঙ্গিত চেতনা-প্রবাহের রূপ-স্বরূপ

জীবন হচ্ছে চেতনা-প্রবাহের সমষ্টি। জন্ম মুহূর্তে এর শুরু, মৃত্যু মুহূর্তে এর শেষ। এমনকি নিদ্রিত অবস্থাতেও এই চেতনাপ্রবাহ নিস্তরঙ্গ হয়ে প্রবহমান থাকে, তবে হালকা নিদ্রায় মৃদুতরঙ্গে পূর্বশ্রুত, দৃষ্ট এবং অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনার বা দৃশ্যের স্বপ্নেদর্শন মেলে, কেননা স্মৃতি খড়খুটো বা পানার মতো প্রবাহের উপরে ভাসমান থাকে। একে একালের ক্যাসেটের বা কম্পিউটারের সঙ্গে তুলনা করা চলে। হালকা ঘুমের তুচ্ছ স্বপ্ন ঘুম ছোটার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায়, মনে থাকে না। কিন্তু জীবনের আশা-আশ্বাসের বল-ভরসার কিংবা ভয়ের বিপদের আশঙ্কার সাপের বাঘের আক্রমণের দৃশ্য বা ঘটনা ঘুম ভাঙার পরেও মনে থাকে এবং তাকে নিয়মিত পূর্ব আভাস মনে করে মানুষ আনন্দিত কিংবা ভীত হয়। এমনকি স্বপ্নে দৃষ্ট লোকের আত্মার অমরত্বেও লোকে আস্থা রাখে। অথচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃতব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখে সেই মৃত ব্যক্তির পার্থিব জীবনের প্রতিবেশে ও পরিপ্রেক্ষিতে অপার্থিব জীবনের অবস্থানে ও প্রতিবেশে নয়, কাজেই এতে আত্মার অমরত্ব প্রমাণিত হয় না। জাগ্রত অবস্থায় নিস্তরঙ্গ চেতনাপ্রবাহ মানুষ অনুভব বা উপলব্ধি করতে পারে না। সেই নিস্তরঙ্গ প্রবাহে তার দিনও কাটে না, রাতও কাটে না, নিরানন্দ অসহ্য বেকারত্ব অনুভব করে। জীবনে স্বপ্নে ও সাধ থাকে। ক্ষুধা তৃষ্ণাও মেটাতে হয়। অতএব জীবনকে অনুভব-উপলব্ধি এবং ভোগ-উপভোগ এবং সম্ভোগ করতে হলে প্রভাতে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কোনো দায়িত্ব কর্তব্য লাভ লোভ স্বার্থ সম্পৃক্ত উদ্দীপনা উত্তেজনা প্ররোচনা বিপদের আশঙ্কা উৎসবের আনন্দ প্রেরণা প্রণোদনা প্রবর্তনা চেতনা প্রবাহে তরঙ্গ সৃষ্টি না করলে মানুষ ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে উদ্যম, উৎসাহ, আগ্রহ কিছুই পায় না। কাজেই জীবনঅনুভবের জন্যে চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, তজ্জাত, রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ যোগে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য কিংবা স্নেহ, মমতা, প্রীতি, প্রেম, কৃপা, করুণা, দয়া, দাক্ষিণ্য অথবা দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, ঘৃণা, ঈর্ষা, অসূয়া প্রভৃতি যে-কোনো বৃত্তি-প্রবৃত্তি, চেতনাপ্রবাহে প্রবল হয়ে না উঠলে মানুষের নিত্যকার জাগ্রত জীবন আলস্যে নিষ্ক্রিয়তায়, উদ্যমহীনতায় বৃথা ও ব্যর্থ হয়ে যায়। অতএব আমরা মানুষের মধ্যে যে-লাভ লোভ-স্বার্থবুদ্ধি কিংবা কাম ক্রোধ প্রতিহিংসা অথবা প্রেমপ্রীতি, কৃপা করুণা হিতৈষণা প্রভৃতি দেখি তার মাধ্যমে মানুষ বিচিত্র ভাবে জীবন অনুভব ও উপভোগ করে।

এই তত্ত্ব যদি সত্যি হয়, তা হলে মানুষের মধ্যে কাড়াকাড়ি মারামারি হানাহানি যেমন নিবারণ করা যাবে না, কমানো হয়তো যেতে পারে, তেমনি প্রেম প্রীতি ভালোবাসাও কখনো বিলুপ্ত হবে না। এমনকি দুনিয়াতে সব মানুষ একধর্মের একসমাজের একরাষ্ট্রের সদস্য হলেও প্রাণীর বৃত্তি-প্রবৃত্তি পরিহার করতে পারবে না। প্রাণীর স্বভাব থেকেই যাবে। তবু মনে বোঝে না বলে মানুষ নানাভাবে ব্যক্তিজীবনে সুখ, স্বস্তি, নিরাপত্তা চায়। তেমনি পারিবারিক জীবন আর সামাজিক জীবনও করতে চায় নিরাপদ। রাষ্ট্রীয় জীবনেও চায় আইনের শাসন এবং মানুষকে অন্যায় শাসন-শোষণ-পীড়ন, বঞ্চনা, প্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত করবার জন্যে হৃদয়বান মানববাদীরা চায় শোষণমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র। এইজন্যে এ কালে মানুষকে সচেতন অনুশীলনে হতে হবে যুক্তিবাদী মুক্তচিন্তক ও মানববাদী। এক কথায় অধিকাংশ মানুষকে Rationalism secularlism liberalism এবং science and technology মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনে অবলম্বন আর বর্জন করতে হবে Social, religious, regional এবং linguistic স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি। তাহলেই কেবল সামগ্রিক ভাবে মানুষের জীবনে পরিবারে সমাজে ও রাষ্ট্রে জীবন ও জীবিকা নিরুপদ্রব নিরাপদ এবং অধিকতর শান্তির ও সুখের হতে পারবে। যদিও মানুষ যন্ত্র নয় বলে রবোটের মতো সবাই আক্ষরিকভাবে নীতি নিয়ম আদর্শ মেনে চলবে না। তখনো ফাঁকির ফাঁক, কাড়াকাড়ি, হানাহানি এবং মারামারি থাকবে, তবে সংখ্যায় ও মাত্রায় কমবে এই আশা করা বোধ হয় বাতুলের স্বপ্ন ও সাধ নয়। এই চিন্তা অলস মনের আষাঢ়ে স্বপ্ন ও সাধ হলেও এমনি সাধ ও স্বপ্নে আমাদের কারো কারো ব্যক্তিমনের উৎকর্ষ সাধন করবে। আমরা সংযত, সহিষ্ণু, যুক্তিনিষ্ঠ, বিবেকানুগত ন্যায়প্রবণ সুজন ও সজ্জন হতে পারব। যা কিছু দেখতে শুনতে বলতে করতে ভাবতে কুৎসিত, তা থেকে নিজেকে বিরত রেখে অধিক সংস্কৃতিমান হতে পারব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অহং– এর উৎস ও ভিত্তি

আমাদের ও আলোচনা ফ্রয়েডের বা পাভলভের মনোবিজ্ঞানসম্মত নয় কিংবা অস্তিত্ববাদ বা মগ্ন চিন্তাপ্রবাহ সম্পৃক্ত নয়, আমাদের চেতনাবিধৃত অনুমান, অনুভব ও উপলব্ধি ভিত্তিক এই এক স্থূলবুদ্ধির অভিব্যক্তি মাত্র।

অহং-অস্তিত্ব চেতনারই প্রসূন অথবা অস্তিত্ব চেতনায় অহংরূপে প্রতীয়মান হয়। আসলে প্রাণী মাত্রই Veni, vidi ও Vici সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে জন্ম, জীবন ও মৃত্যুর পরিসরে কাজ্ক্ষার বীজ রূপে অন্তরে অবচেতনভাবে পোষণ করে। কিন্তু সুস্পষ্ট অনুভবে ও উপলব্ধিতে সচেতন লালন পায় না বলেই অনেক সময়ে জীবন নিরুদ্দিষ্ট দিশাহারা চেতনার মতোই প্রতীয়মান হয়। তবু প্রাণী মাত্রেই স্বসত্তার অস্তিত্বে ও স্বাতন্ত্র্যে টিকে থাকতে চায়। এ যেন সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তিরই এক প্রকার অভিব্যক্তি। এজন্যেই আমরা মানুষকে জিজ্ঞাসায়-অন্বেষায় ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে এবং সুখের ও আনন্দের আশায় ও আশ্বাসে প্রাণ ও শক্তি অর্জন ও সঞ্চয় করতে দেখতে পাই। অর্থাভাব তথা খাদ্যাভাব, দুশ্চিন্তা ও রোগমুক্ত মানুষের চোখে পৃথিবী বড় সুন্দর, জীবন মধুময়। জীবনের এবং পৃথিবীর প্রতি গাঢ় গভীর এই প্রীতি বা মমতাই মানুষের মনে সদা-সর্বদা মৃত্যুভীতি জাগিয়ে রাখে। যদিও মানুষ জানে মৃত্যুদণ্ড নিয়েই মনুষ্যজন্ম শুরু, কিন্তু তা কখন কার্যকর হবে জানা থাকে না বলেই সে নিজেকে মৃত্যুভয়হীন অবিনশ্বর চেতনায় উদ্দীপ্ত রেখে, জাগ্রত রেখে ভাব চিন্তা কর্ম আচরণ সুষ্ঠুভাবে করে অর্জনের ও সঞ্চয়ের কীর্তির আনন্দ ও প্রসাদ অনুভব করে। বিশ্বাস করে 'আমি আছি বিশ্ব আছে অঙ্গে ও অন্তরে জীবন নাচে মৃত্যু কোথা বল।' জীবনরসিক শিশু লুব্ধ ভোগী হয়, সে কেবল পেতে চায়, সে কেবল কাড়ে, কিছু কাউকে দিতে নারাজ। সে ভোগলিপ্সু ত্যাগবিমুখ সে অজরামরবৎ পার্থিব জীবনকে গুরুত্ব দেয়।

মনোবিজ্ঞানীরা ও দার্শনিকরা মানুষের বিচিত্র চেতনার অনুভবের, উপলব্ধির, কাঙ্ক্ষার, ভোগবাঞ্ছার বিভিন্ন ও বিচিত্র তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য আবিষ্কার করেছেন ও করছেন। সেইসব জটা-জটিল তত্ত্ব-তথ্য ও সত্য আমাদের যুগপৎ ও একাধারে বিস্মিত ও বিভ্রান্ত করে আমাদের বোধশক্তির বিকাশ সম্ভবত অননুশীলিত ও সীমিত বলেই। তবু আমরা আনাড়ি হয়েও কখনো কখনো কৌতূহল বশে জিজ্ঞাসায় সন্ধিৎসায় বিশ্লেষণ যোগে জানতে ও বুঝতে চাই স্ব স্ব সাধ্যমত। ফলে আমরাও জানি ও বুঝি যে প্রত্যেক মানুষই লিঙ্গ ও বয়স নির্বিশেষে স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্যচেতনার প্রেরণায় নিজের গুণ-গৌরব-গর্ব সম্বন্ধে একটা স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম ধারণা নিয়ে চলে। এইভাবেই আমরা ব্যক্তির গুণ-গৌরব-গর্ব, পারিবারিক গুণ-গৌরব-গর্ব, বংশগত গুণ-গৌরব-গর্ব, ধর্মগত গুণ-গৌরব-গর্ব, সম্প্রদায়গত গুণ-গৌরব-গর্ব, দেশগত গুণ-গৌরব-গর্ব, গোত্র বা গোষ্ঠীগত গুণ-গৌরব-গর্ব এবং জাতিগত গুণ-গৌরব-গর্ব এমন কি অঞ্চলগত গুণ-গৌরব-গর্ব প্রভৃতিকেও জীবনে সমাজে রাষ্ট্রে রুচিতে সৌন্দর্যবোধে এবং সংস্কৃতিতে প্রেরণার, প্রণোদনার ও প্রবর্তনার উৎস হিসেবে পুঁজি-পাথেয় করি জীবনযাত্রায়। এক কথায় প্রত্যেক মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবয়বে যেমন অনন্য, স্বভাবে চরিত্রে ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বে তেমনি অনন্য রূপে চিহ্নিত হতে চায়। এইভাবেই মানুষ মর্ত্যজীবনে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চায়। এতেই মানুষে মানুষে কেবল বিচ্ছেদের ও ব্যবধানের অলঙ্ঘ্য ও দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল গড়ে ওঠে। কিছুতেই নির্বিরোধ মানুষের মিলন-ময়দান তৈরি হয় না। এইভাবেই আজ অবধি জাত, জন্ম, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, গোত্র, গোষ্ঠী, নিবাস মানুষকে স্বাতন্ত্র্যে বিভক্ত করে রেখেছে, প্রাজাতিক জীবনের সাদৃশ্যে অভিন্ন চেতনায় উদ্দীপ্ত করে মিলন ঘটায়নি।

সবটার মূলে অস্তিত্ব রক্ষার তথা অহং-এর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার একটা প্রাবৃত্তিক চেতনা যেন ক্রিয়াশীল থাকে। এ কারণেই আজকে ১৯৯৭ সনেও সবচেয়ে অনুন্নত গোত্রের লোক– যারা সভ্যতা-সংস্কৃতিতে রিক্ত আদিম ও আদি অবস্থায় রয়ে গেছে, তারাও স্ব-অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে আশঙ্কায় তাদের খাদ্যের, পোশাকের, আচারের, আচরণের নিকৃষ্টতা তথা অবিকশিত অবস্থা চোখে দেখেও নানা অসুবিধা জেনেও অন্তরে অনুভব এবং মগজে উপলব্ধি করেও ছাড়তে রাজি হয় না, পাছে স্বাতন্ত্র্য হারালেই অস্তিত্ব হারাবে এই আশঙ্কায় তারা অতীতের ও ঐতিহ্যের পিছুটানে খাঁচাবদ্ধ প্রাণীর মতো স্ব-অস্তিত্বে বাঁচতে চায়, স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে প্রাগ্রসর মানুষের অনুকরণে অনুসরণে এগুতে চায় না। এজন্যে আজো আমরা পৃথিবীর অধিকাংশ পিছিয়ে-পড়া জাতির মধ্যে ঘন ঘন স্ব-সংস্কৃতি-বিপন্নতার শঙ্কা ও উষ্মা কাগুজে বিবৃতিতে ও মেঠো বক্তৃতায় পরিব্যক্ত করতে দেখি ও শুনি। এমন কি লক্ষ করলে দেখা যাবে য়ুরোপের সবকিছু– যানবাহন যন্ত্রপাতি প্রকৌশল প্রযুক্তি স্থাপত্য ভাস্কর্য সাহিত্য সংস্কৃতি আর ঈশ্বরপ্রোক্ত বিদেশী শাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পোশাক, খাদ্য, জীবনযাপন পদ্ধতি দৈনন্দিন জীবনে ঘরে বাইরে এবং অঙ্গে ও অন্তরে গ্রহণ করেও নির্বোধের মতো স্বজাতির, স্বদেশের স্বধর্মের সংস্কৃতিরক্ষার জন্যে আবেদন নিবেদন করতে দেখা যায়। তাদের এই মনোভাব আমাদের ভিক্ষাজীবীর স্বভাব স্মরণ করিয়ে দেয়। ভিক্ষাজীবীরা নির্বিশেষ মানুষের দানে দয়ায় বাঁচে। কৃপা প্রাপ্তিসাফল্যের জন্যে কণ্ঠস্বরে মিনতি যুক্ত করলেও আসলে কিন্তু তারা অন্তরে কোনো বিনয় বা মিনতি রাখে না। সবার থেকে কৃপা নেয় বলে কারো প্রতিই তারা কৃতজ্ঞ থাকে না এবং প্রয়োজনে তারাও তাদের অস্তিত্বের ও স্বাতন্ত্র্যের জানান দেন রূঢ় ব্যবহারে। অতএব অহং অস্তিত্ব প্রসূন। অহৎ-এর বিলুপ্তি আত্মবিলুপ্তিরই নামান্তর। সম্ভবত প্রাণীমাত্রেরই এ অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিজাত অহং চেতনা থাকেই। মানুষের মধ্যে তা প্রকট বলেই, মানুষের মধ্যে সর্বপ্রকার বিরোধ-বিবাদ এ চেতনারই ফল এবং স্নেহ-মমতা-প্রেম-ভালোবাসা-ত্যাগ-তিতিক্ষাও অহং-এর উৎকর্ষজাত জিগীষারই অভিব্যক্তি অর্থাৎ আপাত বিপরীতমুখী হলেও দু'টিরই উৎস ও ভিত্তি অভিন্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তজীবন উপভোগের উৎস

পনেরো শতকের অবসানকালে সদ্য স্বাধীন স্পেনের রাজার উদ্যোগে সমুদ্রের সীমার সন্ধানে নিয়োগ করা হল নাবিকদের। কলম্বাসের ও ভাসকো দ্য-গামার নাম আমরা সবাই জানি। য়ুরোপে তখন সর্বত্রই জনস্ফীতি ঘটেছিল। জনগণের জীবিকা সঙ্কট প্রায় অসামাধ্য হয়ে উঠছিল, সম্ভবত তাই সবাই বুঝেছিল সমাধানের পথ একটিই, তা হচ্ছে বাণিজ্যের বিস্তার এবং ভূ-খণ্ডের আবিষ্কার। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' এই তথ্য তখন অনুভূত ও উপলব্ধ হয়। কাজেই গোটা পশ্চিম য়ুরোপে সরকার ও সওদাগরদের বাসনা জাগে জানা-অজানা পৃথিবীময় আর্থবাণিজ্যিক আত্মবিস্তারের। এইকালে যেমন বিজ্ঞানীরা আকাশের কিনারা খোঁজার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন, তেমনি পনেরো শতকের শেষ দশক থেকে আঠারো-উনিশ শতক পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র ভূমি সন্ধানের ও দখলের অভিযান চালায় য়ুরোপীয়রা, সেই সঙ্গে জানা পৃথিবীর সর্বত্র পণ্যের বাজার সৃষ্টিতে থাকে নিরত। এইভাবেই য়ুরোপ পৃথিবীর ধন-সম্পদ লুণ্ঠনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, ষোল শতক থেকে আজো যার অবসান ঘটেনি।

এর মধ্যে সতেরোশ ষাট সনে নতুন যন্ত্রও আবিষ্কারের ফলে শিল্প বিপ্লব ঘটে যায়। ইংল্যান্ডে এর শুরু। এর পর থেকে ধনে, মানে, মগজে, মননে, মনীষায় য়ুরোপীয়দের জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে বিচিত্র যান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ দ্রুততর হতে থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ওদের আত্মপ্রত্যয় আত্মশক্তি সাহস ও লিপ্সা। ফলে জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে প্রকৌশল-প্রযুক্তি এবং অস্ত্র প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধিত হতে থাকে। তাই রাজনীতিতে কূটনীতিতে শক্তিতে সাহসে লড়াইয়ে তারা পৃথিবীময় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপরাজেয় হয়ে ওঠে। এভাবে আঠারো উনিশশতকে তারা গোটা পৃথিবী গ্রাস করে শাসনে শোষণে বাণিজ্যে বিজ্ঞানে দর্শনে অস্ত্রে ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে পৃথিবীর মানুষের শিক্ষণীয় অনুকরণীয়, অনুসরণীয় শিক্ষক, প্রভু এবং শাসক ও শোষক হয়ে ওঠে।

অবশ্য চৌদ্দশতক থেকেই ইটালী হয়ে য়ুরোপে নতুন চেতনার চিন্তার ও সৃষ্টিশীলতার উন্মেষ ঘটতে থাকে। যদিও শিক্ষিতের হার বেশি ছিল না, কিন্তু পশ্চিম য়ুরোপে লন্ডন অবধি সর্বত্র অসামান্য জ্ঞানী বিজ্ঞানী-দার্শনিক-সাহিত্যিকের এবং শাস্ত্র ও সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। এই নতুন চেতনার বিস্তারের ও তার ফসলের দান হচ্ছে রেনেসাঁস। উল্লেখ্য যে রেনেসাঁস হচ্ছে নতুন চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ও বিকাশ আর রিভাইব্যালিজ হচ্ছে অতীত ও ঐতিহ্যের প্রতি নব আকর্ষণ এবং তার পুনরুজ্জীবন প্রয়াস। সুতরাং একটি সম্মুখ দৃষ্টির এবং অপরটি পশ্চাদ্দৃষ্টির ফুল ফল ফসল। দেকার্তের থেকেই হিউমের কাল অবধিকে Enlightenment বা চিৎচেতনার চিৎপ্রকর্ষের বিকাশের চরম ও পরম কাল বলে চিহ্নিত করা হয়। চৌদ্দশতকের আগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বোগদাদিচাঁদের জ্যোৎস্না জ্ঞানের, বিজ্ঞানের, দর্শনের, ইতিহাসের এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের পৃথিবীময় আলো ছড়াচ্ছিল, সম্ভবত ইমাম গাজ্জালীর গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বেষণার প্রভাবে মুসলিম জাহানে গ্রীকবিদ্যার চর্চা বন্ধ হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনকি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে আরো বিপুলতর সাম্রাজ্যের মালিক হওয়া সত্ত্বেও চৌদ্দশ তিপান্ন সন থেকে উনিশশ আঠারো সন অবধি বিপুলকায় ওসমানীয় সাম্রাজ্যের কোথাও নতুন চিন্তা-চেতনার, আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের, সৃষ্টির প্রয়াস প্রযত্ন ও ফসল দেখা যায়নি, বোগদাদে যে চাঁদ ডুবল আজ অবধি মুসলিমজগতের কোথাও তার উদয় ঘটেনি। আগে বলেছি চৌদ্দশতকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্প-সাহিত্যের, মনন-মনীষার যে অরুণোদয় ঘটে য়ুরোপে তা আর কখনো ডোবেনি, ক্রমে দীপ্তিতে উজ্জ্বলতর হয়ে মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ য়ুরোপীয় জ্ঞান-সূর্য সারা পৃথিবীতে আলো ছড়াচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলো ঐ সূর্যের অনুকরণে মাটির পিদিম জ্বালিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করে বটে, কিন্তু তা প্রত্যাশিত মাত্রার নয় বলে কোনো প্রয়োজনও পূরণ করে না, যদিও বিভিন্ন দেশের কিছু বিজ্ঞানী যেমন জগদীশ বসু, সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা, রমন পরিবারের দুইজন, সালাম এবং আরও কয়েকজন নোবেল পুরস্কার পেয়ে এই উপমহাদেশকে ধন্য করেছেন বিজ্ঞান চর্চায়, তেমনি সাহিত্যে শিল্পে দর্শনেও কিছুলোক য়ুরোপ-আমেরিকার বাইরে খ্যাতিমান হয়েছেন বটে, কিন্তু সবটাই য়ুরোপীয় জ্ঞানের প্রভাবে ও শিক্ষায় সম্ভব হয়েছে। এই অর্থে য়ুরোপ-আমেরিকার বাইরে য়ুরোপীয় বিদ্যার প্রভাববিহীন কোনো মৌলিক বা স্বতন্ত্র ধারায় জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, প্রকৌশল প্রযুক্তি চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতির উন্মেষ-বিকাশ ঘটেনি। আজকে গোটা পৃথিবীর মানুষের মন, মগজ, মনন, মনীষা এবং ঘরোয়া ও সামাজিক জীবনযাপনপদ্ধতি প্রতীচ্য প্রভাবিত। এইকালের পৃথিবীর কোনো শিক্ষিত সমাজের চিন্তায় চেতনায় জীবনযাপন পদ্ধতিতে তাই কোনো মৌলিকতা নেই, অনুকৃতি ও অনুসৃতি আছে। আজ তাই বিশ্বমানবের মর্ত্যজীবনের প্রয়োজনীয় সব কিছুর উৎস হচ্ছে প্রতীচী। অতএব চৌদ্দ-পনেরো শতকে মুসলিম জগতে জ্ঞান- বিজ্ঞান চর্চা বন্ধ হয়ে যায় এবং খ্রীস্টান জগতে নতুন চিন্তা-চেতনার উন্মেষে চৌদ্দ-পনেরো শতক থেকে জ্ঞান যন্ত্র শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস চর্চায় ও সৃষ্টিতে য়ুরোপ গোটা পৃথিবীর শিক্ষকের ও অধিকারীর ভূমিকা পালন করছে। য়ুরোপের এই জ্ঞান, বিজ্ঞান সাধনার এবং সৃষ্টি ও নির্মাণ প্রয়াসের ফলেই পৃথিবীর জনজীবনে আরাম আয়েশের সুযোগ ও সুবিধে মিলেছে। আজ আমরা ওদের অবদানেই যন্ত্র যুগে ও যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জগতে বাস করছি। মানুষের শ্রম ও সময় ব্যয় আজ প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। আকবর বাদশার পক্ষে সম্ভব ছিল না শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বাস করা, শাহজাহান গ্রীষ্মকালে আগ্রায় বৈদ্যুতিক পাখার কল্পনাও করতে পারেননি, ফোনের ফ্রিজের ফ্যাক্সের সুবিধা গ্রহণ করতে।

যা একদিন রাজা-বাদশার পক্ষে অসম্ভব ছিল আজ তা দফতরের ও ধনী ঘরের গৃহভৃত্য ও ভৃত্যরা উপভোগ করছে। তাছাড়া টিভি, রেডিও, ভিসিআর, ডিস অ্যান্টেনা, ফ্যাক্স, ফোন, কমপিউটার ও অন্য বেতার যন্ত্রের ও যানবাহনের বদৌলত গোটা পৃথিবীটা একটা ক্ষুদ্র শহরে যেন পরিণত হয়েছে। আজ পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তের যে-কোনো ব্যক্তির সঙ্গে প্রয়োজনে কথা বলা সহজ, পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব। আজ রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে সর্ব প্রকার যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ এমনকি গৃহের দরজা খোলা ও বন্ধ করা সম্ভব, এমনকি লক্ষ কোটি যোজন দূরের আকাশে পাঠানো সন্ধানী যন্ত্রযান ঘরে বসে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ এক বাস্তব চিচিংফাঁক ও চিচিংবন্ধ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মেরামত ও বদলানো সম্ভব। আজ হকিং-এর মতো জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কেবল সৌরজগতের নয় বিশ্বজগতের উদ্ভবতত্ত্ব, তার অন্ধি-সন্ধি, তার সীমা সন্ধানে নিরত। ডারউইন, মার্কস প্রয়েট, ফ্রয়েড প্যালব, সোরেন, কে কে গার্ড, হাইডেগার, জাঁপল সার্ত্র প্রমুখ আর বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানীরা মানুষের শারীর ও মগজী শক্তি যে অসামান্য তা বারবার প্রমাণ করা সত্ত্বেও মানুষ তার মানবিক শক্তিতে আস্থা গড়ে তুলতে পারেনি মগজী শক্তি প্রয়োগসামর্থ্যের অভাবে।

মানবশক্তি তথা মানুষের চেতনার চিন্তার মনের, মগজের, মননের, মনীষার, উদ্যমের উদ্যোগের নৈপুণ্যের এক কথায় মানব-শক্তির বিস্ময়কর অপরিমেয়তার সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও মানুষ কেন যে ভূতে-ভগবানে ভক্তি-ভয়-ভরসা রাখে তা যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না, যদিও তা তাদের চোখের সামনে তাদের কল্পিত অনুমিত অদৃশ্য বহু দেবতা-উপদেবতা-অপদেবতার অস্তিত্ব আজ সর্বজন স্বীকৃতভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। যেমন ওলাদেবী, শীতলাদেবী বা ষষ্ঠিদেবী যে নেই কিংবা শহরে কোনো গাছে যে ভূত, প্রেত, পিশাচ, জীন, পরী বাস করে না, তা জানা সত্ত্বেও মানুষ কেন মানবশক্তির উপরে আস্থা রাখে না, আসমানী শক্তিতে ভয়-ভরসা রেখে বাঁচতে চায়, তার কোনো বিজ্ঞানসম্মত যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সাধারণ মানুষ যান্ত্রিক ভাবে বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা নির্ভর জীবন যাপন করে। কখনো জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগে কোনো জিজ্ঞাসারই উত্তর সন্ধান করে না। এমনকি তাদের মনের মধ্যেও কোনো প্রশ্ন জাগে না। মনে হয় সেই জন্যে মানবশক্তির অসামান্য অতুল্য সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও আন্দাজে অনুমানে কল্পলোকে জীবননিয়ন্ত্রক শক্তির ভয়ে কাতর এবং কৃপার আশ্বাসে আশ্বস্ত থাকে। তাই মানুষ প্রাচীন ও মধ্যযুগ মানসিকভাবে অতিক্রম করে সমকালীন বাস্তব যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবন যাপন করতে পারছে না। ভূতে-ভগবানে আস্থার ফলে তাদের ভয়-ভরসা আশ্রিত আত্মপ্রত্যয়হীন জীবন কাটে। কারণ তারা মুক্তবুদ্ধির কিংবা চিন্তার অনুশীলন করে না। মুক্ত চিন্তার বা ফ্রিথিংকিং-এর প্রসাদ পায় না বলে তার জীবনানুভূতি একটা অতিসংকীর্ণ পরিসরে আবর্তিত হয়। উদার আকাশের মতো বিস্তৃত পরিসরে জীবনকে বিচিত্রভাবে অনুভব ও উপলব্ধি করতে পারে না, তার জীবন হচ্ছে ভয়-ভরসার খাঁচায় বদ্ধ পাখির মতোই। মুক্তিও বোঝে না, বন্ধনও বোঝে না। কেবল আবর্তিত জীবনে অভ্যস্ত থাকে। মানুষের শক্তিতে আস্থা থাকলেই মুক্ত জীবন যাপন সম্ভব। মুক্ত জীবনের উৎস ও ভিত্তি হচ্ছে মানবশক্তিতে আস্থা।

প্রগতির ও প্রাগ্রসর চিন্তার শত্রু

শাস্ত্রনিষ্ঠ মানুষমাত্রেই হয় অতীত ও ঐতিহ্যমুখী। কেননা শাস্ত্রমাত্রই অতীতের। তাই যুক্তি, বুদ্ধি প্রয়োগে উপযোগ ও প্রয়োজন বিবেচনা না করেই প্রচলিত নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি গতানুগতিকভাবে মানায় অভ্যস্ত থেকে অন্তরে বাইরে একঘেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবর্তিত জীবন যাপন করে। তাতেই তারা নিশ্চিন্ত শান্তির স্বস্তির ঐহিক ও পারত্রিক জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিতি পায়। এইজন্যেই সমকালে কোনো প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার মানুষ কোনো নতুন তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য উচ্চারণ করলেই একেবারে দলবদ্ধ কাকের মতো প্রতিবাদে মুখর ও মারমুখো হয়ে তেড়ে আসে এবং নতুন চিন্তা-চেতনার ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত আহত বা নিহত করে নিশ্চিন্ত হয় সর্বনাশ ঠেকাল ভেবে। এদের হাতেই কালে কালে নবী-অবতারেরা লাঞ্ছিত, আহত, নিহত হয়েছেন অথবা পলায়নে আত্মরক্ষা করেছেন কিংবা আত্মসমর্পন করে আপোসে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। সক্রেটিস, গ্যালিলিও, জোয়ান অব আর্ক অবধি নতুন কথার মানুষের জীবনবৃত্তান্ত প্রায় একই রূপ। এ সূত্রে নতুন বাণীর যাঁরা উদ্ভাবক রবীন্দ্র-নজরুলের প্রথম জীবনের প্রাপ্ত উপহাস ও লাঞ্ছনা স্মর্তব্য। আজো তার অবসান ঘটেনি বহু অনুন্নত দেশে। সাধারণ মানুষ সব সহ্য করে কিন্তু তার বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার লৌহকঠিন স্বস্তির, শান্তির নীড়স্বরূপ খাঁচাবিরোধী কোনো কথা সহ্য করতে রাজি নয়। অথচ নতুন চিন্তা-চেতনা যার মনে জাগে, দেশ-কাল-মানুষের প্রয়োজনে, সে তা প্রকাশ ও প্রচার না করে পারে না। এইজন্যেই প্রাণের ও প্রয়োজনের প্রেরণাতে জান-মাল-গর্দান বিপন্ন হবে জেনেও তার নতুন অনুভূত ও উপলব্ধ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য প্রকাশ ও প্রচার না করে পারে না।

আস্তিক হলে আমরা ভাববাদী আস্তিক কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই নতুন চেতনার ও চিন্তার কথা অন্যভাবে বলতে পারতাম, যেমন

অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাহারে দেয়
তার বক্ষে বেদনা অপার।
তার নিত্য জাগরণ অগ্নিসম দেবতার দান অহর্নিশ
দগ্ধ করে প্রাণ।

কিংবা

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে
সে আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে।
যত সব মরা গাছের ডালে ডালে
নাচে আগুন তালে তালে রে
– সেই আগুনেই স্বর্ণ কমল ফুটে।

নতুন চেতনা, চিন্তা এইভাবেই মানবসমাজে যুগান্তর ঘটায়। সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা এই ভাবেই এগোয়। এজন্যেই নতুন চিন্তা-চেতনা প্রাণ হারানোর ঝুঁকি নিয়েও প্রকাশ ও প্রচার করা দরকার মানব কল্যাণে।

এ যুগের সমাজ, সরকার ও রাষ্ট্র মুখে স্বীকার করে বটে প্রত্যেক ব্যক্তির নতুন চিন্তা করার, প্রকাশের, মুদ্রণের ও প্রচারের এবং নিরাপদে বিচরণের অধিকার আছে। কিন্তু কার্যত দলের কিংবা শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থবিরোধী হলেই প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে উগ্র ও সহিংস মূর্তি নিয়ে এগিয়ে আসে প্রাণ নাশে। এই রক্ষণশীল, বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাবদ্ধ বিজ্ঞম্মন্য জাহেল বা মূর্খদের কথাই কবি জীবনানন্দ দাস চরম ক্ষোভের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই, প্রীতি নেই
কল্পনার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।

আমাদের দেশে এই মুহূর্তে এই বিজ্ঞমন্য মূর্খরা সমাজ-সংস্কৃতি, শাসন-প্রশাসন প্রভৃতির নিয়ামক, নিয়ন্ত্রক ও গণ-হিতৈষণাতত্ত্বের বিশ্লেষক।

তাই আমাদের কোনো দিকেই আত্মপ্রসারের, নির্বিঘ্নে বিকাশের ও আত্ম-উৎকর্ষের কোনো পন্থা খোলা নেই। অতীত ও ঐতিহ্যমুখী গতানুগতিক চিন্তাধারায় লাটিমের মতো সচল জীবনযাপনে আবদ্ধ রাখার জন্যে মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণে দেয়া হচ্ছে উৎসাহ। আধুনিকতম সর্বপ্রকার জ্ঞান বিজ্ঞান প্রকৌশল প্রযুক্তি, চিকিৎসা বিজ্ঞানে সর্বপ্রকার রোগের প্রতিষেধক, ঔষধ ও যন্ত্রপাতির উদ্ভব ক্ষেত্র যে য়ুরোপ তা জেনে বুঝেও জনগণের সন্তানদের সেই জ্ঞান থেকে বঞ্চিত রাখার উদ্দেশ্যে বাঙলা ভাষার মাধ্যমে প্রশ্ন-উত্তরে অপূর্ণ জ্ঞান দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে সারা দেশে। যারা অর্থ-সম্পদের-বাণিজ্যের শাসনে প্রশাসনে নিয়ন্ত্রক শক্তি, সেই শ্রেণীর সন্তানদের জন্যে ব্যবস্থা রয়েছে তিন বছর বয়স থেকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দানের।

তবু আমাদের সাধারণ ঘরের মেধাবী বিদ্বান বুদ্ধিমান ও বিদেশে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত কিছু লোক যে নেই তা নয়, কিন্তু তাদের উচ্চ বেতনের পদ ও পদবী দিয়ে আরামে ও আনন্দে অলস জীবন যাপনে ও সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রেখে তাদের সৃষ্টিশীল গবেষক আবিষ্কারক উদ্ভাবক কিংবা যন্ত্র নির্মাতা হওয়ার পথে পরোক্ষ বাধা তৈরি করে রাখা হয়েছে।

অথচ আমরা জানি প্রাথমিক স্তরে বই দেখে শেখানো হয়। মাধ্যমিক স্তরে বই দেখে জানানো এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বই দেখে বোঝানো ছাড়াও এ বিদ্যা বিতরণের কেন্দ্র ব্যবহার করা হয় বিদ্যা সৃষ্টির কারখানা তথা নতুন চিন্তা-চেতনার, তত্ত্বের, তথ্যের, সত্যের আবিষ্কার উদ্ভাবন ক্ষেত্র রূপে, এমনি ব্যবহারেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্থকতা। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাস্তবে প্রশ্ন-উত্তরের পাঠশালাই রয়ে গেল কিংবা বিদ্যা বিক্রয়ের বিপণিই থেকে গেল।

আমাদের এখানেও গবেষণা হয় বটে। কিন্তু তা গুণে, মানে, মাপে, মাত্রায় নিতান্ত তুচ্ছ স্তরের। তাই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদ্বান, গবেষক, আবিষ্কারক, উদ্ভাবক এবং স্রষ্টা আমাদের দেশে বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। এভাবে আমরা কখনো সৃষ্টিশীল, স্বয়ম্ভর জাতি হতে পারব না। অপরের অনুকারক অনুসারক থাকব। রেনেসাঁসপুষ্ট হব না। রক্ষণশীলেরা শেষাবধি হার মানেই। ইতিহাসের এ সাক্ষ্য-প্রমাণ তবু সমকালের বিজ্ঞমন্য মূর্খরা মানে না। নতুনকে কেবলই ঠেকিয়ে রাখতে চায়।

একসময়ে 'কানু ছাড়া গীত নেই' এই প্রবাদ চালু ছিল বাঙলাদেশে। উনিশ শতকেও বর্ণহিন্দু সমাজে বৈষ্ণবগীতি আর শাক্তসঙ্গীত ছিল জনপ্রিয়। আর শাহ-সামন্ত-জমিদার ঘরে চলত উচ্চাঙ্গসঙ্গীত। তারপর বিশ শতকের ত্রিশ-উত্তর কালে ভদ্রসমাজে জনপ্রিয় হল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্র-নজরুল সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথের আশা ও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তিনি তাঁর সঙ্গীতে বাণীর ও ভাবের সৌন্দর্যের ও উঁচু মানের জন্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অর্থাৎ তিনি মনে করেছিলেন তাঁর সঙ্গীত বহু শতাব্দী ধরে লোকপ্রিয় থাকবে। নজরুল ইসলামের সঙ্গীতও সুরের বৈচিত্র্যের জন্যে ঘরে ঘরে কণ্ঠে কণ্ঠে বহু কাল চালু থাকবে। আশ্চর্য অর্ধ-শতাব্দী পার না হতেই রবীন্দ্র-নজরুল সঙ্গীতের জনপ্রিয়তার বিকল্প দেখতে পাচ্ছি ফিলমী গান, পপ সঙ্গীত এমন কি আধুনিক গানও যার গুণে মানে কোনো বিশিষ্টতা নেই কিন্তু চমক আছে, এতেই বোঝা যায় প্রজন্ম-স্রোতে রুচির ও চাহিদার কালিক পরিবর্তন ঘটে। কেননা দেহ-মনের সমকালীন প্রয়োজনের দাবি থাকে, এই তত্ত্বটি শিক্ষিত আমজনতা উপলব্ধি করে না বলেই তারা পুরোনোপ্রীতি ছাড়তে পারে না, পারে না কাল-উপযোগী নতুনকে গ্রহণ বরণ করতে। তাই তারা প্রগতি ও প্রাগ্রসরতার শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করে দেশের মানুষের সমাজের-সংস্কৃতির অগ্রগতির স্বাভাবিক পথ করে রুদ্ধ। ফলে দেশ ও রাষ্ট্র তথা সমাজ পৃথিবীর উন্নত সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। পিছিয়ে পড়ে সর্বক্ষেত্রে ও সর্বপ্রকারে।

প্রতি নতুন কালের নতুন প্রজন্মের নতুন চাহিদা থাকে, সেই চাহিদার জোগান দিতে হয়, নতুন চিন্তা-চেতনাও নতুন যুগের চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। একালে ঠেকে এবং ঠকে শেখার দরকার হয় না। দেখে এবং শুনে এবং যুক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগে শ্রেয়সকে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। রক্ষণশীলতা একালে আত্মবিনাশী মূর্খতারই পরিচায়ক মাত্র।

AMARBOI.COM

মনের মতো

মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া মানে হচ্ছে নির্বিঘ্নে নিরাপদে মৃত্যুর কবল মুক্ত হওয়া। কাজেই মানুষের তথা প্রাণীর জীবনে পদে পদে জীবনের বাঁকে বাঁকে সময়ে অসময়ে আপদ বিপদ রোগ শোক ক্ষয় ক্ষতি এড়িয়ে চলা সম্ভব হয় না। তাই জীবনস্রোত চলে এঁকে বেঁকে নানা বাঁক অতিক্রম করে নানা ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করে। যেমন জন্ম মুহূর্ত থেকেই শৈশবে বাল্যে কৈশোরে আদরে যত্নে, ঔদাসীন্যে অবহেলায়, ইচ্ছা-অনিচ্ছায়, নিরপেক্ষভাবে পরনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠতে হয়। সোহাগ যেমন থাকে শাসনও থাকে। তেমনি কোনটা যে বেশি তা তখন অনুভব করা যায় না। ভরসার চেয়ে যেন ভয়েই কাটে দিনের বেশির ভাগ, কেননা বিধিনিষেধের গণ্ডি থাকে আঁটসাঁট। কৈশোর পর্যন্ত জীবন কাটে মোটামুটি ভাবে বদ্ধখাঁচায় বন্দী পোষা পাখির মতো। সোহাগ বেশি কি শাসন বেশি তখন বুঝবার উপায় থাকে না। কোনো অবস্থাতেই এবং অবস্থানেই স্বৈর স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করা চলে না মনের মতো করে। তারপরেও মানুষ যেহেতু নিঃসঙ্গভাবে নির্জনে বাস করতে পারে না, পরিবারে, গোষ্ঠী জীবনে, গৌত্রিক জীবনে, সামাজিক জাতিক রাষ্ট্রিক জীবনে অন্যের মন জুগিয়ে অন্যের মতকে সম্মান দিয়ে, অন্যের অধিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বীকার করে, প্রবলের হুকুম-হুমকি-হামলার আশঙ্কায় থেকে লেনেদেনে, পণ্য বিনিময়ে, রোগে, শোকে, আপদে, বিপদে, আনন্দে, উৎসবে পালাক্রমে অন্যের ভাবে নিজের মনের মতো করে জীবন যাপন করতে পারে না। দশজনের মন জুগিয়ে, মান রক্ষা করে, লাভে লোভে স্বার্থে বিঘ্ন না ঘটিয়ে চলতে হয় বলে মনের মতো চাওয়া ও পাওয়া, স্বপ্ন ও সাধ মেটানো কখনো সম্ভব হয় না জীবনে। সবকিছুতে বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয় এবং সব বাঞ্ছিত রূপগুণ ধনসম্পদ স্নেহমমতা প্রেমপ্রীতিভালোবাসা দয়াদাক্ষিণ্য করুণামৈত্রী গুণে মানে মাপে মাত্রায় দুর্লভ। সেইজন্যেই সারাজীবন চলে আশার পূর্তিতে এবং হতাশার আঘাতের সমষ্টিতে ও সঞ্চয়ে। যেমন লোকে চায় স্ত্রী হোক রূপবতী ও গুণবতী বাস্তবে দেখা যায় রূপবতী মেলে তবু গুণবতী মেলে না, আবার গুণবতী মেলেতো রূপের থাকে ঘাটতি, তেমনি বাঞ্ছিত রূপের ও গুণের, ধনের ও মানের, সততার ও সৌজন্যের স্বামীও মেলা ভার। ভাই অনুকূল বা অনুগত হবে এই আশাই করে লোকে। কিন্তু তেমন ভাই সব ঘরে মেলে না। সন্তান মাত্রই যোগ্য হোক, স্বভাবে চরিত্রে গুণে গৌরবে গর্বে দশজনের উপরে একজন হোক এই কামনাই থাকে মা-বাবার অন্তরে। কিন্তু সেই বাঞ্ছা সব মা-বাপের সব সন্তানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় না। এমনি করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মনের মতো চাকুরী, মনের মতো বাড়ি, মনের মতো গাড়ি, মনের মতো বন্ধু, মনের মতো আত্মীয়, মনের মতো বস্, মনের মতো প্রিয়জন গুণীজন মেলে না। চাঁদের কলঙ্কের মতো কিংবা সোনায় খাদের মতোই কিছু গোঁজামিল থাকেই। নির্ভেজাল, নিখাদ, নিখুঁত খাঁটি কিছুই যেন জগতে মেলে না। কাজেই পরিবারের পরিজনের মধ্যে, আত্মীয়ের মধ্যে, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের মধ্যে কোথাও মনের মতো কিছু পাওয়া যায় না। মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি মেনে পরিবেশের প্রতিকূলতা সহ্য করে এবং নিজেকেও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে জীবন যাপন করতে হয়। মনের সাধ-স্বপ্ন অনেক কাটছাঁট করে, বহু কিছু বর্জন করে, অনেক কিছু সহ্য করে, অনেক ক্ষতি অপমান লাঞ্ছনা স্বীকার করে আমাদের জীবন যাপন করতে হয়। বট-অশথের বীজ যেমন কঠিন ও নীরস ইট-পাথরের মধ্যে অঙ্কুরিত ও আত্মবিস্তারের শক্তি রাখে মানুষকেও তেমনি এই বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে সুখ, শান্তি, স্বস্তি, আনন্দ, আরাম, আয়েশ প্রভৃতি নিজের চেষ্টায় ভোগ-উপভোগ ও সম্ভোগ করতে হয়। এতো দুঃখ-বেদনা-যন্ত্রণার মধ্যেও তাই মানুষ সুখের ও আনন্দের আধিক্য অনুভব ও উপলব্ধি করে। এরই নাম জীবনানন্দ। হংসের মতো জল বাদ দিয়ে দুধ সংগ্রহ করার মানসিক যোগ্যতা যদি মানুষের না থাকত, তাহলে মানুষ জীবনে সুখ ও আনন্দ খুঁজে পেত না। অতএব মনের মতো কিছু না পাওয়া গেলেও মনকে প্রবোধ দেওয়ার মতো, কাজ চালানোর মতো, অনেক কিছুই পাওয়া যায়। এইজন্যে আমরা জীবনের জয় অনুভব করি। জীবনকে ভালোবাসি, মৃত্যুকে এড়িয়ে চলি। আসলে অর্থাভাব, দুশ্চিন্তা ও রোগ মুক্ত অযোগ্য দরিদ্র মানুষের কাছেও পৃথিবী সুন্দর এবং স্বর্গের বাড়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঙাল চরিতম্

ইসলামে আল্লাহ হচ্ছেন রব-প্রভু আর মানুষ হচ্ছে আবদ্ দাস ভৃত্য। ভৃত্যের কর্তব্য হচ্ছে প্রভুর অনুরাগী ও তাঁর নির্দেশ মেনে অনুগত থাকা। প্রশ্ন করার ঔদ্ধত্যে বা বেয়াদবিতে তাঁর অধিকার নেই। মৌলভীর ওয়াজে শোনা যায় যে তোয়াঙ্গর বা ধনী লোকের দীল, মন, চরিত্র ও ঈমান পরীক্ষার জন্যেই স্রষ্টা দুনিয়াতে নিঃস্ব, নিরন্ন, অন্ধ, খঞ্জ, পাগল, পঙ্গু, রুগ্ন, এতিম, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা প্রভৃতি নানা রকমের ভিক্ষাজীবী, সেবাকামী, দুস্থ ও দরিদ্রলোক সৃষ্টি করেছেন, যাতে সচ্ছল মুমিনের কৃপার, করুণার, দয়ার, দাক্ষিণ্যের, সেবার, দরদের ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের মুমিনের সাচ্চা ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়। এবং মুমিন এইভাবে ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরলোকে জান্নাতবাসী হয়। এদের আঙ্গিক অপূর্ণতার ক্ষতিপূরণ ভোগ-উপভোগের ব্যবস্থা থাকে পরকালে।

আমরা চারদিকে অসংখ্য মুসলমান দেখি এবং কে বা কারা মুমিন তা সবসময়ে জানা-বোঝা, অনুভব, উপলব্ধি করা যায় না তাঁদের ভাব, চিন্তা, কর্ম, আচার, আচরণ দেখে। তবে অধিকাংশ যে মনে কাঙাল তা অনুমান করা যায়।

কিন্তু একটা বিষয় সম্বন্ধে আমরা সবাই জানি এবং প্রত্যক্ষ করি সদা সর্বদা। সেইটা হচ্ছে এই, প্রত্যেক ভিক্ষাজীবীই সর্বক্ষণ আল্লাহ-রসুলের নাম নেয়, কোরআনের আয়াত আওড়ায়, দোয়া-দরুদ পড়ে ভিক্ষার হাত পাতার অনুষঙ্গী হিসাবে, কিন্তু কোনো ভিক্ষাজীবীই নামাজ-রোজা এমনকি ঈদের নামাজ, জুমার নামাজ, শবেবরাতের ও শবেকদরের নামাজও পড়ে না। তারা তখন রোজগারের আশায়– বহুপ্রাপ্তির লোভে মসজিদের পথে, দরগাহর প্রাঙ্গণে, কবরস্থানের পথে, ঈদের জামাতের ধারে কাছে ভিক্ষা প্রাপ্তির জন্যে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকে। তারা আল্লাহর নামে, রসুলের নামে, শাস্ত্রের নামে ভিক্ষা মাগে বটে; কিন্তু নিজেরা কখনো শাস্ত্রানুযায়ী নামাজ রোজা কিংবা পার্বণিক কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেয় না অর্থাৎ তারা আল্লাহর রসুলের নাম উচ্চারণ করে অন্যের মনে ধর্মভাব জাগিয়ে পুণ্যের আশা সঞ্চার করে কিছু ভিক্ষা চায় বটে; কিন্তু নিজেরা কখনো কোনো এবাদতে যোগ দেয় না। ভিক্ষাজীবীরা কি ধার্মিক? এই প্রশ্ন সহজে মনে জাগে। এরা ফিতরা, জাকাত, মাংস সংগ্রহের জন্যে দুই ঈদে, শবেবরাতে ও কদরে পঙ্গপালের মতোই শহরে ছুটে আসে।

সীমাবদ্ধতার ও অন্য অনেক কিছুতে অনধিকারের কারণে মর্ত্যজীবনে ভোগ-উপভোগে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষতি মুমিনের আদরে কদরে ও সেবায় পুষিয়ে নিয়ে তৃপ্ত তুষ্ট ও হৃষ্ট থাকতে পারত হয়তো, কিন্তু সাধারণভাবে মুমিনদের কর্তব্যে উদাসীনতার দরুন এরা নিঃস্বতায়, নিরন্নতায়, নিষ্চিকিৎসায় যন্ত্রণাগ্রস্ত জীবন যাপন করে। ফলে এরা বাস্তবে কার্যত গিনিপিগই থেকে যায়।

অথচ সমাজে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ক্রমেই এদের স্থিতি ও উপস্থিতি আবশ্যিক। কেননা এরা না থাকলে অর্থাৎ গরীব, মিসকিন, এতিম না থাকলে ফিতরা ও জাকাত নেওয়ার লোক মিলবে না। তাহলে মুমিনের ফিতরা জাকাত দেওয়া যে অবশ্য কর্তব্য তা দেওয়া যাবে না। কেননা অমুসলিমদের ফিতরা-জাকাত প্রাপ্য নয়। অথচ ফিতরা ও জাকাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভৃতি সৎকর্মের জন্যেই দাস, নিঃস্ব ও নিরন্ন কিছু মানুষের সমাজে স্থিতি সচ্ছল গৃহস্থের ও ধনীদের ধর্মাচরণের জন্যেই আবশ্যিক। এই জন্যেই পৃথিবীর সর্বত্র মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে তুলনামূলক ভাবে নিঃস্ব নিরন্ন অজ্ঞ অনক্ষর দুঃস্থ ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেশিই দেখা যায়। ধর্মাচরণে ব্যাঘাত ঘটবে বলেই মুসলমানেরা কম্যুনিজম বা সমাজতন্ত্র পছন্দ করে না।

গ্রামাঞ্চলে প্রাবচনিক বা প্রাবাদিক ছড়ায় মুমিনের কর্তব্য আজো ঘোষিত হয়:

ক্ষুধার্তকে দানা তৃষ্ণার্থকে পানি
শীতার্তকে দিতে হবে কানি,
বস্ত্রহীনে বস্ত্র দেবে– রোগীরে দাওয়াই।
এতিমেরে আদর নিরাশ্রয়কে দিতে হবে ঠাঁই।
"হাম্ সায়া"র লোকেরে পুষিবে যতনে
এইসব কর্তব্য মুমিনে জানে।

মনে রাখতে হবে এইগুলো সব মুমিনের ব্যক্তিগত দায়িত্বের ও কর্তব্যের বিষয়। তাই মুমিনেরা যৌথভাবে সমাজ পরিবর্তনে আগ্রহী নয়। তাই তারা শোষণমুক্ত সমাজের তথা গণমানবের শোষণমুক্তির জন্যেই সংগ্রামে আগ্রহী নয়।

AMARBOI.COM

আড্ডা

অজ্ঞ, অনক্ষর, নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ, দরিদ্র, গতরখাটা মানুষবহুল মুসলিম পাড়ায় গাঁজারুর আড্ডা দেখিনি। কিন্তু একান্নবর্তী হিন্দুর পাড়ায় পরান্নজীবী বেকার গাঁজারুদের আড্ডা দেখেছি এবং আড্ডার খবর শুনেছি আরও বেশি। হিন্দুপাড়াতে অবসরপ্রাপ্ত কেরানী-শিক্ষক প্রভৃতির এবং বয়স্ক ব্যক্তির নিয়মিত আড্ডাও দেখেছি, কারও বৈঠকখানায় কিংবা গাছতলায়। আসলে মানুষ নিঃসঙ্গ জীবন নির্জনে কাটাতে পারেই না; তার জন্যে সঙ্গ ও সঙ্গী চাই। শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সব বয়সের মানুষই সমবয়স্ক সঙ্গী খুঁজে বেড়ায়। কেন না সমাজে অর্থ বিত্ত শিক্ষাগত অবস্থা ও অবস্থান যার যেমনই হোক না কেন চিত্ত বিনোদনের জন্যে, শ্রমের ক্লান্তি ঘোচানোর জন্যে, অবসর সময় কাঠামোর জন্যে, দুর্দিনের দুর্ভাগ্যের যন্ত্রণার উপশমের জন্যে মানুষ বিনোদন চায়। এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে বিনোদনের সহজতম উপায় হচ্ছে পছন্দ মতো লোকের সঙ্গ। এইজন্যেই সব বয়সের লোকেরই, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই গৃহকর্মের অবসরে কারো না কারো সঙ্গে আলাপে সময় কাটানো প্রয়োজন হয়। নইলে নিরানন্দ একঘেয়ে নিঃসঙ্গ জীবনের যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে ওঠে। ফলে সব বয়সের লোকেরই সমবয়স্ক লোকের সঙ্গে আড্ডা ও বৈঠক মানসিক চাহিদা পূরণের জন্যে আবশ্যিক হয়। আমরা শহরে, গঞ্জে, বন্দরে, জুয়াড়ির আড্ডা দেখি। শ্রমের ক্লান্তি এবং মানসিক নানা গ্লানি ঘোচানোর জন্যে মুচি, মেথর, বাগদী, চাঁড়াল, সাঁওতাল, উপজাতি জনজাতি প্রভৃতির মধ্যে আমরা ধেনো, তাড়ি প্রভৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাড়িয়া মদ খেতে দেখি, আর বড়লোকদের বাগানবাড়িতে, ক্লাবে হোটেলে রেস্তোরাঁয় জুয়ার আড্ডায় ও মদের আড্ডায় অবসর বিনোদন করতে দেখি। অতএব আড্ডা প্রায় সর্বশ্রেণীর মানুষের নিত্যকার জীবনের কমবেশি অপরিহার্য অংশ। কেউ খেলায় বিনোদন খোঁজে, কেউ জুয়ায় বিনোদন খোঁজে, কেউ নেশায় বিনোদন খোঁজে, কেউ নাচে, গানে, যাত্রায়, কথা-বার্তায়, সিনেমায় চিত্তবিনোদন খুঁজে বেড়ায়।

আরেক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁদের আমরা বুদ্ধিজীবী, কলাকার, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ইতিহাসকার প্রভৃতি গুণী ব্যক্তি বলে মানি। তাঁরা সাধারণত মধ্যবিত্ত বা মধ্যশ্রেণী নামে পরিচিত। তাঁদের অবদানেই যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের ও জাতির সংস্কৃতি-সভ্যতা গড়ে উঠেছে, বিকশিত হয়েছে এবং উৎকর্ষ লাভ করেছে। তাঁরা এককালে শাহ-সামন্ত যুগে রাজা-বাদশা, জমিদার, জায়গীরদার প্রভৃতির দরবারে বেতন বা বৃত্তিভোগী আশ্রিত রূপে বিভিন্ন কলার অনুশীলন ও সৃষ্টি করে সংস্কৃতি-সভ্যতাকে এগিয়ে এনেছেন। শাহ-সামন্তযুগ অবসিত হওয়ার পরে পত্রিকা অফিসে, বইয়ের দোকানে, পাঠাগারে, চা-কফির দোকানে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীর আড্ডা বসে, কোনো কোনো পাড়ায় তাঁরা ক্লাব ঘরেও বসেন। সুতরাং আড্ডা না হলে কারো চলে না।

আড্ডা কি? একটা নিরুদ্দিষ্ট, নির্লক্ষ্য অর্থাৎ বৈষয়িক লাভ-লোভ-স্বার্থ নিরপেক্ষ সঙ্গবাঞ্ছাজাত জমায়েত মাত্র। আড্ডার একজন মধ্যমণি থাকেন। তিনি তাঁর বুদ্ধি, যুক্তি, জ্ঞান, প্রজ্ঞাপ্রয়োগে অন্যদের চমৎকৃত করার ক্ষমতা রাখেন। এবং তাৎক্ষণিকভাবে কোনো বিষয়ে উত্তর, মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত দানের অসামান্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকে তাঁর। তিনি অন্যদের তুলনায় বেশি বুদ্ধিমান, বেশি বাকপটু এবং বিভিন্ন রসের সমঝদার ও রসিক। তাঁকে কেন্দ্র করে আড্ডা জমে ওঠে, ঘর থেকে কেউ কিছু বলতে, কিছু শুনতে, কিছু জানতে কিছু বুঝতে আগ্রহী হয়ে আড্ডায় যায় না, যাত্রাটা নির্লক্ষ্য প্রিয়পরিচিত জনের সঙ্গলাভ স্পৃহামাত্রা তবু আড্ডায় উপস্থিত হলে কিছু বলতে হয়, কিছু শুনতে হয়, কিছু জানতে ও বুঝতে হয়। এমনকি কিছু দেখতেও হয়। কারণ চোখ, কান, মনতো খোলা থাকে। তাই পরোক্ষে কিছু জানা, শোনা, বোঝা সহজ হয়। তাতে জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়ে। মন-মননের বিকাশও সম্ভব হয়। কিন্তু কোনোটাই আসলে সব সময়ে গুরুতর আলোচনার বিষয় হয় না। আড্ডায় ধর্মকথা, নীতিকথা থেকে শুরু করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য সম্বন্ধে যেমন আলাপ হয়, তেমনি শ্লীল-অশ্লীল নানা ভাবে পরনিন্দা, পরচর্চা এবং রসিকতা প্রভৃতিও বাদ যায় না, সঙ্গেতো থাকেই ঠাট্টা-মশকরা-পরিহাস। মাঝে মাঝে তর্ক-বির্তকের ঝড়ও ওঠে। মাঝে মধ্যে তর্ক-বির্তক হাতাহাতি-মারামারিতে পরিণত হয়। তবু তাতে দুই বিরুদ্ধ দল গড়ে ওঠে না, বিবাদটা ব্যক্তিস্তরে সীমিত থাকে। এবং একসময়ে মনের ম্লানিমা মুছে যায়। মিলন ঘটে আবার।

তবে এই কথা স্বীকার করতে হবে, আড্ডা মাত্রই একরকমের জ্ঞান-বুদ্ধির অনুশীলন এবং সংযম ও পরমত-কর্ম-আচরণ সহিষ্ণুতা ও সৌজন্য শেখায়। আমাদের ধারণায় গাঁয়ে গাঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় আড্ডার প্রসার সমাজ উন্নয়নের সামাজিক সংস্কৃতির বৃদ্ধির সহায় হয়। আড্ডা মৈত্রীর ও সহযোগিতার বর্ধকও। আড্ডা এভাবে বিভিন্ন কলার উৎকর্ষেরও পরোক্ষ কারণ হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড্ডা সঙ্গ ও সঙ্গী-সুখের উৎস। আড্ডা যেহেতু কোনো লাভ-লোভ-স্বার্থ সম্পৃক্ত নয়, সেহেতু আড্ডাতে যেতে কোনো মানুষের প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না এবং আড্ডাতে শ্লীল অশ্লীল রস, রসিকতার অবতারণা করা হয় কিংবা পরনিন্দা পরচর্চা অথবা জ্ঞান-গর্ভ নৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক শৈক্ষিক সাংস্কৃতিক বৈজ্ঞানিক কিংবা শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক যেসব আলোচনা হয়, তা যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন ঘরে ফেরার সময় তা হালকা ঘুমের হালকা স্পর্শের মতো মন থেকে মুছে ফেলে হালকা মনে ঘরে ফেরা যায় প্রসন্ন চিত্তে। এতে নাকি মানসিক ও কায়িক স্বাস্থ্য সুষ্ঠু থাকে। এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়। অতএব জয়তু আড্ডা।

রাজার আদর্শ সিংহ

সিংহ অরণ্য ও পর্বতবাসী, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য ও পর্বত মানুষের পক্ষে চিরকালই দুর্লঙ্ঘ্য দূরঅতিক্রম্য ও বিপদ সঙ্কুল। একালে মানুষের হাতিয়ারের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। আজকের আণবিক অস্ত্র দিয়ে অরণ্য-পর্বত ধ্বংস করা যায়। এমন এককাল ছিল যখন পাথর ও লাঠি ছাড়া মানুষের কোনো অস্ত্রই ছিল না। তারপর তীর-ধনু ও বর্শা এল, আরও পরে এল বন্দুক ও কামান। তবু মানুষ বাঁচার গরজেই জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও খাদ্য সংগ্রহের জন্যে অরণ্যে যেতই দলবদ্ধ হয়ে। পশুদের ভীত করার জন্যে সঙ্গে রাখত আগুন, বিপদ এড়ানোর জন্যে মানুষ আশ্রিত হত বুনো বৃক্ষের ডগায়। ভেবে বিস্মিত হই সেই আদি ও আদিম কালেই মানুষ বাঘ-সিংহের বিক্রমের পার্থক্য এবং স্বভাবের স্বাতন্ত্র্য জানতে বুঝতে পেরেছিল। বাঘ-সিংহ উভয়েই হিংস্র, কিন্তু বাঘের হিংস্রতাকে মানুষ ভয় করে বটে, কিন্তু শ্রদ্ধা করে না। অথচ সিংহের শক্তিকে ও হিংস্রতাকে মানুষ তাদের গোষ্ঠীর, গোত্রের সমাজের ও রাষ্ট্রের সর্দারের বা রাজার শক্তির ও শাসনরীতির সঙ্গে তুলিত করে মহিমান্বিত করেছে। বস্তুত সিংহের গুণ, শক্তি ও হিংস্রতাই সর্দারের বা রাজার উপর আরোপিত করে সর্দার বা রাজাকে করেছে মহিমান্বিত বা শ্রদ্ধেয়। তাই আমরা মানুষের ভাষায় সিংহ প্রতীক অনেক শব্দ পাই, যেমন সিংহাসন, এ হচ্ছে সর্বোচ্চ বল-বীর্যের প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ। যেমন সিংহদ্বার মানে সর্বোচ্চ সর্ববৃহৎ সুন্দর ও প্রধান প্রশস্ত প্রবেশ পথ। যেমন সিংহভাগ মানে অন্য যে কোনো কারোর থেকে বেশি সংখ্যায় পরিমাণে যে-কোনো সামগ্রিক সম্মান সম্পদ সম্ভোগ্য দ্রব্য প্রাপ্য হচ্ছে সিংহের তথা সর্দারের বা রাজার অর্থাৎ শক্তিমান প্রধান ব্যক্তির। মানুষ আজো সগৌরব 'সিংহ'-এ কুলবাচি বা পদবী নামের সঙ্গে ব্যবহার করে। মানুষের উদারতার, দানশীলতার, মহত্ত্বের সঙ্গে সিংহের হৃদয়ের তুলনা করা হয়। ইংল্যান্ডের রিচার্ড নামের এক রাজা 'কো'ড্য লায়ন' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন ক্রুশের যুদ্ধে তাঁর বল-বীর্যের ও নেতৃত্বের অসামান্যতার জন্যে। যদিও আমাদের দেশে শক্তি-সাহস ও দৃঢ় সংকল্পসম্পন্ন অভীক মানুষকে সাধারণত বাঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তার বাঘা তেজ বা ব্যাঘ্র সুলভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তি-সাহসের জন্যে কোনো কোনো মানুষকে বাঘের বাচ্চাও বলা হয়। আমাদের স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন লোকমুখে "বাঙলার বাঘ" নামে প্রশংসিত তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্বের জন্যে। রাজনীতিক নেতা আবুল কাসেম ফজলুল হককে উত্তর ভারতের মুসলিম রাজনীতিকেরা শের-ই-বাঙলা উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। ওরাও সাহসী, শক্তিমান, নির্ভীক মারমুখো ব্যক্তিকে "শেরকা ব্যাচ্চা" বলে প্রশংসা করে।

আমরা তবু কোনো কোনো অঞ্চলে কারো কারো শের আলী, শেরসিং, সার্দুলসিং প্রভৃতি নাম সমাজে চালু দেখতে পাই, তবে মনে হয় বাঘের স্থান জনগণের চেতনায় কোনো কালেই সিংহের উপরে ছিল না। এজন্যেই পাঞ্জাবের রাজপুতনায় শিখ ও হিন্দুদের কুলবাচি হিসেবে সিংহ নামের সঙ্গে সংযুক্ত। এমন কি বাঙলাদেশেও কায়স্থদের মধ্যে সিংহ উপাধি সুলভ, কিন্তু বাঘ বা সার্দুল পদবী কোথাও দেখা যায় না। এতে বোঝা যায় সিংহের মর্যাদা সর্বোচ্চ। তাইতো রাজ আসনের নাম সিংহাসন। তাইতো প্রাসাদের ও দুর্গের প্রধান দরজার নাম সিংহদ্বার। এই সিংহ ভারতীয়দের চেতনায় এতো গুরুত্বপূর্ণ যে তার সাংস্কৃতিক চিন্তা-চেতনায় তার ভাষায়, তার নামে সিংহ ও সিংহের গুণ নানাভাবে যুক্ত হয়েছে। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক সুদূর কম্বোডিয়ায় মোঙ্গল গোত্রীয় রাজার নরোদম সিহানক নাম হচ্ছে সংস্কৃতে নরোত্তম সিংহনখ। শব্দগুলোর উচ্চারণে বিকৃত রূপ। লক্ষণীয় যে সিংহনখ হচ্ছে বলবীর্যের প্রতিম ও প্রতীক। বাঙলাভাষায় শ্রেষ্ঠ বীরকে বীরসিংহ বলা হয়। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সত্যেন দত্তের কবিতার একটি চরণ এইরূপ,

বীরসিংহের সিংহশিশু বিদ্যাসাগর নাম।

সিংহীর নয়– সিংহের কেশরের সৌন্দর্য বর্ণনার সময় সিংহকে কেশরী বলা হয়। কোনো কোনো অসচেতন লেখক বীর সিংহকে বীর কেশরী লিখে ভুল করেন। কারণ কেশরী বললে দৈহিক সৌন্দর্য বোঝায়। বল-বীর্য চাপা পড়ে।

আধুনিক প্রাণিবিজ্ঞানীরা সিংহ সম্বন্ধে স্থূল সূক্ষ্ম সবকিছুই জানেন। কিন্তু সুপ্রাচীন কাল থেকেই সিংহের কাছে না গিয়েও সিংহ না পুষেও বর্ণনা করে সিংহকে এভাবে মহিমান্বিত করা হল কিভাবে তা বোঝা যায় না। এখনকার দিনে দেখতে পাচ্ছি চিড়িয়াখানায় সারকাসে সিংহকেও কুকুর-বেড়াল-হাতি-ঘোড়ার মতোই পোষ মানানো যায়, অনুগত করে তাদের দিয়ে লোকরঞ্জক খেলাও দেখানো যায়। আমাদের দেশে একটা ইতিহাসগত গল্প চালু আছে। সেটি হচ্ছে এই– আকবরের আমলে বাঙলার সেনানীশাসক ছিলেন রাজপুত মান সিংহ। ঢাকায় শ্রীপুরের ভূঁইয়া ছিলেন তখন চাঁদ রায়-কেদার রায়, মান সিংহ তাঁদের মুঘলের বশ্যতা স্বীকারের জন্যে পত্রযোগে আহ্বান জানান। পত্রে সম্ভবত দিল্লীর সম্রাটের প্রতিনিধি মান সিংহের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বা হুমকি স্বরূপ কোনো কথা ছিল। পত্রের উত্তরে তাই চাঁদ রায় নাকি লিখেছিলেন সিংহ বিক্রমশালী হলেও পশু মাত্র। কাজেই তার ভয়ে মানুষ ভীত হয় না।

সিংহ একটা বুনো হিংস্র পশু মাত্র। কিন্তু সুপ্রাচীনকাল থেকে সিংহ মানুষের শক্তি সাহস সংকল্প উদারতা মহত্ত্ব শ্রেষ্ঠত্ব সর্বোচ্চ সম্মান সর্বাধিকার প্রভৃতির প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ হয়ে রয়েছে আজো। আধুনিক প্রাণীবিদেরা সিংহকে প্রকৃতপক্ষে এই সম্মান দেন কিনা জানি না। কারো কারো মতে সিংহ অলস বা রাশভারী প্রাণী কিন্তু কায়িক শক্তিতে প্রবলতম। তাই ভীত পশুরা তাকে রাজা মানে। মানুষের মধ্যে সর্দার বা রাজামাত্রই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহুবলে, ধনবলে, জনবলে, হিংস্রতায়, সাহসে উদ্যমে প্রবলতম। লোক-প্রচলিত সুপ্রাচীন বিশ্বাস অনুসারে সিংহ হচ্ছে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ধীর-বুদ্ধিতে, শিকারের নৈপুণ্যে, সংযত চরিত্রে এবং কায়িক শক্তিতে ও রণ কৌশলে বনের শ্রেষ্ঠ প্রাণী। তাই তাকে বুনো প্রাণী মাত্রেই ভয়-ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে এবং রাজা বলে মানে। সেই বুনো রাজাই মনুষ্য রাজারও আদর্শ হয়েছে যুগে যুগে কালে কালে দেশে দেশে মাংসাশী সিংহ নাকি ক্ষুধার্ত না হলে কখনো আহারের জন্যে প্রাণী হত্যা করে না, এমনকি এমন গল্প চালু আছে যে সিংহ রাজা বলেই অন্য প্রাণীরা মিলে কোনো একটা প্রাণীকে আহারের জন্যে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়। সত্যি কি সিংহ এতো গুণের গুণী যাতে সে মানুষের আদর্শ হয়ে রয়েছে! অবশ্য টোটেম-ট্যাবু যুগের লেশ ও রেশ রয়ে গেছে সিংহ সম্বন্ধে এ বিবর্তিত ধারণার মধ্যেও।

'জাতীয়' বিশেষণে সবিশেষ

যদিও আমাদের কোনো সর্বসম্মত জাতি নাম নেই, নেই নির্দিষ্ট কোনো জাতীয় পোশাক। তবু অন্যসব রাষ্ট্রের মতো আমাদেরও রয়েছে জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় জাদুঘর, জাতীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় উদ্যান, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, তেমনি আছে, জাতীয় পাখি দোয়েল, জাতীয় ফুল শাপলা, জাতীয় পশু বাঘ, জাতীয় মাছ ইলিশ, জাতীয় ফল কাঁঠাল, আরও কিছু জাতীয় পশুপাখি হতে পারত, যেমন সরাইলের কুকুর, ময়মনসিংহের খাসি, জালালি কবুতর।

AMARBOI.COM

আমাদের আরও নানা জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও দল আছে। যেমন জাতীয় সংসদ, জাতীয় রাজনীতিক দল, জাতীয় স্তরের দৈনিক পত্রিকা। জাতীয় রেডিও টেলিভিশন। জাতীয় ভাষা, এমনকি আমাদের জাতীয় মসজিদও আছে। যাতে সম্ভবত বিদেশী, বিভাষী, বিজাতি মুসলিমকে ভিসা বা অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতে হয়, নইলে আল্লাহর উপাসনা ঘর কোনো বিশেষ রাষ্ট্রের জাতীয় মসজিদ হয় কি করে, যেমন কাবা বা দরগাহ কারো জাতীয় সম্পদ হতে পারে না।

আমাদের জাতীয় অধ্যাপকও আছে। শোনা যায় অন্যান্য দেশে জাতীয় অধ্যাপক মাত্রেই গুণে-গৌরবে অনন্য। তাঁকে বিদ্বান, গবেষক, আবিষ্কারক, উদ্ভাবকরূপে আন্তর্জাতিক খ্যাতির বা পরিচিতির অধিকারী হতে হয়। হতে হয় অন্তত স্বদেশে প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ইতিহাসকার, গবেষক, উদ্ভাবক, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থবিজ্ঞানী কিংবা সাহিত্যিক, শিল্পী প্রভৃতি। কিন্তু এই সংজ্ঞায় সবাই উৎরে না গেলেও রাষ্ট্রের সর্বত্র শিক্ষিত সমাজে কোনো গুণের বা গৌরবের জন্যে তাঁদের পরিচিতি থাকা আবশ্যিক ছিল। আমাদের দেশের জাতীয় অধ্যাপকদের পদ ও পদবী যখন লাভ হয়, তখন রেডিও-টেলিভিশনে ও সংবাদপত্রে তাঁদের নাম ও ছবি দেখে-শুনে আমরা চমকিত হই। কেননা এইসব নাম প্রায়ই আকস্মিকভাবে আমাদের চমকে দেয়। শুনতে পাই পৃথিবীর সব দেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাকি সব রকমের পুরস্কারই সর্বক্ষেত্রে যোগ্যতার ভিত্তিতে মেলে না। কারো তদবির-এর জোরে এবং কারো তকদীর-এর জোরে আকস্মিকভাবে এই পুরস্কার ও মান মেলে। কাজেই যারা পায় না অথচ প্রত্যাশা রাখে তারা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের নিন্দা কিংবা সিদ্ধান্তকে উপহাস করে আত্মপ্রবোধ লাভ করে। কিন্তু যাঁরা এই পুরস্কার ও পদ-পদবীর মান পেয়ে থাকেন তাঁরা সাধারণত নিজেদের অযোগ্যতার জন্যে লজ্জিত হন না। বরং গর্বিত হন ও পরিবার কিংবা স্বগোষ্ঠীও মনে করে যেন এই পুরস্কারের যোগ্যতা সত্যি আছে, যোগ্য সরকার বা প্রতিষ্ঠান জহুরীর মতো জওহর বা রতন চিনেই এই সম্মান যোগ্য ব্যক্তিকে দিয়ে থাকে। তাছাড়া সমকালে কয়জনই বা কার বিদ্যা-বুদ্ধির খবর রাখে। অন্যরা সত্যিই মনে করে যে যোগ্য ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা হয়। এবং পর জন্মের লোকেরা কোনো কারণে এদের নাম জানতে পারলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণে রাখে। যেমন ব্রিটিশ আমলের ব্রিটিশ অনুরাগী অনুগামী ও অনুগত চাটুকার পদলেহিরাই স্যার, নওয়াব, রাজা, মহারাজা, শামসুল ওলামা, মহামহোপাধ্যায়, রায় সাহেব, রায় বাহাদুর, খান সাহেব, খান বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি পেতেন। তাঁদেরও বংশধরেরা স্বাধীনতা পরবর্তী কালেও এসব কৃতী পুরুষকে সগৌরব সগর্ব স্মরণ করে। অবশ্য কেউ কেউ তোয়াজ, তোষামোদ না করেও যোগ্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ বিনা তদবীরেও হয়তো এইসব উপাধি পেতেন এবং তাঁরা যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে আজ সর্বজন শ্রদ্ধেয়। এখন অবশ্য বিনা তদবীরে কোনো কোনো যোগ্য ব্যক্তি সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়ে থাকেন। তাঁরাও আমাদের অবশ্যই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

জাতীয় গৌরব এইভাবে জীব, উদ্ভিদ, ও মানুষের মধ্যে কয়েক শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ না রেখে সব শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে বিস্তৃত ও উদারভাবে ভাগ করে দিলে যোগ্যতার ও অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয় বলে আমাদের বিশ্বাস। যেমন খানজাহান আলীর দিঘীর কুমীরকে, বায়জিদ বোস্তামির দরগাহ-এর কচ্ছপকে, শাহজালাল-এর দরগাহর গজারি মাছকে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি দেয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন বাঞ্ছনীয় অসংখ্য নদী উপনদীর মধ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনাকে জাতীয় পর্যায়ে নানা ভাষণে ও লেখায় স্মরণ করা হয়, তেমনি জাতীয় চিড়িয়াখানা, জাতীয় বলধা গার্ডেন, সরকারি বোটানিকাল গার্ডেন প্রভৃতির মতো আরও অনেক কিছুই জাতীয় গৌরব-গর্বের বিষয় হিসেবে স্বীকৃত হওয়া দরকার। বিচারের মাপকাঠি যখন অনির্দিষ্ট এবং বিচারও যখন সরকারি খেয়াল-খুশী নির্ভর তখন স্ব স্ব জীব-উদ্ভিদের আর প্রিয়জনের এইভাবে মর্যাদা বৃদ্ধিতে কার কিবা ক্ষতি! বিশেষ করে ধূর্ত শেয়ালও এমনি জাতীয় মানের ও পর্যায়ের হতে পারে। তাছাড়া শেয়াল বাঙালি স্বভাবেরও প্রতীক। এই সূত্রে উত্তরবঙ্গের গলগণ্ড খেসারিজাত পঙ্গুত্বকেও জাতীয় ব্যাধিরূপে অভিহিত করা চলে। বিশেষ করে পুরস্কার যেখানে গুণগ্রাহিতা বলে যোগ্যতার ও গুণের স্বীকৃতি বলে দাবি করা হয় সেখানে যোগ্যের সংখ্যা বাড়াতে বাধা কি? বঞ্চিতরা বিক্ষুব্ধ হলই বা তাতে কার কি ক্ষতি!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৈতন্যের পরিচর্যা

রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য বাণীবদ্ধ মনমাতানো গান আছে, শাপমোচন গীতিনাট্যে ব্যবহৃত তেমন একটি গান নাটকের বক্তব্য সম্পৃক্ত হলেও বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন তাৎপর্যেও একে অনুভবের ও উপলব্ধির মাধ্যমে উপভোগ করা যায় বলে আমাদের ধারণা। এখানে পুরো গানটি তাই উদ্ধৃত করছি:

রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাও গো এবার যাবার আগে,
তোমার আপন রাগে, তোমার গোপন রাগে,
তোমার তরুণ হাসির অরুণ রাগে,
অশ্রু জলের করুণ রাগে।।
রঙ যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে,
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে, গভীর রাতের জাগায় লাগে।।
যাবার আগে যাও গো আমায় জাগিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমার চরণ-দোলা লাগিয়ে দিয়ে।
আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণগুহার কক্ষে নিঝর ধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে
বিশ্ব-নাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,
তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে,
কাঁদন-বাঁধন ভাঙ্গিয়ে দিয়ে।

এক এক মানুষের জীবনে প্রেমের প্রভাবে ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আর্দশের প্রভাবে নতুন চেতনার ও চিন্তার প্রভাবে জীবনদৃষ্টির জীবনের গতি-প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। সাদামাঠা কথায় জীবনের খোল নলচে বদলে যায়। এ প্রভাব আমরা ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে শিকার করি। এ প্রভাবের অনুগত হই। ব্যক্তির সমষ্টিতে গড়ে ওঠে পরিবার, সমাজ, দেশ, জাতি, রাষ্ট্র। আদি ও আদিমকাল থেকেই একটা গোষ্ঠী, গোত্র বা সমাজ, কারো না কারো প্রভাবে, নেতৃত্বে, আদেশে, নির্দেশে উপদেশে বা পরামর্শে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এবং সেই ভাবেই কিছু নীতিনিয়ম রীতিরেওয়াজ প্রথাপদ্ধতি গড়ে ওঠে, যা জনজীবনে তাঁদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে অভিব্যক্তি লাভ করে। অতএব ব্যক্তির উপর ব্যক্তির প্রভাব যেমন পড়ে, তেমনি বড় মনের, বড় মগজের, বড় মননের, বড় মনীষার প্রভাব ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে গোষ্ঠী গোত্র দেশ জাতি প্রভৃতিকে অতিক্রম করে বৃহত্তর মানব সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। এবং শাস্ত্রের ক্ষেত্রে তা প্রায় চিরন্তন হয়ে বহু মানুষের জীবন, জগৎ ও জীবনভাবনা নিয়ন্ত্রণ করে, এভাবে পৃথিবীর ধর্ম সম্প্রদায়গুলো গড়ে উঠেছে নবী, অবতার, সন্ত, দরবেশ প্রভৃতির ব্যক্তিত্বের ও মনীষার প্রভাবে। বস্তু যেমন পুরোনো হলে রূপ বদলায় রঙ বদলায় জীর্ণতা পায়, তেমনি তত্ত্ব, তথ্য ও সত্যও কালে কালে বিবর্তন ও বিকৃতি পায়, অনেক সময়ে তাৎপর্য হারিয়ে উপযোগরিক্ত হয়ে রীতিরেওয়াজের প্রথাপদ্ধতির অসার্থক অংশ হয়ে টিকে থাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ করে বেশি। কাজেই বস্তু যেমন চিরকাল ব্যবহার্য থাকে না, তত্ত্ব, তথ্য এবং সত্যও তেমনি কালক্রমে ও প্রজন্মক্রমে পরিবর্তিত প্রতিবেশে, অবস্থায় ও অবস্থানে তার তাৎপর্য ও উপযোগ হারায়, তখন তা বর্জন করাই বাঞ্ছনীয় কল্যাণকর হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ জীবিকাচিন্তায় প্রাধান্য দেয় বলে এবং প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদা পূরণে ব্যস্ত থাকে বলে তাদের আস্তিক্যবোধের শাস্ত্রচিন্তার রূপ-স্বরূপ বিচারে-বিশ্লেষণে কখনো মনোযোগী হয় না। ফলে আশৈশব শ্রুত, প্রাপ্ত ও দৃষ্ট গতানুগতিক বিশ্বাসে সংস্কারে ও ধারণায় চালিত হয়ে সারা জীবন নিসংশয় জীবন যাপন করে। মনে করে যেন এর চেয়ে শ্রেয়স কোনো মত-পথ-নৈতিক চেতনা বা আদর্শ অথবা জীবনদৃষ্টি হতেই পারে না। এ হচ্ছে এক রকমের মূর্খের স্বর্গে বাস করা এবং এই নিশ্চিত নিষ্ক্রিয় গতানুগতিক জীবনে তাই তাঁদের অন্ধতা ঘোচে না, মানবিক গুণেরও হয় না বিকাশ। এমনকি অধিকাংশ মানুষ থেকে যায় নিতান্ত প্রাণীর স্তরেই। তারা লৌকিক স্থানিক অলৌকিক অলীক উপযোগরিক্ত বিশ্বাসে, সংস্কারে ধারণায় খাঁচায় বদ্ধ পাখির মতো একঘেয়ে জীবন যাপনে থাকে তুষ্ট তৃপ্ত ও হৃষ্ট, অথচ প্রতিদিনের নতুন সূর্যের সঙ্গে তাল রেখে নতুন নতুন চিন্তায় ও চেতনায় মন মগজ মনন মনীষা রাঙিয়ে না তুললে নতুন ভাবে চিন্তায় কর্মে ও আচরণে নতুন কিছু যুক্ত না হলে জীবন যে পিছিয়ে পড়ে, মগজ মনন মনীষা যে গতানুগতিক ধারায় আবর্তিত হয়, চিত্তলোকে নতুন চেতনার ও আনন্দের সঞ্চার পন্থা রুদ্ধ হয় তা তাদের ধারণার মধ্যেও থাকে না। ভাববাদী কবির এই কবিতা বা গান আমরা উদ্ধৃত করেছি অন্তরে ভক্তিভাব জাগানোর জন্যে নয়। কোনো আধ্যাত্মিক অনুভূতির মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যেও নয়। আমরা শেষের দিকের কয়েকটি চরণের আক্ষরিক রূপায়ণ জীবনে কাম্য বলেই মনে করি সমকালীন জীবনের চাহিদা পূরণের জন্যে অনুপ্রাণিত হওয়ার লক্ষ্যে চরণগুলো এই–

আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণ গুহার কক্ষে নিঝর-ধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে।
বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,

জীবনকে কালোপযোগী করে গড়ার জন্যে, চালিত করার জন্যে এবং উপভোগ করার জন্যে আর সার্থক করার জন্যেই চাই বটে যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবন, যন্ত্রবিজ্ঞানে বাণিজ্যে এবং সম্পদ সঞ্চয়ে গুরুত্ব। এছাড়া একালে ফ্রিথিংকার না হলে কারো পক্ষে মুক্ত চিন্তা ও শ্রেয়সচেতনা নিয়ে যুক্তি ও বুদ্ধি গ্রাহ্য জীবন যাপন সম্ভব নয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, সাংস্কৃতিক জীবনে, রাজনীতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে আর বৈষয়িক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধ রক্ষায় এমনি এক জাগ্রত জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। নইলে আমরা ক্রয় করা যন্ত্রে ব্যবহারিক জীবনে আধুনিক থাকব বটে, কিন্তু মানসিক জীবনে সেই হাজার, দুই হাজার, তিন হাজার বছর আগেকার জীবনের পুরোনো জগতেই বাস করব। সেই জীবন কারো অভিপ্রেত হতে পারে না, কেন না মনে, মগজে, মননে, মনীষায় সমকালীনতা না থাকলে, তা জীবনের সম্পদ না হয়ে জীবনের বোঝা হয়েই দাঁড়ায়। আমাদের সর্বপ্রকারে রেনেসাঁসপন্থী হতে হবে। অতীত ও ঐতিহ্যমুখিতার নাম হচ্ছে রিভাইব্যালিজম, তা কাম্য নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজের মানুষকে নতুনভাবে চিন্তায়, চেতনায়, কর্মপ্রেরণায় রাঙিয়ে দেওয়ার মতো, জাগিয়ে দেওয়ার মতো, মনে ধরিয়ে দেওয়ার মতো, মর্মে লাগিয়ে দেওয়ার মতো মনীষা সম্পন্ন প্রজ্ঞাবান লোকের আবির্ভাব সবসময়ে কাম্য হলেও দেখা যায় কোটিতে গুটিকও মেলে না শতাব্দীর পর শতাব্দীর কালের পরিসরেও কোনো কোনো দেশে বা সমাজে। তাই সংস্কৃতিতে সভ্যতায় মানুষের কোনো অগ্রগতি হয় না, লাটিমের মতো গতানুগতিক অভ্যস্ত রীতিতে জীবন অবক্ষয়গ্রস্ত হয় মাত্র। আমাদের দেশে আমরা এই রাঙিয়ে দেয়ার মতো, জাগিয়ে দেবার মতো, মুক্তির স্পৃহা জাগানোর মতো মানবিক গুণে আত্ম-বিকাশে অনুপ্রাণিত হবার মতো মানবতায় ও মনুষ্যত্বে ঋদ্ধ হওয়ার প্রবর্তনা দেওয়ার মতো লোক চাই। এ লোক আমাদের বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। আমাদের অতীত ও ঐতিহ্যমুখিতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে যুক্তি-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা প্রয়োগে যৌক্তিক বৌদ্ধিক জীবন যাপনে অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্যে আমরা সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, যন্ত্র আবিষ্কারে-নির্মাণে, সম্পদ-সৃষ্টিতে, বাণিজ্যে সংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন মানববাদী ব্যক্তিত্বের, নেতৃত্বের, মনীষার প্রত্যাশী।

AMARBOI.COM

আবারও শিক্ষার কথা

যাঁরা বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও উচ্চাশী দেশের মধ্যে তাঁদের বাঞ্ছিত আয়ের কোনো চাকরি মেলে না। তাই তাঁদের ধনিক, বণিক, আমলা, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার অভিভাবকেরা সন্তানদের সাড়ে তিন বছর বয়স থেকে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে থাকে। কারণ ইংরেজি এখন গোটা পৃথিবীর লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা। ফলে ইংরেজি-জানা যে-কোনো বিষয়ে বিদ্বান ও বিশেষজ্ঞ মাত্রই পৃথিবীর যে-কোনো দেশে চাকরি বাকরি করে বিপুল অর্থ উপার্জন করে স্বচ্ছন্দে শৌখিন জীবন যাপন করতে পারে। এ জন্যে আজকাল আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন কাজে যোগ্য ও বিশেষজ্ঞ লোক উচ্চ বেতনের চাকরির জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রোজই পাড়ি জমাচ্ছে।

নিঃস্ব, নিরন্ন, দুঃস্থ লোক ভাত-কাপড় চায়, দরিদ্র চায় ধন। দরিদ্র ধনী হলে চায় মান। মানের জন্যে চাই ক্ষমতা এবং ক্ষমতা লাভের জন্যে দরকার পদ ও পদবী। কিন্তু উল্লেখ্য যে, বিদেশে যারা বিপুল অর্থ অর্জনের জন্যে পাড়ি জমায় এবং যথাসময়ে দেশে ফিরে আসে তারাই বুদ্ধিমান, আর যারা বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে তারা স্বচ্ছন্দে শৌখিন জীবন যাপন করে বটে, কিন্তু সেই দেশে তারা এবং তাদের সন্তানেরা সংখ্যালঘুর প্রাপ্য তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা, অবহেলা পেতে থাকে। যোগ্যতা থাকলেও সম্মানে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারে না। সেদিক দিয়ে তারা প্রজন্মক্রমে সংখ্যালঘু হিসেবে হীনম্মন্যতায় ভোগে। এখন আমরা জানি, পৃথিবীর কোথাও সংখ্যালঘুরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান নাগরিক অধিকার ভোগ-উপভোগ করতে পারে না। মাঝে মধ্যে নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শাস্ত্রিক, ভাষিক, বার্ণিক কারণে লাঞ্ছিত ও বিপন্ন জীবন যাপন করে। এই জন্যেই লোকে কথায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা।' অবশ্য কোথাও কোথাও অনন্য-অসামান্য-অসাধারণ বিদ্বানের-গবেষকের-আবিষ্কারকের-উদ্ভাবকের ও বিশেষজ্ঞের বিদেশে বিজাতির মধ্যেও উচ্চতম সম্মান মেলে। কেননা 'বিদ্বানং সর্বত্র পূজ্যতে'। এতএব, যথাসাধ্য পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করা যে-কোনো বুদ্ধিমান ও উচ্চাশী লোকের পক্ষে আবশ্যিক ও জরুরি। সুতরাং আমরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে সবাইকে উৎসাহদানে রাজি ও আগ্রহী।

কিন্তু আমরা জানি ১৯৩০ সালের পরে স্কুলের প্রবেশিকা শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু হয়, কিন্তু ইংরেজির গুরুত্ব বিন্দুমাত্র হ্রাস না করে তা করা হয়। কারণ তখন ব্রিটিশ আমল চলছে। আমরা চেয়েছিলাম পাকিস্তান এবং বাঙলাদেশ আমলেও সমগুরুত্বে ইংরেজি শিক্ষাদান করা হোক। কিন্তু কিছু চালবাজ রাজনীতিকের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তে ও পরামর্শে মাতৃ ভাষাকে স্বাধীন দেশে অকারণে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় এবং ইংরেজির গুরুত্ব প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে, ফলে নতুন শাসক-শোষক ইংরেজি শিক্ষিত একটা শ্রেণী গড়ে ওঠে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের ফলে। স্কুলে নামত ইংরেজি শিক্ষাদান চালু থাকলেও কার্যত তা ইংরেজি শিক্ষা-বঞ্চনার নামান্তর হয়ে দাঁড়াল। এটাও হচ্ছে কায়েমী স্বার্থবাদী রাজনীতি ও অর্থ-বাণিজ্য সচেতন শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবুদ্ধিরই ফল। শুধু এখানেই শেষ নয়, তারা কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়েও মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানে, দর্শনে, ইতিহাসে, সমাজবিজ্ঞানে এমন কি আয়ুর্বিজ্ঞানে ও প্রকৌশল প্রযুক্তিতেও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানে প্রয়াসী ছিল। অথচ আমরা সবাই জানি এই যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বপ্রকার উৎস হচ্ছে য়ুরোপীয় ভাষা। তাই আমাদের মতে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা দান আবশ্যিক। আয়ুর্বিজ্ঞানে, প্রকৌশলে প্রযুক্তিতে এবং বিজ্ঞানের কয়েকটি শাখার-বিষয়ে বাঙলাতে শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয় দেখে সেসব বিষয় এখনো ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পড়ানো হয়। এভাবে শহুরে শিক্ষিত ধনিক, বণিক, আমলা, সাংসদ, শিক্ষাবিদ ও নানা পেশার বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে প্রতিযোগিতা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতাও আয়ত্তের মধ্যে সীমিত রাখার কুমতলবে বৃহত্তর আমজনতার সন্তানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সুকৌশলে অযোগ্য অবিদ্বান অবিশেষজ্ঞ করে রাখার প্রায় স্থায়ী ব্যবস্থা করল। প্রমাণ, আজ তাই মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উঁচুমানের ফল শহুরে ধনী শ্রেণীর ঘরের সন্তানের মধ্যে সীমিত দেখতে পাই, মফস্বলের হাজার হাজার গ্রামীণ স্কুলগুলোর, শত শত কলেজগুলোর, এবং মফস্বল থেকে আসা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফল নিতান্ত নিম্নমানের, তারা সাধারণভাবে লেখাপড়ায় কাঁচা, আচারে আচরণে অজ্ঞ। জ্ঞানের আলো ও আত্মপ্রত্যয় তাদের অন্তরে ও মগজে নিতান্ত দুর্লভ। কোনো দেশপ্রেমিক ও মানবদরদী নেতা, রাজনীতিক, শিক্ষিত ব্যক্তি, আমলা, সাংসদ, মন্ত্রী এবং তথাকথিত বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধিজীবী জাতির এতোবড় সর্বনাশ করতেই পারে না। এতেই বোঝা যায় আমাদের শিক্ষিত ধনী-মানী শহুরে মানুষেরা বিদ্বান বুদ্ধিমান ও উচ্চাশী এবং বিত্তবান হলেও চিত্তবান মানুষ নন। মানবিক গুণের অভাব রয়েছে তাঁদের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে মানবতাও নেই। মানববাদিতাও নেই। এর চেয়েও হীনতম অমানবিক ষড়যন্ত্র হচ্ছে দেশের নিঃস্ব, নিরন্ন, অজ্ঞ, অনক্ষর, দুঃস্থ, দরিদ্র লোকের সারল্যের ও অজ্ঞতার সুযোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে তাদের ছেলে-মেয়েদের দেড় হাজার বছর আগে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার খাঁচার মধ্যে ধরে রাখা। অপচেষ্টা হচ্ছে উক্ত শাসক এ প্রশাসক শ্রেণীর সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফল-যাতে তারা তথাকথিত লেখাপড়া শিখলেও, যেন দেড় হাজার বছরের সময়ের ব্যবধান অতিক্রম করে কখনো আধুনিকতম জ্ঞান-বিজ্ঞানের মন-মগজ-মনন-মনীষার জীবন আয়ত্ত করে সমকালীন মানুষ বা নাগরিক হতে না পারে। স্বদেশী মানুষের এতো বড় সর্বনাশ কোনো মানবিকগুণসম্পন্ন, মানব আকৃতির মানুষ কি করতে পারে? আমাদের দেশের জাতির, রাষ্ট্রের, সরকারের এবং আর্থবাণিজ্যের আর রাজনীতির মতলববাজ নিয়ন্ত্রক ছাড়া আর কোনো দেশে কারো পক্ষে সম্ভব হত না এমন ষড়যন্ত্র করা।

তাই আমাদের দেশে এই মুহূর্তে বিদেশমুখী ইংরেজি, অতীত ও ঐতিহ্যমুখী আরবী এবং আমজনতার সর্বনাশমুখী নির্লক্ষ্য, বাস্তব প্রয়োজন পূরণমুখী নয়। বাঙলা মাধ্যমের এই তিন প্রকার স্কুল কোনোভাবে চালু থাকতে পারত না। দেশের মানুষও এই ক্ষেত্রে অজ্ঞ এবং উদাসীন। তাই আজ প্রতিকারের, প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের জন্যে কোনো দাবি বা আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। দুঃখের কথা আমরা নিজেদের সভ্য জাতি বলে ভাবি অথচ আমাদের একই রাষ্ট্রের তিন ভাষায় তিন পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে, বর্বর যুগের গোত্রীয় ব্যবস্থার মতোই।

AMARBOI.COM

সাম্প্রদায়িকতার ও জাতীয়তার প্রভেদ

কথায় বলে "সব শেয়ালের এক রা" এখানে এক রা মানে অভিন্ন 'রা' নয়, একত্রে রা বা রব। এক শেয়াল হুক্কা হুয়া উচ্চারণ করলেই অন্য শেয়াল একইভাবে সাড়া না দিয়ে পারে না, এ হচ্ছে তাদের পারস্পরিক সখ্য-সংহতি-সহানুভূতির এবং সমর্থনের প্রতীক। তাই বলে শেয়ালের মধ্যে যে ব্যক্তিগত ভাবে বিরোধ-বিবাদ ঘটে না, তা নয়। কিন্তু প্রজাতিগত ভাবে তাদের প্রাজাতিক ঐক্য বা জ্ঞাতিত্ব চেতনা প্রাণিজগতে সম্ভবত অন্যান্য সব প্রজাতির প্রাণীর মধ্যেই কামে, প্রেমে, আপদে বিপদে সম্পদে, আত্মরক্ষায় ও আত্মপ্রসারে একটা ঐক্য ও সহযোগিতা থাকেই।

কাকের মধ্যে আমরা দেখি ওরা ঘন ঘন সভা করে। আবার পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াও বাধে ঘন ঘন কিন্তু একটা কাক কোনো কারণে মানুষের হাতে মারা গেলে নিজেদের বিরোধ-বিবাদ ভুলে মুহূর্তে স্বাজাত্য চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং প্রায় মারমুখো হয়ে চিৎকারে পাড়া মাতিয়ে তোলে।

কুকুরের মধ্যেও দেখা যায় এ-বাড়ির কুকুরের সঙ্গে ও-বাড়ির কুকুরের, এপাড়ার কুকুরের সঙ্গে ও-পাড়ার কুকুরের দেখা মাত্রই বিবাদ শুরু হয়। পরস্পর পরস্পরকে হয়তো প্রতিবাদী কণ্ঠেই অনধিকার প্রবেশের জন্যে গালাগাল করে। কিন্তু আর অন্য কুকুরের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতায় যৌথবদ্ধ জীবন যাপন করতে দেখা যায়। অনেক প্রকারের পাখি, মাছ প্রভৃতিও দলবদ্ধ হয়ে বিচরণ করে, দেখা যায়। আর অন্য পশুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যেও এক প্রজাতির পশু অন্য প্রজাতির পশুর সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে লড়াই করে। এগুলো মানুষের মতো ওদেরও হয়তো জাতীয় স্বার্থে সংগ্রাম।

এই দৃষ্টিতে যদি আমরা যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে চাই, তাহলে মানুষের সমাজে চালু সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তা বোধের একটা ব্যাখ্যা হয়তো পেতে পারি। আমরা দেখতে পাই ঘরোয়া জীবনে ভাইয়ে-ভাইয়ে, ভাইয়ে-বোনে, মায়ে-বাপে, স্বামীতে-স্ত্রীতে, লঘু-গুরু-ঝগড়া-বিবাদ। মন-মেজাজ আছে বলেই এই বিবাদ এড়ানো যায় না, তাই একে লোকে গুরুত্ব দেয় না। উপমা দিয়ে বলে দুটো হাড়ির মধ্যেও কাছাকাছি থাকলে ঠোকাঠুকি লাগে। অথচ সবকিছুর এমনি ঘরোয়া বিবাদ, জ্ঞাতি বিরোধ-বিবাদ গুরুতর রূপ ধারণ করতেও দেখতে পাই, এমনকি কেবল মামলা-মোকদ্দমা নয়, হত্যাকাণ্ডও চলে। কিন্তু এই মানুষই আবার পাড়াগাঁয়ের দলের, শাস্ত্রিকমতের, আর্থিক স্বার্থের, শ্রেণীরই প্রয়োজনে একত্র বা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওই কাকের মতোই শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে বাকযুদ্ধ কিংবা মারামারি-হানাহানি শুরু করে দেয়। একই রাষ্ট্রের বা দেশের মধ্যে হলে আমরা এর নাম দিই সাম্প্রদায়িকতা, শ্রেণীসংগ্রাম আর ভিন্ন রাষ্ট্রের বা দেশের লোকের সঙ্গে এমনি লাভ-লোভ ও স্বার্থগত বিরোধ-বিবাদ ঘটলে ও তা লড়াইয়ে পরিণত হলে তাকে বলি জাতীয় ঐক্যে জাতীয় স্বার্থে সংগ্রাম। অতএব এই দুই চেতনার ও কাজের মধ্যে বাস্তবে কোনো প্রভেদ নেই। দুটোরই উৎস অভিন্ন, লক্ষ্য অভিন্ন এবং ভিত্তিও অভিন্ন। তবু একটি নিন্দিত অপরটি নন্দিত। যেমন ভ্রাতৃবিরোধ-বিবাদ অবাঞ্ছিত ও নিন্দিত, কিন্তু পরের সঙ্গে বিবাদ শক্তির, সাহসের ও পৌরুষের পরিচায়ক বলে নন্দিত। কিন্তু দৈশিক ও রাষ্ট্রিক স্বার্থে বিচ্ছিন্নতা-বিভেদ এড়ানোর জন্যে একে আমরা নিন্দনীয় সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক চেতনা বলে পরিহার করার জন্যে জনগণের কাছে আবেদন ও অনুরোধ জানাই। আবার প্রতিবেশী দেশের ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যদি আমাদের লাভ-লোভের স্বার্থ রক্ষার জন্যে বা স্বার্থহানির আশঙ্কাজাত বিরোধ-বিবাদ বাধে, তখন আমরা জাতীয় স্বার্থ রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনের জন্যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে যাবার আহবান জানাই। তখন একই বিবাদ-বিরোধ-লড়াইকে মহিমান্বিত করে তুলি, উৎসাহ জোগাই সবাইকে বিদেশী, বিজাতি, বিভাষী, বিশ্রেণী, বিধর্মী দ্বেষণায় উত্তেজনা দানের জন্যে। আজ অবধি সাম্প্রদায়িকতার ও জাতীয়তার মধ্যে তাৎপর্যগত ভেদ বজায় রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে শাসক-প্রশাসক ও রাজনীতিকেরা। সব দেশের সব রাষ্ট্রের সরকারের ও রাজনীতিকদের এই মোক্ষমবুলি উচ্চারণ করতে আমরা দেখতে পাই। এর মধ্যে যে যুক্তির দৈন্য ও যুক্তির অসঙ্গতি রয়েছে তা জেনে-বুঝেও কেউ কখনো কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় না। কারণ স্বার্থবুদ্ধিই হচ্ছে সব চেতনার ও চিন্তার, কর্মের ও আচরণের উৎস। তাই মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের মধ্যে কখনো কোনো সঙ্গতি সামঞ্জস্য থাকে না। যখন যেমন গরজ ও প্রয়োজন সেভাবে মানুষ যুক্তি প্রয়োগ করে ন্যায় ও সত্য প্রতিপন্ন করে। এই জন্যে ন্যায়, সত্য, সুবিচার প্রভৃতি সব কিছুই আপেক্ষিক। অনপেক্ষ ন্যায়, সত্য, দায়িত্ব, কর্তব্য, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে কিছুই নেই। অতএব মানুষের শাস্ত্রিক, সামাজিক, নৈতিক, আদর্শিক নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ ও প্রথাপদ্ধতি লোক-প্রতারণার লোকশাসনের এবং শ্রেণীস্বার্থরক্ষার প্রয়োজনেই তৈরি। এ সবেরই শহুরে শিক্ষিত শাসক প্রশাসক সেনানী আমলা সওদাগর ঠিকাদার প্রভৃতি শাসন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশাসন অর্থ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রক শ্রেণীর প্রয়োজনে ও স্বার্থে উদ্ভব বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে, ঘটে। গাঁয়ের অজ্ঞ-অনক্ষর নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র লোকেরা এ সব জানে না, বোঝে না, কেবল এসব কিছুর সঙ্গে যথাসময়ে যথাস্থানে যথাপ্রয়োজনে তাদের জড়ানো ও লিপ্ত করানো হয় ওই শাসক শোষক পীড়ক অর্থবিত্ত বেসাত ও শাসন ক্ষমতার মালিক শ্রেণীর স্বার্থে। এরাই আবার রাজনীতিক, কূটনীতিক, আর্থ-বাণিজ্যিক স্বার্থে ঘন ঘন বৈশ্বিক চেতনার কাপট্য প্রয়োগে আন্তর্জাতিক সহমর্মিতার ও সহযোগিতার ও সম্প্রীতির বুলি কপচায়। আজ এ মুহূর্তে আমরা ওই ক্ষমতাবান কায়েমী স্বার্থবাদীদের দেখছি 'এডাব (Association of Development Agency's in Bangla) নামের N.G.O-র কর্তৃত্বে, নেতৃত্বে ও অর্থে জাতীয়স্তরে তৃণমূল নামে রাজনীতিক দল গড়ে অভ্যন্তরীণ বা জাতীয় রাজনীতিতে নাকগলাতে নয় কেবল, রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে, ঔপনিবেশিক শাসন পরোক্ষে চালু করতে ও রাখতে। নগদজীবী রাজনীতিকদল এতে কোনো বিপদ বা অন্যায় দেখে না।

বঞ্চিত মানুষের কথা

গানের সুর ও বাণী কানে বাজে, যে-কোনো কিছুর রূপ চোখে পড়ে, মনে ধরে এবং মর্মে লাগে। বাঁশী যখন বাজে তখন তা বনে বাজে কি মনে বাজে তা বিবেচ্য নয়। বাঁশীর সুর যে আকুল-ব্যাকুল করে তোলে তারই গুরুত্ব বেশি। মানুষ পথ চলতে রূপবন্ত, ফুলবন্ত ও ফলবন্ত তরুলতা সচেতন ভাবে তাকিয়ে দেখে। কেন না সেগুলোর দর্শন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মন কাড়ে, মর্মে নাড়া দেয়। সেজন্যেই সেগুলো কোনো অমনোযোগী পথিকেরও দৃষ্টি এড়ায় না। কোনো কোনো দৃশ্য বা ঘটনা মানুষের মনে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ জাগায় এবং আবার কৃপা- করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্যের আবেগ জাগায়, অন্তরে সবটাই কিন্তু ক্ষণজীবী। মানুষের মধ্যে যারা গুণের মানের ও ধনের মানুষ তারা সবার কাছে আদর ও কদর পায়। অতএব রূপবান, ধনবান, ক্ষমতাবান মানুষকে আমরা তাচ্ছিল্য করতে পারি না, করলে নিজেকেই পরোক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত করি মাত্র। গুণের, সম্মানের, ধনের, ক্ষমতার, সাহসের ও শক্তির মানুষই দুনিয়ায় শাসন শোষণ পীড়ন যেমন করে, তেমনি অন্যভাবে পালন-পোষণও করে তারাই। তাদের এ অভিভাবকত্ব, তত্ত্বাবধায়কত্ব, নজরদারি, খবরদারি ও তদারকি ছাড়া নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ, দরিদ্র, অজ্ঞ, অনক্ষর, অদক্ষ, অযোগ্য মানুষ নিজেদের বড় অসহায় বোধ করে। লতা যেমন শক্ত বৃক্ষকে অবলম্বন করে বেয়ে ওঠে আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রসারের জন্যে, তেমনি সাধারণ মানুষও উক্তসব বিভিন্ন শক্তির মানুষের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। এজন্যেই তারা ওদের হুকুম, হুমকি, ধমক, ধমকি সহ্য করে আত্মপ্রত্যয়ী নয় বলে। তাদের বাঁচার অধিকার জন্মগত এ ধারণা ও দাবি তাদের মধ্যে সহজে উদ্ভূত হয় না, অন্যে জানিয়ে বুঝিয়ে দিলেও সে দাবি পেশ করার, আদায় করার শক্তি ও সাহস তারা নিজেদের মধ্যে খুঁজে পায় না। তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণভাবে রূপের গুণের মানের মানুষ বলে গণ্য হয় না, তারা শ্রদ্ধেয় নয়, এককথায় তারা গণ্যমান্য নয়। এজন্যেই তাদের শ্রমেই যে কালে কালে দেশে দেশে সংস্কৃতি-সভ্যতার, জীবনের সাচ্ছল্য-স্বাচ্ছন্দ্যের সব সামগ্রী, সব ব্যবস্থা, সব স্থাপত্য, সব আসবাব, সব তৈজস, সব রকমের খাদ্য এ যাবৎ তৈরি হয়ে উৎকর্ষে অনন্য হয়ে উঠেছে সেগুলো তো ওই নাম-গোত্রহীন গুণহীন বলে অবহেলিত চিরবিস্মৃত, চির অস্বীকৃত শ্রমিক-মজুরেরই অবদান। মানব সভ্যতার বাহ্য ও ব্যবহারিক অংশটুকু তো তাদেরই শ্রমের সাক্ষ্য ও প্রমাণ। তাঁরা না থাকলে মগজীদের মনন-মনীষার ফুল, ফল বাস্তবরূপ পেত না কখনো। তাজমহল যারই স্বপ্নের এবং অঙ্কনের ফল হোক না কেন বাস্তবে রূপায়ণ হয়েছে অজ্ঞ, অনক্ষর মজুরের শ্রমে ও হাতের নৈপুণ্যে।

সেকালে এবং একালেও নিঃস্ব নিরন্ন, দুঃস্থ, দরিদ্র, অজ্ঞ, অনক্ষর, কিংবা দাস, ক্রীতদাস এবং ভূমিদাস, আর পৃথিবী ব্যাপী অবজ্ঞেয় বিশেষ করে ভারতবর্ষে অস্পৃশ্য শুদ্ররা আজ অবধি শাহ্-সামন্ত, ধনী মানী অভিজাত শ্রেণীর মতো আত্মবিকাশের, নিজেদের মগজী শক্তির প্রকাশের অনুকূল পরিবেশ কখনো পায়নি, আজো পায় না। তাই ইতিহাসে তাদের কৃতি-কৃতিত্বের স্বীকৃতি মেলে না। মানুষের ভোগের উপভোগের সম্ভোগের সবকিছু করেও তারা কেবল শ্রমিক-মজুরই রয়ে গেল। কখনো মানুষ হিসেবে মর্যাদা পায়নি, পায় না। এ মানুষ দালান বানায় কিন্তু বাস করার অধিকার পায় না, উদ্যান বানায় কিন্তু তাতে ঘুরে বেড়ানোর সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগ মেলে না। এ মানুষ সুইমিংপুল স্টেডিয়াম প্রভৃতিও বানায় কিন্তু স্নানের কিংবা খেলার অধিকার পায় না। বড়লোকের স্থিতির, ফুর্তির ও সর্বপ্রকার আরাম আয়েশের জন্যে প্রথম শ্রেণীর বিপুলাকার হোটেল বানায় শ্রমিক-মজুর হিসেবে, কিন্তু কখনো তাতে প্রবেশাধিকার পায় না। ভোজন উৎসবের সর্বপ্রকার খাদ্য তৈরি করে ওরাই, কিন্তু ভদ্র লোকদের সঙ্গে চেয়ারে টেবিলে বসে খাওয়ার অধিকার পায় না। রাজা-বাদশার পোশাকও ওরাই তৈরি করে। কিন্তু নিজেদের জন্যে কিংবা তাদের পরিবার পরিজনের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিধেয় সুতিবস্ত্র সব সময় জোগাড় করতে পারে না। মাছ ধরে এরা কিন্তু রুই-কাতলা শ্রেণীর সুস্বাদু মাছ খাওয়ার অধিকার পায় না জীবনে। এমনি করে মর্ত্যজীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সর্ব প্রকার উপাদান, উপকরণ ব্যবস্থা যারা করে, তারা মর্ত্যজীবনে সপরিবার অর্ধাহারে, কখনো কখনো বেকার অবস্থায় অনাহারে অচিকিৎসায় অকালে অল্প বয়সে অপমৃত্যুর শিকার হয়। এ থেকে মনুষ্যজীবনের বড় ট্র্যাজেডি কি, শিক্ষিত সংস্কৃতিমান, গুণী, জ্ঞানী ধনী মানী মানবতাবাদী শাস্ত্রিক সন্ত সজ্জনের এর চেয়ে বেশি লজ্জার আর কি থাকতে পারে! এ অমানবিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা সভ্যতার উষাকাল থেকে আজ অবধি চলে আসছে, শাস্ত্রীরা মানবতাবাদীরা এদের অধিকার কখনো স্বীকার করেননি, কেবল কৃপা-করুণা-দায়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতিযোগে তাদের মনুষ্যত্বকে অপমানিতই করেছেন পরোক্ষে। তাদের কখনো মানুষ হিসেবে স্বাধিকারে প্রাপ্য সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ আয়োজন করেননি। কার্ল মার্কস, লেনিন ও মাওসেতুং প্রমুখের আগে কেউ এদের স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ করার এ অঙ্গীকার কিংবা চেষ্টাও করেননি। চিরকাল ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেতে, পারত্রিক জীবনের সুখ, শান্তি, আনন্দ প্রাপ্তি লক্ষ্যেই দাস, ক্রীতদাস, ভূমিদাস, গৃহভৃত্য, ভিখেরী এবং নিঃস্ব, নিরন্ন, কাঙাল প্রভৃতির পার্বণিক খাদ্যে ও দানে সেবা করার চেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে, এখনো করে, সচ্ছল আস্তিক লোকেরা পৃথিবী ব্যাপী সর্বত্র। অতএব ঈশ্বরের কৃপা লাভের, লোভের ও স্বার্থের বশে দরিদ্র নারায়ণের সেবা করতে চায় মাত্র। নিঃস্ব, শোষিত, পীড়িত মানুষের জীবন-যন্ত্রণায় ব্যথিত হয়ে কখনো ওদেরকে শোষণমুক্ত করার লক্ষ্যে সমাজ পরিবর্তনে এগিয়ে আসে না মানুষ। এবং স্বল্প সংখ্যক যারা আসে তাদের কায়েমী স্বার্থবাদী ধরে, জনে, বাহুবলে শক্তিমান লোকেরা নির্মমভাবে হত্যা করে, উচ্ছেদ করে আজো। এ হিসেবে আমরাও সংস্কৃতি-সভ্যতার মানবতার মানবিকগুণের কিংবা মানববাদিতার প্রেরণায় দরদী হই না, এমনকি ঈশ্বরানুগত বলে যারা আত্মতৃপ্ত তারাও ঈশ্বরেরই সৃষ্টি বলে মানুষকে মানুষ বলে গ্রহণ করে না। প্রাণীরূপে কৃপা করে মাত্র।

না বললেও চলে যে এইভাবে সমাজে কখনো জীবন-জীবিকার বৈষম্য ঘুচবে না। সব মানব কখনো স্বাধিকারে প্রাপ্য সম্মানে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারবে না। অতএব মানববাদীদের লক্ষ্য হবে বিকল্প মাধ্যমে গণমানবকে শোষণ মুক্ত করে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা। কেননা খেয়ে পরে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার।

AMARBOI.COM

নতুন আসে কালিক প্রয়োজনে

নতুন আসে প্রাজন্মক্রমিক জীবনের চাহিদা পূরণের জন্যেই, এবং তা কালানুগ হয়েই টিকে থাকে এবং কালান্তরে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বিলুপ্ত হয়, কালান্তরে বিবর্তন ঘটে মানব সমাজে। এ অপ্রতিরোধ্য। নতুনের আবির্ভাব প্রথমে আতঙ্ক সৃষ্টি করলেও পরিণামে চোখসহা, গাসহা ও মনসহা হয়ে মনের ও আচারের অঙ্গীভূত হয়।

বিজ্ঞানীরা বলেন প্রত্যেক কারণেরই সমমাত্রার প্রতিক্রিয়া বা ফলন আছে। আমরা পদার্থবিজ্ঞানী বা সমাজবিজ্ঞানী নই। তবু সমাজে বাস করি বলে আনাড়ি হয়েও প্রাতিভাষিক দৃশ্যকে ও ঘটনাকে অস্বীকার করতে পারি না, এগুলোর দ্বারা আমরা প্রভাবিত হই। এবং সেই প্রভাব স্বীকার করেই লাভ-ক্ষতির ভালো-মন্দের ন্যায়-অন্যায়ের যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক ধারণা পোষণ করি অবশ্য তার সঙ্গে ব্যক্তিগত মগজী ও আবেগী শক্তিও জড়িত থাকে, অতএব অকারণে কিছুই ঘটে না। কারণের সমমানের ফলও অমোঘ ও অনিবার্য।

আমরা যেকালে জন্মেছি সেকালের পারিবারিক, সামাজিক, প্রাতিবেশিক, শাস্ত্রিক, লৌকিক, অলৌকিক, অলীক, অদৃশ্য নানা আসমানি শক্তির অপশক্তির এবং নিয়তির প্রভাব স্বীকার করেই চালিত হত ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শাস্ত্রিক নীতিনিয়ম-রীতিরেওয়াজ-প্রথাপদ্ধতি অনুগ জীবন যাপন।

হঠাৎ শোনা গেল পূর্ব দিগন্তে জাপান, পশ্চিমে ইটালী-জার্মানী যুদ্ধে নেমেছে পৃথিবী দখলের উদ্দেশ্যে। সেই যুদ্ধের দূরাগত আঁচ আমাদের গাঁয়েও তথা জীবনযাত্রায় লাগল। এর একটি ছিল অসংখ্য লোক যুদ্ধের কাজে নিয়োজিত হয়ে ঘরছাড়া হয়ে দুনিয়া দেখার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম সুযোগ পেল। আর দ্বিতীয়টি ছিল ওই দূরের যুদ্ধও আমাদের আর্থিক জীবনে এবং জীবিকার ক্ষেত্রে আনল পরিবর্তন ও প্রসার। উনিশশ উনচল্লিশ সন থেকে আমাদের জীবনে ও জগতে শুরু হল পরিবর্তন। বাঙলাদেশে হল দুর্ভিক্ষ, বার্মা থেকে পালিয়ে এল লক্ষ লক্ষ বেকার মানুষ প্রাণ ভয়ে। আবার জাপান এল বলে যখন রটে গেল, তখন ত্রস্ত ব্রিটিশ সরকার পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করে বাঙলাদেশের যানবাহন সব নষ্ট করে দিল। বাঙলার মানুষের খাদ্য পাচার করল সরকার বিদেশে। দুর্ভিক্ষ হল উনিশশ তেতাল্লিশ সনে। মরল দরিদ্র হিন্দু হাড়ি ডোম, মুচি, মেথর, কামার, কুমার, চাঁড়াল প্রভৃতি নিম্নবৃত্তির ও তুচ্ছ পেশায় অস্পৃশ্য লোকেরা আর ওদেরই জ্ঞাতি বহুকাল আগে দীক্ষিত হওয়া মুসলিমদের নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ, দরিদ্র অজ্ঞ অনক্ষর মজুর শ্রেণীর মানুষ, এভাবে উভয় সম্প্রদায়ের বাঙালি মরল কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ। চালের দাম বাড়ল বলে যারা টিকে রইল বা বেঁচে রইল তারাও দরিদ্রতর হয়ে অনাহারে অর্ধাহারে দুস্থ জীবন যাপন করছিল। এরা ছিল অসচ্ছল গৃহস্থ এবং বিত্তহীন বা নিম্নবৃত্তির তথাকথিত হিন্দু-মুসলিম ভদ্রলোক।

ফলে বাঁচার তাগিদেই বুদ্ধিমানেরা হল ধূর্ত, ভেজাল ও প্রতারণা প্রবণ চোরাকারবারী ও চোরাচালানদার। একালের ভাষায় এরা হল কালোজগতের ও কালোবাজারের লোক। এই দুই নম্বরী লোকের সংখ্যা বাড়ল হাজারে হাজারে নয়, লাখে লাখে। এভাবে সমাজে আকস্মিকভাবে দুর্নীতি বৃদ্ধি পেতে লাগল। মানুষ হল A-moral ও immoral নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রাণের পরিচর্যার প্রয়োজনে। তারপর এল ব্রিটিশভারতের দ্বি-খণ্ডিত স্বাধীনতা, বুদ্ধিমান মানুষ আবার একবার চরিত্র হারিয়ে হল ধূর্ত, শক্তিতে ও সাহসে বেপরোয়া, তারা আপাত সাফল্য সম্বন্ধে হল দৃঢ়প্রত্যয়ী। ফলে বাস্তুত্যাগীদের ধন-সম্পদ কৌশলে স্বল্পমূল্যে ভীতি প্রদর্শন করে, মিষ্টি কথায় প্রতারণার জাল বুনে কথা রাখার আশ্বাসে অসংখ্য মানুষকে প্রতারিত করে এবং লুণ্ঠন করেও অনেকে বিত্তবান হল। তারপর আবার সুযোগ এল উনিশশ একাত্তরে ও বাহাত্তরে লুণ্ঠনের ও জবর দখলের। জোর-জুলুমের প্রতারণার সেই ধারা আজো চলেছে ক্ষীণভাবে। এই ধারায় আমাদের আর্থ বাণিজ্যিক ও জীবিকাজগৎ হল দুর্নীতি দোষে দুষ্ট; যার থেকে আমাদের মুক্তি ভবিষ্যতেও যেন সম্ভব হবে না। অন্যদিকে আরো একটি ক্ষতি হল আমাদের। আমরা হিংস্রতায় নতুন করে যেন শ্বাপদ হয়ে উঠলাম এখন মানে উনিশশ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে।

পোকা মাকড় মশা মাছি মাছ মোরগ হত্যার মতোই আমরা মানুষ হত্যায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি; এতে কখনো শাস্ত্রিক পাপবোধ কিংবা বিবেকী দংশন আমাদের অনুভব-উপলব্ধির মধ্যে থাকে না।

কাজেই গাঁয়ে গঞ্জে শহরে বন্দরে পাড়ায় মহল্লায় নরহত্যা মাছ-মোরগ হত্যার মতোই নিত্যকার তুচ্ছ ও প্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গোদের উপর বিষফোটের মতো আবার একালের রেডিও টিভি সিনেমা ক্যাসেট এবং ডিস-অ্যান্টেনা যোগে পৃথিবীময় অশ্লীলতা হিংস্রতা কাড়াকাড়ি মারামারি হানাহানি যৌন ব্যভিচার শিশু বালক কিশোর থেকে সব বয়সী লোককে করছে প্রভাবিত। ফলে পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রাশাসনিক জীবনে এর দুষ্ট প্রভাব কোনোক্রমেই এড়ানোতো যাচ্ছেই না, বরং দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নীতিচেতনা আদর্শনিষ্ঠা পাপবোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লজ্জাবোধ আত্মসম্মানবোধ প্রভৃতি সবটাই বন্যার স্রোতের মতো ভেসে যাচ্ছে মানুষের মন-মগজ এবং আচার-আচরণ থেকে। বেঁচে থাকা সঙ্কটময় হওয়ায় মানুষ হয়ে উঠছে বেহায়া, বেশরম, বেলেহাজ, বেআদব, বেদানাই, বেদরদ, বেআক্কেল ও বেল্লিক। সমাজ ভাঙছে নীতিনিয়ম ভাঙছে রীতিরেওয়াজ বিলুপ্ত হচ্ছে, প্রথাপদ্ধতি লোপ পাচ্ছে। চারদিকে কেবল খরস্রোতা নদীর মতো পূর্বেকার সবকিছু নদীর তীরের মতো ভাঙছে আর ভাঙছে, পুরোনো মনের নীতিবিদেরা তাই শঙ্কিত ও ত্রস্ত। একে শাস্ত্রিক নীতিনিয়ম বিধিনিষেধ লঙ্ঘন ও উপেক্ষা বলেই অতীত ও ঐতিহ্যপ্রিয় রাজনৈতিক জীবনে অভ্যস্ত রক্ষণশীলতা শাস্ত্র-সমাজ ভাঙা বলেই জানছে, বুঝছে। কালস্রোতে প্রজন্মক্রমে পুরোনো নীতিনিয়ম, আদর্শ, রুচি, জীবনযাত্রা-পদ্ধতি বদলায়। আগের যুগে হাতিয়ারের যন্ত্রের সামগ্রীর আবিষ্কার, উদ্ভাবন, নির্মাণ হত নিতান্ত আকস্মিকভাবে কৃচিৎ কোথাও কখনো। এখনকার দিনে বলতে গেলে প্রতিমুহূর্তে কোথাও না-কোথাও কোনো না-কোনো বিদ্যার, যন্ত্রের প্রযুক্তির অভিজ্ঞতার প্রসার, আবিষ্কার, উদ্ভাবন, উৎকর্ষ ঘটছেই। পৃথিবীর মানুষের জীবন এখন জ্ঞান অভিজ্ঞতা কৌশল প্রযুক্তি ও যন্ত্রনির্ভর। ভূত-ভগবানের প্রভাবের চেয়ে তার দিবারাত্রির জীবন এখন মনুষ্য শক্তির, জ্ঞানের, অভিজ্ঞতার, বুদ্ধির, প্রজ্ঞার, আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের, নির্মাণের, সৃষ্টির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণেই বেশি চালিত। এ অবস্থায় পুরোনো ধ্যান-ধারণার নীতিনিয়মে, আদর্শে, শ্রেয়স চেতনায় সতর্ক সযত্ন প্রয়াসে গড়ে তোলা শাস্ত্র-নৈতিক চেতন, আদর্শনিষ্ঠা, নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি, পাপপুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, সত্যমিথ্যা, কল্যাণ-অকল্যাণ বোধ-বুদ্ধি বিলুপ্তির পথে দেখে রক্ষণশীল গতানুগতিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নিশ্চিন্ত মানুষ উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেই না, কেননা একে তারা সর্বনাশা বৈনাশিক বিপর্যয় বলেই জানে বোঝে ও মানে। তাঁরা আবর্তনে স্বস্থ, বিবর্তনে বিচলিত। তাদের পুরোনোপ্রীতি দৃঢ়মূল নতুনভীতি প্রবল। আজকের মানুষের পারত্রিক জীবনচেতনার অভাব, মর্ত্যজীবননিষ্ঠ আচরণ, পুণ্যপ্রীতির পাপভীতির স্বল্পতা, নিরীশ্বর-নাস্তিকের মতোই পূর্বেকার শাস্ত্রে গাঢ়-গভীর অনাস্থার, ঔদাসীন্যের ও অবহেলার বৃদ্ধি, প্রাণীসুলভ সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তির প্রশ্রয় প্রভৃতি সমাজহিতৈষী শাস্ত্রপন্থী বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা চালিত মানুষকে তাদের বংশধরদেরও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত ও শঙ্কিত করে তুলেছে। এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। তবে ভিন্ন দৃষ্টির মানুষের এ সম্বন্ধে ভিন্নমত রয়েছে। নতুন আসে বিলুপ্ত হবার জন্যে নয়, কালানুগ হয়ে চালু থাকবার জন্যেই। আমরা জানি মানুষ জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রেই মনে মগজে-মননে-মনীষায়, রোদ-বৃষ্টি-শৈত্যে, ঝড়-বন্যা-খরা-মারীতে প্রকৃতিকে ও প্রাকৃতশক্তিকে অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা-কৌশল-যন্ত্র-প্রযুক্তি প্রয়োগে দাস-বশ করে, প্রকৃতির সঙ্গে আপোস করে, প্রকৃতিকে প্রতিরোধ ও অনুগত করার চেষ্টা করে আসছে চিরকাল, আজো তার সে ইচ্ছার বিরতি ঘটেনি, বরং তার মগজীশক্তির অশেষতার সন্ধান পেয়ে সে হাজারগুণ উৎসাহে উদ্দীপ্ত ও উদ্যমশীল উদ্যোগী হয়ে সমুদ্র অরণ্য পর্বত আকাশ বা নভোলোক আয়ত্তে আনার চেষ্টায় মেতেছে। এ অবস্থায় ও অবস্থানে মানুষের সংস্কৃতির, সভ্যতার, রুচির, সৌজন্যের অবক্ষয় ঘটবে, তার মানবিকগুণের, মানবতার এককথায় মনুষ্যত্বের প্রকাশ-বিকাশ-উৎকর্ষপথ রুদ্ধ হবে, মানুষ আবার প্রাণী-প্রবৃত্তির প্রাবল্যে প্রাণীর প্রজাতিই হয়ে থাকবে পারিবারিক ও সামাজিক আচরণে, এমন আশঙ্কা নিশ্চয়ই অমূলক। কেননা, মানুষের একটা বৃহৎ অংশই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিরকাল প্রকৃতিচালিত হয়েছে। প্রলোভন প্রবল হলেই, প্রাণ রক্ষার প্রয়োজনে কিংবা লাভে-লোভে-স্বার্থে সুযোগ সুবিধে পেলেই প্রবলভাবে প্রলুব্ধ হলেই ভূত-ভগবান, দেবতা-অপদেবতা প্রভৃতি কোনো অদৃশ্য শক্তিই কোনো অপকর্ম অন্যায় কর্ম, জোরে-জুলুমে কাড়া মারা হানা, দহন-ধর্ষণ-লুণ্ঠন-ভাঙন থেকে লিপ্সুকে বিরত রাখতে পারেনি, এমনি ভাবে চিন্তা-কর্ম-আচরণে রাজা থেকে পথের ভিখিরী অবধি সবাই সমভাবে অভ্যস্তই। প্রবলমাত্রই পীড়ন করে, ক্ষমতা মাত্রই অপব্যবহৃত হয়, পরিবেশ অনুকূল হলে কামমাত্রই অপ্রতিরোধ্য হয়, সুযোগ সুবিধে মতো লোভমাত্রই তার বাস্তবায়নে প্ররোচিত করে।

শাহ-সামন্তের স্বৈর-স্বেচ্ছাচারিতা সত্ত্বেও, জুয়াড়ি-জোচ্চোর-মাতাল-লম্পট-গণিকা থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃতি-সভ্যতা এগিয়েছে। ভবিষ্যতেও মানুষ নিরীশ্বর নাস্তিক নীতিআদর্শহীন হলেও এক প্রকারের সহযোগিতায় শ্রম-অর্থ ও পণ্যবিনিময়ে যূথবদ্ধ হয়ে তথা সমাজবদ্ধ থেকে নিজ নিজ স্বার্থে সংযমে পরমত-পরকর্ম-পরআচরণ সহিষ্ণু হয়ে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ থাকার গরজে সহাবস্থান করবে সাধারণভাবে নির্বিরোধে ও নির্বিবাদে। অবশ্য মাঝেমধ্যে ব্যক্তিগত লাভে-লোভে-স্বার্থে বিরোধ-বিবাদ ঘটাবেই, কাড়াকাড়ি, মারামারি হানাহানিও চলবেই প্রাণের পরিচর্যার প্রয়োজনে, কেননা কোনো প্রাণী জড়পদার্থ নয় এবং মানুষ মূলত ও কার্যত বাস্তবে প্রাণীই। দেহ-প্রাণ-মনের চাহিদা পূরণই তার জীবনপ্রেরণা। তবু ভয়ের কারণ নেই, মন্দ যতই আপাত সুখের ও আনন্দের বলে আকর্ষণীয় হোক, কেউ কেউ নয়, অনেকেই রুচি-বুদ্ধি-ঈহা ভেদে মন্দে বিরত বা অনাকৃষ্ট থাকেই।

কাজেই পুরোনো সমাজ ভাঙছে বটে সাড়ে তিন, আড়াই, দুই, দেড় হাজার বছর ধরে চালু ব্যক্তিক, পারিবারিক, শাস্ত্রিক, সামাজিক, আচারিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, আদর্শিক, ঐহিক, পারত্রিক জীবনের মূল্য-মান চেতনার বিলুপ্তি ঘটছে বটে, কিন্তু কালগত প্রজন্মগত নতুন একটা নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি চালু হয়ই স্বার্থে, সংযমে, সহিষ্ণুতায় সৌজন্যে সহযোগিতায় সহাবস্থানের প্রয়োজনে। এ সূত্রে আমরা যদি স্মরণ করি যে সভ্যতা-সংস্কৃতি, নীতি-নিয়ম, ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, লাভ-ক্ষতি ঐহিক-পারত্রিক, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা কোথাও কখনো সর্বপ্রাণবাদীর জাদুবিশ্বাসীর টোটেম-ট্যাবু প্যাগান যুগেও বুনো-বর্বর ভব্য-সভ্য কারো মধ্যে অভিন্ন ছিল না এবং আজকেও নেই। তবু আদিবাসী, বুনো জনজাতি, আরণ্য উপজাতি, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ, পিতৃপ্রধান সমাজ, পুরোনো কিংবা আধুনিক শাস্ত্রপন্থী বা গুরুবাদী প্রভৃতি দল, সম্প্রদায়, সমাজ শত শত বছর ধরে দ্বন্দ্বে-মিলনে ভারসাম্য রক্ষা করে একপ্রকার নৈতিক আদর্শিক নীতিনিয়মে রীতিরেওয়াজে প্রথাপদ্ধতিতে স্বস্থ থেকে জীবনযাপন করছে। অথচ পৃথিবীব্যাপী এসব গোষ্ঠী-গোত্র শাস্ত্রগত নীতিনিয়মে, আদর্শে, শ্রেয়স প্রেয়স চেতনায় ন্যায়-অন্যায়বোধে বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা বিচিত্র, বিবিধ ও অশেষ, সাদৃশ্য নিতান্ত সামান্য। কোনো দুই দার্শনিকের চিন্তা-চেতনা ও জীবনদৃষ্টি যেমন অভিন্ন নয়, এও তেমনি, মানুষের সামাজিক আচারে আচরণে খাদ্যে পোশাকেও কি বৈপরীত্য কম! কাজেই মাভৈঃ। একটা পুরোনো আপ্তবাক্য স্মরণে রাখলেই আমাদের উৎকণ্ঠা উদ্বেগ আকুলতা বিচলন অস্বস্তি কাটবে– তা Old order changeth yeiding placc to new।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগান্ত লক্ষণ সূচিত

আগে যেমন কোটি কোটি লোক হাতে তাঁতে কাপড় বুনত, কোটি কোটি গরু মোষ ঘোড়া দিয়ে কৃষি কাজ করত, লক্ষ লক্ষ জেলে মাছ ধরত, তেমন রীতি এখন নেই। আজ কাপড় তৈরির জন্যে রয়েছে কল, কৃষির ট্রাকটর, মাছ ধরার যন্ত্রযান মহাসমুদ্র মন্থন করে মাছ ধরে। ফলে অসংখ্য মানুষ বেকার হয়ে গেল। ১৯৯৫ সনের কায়রোর, কোপেন-হেগেনের ও বেইজিঙের সম্মেলনে যুগান্ত ও যুগান্তর লক্ষণের আভাস সূচিত হয়েছে। পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক আসন্ন ও আপন্ন বিপদ বিপর্যয় আশঙ্কায় আজ অস্থির, দিশেহারা হয়ে খুঁজছে এ বিপন্মুক্তির ও উত্তরণের পথ। আপাতত পরোক্ষ বাহ্য সমস্যাগুলো তুলে ধরবার চেষ্টা করলেও বাস্তবে ওগুলোই হচ্ছে তাদের নীতির ও আদর্শের স্বরূপে মৃত্যুবাণ, তাই তারা নারীর অধিকার, জনগণের দারিদ্র্যমুক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে। এর জন্যে প্রয়োজনীয় পুরোনো নৈতিক শাস্ত্রিক স্থানিক লৌকিক অলৌকিক ও অলীক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার, রীতিনীতির, আচার-আচরণের পরিবর্তন পরিবর্জন কিংবা পরিমার্জন আবশ্যিক বলে তারা প্রচার করে চলেছে। অর্থাৎ পুরোনো নীতিনিয়মে, রীতিরেওয়াজে, প্রথাপদ্ধতিতে জীবন যাপন শীঘ্রই অচল হয়ে পড়বে, এই আশঙ্কা তাদের মনে দৃঢ়মূল হয়েছে। তাই তারা বুঝেছে মানুষের মনের পরিবর্তন, জনসংখ্যার অনুপাতে সম্পদের বৃদ্ধি এবং জীবন সম্বন্ধে চেতনার আমূল বিন্যাস প্রয়োজন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিই সমস্যাকে জটিল করেছে। এবং সেই জটিলতা মোটামুটি হয়েছে বিদ্যার, বিজ্ঞানের ও বাণিজ্যের দ্রুত বিস্তারে বিকাশে ও উৎকর্ষে। মনুষ্য শ্রমের ও সময়ের চাহিদা প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে নেমেছে। ফলে এখনকার জগৎ ও জীবন যন্ত্রনির্ভর যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত তাই যান্ত্রিক। এখন প্রকৌশলীর কাজ করে যন্ত্র, মজুরের কাজ করে রবোট, মস্তিষ্কজীবীর কাজ করে কম্প্যুটার। কাজেই মানুষের জনসংখ্যা অনুপাতে শ্রমখাটানোর ক্ষেত্র এবং উপার্জনের উপায় সংকীর্ণতর ও সীমিত হয়ে চলেছে। ফলে জীবিকাক্ষেত্রে আমাদের আংশিক সাচ্ছল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে অনিশ্চিতির আশঙ্কা নারী-পুরুষকে বিবাহ বন্ধনে নিশ্চিতির অভাব সচেতন করেছে, করছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটা বিশ্বজনীন সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এই সংখ্যা কমানোর জন্যে নারীর পুরুষের স্বামীত্বের বা প্রভুত্বের মুক্তির কামনা প্রয়োজন। কাজেই নারীকে পুরুষের সর্ব ব্যাপারে সমকক্ষতার দাবিদার করে তুলতে হয়। ভাত-কাপড়ের বা অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষনির্ভরতা থেকে মুক্ত করে স্বনির্ভরতায় প্রতিষ্ঠা দিতে হয়। তাহলেই কেবল নারী পুরুষের আদেশ নির্দেশ হুকুম হুমকি মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে নিজের রুচি-বুদ্ধি এবং প্রয়োজন চেতনা নিয়ে জীবন যাপন করতে পারে। এই নারীই কেবল সন্তান ধারণ করার বা না করার পূর্ণ অধিকার পেতে পারে। গর্ভপাতেরও পাবে অধিকার। নারীর মধ্যে যে মাতৃত্বের একটা আকাঙ্ক্ষা আবাল্য লালন পায়, তা পরিবেশেরই প্রভাবজাত, অন্তরোত্থিত কিনা বলা যাবে না, কেননা এতোকাল দাম্পত্য বা ঘরোয়া জীবনে মানুষ পৃথিবীর সর্বত্র সসন্তানই বাস করত। এইকালে সন্তানেরা নীড়ে লালিত পক্ষী শাবকের মতো পাখা গজালে স্বনির্ভর হওয়ার যোগ্য হলেই জীবিকা সন্ধানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে, পিতামাতার সাথে গৃহগত জীবন যাপন করে না। পূর্বেও পিতৃপ্রধান সমাজে মেয়েরা স্বামীর ঘর করবার জন্যে পরের বাড়ি চলে যেত চিরকালের জন্যে। এবং মাতৃতান্ত্রিক সমাজে ছেলেরা চলে যেত শ্বশুর বাড়িতে। কাজেই আগেও ছেলে বা মেয়ে কাছে থাকত না। এখনকার দিনে ছেলে বা মেয়ে কেউ উন্নত সমাজে মা-বাবার সঙ্গে বাস করে না। এভাবে নারীরাও ছেলেমেয়ে দূরে চলে যায় বলে পক্ষীমাতার মতো, নিঃসন্তানের মতো জীবন যাপন করে। এইভাবে ঘর ভাঙছে, সমাজ ভাঙছে, চিরাচরিত জীবনপদ্ধতি পাল্টাচ্ছে। কাজেই পরিবর্তন বিবর্তন দ্রুততর হচ্ছে। এই কারণেই প্রতীচ্য জগতে অনেক নারীর মনেই সন্তানের অনুপস্থিতি ও অনস্তিত্ব একাকার হয়ে গেছে। এই পরিবেশেই দেখা যাচ্ছে অনেক নারীই সন্তান কামনা করে না। করলেও একাধিক সন্তান চায় না। এমনকি বহু নারী ও পুরুষ দাম্পত্য জীবনে অনীহ। তারা অনৈতিক, অশাস্ত্রিক এবং সাময়িক, নিঃসন্তান বন্ধ্যা দাম্পত্যে আগ্রহী, আর সমকামিতা পৃথিবীর কোথাও কোথাও আইনসম্মত বিকৃতি বলে গৃহীত। এবং আইনসম্মত না হলেও পৃথিবীর বহু দেশে এই বিকৃতির দ্রুত প্রসার ঘটছে। আজকাল য়ুরোপে ছাত্রাবাসেও নারী-পুরুষের একত্রবাস নিন্দিত নয়। এই অবস্থায় কায়রোর ও বেইজিং-এর সম্মেলনে নারীদের স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ করার নামে নারীকে ইচ্ছে মতো অবিবাহিত থাকার, বিবাহিত জীবনে সন্তান ধারণ না করার, গর্ভপাতের কিংবা একটা বা দুটো সন্তান ধারণ করার এবং যেকোনো সময়ে ইচ্ছে হলেই বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দেওয়ার আন্দোলন শুরু করা হয়েছে। তাছাড়া বিদ্যার ও বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে যন্ত্রচালিত মানুষের জীবনে ভূতে-ভগবানে আস্থা ও নির্ভরতা হালকা অথবা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মানুষের মর্ত্যজীবনকে বাস্তব বলে সচেতন ও নির্ভীকভাবে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। পারত্রিক জীবন অলীক বলে সংশয়-সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সনাতন অর্থাৎ আদি ও আদিম অজ্ঞ অসহায় মানুষের ভয় বিস্ময় ভক্তি ভরসা প্রভৃতির অবলম্বন ও কল্পনাপ্রসূন অদৃশ্য ভূত, প্রেত, দেও, দানু প্রভৃতি অরি-মিত্র অলীক শক্তিতে আস্থা মানব সংস্কৃতি-সভ্যতার এই পরিণতির যুগে বিদ্যা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য নির্ভর যন্ত্রচালিত জীবনে বিলুপ্ত হতে চলেছে। ফলে সর্বত্র এখন যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবন যাপনে উৎসাহী এবং দৈশিক সামাজিক বৈশ্বিক আন্তর্জাতিক জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে লেনেদেনে পণ্য-বিনিময়ে সহযোগিতায় সহঅবস্থানের গরজে সমস্বার্থে সংযমে পরমত-কর্ম ও আচরণ-সহিষ্ণুতায় যুক্তিনিষ্ঠায় স্বাধিকারে সৌজন্যে বিবেকী বিবেচনায় জীবন যাপনের অনুশীলনে উৎসাহী হয়ে উঠছে সংস্কৃতিমান মানুষ ও উন্নত সমাজ।

এই কারণেই পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সমাজ সম্পদবৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনে বিশেষ মনোযোগী হয়েছে। কেননা বিদ্যার বিস্তারের ফলে এই যন্ত্রচালিত জীবন যাপনপদ্ধতি বিশ্বময় অভিন্ন হয়ে উঠেছে। এখন আগের মতো অদৃশ্য আসমানী শক্তির দোহাই দিয়ে ভূত-ভগবানের ডর দেখিয়ে দুর্বল মানুষকে শাসনে শোষণে পীড়নে বশে রাখা সম্ভব নয়। তাদেরও সচ্ছল ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের ব্যবস্থা করেই দিতে হবে। অর্থাৎ সমহারে না হলেও আনুপাতিক হারে সম্পদ বণ্টনে নতুন সমাজ গড়ে তোলা যে আবশ্যিক, তা যুক্তি-বুদ্ধিযোগে পরিণামদর্শী পুঁজিবাদী সমাজ-সরকার-রাষ্ট্র অনুভব ও উপলব্ধি করে। ন্যাটোজোট যে আজ একরাষ্ট্রে পরিণত হতে চলেছে তার কারণও এ-ই। এবং বিশ্বময় যে

www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন নানা আর্থ বাণিজ্যিক চুক্তি হচ্ছে যেমন গ্যাট, নাপতা, বাজার অর্থনীতি প্রভৃতি একই চেতনার উপজাত, কিন্তু সমাজতন্ত্র অঙ্গীকার না করলে শেষ রক্ষা করা যাবে কি না বলা যাবে না। তবু মানুষের জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা পরিবর্তিত হচ্ছে। আগের মতো সামাজিক, নৈতিক জীবন পারত্রিক চিন্তার চেতনাযুক্ত থাকবে না, মর্ত্যজীবন ঐহিকতাই পাবে মানুষের মানসিক ও ব্যবহারিক বৈষয়িক জীবনে প্রাধান্য। জীবনে যুক্তি-বুদ্ধি বৃদ্ধি পাবে গুরুত্ব সহযোগিতায় শান্তিতে স্বাধিকারে অন্যদের সঙ্গে সহাবস্থানের গরজে।

একালে যোগ্য নেতৃত্বে বিপ্লব সম্ভব ও সহজ

অভাববোধ ভাষায় কাঙ্ক্ষা নামে অভিহিত। অভাববোধ হচ্ছে গুণের মানের ধনের খ্যাতির ক্ষমতার প্রেমের স্নেহের মমতার ভালোবাসার ত্যাগচেতনার ও জয়ের। এমনি অসংখ্য কাঙ্ক্ষা মানুষের মনে উদ্ভূত হয় দিনে রাতে। সব কাঙ্ক্ষার পূর্তি ঘটে না। তবু নতুন নতুন কাঙ্ক্ষার কোনো বিরাম নেই। এই কাঙ্ক্ষাই মানুষকে তার ভাবে চিন্তায় কর্মের প্রয়াসে প্রযত্নে প্রেরণা জোগায়। গভীর তাৎপর্যে একে এক কথায় জিগীষা নামে চিহ্নিত করা চলে। অর্থাৎ প্রাপ্তির বা জয় করার ইচ্ছা। যা কিছু বাঞ্ছিত ও প্রয়োজনীয় তাইতো অন্তরে ও মগজে কাঙ্ক্ষারূপে জেগে ওঠে। মানুষের গোটা কর্ম-প্রয়াসের মধ্যে থাকে আকাঙ্ক্ষা পূর্তির আগ্রহ।

যেহেতু কাঙ্ক্ষার উন্মেষ ঘটে স্বপ্ন ও সাধরূপে এবং কাঙ্ক্ষা পূর্তির জন্যে ব্যক্তির জীবনে যে শক্তি, সাহস, বুদ্ধি, উদ্যম ও প্রয়াস-প্রযত্ন প্রয়োজন এবং তা যেহেতু সব মানুষের আয়ত্তের মধ্যে নেই, সেহেতু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব পরিবেশের প্রতিকূলতার চেতনার ফলে মানুষের কাঙ্ক্ষাও ক্রমে ক্রমে সংখ্যায় ও সীমায় সংকুচিত হতে থাকে এবং পরিত্যক্তও হয় অনেক কাঙ্ক্ষা সাধ্যাতীত বলে। এজন্যেই পৃথিবীতে আত্মপ্রত্যয়ী শক্তিধর সাহসী উদ্যমশীল অঙ্গীকারবদ্ধ উচ্চাশী মানুষের সংখ্যা বেশি নয়। জনসংখ্যার তুলনায় নিতান্ত নগণ্য।

তখন মানুষ আয় বুঝে ব্যয় করে, অভাবগ্রস্ত লোক কাঙ্ক্ষাকে পরিহার করে। দরিদ্র কৃপণ হয়। মূর্খ হীনম্মন্যতায় ভোগে। নিঃস্ব লোক কেবল ভাত-কাপড় জোগাড়ে থাকে তুষ্ট। অযোগ্য লোক ক্ষমতা লাভের আশা ছাড়ে। দরিদ্র অনুগত ভৃত্য হতে দ্বিধা করে না। নিঃস্ব লোক মান প্রত্যাশা করে না। এমনিভাবে এ ধনের মানের ক্ষমতার গুণের প্রেমের জয়ের আনন্দের আরামের কাঙ্ক্ষাহীন হয়ে কোটি কোটি মানুষ 'শুধু দিন যাপনের গ্লানি' নিয়ে জীবন কাটায়। ফলে আদি ও আদিম কাল থেকে ব্যক্তি মানুষের মন-মগজ-মনন মনীষার ও প্রয়াস-প্রযত্নের ফল ফসল হিসেবে সংস্কৃতি ও সভ্যতা আজ অনেক উঁচু পর্যায়ে উঠে এসেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে শাসন, শোষণ, পীড়ন, প্রতারণা, বঞ্চনা, যন্ত্রণা রয়ে গেছে, মেলেনি অঙ্গে কিংবা অন্তরে মুক্তি। তারা আজো শ্রম ও সময় সস্তায় বিক্রি করে স্বল্প সংখ্যক লোকের জীবন ভোগের, উপভোগের ও সম্ভোগের সর্ব প্রকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবস্থা করে দেয়। আমরা গোটা পৃথিবীতে যা কিছু সুখের সুন্দরের আনন্দের ঐশ্বর্যের ভোগ উপভোগের উপকরণ আয়োজন মৌজুত দেখি, সবটাই হচ্ছে ঐ অসহায়, গণমানবের শ্রম ও সময় ব্যয়ের, আত্মঅবমাননার ও আত্মার অপমৃত্যুর সাক্ষ্য ও প্রমাণ। তবু কায়েমী স্বার্থবাদীরা চিত্তবান নয় বলেই এদের স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠাদানের প্রয়াসী হয় না। সমাজ পরিবর্তনে তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজি নয় কেউ। উচ্চ বিদ্যার বিত্তের মানুষগুলো শক্তি, সাহস ও বুদ্ধি প্রয়োগে নানা সূক্ষ্ম ব্যবস্থার দুর্লঙ্ঘ্য বাধা-বিঘ্ন তৈরি করে বিশ্বময় মানবমুক্তি অসম্ভব করে তুলেছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় কিংবা চীনে যতটুকু মুক্তি তথা সুযোগ সুবিধে প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছিল, তাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার অনুগত তথাকথিত Seven Great বানচাল করে দিয়েছে এবং দিচ্ছে। তাই বিশ্বময় আজও গণমানবের মুক্তি ঘটেনি, এমনকি হয়তো এখনো মুক্তি সুদূরে। চারদিকে কোথাও আসন্ন বলেও মনে হয় না। এ-ই হচ্ছে সংস্কৃতিমান সভ্য মানুষের বিবেকী লজ্জার একটা বড় কারণ। অথচ সেই লজ্জা অনুভব করার মানুষও পৃথিবীতে আজো করগণ্য। সবচেয়ে বড় কথা ত্রুটি রয়েছে মানুষের ব্যক্তিক চিন্তায় ও চেতনায়। সে বাঁচতে চায় অথচ বাঁচতে জানে না। সে মুক্তি চায় অথচ মুক্তির পথ খুঁজে পায় না। মুক্তির পথও জানিয়ে বুঝিয়ে দিলেও, সে মৃত্যুভীরু বলে মুক্তি সংগ্রামে আগ্রহী হয় না। ফলে মানুষ পীড়িত হয়েও পীড়ন মুক্তির প্রয়াসী হয় না। সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামের অভাবে কোথাও পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানবমুক্তি সম্ভব হচ্ছে না। অথচ প্রয়োজন মতো যে মরতে প্রস্তুত, বাঁচবার অধিকার যে তাঁরই, তা সবাই অনুভব-উপলব্ধি করে। কেননা প্রভু শ্রেণীর মানুষও যে স্বভাবে চরিত্রে 'শক্তের ভক্ত নরমের যম' এই তত্ত্ব জানা সত্ত্বেও কেউ প্রভুকে চটায় না। গরু-ছাগল-ভেড়ার মতো একক পরিচালকের অনুগত থাকে। মানুষ যে গরু-ভেড়ার মতোই সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামে বিমুখ সাধারণভাবে তার প্রমাণ তারা ব্যক্তিগতভাবে দ্রোহী হলেও সঙ্ঘবদ্ধভাবে দ্রোহী হতে জানে না। এই জন্যেই আমরা পুরা-কাহিনীতে নবী-অবতারদের যাঁরা মানুষের চালক ছিলেন, প্রথম বয়সে পশু চালক ও রক্ষকরূপে দেখতে পাই। তার মানে মানুষশাসন ও পশুশাসন যেন অভিন্ন পন্থায় সম্ভব। তাই আমরা পীড়িত জনেরাও ঘরে বসে বৈঠকে আড্ডায় ক্ষোভ, ক্রোধ ও উষ্মা প্রকাশ করি। কিন্তু কার্যকর প্রতিবাদে প্রতিকারে ও প্রতিরোধে এগিয়ে আসি না সাফল্যের লক্ষ্যে। আমাদের শিক্ষিত লোকের কথায়, লেখায়, ভাষণে মুক্তির পথ ও শপথ উচ্চারিত হয় বটে, কিন্তু বাস্তবে রূপায়ণের জন্যে লোক মেলে না। তাই মাঝে মধ্যে ক্ষোভের ও ক্রোধের ক্ষণিক উত্তেজনায় হুজুগে প্রেরণায় সভা-মিছিল হয়, সংঘর্ষ ঘটে, জান-মালের ক্ষতিও হয়, কিন্তু গণমানবের অবস্থার ও অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয় না।

এখন বিদ্যার যথার্থ বিস্তার না ঘটলেও লেখা-পড়া জানা মানুষের সংখ্যা বেড়েছে হাজারগুণ। আধুনিক যন্ত্র-যোগে অর্থাৎ রেডিও, টিভি, ভিসিয়ার, অ্যান্টিনা, ক্যাসেট, সিনেমাযোগে অজ্ঞ, অনক্ষর মানুষও বিজ্ঞ ও স্বশিক্ষিত হচ্ছে। অনক্ষর নিঃস্ব, নিরন্ন শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ জীবিকা অর্জনের তাগিদে সমুদ্র-পর্বতের বাধা অতিক্রম করে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। তাদেরও জ্ঞান অভিজ্ঞতা বইপত্র-পড়া শিক্ষিত লোকের চেয়ে কম নয় এবং যেহেতু মুক্ত বুদ্ধি শ্রেণী নির্বিশেষে কোনো কোনো ব্যক্তিমানুষে অনন্য অসামান্য মানে যাত্রায় দেখা যায়, সেহেতু আমাদের বিশ্বাস ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সাহসী চরিত্রবান শক্তিমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেতার প্রেরণায় ও পরিচালনায় একালে ১৯১৭ সনের বা ১৯৪৯ সনের মতো বিপ্লব সম্ভব ও সফল হতে পারে।

প্রেমের রঙে মন না রাঙিয়ে

কথায় বলে ভিক্ষা পেতে হলে ভেখ ধরতে হয়। এই জন্যেই আমরা চিরকালই পৃথিবীর সর্বত্রই দেখে আসছি বিশেষ পেশার মানুষের বিশেষ বিশেষ পোশাক থাকে, শুধু তা নয়, বিশেষ বিশেষ মতবাদী সম্প্রদায়েরও তা শাস্ত্রিক কিংবা রাজনীতিক হোক– বিশেষ রকমের ভেখ বা পোশাক থাকে। যেমন কোনো কোনো স্কুল-কলেজের ছাত্রদের বিশেষ রকমের পোশাক থাকে। পুলিশের এবং সৈনিকের পদ ও পদবী জ্ঞাপক ভেখ থাকে। যেমন থাকে পাদরী, মোল্লা, মৌলবী, পূজারী, পুরোত, সন্ত, সন্ন্যাসী, শ্রমণ, শ্রাবক, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষুক, বাউল প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম সাধকদের বিভিন্ন ধরনের পেশা ও মতবাদ পরিচায়ক অথবা জীবনাচার পরিচায়ক বস্ত্র। এমনকি নারী এবং পুরুষের নয় কেবল বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষের পোশাকে রঙে রূপে সাজে সজ্জায়ও থাকে পার্থক্য। এমনভাবে রাজার রাজপোশাক থেকে জাহাজের খালাসী, রেলের কুলির পোশাক অবধি সবারই থাকে পদ ও পদবী আর পেশা পরিচায়ক পোশাক। মার্কসবাদের প্রসারের প্রভাবে চটের কাপড়ের বা অন্য রকমের থলে বা ঝোলা কাঁধে করে ঘুরে বেড়ানো এক শ্রেণীর প্রগতিশীল লোক দেখা যায়। যেমন গান্ধী প্রভাবিত কংগ্রেসের লোকেরা পরত খদ্দর ও গান্ধী টুপি। দেখলেই বোঝা যেত তার রাজনীতিক মতাদর্শ।

কিন্তু এহো বাহ্য। কেননা আমরা লরেন্স অব অ্যাবেরিয়া নামে খ্যাত পাদ্রী লরেন্সকে দেখেছি ঝানু কূটনীতিক চালবাজ হিসেবে। আমরা পাদ্রী ডারউইনকে দেখেছি শাস্ত্রবিরোধী বিবর্তনবাদ আবিষ্কার করতে। পূর্ব এশিয়ায়, বার্মায়, চিলোনে, থাইল্যান্ডে, কম্বোডিয়ায়, ভিয়েতনামে আমরা বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও দেখেছি রক্তক্ষরা প্রাণহরা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে, আত্মহত্যা করতে, নরহত্যায় উৎসাহিত হতে। আমরা ভণ্ড পীর গুরু সন্ত, সন্ন্যাসী, মোল্লা পুরোত প্রভৃতির ভণ্ডামীর প্রতারণার নানা গল্প শুনেছি। 'তারা মাঝে মাঝে এমন সব চমকপ্রদ লজ্জাকর ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন।'

এভাবেই মানুষ সমাজবিচ্ছিন্ন হয়েই বাঁচতে পারে না, সবার সঙ্গে নানা প্রয়োজনে তার সম্পর্ক রাখতেই হয়। জীবিকার ক্ষেত্রে বৈষয়িক জীবনে কারো কারো প্রতি আস্থা রেখে প্রতারিত হয়ে বিশ্বাস হারাতে হয়। তবু একা চলা সম্ভব নয় বলে নতুন লোকের উপর আস্থা রেখে আবার নিশ্চিন্ত হতে চায় জীবনে। কেননা কারো না কারো উপর বিশ্বাস-ভরসা না রাখলে জীবন অচল হয়ে পড়ে। তাছাড়া অদৃশ্য লৌকিক অলৌকিক অলীক স্থানিক ও শাস্ত্রিক নানা শক্তির উপর বিশ্বাস রেখে দুর্বল মনের অসহায় মানুষ আসন্ন ও আপন্ন আপদ বিপদ এড়াতে চায়। তাই তারা তুক-তাক ঝাড়-ফুঁক বাণ-উচ্চাটন মন্ত্র-মাদুলী তাবিজ কবচ ধূলি-পানি-তাগা তেন পরা প্রভৃতি যোগে দেবতার রোষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপদেবতার প্রভাবমুক্তির আশা করে। এই সব ক্ষেত্রে প্রায়ই ভেখধারী পেশাদার লোকেরা অধ্যাত্ম শক্তিধর বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে মানুষকে ভুয়া বল-ভরসা জুগিয়ে জীবিকা অর্জন করে।

কোনো স্থূলবুদ্ধির সরলমানুষ কাউকে প্রতারণা করার শক্তি ও সাহস রাখে না। অতএব প্রতারক মাত্রই ভেখধারী ধূর্ত ব্যক্তি। তাদের ধূর্ততা এতো সূক্ষ্ম, তাদের আচরণ এমন নিখুঁত, তাদের ছদ্মবেশ, ছদ্ম বাকজাল এমন নিখাদ যে মানুষ তাদের কথায় আচরণে এবং কিছু কিছু জাদুকর-সুলভ ভেলকীবাজিতে এমন মুগ্ধ রাখতে পারে যে তাদের অবিশ্বাস করা কখনো কখনো অতিবড় বিদ্বান-বুদ্ধিমানের পক্ষেও সম্ভব হয় না। একালে, আমরা রজনিশ, বালক ব্রহ্মচারী, জাপানী শাহোতা মার্কিন আত্মহননপন্থী মার্কিনী মরমীগুরু, আনন্দমার্গী প্রভৃতি এই রূপ অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব জনগণ মন জয় করছে দেখতে পাই। এ ক্ষেত্রে দেখছি বার বার প্রতারিত হয়েও পীর গুরু সন্ত, সন্ন্যাসী শ্রমণ, ভিক্ষু, পাদ্রী প্রভৃতির প্রতি আস্থা হারায় না কেউ, বিপদে আপদে তাদের স্মরণ ও শরণ করে। যুগে যুগে এই রকম অবস্থা ছিলই, সুযোগ সন্ধানী ও সুবিধেবাদী মানুষ সুযোগ সুবিধে পেলেই প্রতারণার পন্থা গ্রহণ করে। তাই চিরকাল ভণ্ডলোক সমাজে ছিলই। প্রাচীন শাস্ত্রে এবং সাহিত্য গ্রন্থে এমনি ভণ্ডলোকের উল্লেখ মেলে, মধ্য যুগেই একটা কথা চালু ছিল হিন্দুস্থানী ভাষায় উত্তর ভারতে, বাঙলায় তা এরূপ:

প্রেমের রঙে মন না রাঙিয়ে
কাপড় রাঙালে যোগী।
আহার বিহারে ত্যাগী তাহার
সাঙ্গিল নেহাত রোগী।

এই যে কেবল শাস্ত্রিক ভূত-ভগবানের ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক ব্যবসায়িক, ব্যবহারিক, রাজনীতিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই কিছু ধূর্ত লোক কথায় কাজে ও আচরণে এমন একটা মতলবী ছদ্মরূপ ধারণ করে তাদের প্রতি পরিচিত লোকদের ভক্তিশ্রদ্ধা জাগে এবং সেই ভাবেই তারা পরিচিত জনদের প্রভাবিত করে আস্থা অর্জন করে সমাজে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়। এরা পোশাকে যেমন একটা বিশেষ ভেখ ধারণ করে অর্থাৎ বিশেষ রকমের পোশাক পরে, কথা বলতেও তেমন একটা আকৃষ্ট করবার মতো বিশেষ ভঙ্গি গ্রহণ করে।

তাদের কথায় শুধু সরল মানুষ নয়, বুদ্ধিমান মানুষও মুগ্ধ হয়। রাশিয়ার শেষ জারের রাসপুটিন এমনি এক জাদুশক্তির অধিকারী ছিল। রাজনীতি ক্ষেত্রে যাঁরা বিচরণ করেন, আদর্শের ও জনকল্যাণের বুলি কপচান সমাজে ও রাষ্ট্রে তাঁদের কাপট্যই নাকি সবচেয়ে বেশি। তাঁরা কখনো বুকে মুখে মনে মর্মে, অভিন্ন নন। তাঁদের কথার সঙ্গে কাজের মিল থাকে না, তাঁদের মুখে উচ্চারিত বাণী-ভাষণ কখনো অন্তরের কথা হয় না। তাঁরা মন ভোলানো কথা বলে চোখ ধাঁধানো কাজ করে জনপ্রিয় হয়ে জনসমর্থন আদায় করতে চান। আমাদের এই বাঙলাদেশেই যে কয়টা রাজনীতিক দল আছে সেই দলগুলো কখনো সদস্যদের ভোটে নেতা ও উপনেতা কর্মকর্তা নির্বাচিত হয় না।

দলের নায়ক বা নায়িকা সর্বময় ক্ষমতার দর্প-দাপটের অধিকারী হয়ে ইচ্ছা মতো তাঁর অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত লোক দিয়েই গড়ে তোলেন তাঁর দলের নেতৃপরিষদ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদিও লোক দেখানো একটা সাংগঠনিক রূপরেখা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ ও প্রচার করে থাকেন। নিজেরা সর্বময় ক্ষমতা হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে দেশের মানুষের কাছে গণতান্ত্রিক গণহিতৈষী সরকার ও শাসন কায়েম করার অঙ্গীকার করেন। এই কাপট্যের দরুন তাঁরা কখনো জনগণের আস্থাভাজন হন না। ধূর্তরা অর্থ দিয়ে জোগাড় করা মস্তান সন্ত্রাসী খুনী প্রভৃতির সমর্থনে দাপটের সঙ্গে রাজনৈতিক দল গড়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে বিচরণ করে। একই লক্ষ্যে একই চরিত্রের দলগুলো পরস্পরের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি হানাহানি করতে থাকে গদি দখলে রাখার ও কাড়ার লক্ষ্যে। তাই তৃতীয় বিশ্বের কোথাও সুজন সজ্জন নেতার নেতৃত্বে গঠিত রাজনীতিক দল সুলভ নয়। ফলে তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতি মানে চালবাজি এবং রাজনীতিক দল মানে হচ্ছে ক্ষমতা লিপ্সু উচ্চাশী জনগণের সমষ্টি। আর সরকার মাত্রই স্বৈর স্বেচ্ছাচারী জোর-জুলুমপ্রিয় লুটেরা। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ সরকারপ্রধানই জঙ্গী নায়ক। এসব রাষ্ট্রে কৃত্রিম ভোটতন্ত্র থাকে প্রকৃত গণতন্ত্র থাকে না। আদর্শ নয়, হিতৈষণা নয়, কেবল মানবৃদ্ধির ও ক্ষমতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে রাজনীতিক হয় বলেই এখানে ধনিক বণিকরাই মৌসুমী রাজনীতিক হয় নির্বাচন কালে। তাই শাসন-প্রশাসনের ও ব্যবসায় বাণিজ্যের মালিক, অবসেনানী, সওদাগর, ঠিকেদার এবং প্রাক্তন আমলারাই সংসদ নির্বাচনে সাধারণ ভাবে নির্বাচিত হয় অর্থ ছিটিয়ে। এদের কোনো রাজনীতিক প্রশিক্ষণ বা প্রজ্ঞা থাকে না বলে স্বেচ্ছাচারিতা ও নির্লক্ষ্য কর্মসূচীই তাঁদের অবলম্বন হয়। ফলে তাঁদের নিজেদের এবং নিজেদের শ্রেণীর লোক ছাড়া আর কারো কোনো উপকার হয় না তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে। তাই তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রমাত্রই অর্থে সম্পদে পণ্যের উৎপাদনে ও বিপণনে সাময়িক শক্তিতে ও সমরাস্ত্রে পরিনির্ভরশীল। পরানুগত মুৎসুদ্দি সরকারেরা সাধারণত তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো শাসন করে। এবং মুৎসুদ্দি সরকারের প্রধান হয় সাধারণভাবে জঙ্গী সেনানীরাই। আমাদের দেশেও প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে ঐ ভেজাল গণতন্ত্র বা ভোটতন্ত্র গণতন্ত্র নামে মাঝে মধ্যে চালু থাকে। এবং তা স্বল্পকাল স্থায়ীই হয় শ্রাবণের মেঘ-ভাঙা রোদের মতো। ফলে আমাদের সমাজের সর্বক্ষেত্রে সর্বপেশার ভেখধারী মাত্রেই গণআস্থা অর্জনে ব্যর্থ হন। লোকে তাঁদের যত সন্দেহ করে তাঁদের যত ভয় পায়, সেই পরিমাণে তাঁদের উপর আস্থাও রাখে না তাঁদের উপর ভরসাও করে না। যদিও বা মানুষ ব্যক্তিগতভাবে স্ব স্ব অসহায়তার দরুন আপদে বিপদে স্রোতে তৃণ ধরে বাঁচার চেষ্টার মতো তাঁদের আশ্রিত হয়। এতেই তাঁদের পেশা চালু থাকে। এবং ফলে অর্থে বিত্তে বাণিজ্যে তৃতীয় বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রেরই উন্নতি হয় না। মনে-মননেও জাগে না নতুন চিন্তা-চেতনা। গতানুগতিক রীতিতে অভ্যস্ত ও আবর্তিত বলে। তাই উৎকর্ষ ঘটে না বরং অবক্ষয়গ্রস্ত হয়। আমরা যতদিন সামাজিক এবং রাজনীতিক ক্ষেত্রে চরিত্রবান মানববাদীর সেবা ও নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত থাকব ততদিন অবধি আমাদের কোনো উন্নতিই হবে না। সৈনিক না হয়েও সৈনিকের পোশাক পরে, পুলিশ না হয়েও পুলিশের পোশাক পরে, নিঃস্ব না হয়েও ভিখেরী সেজে লোককে প্রতারিত করার অপরাধের মতোই দেশপ্রেমী ও মানবসেবী না হয়েও লাভে লোভে স্বার্থে রাজনীতিক হওয়া অপরাধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদেশী বিতাড়ন– চেতনার উন্মেষের কারণ

আগের কালে অর্থে বিত্তে প্রতাপেপ্রবল উচ্চাশী ব্যক্তি বুদ্ধি, শক্তি ও সাহস সম্বল করে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে পরসম্পদ পররাজ্য হরণ করে, পরের ধন লুণ্ঠন করে শাই-সামন্ত হত, কেউ কেউ আরও উচ্চাশী হয়ে জ্ঞাত পৃথিবী জয়েও উদ্যোগী হত যেমন সায়রাস, আলেকজান্ডার, এটিলা, চেঙ্গিস, হালাকু নেপোলিয়ন, হিটলার প্রভৃতি। বীরের এই বিজয়অভিযান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত পৃথিবীময় চালু ছিল। এই সেই দিন পর্যন্ত বড় বড় সাম্রাজ্যের উদ্ভব ও বিলয় ঘটেছে। যেমন রোমান সাম্রাজ্য, আব্বাসীয় সাম্রাজ্য, ওসমানীয় সাম্রাজ্য, মুঘল সাম্রাজ্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রভৃতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরের ভূমি দখলের তথা পররাজ্য জয়ের নেশা এ কালে লাভজনক নয় বলে বিলুপ্ত হয়েছে। তার পরিবর্তে এখন আর্থ-বাণিজ্যিক-মহাজনী সাম্রাজ্যবাদ চালু হয়েছে নানা জটিল কৌশলে ও পদ্ধতিতে। এখন পৃথিবীময় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ও প্রযুক্তির এবং যানবাহনের প্রসারে ও উৎকর্ষে নতুন করে গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক, ধার্মিক, বার্ণিক, ভাষিক এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য চেতনা আদিবাসী উপজাতি জনজাতি সমেত বিভিন্ন স্তরের ও মাত্রার সভ্যতার সংস্কৃতির লোকগুলোর মধ্যে অবচেতন অস্তিত্ব রক্ষার গরজে যেন পৃথকসত্তা চেতনারূপে প্রবল হয়ে উঠেছে। তারা এখন স্বতন্ত্র সংস্কৃতির আচার-আচরণের বিশ্বাস- সংস্কারের ভাষার ও অঞ্চলের ভিন্নতার দোহাই দিয়ে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকতে চাইছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-সম্বন্ধও গাঢ় গভীর করার আগ্রহ প্রকাশ করছে, এবং উন্নত সংস্কৃতি-সভ্যতার সর্বপ্রকার উপাদান উপকরণ অনুকরণে ও অনুসরণে আত্তীকরণে ও আত্মীকরণে উৎসাহী হয়ে উঠেছে কিন্তু তবু স্বাতন্ত্র্যচেতনাটা কেবল মানুষ বলে গ্রহণ বরণ করতে পারছে না বুনো, বর্বর, ভব্য, সভ্য, উন্নত কোনো সমাজই। ফলে আগে যেমন একগোত্র প্রবল হয়ে ভিন্ন গোত্রকে সবংশে নিধন করত, যেমন স্পেনে মুর মাত্রই নিহত ও বিতাড়িত হয়েছিল, আমেরিকার একটা বৃহত্তর অংশে রেড ইন্ডিয়ানরা নিহত হয়ে বিলুপ্ত হয়েছে, য়ুরোপের বিভিন্ন রাজ্যের ইহুদীরা যেমন বার বার বিতাড়িত হয়েছে, তারও আগে সুপ্রাচীনকালে মিশর থেকে এবং কেনান থেকে ইহুদীরা যথাক্রমে ফেরাওদের ও রোমানদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে বিতাড়িত হয়েছে, একালেও তেমনি লক্ষণ দুর্লভ নয়। স্বাধীনতা লাভের মুহূর্তে ভারতবর্ষেই এমনি হনন-বিতাড়ন আমরা দেখেছি, অস্ট্রেলিয়ায় আদিবাসীদের অনুর্বর বনেজঙ্গলে আশ্রিত হতে হয়েছে বিজেতাদের দৌরাত্ম্যে। এমনি পৃথিবীর সর্বত্রই ঘটেছে। এখনও ঘটছে পৃথিবীর কোথাও কোথাও। যেমন উত্তর পূর্বভারতের সাত রাজ্যে এই গৌত্রিক কোন্দল, স্বাধীনতাসংগ্রাম চলছেই বহুকাল ধরেই, কাশ্মীরীরা এবং শিখেরাও স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতাকামী। শ্রীলঙ্কায় তামিলেরা স্বায়ত্ত শাসন কিংবা স্বাধীনতা চায়। সাইপ্রাসতো দুভাগ হয়েই রয়েছে।

পনেরো শতকে য়ুরোপে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল। মানুষের জীবিকা সঙ্কট দেখা দিল। খোরপোশের অভাব মেটানোর জন্যে রাজকীয় সহায়তায় সাহসী অভিযাত্রীরা সমুদ্র-পর্বত-অরণ্যের বাধা লঙ্ঘন ও অতিক্রম করে নতুন নতুন ভূ-খণ্ড আবিষ্কার ও অধিকার করে নিল। সেখানে শাসন-শোষণ চালিয়ে বিত্তে-বেসাতে গোটা য়ুরোপ ধনী হয়ে উঠল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

য়ুরোপীয়রা আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যান্ডে অভিবাসিত হয়ে, য়ুরোপের জনস্ফীতিজাত সমস্যার অবসান ঘটাল, আজো ঘটাচ্ছে। এখন তাই ভূমিসাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশবাদ আর নেই। তার পরিবর্তে এখন স্বদেশের বেকার উচ্চাশী লোকেরা বেশি রোজগারের প্রত্যাশায় ও সন্ধানে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে যেখানে সুবিধে পাচ্ছে চাকরি বা ব্যবসা নিয়ে থেকে যাচ্ছে নিশ্চিন্তে বাঁচার গরজে। এই বেকারের বিদেশে ভাগ্যান্বেষণ বেড়েই চলেছে। কেননা পৃথিবীর সর্বত্র এখন জনস্ফীতি ঘটছে। অথচ যন্ত্র, প্রযুক্তি ও প্রকৌশলের প্রসারে ও উৎকর্ষে শ্রম ও সময় ব্যয় অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই বেকারত্ব বাড়ছে। তাছাড়া মোটামুটি উনিশশ' পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন সনের পরে বিভিন্ন মারাত্মক রোগের প্রতিষেধক বের হওয়ায় এবং গর্ভবতী নারীরও শিশুর স্বাস্থ্য ও সুষ্ঠু প্রসব সম্বন্ধে জ্ঞানের ও যন্ত্রের প্রসারে এখন মৃত্যুর পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে জনসংখ্যা অভাবিত ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ও পাচ্ছে। আগে যক্ষ্মায় সন্নিপাতে, হৃদরোগে, মস্তিকের রোগে, কলেরায়, বসন্তে লোক মরত, এমনকি ম্যালেরিয়ার, কালাজ্বরের সূতিকার কোনো প্রতিষেধক ছিল না। আজকাল এই সব রোগের চিকিৎসা থাকায় সচ্ছল মানুষ মাত্রই দীর্ঘায়ু হয়। আগে কলেরা ও বসন্ত মহামারী রূপে দেখা দিয়ে বহুবাস্তু উজাড় করে দিত, বহু পরিবার হত বিলুপ্ত। এখন আর মহামারী নেই। তাছাড়া আগে প্রাকৃতিক ঝড়, বন্যা, খরাও হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ হত। এখন আবহওয়ার পূর্বাভাস মেলে। তাছাড়া অনেক ঘরবাড়িও পাকাপোক্ত করা হয়েছে গাছ দিয়ে জঙ্গল তৈরি করে জলোচ্ছ্বাসও ঠেকানোর ব্যবস্থা হয়েছে অনেক জায়গায়। একারণে রোগে, দুর্যোগে মৃত্যুও জনসংখ্যা কমাতে পারছে না। মনে পড়ে হেস্টিংসের আমলে চট্টগ্রামে চাঁদগাঁও নামের গাঁয়ে তিন বছরের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ষোল থেকে আঠারোতে উঠা-নামা করেছে, দেখতে পাই। বোঝা যায় বেঁচে থাকা ছিল দুঃসাধ্য, অকাল মৃত্যুই ছিল স্বাভাবিক। আজ সেই চাঁদগাঁও বা (চন্দ্রগ্রাম) এখন ঘনবসতিপূর্ণ জনবহুল শহরতলী।

আজ পৃথিবীর সব দেশেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষ জীবিকাহীন হয়ে খোরপোশের অভাবে ভূগছেন। কিছু ধনী রাষ্ট্র বেকারভাতা বার্ধক্যভাতা প্রভৃতি ভাতা দিয়ে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখছে। কিন্তু দরিদ্র ও মাঝারি রাষ্ট্রের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই মানববাদীরা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে মার্কসবাদের রূপায়ণে আগ্রহী কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদীরা তা হতে দিচ্ছে না কোথাও। সোভিয়েত ইউনিয়ন তারা ভেঙেছে। চীন, ভিয়েতনাম ও কিউবা ভাঙার প্রয়াস চালাচ্ছে। এদিকে ধনবাদীরা বা পুঁজিবাদীরাও সুখে নেই, তারাও অর্থ-সম্পদের সঙ্কটে পড়েছে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে ন্যাটোজোটের রাষ্ট্রগুলো আজ এই সঙ্কটের সম্মুখীন। ঘরের লোকের বেকারত্ব ঘোচানোর জন্যে বিদেশীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করণ, নানা অজুহাতে অভিবাসিত বিদেশী বিতাড়ন তাঁদের জন্যে এখন আবশ্যিক হয়েই উঠছে। বিদেশীবিদ্বেষও বাড়ছে একারণেই। তাই এইসব দেশে এখন ভাগ্যান্বেষণে যাওয়া বিদেশী চাকুরে ও বেকারদের বিতাড়নের পন্থা আবিষ্কারের জিগির উঠেছে। এই ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংল্যান্ড জার্মানী প্রভৃতি এমনকি বাঙালি বিতাড়নে ভারতও নানা কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। কাজেই বিদেশে বিজাতি, বিধর্মী, বিভাষী, বিদেশী বিতাড়ন কোথাও আসন্ন, কোথাও আপন্ন হয়ে উঠেছে। তাছাড়া সংখ্যালঘুরা হীনম্মন্যতায় ও লাঞ্ছিতজীবনের গ্লানিতে ভোগে। এই কারণে তাদের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন-মনন-মনীষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ-বিকাশ ঘটে না। এবং এই হীনম্মন্যতার দরুন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার অবচেতন ও সচেতন গরজে তারা সংকীর্ণচিত্ত স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় কূর্মস্বভাবের লোক হয়। ফলে তারা না পারে সংখ্যাগুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করে অবজ্ঞেয় হয়ে মিশে যেতে, না পারে স্বতন্ত্র সত্তায় মাথা উঁচু করে বাঁচতে। একারণেই পৃথিবীর সর্বত্র সংখ্যালঘুর জীবন মানসিক, ব্যবহারিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে কখনো স্বাভাবিক প্রকাশ, বিকাশ ও উৎকর্ষ পায় না। এই জন্যে পারতপক্ষে শুধু ধনলোভে আর্থিকভাবে সাচ্ছল্যে, স্বাচ্ছন্দ্যে ও সুখে থাকার জন্যে মানসিক ভাবে লাঞ্ছিত জীবন বরণ করা উচিত নয়। উপার্জন শেষে স্বদেশে ফিরে আসাই ভালো। অভিবাসিত হলে বংশধরের উপরে অবিচার করা হয়। কথায় বলে 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা।'

আমাদের এই উপমহাদেশে আজো সংখ্যালঘুদের জানে-মালে বিপন্মুক্তি ঘটেনি, এক কবির ভাষায় এর কারণ এরূপ–

তুমি হিন্দু, আমি মুসলিম
শুধু এই জন্ম দোষে
আমি পড়িয়াছি হিন্দুর কোপে,
তুমি মুসলিম রোষে।

AMARBOI.COM

ব্যাক গিয়ারের রাজনীতি

সেইদিন এক জজসাহেব কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের রাজনীতিক চিন্তা, চেতনা, জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও সংস্কৃতি এখনো উন্মেষকালীন অবস্থায় রয়ে গেছে। তাই এরা বর্তমান বোঝে না, ভবিষ্যৎ দেখে না, কেবল অতীতের ও ঐতিহ্যের গুণ-গৌরব-গর্ব ও আস্ফালন করে বেড়ায়। এককথায় তাদের রাজনীতিক চিন্তা, চেতনা, কর্ম ও আচরণ, গাড়ির ব্যাকগিয়ারের মতো কেবল পিছু হটে। কেবল পেছন দেখে, পূর্ব গৌরব-গর্ব রোমন্থন করে। সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করে না। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাদের কোনো স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুষ্ঠু, সুপরিকল্পনাও নেই। তাই তারা রাজনীতিক্ষেত্রে দলীয় লোককে প্রেরণা প্রণোদনা উত্তেজনা উদ্দীপনা ও প্রবর্তনা জোগানোর জন্যে উনিশশ ছেচল্লিশ সনে পাকিস্তান প্রাপ্তি লক্ষ্যে এককাট্টা হয়ে মুসলিম লীগ সমর্থক হয়েছিল। তারপর চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে বাঙলাভাষাকে অন্যতর রাষ্ট্রভাষা করার দাবি আদায়ের জন্যে আন্দোলন ও সংগ্রাম শুরু করে। বাঙলা ভাষার ও বাঙালীর প্রতি প্রীতি আন্তরিক হলে তারা নিরক্ষর বাঙালীকে বাঙলা ভাষায় সাক্ষর করবার চেষ্টা করত। কিন্তু তা কখনো করা হয়নি। উর্দু পাকিস্তানের কোনো অঞ্চলেরই ভাষা ছিল না। উত্তর ভারতের লোকদের স্বার্থেই উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হয়। হীনম্মন্যতার ও হুজুগের বশে সংখ্যাগুরু হয়েও এবং উন্নত ভাষার অধিকারী হয়েও একক রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙলা ভাষার যৌক্তিক দাবি পেশ করেনি বাঙালীরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনকি কেন্দ্রীয় পরিষদে ধীরেন্দ্রনাথদত্ত প্রমুখ হিন্দু সদস্যরা বাঙলা ভাষায় পরিষদের অধিবেশনে কথা বলতে চেয়ে তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। সেখানেও বাঙালী মুসলমানেরা ছিলেন সংখ্যাগুরু। বিশেষ প্রাণীর মতো আনুগত্য বশে একজন মুসলিম সদস্যও ধীরেন দত্তের প্রস্তাব সমর্থনে অথবা বাঙলা ভাষার অবমাননার প্রতিবাদে মুখ খোলেনি। এই জন্যে আজো বাঙালী মুসলমান লজ্জা বা ক্ষোভ প্রকাশ করে না। ব্যাক গিয়ারের রাজনীতিতে মানসিকভাবে আবদ্ধ বলে এই মুহূর্তে বাঙালী রাজনীতিকেরা কেবল উনিশশ ছেচল্লিশ-এর লক্ষ্যের, বায়ান্নতে রক্তদানের, বাষট্টিতে শিক্ষা আন্দোলনের, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের, সত্তরে এককাট্টা হয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থনের, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের এবং নব্বইয়ের এরশাদ-বিতাড়নের গুণ-গৌরব-গর্বের আস্ফালন করে বেড়ায়। ফলে আমাদের রাজনীতি লাটিমের মতো সচল ও গতিশীল হলেও তা গুণে, মানে, মাপে ও মাত্রায় বাড়ে না। এই জন্যেই ২৩/২৪ বছর পরে মুক্তিযোদ্ধা দেশপ্রেমিকেরা ও তাদের সন্তানেরা রাজাকারের শাস্তি চেয়ে দেশব্যাপী নিষ্ফল আন্দোলন করে। জাতিকে মানসিকভাবে প্রগতিশীল ও প্রাগ্রসর চিন্তায় চেতনায় প্রবুদ্ধ করে না। ফলে অনুশীলিত, পরিশীলিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত রাজনীতিক সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ লোক এখনো করগণ্যই রয়ে গেছে। তাই আমাদের রাজনীতি ভাড়াটে মস্তান, গুণ্ডা, খুনী নির্ভর রয়ে গেছে। চল্লিশোর্ধ্ব বয়সের লোক এখনো যুবদলের সদস্য দেখা যায় যেমন ত্রিশোধর্ব বয়সের লোকও মেলে ছাত্রনেতা হিসেবে। এইসব ন্যক্কারজনক রাজনীতিক পরিবেশ আবর্তিত হয় বলেই আমাদের সবকিছুই দেখে সহা, গা সহা, মন সহা হয়ে গেছে। আমাদের নির্দলীয় শিক্ষিত, জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিজীবীরাও স্ব স্ব জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, যুক্তিযোগে মগজী আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমে রাজনীতিকদের প্রভাবিত করে রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদেরকে সমকালীন রুচির চাহিদার মান ও মাত্রা বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করারও কোনো প্রয়াস নেই। ফলে কৃতি ও কীর্তি স্মরণে ও রোমন্থনে আমাদের রাজনীতিক প্রয়াস, প্রযত্ন, কর্ম ও আচরণ কেবলই আবর্তিত হচ্ছে। কোনক্রমে এগোয় না বরং পিছু হটে। এই জন্যেই আমাদের জাতিসত্তা ও জাতি আজো সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে অনির্ণীত। এই জন্যেই আমাদের রাজনীতিক আদর্শ ও লক্ষ্য আজো নির্লক্ষ্য। এই জন্যেই আমরা সমাজতন্ত্র চাই, আমরা কল্যাণরাষ্ট্র চাই, আমরা শাস্ত্রিক, সামাজিক, আর্থিক ও প্রাশাসনিক শাসন-শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা-প্রতারণামুক্ত সমাজ চাই। তা স্পষ্ট করে আজো আমাদের লক্ষ্যে ও কর্মসূচিতে তুলে ধরতে পারি না। একটা ভেজালের ও কাপট্যের বিভ্রান্তি সৃষ্টির গোঁজামিল যেন থেকেই যায় উচ্চারণে। অতএব রাজনীতি ক্ষেত্রে উনিশশ সাতচল্লিশ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরে কিংবা উনিশশ একাত্তর থেকে পঁচিশ বছর ধরে যথাক্রমে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী বিতাড়নের পরেও আমাদের শাস্ত্রিক, সামাজিক, আর্থিক, নৈতিক, আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অগ্রগতি ঘটেনি। বরং অতীত ও ঐতিহ্যমুখিতা বেড়েছে বলে আমরা আরো সংকীর্ণচিত্ত রক্ষণশীল বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার লৌহকঠিন খাঁচায় যেন স্বেচ্ছায় এবং সুপরিকল্পিতভাবে ধরা দিয়েছি মুৎসুদ্দি সরকারের অভিপ্রায় ক্রমে। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে মানববাদীদের ও উদার মানবতাবাদীদের এবং বিজ্ঞান-বাণিজ্য ও প্রযুক্তিবাদীদের আন্দোলনে ও সংগ্রামে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে, শোষিত গণমানবের মুক্তি না হলে এবং পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারণার খাঁচায় বদ্ধ মানুষের মানসমুক্তি না ঘটলে আমাদের প্রগতির ও প্রাগ্রসর চিন্তার পন্থা রুদ্ধ থাকবে। আমরা রক্ষণশীলতার ও প্রতিক্রিয়াশীলতার অনুরাগী থেকে অবক্ষয়ের শিকার হয়ে থাকব সর্বপ্রকারে।

একটি আষাঢ়ে প্রস্তাব

বিবাহপ্রথা চালু হয়েছে সুপ্রাচীন কালে। এই বিবাহপ্রথা মাতৃপ্রধান সমাজে ও পিতৃপ্রধান সমাজে ভিন্ন ধরনের ছিল নানা ভাবে। একটি হচ্ছে মাতৃপ্রধান সমাজে বর ঘরজামাই হয় আর পিতৃপ্রধান সমাজে বধূ আসে স্বামীর ঘর করতে। কিন্তু গোড়া থেকেই নীতিনিয়ম রীতিরেওয়াজ প্রথাপদ্ধতি সুশৃঙ্খল ভাবে সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে গড়ে ওঠেনি। যেমন কিন্নরদের ও নায়ারদের মধ্যে বিবাহ প্রথা বিচিত্র। কিন্নরদের মধ্যে সব ভাই মিলে একটি স্ত্রী গ্রহণ করে। আবার নায়ারদের মধ্যে একভাই-ই কেবল বিয়ে করে অন্য ভাইরা নারী সম্ভোগ করে ভিন্নভাবে, যদিও তা সামাজিকভাবে স্বীকৃত। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে সুপ্রাচীনকাল থেকে হরণে বইয়ে-আনা নারীকে বিয়ে করা হত। তাই বইয়ে-আনা বলেই স্ত্রীর নাম হল বধূ এবং বিভিন্ন গোত্র থেকে হরণ করা এই বধূরাই স্বামীকে সম্বোধন করত আর্যপুত্ররূপে, তাছাড়া ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে নন্দিত ও নিন্দিত প্রচলিত আটপ্রকার বিয়ের বিবরণ আছে, তার মধ্যে গান্ধর্ব, রাক্ষস প্রভৃতি বিয়ের বয়ান রয়েছে। উল্লেখ্য যে নারী ধর্ষণ চিরকালই ছিল এবং তা তেমন অপরাধ বলে বিবেচিত ছিল না। আর পরপুরুষ দিয়ে সন্তান উৎপাদন প্রথাতো ছিল সর্বজন গ্রাহ্য। তাদের বলা হত ক্ষেত্রজ সন্তান। মহাভারতে অধিকাংশ প্রসিদ্ধ চরিত্র হচ্ছে গোপনে ও প্রকাশ্যে উৎপাদিত ক্ষেত্রজ সন্তান। কানীন সন্তানও ছিল বহু মুনি ঋষি। শুধু এখানেই শেষ নয়, প্রাচীন কালে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে আর একটি প্রথাও চালু ছিল সামাজিকভাবে যেমন বাড়িতে আসা অতিথিকে সুষ্ঠু ভোজনে তুষ্ট করা হতই, স্ত্রী-কন্যাকে যৌন সম্ভোগের জন্যে দিয়ে লৌকিকতা বা সৌজন্য বজায় রেখে তুষ্ট করা হত। ঋষি উদ্দালকের স্ত্রীকে এমনি এক গৃহাগত অতিথি উপগত হলে পুত্র শ্বেতকেতু পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে উদ্দালক জানালেন যে এ কুলধর্মের অন্তর্গত, আপত্তির কিছুই নেই। অবশ্য শ্বেতকেতু এই প্রথা রহিত করান। আর না বললেও চলে যে পৃথিবীব্যাপী পুরুষের ধারণা নারী হচ্ছে পুরুষ সম্ভোগ্য প্রাণী মাত্র। আজো সেই ধারণার অবসান ঘটেনি সাধারণের মধ্যে। এজন্যেই পুরুষ এককভাবে আজো বিভিন্ন শাস্ত্রিক সমাজে কিংবা প্যাগান সমাজে শত সহস্র নারী সম্ভোগের অধিকারী, কিন্তু নারীর একাধিক পুরুষ সম্ভোগ স্বীকৃত নয় কিন্নর বা নায়ার প্রভৃতি কয়েকটি গোত্রীয় সমাজে ছাড়া। কাজেই নারীসত্তার মূল্য ও মর্যাদা মাতৃতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক কোনো সমাজেই ছিল না, যদিও মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী ধন-সম্পদের অধিকারিণী এবং যৌবনবতী রূপসী বলে বিশেষ বয়সে দর্পে দাপটে প্রভাবে প্রতিপত্তিতে পুরুষকে অনুগত রাখত। অন্যান্য গৌত্রিক সমাজে সভ্যতার মন্থর বিকাশের কালে নারীকে দুর্বলচিত্ত অসহায়, অবজ্ঞেয়, পাপপ্রবণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে নিন্দা করা হয়। সেমেটিক অঞ্চলে নারী নরকের দ্বার আর অন্য আদলে আমাদের উপমহাদেশে নারীমনের বক্রগতির ও অবিশ্বস্ততার নিন্দা রয়েছে যেমন "স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম দেবা নজানন্তি কুতোমনুষ্যা বলে নিন্দিতা"। পিতৃপ্রধান সমাজে বর বা স্বামীবাচক সব শব্দই হচ্ছে মালিকানা বা প্রভুত্ব ব্যঞ্জক। এতেই নারী যে গৃহ-পালিতা একটা আবশ্যিক প্রাণীমাত্র, তার বেশি কিছুই নয় এমন ধারণা পুরুষের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে যায়, যদিও এই নারী জননীও অবজ্ঞা বা নিন্দা প্রকাশ কালে কখনো মনে রাখে না। জননী, জায়া, জাতারূপে নারী গৃহগত জীবনে অপরিহার্য নন্দিত সম্পদ বটে কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে সুজন সজ্জনও লৌকিক ধারণার উর্ধ্বে সহজে উঠতে পারে না। তারই ফলে পুরুষ নারীকে আজো মানুষ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। তাই জননী জায়া জাতা মাত্রই প্রথমে পিতার, মধ্যে স্বামীর, পরে পুত্রের কর্তৃত্বে ও নেতৃত্বে জীবন যাপন করেন। নারীর রক্তে যে সতীত্বের ধারণা তাও পুরুষপ্রাধান্যের ও পুরুষসম্ভোগ্যা রূপেই যে নিজের অস্তিত্ব এই ধারণার প্রসূন। তাই ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর সহমরণের কিংবা ভোগ বঞ্চিতা হয়ে কৃচ্ছ্র সাধনের বিধান চালু ছিল। আজ কার্যত তা নেই বটে, কিন্তু মানসিক ভাবে অসতী বা বিধবা নারী অনেকের কাছে ঘৃণ্য।

ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মধ্যে একটা কথা চালু আছে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'। এর কারণ সম্ভবত আর্যভাষীরা যাযাবর ছিল বলে এবং তখনকার দিনে সোনার বা রূপার অর্থ বিনিময় ব্যবস্থা অনাবিষ্কৃত ছিল বলে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমেই নিত্যকার চাহিদা মেটানো হত, তাই যাযাবর আর্যভাষীরা পশু পালনেই বিশেষ করে গোধনকে জীবিকার অবলম্বন করেছিল। এই গরুপালনের জন্যেই পুত্র সন্তান দরকার হত, বেদে দেখা যায় ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনায় অন্ন, গো-সম্পদ, পুত্র এবং নারী যাঞ্চা করা হচ্ছে।

আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় পৃথিবীর কোনো কোনো গোত্রে জ্ঞাতি বিয়ে ছিল নিষিদ্ধ, সম্ভবত কামে, প্রেমে, দাম্পত্য বিরোধের বিবাদের সম্ভাবনা ছিল বলে গোষ্ঠীর বা গোত্রের ঐক্য বা সংহতি নষ্ট হবে আশঙ্কায় ভাইয়ে বোনে, নিকট আত্মীয়ে ও জ্ঞাতিতে বিয়ে ছিল নিষিদ্ধ। আবার সম্ভবত কোনো কোনো গোত্রের ধারণায় ভিন্ন গোত্রের সঙ্গে কাম-প্রেম-দাম্পত্যের সম্পর্ক স্থাপিত হলে শ্বশুর পক্ষীয় কোনো কোনো নারী বা পুরুষ স্ব স্ব গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেমিকার বা পত্নীর স্বামীর বা প্রেমিকের গোত্রকে গোপন সংবাদ জানিয়ে দিতে পারে এই আশঙ্কায় কোথাও কোথাও ভিন্ন গোত্রে বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ। প্রথমটার উদাহরণ ভারতের ব্রাহ্মণ্য সমাজ এবং অন্যটার উদাহরণ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র মেলে। সভ্যতার বিকাশের কাল থেকে সর্বপ্রাণবাদী জাদুবিশ্বাসী টোটেম-ট্যাবু বিশ্বাসী প্রভৃতি সব প্যাগানই স্ব স্ব বিশ্বাস সংস্কার ধারণা আচার অনুষ্ঠান ভয় ভক্তি ভরসা প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য রক্ষার জন্যে সম্ভবত ভিন্ন গোষ্ঠীর ও গোত্রের প্রভাব এড়িয়ে চলায় সতর্ক ও সযত্ন প্রয়াসী ছিল। এই কালেও হয়তো অস্তিত্ব রক্ষার গরজেই সম্ভবত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আচারের, আচরণের ও অনুষ্ঠানের এমনকি পোশাক ও খাদ্য প্রভৃতি এবং স্থানিক প্রাকৃতিক পরিবেশানুগত জীবন যাপন পদ্ধতি বজায় রাখার প্রয়াস অনুন্নত আদিবাসী-উপজাতি-জনজাতির আর সভ্যতায় সংস্কৃতিতে পিছিয়েপড়া সভ্য ও সংস্কৃতিমান গোত্রের সম্প্রদায়ের ও জাতির মধ্যে আমরা আজো দেখতে পাই। এই জন্যেই স্ব-সংস্কৃতির ও আচার-আচরণের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার প্রয়াস দেখা যায় এবং নিজেদের অতীতের ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐতিহ্যের অযৌক্তিক অসঙ্গত গুণ-গৌরবের গর্ব করার আস্ফালন শোনা যায়। এমনকি একটা সার্বিক-স্বাতন্ত্র্য চেতনা সব দেশের সব গোত্রের সম্প্রদায়ের জাতির মধ্যে কম বেশি দেখা যায়, যেমন দেখা যায় পারিবারিক পরিচিতির এবং স্বাতন্ত্র্যের গর্ব প্রকাশ করার আগ্রহ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। তবু পৃথিবীতে নানা কারণে কামে প্রেমে দাম্পত্যে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে নগণ্য সংখ্যায় হলেও মিলন-মিশ্রণ ঘটেছে। চিরকালই ভূমি ও নারী বীর ভোগ্যা। পররাজ্য জয়ের জন্যে এবং অনুপমা রূপসীর সন্ধানে বীরেরা ও রাজপুত্ররা চিরকালই নিরুদ্দেশ অভিযাত্রায় বের হত। রূপকথায় আমরা এই সংবাদ পাই, মানব-দানব সবাই নিরুপমা নারীর হরণের বা প্রেমের প্রার্থিতার চেষ্টা করেছে রূপকথার জগতে। পৃথিবীর মহাকাব্যগুলোতেও আমরা এই নারী হরণের প্রেমের কাহিনীকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে দেখতে পাই। হোমার ব্যাস বাল্মীকি ফেরদৌসী প্রভৃতির কাব্য তার প্রমাণ। বাদসেবা, হেলেন, রুক্মিনী, সুভদ্রা সীতা হরণ কাহিনী আমরা শুনেছি। অতএব শুধু যে রূপকথার জগতে মানব-দানব রূপসী নারীর জন্যে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল পর্যটন করেছে তা নয়, হিন্দু পুরাণে চন্দ্র সূর্য ও দেবতারা নারী সম্ভোগের জন্যে পৃথিবীতে নেমেছে দেখা যায়। বাস্তবেও ইতিহাস সূত্রে সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যেই নারী হরণের, নারী নিয়ে পলায়নের এবং সে-কারণে গোত্রে গোত্রে বা রাজায় রাজায় যুদ্ধ হত দেখা গেছে। তবে এতে কারো লাভ হয়নি। তার কারণ পিতৃপ্রধান সমাজে ভিন্ন শাস্ত্রের বর্ণের সংস্কৃতির কিংবা ভাষার নারী স্বামীর পরিবারের সবকিছু বরণ করে নিয়েছে বাপের বাড়ির বা গোত্রের সব বৈশিষ্ট্য বর্জন করে। তেমনি মাতৃতান্ত্রিক সমাজেও পিতৃপ্রধান সমাজের কেউ কামের প্রেমের দাম্পত্যে আত্মসমর্পণ করলে নিজেদের পরিবারের বিশ্বাস সংস্কার ধারণা আচার আচরণ সব পরিহার করে এ নতুন সমাজে মিশে যেতে দেখা গেছে। যেমন কোনো মুসলিম যখন খ্রীস্টান বা ইহুদী ছাড়া অন্য কোনো শাস্ত্র বিশ্বাসীর মেয়ে বিয়ে করে তাকে মুসলিম ধর্মে দীক্ষা দেয়। নইলে বিয়ে শাস্ত্রসম্মত হয় না। তেমনি অন্যরাও পত্নীকে স্বধর্মে দীক্ষিত করে। কখনো কখনো কোনো কোনো প্রেমিক আবেগ বশে স্ত্রীর ধর্মেও দীক্ষিত হতে পারে। যেমন আমাদের মহুয়া গাথার নদের চাঁদ মহুয়াকে পাবার জন্যে বেদের জীবন বরণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল।

আমরা আমাদের এখানে একটা নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্যে উপর্যুক্ত বৃত্তান্ত গুলো ভূমিকা হিসেবে বয়ান করলাম মাত্র। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষে মানুষে গৌষ্ঠীক গৌত্রিক শাস্ত্রসম্পৃক্ত সাম্প্রদায়িক কিংবা জাতিক স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য চেতনা বিলুপ্ত করার প্রয়াসী হওয়া। যাতে মানুষে জাত, জন্ম; বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, নিবাস, আচার-আচরণ প্রভৃতির পার্থক্য ভুলে সহজেই মানুষকে মানুষ রূপে গ্রহণ করতে পারে– এ ক্ষেত্রে আন্তর্গৌত্রিক, আন্তর-শাস্ত্রিক, আন্তর্দেশিক অসবর্ণিক বিয়ে-প্রথা চালু করতে বরের বা কনের স্ব স্ব ধর্ম রক্ষা করেই যদি সমাজের লোক রাজি থাকে, তাহলে তাদের সন্তানদের মধ্যে, শাস্ত্রিক বা সাম্প্রদায়িক বিভেদ চেতনা সহজে ঘুচে যাবে। এই ভাবেই গোটা দুনিয়ার সর্বত্র সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ও জাতির হাতে সংখ্যা-লঘু শাস্ত্রিক, বার্ণিক, গৌত্রিক, ভাষিক বা আঞ্চলিক মানুষ লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হবে না। এইভাবেই ক্রমে সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘুর সম্পর্কের তিক্ততার অবসান ঘটবে। এইজন্যেই নারী-পুরুষ স্ব স্ব ধর্ম রক্ষা করেই নির্বিচারে ভালো লাগলেই ভালোবেসে কিংবা প্রস্তাবে বিভিন্ন শাস্ত্রের সম্প্রদায়ের বর্ণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষার এবং অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে সাগ্রহ বিবাহ ব্যবস্থা চালু করলে একটা প্রধান মানবিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যার সমাধান সহজ হবে বলে আমাদের ধারণা। অতএব স্ব-স্ব ধর্ম রক্ষা করে বিধর্মী বিদেশী বিজাতি বিভাষী বিবাহে প্রচার-প্রচারণায় মানুষকে প্রেরণা, প্রণোদনা ও প্রবর্তনা দান রাজনীতিক ও সমাজপতিদের আর সংস্কৃতিসেবীদের একটা নৈতিক ও আদর্শিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। এই ভাবে তৈরি হবে মানুষে মানুষে দ্বেষ-দ্বন্দ্বহীন মিলন-ময়দান।

অনুবাদ না করেও

সুপ্রাচীন কাল থেকেই রাজ্যসীমা কখনো স্থির ও স্থায়ী থাকত না। জয়ে পরাজয়ে তার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটত। আমাদের এখনকার বাঙলাভাষী অঞ্চলেও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। তাদেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ও বিলুপ্তি ঘটত। গুপ্তদের, শশাঙ্কর, পালদের এবং সেনদের গৌড় রাজ্য কখন কতটুকু বিস্তৃত ছিল তা আমরা ঠিক জানি না। তাদেরও রাজ্যসীমার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে এই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। সেকালে যানবাহনের অভাবের লোকসংখ্যার স্বল্পতার দরুন এবং নদী-পর্বত-অরণ্যের বাধা থাকায় এবং অস্ত্রের ও বাহনের উৎকর্ষের অভাবে রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করা সহজ ছিল না। সেজন্যেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রাজ্য থাকত। প্রতাপে প্রবল কোনো কোনো রাজা প্রতিবেশী কোনো কোনো রাজ্যকে প্রত্যক্ষ শাসনে না এনে করদ রাজ্য হিসেবে বা সামন্তরাজ্য হিসেবে বশে রাখত, মধ্য যুগে অর্থাৎ তুর্কী-মুঘল আমলে অস্ত্রের উৎকর্ষে এবং অশ্ববাহনে রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করা এবং স্বাধিকারে রাখা কিছুটা সহজ হয়েছিল। তাই আমরা স্বাধীন সুলতানী আমলেও কখনো কখনো বিহারের কিছু অংশ এবং উড়িষ্যা রাজ্যকে গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাই, আর মুঘল সাম্রাজ্যে মোটামুটি জাহাঙ্গীরের আমল থেকে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা একক সুবাদারের শাসনে দেখা যায়। বিশেষ করে বাঙলার বার-ভূঁইয়াদের প্রত্যেকের পরাজয়ের শেষে ষোড়শ সতেরো সন থেকে গৌড়, বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে সম্ভবত সুবেহ বাঙলা গঠিত হয়। এই সুবেহ বাঙলা বাস্তবে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী নামে উনিশশ' পাঁচ সন অবধি স্থায়ী ছিল, আমাদের ছোটকালে আমাদের এই রাজ্যেই বাঙলা প্রদেশ বলতে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যাকে এককভাবে স্মরণ করতাম, এই ছিল আমাদের ইতিহাস পড়ার ফল। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলাদেশকে বাঙলা-বলতে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যাকে অর্থাৎ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীকে বুঝতেন। এবং এই গোটা অঞ্চলকে তিনি জাত, জন্ম, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, ভাষী, নির্বিশেষে সবাইকে স্বজাতি বাঙালি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এই জন্যেই তাঁর 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতে এই তিন অঞ্চলের সাত কোটি মানুষের উল্লেখ রয়েছে। অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করার জন্যে ইতিহাসের একটা স্থূল তথ্যের উল্লেখ করলাম মাত্র, আমাদের আলোচ্য হচ্ছে এই অঞ্চলের ভাষা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা সবাই জানি যে-কোনো ভাষার মুখে মুখে উচ্চারণ বিকৃতি ঘটে এবং প্রজন্মক্রমে তা ঘটতে থাকে বলে এক অঞ্চলের উপভাষা বা মুখের বুলি অন্য অঞ্চলের মুখের ভাষা বা বুলি থেকে পৃথক হয়ে যায়। যেমন টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া যেতে কিংবা সিলেট থেকে মালদহ যেতে অথবা খুলনা থেকে বাঁকুড়া যেতে আমরা আঞ্চলিক বুলির তথা বাঙলার বিস্ময়কর দুর্বোধ্য পরিবর্তন দেখতে পাই। কিন্তু উড়িষ্যার আসামের লেখ্য বা লিখিত ভাষার মধ্যে বাঙলা দেশের কোনো কোনো উপভাষার মধ্যে বিকৃতি যেমন চট্টগ্রামের কিংবা মালদহ-রংপুরের ভাষার পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে তেমনি পার্থক্য দেখতে পাই না, বরং তিনটে লিখিত ভাষার যে-কোনো নিষ্ঠ পাঠকের পক্ষে একসপ্তাহের অনুশীলনে সুবোধ্য ও সুপাঠ্য বা সহজপাঠ্য হয়ে উঠতে পারে। আমাদের মনে হয় বিগত সুদীর্ঘ দুই হাজার বছরের সময় পরিসরে যদি কোনো উড়িয়া অহমি কিংবা খাঁটি বাঙালি শাসকের অধীনে এই বৃহৎ অঞ্চল শত বছর ধরে শাসিত হত, তাহলে একক লেখ্যভাষাভাষী হয়ে উঠত উড়িষ্যার বাঙলার ও আসামের লোক। তাহলে, একক ভাষাভাষী জনবহুল বৃহৎ এক জাতি ও রাষ্ট্র আমরা আজ পেতে পারতাম, যা একালের অনেক অর্থসম্পদের ও বাণিজ্যপণ্যের প্রাচুর্যের একটা সমৃদ্ধ উন্নত ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করত একে, কিন্তু এই সাধ-স্বপ্ন, পূরণ হওয়ার নয়। কিন্তু আমরা যদি স্ব স্ব ভাষীর স্বাতন্ত্র্যের অভিমান পরিহার করে অভিন্ন হরফে অহমি, বাঙলা ও উড়িয়া ভাষা লিখি, তাহলে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলোর অধিকার ও উত্তরাধিকার সহজেই পেয়ে যাই। আমাদের বোধগম্য হিন্দি, উর্দু এবং নেওয়ারী বইগুলো আমাদের বাঙলা হরফে মুদ্রিত হলে আমরা সহজে সে-ভাষার শ্রেষ্ঠ অবদান গুলো পড়ে জেনে বুঝে উপকৃত হতে পারতাম। উল্লেখ্য যে উনিশ শতকে হিন্দু-মুসলিমদের গোঁয়ার্তুমির জন্যেই একই ভাষা হরফের পার্থক্যে উর্দু হিন্দি নামে দুটো আলাদা ভাষা হয়ে গেছে। আমরা জানি কেউ কারো হরফের স্বাতন্ত্র্য বর্জন করতে রাজি হবে না। কারণ এরমধ্যে একটা দৈশিক যা আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য চেতনাজাত গৌরব-গর্ববোধ রয়েছে। আমাদের কুড়ি কোটি বাঙালির বাঙালিত্বের বন্ধন যেমন লেখ্য বা লিখিত বাঙলা ভাষা, তেমনি অহমি ও উড়িয়া ভাষী সম্বন্ধেও এই তথ্য প্রযোজ্য। কাজেই কারো হরফ ছাড়ার ও অভিন্ন ভাষা তৈরি করার কোনো প্রস্তাব এই কালে কারো পক্ষে সমর্থন করা সম্ভব হবে না, জানি। তবু আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে অহমিয়া উড়িয়া ভাষীরা ও বাঙালিরা স্ব স্ব হরফে এই তিন অঞ্চলের যে-কোনো বিষয়ক শ্রেষ্ঠ রচনা গুলোকে মুদ্রিত করে প্রকাশ ও প্রচার করুন, তাহলে জিজ্ঞাসু শিক্ষিতজনের বিদ্যাবৃদ্ধি সহজ হবে। আমরা জানি এই কালে জ্ঞানের প্রসার লক্ষ্যে সব দেশেই গ্রন্থানুবাদে উৎসাহ দান করা হয়। আমাদের এই প্রস্তাব অনুবাদের দুঃসাধ্যতা এড়িয়ে সহজেই জ্ঞান আহরণের উপায় বলে গৃহীত হতে পারে। উত্তর ভারতের লিখিত হিন্দি-উর্দু বাঙলা-আসাম-উড়িষ্যায় শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষের কাছে ছায়াছবির বহুলতার ফলে সুবোধ্য হয়ে উঠেছে। কাজেই বাঙলা-আসাম-উড়িষ্যার হরফে উর্দু-হিন্দি গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হলে আমাদের পাঠ্য শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের সংখ্যা দ্বিগুণ তিনগুণ বেড়ে যায়। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের জন্যে আমরা অনুবাদের পরিবর্তে আমাদের এই প্রতিবেশীর ভাষার সম্পদগুলোর প্রসাদ সহজে পেতে পারি। এই সঙ্গে নেওয়ারী ভাষাও বিবেচ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথবা বাঙালিরা তো অহমি হরফ চেনেই, তারা উড়িয়া, হিন্দি ও উর্দু, নেওয়াৱী হরফ শিখে নিলেই, উড়িয়ারা বাঙলা, নেওয়ারী হরফ চিনে নিলেই আর অহমিরা উড়িয়া-হিন্দি-নেওয়ারী হরফ শিখে নিলেই স্ব স্ব হরফে এই প্রতিবেশী ভাষার গ্রন্থগুলো মুদ্রিত করার প্রয়োজন হবে না।

রহমত আলীর জিজ্ঞাসা

শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত-প্রতারিত জনগণ মানুষ হিসেবে মনের মধ্যে সাধ ও স্বপ্ন জিয়ে রাখে, কখনো বাস্তবায়িত হবে না জেনে বুঝেও। তাই তারা ঘরে বসে মনে মনে হাতি-ঘোড়ায় চড়ে সাধ মেটায়। তেমনি দুর্বল অসহায় পীড়িত মানুষ বাস্তবে কোনো প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে পারে না বলেই ঘরে বসে পীড়ককে মনের সাধে গালাগাল করে মনের ক্ষোভ মেটায়, মনের জ্বালা ঘরে বসেই রাজা-উজির মেরে। ঘরে বসে রাজা-উজির মারা-কথাটির উদ্ভবের এবং নিত্য প্রয়োজনের মূলে রয়েছে এই তথ্য।

রহমত আলীও ঐ একই ধারায় ঘরে বসেই জানতে চায় সরকারিভাবে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষিত না হওয়া সত্ত্বেও কোনো মুসলিম পার্বণ উদ্‌যাপনে সরকারি পয়সায় নগরসজ্জা করা হয়। এবং দেশের ১২ কোটি মানুষ যখন পুণ্য অর্জনের জন্যে রোজা রাখে এবং নিজের পয়সায় ইফতার করে, পয়সা না থাকলে কেবল নুন-পানি মুখে দিয়ে রোজা ভাঙে, সরকার এবং সরকারি লোকেরাও ব্যক্তি স্বার্থে রোজা রাখার পুণ্য অর্জন করে, তা হলে সরকারি পয়সায় কেন ইফতারের আয়োজন করে? রোজা ও ইফতার তো সরকারি উৎসবের বিষয় নয়। সরকারি পয়সার এই অপব্যবহার কেন, এক বিশেষ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জন্যে? এর সঙ্গে সরকারি শাসন-প্রশাসনের কি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ আছে? এইভাবে চলতে থাকলে একসময়ে তো সংখ্যাগুরু সরকারি লোকের ঈদ বোনাসের মতো পরিবারের ঈদের কাপড়ও দাবি করবে, চাকুরেরা দাবি করবে পিকনিকের খরচ সরকারের কাছে এবং সেই সব দাবি অন্যায় বলে কি উড়িয়ে দেয়া যাবে? সরকারের কখনো মনে থাকে না যে দেশে আরো অনেক শাস্ত্রিক সমাজ ও সম্প্রদায় রয়েছে। তাদের জন্যে তাদের শাস্ত্রিক পার্বণ উদ্‌যাপন কালে সরকারি ব্যয়ে কোনো উৎসব-পার্বণ অনুষ্ঠান করা হয় কি? সরকারের এই বিবেকী প্রশ্ন জাগে না কেন? অথচ সরকার সব সময়ে উচ্চকণ্ঠে ও স্বগর্বে রাষ্ট্রের সব নাগরিকের সমান অধিকার আছে বলে দাবি করে। রহমত আলীর জিজ্ঞাসা: জীবন-জীবিকার উৎসব-পার্বণের কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের সমান অধিকার দেয়া বা মানা হয়? এই প্রশ্ন কি অসঙ্গত ও অযৌক্তিক। সরকারের বিবেকী বিবেচনার প্রতীক্ষায় থাকবে রহমত আলীরা।

রোজাদার মুমিন সবাই নিশ্চয়ই ইসলামের সামাজিক সাম্যে আস্থা রাখে। সরকারও ইসলামি সাম্যের গর্ব ভাষণে পরিব্যক্ত করে। অতএব ইফতার পার্টিতে বিভিন্ন পেশার বেরাদরানে ইসলাম যোগ দিয়ে ইফতারের সওয়াব পায় না কেন? যেমন কিছু শ্রমিক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু রিকশাওয়ালা, কিছু দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, কিছু বস্তিওয়ালা সরকারি খরচের ইফতার পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয় না কেন? তেমনি এইসব বড় লোকেরা নিজের খরচে ঝুপড়ি খুপরি ওয়ালাদের কাছে ইফতারি পাঠিয়ে সওয়াব অর্জন করেন না কেন? তেমনি রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রীর ঈদের দিনে আমজনতার কিছু লোককে তাদের দরবারে ঈদের মোলাকাতের জন্যে আহবান করেন না কেন? রহমত আলীর মনে এইসব প্রশ্ন জাগে কিন্তু উচ্চারণ করতে সাহস পায় না। অলমিতিবিস্তরেণ।

ঘৃণা করার অঙ্গীকার আবশ্যিক

দরিদ্র ভাত-কাপড়ই চায়। তার ধন হলে সে চায় মান, সামাজিক মর্যাদা। মান পাবার জন্যে প্রয়োজন পদ ও পদবী। আর পদ ও পদবী আয়ত্তে আনে ক্ষমতা। ফলে ধনের ও মানের মানুষের মধ্যে সাধারণত মানবিক গুণের অভাব থাকে আশৈশব আবাল্য আকৈশোর অনুশীলনের অভাবে।

এ জন্যে সাধারণভাবে ভুঁইফোড় ধনী মানীরা মানবিক গুণে ঋদ্ধ নয়। তাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে থাকে বাঞ্ছিত রুচি, সংস্কৃতি, সৌন্দর্য ও সৌজন্য দুর্লক্ষ্য। এ মানুষের মধ্যে যশ খ্যাতি ক্ষমতা প্রভাব প্রতিপত্তি দর্প দাপটে আয়ত্ত করার কাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস যত থাকে, সে পরিমাণে লোকহিতের চেতনা-চিন্তা থাকে না নেতাদের মনে। তারা তাই লোকচক্ষে মতলববাজ রূপে প্রতিভাত হয়। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় না। এ কথাগুলো আমাদের সমাজনিয়ন্ত্রক ধনী-মানী-শিক্ষিত শহুরে অর্থসম্পদ-ব্যবসা-বাণিজ্য-শাসন-প্রশাসন নিয়ন্ত্রক রাজনীতিক, সংস্কৃতিকর্মী, সমাজসেবক, শিক্ষক উকিল ডাক্তার সাংবাদিক প্রভৃতি সব পেশারই নীতিআদর্শ নিষ্ঠাহীন আত্মসত্তার স্বাতন্ত্র্য ও মূল্য-মর্যাদাবোধরিক্ত সুবিধেবাদী, সুযোগসন্ধানী নগদজীবী বুদ্ধিজীবী, আমলা, সাংসদ ও বুর্জোয়া রাজনীতিকদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রযোজ্য। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে এবং থাকে। তবে তাদের সংখ্যা করগণ্য। আর বেশরম বেলেহাজ বেপরওয়া লোকের সংখ্যা বিপুল। এ জন্যেই আমাদের এ সাধারণ মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হওয়ার যোগ্য। আর একে একটা মূল্যবান তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য হিসেবে স্বীকার করে নিলে আমাদের জীবনে এ মুহূর্তে যে রাজনীতিক কোন্দল চলছে, আর্থ-সামাজিক, নৈতিক, আদর্শিক, ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রভৃতি জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত অবস্থার ও অবস্থানের যে-সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে, তার থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় চিন্তার উদ্ভব ঘটবে ব্যক্তিমনে ও সমাজে। তা হলেই আমাদের বেঁচে বর্তে থাকার জাতিক ও রাষ্ট্রিক ভাবে একটা পন্থা-পদ্ধতি ও একটা নীতি-নিয়ম চালু করার মতো চরিত্রবান, মানববাদী ব্যক্তিত্বের ও নেতার উদ্ভব ঘটবে। আমরা সমাজে আজ জীবন-যন্ত্রণার মাধ্যমে অনুভব ও উপলব্ধি করছি যে আমরা অসংখ্য ধন-মান-ক্ষমতালিপ্সু, বুভুক্ষাজিগীষু এবং মরিয়াহওয়া জিঘাংসু মানবিক গুণরিক্ত মানুষের শাসনে শোষণে পীড়নে হননে পর্যুদস্ত। গাঁয়ে-গঞ্জে, নগরে বন্দরে, পাড়ায় মহল্লায় সর্বত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ এ মুহূর্তে দেখছি দেশের সর্বত্র নররক্তে মাটি সিক্ত হচ্ছে। প্রতিকারের, প্রতিবাদের, প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থা নেই। নেই সরকারের কোনো প্রশাসনিক প্রয়াস। জীবন এখন জাঙ্গলিক, সমাজ এখন আরণ্য, জীবিকা এখন অনিশ্চিত। জীবন এখন যন্ত্রণাময় ও গাড্ডলিক। কারো কোথাও জান মাল গর্দান নিরুপদ্রব নিরাপদ নয়, এর অবসান কোথায় আমরা তা জানি না। য়ুরোপীয় গণতন্ত্রের আদলে চালু করা আমাদের ভোটতন্ত্র কেবল লাভ-লোভ-স্বার্থ সচেতন স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারী, নির্বিচার লুটেরাই করে তৈরি বেশি, জনগণহিতৈষী সেবক, অভিভাবক সৃষ্টি করে না। তাই জনপ্রতিনিধি, পার্ষদ, পারিষদ, সাংসদ, সদস্য প্রভৃতি প্রভু ও শাসক হয়ে দাঁড়ায়, জনদরদী গণসেবক হয়ে ওঠে না। আমরা আজ সামষ্টিক, সামূহিক ও সামগ্রিকভাবে এসব নিষ্ঠুর নির্মম শাসক-প্রশাসক-ব্যবসায়ী ও সরকারি নীতি কবলিত। আমাদের নির্জলা ক্ষমতার রাজনীতি ও রাজনীতিক থেকে মুক্তি আবশ্যিক ও জরুরি। আমাদের কৃত্রিম গণতন্ত্র নামের 'ভেজাল গণতন্ত্র' থেকে মুক্ত হয়ে প্রজ্ঞা যুক্তি বুদ্ধি সততা দেশপ্রেম ও মানবহিতৈষণা প্রভৃতিকে সচেতন অনুশীলনে আমাদের মন-মগজ-মনন-মনীষার এবং চরিত্রের ও যোগ্যতার পুঁজি-পাথেয় করে রাজনীতিতে নামতে ও নামাতে হবে সততা ও সদিচ্ছা সম্বল করে। নইলে আমাদের দুষ্ট-নষ্ট চরিত্র নিখাদ নিখুঁত স্তরে উন্নীত করা যাবে না। অন্যায় ও অন্যায়কারীকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করার অঙ্গীকার করা যাবে না। মানুষের সেবায় ও কল্যাণ চিন্তায় ও কর্মে দায়বদ্ধ মানুষের সংখ্যা শাসনে প্রশাসনে ও রাজনীতিতে বৃদ্ধি পেলেই কেবল আমাদের এ দুর্দিন ঘুচবে, যুগান্তর ঘটবে আমাদের নৈতিক-আদর্শিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক জীবনেরও– জীবিকার সর্বত্র। আমাদের অসৎ মানুষ মাত্রেরই প্রতি ঘৃণায় ও নিন্দায় মুখর হতে হবে। প্রতিবাদী হতে হবে। প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে আমাদের আত্মকল্যাণ লক্ষ্যেই, আমাদের সন্তানের জন্যে দেশকে বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্যে। আজ শিক্ষিত সচেতন জনগণের মধ্যে দায়বদ্ধতার চেতনাসৃষ্টি করতেই হবে। নইলে এ অবক্ষয়গ্রস্ত ও পচনশীল সমাজ ও রাষ্ট্র সঙ্কট-সমস্যা মুক্ত হবে না কোনোক্ষেত্রেই।

আশায় ও আশ্বাসে বাঁচব

পৃথিবীর মানুষ প্রতি মুহূর্তে কোথাও না কোথাও নতুন চেতনায়, চিন্তায়, যুক্তিবাদের প্রসারে, মুক্তবুদ্ধির চর্চায়-জিজ্ঞাসায়-অন্বেষায়-কৌতূহলে-সন্ধিৎসায়-আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-সৃষ্টিতে-নির্মাণে এগিয়ে যাচ্ছে ব্যক্তিগত মন-মগজ-মনন-মনীষা-উদ্যম-উদ্যোগ-অধ্যবসায় প্রয়োগে। এক মানুষের সৃষ্টি গোটা পৃথিবীর মানুষের উত্তরাধিকার। কাজেই যে-কোনো ব্যক্তির, জাতির, দেশের, অঞ্চলের, রাষ্ট্রের কৃতি-কীর্তিতে, রুচি-সংস্কৃতিতে, বিজ্ঞানে-দর্শনে-সাহিত্যে-আয়ুর্বিজ্ঞানে নতুন অবদানে, গোটা পৃথিবীর মানুষ প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে লঘু-গুরুভাবে প্রভাবিত ও উপকৃত হয়ই। অতএব তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বলতে গেলে কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো ব্যক্তি-মানুষ সংস্কৃতি-সভ্যতায় এগুচ্ছে, মগজ-মনীষার অনন্যতায় বিশিষ্ট হচ্ছে, চেতনা-চিন্তা-সম্পদ-সংস্কৃতি উৎকর্ষ লাভ করছে। অতএব আমরা আশাবাদী। আমাদেরও এ দুর্দিন থাকবে না। আমরাও এগুবো আমাদেরও এদিন যাবে, রবে না।

আমাদের প্রজন্মধারাকে যদি আমরা বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে বৃক্ষের গোড়ার দিকে যেমন বৃক্ষের আদিকালের, জন্মকালের, শৈশবের, বাল্যের, কৈশোরের, যৌবনের, প্রৌঢ়ত্বের ও বার্ধক্যের কাল চিহ্নিত করা যায় বৃহৎ ও প্রাচীন সুউচ্চ প্রশাখায় বিস্তৃত বৃক্ষের অবয়ব দেখে, তেমনি আমাদের মানুষের প্রজন্মধারার মাপে বলা চলে সুদূর অতীত তথা আট-দশ হাজার বছর আগে ছিল মানুষের চেতনা-চিন্তার, মগজ-মননের, সংস্কৃতি-সভ্যতার শৈশবকাল, ক্রমে কোথাও অনুকূল পরিবেশে ব্যক্তি মানুষের নতুন চেতনার-চিন্তার-উদ্যমের-উদ্যোগের-আয়োজনের ফলে কিংবা প্রতিকূল প্রতিবেশে বাঁচার গরজে বুদ্ধিমান-যুক্তিমান মানুষের নেতৃত্বে প্রকৃতির প্রতিকূলতা প্রতিরোধ লক্ষ্যে এবং আত্মশক্তির অর্জন ও বৃদ্ধি বজায় রেখে উদ্যমী মানুষ গোষ্ঠীগত চাহিদা পূরণের প্রয়াসে নতুন সৃষ্টির, নির্মাণের, উদ্ভাবনের, আবিষ্কারের চেষ্টায় দেহ-প্রাণ-মন-মগজ-মনন-মনীষা প্রয়োগ করে করে ক্রমে উন্নত জীবন যাপনে সমর্থ হয়েছে। আমরা প্রচলিত ধারণায় ও ভাষায় প্রজন্ম ক্রমকে উর্ধ্বগামী বর্ধিষ্ণু না বলে বলি নিম্নগামী তথা সন্তান পরম্পরা বলেই অভিহিত করি। বাস্তবে প্রতি প্রজন্ম অর্থাৎ পিতা থেকে পুত্র, পুত্র থেকে পৌত্র, পৌত্র থেকে প্রপৌত্র সর্বপ্রকারে উন্নততর সংস্কৃতির, সভ্যতার, সৃষ্টির, নির্মাণের, উদ্ভাবনের, আবিষ্কারের, মনের-মগজের-মননের-মনীষার উৎকর্ষের মধ্যে গড়ে উঠছে, চেতনায়-চিন্তায়-চিন্তায় রুচিতে-ভোগে-উপভোগে-প্রভোগে-বিলাসে-বিনোদনে, সূক্ষ্মতর-সুন্দরতর অনুভবে-উপলব্ধিতে ঋদ্ধ হচ্ছে। এ তাৎপর্যে প্রজন্মক্রম হচ্ছে মনুষ্য সংস্কৃতি-সভ্যতার উর্ধ্বায়ন, বিকাশ, চিন্তারও উৎকর্ষব্যঞ্জক নয় শুধু, ক্রমবিকাশের ও চেতনার ক্রমোৎকর্ষের প্রতীক, প্রতিম এবং প্রতিভূও। আমাদের বাঙলাদেশের রাজনীতিকদের গদির লড়াই এবং এর প্রভাবে মানুষের জীবন-জীবিকায় যে বিপর্যয় আর জানমালের যে-অপরিমেয় ক্ষতি হচ্ছে, আর্থিক-মানসিক জীবনে যে-সংকট দেখা দিচ্ছে, সে-সম্বন্ধে হালকা মন্তব্য করতে গিয়ে এক গুণী ব্যক্তি বলেছিলেন যে, আমাদের প্রপৌত্রের আমলেই বাঙলাদেশে সুষ্ঠু চেতনার রাজনীতি শুরু হবে, তখনই গণতন্ত্র স্বরূপে স্বপ্রতিষ্ঠ হবে বাঙলাদেশে। উত্তরে বলতে ইচ্ছে হল, তাহলে তো দেশের ও দশের স্বার্থেই পৌত্রদের বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা চালু করতে হয় যাতে প্রপৌত্রের আবির্ভাব ত্বরান্বিত হয় সে-লক্ষ্যে– দেশের সংকট-সমস্যার সমাধান যখন প্রপৌত্রের প্রজন্মেই মাত্র সম্ভব হবে। তাই বলে আমাদের নীরব-নিষ্ক্রিয় থাকা চলবে না, সাধ্যমতো প্রতিকার লক্ষ্যে প্রতিবাদে প্রতিরোধে আবেদনে আন্দোলনে মুখর থাকতে হবে আমাদের।

আমরা ততোদিন বাঁচব না। তবু তো বংশধরদের জীবনে এক সময়ে সুখ-শান্তি-আনন্দ-আরাম আসবে– এ আশা ও আশ্বাস নিয়ে মরতে পারব। কারণ এ দেশ আমাদের জন্মভূমি, পূর্ব প্রজন্মের পিতা-পিতামহের স্বভূম-স্বভিটে এবং আমাদের সন্তানদের ও তাদের বংশধরদের স্থায়ী নিবাসভূমি, এর জন্যে নিজের প্রয়োজনে না হলেও ভাবনা-দুর্ভাবনা থেকে তো মুক্তি পেতে পারি না। দেশের মানুষের অজ্ঞতা-অনক্ষরতা নিঃস্বতা-নিরন্নতা-দুস্থতা-দরিদ্রতা ঘুচুক। অপেশাদার রাজনীতিকদের ক্ষমতালিপ্সা বিলুপ্ত হোক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবদরদী গণমানবের স্বার্থসচেতন দেশপ্রেমী মানবসেবী আকৈশোর রাজনীতিপ্রবণ মানুষের দ্বারা গঠিত হোক রাজনীতিক দলগুলো, অবসেনানী, অবআমলা, সওদাগর, ঠিকেদার, মস্তানমুক্ত নৈতিক-আদর্শিক নীতি-নিয়মে রাজনীতি পরিচালিত হোক– এসব কামনা করেই প্রপৌত্রের আমল ত্বরান্বিত হবে প্রত্যাশায় আমৃত্যু প্রতীক্ষায়-আশায়-আশ্বাসে থাকব।

আর আসন্ন নির্বাচন নিয়ে আমজনতার আর্থিক-মানসিক জীবনের ও জীবিকার নিরাপত্তা ও নিরুপদ্রব বিঘ্নিত না হোক, ক্ষমতার রাজনীতিকরা মানবিক ও বিবেকী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হোন, আমজনতার, মস্তান-গুণ্ডার-খুনীর এবং ছাত্র-যুবার মনে মানুষের জীবনের মূল্যবোধ জাগ্রত হোক– এ কামনাও করছি।

রজতজয়ন্তী উৎসবে উৎসাহ কাদের

মানব সভ্যতার শৈশবে, বাল্যে, কৈশোরে ঘরে বাইরে সর্বত্র ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে স্বীকৃত সর্দারতন্ত্র, পরিবারের সর্দার, গোষ্ঠীর সর্দার, গোত্রের সর্দার, পাড়ার সর্দার, গ্রামীণ সর্দার হয়ে সামন্ত পর্যন্ত বিন্যস্ত ছিল সমাজ। কেননা বুদ্ধিবলে ও বাহুবলে যে প্রবল তার অনুগত থাকতে হত কমবুদ্ধির কমশক্তির অসজ্ঞবদ্ধ লোকদের। এইভাবেই দাস, ক্রীতদাস ও ভূমিদাস আর অনুগত নির্জিত বঞ্চিত পীড়িত মানুষের বৈশ্যতা ও আনুগত্য ভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যক্তিসত্তার মূল্য ও মর্যাদাবোধ কখনো ঐ বিরুদ্ধ পরিবেশে গড়ে উঠতে পারেনি। তাই বীরপূজা, রাজপূজা, এমনকি পরিবারের কর্তা, গোষ্ঠীর সর্দার প্রভৃতির অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত থাকায় ছিল মানুষের অভ্যস্ত জীবন ধারার অপরিহার্য নীতি ও নিয়ম। তাই আমরা আত্মসত্তার চেতনাবিহীন সাধারণ ব্যক্তি মানুষের কোনো কিস্‌সা পাই না। রূপকথার তাই রাজা রাজপুত্র এবং বিত্তবেসাতের মালিক সওদাগর ও সওদাগরপুত্রের কাহিনীই পাই। স্বপ্নে ঠিকানাবিহীন কোনো রাজ্যের রাজকন্যার রূপ দেখে কিংবা লোকমুখে রাজকন্যার অনন্য রূপের কথা শুনে অথবা কোনো রূপসীর তসবির বা আলেখ্য দেখে বিবাগী হয়ে রাজপুত্রের ঐ সুন্দরীর সন্ধানে অসংখ্য লোকলস্কর নিয়ে স্থলপথবিহীন সেকালে অসীম সমুদ্রযাত্রা করত রাজপুত্র। নিরুদ্দেশ যাত্রায় ঝড়ে ছিঁড়তো পাল, ভাঙত হাল, ডুবত নৌকা, মরত লোকলস্কর সবাই। রাজপুত্রই কেবল তক্তাভর করে উঠত কোনো সমুদ্রতীরস্থ অরণ্যে। দেখা হত দৈত্য-রাক্ষসের হরণ-করা কোনো রাজকন্যার সনে, দেখা হত নির্জন অরণ্য প্রাসাদে ইত্যাদি। সেকালে তাই দেশের রাজপুত্রের জয়ই ছিল সারারাজ্যের মানুষের জয়। রাজপুত্রের রূপসী বিয়েই ছিল সারারাজ্যের জনগণের আনন্দের কারণ। রাজঘরের ভাণ্ডারে হীরে মণি মুক্তা জহর, হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, নদীতে নৌবহর থাকলেই রাজ্যের জনগণ গৌরব এবং গর্ববোধ করত। এই মনোভাবটা অনেকটা বিশেষ প্রাণীর তৃতীয় বৎসের মতো। তার কেবল দেখেই আনন্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনেই আনন্দ, না পেয়েই তুষ্টি অর্থাৎ তার নিজের সত্তার দাবিবোধ, অধিকারচেতনা কোনোটারই তখনো উন্মেষ হয়নি। সেই কাল অবসিত। কেননা এখন বিজ্ঞানের বদৌলত যন্ত্রের আবিষ্কারে নির্মাণে ও উৎকর্ষে এই যন্ত্রযুগ ও যন্ত্রজগৎ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এখন জগৎ একটি জনপদ মাত্র। এখন মানুষ সমুদ্র পর্বত অরণ্য আকাশ শুধু জ্ঞানগত নয় কিছুটা আয়ত্তেও নিয়ে আসছে। তাই মানুষের স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ও স্বাধিকারচেতনা প্রবল ও প্রখর। এইজন্যেই পৃথিবীর সর্বত্র আজ বঞ্চিত মানবের গণমানবের স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠা হওয়ার সংগ্রাম চলছে।

শুনতে পাচ্ছি আমাদের স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে রজতজয়ন্তীর উৎসবের আয়োজন হচ্ছে সরকারি বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠান সঙ্ঘ সমিতি প্রভৃতির উদ্যোগে। তাই মনে প্রশ্ন জাগছে স্বাধীনতার কোন সুফল আমি ভোগ করেছি যে আমি জয়ন্তী উৎসবে মেতে উঠব কিংবা আগ্রহী হব। মনে করা যাক একজন পুরুষানুক্রমিক ক্ষেতমজুর স্বাধীনতার কি সুফল বা উপকার পেয়েছে যে জয়ন্তী উৎসবে যোগ দেবে বা আনন্দিত হবে। যদি না তার চেতনা আমাদের পূর্বালোচিত তত্ত্বের আলোকে বঞ্চিত ছাগবৎসের উৎসাহের সঙ্গে তুলনা করি। তার কারণ সে যদি এই উৎসবে আনন্দিত হয় তাহলে তার একটি স্থূলবোধেরই পরিচয় পাওয়া যাবে। সেটা হবে নিজে বঞ্চিত হয়েও সে স্বদেশী, স্বজাতি, স্বভাষী ও স্বধর্মীর রাজত্বে নিজেকে স্বাধীন মনে করছে। ওদের সুখই তার সুখ, ওদের আনন্দই তার আনন্দ, ওদের বিত্ত-বেসাত-খ্যাতি-ক্ষমতা প্রভৃতিকে যেন নিজেরই কিংবা আপন জনেরই বিত্ত বেসাত খ্যাতি ক্ষমতা বলে মনে করে। কিন্তু এক জন মুসলিম ক্ষেতমজুর এবং একজন অমুসলিম ক্ষেতমজুর দুইজনের মনোভাব কি এক? যদি অভিন্ন না হয় কেন ভিন্ন হল, ভিন্ন করার জন্যে কারা দায়ী, একি রাষ্ট্রের পক্ষে শুভ হয়েছে? যদি ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষতির পথ রুদ্ধ করার কোনো প্রয়াস হয়েছে কি? এবং এই কথাগুলো বিভিন্ন শ্রেণীর শাস্ত্রে বিশ্বাসীর ক্ষেত্রে কি প্রযোজ্য নয়?

আমরা আজো বাঙালি কি বাঙলাদেশী তা-ও বিতর্কিত। জাত, জন্ম, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা পেশা, কর্মক্ষেত্র, অঞ্চল নির্বিশেষে এক দৈশিক বা রাষ্ট্রিক জাতিতে কি পরিণত হয়েছি? সরকার কি সব মানুষকে সাক্ষর ও সচেতন করে আধুনিক বা সমকালীন জীবিকা ক্ষেত্রে জীবিকা অর্জন করার যোগ্য করে তুলেছে বা তোলার চেষ্টা করেছে? আমাদের এখানে কি কখনো দেশ-কাল-মানুষের প্রয়োজনে আধুনিকতম সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে গণতন্ত্র চালু ছিল বা আছে! আমরা কি সাতচল্লিশ থেকে অথবা একাত্তর থেকে স্বেচ্ছাচারী বা স্বৈরাচারী নায়কের বা জঙ্গীনায়কের শাসনের শোষণের ও লুণ্ঠনের শিকার ছিলাম না? এখনো কি আমাদের অবস্থার এই ভোটতান্ত্রিক শাসনে উন্নতি হয়েছে? আমাদের শাসক গোষ্ঠী এবং আমরা শাসনপাত্ররা কি একজাত, এক শ্রেণীর? জাত, জন্ম, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে নাগরিকেরা কী যথাপ্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে পেয়েছে? রেডিয়োর জীবনের আলো কিংবা উজ্জীবন সব নাগরিকের জন্যে কি কাম্য বা প্রযোজ্য হয়েছিল? বিসমিল্লাহ অঙ্কিত হয়ে সংবিধান কি একাধারে ও যুগপৎ সেক্যুলারিজম, রাষ্ট্রিক জাতীয়তা, আর্থিক সুবিচার নীতি বিলুপ্ত করেনি? তারও আগে বাকশাল কি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে তৈরি হয়নি? একালে শাসকদেরই প্রয়োজনে রাস্তা সেতু স্টেডিয়াম উদ্যান প্রভৃতি তৈরি হয়, তেমনি সচেতন গ্রামীণ জনগণই সন্তানদের স্বাক্ষর করার জন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেদের উদ্যোগে বিদ্যালয় গড়ে তোলে, সরকার তথা শাসক গোষ্ঠী যারা শাসন-প্রশাসন ও দেশের অর্থসম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে বিত্তে ও বাণিজ্যে তারাই ভোট পাওয়ার লক্ষ্যে একবার প্রাথমিক শিক্ষকদের এক নির্বাচনের আগে সরকারী চাকুরে বলে ঘোষণা দেয় কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাল আছে কি-না, বেড়া আছে কি-না, বেঞ্চ আছে কি-না, ব্ল্যাক বোর্ড আছে কি-না সেই খবর নেওয়ার গরজ বোধ করেনি। সরকার আজো করে না। পরেপরে স্থানীয় এম,পি-রা এবং উচ্চাশী হবু এম, পি-রা মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ গুলোকে নির্বিচারে অপ্রয়োজনে সরকারের আর্থিক সাধ্যাতীত জেনেও সরকারি স্কুল-কলেজ রূপে অধিগ্রহণ করায়। ফলে গোটা দেশে এভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এখানে লেখাপড়া হয় কিন্তু শিক্ষিত ও বিদ্বান হওয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকে না। অধিকাংশ শিক্ষকের সেই যোগ্যতাও নেই এবং বিদ্যার অনুশীলন করে যোগ্যতা অর্জনের আগ্রহও নেই। একই কথা বলা চলে গাঁয়ে গঞ্জে এমনকি শহরেও স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে। বহু হাসপাতালে একালে চিকিৎসার জন্যে অপরিহার্য সর্বপ্রকারের যন্ত্র নেই। কোথাও কোথাও যন্ত্র থাকলে ও যন্ত্র প্রয়োগের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং মেরামতে পটু লোকের একান্ত অভাব এবং প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারকে প্রায়ই উদাসীন থাকতে দেখা যায়। কাজেই দেশে চিকিৎসার সুব্যবস্থা নেই। ধনীরা বহু অর্থব্যয়ে বিদেশে চিকিৎসা করায়, গরীবেরা কালোপযোগী চিকিৎসার অভাবে অকালে প্রাণ হারায়।

খনিজ, কৃষিজ, জলজ ও কারখানাজাত উৎপাদিত ও নির্মিত পণ্যের ক্ষেত্রে দেখি ভেজালের ও প্রবঞ্চনার আশঙ্কাই থাকে বেশি, ফলে সর্বপ্রকার বিদেশী পণ্যের আদর-কদরও জনগণের মধ্যে দেখতে পাই। উৎপাদন নির্মাণ ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে 'দুই নম্বরী পন্থা' বলে এক পন্থার কথা লোকমুখে শোনা যায়। এ হচ্ছে কালো জগতের কালোবাজার, কালোব্যবস্থা। এ হচ্ছে ভেজালের প্রতারণার চোরাচালানের ও পাচারের জগৎ। তেলে ভেজাল, সিমেন্টে ভেজাল, ঔষধে পর্যন্ত ভেজাল দেখা যায়। ধরাপড়া সত্ত্বেও অপরাধের শাস্তির তেমন কোনো খবর মেলে না। ফলে দেখা যায় সারা দেশে কোনো প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে না। কোনো পেশার লোকই যেমন ডাক্তারদের মধ্যে, স্বপেশার অন্যলোকের যোগ্যতায় দক্ষতায় ও সততায় আস্থা রাখে না। ফলে দেশ এগুচ্ছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। সেইজন্যে দেশের কোনো দিকে কোনো উন্নতি দেখা যায় না। কেবল ধনিক বণিক শ্রেণীর মধ্যে বাড়ির, গাড়ির, শাড়ির, খাদ্যের, পোশাকের, ফ্যাশনের চালবাজির বিচিত্র প্রকাশ ও বিকাশ এবং বিস্তার জনগণের চোখ ঝলসায় মাত্র। শ্রেণীর উন্নতি কি দেশের উন্নতি? আমাদের ধনিক বণিক শ্রেণীর ধারণা, তারা যেহেতু দেশের মানুষ সেহেতু তাদের উন্নতিই দেশের উন্নতি। এবং তাদের অধিকাংশই বিদেশে সন্তান ও অর্থ পাচার করে। প্রজন্মক্রমে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ও সাচ্ছল্যে জীবন কাটানোর লক্ষ্যে। এই অবস্থায় আমরা যারা জনগণ স্বাধীনতার কোনো প্রমাণই ব্যবহারিক ও বৈষয়িক জীবনে পাইনি, আমরা রজতজয়ন্তী উৎসব করতে উৎসাহ বোধ করব কেন? দেশটা নিশ্চয়ই শাসক-প্রশাসক ও অর্থ-সম্পদ নিয়ন্ত্রক শিক্ষিত ও শহুরে শ্রেণীর ও তাদের মুৎসুদ্দিদের নয়। অতএব রজতজয়ন্তী আমাদের কাছে আমাদের অধিকার উপেক্ষার, অস্বীকারের ও আমাদের লাঞ্ছিত করার প্রতীক, প্রতিম মাত্র। এই কাল হচ্ছে জনগণতন্ত্রের দাবিদারের কাল। কাজেই যেখানে শোষণ পীড়নমুক্ত মানববাদী সমাজ গড়ে ওঠেনি, সেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা থাকে না। স্বাধীনতার কোনো প্রসাদও তারা পায় না প্রকৃত অর্থে। তাই স্বদেশীর স্বজাতির স্বধর্মীর স্বভাষীর বুর্জোয়া মানববাদী শাসনে জনগণ প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হয় না। কেবল শাসন পাত্র থাকে মাত্র। শত বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্রও এ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। কেননা সে অবস্থায় নিঃস্ব নিঃস্বই থাকে, নিরন্ন নিরন্নই থাকে, ভিখিরীরাও থাকে প্রজন্মক্রমে ভিখিরী, দুঃস্থ-দরিদ্ররাও আকস্মিক কোনো সুযোগ-সুবিধে না পেলে থাকে প্রজন্মক্রমেই দরিদ্র। এবং ভূমিনির্ভর পরিবার জমি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টনের ফলে দরিদ্রতর এবং ভূমিহীন হয় ঝড়-বন্যা-খরা-রোগ-মামলার কবলিত হয়ে। ফলে প্রশ্ন জাগে স্বাধীন কে বা কারা? স্বাধীনতা কাদের? গত আটচল্লিশ বছরে ভারতে হিন্দুর রাজত্বে পাকিস্তানে ও বাঙলাদেশে মুসলমানের রাজত্বে শাসক প্রশাসক ও সওদাগর শ্রেণীরই উন্নতি হয়েছে। কিঞ্চিৎ আকস্মিকভাবে অন্য শ্রেণীর ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বিশেষের উন্নতিও হয়েছে বটে, কিন্তু মানুষের সামূহিক, সামষ্টিক ও সামগ্রিক উন্নতি হয়েছে কি?

শোষণ-পীড়নমুক্ত নাগরিকের সুখ শান্তি আনন্দ-আরামই স্বাধীনতা, ভাবনা-চিন্তা-কর্ম-আচরণে আত্মপ্রকাশের ও আত্মবিস্তারের অবাধ অধিকারই স্বাধীনতা। সরকারী ভুল সিদ্ধান্তের, দুর্নীতির, অন্যায়ের প্রতিকার চাওয়ার, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার নির্বিঘ্ন অধিকারই স্বাধীনতা।

AMARBOI.COM

'ঐকমত্য' কি ও কেমন

সবাই কোনো বিষয়ে এক মতের হলে বলা হয় 'মতৈক্য' বা 'মতের ঐক্য' হয়েছে। একমতের বা সর্বজনগ্রাহ্য কিংবা সর্বসম্মত মতের অপর নাম ঐকমত। এর বিশেষ্যরূপ হচ্ছে ঐকমত্য। ঐকমত্য শব্দটি ব্যাকরণগত ভাবে শুদ্ধপ্রয়োগ ও তাই বাঞ্ছনীয় এবং এ শব্দটির বহুল ও জনপ্রিয় প্রয়োগ অর্বাচীন, প্রাচীন নয়। বাঙলাদেশে এক বিশেষ রাজনীতিক তাৎপর্যে প্রয়োগ মাত্র ছয়মাস আগে থেকেই।

আমরা এখানে রাজনীতিক তাৎপর্যেই শব্দটির যথার্থ ও সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্বন্ধে সংজ্ঞা ও সংজ্ঞার্থ আলোচনা করব। স্বৈর-স্বেচ্ছাতন্ত্র তথা রাজতন্ত্র মাত্রই ছিল চিরকাল ঐকমত্যের শাসন। জঙ্গীনায়কের তথা সেনানীর 'ক্যু' করে ক্ষমতা দখলান্তে শাসন-প্রশাসন হয় ঐকমত্যের শাসন। আজো সৌদী সরকারের রাজতান্ত্রিক শাসন ঐকমত্যের শাসন, আজো জঙ্গীনায়ক সাদ্দাম হোসেনের রাষ্ট্রপতিরূপে ইরাক শাসন স্বৈরশাসন হিসেবে ঐকমত্যের শাসন। প্রাক্তন রাশিয়ার বা চীন প্রভৃতি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের শাসন ঐকমত্যের শাসন। ১৯৭২-৭৫ সনের গণতান্ত্রিক শাসন ছিল বিরোধী দলবিহীন একদলীয় তথা ঐকমত্যের শাসন। ১৯৯৪-৯৫ সনের খালেদা জিয়ার শাসনও ছিল একদলীয় ঐকমত্যের শাসন। এখনকার তৃতীয়বিশ্বের জঙ্গীনায়কদের দর্প-দাপটের তথাকথিত গণতান্ত্রিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাসনও ঐকমত্যের শাসন। তিউনিসিয়ায়, আলজিরিয়ায়, লিবিয়ায়, মিশরে, সিরিয়ায়, ইরাকে, মরোক্কে, জর্ডানে, ইন্দোনেসিয়ায় এককথায় তুরস্ক ব্যতীত প্রায় সব মুসলিম রাজ্যে ও রাষ্ট্রে আজো একদলীয় নায়কতান্ত্রিক শাসনই রয়েছে চালু। স্বৈরতান্ত্রিক কম্যুনিস্ট ও সামরিকশক্তির শাসন মাত্রই কার্যত ঐকমত্যের শাসনই। এমনি শাসনব্যবস্থা, কার্যত জোর-জুলুমের, স্বেচ্ছাচারিতার, হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলার শাসনই হয়ে থাকে। কারণ এখানে স্বাধীন ও মুক্ত আর নতুন চিন্তা-চেতনার অবাধ অভিব্যক্তির চাওয়ার, প্রতিবাদ করার, প্রতিরোধে সক্রিয় হওয়ার অধিকার থাকে না জনগণের। ইরানের মতো তথাকথিত গণতন্ত্রেও বাকে-কর্মে-আচরণে নাগরিক-মৌলমানবিক অধিকার স্বীকৃত নয়। অনেকতায় ও বৈচিত্র্যে এমনি ব্যক্তি স্বাধীনতাহীনতার নজির অগণ্য ও প্রায় সার্বত্রিক তৃতীয় বিশ্বে ও কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে। ঐকমত্যের শাসন স্বরূপে একক ব্যক্তিত্ব চালিত হুকুমের শাসন তা, বিবেচনার পরামর্শের আলোচনার ও সিদ্ধান্তের প্রসূন নয়। কাজেই ঐকমত্যের শাসন হচ্ছে জোর-জবরদস্তির, হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলার-শাসন। স্বৈররাজতান্ত্রিক শাসন, জঙ্গীনায়কতান্ত্রিক শাসন, নেতৃকেন্দ্রী স্বেচ্ছাশাসন যার প্রতিকারে প্রতিবাদে প্রতিরোধে জনগণের বা জনগণপ্রতিনিধির কোনো অধিকারই থাকে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদে বিরোধী দলের স্থিতি আবশ্যিক ও জরুরি। আওয়ামী লীগ সম্ভবত ঐকমত্যের তাৎপর্যচেতনার অভাবে কিংবা রাজনীতিক চাল ও ভাঁওতা হিসেবে 'ঐকমত্য' শাসনের মহিমা-মাহাত্ম্য প্রচারে সার্বক্ষণিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ গণতন্ত্র মানে হচ্ছে নির্বাচনে যে দলের প্রতিনিধি সংখ্যাগুরুত্ব পান, সে-দলের শাসন। অতএব গণতন্ত্র মানে যে-কোনো দলের সংখ্যাগুরু সাংসদের শাসন। ঐকমত্যের শাসন বলে গণতন্ত্রের কিতাবে কোনো নাম, সংজ্ঞা বা সংজ্ঞার্থ নেই। দুই বা ততোধিক দলের আঁতাতে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেও সংখ্যাগুরু হয়ে যে-শাসন ক্ষমতা দখল করা হয়-যে-সরকার গঠিত হয় তাকে বলে কোয়ালিশন সরকার।

অভ্যন্তরীণ কিংবা বহিঃশত্রুর বৈরিতাজাত সমস্যা-সঙ্কট-বিপদকালে গঠিত হয় যে-সরকার দেশের মানুষের ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে সবদলের ও মতের যোগ্য লোক নিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে ও সর্বজন সমর্থনে তার নাম জাতীয় সরকার (National Government)। অতএব গণতান্ত্রিক সরকার তিন প্রকার: কোনো রাজনীতিক দলের সাংসদসংখ্যা সর্বাধিক হলে সংখ্যাগুরু দলের সরকার গঠিত হয়। দুটো বা কয়েকটা দলের আঁতাতে, সমর্থনে ও সহযোগিতায় বা শরিকানায় গঠিত সরকারকে বলে কোয়ালিশন সরকার, কিংবা নানাদলের সমর্থিত সংখ্যালঘু দলের সরকার এবং আপৎকালীন সর্বদলের সমর্থনে, সম্মতিতে, সহযোগিতায় ও শরিকানায় গঠিত সরকারের নাম জাতীয় সরকার। সুতরাং ঐকমত্য শব্দটা, ধারণাটা 'গণতন্ত্র'-এর মৌলতত্ত্ব ও তাৎপর্য বিরুদ্ধ। কারণ সুষ্ঠুগণতান্ত্রিক শাসনের জন্যে সংসদে বিরোধীদলের উপস্থিতি আবশ্যিক। ঐকমত্য অজ্ঞ-অনক্ষর স্থূলবুদ্ধি লোকদের বিভ্রান্ত করার ও রাখার একটা মতলবী জিগির-নারা-স্লোগান ভাঁওতামাত্র। এটি মৌলিকভাবেই অগণতান্ত্রিক শব্দ ও তত্ত্ব। এর বর্জন-বিরোধিতাই বাঞ্ছনীয়। বর্তমান সরকার হচ্ছে আওয়ামী লীগার সাংসদ ও মন্ত্রী প্রধান জাসদ, জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংজ্ঞায় ও সাংবিধানিক সংজ্ঞার্থে হাসিনার সরকার কোয়ালিশন সরকার, ঐকমত্যেরও নয়, আওয়ামী লীগেরও নয়। 'বিশ্বে এল নতুন বাদ' মার্কা এ-ও এক চমক লাগানো বাদ। ঐকমত্য নতুন তত্ত্ব।

আবর্তনে পরিবর্তন নেই

স্থলে জলে অরণ্যে পর্বতে আকাশে সর্বত্র প্রাণীরা সাধারণভাবে খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বলেই সদা শঙ্কা-ত্রাসের মধ্যে বাস করে। একের খাদ্য অপরের খাদক। কাজেই জীবৎকালে প্রত্যেকটা প্রাণী খাদ্য না হওয়ার প্রয়াসে এবং খাদ্য সংগ্রহের আয়াসে তাদের জাগ্রত মুহূর্তগুলো ব্যয় করে। এভাবেই আত্মরক্ষার প্রয়াস আর নিরাপত্তার অভাব অনিশ্চয়তা প্রাণীকে সারাজীবন চিন্তিত, অস্থির ও অস্বস্ত রাখে। একারণেই প্রাণীর জীবন সুখেরও নয়, শান্তিরও নয়। এ জন্যেই জীবন হচ্ছে সংগ্রামের, আত্মরক্ষার, প্রতিরোধের, খাদ্যসংগ্রহের সামগ্রিক, সামূহিক, সামষ্টিক ও সার্বক্ষণিক প্রয়াসসমষ্টিমাত্র। অতএব জীবনে সুখ ও শান্তি কোথায়! সুখ তো মরীচিকা, আনন্দতো ক্ষণপ্রভা, শান্তিতো শ্রাবণের মেঘভাঙা রোদ মাত্র। সুখের শান্তির স্বস্তির আনন্দের আশায় ও আশ্বাসে তবু রূপের পিপাসায় রসের তৃষ্ণায় ভোগের বাসনায় কাম-ক্রোধ-লোভের উত্তেজনায় জীবনভর মানুষ ছুটোছুটি করেই চলেছে। মুগ্ধপ্রাণীর মুক্তি নেই। রবীন্দ্রনাথ দাবি করেছেন 'জন্মেছিনু সূক্ষ্মতারে বাঁধা মন নিয়া।' তাই তাঁর পঞ্চেন্দ্রিয় সংগৃহীত রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ তাঁকে জগৎভাবনায় ও জীবন-চেতনায় নানা রূপের ও বিচিত্র রসের সন্ধান দিয়েছিল। ফলে তাঁর জীবনে নানা রোগ শোক সত্ত্বেও তিনি অনুভব-উপলব্ধি করেছেন যে 'যা পেয়েছি তুলনা তার নেই।'

আমরা সাধারণ মানুষেরা অজ্ঞ-অনক্ষর স্বল্পাক্ষর স্বল্পবোধের ও স্বল্পবিদ্যার লোক। আমাদের মন-মগজ-মনন নিতান্ত বন্ধ্যা, সূক্ষ্ম বুদ্ধির অনুশীলনে অসমর্থ এবং আমাদের মন-মগজ নিত্যকার ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কাম-ক্রোধ-লোভসংক্রান্ত চেতনায় চিন্তায় প্রযুক্ত মাত্র। কেননা আমরা অন্যান্য প্রাণীসুলভ প্রবৃত্তি পরবশ। আমাদের নিবৃত্তির, সংযমের, সহিষ্ণুতার সহযোগিতার প্রত্যাশিত ও প্রয়োজনীয় মানের মাপের মাত্রার অনুশীলনজাত অর্জন নেই। এ জন্যেই হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ স্বরচিত কৃত্রিম অপ্রাকৃত জীবন যাপনের প্রয়াসী থেকেও আজো ঘরে বাইরে সমাজে-সরকারে-রাষ্ট্রে-বিশ্বে সহ ও সমস্বার্থে, সংযমে, পরমত-কর্ম-আচরণ সহিষ্ণুতায়, পণ্য বিনিময়ে, সততায়, সহযোগিতায় সহাবস্থানে অভ্যস্ত হতে পারল না। কেবলই লাভে লোভে স্বার্থে সংকল্প বা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চলেছে জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে। ফলে আমরা কেউ কাউকে সুখ দিতে পারি না। নিজেরাও আত্মসুখ অন্বেষায় কেবলই ব্যর্থ হই। পরিণামে সুখের আশায় যে করে প্রয়াস, দুখ যায় তার পাশ। পৃথিবীতে এতো মহৎকথা, আপ্তবাক্য, প্রবাদ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবচন, নীতিকথা, সদুপদেশ, তত্ত্ব দর্শন, ইতিহাস চালু রয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞতা-অভিজ্ঞতার সঞ্চয় রয়েছে, কিন্তু সমাজ বাহ্যত রূপান্তরিত হলেও আবর্তিতই হয়েছে মূলত, বিবর্তিত হয়নি আজো। মানুষে মানবিকগুণও বাঞ্ছিত মাত্রায় বিকাশ বিস্তার উৎকর্ষ লাভ করেনি।

কেননা মা-বাবা সচেতন প্রয়াসে চৈত্তিক উৎকর্ষ লাভ করলেও সন্তানতো জন্মসূত্রে প্রাণীমাত্র, বিনা অনুশীলনে সে তো অর্থ-সম্পদের মতো মানবিক গুণের অধিকারী হয় না। এর ফলেই আলিমের ঘরে জাহেল, ন্যায়বানের ঘরে জালিম, দয়ালুর ঘরে নিষ্ঠুর মানুষ সুলভ। পারিবারিক ঐতিহ্য রক্ষিত হয় না। ভালো-মন্দ, পণ্ডিত-মূর্খ কিংবা করুণা-কৃপা দয়া-দাক্ষিণ্য, অথবা যুক্তি-বুদ্ধি জ্ঞান-প্রজ্ঞা বিবেকী বিবেচনা কখনো বংশানুক্রমিক হয় না। একারণেই পৃথিবীতে সাহিত্য, দর্শন, শাস্ত্র, নীতিকথা, আপ্তবাক্য, প্রবাদ-প্রবচন কিছুই মনুষ্যের মন-মগজ-মনন উন্নয়নের সাধারণভাবে সহায়ক হয়নি। বুলির সত্য কাজের সত্য হয়ে ওঠেনি। গণতন্ত্রও গণতান্ত্রিকতায় বাস্তবায়িত হয় না। গণনেতাও হয় না গণসেবী, গণদরদী হয়ে দাঁড়ায় গণবন্দ্য ছদ্মসেবক, স্বরূপে হয় কপট-বঞ্চক-প্রতারক। বিশ্বের সর্বত্র গণতান্ত্রিক সরকারের নায়করা কথায় সেবক প্রতিনিধি, কাজে প্রভু ও শাসক-শোষক। জাতীয় রাজনীতিক দলের নেতারা এবং সরকার-প্রধানরা কোনো কোনো দেশে এমুহূর্তে অসততার, দুর্নীতির, দুঃশাসনের, হত্যার ও অর্থ আত্মসাতের দায়ে জনধিকৃত ও সাজাপ্রাপ্ত।

আরো একটি বিষয়ও শাহ-সামন্ত-বুর্জোয়া রাজনীতিতে বিবেচ্য, তা হচ্ছে সাধারণভাবে চিরকাল দেখা যাচ্ছে নিম্নবিত্তের ও মধ্যবিত্তের ঘরেই জন্মে জ্ঞানী-বিজ্ঞানী-গুণী মানববাদী মানবিকতাবাদী মানবতাবাদী মানবহিতবাদী অনন্য মন-মগজ-মনন-মনীষা সম্পন্ন সজ্জন সুজন। এসব জ্ঞানে বিজ্ঞানে প্রজ্ঞায় যুক্তিতে বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ লোকেরা সাধারণভাবে অর্থে সম্পদে বাহুবলে জনবলে শক্তিমান শাহ-সামন্ত-ধনী-মানী-খ্যাতি-ক্ষমতাবান লোকদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, তাঁরা লতার মতো বৃক্ষস্বরূপ ধনী-মানীর আশ্রিত হয়ে ধন্য হন। প্লেটো অ্যারিস্টটল ম্যাকিয়াভেলি গ্যয়টে ফেরদৌসী কালিদাস হয়ে আজকের কবি সাহিত্যিক দার্শনিক ঐতিহাসিক বিজ্ঞানী প্রভৃতি সবারই একই লক্ষ্য দেখতে পাই। তাঁরা কখনো নেতৃত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন না।

এখনো যাঁরা ভালো বিদ্বান, তাঁরা আমলা হন। যাঁরা বিদ্যাহীন, আদর্শ চেতনায় দীন, বুদ্ধিতে স্থূল কিন্তু চরিত্রেরিক্ত ও ধূর্ততায় প্রবল তাঁরাই জ্ঞানী-গুণীদের প্রভু। ফলে আজো গণতান্ত্রিক সরকারের ও রাজনীতিক দলের সদস্যরা সাংসদরা দেশে খ্যাতি ক্ষমতা বিত্ত বেসাত দর্পদাপট অর্জনে নিষ্ঠ, লোকসেবায় কার্যত অনীহ। একটি দৃষ্টান্ত। ইসলামে পাপ-পুণ্য বিনিময় বা দান যোগ্য নয়। রোজা-নামাজ পারত্রিক জীবনে আত্মমুক্তির সঞ্চয় বা পুঁজি মাত্র। কাজেই রোজা ব্যক্তিগত কর্তব্য সরকারি অর্থে সরকারি ভাবে ইফতার উৎসবে লক্ষ লক্ষ অর্থব্যয়ে অধার্মিকতার অপরাধবোধ কিন্তু সরকারের থাকে না। তা ছাড়া সরকারি অর্থ বিভিন্ন ধর্মমতের নাগরিকের। কয়েক শতলোক নিয়ে ইফতারে অর্থ ব্যয় অপকর্ম নয় কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযুদ্ধের কিস্‌সা ও কাহিনী

১৮৫৭ সনের দ্রোহে সিপাহি, ওয়াহাবী ও দত্তকগ্রহণের বৈধতা বিলুপ্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশীয় রাজ্যের রাজন্যের মিলিত শক্তির পরাজয় ঘটে ব্রিটিশ কোম্পানী সরকারের হাতে। এবার দিল্লীর নামেমাত্র সম্রাটও অস্তিত্ব হারান। ফলে স্যার সৈয়দ আহমদের পরামর্শে ও নেতৃত্বে ভারতের মুসলিমরা হৃত সামাজিক গৌরবের গর্বের ক্ষোভ-ক্রোধ পরিহার করে সংখ্যাগুরু শাসিত হিন্দুর সম্ভাব্য শাসন-শোষণ-পীড়ন-প্রতিহিংসার আশঙ্কা সচেতন হয়ে হিন্দুদ্বেষণাকে পুঁজি-পাথেয় করে ব্রিটিশ শাসনের সমর্থক হয়ে ব্রিটিশ কৃপা-করুণা-আশ্রয়-প্রশ্রয়ের প্রত্যাশী হল। ১৮৭০ সনে ওয়াহাবীমামলার অবসান কাল থেকে ১৯৪৭ সন অবধি ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিম আমজনতা সাধারণভাবে ব্রিটিশবিদ্বেষী ছিল না। ব্যতিক্রম এ ক্ষেত্রে আলোচ্য নয়। কিন্তু মাদ্রাসাশিক্ষিত শাস্ত্রজ্ঞ মুসলিমরা ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের অভাবে ব্রিটিশ-কৃপা বঞ্চিত ছিল বলেই মুঘল সাম্রাজ্য বিলুপ্তির ক্ষোভ ভুলতে পারেনি বলেই স্বাধীনতাকামী কংগ্রেসের সমর্থকই ছিল উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে ১৯৪০ সনে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ কালঅবধি। সাধারণভাবে মুসলিম রাজনীতির লক্ষ্য ছিল সংখ্যানুপাতে সরকারি চাকরিতে, সরকারি শাসন-প্রশাসন-শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ক কমিটি-কমিশনে এবং লাটের-বড় লাটের মন্ত্রী পরিষদে এবং আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চাকরি ও আসন সংরক্ষণ এবং স্বতন্ত্রনির্বাচন। কংগ্রেসের সঙ্গেও তথা হিন্দুদের সঙ্গে একই লক্ষ্যে বেঙ্গল প্যাক্ট, লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট প্রভৃতি চুক্তি হয়েছিল। বসেছিল ১৯৩০-৩২ সনে তিনবার হিন্দু-মুসলিম দাবির সমস্যা-সঙ্কট আলোচনার ও মীমাংসার জন্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বে ও নেতৃত্বে গোলটেবিল বৈঠক।

১৯৪৭ সন অবধি শিক্ষিত শহুরেদের রাজনীতিতে গ্রামীণ গণমানবের স্বার্থচেতনা কখনো কার্যকর ছিল না। কাগুজে বিবৃতিতে, মেঠো বক্তৃতায়, নির্বাচনী ইস্তিহারে কম্যুনিস্টদের লেখায় অবশ্য গণমানবের প্রতি ছদ্মদরদ এবং তাদের হিতকামনা প্রকাশ পেত। এখনো যেমন পথে ঘাটে, ভাষণে বক্তৃতায় লেখায় রেখায় মিছিলী জিগিরে নারায় স্লোগানে গণদরদ উথলে ওঠে শহরে বন্দরে সর্বত্র। ঝড়-ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-মারী পীড়িতরা জমিদারের ও সরকারের আকালিক নির্মম অমানবিক শোষণের নির্যাতনের অসহ্য যন্ত্রণায় মরীয়া হয়ে কখনো কখনো ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ চিত্তে আত্মবিনাশীদ্রোহ করে জান-মাল-গর্দান হারিয়েছে কোনো কোনো অঞ্চলে, গাঁয়ে, পাড়ায়। কিন্তু মহাজনের শাহ-সামন্ত-বুর্জোয়ার শাসন-শোষণ-পীড়ন মুক্তি লক্ষ্যে কোনোদিন কোনো সংহত সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস-প্রযত্ন দানা বেঁধে ওঠেনি বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদের আগে। বস্তুত ১৯১৫ সন থেকে গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে এবং প্রথমে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস ও পরে স্বাধীনতার দাবিতে দ্রোহী হয়ে ওঠে কংগ্রেস। আর মুসলিম লীগ ১৯০৬ সন থেকে চাকরিতে ও ব্যবস্থাপক সভায় মুসলিমদের জন্যে সংখ্যানুপাতিক পদ ও আসন দাবিতেই তার চিন্তা-চেতনা-প্রয়াস-প্রযত্ন-আন্দোলন সীমিত রাখে।

বাস্তবে গোলটেবিল বৈঠক থেকেই ভারতে রাজনীতি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মুসলিমরা ব্রিটিশ প্রশ্রয়ে আর মনস্বী মুহম্মদ আলি জিন্নাহর নেতৃত্বে ১৯৪০ সনে দ্বিজাতিতত্ত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঙ্গীকার করে মুসলিমদের জন্যে মুসলিম সংখ্যাগুরুঅঞ্চল নিয়ে পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র দাবি করেন, ঠিক ওই সময়েই রাজনীতি ক্ষেত্রে কম্যুনিস্টরাও গুরুত্ব পেতে থাকে। এদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত ব্রিটিশ সরকারের ত্রিশঙ্কু দশার সুযোগ নিয়ে 'কুইট ইন্ডিয়া' নারায় ও আন্দোলনে ব্রিটিশ বিতাড়ন সঙ্কল্প বাস্তবায়নে উদ্যমী উদ্যোগী হয়ে ওঠে কংগ্রেস। আর পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু, রাজাগোপাল আচরিয়া প্রমুখ নেতারাও স্বাধীনভারতের শাসক হওয়ার আগ্রহে চঞ্চল হয়ে আশু মীমাংসায় মেতে ওঠেন। ফলে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ছদ্ম নিরপেক্ষতারূপ ঔদাসীন্যে ও অব্যবস্থায় ছয় লক্ষ লোকের প্রাণহরা বীভৎস রক্তস্রোতে স্নাত স্বাধীনতা এল ধনী মানী শহুরে শিক্ষিত অর্থ-বিত্ত-বেসাতের মালিকদের বিখণ্ডিত ভারতে, যদিও দ্বিজাতিতত্ত্ব রইল সরকারিভাবে অস্বীকৃত।

অজ্ঞ অনক্ষর নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র বহুল সংখ্যালঘুর হিন্দুর শোষণ-শাসন-পীড়ন-বঞ্চনার যে আশঙ্কায় পাকিস্তান দাবি করেছিল, পাকিস্তানে সেই একই কারণে বাঙালিরা বাঙলাদেশে কেন্দ্রীয় শাসনবিরোধী হয়ে ওঠে। একইভাবে লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাঙলাদেশ স্বাধীন হয়। বঞ্চনার ক্ষোভ শুরু হয় বাঙলাভাষা অন্যতর রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃত না হওয়ায়। আওয়ামী মুসলিম লীগের উদ্ভব ঘটে এভাবেই। মুসলিম লীগ শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে পূর্ববাঙলায় আসতেই দিল না। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী জিন্নাহ ঘোষিত Direction Action-এ মুসলিম বহুল বাঙলাপ্রদেশে নেতৃত্ব দেন। Direction Action ছিল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। তাই জিন্নাহর নির্দেশে সরকারপ্রদত্ত সব উপাধিবর্জন করেন সরকার-পুরস্কৃতরা। কিন্তু খাজা নাজিমউদ্দীন মুসলিম ইনস্টিট্যুটে অনুষ্ঠিত একসভায় তাঁর ভাষণে বলেন যে মুসলিম লীগের এ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direction Action) সরকারের বিরুদ্ধে নয়, কংগ্রেসেরই [হিন্দুদের] বিরুদ্ধে ঘোষিত। এতেই হিন্দুরা দাঙ্গার প্রস্তুতি নিল, হিন্দুদের নিবাস দোতলায় তেতলায় ইট পাথর গরমপানি গুলি-শেল- বল্লম নিক্ষিপ্ত হল উপর থেকেই। মুসলিম লড়িয়ে-লড়াকুরা ছিল রাস্তায়-নামা বিহারী বাঙালি শ্রমিক কিংবা ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ পেশাজীবী শ্রেণীর গরীবেরা। কাজেই মার খেল তারাই ১৯৪৬ সনের কোলকাতার দাঙ্গায়।

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন নীতি-আদর্শহীন সুবিধেবাদী সুযোগসন্ধানী নগদজীবী জাতীয় পর্যায়ের নেতা। তাই সুমলিম লীগার হিসেবে ছিলেন পাকিস্তানের দাবিদার, আবার জিন্নাহর মনজোগানোর জন্যে পাকিস্তান প্রস্তাবের States'-এর "S" বর্জনে তিনিই উদ্যোগী হন ১৯৪৭ সনের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত দিল্লী কনফারেন্সে অবাস্তব একক 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে। পুনরায় ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেস ভারত বিখণ্ডনে সম্মত হওয়ার পর পরই এই সোহ্‌রাওয়ার্দীই অখণ্ড বাঙলা রাষ্ট্র গঠনের জন্যে তদবীর শুরু করেন। এর ফলেই মৌলানা আকরম খান, খাজা নাজিমউদ্দীন-নুরুল আমিনরা তাঁকে মুসলিম সমাজে অপ্রিয় করে তোলেন। দাঙ্গাবাজ বলে কোলকাতায়ও তাঁর ঠাঁই হল না, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে তিনি করাচি-আশ্রিত হন। বাঙলাদেশে যুক্তফ্রন্ট গঠন কালে তিনি আবার জনপ্রিয় নেতা হন। মৌলানা ভাসানী মুসলিম বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ করেন, সোহ্‌রাওয়ার্দী এ সুযোগে তাঁর অনুগত শেখ মুজিব প্রমুখ তরুণ নেতাদের সমর্থনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব পেলেন, এমনকি চাটুকারদের তোয়াজের ভাষায় হয়ে উঠলেন 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র'। অথচ সোহ্‌রাওয়ার্দী 'শূন্য যোগ শূন্য সমান শূন্য' তত্ত্ব উচ্চারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে রাষ্ট্রকে মার্কিন অনুগত করে দিলেন, সে-আনুগত্য স্বাধীনতা উত্তর কালেও রয়ে গেল তাঁর ভক্তদের বদৌলত। ইনি রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পক্ষেই ছিলেন, তা তাঁরও মাতৃভাষা বলেই। ইনিই আবার কেন্দ্রীয় সরকারপ্রধান হওয়ার লক্ষ্যে বলেছিলেন পূর্বপাকিস্তান শতে আটানব্বই ভাগ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে। ইনিই মুহম্মদ আলি বোগড়ার সরকারে হঠাৎ আইন মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন পরে প্রধানমন্ত্রী হবার লক্ষ্যে।

শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতিক উত্থান ঘটে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর অনুচর সহচর আস্থাভাজন অনুগত যোগ্য-দক্ষ সাহসী রাজনীতিক হিসেবে। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর প্রয়াণের পরে, ভাসানীর সমর্থন ও আশীর্বাদ পুষ্ট সাহসী জেলখাটা দেশপ্রেমী ও বাঙলাদেশের গণমানবের স্বার্থ সংরক্ষক হিসেবে ছয় দফার দাবিদার আওয়ামী লীগের নেতা রূপে দেশের জাতীয় পর্যায়ের প্রভাবশালী প্রথম সারির করগণ্য নেতাদের অন্যতম হয়ে ওঠেন। ইতোমধ্যে আকস্মিকভাবে তাঁকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী হিসেবে আটক করা হয়, এ মামলার কারণে বাঙালি মাত্রই একে জাতীয় অবমাননা বলে অনুগত-উপলব্ধি করতে থাকে। ফলে মুজিব হয়ে ওঠেন গোটা বাঙলাদেশীর ও বাঙলার প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ। বাঙালি মাত্রেরই বাঙালিসত্তার ও স্বাধীনতার প্রেরণার, প্রণোদনারও প্রবর্তন দানের উৎস ও ভিত্তি। তাই তাঁর ভক্তরা তাঁকে জাতির পিতা ও বঙ্গবন্ধু নামে জানে বোঝে ও মানে এবং অন্যদের থেকেও এ সম্মান ও মর্যাদা যে তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য তার স্বীকৃতি আদায় করতে তৎপর।

১৯৬৯ সনে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় করাচিতে লাহোরে ইসলামাবাদে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরে তা সংক্রমিত হয় ঢাকায় ও পূর্ববঙ্গের সব শহরে তখন জাতীয় বীরপ্রতীক শেখ মুজিবের প্রভাব তুঙ্গে। কাজেই ১৯৭০ সনের নির্বাচনে তাঁর আওয়ামী লীগ তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

জুলফিকার আলী ভুট্টোই প্রথম সংখ্যাগুরু দলের কাছে গণতান্ত্রিক শাসন ক্ষমতা দানে অন্যায়ভাবে বাধা দেন, জঙ্গীশাসক মুহম্মদ ইয়াহিয়া তাঁর সঙ্গে জুটে যান পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি পদ প্রাপ্তির লোভে। ভুট্টোই প্রথম পাকিস্তান দ্বি-খণ্ডিত করার প্রস্তাব উচ্চারণ করেন এই বলে যে তিনি হবেন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। এ তাৎপর্যে পূর্ব পাকিস্তানীরা পাকিস্তান ভাঙেনি। দ্বি-খণ্ডিত করেছে পাকিস্তানীরাই ইয়াহিয়ার মুখে সংসদ অধিবেশন অনিশ্চিত বলে ঘোষণা করিয়ে।

তারপরের ঘটনা সবাই জানে, তেসরা মার্চ থেকে পঁচিশে মার্চ অবধি বাঙলাদেশের প্রশাসন চলে মুকুটহীন সম্রাটের নির্দেশে। যুদ্ধের উদ্যোগ আয়োজন চলছিল পূর্ণ উদ্যমে অস্ত্র আনয়নে ও ট্রেন্স খননে।

বাঙালি পুলিশ ও সৈনিকরা তাঁদের উপর আসন্ন হামলার নিঃসংশয় আশঙ্কায় নিরুপায় হয়ে পাক-বাহিনীকে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি ও সাহস অর্জন করে প্রতিরোধে বুক ফুলিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ওরাঁ চাকুরে ছিলেন, কোনো দলের সদস্য ছিলেন না, মনে মনে কেউ কেউ আওয়ামী লীগ সমর্থক অবশ্যই ছিলেন, কিন্তু সবাই নন এবং জিয়াউর রহমানের মতোই অনেকেরই পাকিস্তান ও ইসলাম প্রীতি যে ছিল, তাও পরবর্তী যুদ্ধকালে প্রমাণিত হয়েছে নূরুল আমিন, মাহমুদ আলি, হামিদুল হক চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খন্দকার মোস্তাক আহমদ, হোসাইন মুহম্মদ এরশাদ, ওবায়দুল্লাহ মজুমদার প্রভৃতির এবং শাহ আজিজুর রহমান, এ.কে. এম নূরুল ইসলাম, ফজলুল কাদির চৌধুরী, ডক্টর কাজী-দীন মুহম্মদ, মৌলবী ফরিদ আহমদ প্রমুখ অনেক অনেক শহুরে শিক্ষিতদের কর্মে ও আচরণে।

কাজেই মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সৈন্যেরা ও পুলিশেরা আর কিছু নানা পেশার সাহসী দেশপ্রেমীরা। আবেগ চালিত হয়ে গাঁ-গঞ্জের বহু বহু কিশোর-তরুণ নিরক্ষর সাক্ষর ও শিক্ষিত নির্বিশেষে যুদ্ধ করেছে, প্রাণ দিয়েছে এবং গাজী হয়ে ফিরে এসেছে। এ ছিল পরিণামে জনযুদ্ধ, গণযুদ্ধ, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন লক্ষ্যে জাতির হয়ে লড়াকু দেশপ্রেমীর মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতার যুদ্ধ। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এ যুদ্ধের প্রাণপুরুষ এ অর্থে যে তিনিই ছিলেন জাতির প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূরূপে যুদ্ধে প্রাণ দানের প্রণোদনার প্রবর্তনার উৎস ও ভিত্তি। তাই বলে একে কোনো অর্থেই আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতাযুদ্ধ বলে দাবি বা অভিহিত করা চলে না। এজন্যেই বাঞ্ছনীয় ছিল ১৯৭২ সনের গোড়ায় একটা জাতীয় সরকার গঠন, দলীয় নয়।

উল্লেখ্য যে ১৯৭১ সনে কোনো খ্যাত আওয়ামী লীগার সেনাবাহিনীর হাতে নিহত বা লাঞ্ছিত হননি। তবে মুসলিম লীগার বগুড়ায় ফজলুল বারী ও যশোরে আওয়ামী লীগার মশিহুর রহমান নাকি পাকসেনার আকস্মিক ভুলে নিহত হন। এখন প্রকৃত ইতিহাস রচনার ও বলার নামে সব কৃতি-কীর্তির মালিক হয়ে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ ও মুজিব পরিবার। এদের বয়ানে মনে হয় শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর আওয়ামী লীগের আগে বাঙলাদেশে রাজনীতিক অঙ্গনে কেউ ছিল না, কিছুই ছিল না এবং পরেও অ-আওয়ামী কোনো সুজন-সজ্জন দেশপ্রেমী-মানবসেবী রাজনীতিক দল ও রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব নেই–নেই তথাকথিত বুদ্ধিজীবী-লেখক-সাংবাদিক-শিক্ষক-উকিল-ডাক্তার-প্রকৌশলী এমনকি কোনো চিত্রকর, সঙ্গীত-নৃত্য-বাদ্য-অভিনয় শিল্পীও। আমাদের মনে রাখা দরকার 'মিছা কথা, সিঁচা জল কতক্ষণ রয়।' আর 'সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর' [ভারতচন্দ্র রায়] যদিও আমরা জানি ইতিসাহ হচ্ছে দলগত, কালগত ও মতগত Legend ও Myth, তবু সত্যের লেশ ও রেশ ঢাকা পড়ে না, ঢাকা যায় না, পাথুরে দাগ মোছা সহজ নয়। লোকে বলে গুণ, গন্ধ ও সত্য গোপন থাকে না, নানাভাবে বেরিয়ে যায়, ছড়িয়ে পড়ে।

'পাছে লোকে কিছু বলে'

মার্কসবাদ অঙ্গীকার করলে কেউ আস্তিক বা শাস্ত্রিক বিশ্বাসে ও সত্যে আস্থা রাখতে পারে না। কেননা দুনিয়ার তাবৎ শাস্ত্রেই মৌরুসী সম্পদ ভোগের অধিকার ন্যায্য বলে স্বীকৃত। কাজেই মার্কসবাদী মাত্রই বাহ্যত অন্তত নিরীশ্বর নাস্তিক এবং শাস্ত্রে আস্থাহীন। কিন্তু একালে তারা শাস্ত্রীপন্থীদের রোষের অবজ্ঞার ভয়ে যথাকালে যথাস্থানে যথাপ্রয়োজনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যথাপাত্রে স্বমত ও স্বপথ গোপন করে চলে। ফলে আস্তিক জন আজো নিরীশ্বর নাস্তিকের প্রতি অসহিষ্ণু ও অবজ্ঞাপরায়ণ। মাকর্সবাদীরা এ ছদ্ম-কপট আচরণ না করে যদি সাহসের সঙ্গে স্বপরিচয় তুলে ধরত অর্থাৎ নিজেকে শাস্ত্রে আস্থাহীন বলে জাহির করত, তা হলে এতো দিনে শাস্ত্রে আস্থাবান নিষ্ঠা ধার্মিকরাও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে যেভাবে সহ্য করে, সেভাবেই নাস্তিকদেরও সহ্য করত নতুন এক চার্বাকে দল হিসেবেই। ফলে নাস্তিকের প্রতি অবজ্ঞা-অসহিষ্ণুতা হ্রাস পেত এমন কি তাদের চার্বাকপন্থী বা আজীবিক বলেও চরম তাচ্ছিল্যে সহ্য করত সমাজে তাদের বিচরণ। হিন্দু সমাজ এ সব বিষয়ে আজকাল অনেক উদার হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর কালে নিম্নবর্ণের নিম্নবিত্তের ও নিম্ন অনক্ষর বর্গের লোকের স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার দাবির দাপটে ও চাপে। তবু সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব আজো সেখানে রক্ত ঝরায়, প্রাণ হানে। এ ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী মুসলিমমাত্রই অসহিষ্ণু এবং উগ্র। আলবেনিয়ায় কিংবা জারের রুশ সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চলের মুসলিমরা বাহ্যত ও নামত কম্যুনিস্ট হলেও কার্যত অন্তরে ইসলামে আস্থা গাঢ় গভীর ভাবে পোষণ করত অনেকেই, এখন তার অঢেল অজস্র দেদার সাক্ষ্য প্রমাণ মিলছে। খ্রীস্টান-বৌদ্ধদের ক্ষেত্রেও এ সমপরিমাণে সত্য। প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ার বসনিয়ায়-সার্বিয়ায় বিধর্মী হত্যায় ও গির্জা-মসজিদ ভাঙায় আদি ও আদিম বর্বরতারই সাক্ষ্য-প্রমাণ মেলে। মারমুখো উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ-লিপ্সু মানুষকে আজো শ্বাপদ প্রাণীর স্তরেই রেখেছে।

সেদিন আশিরও ঊর্ধ্ব বয়সের অবসরপ্রাপ্ত বড়ো চাকুরে ও প্রাক্তন মন্ত্রী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁর পরিবার নানা কারণে এ উপমহাদেশের শিক্ষিতদের অনেকেরই চেনা-জানা। তিনি যখন বললেন যে তিন প্রজন্মে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি বাল্যে কুরআন পড়েননি, তাঁকে নামাজ-রোজাও শেখানো হয়নি এবং তাঁর ভাইদেরও কেউ কেউ অপ্রকাশ্যে তাঁর মতোই নিরীশ্বর নাস্তিক, যদিও তাঁরা এ বিষয়ে কাউকে কিছু জানতে বুঝতে দেন না। ফলে লোকে তাঁদের নামাজে-রোজায় উদাসীন মুসলিম বলেই জানে ও মানে এবং তাঁরা সবাই সমাজে সৎ ও বিদ্বান এবং রাজনীতিসচেতন সংস্কৃতিমান হিসেবে শ্রদ্ধেয়। কিন্তু শিক্ষিতদের মধ্যে আমি এমনি নাস্তিক ছদ্ম মুসলিম ও হিন্দু অনেক দেখেছি। কাজেই এ ভদ্রলোকের কথা শুনে বিস্মিত হইনি। তবে শ্রদ্ধাটা গাঢ়-গভীর হল মাত্র। এঁদের মুক্ত বুদ্ধি-চিন্তা-চেতনা কিন্তু সমাজকে উপকৃত করেনি।

এ ধরনের লোকদের সম্বন্ধে আমার ক্ষোভ ও আফসোস এই যে তাঁরা যদি সাহস করে তাঁদের উদার মুক্ত স্বাধীন চিন্তা-চেতনা, মত-মন্তব্য-সিদ্ধান্ত এককথায় তাঁদের জীবনভাবনা ও জগৎচেতনা পরিব্যক্ত করতেন, তা হলে আমাদের বাঙলাদেশী মুসলিম সমাজের উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা কমত। নিরীশ্বর-নাস্তিকের বিপুল সংখ্যায় সমাজে উপস্থিতি দেখে তারাই এতোদিনে প্রতিরোধ প্রয়াস বৃথা-ব্যর্থ-নিরর্থক মনে করে উগ্র পীড়নবাঞ্ছা ও অসহিষ্ণুতা পরিহার করে কেবল অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য করেই তুষ্ট, তৃপ্ত ও হৃষ্ট থাকত। মুসলিম সমাজের কল্যাণ লক্ষ্যে সমাজকে চিন্তা-চেতনায় সমকালীনতা দানের উদ্দেশ্যে তাঁরা সমাজে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলে আজ আমরা অনেক এগিয়ে যেতে পারতাম জীবন-জীবিকার নানা ক্ষেত্রে।

শক্তি মরে ভীতির কবলে/ পাছে লোকে কিছু বলে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের কম্যুনিস্টরাও উগ্র ধর্মধ্বজী মুসলিমরোষমুক্তির এবং ভোটরূপ দয়া প্রাপ্তির গরজে নতুন করে 'ধর্মকর্ম সমাজতন্ত্র' নামের এক জিগির বা স্লোগান তৈরি করল। এ স্লোগান বা নারা হচ্ছে সোনার পাথরবাটির মতোই অদ্ভুত ও অলীক। তাদের এ নীতি 'সাপও মরে, আর লাঠিও না ভাঙে' নীতিরই নামান্তর মাত্র। শক্তি-সাহসের অভাবে এ হচ্ছে কম্যুনিস্টদের অঙ্গীকারভ্রষ্টতা। গা-পা বাঁচানোর অপচেষ্টা মাত্র। আমরা জানি, শক্তি, সাহস ও আত্মপ্রত্যয় থাকলে এ মুহূর্তেই বাঙলাদেশে অন্তত দু'লক্ষ লোক নিজেদের মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তা-চেতনা-ঋদ্ধ-শাস্ত্রে আস্থাহীন নিরীশ্বর-নাস্তিক বলে ঘোষণা করত। তা হলে মৌলবাদীরা তাদের মনে প্রাণে ভয়-ত্রাস সৃষ্টি করতে পারত না। মানুষ মনের-মগজের-মননের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারত। দেশও হত সমকালীন প্রগতিশীল প্রাগ্রসর চিন্তায়-চেতনায় বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত। কারণ নাস্তিক ও নাস্তিক্য অন্যদের এতোদিনে গা-সহা, চোখসহা ও মনসহা হয়ে যেত। রাজনীতিক দলগুলোও স্বল্পবুদ্ধির দুর্বল অদূরদর্শী নেতৃত্বে ভোট জোগাড়ের সহজ পন্থা হিসেবে জনগণের মতের উমেদার। অথচ জনমত স্বপক্ষে স্বনিয়ন্ত্রণে আনাই হচ্ছে দেশ ও জনহিতকামী রাজনীতিক দলের ও নেতার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। আজ তাই সবাই ধর্মধ্বজী হয়েই রাজনীতি করে আমাদের দেশে। ফলে মৌলবাদীর হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলা বেড়েই যাচ্ছে দেশের শহরে-বন্দরে-গাঁয়ে-গঞ্জে-পাড়ায়-মহল্লায়। একদিকে দারিদ্র্যদুষ্ট দেশে বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি ও অনিশ্চিত আর্থিক জীবনের সঙ্কট-সমস্যাজাত শঙ্কা-ত্রাস যেমন মস্তান-গুণ্ডা-খুনী-প্রবঞ্চক-প্রতারক-জুয়াড়ি-জোচ্চোরের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করছে, তেমনি জনগণকে মৌলবাদী করার সাগ্রহ প্রয়াসও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুটোই সমভাবে প্রসারমান নিরুপায়-নিরাশ-হতাশ জনগণের মধ্যে। দুটোই মানুষের মানসস্বস্তি ও সমাজস্বাস্থ্য নষ্ট করছে। জনজীবন করছে বিপন্ন।

AMARBOI.COM

শিক্ষা-কমিটি ও প্রাসঙ্গিক চিন্তা

শিক্ষকমাত্রই শিক্ষার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবিদ নন। বিদ্বানমাত্রই শিক্ষা বিশেষজ্ঞ নন, তেমনি নন শিক্ষাবিভাগের বড় চাকুরে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-অধ্যাপক মাত্রই শিক্ষার অন্ধি-সন্ধি জানা সর্বজ্ঞ শিক্ষাবিদ। সরকার যে কমিটি করেছেন তার সদস্য-তালিকা দেখেই এ কথাগুলো মনে জাগল বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে। উচ্চশিক্ষার জন্যে অর্থাৎ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষাদানপদ্ধতি সম্বন্ধে বিচার-বিতর্কের, যোজন-বর্জনের কোনো সমস্যাই নেই, ছিলও না কখনো। কারণ সেখানে পাঠ্যসূচিই হচ্ছে তত্ত্ব, তথ্য ও আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত সর্বজনীন সত্যনির্ভর সর্বপ্রকার বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্যে, কিংবা চিকিৎসাবিজ্ঞানে নিত্য আবিষ্কৃত তথ্য সংযোজনে ও যন্ত্রের প্রয়োগ-জ্ঞান অর্জনে সদা সতর্ক ও সযত্ন প্রয়াস চালু রাখা ও আর্থিক সংস্থান রাখা, নতুন প্রতিষেধকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খবর রাখা ও প্রয়োগব্যবস্থা করা, পৃথিবীর বিভিন্ন শাখায় বিজ্ঞান ও প্রকৌশল-প্রযুক্তি বিষয়ক জার্নাল শিক্ষক ছাত্রদের জন্যে ইংরেজিতে কিংবা অনুবাদ মাধ্যমে মৌজুত রাখা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা মাধ্যমে নতুন নতুন তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, যন্ত্রনির্মাতা প্রমুখের পরীক্ষণ, সমীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ কাজের জন্যে যেসব নতুন নতুন যন্ত্র ও পদ্ধতি নিত্যই উৎকর্ষ লাভ করছে সেগুলো আনয়ন কিংবা সেগুলোতে প্রশিক্ষণ দানের জন্যে সংশ্লিষ্ট শাখার ব্যক্তিদের তথা বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ ও চিকিৎসক বিদেশে পাঠানোর জন্যে অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা রাখা প্রভৃতি সরকারের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আবশ্যিক ও জরুরি দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে গুরুত্ব সহকারে মেনে নিলে এবং বাস্তবে ব্যবস্থা গ্রহণও জরুরি বলে জানলে ও বুঝলে এবং বাস্তবায়নে সদা উদ্যোগী থাকলেই প্রতীচ্য জগৎ থেকে শেখা-জানা-বোঝা এবং আয়ত্ত করা সব বিজ্ঞান-চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রকৌশল-প্রযুক্তি সম্বন্ধে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আয়ত্তে থাকবে সব নিত্য বিকাশমান, বর্ধিষ্ণু, আবিষ্কৃত, উদ্ভাবিত জ্ঞান ও যন্ত্র আর প্রয়োগ পদ্ধতি। উচ্চশিক্ষায় পাঠ্য অর্থ-রাজনীতি-প্রশাসন-সমাজবিজ্ঞান কিংবা-আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ-কূটনীতি বিষয়ক বইপত্র ও প্রতীচ্যজগৎ থেকেই আসে। ইতিহাস-দর্শন-মনোবিজ্ঞান-সাহিত্য তত্ত্বও প্রাচীন ও আধুনিক প্রতীচ্য পণ্ডিতদেরই অবদান ভিত্তিক। কাজেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদেয় শিক্ষার জন্যে কোনো শিক্ষাকমিশনের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন কেবল পাশ্চাত্য দেশস্থ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর থেকে নিত্য আবিষ্কৃত উদ্ভাবিত জ্ঞান-বিজ্ঞান-যন্ত্র পদ্ধতি শেখার, জানার, বোঝার ও আয়ত্ত করার জন্যে শিক্ষার্থী পাঠানোর জন্যে দেদার অজস্র-অঢেল অর্থ ব্যয়ের সরকারি সামর্থ্য। কিংবা স্বদেশে গবেষণার ব্যবস্থা করা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষানীতি-পদ্ধতি নির্ধারণের জন্যেই কেবল শিক্ষা কমিশন বা বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রয়োজন।

তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর নাগরিকরা সাধারণভাবে দেশগত ও কালগত জীবনচেতনায় ও চিন্তায় গড়ে ওঠে না। তারা স্ব স্ব শাস্ত্র, স্থানিক, লৌকিক অলৌকিক অলীক কাল্পনিক অদৃশ্য নানা অরি-মিত্র শক্তিতে আস্থা, বিশ্বাস ও ভরসা রেখে ভয়-ভক্তি প্রভাবিত জীবন যাপনে আবাল্য অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। অদৃশ্য রুষ্ট মন্দ শক্তিকৃত ক্ষতি এড়ানোর জন্যে তাকে অরিশক্তিকে তোয়াজে তুষ্ট যেমন রাখতে হয়, তেমনি কৃপা-করুণার সৎশক্তিকেও বল-ভরসার অবলম্বন করতে হয়। ফলে কোনো মানুষই অন্য প্রাণীর মতো মুক্ত মন-মগজ-মনন নিয়ে জগৎকে ও জীবনকে জগৎচেতনা ও জীবনভাবনা নিয়ে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। ইহুদী-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান-মুসলিমেরা যথাক্রমে চার-তিন-আড়াই-দুই ও সাড়ে তেরোশ' বছর আগেকার শাস্ত্রিক ও বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার জগতে বাস করে। সমকালীন দেশ-কাল-জীবনের দাবি বা চাহিদা চেতনা তাই তাদের অবিমিশ্র নয়। পিছুটান তাদের স্বকাল-স্বদেশচেতনার বাধা। স্বদেশের স্বকালের সমাজের চাহিদা অনুগ মানস সম্পদ জোগানোর আয়োজন তাই তারা করতেই পারে না নির্দ্বিধায়। মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগে তারা উদারভাবে কালোপযোগী বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক উচ্চমানের নিখাদ নিখুঁত পুষ্ট মুক্ত মন-মগজ-মনন-মনীষা প্রয়োগে তারা জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-যোগ্যতা-দক্ষতা-সম্পদ-শ্রেণী নিরপেক্ষ জীবনভাবনা নিয়ে বাঁচতে জানে না। তাই তাদের বুকের ও মুখের ভাষায়, কাজে ও কথায় মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। দুটো তুচ্ছ দৃষ্টান্ত: এধরনের লোকেরাই সোভিয়েত রাশিয়ার পতনে মার্কসবাদ বর্জন করল। গণতান্ত্রিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলিম রাষ্ট্রকামীরা ঢাকায় পররাজ্যগ্রাসী পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরশাসক দিল্লীর বাদশাহদের নামে সড়কের নাম থুইল। ঢাকা হল জাহাঙ্গীরনগর।

একালের প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার ধারকরূপে আমরা যদি গণতন্ত্রবাদী ও মানববাদী বা মানবিকতাবাদী কিংবা মানবতাবাদী তথা মনুষ্যত্ববাদী হয়ে আমাদের সন্তানদের মানুষ রূপে গড়ার– বিদ্বান চাকুরে আমলা-সেনানী-সদাগর-সাংসদ রূপে নয়– বাঞ্ছা পোষণ করি, তা হলে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-নিবাস-শ্রেণী-ভাষা অভেদে কেবল মানবিক গুণের উন্মেষ-বিকাশ-উৎকর্ষ সাধন লক্ষ্যেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিকস্তরে সম্পূর্ণ সেক্যুলার শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করলেই আমরা আমাদের বাঞ্ছিত গুণের, মানের, মাপের ও মাত্রার নাগিরকই পাব অধিক সংখ্যায়। ফলে দেশের, সমাজের, সরকারের, রাষ্ট্রের নৈতিক সাংস্কৃতিক আদর্শিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সম্ভব হবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানস মুকুরে বিম্বিত স্বদেশ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

আমার সদ্যপ্রয়াত বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্রুত কৃতি-কীর্তি অধ্যাপকদ্বয়
ডক্টর আবদুল্লাহ ফারুক [১৯২৬-৯৭]
ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার [১৯২৮-৯৭] স্মরণে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রি 'এ' তত্ত্ব
Avoid, Adopt, Advance

মানুষের সব ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ জীবনের চাহিদা পূর্তির, নিরাপত্তার ও স্বাচ্ছন্দ্য সাচ্ছল্য লক্ষ্যেই অনুকূল ও প্রতিকূল প্রতিবেশে কখনো আনুগত্যে কখনো প্রতিরোধে কখনো বা উদ্ভাবনে কৃত্রিম সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে প্রকৃতিকে দাস-বশ করে কিংবা প্রকৃতির সঙ্গে আপোস করে মানুষ আদি ও আদিমকাল থেকে সহাবস্থান করছে। তবু জীবন-জীবিকা কখনো নিরাপদ নির্ঝঞ্ঝাট ছিল না, ঝড়-ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-মারী-শ্বাপদ-সরীসৃপ প্রর্ভৃতি নানা শক্তির ও প্রাণীর হামলা ও ছোবল মানুষকে কখনো নিশ্চিত-নিরুপদ্রব-নিরাপদ জীবন যাপন করতে দেয়নি পৃথিবীর কোথাও কোনো আর্তব মৌসুমেই। তাই অজ্ঞ-অসহায় মানুষকে বারবার অদৃশ্য-অলীক-লৌকিক-স্থানিক-অলৌকিক নানা অরি শক্তির ক্ষোভ-ক্রোধ-হামলা থেকে আত্মরক্ষার মানসপ্রয়াসে এবং নানা কাল্পনিক কৃপা-করুণাময় মিত্রশক্তির দয়া দাক্ষিণ্যে আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে আত্মরক্ষণের বল-ভরসা প্রাপ্তি লক্ষ্যে অরি-মিত্র শক্তির ভজন-পূজন করতে থাকে। এ শক্তিগুলো ছিল তাদের জীবন-জীবিকা নিয়ন্তা নিয়তি। একারণেই কালস্রোতে এসব অরি-মিত্রশক্তিরও জন্ম-মৃত্যু ঘটেছে বারবার। নতুন নতুন প্রয়োজনে দেশ-কাল-পরিবেশ ও সমাজভেদে-আবহাওয়ার পার্থক্যে, ভূমির উর্বরতা ও ঋতুর প্রভাবভেদে নতুন তাৎপর্যে নতুন নতুন শক্তি প্রতীক অরি ও মিত্র দেবতার উদ্ভব ঘটেছে, ভজন-পূজন পদ্ধতিও পাল্টে গেছে। কিছু দৈবশক্তি আবর্তিত হয়েছে ও আজো টিকে রয়েছে। কিছু পরিবর্তিত তাৎপর্যে কিংবা বিবর্তিত তত্ত্বে ও তাৎপর্যে প্রবল ও প্রধান হয়েছে, অনেকগুলো অদৃশ্য শক্তিই নামে পরিচয়ে টিকে রয়েছে বটে, তবে গুরুত্ব হারিয়েছে। এসব আসমানে জমিনে, দিনে রাতে প্রসৃত দৈবশক্তি যথাকালে যথাস্থানে যথাগোত্রে, যথাপ্রয়োজনে উদ্ভাবিত, পূজিত, উপাসিত হলেও স্থানান্তরে, কালান্তরে, গোষ্ঠী-গোত্রান্তরে, উপযোগরিক্ত, তাৎপর্যশূন্য হয়ে পড়লেও মানুষ জন্মসূত্রে আশৈশব পারিবারিক, স্থানিক, সামাজিক সূত্রে দৃষ্ট, শ্রুত লব্ধ আদি কল্পনাপ্রসূন বিশ্বাস-সংস্কার, ধারণা এবং ভয়-ভক্তি-বল-ভরসার পাত্র-পাত্রীদের বর্জন করতে পারে না, জিজ্ঞাসা-সন্ধিৎসা আর জ্ঞান-প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতা-যুক্তি-বুদ্ধি প্রভৃতি মগজী শক্তির অনুশীলনে অনীহ উদাসীন বলে। জীবন-জীবিকার অন্যান্য ক্ষেত্রে এরা স্ব স্ব প্রতিবেশে ও পেশায় গুণে-মনে-মাপে-মাত্রায় বুদ্ধির ও সামর্থ্যের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দক্ষ হয়, সতর্ক-সযত্ন প্রয়াসে যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবনযাপনে সচেষ্ট থাকে ক্ষতি এড়িয়ে চলার গরজেই। কিন্তু অদৃশ্য-অলীক-লৌকিক-স্থানিক-অলৌকিক অরি-মিত্র শক্তি নিয়ে তারা শ্রম ও সময় ব্যয়ে রাজি নয়, তাই তারা গতানুগতিক প্রাজন্মক্রমিক ধারায় বিশ্বাস-সংস্কার ও ধারণা নির্ভর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনযাপন করে, বিজ্ঞানের বদৌলত এ যন্ত্রযুগে যন্ত্রজগতে যন্ত্রনির্ভর যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবন বাস্তবে মেনে নিয়েও।

মানুষের মানবিক গুণের উন্মেষ বিকাশ-বিস্তার ও উৎকর্ষ নির্ভর করছে একটি Dictum-এ, তা এই- Do not do or desire any harm to your followman which you do not desire for yourself. অন্য কথায় Desire not anything for your followman which you not desire for yourself. এ তথ্যে ও তত্ত্বে আস্থাই কেবল মানুষকে যুগোপযোগী নীতি-আদর্শে ও চরিত্রে চিরস্থির রাখতে পারে যৌথজীবনে সমস্বার্থে সংগ্রামে সহিষ্ণুতায় সহযোগিতায় নির্বিরোধে সহাবস্থানে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক স্বার্থে। এ কালে শাস্ত্রিক পাপভীতি, সামাজিক নিন্দাভীতি কিংবা সরকারী শাস্তিভীতি মানুষকে অনধিকার চর্চা থেকে, অপকর্ম থেকে বিরত রাখতে অসমর্থ। অজ্ঞতার-অসহায়তার যুগে মানসজীবনে বল-ভরসা-প্রবোধ ও প্রত্যয়ীশক্তি পাবার জন্যে আদি ও আদিমকালে যা ছিল প্রিয় ও প্রয়োজনীয়, আবশ্যিক ও জরুরী কালান্তরে তাই নিষ্প্রয়োজন, উপযোগরিক্ত, তাৎপর্যহীন বলে পরিহার্য। আজকাল এগুলোর নামই কুসংস্কার; 'A body of Superstitions, prejudices Social customs and irretional modes of living [M.N. Roy -Fragments of Prisoner's dairy, pt-l, p-27] এমনকি 'great tradition can be hindrance to progress, [Andre Malro, আঁদ্রে মালরো] আর ঐশশাস্ত্রেও আস্থা ও বিশ্বাসহীন ছিলেন গোড়া থেকেই অনেক জ্ঞানী-Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false and by the Rulers as useful (Senecca) কাজেই এসব সেকেলে ভৌতিক-কাল্পনিক-অবাস্তব বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-ভয়-ভক্তি-ভরসা পরিহার বা Avoid করা দরকার। একাল বিজ্ঞান ও বাণিজ্যশাসিত ও নিয়ন্ত্রিত। এবং দুটোরই ফুল-ফল-ফসল হচ্ছে সর্বপ্রকারের যন্ত্র। যানবাহন, কলকারখানা প্রভৃতি পণ্য উৎপাদনের যান্ত্রিক ব্যবস্থা, ফোন-ফ্যাক্স-কমপিউটার-স্যাটালাইট প্রভৃতি যোগাযোগ মাধ্যম মাত্রই এখন বিজ্ঞানের প্রসাদ। আর যানবাহন ও যন্ত্র আজ পৃথিবীকে দৃষ্টিগ্রাহ্য ক্ষুদ্র জনপদে সংহত করেছে। ফলে জীবন-জীবিকা, মন-মগজ-মনন, ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ সামগ্রী ও পদ্ধতি এখন বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক। এখন আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি, পোশাক স্যুট, খাদ্য পাঁচতারা হোটেলের মেনু সম্মত। আদব-কায়দা-কানুন ও চাল-চলন-বলনও বৈশ্বিকস্তরে আন্তর্জাতিক। কাজেই এসব Adopt গ্রহণ করেই আমরা বৈশ্বিক আন্তর্জাতিক স্তরে শিগগির হব অভিন্ন বা সদৃশ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, এমনকি প্রচারকও। একালে আমাদের বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে সমকালের সম অবস্থার ও অবস্থানের হতে হলে শিক্ষায়, সম্পদে, স্বাস্থ্যে, রুচিতে, বিদ্যায় ও বেসাতে আমাদের প্রগতিবাদী, প্রগতিশীল ও প্রাগ্রসর নতুন চিন্তার ও চেতনার, মনের, মনজের, মননের, মনীষার, মনস্বিতার সযত্ন সতর্ক সর্বাত্মক ও সর্বার্থক অনুশীলনে নিষ্ঠ হতে হবে। অতএব Advanced হওয়ার ও থাকার জন্যে আমাদের কালের চাহিদার তাগিদে সাড়া দিতে হবে- প্রয়োজন চেতনায় প্রাণিত হয়ে আমাদের সেক্যুলার হতে হবে অন্তরে-বাইরে, মনে-মগজে-মননে, কর্মে ও আচরণে। রাষ্ট্রসীমায় মতবাদী সম্প্রদায়ভুক্ত থেকেও, আস্তিক্য অঙ্গীকার করেও, ন্যাশনালিজম বজায় রেখেও ড্যামোক্রেসি, সোসিয়ালিজম, কম্যুনিজম, রিপাবলিকানিজম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানববাদ বা হিউম্যানিজম প্রভৃতির যে-কোনো একটি বাস্তবজীবনে গ্রহণ-বরণ করে অঙ্গে ও অন্তরে সেক্যুলার মনের মানুষ হয়ে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-অর্থ-বিত্ত-বিদ্যার তারতম্য সত্ত্বেও কেবল মানুষ বলে জানার, বোঝার ও মানার মতো উদার মানবিক গুণের অধিকারী হতে হবে। আমাদের International community-র সদস্য হতে হবে আত্মকল্যাণেই। মানবাধিকার সনদেও রয়েছে এ অঙ্গীকার। Recognition of the inherent dignity and of equal and inalienable rights of all members of the humanfamily is the foundation of freedom, justice and peace in the world. আপাতত এ-ই তো আমাদের কাম্য বা লক্ষ্য। কিন্তু তার আগে Racial, Regional, Religious, Liguistic, Communal স্বাতন্ত্র্যচেতনা পরিহার করে আমাদের মানুষমাত্রকেই স্বজন বলে জানতে, বুঝতে ও মানতে হবে।

শাস্ত্রী ও ধার্মিক অভিন্ন নয়

AMARBOI.COM

আঁচে-আন্দাজে-অনুমানে বলা চলে হোমোসেপিয়ানদের মনে-মগজে কল্পনাশক্তির উন্মেষকাল থেকেই তাদের মধ্যে দৃশ্য-অদৃশ্য নানা বিষয়ে ও শক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ও সন্ধিৎসা জেগেছিল। আমরা জানি, যে-কোনো কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। যে-কোনো জিজ্ঞাসার একটা মনোময় উত্তর তৈরি করতেই হয় জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি-অভিজ্ঞতা দিয়ে, আর সন্ধিৎসা সাধারণভাবে কোনো সত্যে ও তথ্যে উত্তরণ ঘটায় না, আপাত যৌক্তিক, বৌদ্ধিক একটা কাল্পনিক তত্ত্ব জুগিয়ে প্রবোধ দেয় মাত্র। যা প্রমাণসাধ্য, প্রমাণসম্ভব কিংবা প্রমাণিত নয়, তাকে তথ্য, সত্য ও তত্ত্ব হিসেবে গ্রহণ করা আত্মপ্রতারণার, কল্পনাশ্রিত হয়ে সুস্থ থাকার নামান্তর মাত্র। সত্য, তথ্য ও তত্ত্ব যাচাই-বাছাই-ঝাড়াই করা সহজ নয়, সম্ভবও নয় অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু মানুষ জিজ্ঞাসার-কৌতূহলের মীমাংসা চায়, নইলে সে স্বস্তি পায় না অনির্দেশ্য-দিশেহারা অবস্থায়। কেননা সে জান-মালের ক্ষতিকারক অরিশক্তির রোষমুক্তি এবং মিত্রশক্তির আশ্রিত থাকতে চায়। তার জন্যে চাই স্তব-স্তুতি-পূজা-উপাসনা। নইলে অসহায় মানুষ বল-ভরসায় নিশ্চিন্ত হতে পারে না। তাই আমরা দেখতে পাই, আদি ও আদিমকালে যখন সমুদ্র-পর্বত-অরণ্যের ও দূরত্বের বাধা অনতিক্রম্য ছিল, তখন অপরিচিতির ও বিচ্ছিন্নতার ব্যবধানে অজ্ঞাত বা সজ্ঞানেও মানুষ গৌষ্ঠীক ও গৌত্রিকভাবে জগৎ কি, জীবন কেন, সৃষ্টির উৎস কি, স্রষ্টাই বা কে বা কারা, জীবনের লাভ-ক্ষতির, সুখ-দুখের, রোগ-শোকের, জন্ম-মৃত্যুর কর্তা-নিয়ন্তা কে বা কারা– এ সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে প্রজন্মক্রমে। জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তির প্রয়োগে সাধ্যমতো উত্তরও আঁচ-আন্দাজ-অনুমান করে আপাত স্বস্তি-শান্তি লাভ করেছে স্বতোদ্ভূত কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা মিটিয়ে। অবশ্য মন-মগজ-মননের গুণ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মান-মাপ-মাত্রা অনুসারে এবং প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর অনস্বীকার্য ও অপরিহার্য প্রভাবে জিজ্ঞাসার উত্তররূপ মীমাংসা তথা উপলব্ধ-অনুভূত সত্য, তথ্য ও তত্ত্ব হয়েছে বিভিন্ন, বিবিধ ও বিচিত্র। এর ফলেই সভ্যতা-সংস্কৃতি আজকের স্তরে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে বদ্ধমূল ভিন্নতা রয়েই গেছে। বিজ্ঞান-দর্শন-সমাজবিজ্ঞান প্রজন্মক্রমে সে-সব দৃষ্ট, লব্ধ, শ্রুত, প্রাপ্ত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আচার-পালা-পার্বণ-আচরণ, নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি মুছে ফেলতে পারেনি জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিজ্ঞতা-অভিজ্ঞতা প্রয়োগেও। ফলে ভূতে-ভগবানে বিশ্বাস, অরি-মিত্র শক্তির বিচিত্র ভূমিকা ও লীলা আজো মানুষের মানস ব্যবহারিক জীবন ভয়-ভক্তি-ভরসার আকারে গাঢ় গভীরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। অবশ্য প্রলোভন প্রবল হলে মানুষ ভূত-ভগবানের ভয় নিমিষে বর্জন করে না, করতে পারে না হেন অপরাধ-অপকর্ম নেই। আজকাল যন্ত্রের প্রসাদে পৃথিবী একটা ক্ষুদ্র জনপদে সংহত হয়েছে, জনসংখ্যা পেয়েছে বৃদ্ধি, মানুষের মনে জেগেছে আত্মোন্নয়নের, আত্মোৎকর্ষের, ভোগের-উপভোগের-সম্ভোগের অশেষ কাঙ্ক্ষা। তাই জীবিকা ক্ষেত্রে হয়েছে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা সঙ্কুল, জীবন হয়েছে সংগ্রাম-বন্ধুর। জীবন এখন স্ট্রাগল, জীবন এখন রেজিস্ট্যান্স, জীবন এখন কম্প্রমাইজ নয়। তাই মানুষ এখন অদৃষ্ট নির্ভর নয়, বাস্তব জীবনে ঠেকে ঠেকে এবং ঠকে ঠকে প্রায় প্রত্যেকটা মানুষ এখন নিজে শাসন-শোষণ-পীড়ন-প্রতারণা-প্রবঞ্চনা এড়িয়ে এবং অপরকে— দুর্বলকে শাসনে-শোষণে-পীড়নে-প্রতারণায়-বঞ্চনায় কাবু করে কেড়ে-মেরে-হেনে বাঁচতে চায়। তাই আজ দুনিয়াব্যাপী রাষ্ট্রিক, সামাজিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে নানাভাবে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, গোত্রে গোত্রে, বৃত্তিগত শ্রেণীতে শ্রেণীতে, জাত বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাসগত উনজনে-অধিজনে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত কাড়াকাড়ির, মারামারির, হানাহানির ও ঠকাঠকির আকারে নিত্যকার জীবন যন্ত্রণাময় ও সংগ্রামক্লিষ্ট করে তুলেছে। এর সঙ্গে দৃশ্য অদৃশ্য আসমানী অরি-মিত্র শক্তির কোনো সম্পর্ক নেই।

গণতন্ত্র ও প্রভুতন্ত্র

মানুষ শারীরিকভাবে মর্ত্যজগতে বাস করলেও মনে-মগজে-মননে ভিন্ন এক জগতেরও বাসিন্দা। সে-জগৎ স্বপ্নের, সাধের, ভয়ের-ভরসার এক অলীক অলৌকিক অদৃশ্য কিন্তু আঁচে-আন্দাজে-অনুমানে পাওয়া আসমানী শক্তি-নিয়ন্ত্রিত অমোঘ পরিণাম-পরিণতির অমর-অক্ষয়-অনন্ত আত্মিকজীবন। মেধায়-মগজে যে যত স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম, যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগে যে যত উৎসাহী কিংবা অনীহ, তার সেই কল্পলোক ততই অযৌক্তিক অবৌদ্ধিকভাবে বিচিত্র ও বিবিধ আর বিভিন্ন গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায়। আপাতত মতবাদী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্প্রদায়গত ও জন্মসূত্রে দৃষ্ট, শ্রুত ও লব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আচার-আচরণ প্রভৃতিতে সাদৃশ্য থাকলেও প্রত্যেক ব্যক্তির দেহাবয়বের বিভিন্নতার মতোই বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণারও তেমনি স্থূল-সূক্ষ্ম পার্থক্য থেকেই যায় গুণ-মান-মাপ-মাত্রাগত। তাছাড়া জগৎ-জীবন-আত্মাও দেহবিশ্লিষ্ট অন্তত অক্ষয়-জীবন সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনায় ধারাবাহিক অনুভূতির উপলব্ধির অনুশীলনে সাধারণ মানুষের কোনো ঈহা না থাকায় আমজনতা প্রজন্মক্রমে গতানুগতিকভাবে পরম্পরাগত বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায় অভ্যস্ত থেকেই নিশ্চিন্ত জীবন যাপনে পরবর্তী আত্মিক জীবন সম্বন্ধে আশ্বস্ত থাকে, ভয়-ভরসার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে কাতর থেকেও।

আর মানুষের মর্ত্যজীবনে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কাম-ক্রোধ, লাভ-লোভ-স্বার্থ চেতনা বাস্তব ও প্রবল। তাই দেহ-প্রাণ-মন-মগজ-মনন-যুক্তি-বুদ্ধি লাভ-ক্ষতির হিসেব প্রয়োগে এবং প্রয়োজন পূরণের গরজে মানুষও অন্যান্য জীব-উদ্ভিদের মতোই সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত প্রাণীমাত্র। তাই মানুষ স্ব স্ব পেশায় দক্ষ ও এক একটি নেশায় আসক্ত থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় পতঙ্গবৎ বহ্নিতে আকৃষ্ট হয়, কেউ বেঁচে যায়, কেউ সর্বস্ব হারায়। এ বহ্নি মর্ত্যজীবনে নানাপ্রকার: বিশেষ বয়সে রূপবহ্নি ও ভোগবহ্নি, অর্থবহ্নি, মানবহ্নি, যশবহ্নি, খ্যাতিবহ্নি, ক্ষমতাবহ্নি, সুখবহ্নি, নরকাগ্নিভীতি প্রসূত ধর্মবহ্নি এমনকি কামবহ্নি, প্রেমবহ্নি, ক্রোধবহ্নি, অসূয়াবহ্নি, প্রতিহিংসাবহ্নি, স্নেহ-প্রীতিবহ্নিও মানুষকে অস্থানে, অকালে, অপাত্রে ফেলে পুড়িয়ে মারে। এখানে এসব বহ্নিও প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবর্তনা দেয়। ফলে দুনিয়াদারিটা বাস্তবে হারজিতের খেলায় পরিণতি পায় এবং দুর্বলের, আত্মশক্তিতে ও সাহসে সম্বিহীন লোকের জিগীষা জিঘাংসার রূপ নেয়। মারামারি-হানাহানি, বিরোধ-বিবাদ, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, হিংসা-প্রতিহিংসা, সংঘর্ষ-সংঘাত, দাঙ্গা-লড়াই-যুদ্ধ প্রভৃতির কারণ, উৎস ও ভিত্তি এ-ই।

তবু যেহেতু মানুষের সাংসারিক-ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবন এবং চিন্তা-চেতনার ও তাত্ত্বিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার অলীক-অলৌকিক-অদৃশ্য শক্তি নিয়ন্ত্রিত মানসিক জীবন একেবারে বিচ্ছিন্নতার ব্যবধানে স্থিত নয়, কল্পনায় আঁচে-আন্দাজে-অনুমানে অরি-মিত্র শক্তির অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণে আস্থাবান আস্তিক মানুষ বাস্তব চাহিদা-কাঙ্ক্ষাপূর্তির আকুল আগ্রহবশে আসমান-জমিনে, স্বপ্নে-সাধে জড়িয়ে অলীক-অদৃশ্য-অলৌকিক অরি-মিত্র শক্তির নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে। ভয়-ভক্তি-বল-ভরসা নিয়ে আত্ম-প্রত্যয়হীন হয়ে আসমানী শক্তির মদদে প্রসন্নতায় বাঞ্ছার, প্রয়াসের ও কর্মের সিদ্ধি সম্ভব বলে মানে। ফলে বাস্তবজীবনে নিত্যকর্মে অদৃশ্য শক্তির লীলা তারা অনুভব করে।

এতে সাফল্যে দৈবপ্রসন্নতার আভাস মেলে এবং অসাফল্যেও প্রবোধ মেলে, আস্তিক্যের এ এক সুবিধে।

যে কারণে উপক্রমে তত্ত্বকথার ফাঁদ পাততে হল, এখন সে-বিষয়ে আলোচনা শুরু করছি। আমরা জানি কেবল এশিয়াতেই দুনিয়ায় টিকে থাকা ধর্মগুলোর উদ্ভব। সব নবী-অবতারের আবির্ভাব ঘটেছে এশিয়ার কিংবা সুয়েজ সংলগ্ন মিসরে। নির্দিষ্ট করে বললে পশ্চিম এশিয়ার এক প্রান্তে আর ভারতে। তাই এশিয়া গোড়া থেকেই গুরু-পীরবাদী, বংশানুক্রমিক নেতৃত্বে, কর্তৃত্বে, মনিবত্বে, প্রভুত্বে আস্থাবান। তারা তাতেই স্বস্থ ও সুখী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন। এভাবে এশিয়াবাসী নিজেদের সেবক আর অনুগত বান্দা ও ভক্ত রূপে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ফলে তারা গুরুকে-পীরকে, সর্দার-শাস্ত্রী-মাতব্বরকে স্মরণ ও শরণ করেই যেন মর্ত্যজীবন যাপনে আশ্বস্ত ও নিশ্চিত থাকে। আমাদের গুণ-গৌরব, আশা-ভরসা, লাভ-ক্ষতি, সমাজ-সংস্কৃতি, মান-মর্যাদা সবকিছুই যেন গৌষ্ঠীক-গৌত্রিক, শাস্ত্রী-সর্দার-মোড়ল-মাতব্বর-গুরু-পীর-নেতা-কর্তা নির্ভর। আমরা এমনি কারো শাসনে-লালনে-পালনে-পোষণে-সমর্থনে-আশ্রয়ে না থাকলে যেন নিজেদের বড় অসহায় বোধ করি। উন্মেষযুগের খেলাফতও মনোনয়ন প্রথা তিন খলিফায় অবসিত। ভারতে হিন্দু-মুসলিম সমাজে গুরু-শিষ্য-যজমান, পীর-মুরিদ-সাগরেদ বংশানুক্রমিক। ব্যতিক্রম এখানে আলোচ্য নয়। গুরু-পীরের ক্ষেত্রে আমাদের দাস-ভৃত্য-বান্দাসুলভ অনুরাগ, অনুগামিতা ও আনুগত্য যেন মন-মগজ-মননের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। আমরা যেন একজন কর্তা বা মান্যজন, মুরব্বী ছাড়া নিজেদের অসহায় বলেই মানি। এ বান্দাভাব যেন আমাদের মনের-মগজের-মননের নয় কেবল, রক্তেরও অংশ হয়ে গেছে।

তাই আমরা গণতন্ত্রী হয়েও আজো রাজতন্ত্রী, মনিব-প্রভু-গুরু-পীরতন্ত্রী। এজন্যেই শ্রীলঙ্কায় বন্দরনায়েক পরিবারের ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী না হলে রাজনীতিতে ও প্রশাসনে বিপর্যয় ঘটে, পাকিস্তানে জিন্নাহর বোনের ডাক পড়েছিল, আজ ভুট্টো পরিবার দল রাখার জন্যে আবশ্যিক, মুর্তাজা ভুট্টোর স্ত্রী ধরছেন স্বামীর দলনৌকার হাল। বাঙলাদেশে ফজলুল হক-সোহরাওয়ার্দী-ভাসানী সন্তানদের খোঁজ নিতে হয়, মুজিবকন্যার উপস্থিতি আবশ্যিক হয় আওয়ামী লীগের বিলুপ্তি ঠেকানোর জন্যে, জিয়ার স্ত্রীর নেতৃত্ব বিএনপি'র প্রাণ সঞ্চারী শক্তি হিসেবে কাজ করে। মোতি-জওয়াহের ইন্দিরা-রাজীবের বংশের নেতার অভাবে এতোকালের জাতীয় কংগ্রেসে বিলুপ্তির শঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই তো রাজীবপত্নী সোনিয়ার কিংবা রাজীব পুত্র-কন্যার প্রয়োজন ডুবন্ত কংগ্রেসকে ভাসমান ও আমজনতার ভরসার অবলম্বন রাখার জন্যে। এ উপমহাদেশে বিদ্যা নয়, বুদ্ধি নয়, ধন নয়, যোগ্যতা নয়, দক্ষতা নয়, কেবল পূজনীয়, বন্দনীয়, ভক্তিযোগ্য, মান্য হবে বংশগৌরব। গুরুপদে পীরের গদিতে বৃত হবে কেবল মৃত পীরের সন্তানেরাই। তেমনি দাস-ভৃত্য-বান্দা-ভক্ত মনের-মানসের, আমজনতার রাজনীতিকদের নেতৃপদ পাবেন কেবল মৃত নেতার পত্নী-পুত্র-কন্যা। এ কি গণতন্ত্র? কাজেই আমাদের কাম্য হচ্ছে পীর-গুরু-রাজা-প্রভুতন্ত্রেই, পীরবাদেই আমাদের আস্থা ও স্বস্তি। এখানে গণতন্ত্র অচল। আমাদের সাংসদ মন্ত্রীরা নেতা নেত্রীর নাম নিয়েই কথা শুরু করেন, উপাস্যস্তুতি নয়, নেত্রীস্তবই তাঁদের লক্ষ্য। এ অনুরাগে ও আনুগত্যে ভক্তি নয়– এক প্রকার বান্দাভাব থাকে যা গণতন্ত্রের Idea ও Ideal বিরোধী– Concept বিরুদ্ধ। সেমেটিকজগতে রাজতন্ত্র ছিল না, ছিল নবীতন্ত্র। নবীরা হতেন জনশাসনে তথা রাজত্বে ঈশ্বরাদিষ্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণতন্ত্র ও ক্ষমতার রাজনীতি

প্রজন্মক্রমে যেসব সামন্ত-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সরকার চালাচ্ছে তারাও শ্রেণীস্বার্থে সচেতন। তারাও যা কিছু করে, তা নিজেদের লাভ, লোভ, স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যেই করে। তারাও দুস্থ-দরিদ্র দুর্বল-অজ্ঞদের শ্রম ও সময় সস্তা দামে কেনে। তারাও দুস্থদের চোখে শোষক-শাসক-পীড়ক। কিন্তু তারা প্রাজন্মক্রমিক অভিজ্ঞতার ও অর্থসম্পদে ঋদ্ধতার দরুন এবং বিদ্যায়-বিত্তে ও সংস্কৃতিতে উন্নত হওয়ায় নিঃস্ব-নিরন্ন-দুস্থ-দরিদ্র-বেকার-রুগ্ন-অসহায়-অনাথ-এতিম এমনকি প্রাণী নির্বিশেষের প্রতি একপ্রকার নৈতিক-আত্মিক-আদর্শিক-মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বীকার করে। তাই তারা পরার্থে, পরসেবায় কিছু একটা করার আন্তর প্রেরণা অনুভব করে। তাদের আমরা বলি মানবিক গুণে-গৌরবে ঋদ্ধ সংস্কৃতিমান উদার বুর্জোয়া। তারা উদ্বৃত্ত অর্থ-সম্পদ অবলীলায় পরার্থে ব্যয় করে নানা সেবাশ্রম স্বেচ্ছায় গড়ে তোলে। এক কথায় তাদের কিছু সংখ্যক লোক কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্যে মুক্তমন ও মুক্তহস্ত। আমরা তাদেরই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কিছু লোককে আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকায় ঝড়-ঝঞ্ঝা-খরা-বন্যা-মারী-দুর্ভিক্ষকালে আকুল-ব্যাকুল হয়ে সাহায্য-সেবা-সহানুভূতিপূর্ণ দেহ-প্রাণ-মন-মগজ নিয়ে ছুটে যেতে দেখি অকুস্থানে। কাজেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রে শ্রেণীস্বার্থ চেতনা এবং শোষণ প্রক্রিয়া পরিপূর্ণ ভাবে থাকা সত্ত্বেও নাগরিকদের, সাংসদদের, পর্ষদদের, পরিষদদের এবং ঠিকেদার-সদাগর-আমলা-সেনানী-কারখানাদার প্রভৃতির মধ্যে মানবিক-গুণের উৎকর্ষের ফলে একপ্রকার মানবিকতা-মানবতা-উদারতা-যুক্তিবাদিতা আর স্বল্পপরিমাণে হলেও বিবেকী দায়িত্ব ও কর্তব্য চেতনা প্রভৃতির যথাকালে, যথাস্থানে যথাপ্রয়োজনে যথাপাত্রে প্রয়োগ ও প্রকাশ দেখতে পাই।

AMARBOI.COM

আমরাও আজকাল গণতন্ত্রমনস্ক এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়, রক্ষায়, পরিচর্যায় আগ্রহী। কিন্তু আমরা ধনে-মনে কাঙাল গোষ্ঠীভুক্ত ছিলাম বলেই এবং অজ্ঞ-অনক্ষর-অনভিজ্ঞ, অনভ্যস্ত ভুঁইফোঁড় গণতন্ত্রী বলেই আমাদের গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা আজো পষ্ট ও সুষ্ঠু হয়ে ওঠেনি আমাদের মনে, মগজে ও মননে। তাই আমরা ধনে কাঙাল বলে অর্থ-সম্পদ আহরণকেই জীবনের সর্বস্তরে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। আবার মনে কাঙাল বলেই ষড়রিপু পরবশ আমরা আজো সাধারণভাবে মানবিক গুণের উন্মেষে-বিকাশে-বিস্তারে ও প্রয়োগে আগ্রহী নই বরং উদাসীন। এক্ষেত্রে ব্যক্তিক মনুষ্যত্বের বিকাশ-প্রকাশ আলোচ্য নয় সঙ্গত কারণেই। এখানে আমরা রাষ্ট্রিক জাতি নির্বিশেষ নাগরিক সম্বন্ধেই আলোচনা করছি। উদ্যোগী-উদ্যমী-শক্তিমান-সাহসী-আত্মপ্রত্যয়ীর অর্থসম্পদগত কাঙালপনা সহজে ঘোচে। তার প্রমাণও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। দেশজ মুসলিমসমাজ মুখ্যত নিম্নবর্ণের, নিম্নবিত্তের, নিম্নবৃত্তির দুস্থ-দরিদ্র শ্রেণীর হিন্দু-বৌদ্ধ থেকে গড়ে উঠেছে বলেই তাদের শিক্ষার-সম্পদের, পরিশীলিত সংস্কৃতির আমলার, সেনানীর আন্তর্দেশিক ও আন্তর্জাতিক সওদাগরীর জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ছিলই না।

তারা ছিল সাধারণভাবে অনক্ষর, ক্বচিৎ কেউ সাক্ষর। তারা ছিল ঘরানা পেশায় প্রজন্মক্রমে নিযুক্ত, তাই তাদের মধ্যে ক্বচিৎ কেউ ছিল সম্পন্ন গৃহস্থ। সেকালে একালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো অফিস-আদালত-ব্যবসায়িক আড়ত-দফতর শতে শতে হাজারে হাজারে ছিল না, সৈন্য বিভাগেও ভীরু বাঙালী যেত না, তাই শিক্ষার প্রেরণা পায়নি অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে। শিক্ষিত লোক 'পণ্ডিত-মৌলবী-মুন্সী' লাখে না মিলত এক। বস্তুত ১৯৪৭ সন পূর্বকালে মুসলিম সমাজে ও নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজে গাঁয়ে-গঞ্জে শিক্ষিত লোক ছিল বিরলতায় দুর্লভ। এ আমাদের চোখে দেখা। কাজেই এ উক্তিই পাথুরে প্রমাণ। বাঙলাদেশীরা স্বাধীনতা উত্তরকালে ক্রমে ক্রমে ইংরেজ, হিন্দু, পাকিস্তানী ব্যবসায়ীর ও চাকুরের কবল মুক্ত হয়ে, প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বীশূন্য থেকে আমলা, সেনানী, সদাগর, ঠিকেদার, কারখানাদার প্রভৃতি রূপে দৈশিক ও বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবাধে চাকরিতে বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করে অতি অল্প সময়ে ও শ্রমে দেশের মধ্যে নগরে-বন্দরে একটি ধনিক-বণিক শ্রেণী গড়ে তুলল। তারাই এখন একাধারে ও যুগপৎ আমাদের পালক ও পোষক, শাসক ও শোষক, প্রবঞ্চক ও প্রতারক। আমরা আমজনতা এখন তাদের কৃপার, করুণার, দয়ার, দাক্ষিণ্যের, সেবার, সহানুভূতির এবং হুকুমের, হুমকির, হুঙ্কারের ও হামলার পাত্র-পাত্রী। আমরা অর্থে-বিত্তে-বিদ্যায় ভুঁইফোঁড়। আমাদের ভুঁইফোঁড় সমাজে তাই 'গণতন্ত্র' অতিস্থূল 'ভোটতন্ত্রে' পরিণত হয়েছে। মনে কাঙাল বলেই আমাদের এখনো বুর্জোয়া সংস্কৃতির ও উদারতার উন্মেষ ঘটেনি, আমরা মনে কাঙাল ও রাজনীতিক সংস্কৃতিরিক্ত। অর্থে ও জোরেজুলুমে ক্রয় ও আদায় করা হয় এ ভোট। ভোটপ্রার্থীরা সাধারণত শহরবাসী। ভোটের মৌসুমেই তাঁরা রাজনীতির অঙ্গনে নামেন সাংসদ হওয়ার জন্যে, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ধনী সদাগর, ঠিকেদার, কারখানাদার, অবসেনানী ও অবআমলা। বারোমেসে রাজনীতিক কমই। কারণ তাঁদের অনেকেরই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা থাকে না, ভোট ক্রয়ে-আদায়ে, পেশীশক্তি প্রয়োগে ব্যয়ের জন্যে।

এভাবে অগণতন্ত্রীর গণতন্ত্রী হওয়ার দরুন, অরাজনীতিকের রাজনীতিক হওয়ার কারণে, অদেশপ্রেমিকের ও অগণসেবীর দেশপ্রেমীর ও জনসেবীর ভূমিকায় অভিনয় করার ফলে আমাদের গণতন্ত্র কৃত্রিমই থেকে যায়, ভঙ্গুর থাকে তাসের ঘরের মতো। ফলে ভোট-পাওয়া প্রতিনিধি সেবক থাকেন না, প্রভু হয়ে ওঠেন, গণহিতের দায়িত্ব পাওয়া সরকারও থাকে শাসক ও জনভাগ্য নিয়ন্তা প্রভু, জবাবদিহিতার দায়মুক্ত। আমাদের পর্ষদে, পরিষদে, সংস্থায়, সমিতিতে, সঙ্ঘে, সংসদে কেউ কখনো প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন না, খাদেমের-সেবকের ভূমিকা পালন করেন না, স্ব স্ব লাভে-লোভে-স্বার্থ বশে মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-প্রভাব-প্রতিপত্তি-দর্পদাপট অর্জন লক্ষ্যে, অর্থে বিত্তে বেসাতে প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে, আত্মীয়-স্বজনের এবং নির্বাচন এলাকার সর্দার-মাতব্বর-প্রধানদের হিতার্থেই কাজ করেন, ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগ করেন। এ অবস্থায় আমাদের 'গণতন্ত্রে' জনগণহিতে কাজ করে জনগণমন অধিনায়ক হওয়ার প্রয়াস থাকে না গণপ্রতিনিধিদের, ধন প্রয়োগে পেশীজোগাড় করেই 'কিস্তিমাৎ' করা চলে। তাই আমাদের রাজনীতিক দলগুলো গণহিতের প্রতিযোগিতায় নামে না, ক্ষমতার গদি দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে। সেবার, হিতসাধনের কমপিটিশনে জনপ্রিয় হতে চায় না, কনফ্রন্টেশনে পেশীপ্রয়োগে ক্ষমতার গদি দখলে রাখার কিংবা কাড়ার বিরোধে-বিবাদে-লড়াইয়ে-সংঘর্ষে-সংঘাতে নামে, প্রাণহরা রক্তঝরা সংগ্রামেই তাই তারা রত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুতোম প্যাঁচার ডাক

আমাদের গাঁ-গঞ্জের অজ্ঞ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মনে রাত্রিকালীন হুতোম প্যাঁচার ডাক কারো না-কারো আসন্ন মৃত্যু-ভীতি জাগায়। এ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা গাঁয়ে গাঁয়ে আজো অটুট-অনড়। এমনি কুসংস্কার প্রভাবিত পরিবারে, সমাজে আমরাও জন্মাবধি জীবনযাপন করছি-করেছি বলে আমরাও যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা প্রয়োগে অনীহ ও অসমর্থ। তাই জীবনের পক্ষে প্রতিকূল ক্ষতিকর কিছুর লক্ষণ বা আলামত দেখলেই আমরা শহুরে লোকেরাও ক্ষতির, জান-মাল-গর্দান হারানোর আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠি। যেমন যে-কোনো দেশে বা রাষ্ট্রে অস্বাভাবিকভাবে কোনো শাসকের পতন-মৃত্যু-হত্যা কিংবা কোনো নতুন শাসকের স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক উত্থান বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিকভাবে বাজারে-বাণিজ্যে-কূটনৈতিক সম্পর্কে-সম্বন্ধে, চালু নীতি-নিয়মে পরিবর্তন ঘটায়। হরহামেশা আমরা এমনি হাল-চাল দেশে-বিদেশে দেখে থাকি।

আমাদের রাষ্ট্রে বাঞ্ছিত গণতন্ত্র নাকি শুরু হয়েছে ১৯৯১ সনের গোড়া থেকেই এবং গোড়াপত্তন করে 'নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার'। জনগণের ভোটে নির্বাচিত এক সরকার পুরো পাঁচবছর শাসন করেছে দেশ। তারপর আর একটি সরকারও দেড়বছর শাসন করেছে। কিন্তু শাসিত জনের প্রাত্যহিক জান-মাল-গর্দানের নিরুপদ্রবতা কিংবা নিরাপত্তা এ মুহূর্তেও নিশ্চিত হয়নি। জীবন-জীবিকা রয়েছে অনিশ্চিত। বেকারত্ব পূর্ববৎ আছেই, কারখানা কেবল বন্ধ হতেই শোনা যায়, নতুন কারখানা হতে দেখা যায় না, চাকরি জুটত কারো সাধারণভাবে শাখা-প্রশাখায় ক্রমবর্ধমান ব্যাঙ্কে, এখন সেসব ব্যাঙ্কও নাকি ঝড়ো হাওয়ার কবলে। পশ্চিম এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো থেকে শ্রমিকরা-চাকুরেরা বিতাড়িত হচ্ছে কিংবা বিদায় পেয়ে যাচ্ছে। চোরা-গোপ্তা পথে যাওয়া শ্রমজীবী ও চাকরি সন্ধানীরা ধরা পড়ে কয়েদী হয়ে রয়েছে নানা রাষ্ট্রে। তাদের ছাড়ানোরও কোনো ব্যবস্থা হয় না। কাজেই গণতন্ত্রের সাড়ে ছয় বছরে জনগণের আর্থিক-নৈতিক-আদর্শিক-চারিত্রিক কোনো পরিবর্তন হয়নি। ভয়-ভক্তি-ভরসার কিংবা আশা-আশ্বাসের অথবা সর্বস্তরের লোকের মধ্যে কার্পট্যের-মিথ্যাচারের-প্রতারণার-প্রবঞ্চনারও কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি। অসহায় 'মানুষ' 'নিয়তি' 'ভাগ্য' 'কপাল' অদৃষ্টবাদী হয়। ফলে পীর-ফকির-গণকের প্রভাব ও পসার বেড়েছে। বেড়েছে [রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হওয়ায় সম্ভবত দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়] ভিক্ষাবৃত্তি ও ভিক্ষুক। অথবা ইমান শিথিল হওয়ায় মুসলিম সমাজে আল্লাহর গজবে পঙ্গু-পাগল-অন্ধ-রুগ্ন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে-কারণেই হোক বিগত পঞ্চাশ বছরে একশ্রেণীর মুসলিম জনসংখ্যার তুলনায় তারা যত নগণ্য হোক, অর্থ-সম্পদের মালিক হয়ে সরকার, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ-বিত্ত এবং রাষ্ট্রনিয়ন্তা হয়েছে। আর এগারো কোটি মানুষ হয়েছে তাদের শাসনপাত্র-হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলার কবলিত এবং এগারো কোটির আবার নয় কোটিই নাকি নিঃস্ব-নিরন্ন-দুস্থ-দরিদ্র এবং তারা নাকি 'সাব হিউম্যান' বা অমানবিক স্তরে জীবনযাপন করে। এক কথায় এরা বুনো কিংবা গৃহপোষ্য প্রাণীরও অধম অবস্থায় ও অবস্থানে। অসহায় মানুষ অভাবে কিংবা বাঞ্ছাপূর্তির আশায় ও আশ্বাসে সহজেই প্রভাবিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও প্রলুব্ধ হয়, তাই স্থানিক, লৌকিক, অলীক, অলৌকিক যে-কোনো প্রকার সিদ্ধিপন্থায় আস্থা রাখে এবং মরীচিকার পিছু ধাওয়ার মতোই প্রতারিত হয়। মানুষের এ অসহায়তা, অভাবগ্রস্ততা, দরিদ্রতা, বেকারত্ব প্রভৃতির সুযোগ-সুবিধে কাজে লাগাচ্ছে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান– মানুষকে লাভ-লোভের নীলবাতি দিয়ে জুয়ারি বানাচ্ছে লটারি ও শেয়ারবাজার মাধ্যমে এবং প্রলুব্ধ জুয়ালিরা শেষ সম্বল লটারিতে ও শেয়ারক্রয়ে ব্যয় করে আশায়-আশ্বাসে কিছুকাল স্বপ্নে-উৎকণ্ঠায়-উত্তেজনায় কাটিয়ে অবশেষে লালবাতির সর্বনাশা হতাশায় ভোগে, সাফল্যের-সাচ্ছল্যের আনন্দ জোটে করগণ্য কয়জনের জীবনে মাত্র কিছুকালের জন্যে। এ মুহূর্তে কয়েক লক্ষ বাংলাদেশী নাগরিক লটারির ও শেয়ারের মুনাফার স্বপ্নে ও সাফল্যে উত্তেজনাময় সানন্দ জীবন যাপন করছে। এ ছাড়া সাধারণ মানুষ দিবারাত্রি অনিশ্চিত জীবন যাপন করছে। গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে-পাড়ায়-মহল্লায়, হাটে-মাঠে-বাটে-ঘাটে মানুষ চাঁদাবাজের, মস্তানের, গুণ্ডার, খুনীর, প্রতারকের, জলে-স্থলে যানবাহনজাত প্রাণান্তকর দুর্ঘটনার কবলিত হওয়ার আশঙ্কাকাতর অস্থির-উৎকণ্ঠ-ভীত জীবন যাপন করছে।

রাজনীতির অস্থিরতা ও সাড়ে ছয় বছরে এক মুহূর্তের জন্যেও কাটেনি। শ্রাবণের মেঘের মতো রাজনীতিক আকাশ আচ্ছন্ন। রাজনীতিক দুর্বল-প্রবল দল দেশে অনেক। কিন্তু সুষ্ঠু সুস্পষ্ট লক্ষ্যে আদর্শে চালিত দল বলতে গেলে একটিও নেই। যদিও উচ্চারিত আস্ফালনে সবারই একটা গণহিতকামী কর্মসূচি রয়েছে। তবে তা বাস্তবে হাতির সুন্দর দাঁতের মতো দেখানোর জন্যেই– বাস্তবায়নের জন্যে নয়। তাই আমরা সরকারী ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে দেখতে পাই বৈনাশিক অন্তর্দ্বন্দ্ব। তাদের ছাত্র-যুবা দলে চলে নিজেদের মধ্যেই রক্তক্ষরা প্রাণহরা হানাহানি। আবার ছাত্রলীগ-জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল এবং জামাত শিবির-এত দলের লড়াকুদের মধ্যে চলে ঘনঘন প্রাণঘাতী লড়াই। বন্ধ হয়ে যায় স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস এবং পরীক্ষা। ফলে সচ্ছল পরিবারের লক্ষ লক্ষ সন্তান পড়তে যায় বিদেশে, দেশের কোটি কোটি টাকা সে সূত্রে চলে যায় বিদেশে।

অতএব, রাজনীতিক দলের নিরুদ্দিষ্ট সার্বত্রিক হানাহানি, ছাত্র-যুবা নামের মস্তান-গুণ্ডা-খুনী-চাঁদাবাজ-ছিনতাইবাজদের হামলায় জনজীবন উপদ্রুত সর্বদা ও সর্বথা, জনগণের নিঃস্বতা সর্বাধিক, বেকার সমস্যা অসমাধ্য, শিক্ষিতদের অধিকাংশই নির্লজ্জ সুযোগসন্ধানী, সুবিধাবাদী, নগদজীবী, পদলেহী চাটুকার। এখন এই-ই হচ্ছে হুতোম প্যাঁচার ডাকের প্রতীক ও প্রতিম। দেশের মানুষের সামগ্রিক, সামূহিক, সার্বত্রিক সামষ্টিক এবং সর্বার্থক ও সর্বাত্মক অবস্থা ও অবস্থান যখন উপর্যুক্তরূপ তখন আশু আশার, আশ্বাসের, ভরসার কোনো আলম্বন মিলবে মনে করলে বিড়ম্বিত হওয়ারই সম্ভাবনা। আমাদের সুদিনের প্রতীক্ষার সময় দীর্ঘতর করতে হবে। হতাশামুক্তির ও ধৈর্যের এ-ই হবে ভালো উৎস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শারীর প্রয়োজন ও মানসখাদ্য

১৯৯৭ সন শুরু হল। আমরা জানি পৃথিবীর কোথাও না-কোথাও কেউ না-কেউ প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে কিছু না-কিছু নতুন জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞতা, নতুন কিছু উদ্ভাবন, নতুন কিছু আবিষ্কার করছেই। তাতেই পৃথিবীর মানুষ আজকের এ অবস্থায় ও অবস্থানে পৌঁছেছে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-গবেষণায়-নির্মাণে ও সৃষ্টিতে। আজ স্বর্গে-মর্ত্যে-পাতালে, সমুদ্রের তলে, পর্বতের চূড়ায়-নভোলোকে মানুষের অনেক কিছু জানা হয়ে গেছে। তবু প্রকৃতির কতটুকুই বা আমরা জানি। আমাদের মনে হয় এতো কিছু দেখা, জানা, বোঝা সত্ত্বেও আমরা এখনো অজ্ঞানের মহাসমুদ্রের উপকূললগ্ন জ্ঞানের ভেলায় ভাসছি মাত্র, সর্বজ্ঞ হতে এখনো অনেক অনেক বাকি।

আজকে যা জানলাম, গতকাল তা জানা-শোনা ছিল না, কারণ একটা জ্ঞান আজই বাড়ল, একটা আবিষ্কার আজকেই হল, একটা উদ্ভাবন আজকেই প্রকাশ পেল, একটা যন্ত্র আজই চালু হল, একটা মূর্তি আজই নির্মিত হল, একটা কবিতা আজই হল লেখা। এভাবে আমরা যদি ভাবতে থাকি যে অদূর অতীতে আমরা অজ্ঞতর ছিলাম, সুদূর অতীতে আমরা স্থূল ও স্বল্প হাতিয়ারে শ্রমবহুল, দরিদ্র ও নিঃস্ব জীবন যাপন করতাম, আরো অতীতে আমরা পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গের মতো, সামুদ্রিক পুঁটি থেকে তিমির মতো সারাদিন খাদ্য খুঁজে বেড়াতাম, আমরাও রোদ-বৃষ্টি-শীতে নগ্ন শরীরে নিরাশ্রয় জীবনই যাপন করতাম, হিমালয় পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা ও চরম অসহায়তার মধ্যে, তা হলে আমরা সহজেই বুঝতে পারব যে মহাহিমালয়ের অজ্ঞতা-রূপ পাথুরে বরফে মানুষের মন-মগজ-মনন-মনীষা-সাহস-শক্তি-উদ্যম-উদ্যোগ প্রয়োগে জ্ঞানের উন্মেষে-বিকাশে-উৎকর্ষে ক্রমে জ্ঞানের তাপে গলতে ও উবে যেতে থাকে। অতএব, অতীতমাত্রই দ্রুত চলন্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ থেকে কম বিজ্ঞতার, কম সভ্যতার, কম সংস্কৃতির, কম জ্ঞানের কাল। এ তাৎপর্যে আদি ও আদিম কাল হচ্ছে অজ্ঞতার কাল। সে সময়েই অজ্ঞ মানুষ ভয়ে-বিস্ময়ে-কল্পনায়-আঁচে-আন্দাজে-অনুমানে অদৃশ্য নানা অলীক-অলৌকিক, লৌকিক-স্থানিক অরি-মিত্র শক্তির বিচরণ আকাশে-বাতাসে-অরণ্যে-সমুদ্রে-পর্বতে-ঘরে-বাইরে কল্পনায় অনুভব-উপলব্ধি করেছে এবং সেসব অদৃশ্য শক্তির কল্পিত স্বভাব-চরিত্র অনুগ অমূর্ত ও সমূর্ত রূপ ধারণাগত করে তাদের রোষমুক্তির কিংবা কৃপা-করুণাপ্রাপ্তির লক্ষ্যে পূজা-অর্চনা করতে থাকে। এভাবেই মানসিকভাবে ব্যক্তিমানুষ ও সমাজবদ্ধ মানুষ নিরাপত্তা অনুভব-উপলব্ধি করতে থাকে। অজ্ঞতার যুগে অসহায় মানুষের মনে-মগজে-মননে-মনীষায় যা যা উদ্ভূত হয়েছে, তা কালে কালে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধির প্রসারে ও প্রাকৃতিক প্রতিবেশে উপযোগ-প্রয়োজন অনুসারে লক্ষণে-বর্জনে-সংযোজনে-পরিমার্জনে রূপান্তর বিবর্তন পেয়ে আজো টিকে রয়েছে ক্ষতির ভয়কাতর মগজী অনুসারে উদাসীন গতানুগতিক জীবনধারায় অভ্যস্ত ও তুষ্ট মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে ভয়-ভক্তি-ভরসার অবলম্বন রূপে। এসব বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা কিংবা ভয়-ভক্তি-ভরসায় অবলম্বন অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তি নিতান্ত কল্পনা-আঁচ-আন্দাজ-অনুমান প্রসূন মাত্র, প্রমাণিত কিংবা প্রমাণ সম্ভব সত্য ও তথ্য নয়। কাজেই আমাদের জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োগে স্বীকার করতেই হবে যে অতীতমাত্রই আঁচ-আন্দাজ-অনুমান সৃষ্ট– যেমন দর্শন কিংবা সাহিত্য মাত্রই এক এক জনের মন-মগজ-মনন সৃষ্ট বলেই এদের গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় প্রভেদ ও পার্থক্য রয়েছে সৌন্দর্যের, রুচির, যুক্তির, বুদ্ধির, তত্ত্বের, অনুভবের ও উপলব্ধির। তাই দর্শনের ও সাহিত্যের সবটা পাঠকের গ্রাহ্য হয় না। পাঠকের মন-মগজ-মননের গুণ-মান-মাপ-মাত্রার স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা অনুসারে কারো দর্শন বা সাহিত্য ভালো লাগে, কারোটা লাগে না। প্রমাণিত জ্ঞান কাউকে প্রতারিত করে না। কিন্তু বিশ্বাসে ভরসা চিরকালই থাকে অনিশ্চিত ও অপ্রমাণিত। তাই প্রমাণিত ও প্রমাণসাধ্য বিজ্ঞানে ভরসা রেখে বিজ্ঞানমনস্ক থেকে জীবনযাপনে কর্ম-প্রয়াসে ঠকবার আশঙ্কা থাকে না। কাজেই এ যন্ত্রযুগে আমাদের বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক নীতিনিয়মে, পণ্যে, সংস্কৃতি প্রভাবিত জীবনে বিজ্ঞানে ও বাণিজ্যে গুরুত্ব দেয়া আবশ্যিক ও জরুরী। আর আমাদের মানবিক গুণের বিকাশ সাধনের জন্যে অনুভূতির-উপলব্ধির জগৎ বিস্তৃত ও উন্নত করার জন্যে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান পাঠ করা জরুরী। বিজ্ঞান ও যন্ত্র আমাদের বাহ্য শারীর প্রয়োজন মেটাবে আর সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস-সমাজবিজ্ঞান আমাদের মানসখাদ্য জোগাবে।

AMARBOI.COM

বিজ্ঞান বনাম বিশ্বাস

যেদিন মানুষ গরু-মোষ-ঘোড়া দিয়ে লাঙ্গল টানাতে শিখল, সেদিন ছিল মানুষের এ কালের কমপিউটার উদ্ভাবন-নির্মাণের মতো মহা আনন্দের ও গৌরবের দিন। কারণ সেদিন মানুষের শ্রম ও সময় জমি কর্ষণের ক্ষেত্রে কমে সিকি ভাগে নেমেছিল। আজ যেমন 'ট্র্যাক্টর' গরু-মোষ-ঘোড়াকে মুক্তি দিয়েছে চরম যন্ত্রণাদায়ক শ্রম থেকে। যেদিন মানুষ গরু-মোষ-গাধা ঘোড়া-কুকুরটানা গাড়ি নির্মাণ করল সেদিন মানুষের সুখ-সুবিধে-সংস্কৃতি-সভ্যতা বহুগুণে মানে-মাপে-মাত্রায় এগিয়েছিল। এখন চাষার বীজ বপন, চারার পরিচর্যা, ফুল-ফল-ফসলের লালন ও কর্তন, সংগ্রহ, গোলাজাতকরণ প্রভৃতি কলে চলে। কাজেই এখনো পশু-নির্ভর থাকা যানে-বাহনে এবং ভূমি কর্ষণে ও জল সিঞ্চনে আমাদের মানবিক, বৈষয়িক, ব্যবহারিক ও যান্ত্রিক জীবনে পিছিয়ে পড়ে থাকারই লজ্জাকর সাক্ষ্য ও প্রমাণ। আমরা আজো এমনি পিছিয়ে পড়ে রয়েছি যে আমরা আজো যানে-বাহনে মানুষ-গরু-মোষ-গাধা-ঘোড়া-হাতি-কুকুর প্রভৃতির প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ঘাড়ে চাপতে লজ্জাবোধ করি না, আজো মানুষে টানা রিকশা আমাদের প্রধান অবলম্বন, আজো চাষাবাদে গরু-মোষ আমাদের সম্বল ও সম্পদ, আমাদের জীবনযাত্রা আজো মানবতাবিরোধী।

বিজ্ঞানের বদৌলত আবিষ্কৃত, উদ্ভাবিত, নির্মিত ও যন্ত্রযুগে যন্ত্রজগতে ও যন্ত্রনির্ভর যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত মর্ত্যজীবনে যন্ত্রের গুরুত্ব অস্বীকার করে আশৈশব শ্রুত, দৃষ্ট ও লব্ধ ভয়-বিস্ময়-ভক্তি-ভরসার অবলম্বন কাল্পনিক, স্থানিক, লৌকিক, অলৌকিক, অলীক, অদৃশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরি-মিত্র শক্তির বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা চালিত জীবনযাপন যে জাগতিক জীবন অনুভবের ও উপলব্ধির বাধা স্বরূপ তা জানার, বোঝার ও মানার মতো মন-মগজ-মননের অনুশীলনেও আমরা নারাজ। তাই আমাদের একঘেয়ে গতানুগতিক আবর্তিত জীবনে আসে না বৈচিত্র্য, আসে না নতুন চেতনা-চিন্তা, আসে না গতি-প্রগতি আর প্রাগ্রসরতা থাকে সাধ ও স্বপ্নাতীত। ফলে আমরা আজো বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে সমকালীন বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক জাগতিক জীবন ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ করার মতো মন-মগজ-মনন তৈরি করতে পারিনি, এ আমাদের একাধারে ও যুগপৎ লজ্জার, ক্ষোভের ও ক্ষতির কারণ। উল্লেখ্য যে ডারউইন-কার্ল মার্কস-ফ্রয়েড-দেকার্তে-হিউম-কোঁতে-সার্ত্রে এবং বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানীরা উনিশ শতক থেকে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে ও মনোজগতে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন। আমরা কোনো প্রকারেই একালের বিজ্ঞান-বাণিজ্য ও যন্ত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমতা রক্ষা করে আমাদের মানসিক ও আর্থ-বাণিজ্যিক জীবন ঋদ্ধ ও উৎকৃষ্ট করতে পারছি না, অনুকরণে, অনুসরণে, অনুগামিতায়, অনুগত্যে ও আনুরাগে আমরা নিজেদের ধন্য ও কৃতার্থ মনে করছি নির্লজ্জভাবে।

চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও আমরা মানস-চিকিৎসা অনুশীলনে, মগজের চর্যায় ও চর্চায় অনীহ-উদাসীন বলেই কিছু যাচাই-বাছাই-ঝাড়াই করতে চাই না। নইলে বিজ্ঞানের প্রসাদে, বিজ্ঞানের বদৌলত ষষ্ঠীর, শীতলার, ওলার রোষ, অপদেবতার ভর, জীন-পরীর 'আসর', সূতিকার প্রকোপ প্রভৃতি অস্তিত্ব হারিয়ে অলীক হয়ে গেছে। যক্ষ্মা, সন্নিপাত, হৃদরোগ, মস্তিষ্ক রোগ প্রভৃতির চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ সম্ভব হয়েছে, অস্ত্রোপচারে দেহের যে কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চিকিৎসা সম্ভব হয়ে উঠেছে, উঠছে। এমনকি অদল বদল সম্ভব হচ্ছে, জীবকোষ বা জীন নিয়ন্ত্রণও হচ্ছে সম্ভব, এমনকি ক্লোনিং-এ মানুষও বানানো হবে সম্ভব। শেকসপীয়ার-গ্যায়টে-টলস্টয়-লুসুন-রবীন্দ্রনাথও একইভাবে প্রজন্মক্রমে বারবার সৃষ্টিও নাকি করা যাবে। মানুষের মগজীশক্তি ও যন্ত্রশক্তি যখন আজ এ অবস্থায় ও অবস্থানে এসে গেছে, তখনো আমরা আঁচে-আন্দাজে-অনুমানে-কল্পনায় সৃষ্ট অদৃশ্য অলীক নানা শক্তির ভয়ে-ভক্তিতে-বলে-ভরসায় আস্থা রেখে, সে আস্থাকে জীবন যাপনে পুঁজি ও পাথেয় রূপ সম্বল করে জীবনযাত্রায় আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত থাকি। বিজ্ঞান কিন্তু আমাদের বিশ্বাসের-সংস্কারের ও ধারণার দুর্গ দেয়ালে ক্রমাগত আঘাত হানছেই, বিশ্বাসের দুর্গে ফাটল ধরছেই। তাই আশার কথা এই যে ওলা-শীতলা-ষষ্ঠী, ভূত-প্রেত-পিশাচ, রাক্ষস-ড্রাগন-জীন-পরী ক্রমে লোকবিশ্বাসচ্যুত হয়ে অনস্তিত্বে বিলীন হচ্ছে। এমনকি শাস্ত্রের বিধি-বিধানও একালের যন্ত্রনির্ভর-যন্ত্রচালিত নিত্যকার জীবনে ও জগতে লঙ্ঘিত ও উপেক্ষিত হচ্ছে নানা ভাবে জীবিকার ও জীবনযাপনের সর্বক্ষেত্রে। এভাবে শাস্ত্রের সুপ্রাচীন নীতি-নিয়ম গুলো যন্ত্রনির্ভর যান্ত্রিক জীবনে প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকতে পারছে না। উপেক্ষা ও লঙ্ঘন ক্রমে শাস্ত্রপন্থীর মন সহা, চোখ সহা ও গা সহা হয়ে উঠছে। এখন সূতিকার তাবিজ-কবচ-মন্ত্র-মাদুলী বাজারে বিকোয় না। এখন শহুরে মহীরুহে ভূত-প্রেত-দেও-দানু-জীন-পরী মেলে না। এখন ডান-ডাইনী অদৃশ্য ও অনস্তিত্বে বিলীন। এমনকি এখন দেবী দুর্গাও ছাগ-মোষের রক্তপানে অনীহ; এখন তিনি 'বলি' চান না। চাল-কলা-নারকেল-খই-মিষ্টি-পায়েসে তিনি তুষ্ট, তৃপ্ত ও হৃষ্ট। মুসলিম সরকারও অর্থব্যয় কমানোর জন্য মুসলিমদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হজ গমন নিয়ন্ত্রণ করে। বিজ্ঞানের প্রসাদপুষ্ট ও যন্ত্রজগতে যখন পৃথিবীর আসমানের জমিনের সব রহস্য মানুষের প্রায় আয়ত্তে, সমুদ্রের, অরণ্যের, পর্বতের, নভোমণ্ডলের, পৃথিবীর গর্ভের সব খবর যখন মানুষের প্রায় চোখ-কান-মনের গোচরে, তখন আঁচে-আন্দাজে-অনুমানে-কল্পনায় তৈরি বিশ্বাস-সংস্কার ধারণা করে রাখা চলবেই না। ফলে সনাতন বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা, অলীকে-অলৌকিকে ভক্তি-বল-ভরসা রাখা আর সম্ভব হবে না কোথাও কারো পক্ষে। যদিও বুকে পোষা Fear Complex অধিকাংশ মানুষকে স্রষ্টায় ঈশ্বরে আস্থা রেখে নিশ্চিন্ত ভরসায় জীবন যাপনে উৎসাহ জোগাবে। মগজী যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক তাদের বল-ভরসা জোগাবে না ভীত বলেই।

বিজ্ঞানসম্মত যৌক্তিক চেতনা চালিত জীবন

আমি মানবের, মানবিক চেতনা-চিন্তার উন্মেষকালের অজ্ঞতার, অজ্ঞানের, অনভিজ্ঞতার, স্থূলবুদ্ধির, প্রজ্ঞারিক্ততার, মননহীনতার, মনীষাশূন্যতার, অসহায়তার, ভয়-ভক্তি-বল-ভরসার অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির ক্ষমা-আশ্রয়-বরাভয়কামী মানুষ যা কিছু আঁচে-আন্দাজে-অনুমানে কল্পনাসাধ্য বিশ্বাস-সংস্কার ধারণার লৌহ কঠিন খাঁচায় নিজেদের স্বেচ্ছায় অনন্যোপায় হয়ে আবদ্ধ করেছে, তা আজকের বিজ্ঞানের প্রসাদে আন্দাজী ও আনুমানিক তথ্য, তত্ত্ব ও সত্য বলে জেনে বুঝেও, প্রমাণসাধ্য, প্রমাণ সম্ভব, প্রমাণিত নয় জেনেও সেই অজ্ঞতার, অজ্ঞানের, অপ্রজ্ঞার, অনভিজ্ঞতার, অবুদ্ধির, অযুক্তির, অবিবেকী বিশ্বাসের ধারণার সংস্কারের নিগড়ে নিজের মন-মগজ-মনন-মনীষা স্বেচ্ছায় শ্রেয়সবোধে বেঁধে রাখা কি এ যন্ত্রযুগে যন্ত্রজগতে যন্ত্রনির্ভর যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত মানুষের শোভা পায়? বিজ্ঞানীর, আবিষ্কারকের, উদ্ভাবকের, উৎপাদকের, নির্মাতার, রাসায়নিক মিশ্রকের সব যন্ত্র, ঔষধ, চিকিৎসকের সব লাক্ষণিক নিদান আমাদের বাস্তব জীবনে আমরা সত্য ও তথ্য বলে গ্রহণ-বরণ করি, এক্ষেত্রে আমরা স্বকালে ও সমকালে বাস করি, আমরা গ্রহণ-বরণশীল আধুনিক। কিন্তু তথ্য, সত্য ও তাৎপর্যহীন আঁচে-আন্দাজে-অনুমানে তৈরি কল্পজগতের সত্যকে, স্থিতিকে, অস্তিত্বকে আমরা কোনো প্রকারেই মন-মগজ-মনন-থেকে মুছে ফেলতে পারছিনে যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা প্রয়োগে আমরা অনীহ বলেই। ভূত-ভগবান আমাদের দেহ-প্রাণ-মন-মনন ও নিত্যকার জাগ্রত জীবনের চিন্তা-চেতনা জলবায়ুর মতো, ক্ষুধার অন্নের ও তৃষ্ণার জলের মতো আবশ্যিক, জরুরী, অপরিহার্য হয়ে আমাদের জালাবদ্ধ মাছের মতো ধরে রেখেছে, খাঁচার পাখির মতো বেঁধে রেখেছে, শৃঙ্খলিত বা ডিকদড়িবাঁধা পশুর মতো সীমিত পরিসরে আটকে রেখেছে। আমরা বায়বীয় অদৃশ্য নিয়ন্তার ও নিয়তির অনুগত, অনুরাগী ও অনুগামী অযৌক্তিক-অবৌদ্ধিক ও অনৃত জেনেও। আমাদের belief, faith ও trust-বিশ্বাস-ভরসা-আস্থা কিছুতেই টুটে না, যা কিছু নিজে ঘটাই, নিজে করি, যা কিছু আমার দৈহিক-মানসিক শ্রম ও সময় প্রয়োগ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যয়ে অর্জিত, যা কিছু আমার মন-মগজ-মনন-মনীষাপ্রসূন, তাও অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক-নিয়ন্তা-নিয়তির দান বলে নিঃসংশয়ে মানতে আমাদের দ্বিধা নেই। আমাদের দেহ-প্রাণ-মন-মগজ-মনন-মনীষা সবকিছুই অদৃশ্য আসমানী শক্তির কৃপার-করুণার-দয়ার-দাক্ষিণ্যের দান বলেই আমরা জানি, বুঝি ও মানি। পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হলেও, পঞ্চইন্দ্রিয়জ হলেও ভালো কিছু ভাব, চিন্তা-কর্ম-আচরণকে আমরা অপার্থিব শক্তির দান বলেই জানি, বুঝি ও মানি নির্দ্বিধায়। আমরা তাই কখনো প্রত্যক্ষবাদী হতে পারলাম না, পারলাম না এমন কি দ্বিধাগ্রস্ত অজ্ঞেয়বাদী হতেও। তাই আমরা ভূত-প্রেত-দেও-দানু-জীন-পরী কবল মুক্ত হতেই পারলাম না। কোনো দুটো 'গড' অভিন্ন নয়, সদৃশও নয় গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায়-শক্তিতে, দায়িত্ব-কর্তব্য চেতনায় ও মতে-পথে-উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে। তবু আমাদের মনে কোথাও কোনো গলদের কথা জাগে না, কোনো জিজ্ঞাসা, সন্দেহ, সংশয়, সন্ধিৎসা, কৌতূহল আমাদের বিচলিত করে না, প্রাজন্মক্রমিক চিরন্তন আনুগত্যে, অনুরাগে ও অনুগামিতায় আমরা ধন্য, তৃপ্ত, তুষ্ট, হৃষ্ট, নিশ্চিন্ত, নির্বিকার। আমরা যা দেখি তাতে বিস্ময়ের কিছু দেখি না, যা জানি তার তাৎপর্য খুঁজি না, যা বুঝি তাতে গুরুত্ব দিই না, যা শুনি তার অশেষতায়, তার অসীম মাহাত্ম্যে, তার চিরন্তন শক্তিতে, সত্যে ও তত্ত্বে সবিস্ময় অভিভূতিতে আত্মনিমগ্ন থাকি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিন্তা-চেতনার যতই বিকাশ-বিস্তার ঘটুক, তাতে আমাদের চিত্তলোকে কোনো আলোড়ন ঘটায় না। আমরা এসবকে 'এহো বাহ্য' বলে ফুৎকারে উড়িয়ে দিই। ডারুইন-মার্কস-ফ্রয়েড-পাভলভ-হকিং প্রমুখরা আমাদের ঈমান টলাতে পারেন না, আমরা 'হিং টিং ছট' উচ্চারণে বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানীর সব মায়াবী জাদুর কুয়াশা শৈশবে-বাল্যে-কৈশোরে দৃষ্ট, লব্ধ, শ্রুত ও প্রাপ্ত শাস্ত্রিক, স্থানিক, পারিবারিক, সামাজিক, লৌকিক, অলৌকিক, অলীক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণারূপ তাবিজ-কবচ, মন্ত্র-মাদুলী, তুক-তাক, বাণ-উচ্চাটন-ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্রপূত ধূলি-পানি-পাথর-তাগা-ধাতু যোগে জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিচার-বিবেচনাকে নিরাপদ তফাতে রেখে নিশ্চিন্ত মনে মৌরসীসূত্রে প্রাপ্ত জীবনধারা আদি-আদিম ও অকৃত্রিম ধারায় প্রবহমান রাখতে পারি ও পারব এমনি আত্ম প্রত্যয়ে আমরা আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত। বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা স্বরূপে অনেকটা কচুরিপানার মতোই, কেবলই বাড়ে, লুপ্তপ্রায় হয়ে মৃতপ্রায় হয়েও সুপ্ত থাকে, কিছুতেই মরে না, মৌসুমী আবহাওয়ায় বেঁচে ওঠে, জেগে ওঠে, চাঙ্গা হয়ে আত্মবিস্তারে হয় স্ব-উদ্যম উদ্যোগী।

এ দৃঢ়মূল বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাই দুনিয়াব্যাপী জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-গোত্র-গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্য চেতনা জিইয়ে রেখেছে, কিছুতেই কাউকে নির্বিশেষ মানুষ নামে পরিচিত হতে দিচ্ছে না, এ বাধা অলঙ্ঘ্য হিমালয় প্রমাণ। ফলে ওই স্বাতন্ত্র্য চেতনা মানুষকে 'মানুষ' হয়ে উঠতে দিচ্ছে না। তাই দ্বন্দ্ব-হিংসা-ঈর্ষা-অসূয়া কিংবা অপ্রীতি প্রসূন দ্বেষণা-সংঘর্ষ-সংঘাত-দাঙ্গা-লড়াই-যুদ্ধ আজো বিশ্বে অবিরল, বিজ্ঞানের প্রসাদ ব্যবহারিক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-আনন্দ-আরাম-আয়েস দিয়েছে, শ্রম ও সময় ব্যয় হ্রাস করেছে, কিন্তু মনোজগতে আজো কোনো লক্ষণীয় প্রভাব ফেলতে পারেনি, এমনকি বিজ্ঞানীরা যতটা টেক্‌নোক্র্যাট, ততটা তো ননই, তার পরসা পরিমাণও যুক্তিবাদী উদার সংযত সহিষ্ণু ব্যক্তি নন, অনেকেই নিরক্ষরের মতোই অর্থোডক্‌স ও মৌলবাদী-ধার্মিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক এমনকি রাষ্ট্রাভ্যন্তরেও Racial, Regional, Religious স্বাতন্ত্র্যের তিন মুখ্য বাধার সঙ্গে আর একটি বাধা হচ্ছে Language; এ চার বাধা অতিক্রম করতে পারলে অধিকাংশ মানুষ মানসিকভাবে, তাহলে লাভ-লোভ-স্বার্থচেতনাজাত শ্রেণীগত কিংবা মতবাদী সম্প্রদায়গত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিরোধ-বিবাদ-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত কমবে, প্রাণহরা রক্তক্ষরা লড়াইও সম্ভবত হ্রাস পাবে। বিজ্ঞানসম্মত যৌক্তিক চেতনাচালিত জীবন যাপনেই রয়েছে যুগপৎ ও একাধারে মানসমুক্তি ও মানবমুক্তি।

এ মুহূর্তের আমরা

পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে ও রাষ্ট্রে আজো নিরক্ষর এবং সাক্ষর লোকের সংখ্যাই শতে সত্তর-আশি। উচ্চশিক্ষিত বিদ্বান সাহিত্যবিদ, দর্শনবিদ, ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানবিদ এবং যৌক্তিক-বৌদ্ধিক জীবন সচেতন বিজ্ঞানবিদ লোকের সংখ্যা আজো কোথাও প্রত্যাশিত সংখ্যায় মেলে না, যদি কোথাও মেলেও সেসব রাষ্ট্রের বা শহরের সংখ্যা বেশি নয়, করগণ্য।

অজ্ঞ-অনক্ষর-সাক্ষর এবং সাধারণ শিক্ষিত লোক কোনো না-কোনো আস্তিক-শাস্ত্রিক পরিবারে জন্মে এবং জন্মসূত্রেই পিতৃপুরুষের ধর্মে, শাস্ত্রে, আচারে, আচরণে, বিশ্বাসে, সংস্কারে ও ধারণায়, পরিপূর্ণ আস্থায়-নির্ভরতায়-ভরসায় নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত থেকেই জীবনযাপন করে গতানুগতিক অভ্যস্ত প্রথায় ও পন্থায়। কাজেই মানুষ জন্মসূত্রেই আশৈশব দৃষ্ট, শ্রুত, প্রাপ্ত আচার-আচরণ-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা নির্ভর শাস্ত্রিক জীবনে লৌকিক, স্থানিক, অলৌকিক, অলীক, কাল্পনিক নানা অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তিতেও আস্থা রাখে। লাভের আশায় ক্ষতির ভয়ে অরি-মিত্র নির্বিশেষে সব অদৃশ্য অলীক শক্তিকেই তোয়াজে-তোষামোদে, স্তবে-স্তুতিতে, প্রশস্তিতে, চাটুকারিতায় বশ, তুষ্ট, তৃপ্ত, হৃষ্ট রেখে তাঁদের কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য নির্ভর হয়ে নিয়তি মেনে জীবন যাপন করে, এ ক্ষেত্রে এ শ্রেণীর আমজনতা, নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ কখনো নিজের মন-মগজ-মনন প্রয়োগ করে না– সে শক্তি-সামর্থ্য-সাহস ও সময়ই তাদের থাকে না। সে-প্রয়োজনও তারা বোধ করে না, কেননা চিরকাল প্রজন্মক্রমেই তাদের অন্নচিন্তা অন্যান্য প্রাণীর মতোই চমৎকারা এবং সার্বক্ষণিক। তাদের জাগ্রত মুহূর্তগুলো কাটে ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জল সংগ্রহে, প্রাচুর্য চিরকালই প্রজন্মক্রমে থাকে তাদের নাগালের বাইরে। কাজেই ইহুদী-খ্রীস্টান-বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কেউ শাস্ত্রের উপযোগ ও তাৎপর্য নিয়ে মাথা ঘামায় না। প্রচলিত নিয়মে দৃঢ় প্রত্যয় মেনে চলে নিঃসংশয়ে– জিজ্ঞাসা ও সন্ধিৎসাবিহীন হয়েই। ক্বচিৎ কোথাও কোথাও সংস্কারক বা রিফর্মার নতুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে নতুন আচার আচরণ প্রবর্তন করেন। রাষ্ট্রে রাজনীতিক্ষেত্রেও তাই গ্রামীণ বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহুরে আমজনতা রাজনীতি-আর্থ-বাণিজ্যনীতি কিংবা প্রশাসননীতি নিয়ে মন-মগজ-মনন-মনীষা খাটায় না। গাঁয়ের ও শহুরে সচ্ছল গৃহস্থ অবশ্য মান-খ্যাতি-ক্ষমতা-প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন লক্ষ্যে স্বগাঁয়ের ও স্বসমাজের লোকের অভিভাবক-তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে শাস্ত্র মানানোর, আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের এবং রাজনীতিক দলীয় মতাদর্শ প্রচারের খবরদারির, নজরদারির ও তদারকির দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে– তারা সর্দার-মাতব্বর-প্রধানরূপে পরিচিত ও ক্ষমতাবান রূপে মান্য।

অতএব, সমাজে ও রাষ্ট্রে সব মানুষ বিদ্যা-বুদ্ধি-অর্থ-সম্পদ প্রভৃতির অভাবে নাগরিক চেতনায় ঋদ্ধ হয় না, নাগরিকের স্বাধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। এ সুযোগেই এখানকার গ্রামীণ শাস্ত্রী-সর্দার-মাতব্বর-প্রধান-সচ্ছল গৃহস্থরাই কেবল শাস্ত্র ও রাজনীতি সচেতন থাকে এবং তারাই গ্রামীণ সমাজে পর্ষদে-পরিষদে-অর্থে-বিত্তে-বুদ্ধিতে-শক্তিতে-সামর্থ্যে-সাহসে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে সদস্যপদ ও নেতৃপদ দখল করে শহুরে রাজনীতিকদের মতোই অর্থ-জনবল-পেশীশক্তি এবং বুদ্ধি-কৌশল-জোর-জুলুম প্রয়োগে। এরাই আবার শহুরে ধনী-মানী। অবসেনানী, অবআমলা, সওদাগর, ঠিকেদার, কারখানাদার এবং অন্যান্য উপায়ে ও পেশায় অর্জিত অর্থে ধনী লোকেরা যখন কোনো দলের মনোনয়ন নিয়ে গাঁয়ে যান, তখন ওই রাজনীতি সচেতন শাস্ত্রী-সর্দার-মাতব্বর-দেওয়ান-প্রধানরাই তাঁদের মুৎসুদ্দি, প্রচারক ও ভোটজোগাড়ের তদবিরে তদারক হয়।

আগেকার রাজতন্ত্রের সঙ্গে একালের তথাকথিত গণতন্ত্র নামের ভোটতন্ত্রের পার্থক্য সামান্য। নাগরিক চেতনারিক্তদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি রূপ সাংসদ-সদস্য-পার্ষদ-পরিষদ তাই অনপেক্ষ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী প্রভু ও শাসক হয়ে যান, জনগণের সেবক থাকেন না। কারো সঙ্গে কারো সম্পৃক্ততা থাকে না, জবাবদিহিতা থাকে না। শেষাবধি জঙ্গীনায়কতন্ত্রে, স্বৈররাজতন্ত্রে আর তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর গণতন্ত্রে কোনো পার্থক্য থাকে না– সম্পর্ক-সম্বন্ধ হয়ে ওঠে শাসক-শাসিতের, শোষক-শোষিতের, বঞ্চক-বঞ্চিতের, পীড়ক-পীড়িতের। এ আধুনিক নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্ব, দাবি ও কর্তব্য চেতনা নেই বলেই আমাদের গণমানবের সঙ্গে, আমজনতার সঙ্গে দেশের অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতি, প্রশাসননীতি, শিক্ষানীতি কিংবা উন্নয়ননীতি প্রভৃতির কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তারা উদাসীন-অসহায় শাসনপাত্র মাত্র– যথার্থ তাৎপর্যে নাগরিক বা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী পাবলিক নয়। এখানে সরকার জনসেবক নয়– জনগণের শাসক, স্বল্পমাত্রায় পোষকও।

আজ তাই গোটা দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষণ, মস্তান-গুণ্ডা-খুনীশাসন, সন্ত্রাস দমন, অস্ত্রউদ্ধার, বিদ্যালয়ে সশস্ত্র শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, প্রকাশ্যে সশস্ত্র ছুটোছুটি, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া প্রভৃতি সার্বক্ষণিক, সার্বস্থানিক এবং প্রায় সার্বজনিক ঘটনা হয়ে উঠেছে অজ দুর্গম গাঁয়ে-গঞ্জে নয়, ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা-রাজশাহী শহরে, সব বন্দরে এবং সব কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে। কৃপা-করুণা প্রত্যাশী প্রশাসকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠ হয়ে সততার ও সাহসের সঙ্গে কাজ করতে ভয় পান সরকারী মদদ সম্বন্ধে অনিশ্চিতির কারণে। ১৯৯১ সন থেকে গণতান্ত্রিক সরকার চলছে, অন্যান্য ক্ষেত্রে কিরূপ উন্নতি হয়েছে সে বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি। কিন্তু মারামারি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটাকাটি, হানাহানি, ঘুষ, প্রতারণা, মস্তানী, গুণ্ডামী, খুন-খারাবি, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, ডাকাতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, যান-বাহনে দুর্ঘটনা, ভেজাল, মিথ্যাচার, হত্যাকাণ্ড, বেহায়াপনা, সম্পদপাচার, মেধাপাচার, শিক্ষার্থী পাচার যে অনেকতায় অবাধে বেড়ে চলেছে, তা অস্বীকার করা যাবে না, কারণ সবটাই প্রকাশ্যে সর্বসমক্ষে ঘটছে। সরকার আছে, এনজিও আছে, বিদেশী মুরব্বী আছে তবু।

নিখাদ সুষ্ঠু রাষ্ট্রিক জাতীয়তা জরুরী

আমাদের দৈশিক ও রাষ্ট্রিক নাগরিক অধিকারে কিছু খাদ এবং জাতি চেতনায় কিছু ত্রুটি যে রয়ে গেছে, তা শুনতে ভালো না লাগলেও জানতে ও বুঝতে পারলেই আমাদের পক্ষে সহজ হবে নিখাদ নাগরিক অধিকার দান ও সুষ্ঠু সুদৃঢ় জাতি গঠন। ভেজালে, গোঁজামিলে কিংবা মেঠো বক্তৃতায়, ভাষণে, কাগজে লেখায় আবেগে ও আস্ফালন জড়িত উচ্চারণে বা পরিব্যক্তিতে বাহ্যত কপট উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু দৈশিক-রাষ্ট্রিক অভিন্ন জাতি গঠন কখনো সম্ভব হবে না। ঘা ঢেকে রাখলেই ক্ষত শুকায় না। বরং বাড়ে এবং সর্বনাশা পচন ধরে। বনিবনা না হলে পরিবারও পৃথগান্ন হতে বাধ্য হয়, দাম্পত্যও বিচ্ছেদে অবসিত হয়, বঞ্চিত-প্রতারিত ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ আত্মীয় হয় শত্রু। কাজেই রাষ্ট্রের কোনো অংশ বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র, স্বাধীন হতে চাইলে নরহত্যার মাধ্যমে ধরে রাখা অনর্থক যন্ত্রণার ও ক্ষতির কারণ জিইয়ে রাখা মাত্র। আমাদের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আর্থ-বাণিজ্যিক স্বার্থেই আমাদের রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসীকে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-গোষ্ঠী-গোত্র নির্বিশেষে সমদায়িত্বের, সমকর্তব্যের এবং জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে যোগ্যতা-দক্ষতা অনুসারে সম অধিকারের আর ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে ন্যায্য দাবির অধিকারী নাগরিক বলে দৈশিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৈষয়িক ও ব্যবহারিক জীবনে অকপটচিত্তে স্বীকার করতে হবে বাস্তব ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে, কেবল সাংবিধানিক স্বীকৃতি এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিবেচিত হবে না। আধুনিকতম 'গণতন্ত্র' কোনো রাষ্ট্রে শাস্ত্রিক-ভাষিক-গৌত্রিক সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে বা নাগরিককে বিশেষ অধিকার দান ন্যায্য বলে স্বীকার করে না। মাথাগনতি মানুষের জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত সংখ্যাগুরুর চাহিদা ও অন্যান্য ন্যায্য দাবি পূরণই কেবল সরকারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। নাগরিক মাত্রই অবিশেষে কেবল রাষ্ট্রসেব্য ও রাষ্ট্রপোষ্য মানুষ। এ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য স্বীকৃত হলে কোনো রাষ্ট্রের সংবিধান সেক্যুলার না হয়েই পারে না। অতএব আমাদের সংবিধানটা সেক্যুলার হওয়া আবশ্যিক ও জরুরী এবং তা ১৯৭২ সনে গৃহীত এবং পরে পরিত্যক্ত নীতি-আদর্শের আদলে নতুন সংবিধান তৈরিই হবে আমাদের জাতীয় জীবন সুস্থ, স্বস্থ বিকাশ ও উৎকর্ষমুখী করার জন্যে প্রথম ও প্রধান কাজ। সংবিধানকে বাস্তব জীবনে জীবিকার, কর্মের, আচরণের উৎস ও ভিত্তি করে উন্নতির ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেয়াই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগপৎ ও একাধারে নাগরিকের, সরকারের ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য সামগ্রিক, সামূহিক ও সামষ্টিক জনকল্যাণের গরজে।

আমরা গাঁয়ে-গঞ্জে সাক্ষর-শিক্ষিতের হার এবং রেডিও-টিভির সাম্প্রতিক শ্রোতা-দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধির পূর্বে গ্রামীণ মানুষ নির্বিশেষের মধ্যে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-ধনী-নির্ধন প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও ঘরে-বাইরে-হাটে-ঘাটে-মাঠে-বাটে সর্বত্র শ্রম ও পণ্য বিনিময়ে, আপদে-বিপদে সাহায্যে-সহায়তায়-সহযোগিতায়, লেনদেনে সহাবস্থান করতে দেখেছি। অন্তরের গভীরে এক শাস্ত্রে বিশ্বাসীর প্রতি অপর শাস্ত্রে বিশ্বাসীর একপ্রকার অবিশ্বাসের সুপ্ত অবজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও, শহুরে শিক্ষিতের রাজনীতিক বিভেদ-দাঙ্গা এ শতকে ব্রিটিশ প্ররোচনায় ক্রমে বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও।

এমনকি ১৯৪৭ সনের পরে ভারতে বহু বহু রক্তক্ষরা-প্রাণহরা সংখ্যালঘুমারা দাঙ্গা হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানে, বাঙলাদেশে দাঙ্গা এতো কম ও কৃচিৎ হয়েছে যে তা সংখ্যায় আজো করগণ্য। ভারতে ছোট-বড়-মাঝারি দাঙ্গার সংখ্যা সহস্রাধিক। এবং এ তথ্য সর্বজন স্বীকৃত। তবু ইদানীং পূর্বকালে তা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েনি। রেডিও-টিভির বদৌলত এবং গাঁয়ে গাঁয়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রসাদে আমজনতা এখন শহুরে রাজনীতির ও রাজনীতিকদের প্রভাবদুষ্ট হয়ে গেছে। তাই 'বাবরী মসজিদ' ভাঙার রামশিলা আন্দোলনে গোটা ভারতের গাঁ-গঞ্জের মানুষও আকুল-ব্যাকুল ভাবে সহযোগিতায় কিংবা প্রতিরোধে যোগ দিয়েছিল, তেমনি বাঙলাদেশে সরকারী ঔদাসীন্যে এরশাদ-খালেদা জিয়ার আমলে বাঙলাদেশের নগর-বন্দর-গাঁ-পাড়া-মহল্লার সর্বত্র সংখ্যালঘুর অর্থ-সম্পদ-মঠ-মন্দির লুণ্ঠিত হয়েছে। ওরা মূলত লুণ্ঠনলিন্সু ছিল বলে হয়েছে ভাঙার স্বাল্পক্ষণিক চেষ্টা মাত্র। তবে এখানে সেখানে বাড়িঘর-মন্দির দহনের চেষ্টা হলেও মানুষ হননের নিয়ত ছিল না কারো। ১৯৬৪ সনের পরে নিশ্চিন্ত হিন্দুমনে আবার নতুন করে জাগল জান-মাল-গর্দান হারানোর শঙ্কা, ফলে আবার দেশত্যাগের হিড়িক দেখা দিল। অতএব জাতিগঠনের প্রথম ও প্রধান শর্ত হচ্ছে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-পেশা নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের জান-মান-অর্থ-সম্পদ ও জীবিকার নিশ্চিত নিরাপত্তার নিশ্চিতি। সংখ্যালঘুকে সার্বক্ষণিকভাবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতীর জোর-জুলুম, হুকুম-হুমকি-হামলা থেকে মুক্ত রাখা। সরকারী চাকরিতে যোগ্যতানুসারে তাদের যথাপ্রাপ্য পদে-পদবীতে নিয়োগ করা। শোনা যায় আজকাল সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন 'কোরে' সংখ্যালঘুরা সংখ্যানুপাতিক নিয়োগ পায় না। সংখ্যালঘুদের সেনাবাহিনীতে যথাপ্রাপ্য নিয়োগ দেয়া আবশ্যিক। এবং পুলিশবাহিনীতে বরং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের শতে ত্রিশ/চল্লিশ জন করে নিয়োগ দিলে সংখ্যালঘুরা আত্মবিশ্বাস ও সাহস ফিরে পাবে, শঙ্কামুক্ত থাকবে, বল-ভরসা পাবে, তাদের বহির্মুখিতা ঘুচবে। সংখ্যাগুরুর ও সংখ্যালঘুর মধ্যে সর্বাত্মক ও সর্বার্থকভাবে সর্বক্ষেত্রেই পারস্পরিক আস্থা-বিশ্বাস-ভরসা এ শতকের পূর্বেকার মতো-অন্তত এ শতকের প্রথমার্ধের বা প্রথম পাদের মতো স্থিতিশীল হবে। বঞ্চিত-পীড়িত-হৃত অধিকার প্রতিবেশী ও নাগরিক বিপৎকালে সাহায্যে সহানুভূতিতে এগিয়ে আসে না বলে বিপদ বাড়ে। কাজেই ঘরের, গাঁয়ের, দেশের ও রাষ্ট্রের কাউকে অকারণে বঞ্চনায়-পীড়নে-অপমানে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ রাখতে নেই, বিপৎকালে সে শত্রুরই সহযোগী হয়। তাই শত্রু সম্পত্তি ওর্ফে অর্পিত সম্পত্তি আইন যতই জটাজটিল হোক না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন, তার আশু-ন্যায্য মীমাংসা আবশ্যিক ও অত্যন্ত জরুরী। আর রেডিও-টিভিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর ঘরোয়া-সামাজিক বিষয়ে নাটক-সিনেমা প্রভৃতিরও সংখ্যানুপাতিক অনুষ্ঠান ও প্রচার অবশ্যই প্রত্যাশিত। ধর্মীয় অনুষ্ঠান সার্বজনিক প্রচার মাধ্যম রেডিও-টিভিতে কোথাও রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের এ বক্তব্যের লক্ষ্য কেবল বাঙলাদেশ নয়, গোটা উপমহাদেশ।

গণকল্যাণে ও জাতিগঠনে রাষ্ট্র

আমার ভালাই দেশেরও ভালাই, আমার উন্নতি দেশেরও উন্নতি। কারণ আমি দেশের নাগরিক। আমি শহরে-বন্দরে-গ্রামে সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করলে তাতে শহর-বন্দর-গ্রামের শোভা বৃদ্ধি পায়, দেশের সমৃদ্ধির সাক্ষ্যরূপে আমার দালান শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। অতএব, ব্যক্তির উন্নতিই দেশের উন্নতি। এ শাহ-সামন্ত-বুর্জোয়া বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা আজো আমাদের মধ্যে দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে। এর ফলেই দেশ বলতে, জাতি বলতে, মানুষ বলতে শহুরে শিক্ষিত ধনীমানী জ্ঞানীগুণী অর্থ-বিত্ত-বেসাত নিয়ন্তা এবং শাসন-প্রশাসন নিয়ন্ত্রক খ্যাতি-ক্ষমতা-প্রভাব-প্রতিপত্তি-দর্পদাপট সম্পন্ন নানা পেশার ও মতলবের বুদ্ধিজীবী-আমলা-সেনানী-শিক্ষক-সাংবাদিক-ডাক্তার-উকিল-প্রকৌশলী-পেশাদার লেখক-বক্তা ও সংস্কৃতি কর্মী নামের উদ্যমশীল-উদ্যোগী চালাক-চতুরদেরই বোঝায়। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পরেপরেই স্বাধীন বাঙলাদেশ নাকি দুষ্ট চক্রের কবলে পড়ে সূর্যের রাহুগ্রস্ত হওয়ার অবস্থায় ছিল। এখন দেশপ্রেমী মুক্তিযোদ্ধা খাঁটি বাঙালীর শাসনে দেশ রাহুমুক্ত। এখন স্বাধীনতা সূর্যের আলোকের ঔজ্জ্বল্যে ও তাপে দেশে বাসন্তী হাওয়া বইছে। অতএব এখনই দারিদ্র্যমুক্ত দেশগড়ার সময়। সরকারের ভাষণে, বিজ্ঞপ্তিতে, কর্মসূচিতে দেশের ও দেশের মাটি-মানুষের কল্যাণ সাধনই লক্ষ্য বলে চিরকালই প্রচার-প্রচারণা করা হয়, কিন্তু সনাতন ও সুপ্রাচীন সর্দার-শাস্ত্রী-মাতব্বর তন্ত্রে, গণতন্ত্রে, স্বৈররাজতন্ত্রে, এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রে নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ, দরিদ্র গণমানবের-আমজনতার সত্যই দুঃখ-দুর্দশা বিমোচন কি সম্ভব হয়েছে কোথাও কোনো রাষ্ট্রে আদিকালে, মধ্যযুগে এবং বর্তমানকালে? আমরা নাগরিকদের জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-নিবাস-যোগ্যতা নির্বিশেষে সবারই অশন-বসন-নিবাস-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য সরকারের তথা রাষ্ট্রের বলেই একালে জানি, বুঝি ও মানি, অন্তত আমাদের রাজনীতিক দলগুলোর নানা পেশার শিক্ষিত লোকেরা তাই প্রচার করে, উচ্চকণ্ঠে নির্দ্বিধায় স্বীকার করে। কিন্তু বাস্তবে দেখি উত্তরাধিকার সূত্রে ভূবন্টনের ফলে, রুগ্ন মানুষের উপার্জনে অসামর্থ্যের কারণে এবং মামলা কিংবা অন্য আলস্য-ঔদাসীন্য বা বিপথগামিতা প্রভৃতির ফলে পরিবার নিঃস্ব-নিরন্ন ও দুস্থ হয়ে হয়ে দারিদ্র্যসীমার নিম্ন স্তরের, অমানবিক স্তরের বাসিন্দার সংখ্যা সত্তরের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন কিংবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সার্বক্ষণিক বেকারত্ব রাষ্ট্রিক সঙ্কট-সমস্যা দিনানুদিন বাড়িয়ে দিচ্ছে। কাজেই সরকারী দেশগড়া গ্রামীণ চাষী-মজুরের ও কলকারখানার গতরখাটা শ্রমিকের এবং যানবাহন চালকের, গৃহভৃত্যের আর্থিক উন্নতিই প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হওয়া আবশ্যিক ও জরুরী। বেকার সমস্যার সমাধান যে আরো জরুরী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গণমানবের-আমজনতার উন্নতিই যে যথার্থ নিখাদ, নিখুঁত, খাঁটি উন্নতি তা ভদ্রলোকদের অনুভব ও উপলব্ধি করতেই হবে। রাজনীতিক মতলবে কেবল বুলি কপচালেই চলে না, চলবে না। সামনে নতুন দিন এবং কঠিন দিন রয়েছে। এ নিয়মের, এ নীতিরীতির দিন যাবে, রবে না। এটি এখন সভয় স্মরণের সময়। সমাজ বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায়, নীতি-নিয়মে-মূল্যবোধে আমূল পরিবর্তন করা আবশ্যিক হয়ে পড়বে বাঁচার-বাঁচানোর গরজেই। এবং সেকাল আসন্ন, কোথাও কোথাও আপন্নও। সোভিয়েত-ভাঙা রাশিয়ার সর্বার্থক ও সর্বাত্মক মনুষ্যত্ব বিনাশী বিপর্যয় স্মর্তব্য। কাজেই নাগরিক মানে শহুরে ভদ্রলোক নয়, নিঃস্ব-নিরন্ন-দুস্থ-দরিদ্র-বেকার-হতাশ গণমানব। এদের কল্যাণ লক্ষ্যেই দেশগড়া ও উপচিকীর্ষা চালিত হওয়া আবশ্যিক ও জরুরী। কৃষক-শ্রমিক-বেকারেরা চায় ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, এবং সেজন্যে কাজ বা জীবিকা কিংবা ভাতা চায়। চায় রোগের সুচিকিৎসার আয়োজন। এই শহরের সর্বত্র ভোগ্যপণ্যের লক্ষ লক্ষ দোকান রয়েছে, সেগুলোতে কি কৃষক-শ্রমিকের প্রবেশাধিকার রয়েছে? এই সব পণ্য কি ওদের ভোগের ও সাধ্যের আয়ত্তে আসবে কখনো? আর একটি কথা। একালের যানে-বাহনে-যন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক সমাজও চাহিদায় জীবনযাত্রায় সদৃশ এমনকি অভিন্ন হয়ে উঠছে, এবং একালে মানুষ পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে জনবহুলতার দরুন জীবিকার আপদে। তাই একালের রাষ্ট্রে এক গোষ্ঠীর, এক গোত্রের, এক ভাষার ও একটি ধর্মের, এক শ্রেণীর ও বর্ণের লোক থাকে না, বিশ্বের নানা দেশের, ভিন্ন জাতের ধর্মের ভাষার রাষ্ট্রের লোকও থাকে। নগণ্য সংখ্যার হলে তাদের প্রতি উদাসীন থাকে সংখ্যাগুরু। গণ্যসংখ্যার হলে তাদের প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ পরায়ণ থাকে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের নাগরিকরা, আর সংখ্যা লঘুরা যদি অর্থে-বিত্তে-বেসাতে-বিদ্যায়-বুদ্ধিতে প্রবল হয়, তাহলে ঈর্ষী-হিংসুটে প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাদের ছলে-বলে-কৌশলে দাঙ্গায় অর্থ-সম্পদ-ব্যবসা কেড়ে নিয়ে তাদের বিতাড়িত বা উচ্ছেদ করতে চায়। এ বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মী দ্বেষণা রাষ্ট্রিক জাতিগঠনের অপ্রতিরোধ্য বাধা।

আমাদের বাঙলাদেশে রাজনীতিকভাবে ভাষণে-বক্তৃতায় আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় আছে, রয়েছে, থাকবে বলে উচ্চকণ্ঠে বলি বটে, কিন্তু বাস্তব অবস্থা তার বিপরীতে সাক্ষ্য দেয়। সম্প্রতি সালাম আজাদ নামের এক তরুণ 'হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশ ত্যাগ করছে', নামে একখানা পুস্তিকা রচনা করেছেন। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন 'গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে গ্রামের সাধারণ কৃষক, গৃহবধূ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিচারপতি, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, ব্যাংকার, সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও কর্মী এবং সমাজের বিভিন্ন পেশার অসংখ্য মানবতাবাদী ব্যক্তি আমাকে সহযোগিতা করেছেন।' ভূমিকায় তিনি এও বলেছেন, [যারা গেছে] "তাদের বলতে ইচ্ছে করেছে নিজ জন্মভূমিতে ফিরে আসতে। কিন্তু বলার সাহস হয়নি। কারণ আমিতো তাদের জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারব না, তাদের স্ত্রী-কন্যাদের সম্ভ্রমের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরাপত্তা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তো শত্রু [অর্পিত] সম্পত্তি আইন তুলে দিতে পারবো না। আমি কি পারবো দেবোত্তর সম্পত্তি দখল রোধ করতে? মন্দিরে, হিন্দু বাড়িতে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ঝামেলা ঠেকানো কি আমার পক্ষে সম্ভব? হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যে নির্যাতনের স্টিম রোলার চালানো হচ্ছে, তা কি বন্ধ করা সম্ভব? মেধাবী হিন্দু ছেলেটিকে কি আমি যোগ্যতানুসারে একটি সরকারি চাকরি পাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারি?" এ গ্রন্থে বিবৃত সব তথ্যের ও ঘটনার উৎস ও বরাত দেয়া হয়েছে; সে তাৎপর্যে বইতে নতুন কিছু নেই। আছে কেবল এক মানববাদী-মানবতাবাদীর আর্তনাদ।

সন্নিবেশিত তথ্যে প্রকাশ ১৯৯১ সন থেকে ১৯৯৫ সন অবধি ১৭৩৩৭৫ জন দেশত্যাগ করেছে অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন ৪৭৫ জন দেশ ছেড়ে চলে যায় চিরকালের জন্যে [পৃ: ৯০]। লেখক প্রতিকারের জন্যে লঘুগুরু বিশটি প্রস্তাব পেশ করেছেন [পৃ: ৯৩-৯৪]। উল্লেখ্য হিন্দুরা কেবল অমুসলমান বলেই নানা ছলে নির্যাতিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত। বিহারীরা এসেছিল মুসলিম রাষ্ট্রে নিরাপত্তার জন্যে। এখন ওদের ভারতে নেবে না। তাই ওরা পাকিস্তানে যেতে চায়, এখানে তাদের বাড়িঘর চাকরি সব কেড়ে নেয়া হয়েছে বলে। মানবিক বিবেচনায় ওরা পাকিস্তান সমর্থক ছিল যৌক্তিক বৌদ্ধিক কারণে। একে ওদের দোষ বলে গণ্য করা অনুচিত। প্রতিবেশীকে নিঃসম্পর্কের পর ভাবলে, অপ্রীতির ব্যবধানে দূরে রাখলে, কিংবা নির্যাতনে শত্রু করে তুললে অথবা শত্রুকল্প হিসেবে অনাস্থায় অবিশ্বাসে অপমানিত করলে বিপদ-আপদকালে তাদের সাহায্য সহায়তা সহানুভূতি মেলে না, তার ফলে বিপদমুক্তি হয় প্রায়ই অসম্ভব। ঘরের ইঁদুরে বেড়া কাটলে সে বেড়া রক্ষা করা যায় না। তেমনি নাগরিকের এক বিপুল অংশের রাষ্ট্রের পতাকার, স্বার্থের, গৌরবের, গর্বের শরিক না হলে দৈশিক বা রাষ্ট্রিক জাতিচেতনা নিখাদ নিখুঁত খাঁটি হয় না– 'জাতির' ও জাতীয়তার বাহ্য প্রচার তখন ফুটোপাত্রে জল ঢালার মতোই বৃথা ও ব্যর্থ হয়, রাষ্ট্রিক অকৃত্রিম জাতীয়তাই জাতীয় ভাব-চিন্তা-কর্ম প্রয়াসের উৎস।

সংবাদপত্র: রাজার মন্ত্রী, প্রজার বন্ধু, সমাজের শিক্ষক

বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা ত্যাগকালে বঙ্কিমচন্দ্র সংবাদপত্রের একটা সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন 'সংবাদপত্র লেখক রাজার মন্ত্রী, প্রজার বন্ধু এবং সমাজের শিক্ষক।' সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে এর চেয়ে যথার্থ পরিচিতি আর হতেই পারে না। যে-কোনো গুণী-জ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞ লোক স্ব স্ব মন-মগজ-মনন-মনীষার স্তর-মাপ-মান ও মাত্রা অনুসারে এ সংজ্ঞার তাৎপর্যের গুরুত্ব আকাশস্পর্শী করে তুলতে পারেন। কারণ মানুষের মানবিক গুণের বিকাশ সাধনে, মানুষের মনে নীতি-আদর্শ সঞ্চারণে, জাতিগঠনে, মানুষকে যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেকাশ্রিতকরণে, সমাজ-সংস্কৃতির স্বাস্থ্যরক্ষণে, জনমত গঠনে ও নিয়ন্ত্রণে অন্য কথায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশ, মানুষ, জাতি, সরকার, রাষ্ট্র প্রভৃতির সর্বপ্রকার চিন্তা-চেতনার উন্মেষে, বিকাশে, উৎকর্ষে ও নিয়ন্ত্রণে পত্রিকা সম্পাদকের ভূমিকা হচ্ছে জাহাজের কাপ্তানের কিংবা নৌকার কাণ্ডারীর মতোই। কাজেই পত্রিকার শক্তি অসীম ও অশেষ। আমরা যাকে দৈনিক খবরের কাগজ বলে, ঘটনার বয়ান বলে অভিহিত করি, তা কিন্তু সংবাদপত্রের মালিক ও পরিচালকরা কেবল সংবাদ পরিবেশনের জন্যে বের করেন না। তাঁদের একটা নীতিআদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে, তা-ই তাঁরা সম্পাদকীয় রচনায় মত-মন্তব্য-সিদ্ধান্ত রূপে রোজ পরিব্যক্ত ও প্রকাশিত করে থাকেন। তাতেও সবকথা বলা হয় না বলেই সংবাদপত্রের নীতিআদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুগ উপসম্পাদকীয় নামের নিবন্ধ প্রকাশিত করে থাকেন।

অতএব, সংবাদ পরিবেশন ছলে একটি দৈনিক-সাপ্তাহিক সংবাদপত্র তার রাজনীতি, সমাজ ও সরকার, সংস্কৃতি, আর্থ-বাণিজ্য বিষয়ই নীতি-আদর্শই প্রচার করে জনমতকে প্রভাবিত করে জনগণকে তার মতের-পথের সমর্থক ও সহযোগী করে তুলবার জন্যে। এ তাৎপর্যেই এক একটি সংবাদপত্র সমাজের শিক্ষক। কোনো বিশেষ সামাজিক, শাস্ত্রিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক, অর্থনীতিক মতলব অবশ্যই এ ক্ষেত্রে অদৃশ্যভাবে সক্রিয় থাকেই। কিন্তু সাধারণভাবে প্রত্যেক সংবাদপত্র দেশের, সমাজের, মানুষের হিতকামী স্ব স্ব চিন্তা-চেতনার মাপে, তবে তা প্রগতিবাদী প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন মানুষের চোখে যথার্থ হিতকর কি-না, তা তর্কাতীত নয়। কেননা সমাজে আমরা প্রগতিশীল উদার মানববাদী যেমন দেখি, তেমনি পাই প্রতিক্রিয়াশীল প্রগতিবিরোধী অর্থোডকস শাস্ত্রনিষ্ঠ ও বিমুখ মৌলবাদী, তেমনি রয়েছে অজ্ঞ-অনক্ষর-উদাসীন বন্ধ্যা মানুষের মনের, মগজের ও মননের সংখ্যাধিক্য, যারা এসব বিষয় জানেও না, বোঝেও না, আবাল্য শ্রুত, দৃষ্ট ও লব্ধ শাস্ত্রিক, লৌকিক, স্থানিক, অলীক, অলৌকিক বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায় আচ্ছন্ন, তুষ্ট, তৃপ্ত ও দৃঢ়প্রত্যয়ে হৃষ্ট। এ শ্রেণীর লোক গতানুগতিক জীবনচর্চায় অভ্যস্ত ও নিশ্চিন্ত। এ কারণেই কোনো দুটো পত্রিকার মতে-পথে বাহ্য সাদৃশ্য থাকলেও চিন্তা-চেতনার সূক্ষ্মতা-স্থূলতা এবং যৌক্তিক-বৌদ্ধিক-বিবেকী বিবেচনা ভেদে মতের-পথের বিশ্লেষণে, পরিবেশনে, পরিব্যক্তিতে পার্থক্য ঘটে যায়। ফলে আদর্শে আপাত সাদৃশ্য থাকলেও পরিণাম চেতনার তারল্যের দরুন প্রভাব ও ফল হয় ভিন্ন। এখনকার যে কোনো দুটো সরকার সমর্থক কিংবা দুটো সরকার বিরোধী পত্রিকা মিলিয়ে পড়লেই তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এ মগজীশক্তির স্থূলতা-সূক্ষ্মতার পার্থক্যের কারণেই প্রজার বা জনগণের নিষ্ঠ হিতকামী হয়েও, সরকারের অকপট সমর্থক ও পরামর্শদাতা হয়েও এবং সমাজকল্যাণে উৎসর্গিতপ্রাণ হয়েও, অধিকাংশ সংবাদপত্র সরকারের মন্ত্রণাদাতা, প্রজার বা শাসিত-শোষিত জনের পক্ষের লড়াকু এবং সমাজের নীতি-আদর্শে দিশারী হতে পারে না। এমনকি নিরপেক্ষ নির্দলীয় সংবাদপত্রও উদ্দিষ্ট ভূমিকা পালনে সমর্থ হয় না পরিচ্ছন্ন চিন্তা-চেতনার অভাবে। আমাদের ঢাকা শহরে ও জেলা শহরে যতো দৈনিক সংবাদপত্র চালু রয়েছে গোটা উপমহাদেশে এতো দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় না। কারণ আমাদের জানা নেই, তবে দুষ্ট-দুর্জনদের অনুমান এর মধ্যে এক প্রকারের ব্যবসায়িক চাল বা

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসততা রয়েছে। এ ঘটনা কি রটনা, তা আমরা জানি না। তবে সব কয়টাই যে রাজনীতিক মত ও দল সম্পৃক্ত, তাতে তথ্যগত ভুল নেই।

আমাদের সব দৈনিকে সংবাদ পরিবেশন পদ্ধতি এক রকম নয়। শহরের-মফস্বলের, দেশের-বিদেশের, বিজ্ঞাপনের, সভা-সঙ্ঘের, ব্যবসা-বাণিজ্যের, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির, সিনেমার-নাটকের, সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন-ফিচারের, চিঠিপত্রের বিন্যাস ও বিষয় নির্বাচন পদ্ধতি কোনো দুটো পত্রিকার মধ্যে রুচির সাদৃশ্য-সামঞ্জস্য সহজে দৃষ্টি-গোচর হয় না। 'সংবাদপত্রে' বিষয় বিন্যাস ও পরিবেশন যে একটা উঁচুমানের আর্ট তা আমাদের সাংবাদিকরা সব সময়ে মনে রাখেন না। তা ছাড়া আমাদের পত্রিকাগুলোর প্রতিবেদকরা অনেক সময়েই দায়িত্বহীনতার স্বাক্ষর রাখেন তাঁদের প্রতিবেদনে— বিশেষ করে তাঁরা সংক্ষেপে অবিকৃতভাবে সভায় পরিব্যক্ত বক্তার ভাষণ বয়ান করেন না। এমন কি আমন্ত্রণ পত্রে দেখা অনুপস্থিত বক্তার নামও ছেপে দেন, অর্থাৎ কোনো সহযোগী বন্ধু প্রতিবেদকের মুখে কোনো কথা নির্ভর প্রতিবেদনও তৈরি করেন। আবার স্বেচ্ছায় মতলবী বিকৃতি ঘটান। সাংবাদিক জগতে এরই নাম 'ইয়েলো জার্নালিজম'। এমন দায়িত্বহীনতা অপরাধ, লজ্জার ও নিন্দার।

আগেই বলেছি, রাজনীতিক হোক, সামাজিক হোক, শাস্ত্রিক হোক যে-কোনো নীতি-আদর্শ প্রচারে পাঠককে প্রভাবিত করে সে-নীতি-আদর্শের সমর্থক ও সহায়ক সহযোগী করে গড়ে তোলাই এক কথায় 'জনমত' সৃষ্টি করা, নিয়ন্ত্রিত করা এবং প্রয়োজন আন্দোলনে, নির্বাচনে, কিংবা দেশ জাতি মানুষের পক্ষে অকল্যাণকর কিছু বা কোনো সরকারী নৈতিক, সামাজিক অপকর্মের কাজে লাগানো, জনগণকে যথাকালে, যথাস্থানে, যথা প্রয়োজনে ও যথাপাত্রে উত্তেজনা-উদ্দীপনা-প্রেরণা-প্রণোদনা-প্ররোচনা ও প্রবর্তনা দিয়ে লড়াকু ও নিষ্ঠ কর্মী করে তোলাই নীতি-আদর্শ নিষ্ঠ জাতীয় পর্যায়ের সংবাদপত্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে নিম্ন স্তরের দলাদলি সৃষ্টির, প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টির প্রয়াস যতোটা দেখা যায়, জাতীয় স্বার্থে দেশের, মানুষের, সরকারের ও রাষ্ট্রের সত্তার মূল্য-মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উৎকর্ষ সাধন প্রয়াসে প্রতিযোগিতা প্রবণ করার চেষ্টা তেমন দেখা যায় না। দেশে এমন একটা সর্বজনের বিশ্বাসের ভরসার ও আস্থার অবলম্বন রূপে অবিকৃত ও সম্পূর্ণ বয়ানের সংবাদ পরিবেশক পত্রিকা আজো মেলে না। যে-কোনো দলের, শ্রেণীর, পেশার মানুষের নিন্দার বা তারিফের সংবাদ, ঘটনার অবিকৃত বয়ান পাঠকমাত্রই প্রত্যাশা করে, দেশের বা বিদেশের ঘটে যাওয়া বা রটে যাওয়া সর্ব প্রকার সংবাদ পাঠককে জানানো যে-কোনো সৎ সাংবাদিকের আবশ্যিক ও জরুরী দায়িত্ব। দলের নিন্দার হলে সংবাদ গায়েব করা, ভিন্নদলের অপকর্মের গন্ধ পেলেই তিলকে তাল করে পরিবেশন করা অসততা ও অসৌজন্য। এটা সাংবাদিকতার নীতি-আদর্শ বিরোধী।

আমাদের দেশের রাজনীতিক দলগুলো এবং সংবাদপত্রগুলো নিজেদের মতাদর্শ অনুগ জনমত গঠনের উদ্যম-উদ্যোগ আয়োজনরিক্ত। তাঁরা নেতা রূপে নীত, অনুগত, অনুগামী, অনুরাগী সৃষ্টি করতে আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে ভয় পায়, তাই চালু জনমতের অনুগামী হয়ে ভোটব্যাঙ্ক স্ফীত করার প্রয়াসী থাকে। জনশাসক নেতার কাজ হচ্ছে জনমত গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজনমতো জনমত কাজে লাগানো। এর ফলেই মুজাফফর আহমদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদর্শভ্রষ্ট হয়ে বলেন 'ধর্মকর্ম সমাজতন্ত্র' নামের সোনার পাথরবাটি, আস্তিক-শাস্ত্রিক মানুষের প্রীতি অর্জনের জন্যে মার্কসবাদী ফরহাদ ইসলামাশ্রিত হন, আওয়ামী লীগও আওয়ামী মুসলিম লীগ হয়ে যায় কার্যত মুসলিম ভোটারের প্রসন্ন প্রসাদ প্রাপ্তি লক্ষ্যে। বি-এন-পি হয় মুসলিম ও ইসলাম ভক্ত। নীতি-আদর্শ নিষ্ঠ রাজনীতিক দলের, নেতার ও সংবাদপত্রের ভূমিকা হবে নতুন চিন্তা-চেতনা প্রচারকের, পুরোনো বর্জনের নতুন কিছু কল্যাণকর গ্রহণের, Struggle-এর, Resistence এর, Compromise-এর নয়।

জীবনযাত্রায় আমাদের পুঁজি-পাথেয়

প্রাণিজগৎ খাদ্য-খাদক সম্পর্কে সংস্থিত। তাই প্রাণিজগতে মারামারি, কাড়াকাড়ি ও হানাহানি হচ্ছে দিনে-রাতে, জলে-স্থলে সার্বক্ষণিক ব্যাপার। প্রাণিজগৎ নিরস্ত্র বলেই এবং শিশ্নোদর সর্বস্ব বলেই প্রাণিজগতে খাদ্য হিসেবেই হত্যা ছিল সীমিত আর বাঘে-মোষে, সাপে-নেউলে দ্বেষণাজাত যে লড়াই তাও কখনো বৃহদাকারে ঘটেনি। ফলে তখন হত্যাকাণ্ড, জলে-স্থলে হত্যাকাণ্ডে নিহতের সংখ্যা বেশি হতে পারত না। আজো তা মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণিজগতে সেভাবেই স্বল্প সংখ্যায় ও মাত্রায় রয়ে গেছে।

আদিতে মানুষেরাও মানুষ খেত। তবে মানুষখেকো মানুষেরা অন্য প্রাণী পেলে নরহত্যায় তেমন আগ্রহী হত না। তা ছাড়া গোড়া থেকেই প্রাণীর মানব-প্রজাতি প্রায় সর্বভূক। কাজেই মানুষ কোনো একক প্রাণীজীবী বা ফুল-ফল-ফসলজীবী ছিল না কখনো। মানুষ ছাড়া আর সব প্রাণীই ক্ষুৎ-পিপাসার সামগ্রী সংগ্রহ করে সঞ্চিত রাখতে অসমর্থ। পিঁপড়ে-মৌমাছি প্রভৃতি ব্যতিক্রম বলেই বিবেচ্য নয়। ঋজুদেহী উন্নতশির হস্তধর হওয়ার ফলেই মানুষ সহজেই পরস্পরের সহযোগী হয়ে যৌথপ্রয়াসে প্রকৃতিনির্ভর জীবন অতিক্রম করে কৃত্রিম জীবনযাপন পদ্ধতি গোড়া থেকে উদ্ভাবনে ও তার উৎকর্ষ সাধনে নিষ্ঠপ্রয়াস চালায়। ফলে রোদ-বৃষ্টি-শৈত্য থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সে হাত প্রয়োগে যৌথভাবে নির্মাণ করে আশ্রয়, খাদ্যবস্তুর গোলা, আবিষ্কার করে আগুন। প্রকৃতির ও প্রাণীর হামলা প্রতিরোধকল্পে হাতে হাতে নির্মাণ করে হাতিয়ার, তৈরি করে রোগের প্রতিষেধক। জীবনে বারবার মানুষ রোগাক্রান্ত হয় বটে, সবরোগে সে মরে না, মরার রোগ হয় আকস্মিকভাবে মাত্র একবারই।

স্বরচিত স্বনির্ভর জীবনে প্রকৃতিকে দাস, বশ ও প্রকৃতির সঙ্গে আপোস করে আর প্রকৃতির হামলা সুকৌশলে প্রতিরোধ করে কিংবা এড়িয়ে চলার সার্বক্ষণিক ও সর্বজনীন প্রয়াসে মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি ক্রমশ এগিয়েছে, ক্রমোৎকর্ষে আজ স্থূল-সূক্ষ্ম ভেদে গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় পৃথিবীর বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন গৌত্রিক মানুষেরা আঞ্চলিক ও গৌত্রিক মনে-মগজে-মননে-মনীষায়-আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে অসমভাবে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে এবং স্বাধিকারের ও সামর্থ্যের পরিসর বিস্তৃত ও প্রসারিত করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাগ্রসর উচ্চাশী মননঋদ্ধ মগজীরা বিগত শতক থেকে নানা যন্ত্র আবিষ্কারে এবং সমুদ্র-পর্বত-অরণ্য সম্বন্ধে ধারণা ও জ্ঞান অর্জনে ঋদ্ধ হয়ে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-সম্বন্ধ জীবন যাপনে অপরিহার্য করে তুলেছে। পৃথিবী হয়েছে একটা জনপদে ক্ষুদ্র ও সংহত। বলেছি সভ্যতা-সংস্কৃতির স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা অনুসারে মানুষের গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক, জাতিক, ভাষিক, বার্ণিক, নৈবাসিক আঞ্চলিক সম্পদ কাড়াকাড়ি, মারামারি ও হানাহানি কোথাও কোথাও সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য রূপ লাভ করেছে বটে, কিন্তু সাধারণভাবে আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকায় তা আজো গৌষ্ঠীক-গৌত্রিক, বার্ণিক, ভাষিক ও আর্থিক পেশাগত পর্যায়ে রয়ে গেছে।

স্বস্তিতে-শান্তিতে-সম্প্রীতিতে-সহযোগিতায়-সহাবস্থানে সম্মত রাখার প্রবর্তনা দানের জন্যে ইহ-পরলোকে, আসমানে-জমিনে প্রসৃত অদৃশ্য অরি-মিত্র নানা শক্তির ক্রোধ-কৃপা-করুণা-ক্ষতি দাক্ষিণ্য নির্ভর ও নিয়ন্ত্রিত জীবনে বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার নিগড়ে বাঁধার প্রয়োজনে সব নীতিনিয়মের শাস্ত্রগুলো তৈরি ও প্রচারিত হয়েছে এশিয়াতেই। সে-সূত্রে আমরা বলতে গেলে পৃথিবীর সবকয়টি সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক-বাহক প্রভাবিত প্রচারক জাতি। তবু আমরা বন্ধ্যা মন-মগজ-মনন-মনীষার মানুষেরা দেশ-কাল-উপযোগ-প্রয়োজন চেতনারহিত গতানুগতিক আবর্তিত অভ্যস্ত রীতি-নীতি-নিয়মের জীবনে আশ্বস্ত, স্বস্থ জীবনযাপনে তুষ্ট, তৃপ্ত ও হৃষ্ট থাকতে চাই। তাই আমাদের মানসোৎকর্ষ ঘটেনি সাধারণভাবে। আমরা তাই আস্তিক এবং স্বর্গ-নরকে আস্থাবান থেকেও প্রলোভনে প্রলুব্ধ হই। সংযমের নীতি-আদর্শে মানবিক গুণের অনুগত, অনুগামী ও অনুরাগী থাকতে পারি না। তাই আমরা অপরাধপ্রবণ। আমরা লিপ্সু, আমরা হরণে, হননে, দহনে, ধর্ষণে, ভাঙনে উৎসাহী। ছল-চাতুরী-চালাকী-বঞ্চনা-প্রতারণা আমাদের জীবনযাত্রায়-রাজনীতিতে, সামাজিক আচরণে ও ব্যবসায়ে, শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের পুঁজি ও পাথেয়। অবশ্য কথায় আমরা মহৎ বুলিতে মুখর।

জুয়া

আজকাল কোনো নীতিকথা সনাতনী ভাষায় ও ভঙ্গিতে উচ্চারণ করা সম্ভব হয় না। কারণ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা যায়। এবং যুক্তি একটাই, দুনিয়ার হালচাল বহতা নদীর স্রোতের মতো বদলায়। নতুন কিছু দেখলেই ঘাবড়ানোর কারণ নেই। ওই বদলানোর নিয়মেই কালের ও স্থানের বাঁকে বাঁকে নতুন নতুন নীতি-নিয়ম-রীতি-পদ্ধতি চালু হয়। তাকে সহজে গ্রহণ করাই ভালো। কারণ তা গ্রহণ-বরণ না করলেই আত্মবঞ্চনার শিকার হতেই হয়। কারণ নতুন চালু থাকার জন্যে আসে, অসময়ে অকালে বিলুপ্ত হবার জন্যে নয়। তাছাড়া নীতি-নিয়ম-রীতি-রেওয়াজ-প্রথা-পদ্ধতি কোনো এক কালের বা এক দেশের জন্যে আসে না। উদ্ভাবনে অনুকরণে-অনুসরণে গোটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ায় বিস্তৃত হয়ে, গৃহীত হয়ে চালু থাকার জন্যেই আসে। অনুন্নত আদিবাসী, উপজাতি-জনজাতি অধ্যুষিত দেশে বা রাষ্ট্রে নাগরিকদের অজ্ঞতার, নিঃস্বতার, দুস্থতার, দরিদ্রতার, নিরক্ষরতার সুযোগে সরকার অনেক নতুন নীতি-রীতিকে কৃত্রিম উপায়ে বেশ কিছুকাল ঠেকিয়ে রাখতে পারে বটে, কিন্তু সাক্ষর-শিক্ষিত-সভ্য-ভব্য সমাজকে অন্যায় ও কালবিরুদ্ধ ভাবে নতুন কিছু থেকে বঞ্চিত করা যায় না। তা প্রথমে চোরা-গোপ্তা পথে শহরে এবং পরে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

এ ভূমিকাটা গড়তে হল। আমাদের রাষ্ট্র ক্রমে যে লাভ-লোভ দেখিয়ে দেশবাসীকে জুয়াড়ি করে তুলছে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সম্ভবত মহৎ মানবিক কল্যাণ-চেতনা বশে রুগ্ন-দুস্থ-বিপন্ন মানব হিতার্থে, কিন্তু পরিণামে মানবিক গুণের উন্মেষ-বিকাশ পথ রুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা না করেই, সে-সম্বন্ধে কর্তাব্যক্তিদের মনে আশঙ্কা ও জিজ্ঞাসা জাগেনি বলেই আমাদের আঁচ, আন্দাজ ও অনুমান।

আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদনে পথচারীরা রেডক্রস্ বাক্সে টাকা-পয়সা চাঁদা বা দান স্বরূপ দিত। একে তারা পরার্থে মানবিক দায়িত্ব কর্তব্য পালন বলেই মনে করত। ফলে এটি একটি সামাজিক-মানবিক দায়িত্ব গুণের উন্মেষের ও বিকাশের সহায়ক হত। এখন তা ব্যক্তির আর্থিক লাভের-লোভের ফাঁদ রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে– লটারির টিকেট নামের জুয়ার ও অলীক নিয়তির কবলিত করা হচ্ছে মানুষের মনকে ও মনুষ্যত্বকে। কাম-ক্রোধ-লাভ-লোভ-স্বার্থের বশে মানুষ করে না হেন অপকর্ম-অপরাধ নেই মর্ত্যজীবনে। সরকারী বা সামাজিক ভাবে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্ররোচনা-উত্তেজনা-উদ্দীপনা-প্রণোদনা দিয়ে প্রলুব্ধ প্রাণিসুলভ আচরণে মানুষকে প্রবর্তনা দেয়া কি নৈতিক চেতনা ও দায়িত্ব সম্মত সঙ্গত কাজ? লটারি ব্যক্তিকে অর্থলিপ্সু, অদৃষ্টবাদী বা নিয়তিনির্ভর এবং অলস চরিত্রভ্রষ্ট জুয়াড়ি করে তোলে। এসব মানুষের মানবিক গুণের অপকর্ষ ঘটায়। বিনোদনমূলক জুয়া হচ্ছে ঘোড়দৌড়। রেসারু ও নেশারু মনে-মেজাজে ও চরিত্রে অভিন্ন। পরিবারের পক্ষে তারা অমানুষই– কাজের লোক নয়, ক্ষতিরই কারণ। আর ব্যবসায়িক জুয়া হচ্ছে ফটকাবাজারী, স্টক এক্সচেইঞ্জ বা শেয়ার বাজার। লটারিবাজের চেয়ে হাজারগুণ বেশি ঘোড়দৌড়ের নেশারু, মদের নেশারু, তাসের জুয়াড়ি, ফটকাবাজারী প্রভৃতি আত্মবিনাশী খেলা বা পেশা। বহু বহু কাল ধরে এগুলো পৃথিবীর সর্বত্র লঘু-গুরুভাবে চালু রয়েছে। ব্যতিক্রম কৃচিৎ চোখে পড়ে অনুন্নত দেশে। উন্নত দেশে এসব আছে, এবং সবদেশেই এসব লোক পরিবারে অনভিপ্রেত। পরিবারের ও সমাজের তারা দায়, সম্পদ নয়। আমরা স্বীকার করি যে মানুষের জীবনে বিনোদন আবশ্যিক, নেশাও প্রয়োজন জীবনে সুখে-দুঃখে আনন্দ-আরাম-প্রবোধ অনুভব-উপলব্ধির জন্যে। আমরা এ-ও স্বীকার করি যে মানুষ মূলত প্রাণী। মানুষ ষড়রিপুর বশ। কামে-ক্রোধে-লাভে-লোভে-স্বার্থে মানুষ শ্বাপদের চেয়েও বহুগুণে হিংস্র– প্রতিহিংসা পরায়ণ। মানুষ ফেরেস্তা নয়, দোষে-গুণে প্রাণী মাত্র। তবে গুণের চেয়ে দোষের পরিমাণ বেশি হলে সে পরিহারযোগ্য এবং শাসনপাত্র হয়ে যায়। শাস্তি তার প্রাপ্য হয়ে ওঠে। আমরা বয়োধর্মও মানি। কাজেই আমরা পিউরিটান হয়ে সমাজকে শাস্ত্রিক, প্রাশাসনিক, পাপ (Sin), অপরাধ (crim), সামাজিক অপকর্ম (vice) এবং নৈতিক অপরাধ (Crimoral) মুক্ত করা বা রাখা সম্ভব বলে এমনকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজন বলেও মনে করি না। আমাদের আপত্তি কেবল সরকারী মদদে, সমাজসেবীদের সক্রিয় সহযোগিতায় ও সমর্থনে এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে উঁচু পদের-পদবীর জ্ঞানী-গুণী-দক্ষ-যোগ্য ব্যক্তিদের লোকের এ ধরনের লটারি জুয়ায়, বিনোদন জুয়ায়, তাসের জুয়ায়, মদ-মাগের নেশায়, ফটকাবাজারী জুয়ায় আসক্তির বিরুদ্ধে। কারণ এগুলো কোনো ব্যক্তির, পরিবারের, সমাজের, সংস্কৃতির, সরকারের, রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর নয়। এ সবকিছুই মানবিক গুণের স্বাভাবিক উন্মেষ-বিকাশের পরিপন্থী। তাই পরিহার্য মাননীয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের-পদ-পদবীধারীদের। কারণ তাঁরা দেশ-মানুষ-সরকারের ও রাষ্ট্রের, বিজ্ঞান-বাণিজ্যের-অর্থ-সম্পদের ধারক-বাহক পরিচালক ও নিয়ন্তা। তাঁদের কাছে দেশের শাসনপাত্র জনগণ সততা, নীতি-আদর্শ-নিষ্ঠা, ন্যায্যতাবোধ, বিবেকানুগত্য, সংযম, সহিষ্ণুতা, চারিত্রিক দার্ঢ্য আশা করে।

আমরা দুর্নীতিবাজ নই—নীতিশূন্য

AMARBOI.COM

সাধারণ রাজনীতিকরা ভোট জোগাড়ের লক্ষ্যে জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্যে কাপট্যের আশ্রয় নেন, তাঁরা মনযোগানো, মনমাতানো, চোখধাঁধানো, তাক লাগানো, চমক জাগানো কথায় ও কাজে পটু হন।

আমাদের রাষ্ট্রে-দেশে-সমাজে-মানুষে-সরকারেও কোনো দুর্নীতিই নেই, আছে কেবল নীতিশূন্যতা, amoral-এর moral বা immoral চেতনাই থাকে না। আমাদের দেশ-রাষ্ট্র-সমাজ-সরকারকে বন্যার জলে দূরবিস্তৃত সাগর প্রমাণ প্রান্তরে হাল-পাল-দাঁড়ি-মাঝিহীন নৌকার সঙ্গে তুলনা করা চলে। তেমন নৌকা যেমন নিরুদ্দিষ্ট দিশেহারা, বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের সমাজ-সরকারও তেমনি তরঙ্গ-তোড় তাড়িত বায়ুচালিত দিশেহারা নৌকা স্বরূপ। উচ্চাশী নীতি-আদর্শরিক্ত মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্প-দাপট-প্রভাব-প্রতিপত্তি-অর্থ-বিত্ত-বেসাত অর্জনকামী লাভ-লোভ-স্বার্থ চালিত বিবেকী দায়িত্ব-কর্তব্য বোধহীন কপট লোকেরাই এখানে রাজনীতি করে। নইলে আমাদের রাষ্ট্রের সংবিধানে ইসলাম রাষ্ট্রধর্মরূপে স্বীকৃত থাকা সত্ত্বেও আমাদের কোনো ইসলামি প্রাশাসনিক ও বিচারবিধি চালু নেই। এখানে চোরের হাত কাটা হয় না, ব্যভিচারের অপরাধীকে অর্ধাঙ্গ মাটিতে পুঁতে ঢিল পাথর ছুঁড়ে মারা হয় না, নাচ-গান-বাজনা-অভিনয়-নাটক-সিনেমা নিষিদ্ধ নয়। বিদ্যালয়ে সহশিক্ষা চলে, হাসপাতালে নারী নার্স, ডাক্তার পর পুরুষের সেবা-চিকিৎসা করে, দফতরে নারী-পুরুষ একসঙ্গে চাকরি করে, নারীরা হাঁটে-বাজারে-দোকানে ঘোরে বোরখা না পরেই, পুরুষেরা ইউরোপীয় পোশাক পরে, ক্লাবে জুয়া খেলে, মদ্যপান করে, রোজা রাখে না, নামাজ পড়ে না। নাসারা আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত-সৃষ্ট-নির্মিত যন্ত্রাদিতে, সামগ্রীতে, ঔষধে-পথ্যে-চিকিৎসা বিজ্ঞানে আস্থা, আগ্রহ ও আকর্ষণ ইত্যাদিই বহুলভাবে সর্বত্র দেখা যায়, আবার এ ইসলাম পছন্দ রাষ্ট্রেই মস্তানী-গুণ্ডামি-খুনখারাবি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুরি-জোচ্চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই-রাহাজানি-কাপট্য-বঞ্চনা-প্রতারণা অমুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে বেশি ঘটে। কিন্তু আশ্চর্য অতঃপরম্। এখানে মুসলিম ব্যবসায়ীই, আমলা-চাকুরেই চোরাচালানে, কালোবাজারে, ঘুষে, জালিয়াতিতে বিশেষ ভাবে আসক্ত ও নিযুক্ত, অথচ মসজিদের পরিসর ও সংখ্যা বেড়েই চলেছে। দ্বিতল-ত্রিতল-চৌতল মসজিদও গড়ে উঠছে দ্রুত। এ একটি ক্ষেত্রেই এবং পশুহত্যার কুরবানীতেই ইসলাম যে এদেশে সবকিছু ছাপিয়ে চাঙা থাকছে ও হচ্ছে তার প্রমাণ মেলে। আর উরস উৎসবের ঘটা দেখেই কেবল আশা জাগে যে এ রাষ্ট্র চিরকালই ইসলামি থাকবে। এবং বিরোধে-বিবাদে-কাড়াকাড়িতে-মারামারিতে ও হানাহানিতে আসক্তি দেখেও নিঃসংশয়-নিঃসন্দেহ প্রত্যয়ে বলা চলে যে বাঙালাদেশী মুসলিমরা ইমানে হ্রাস-বৃদ্ধি যাই ঘটুক না কেন, তারা মুসলমান থাকবেই।

অতএব সাংবিধানিক মৌল ব্যবস্থা ইসলামি শাস্ত্রের বিধি-নিষেধরূপ নীতি সরকার চালু করেইনি, এ তাৎপর্যে অবশ্যই দেশ নীতিশূন্য। কাজেই নীতিই যেখানে চালু নেই, সেখানে দুর্নীতি চালু করে, দুর্নীতিবাজ হয়, এমন সাধ্য কার? যখন হাজী মন্ত্রী-সাংসদদের সত্যগোপনে, কপটোক্তিতে ও কপট আচরণে আর অনৃত ভাষণে সদানিরত দেখি, তখন তাকে অসততা, মতলববাজি কিংবা আদর্শ ও চরিত্র ভ্রষ্টতা বলে অভিহিত করতে পারি না ওই নীতিশূন্যতার কারণেই।

ইমান যার আছে সে-ই মুমীন। মুসলিম পরিবারে জন্ম, শৈশব-বাল্য-কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব-বার্ধক্য অবধি দৃষ্ট, শ্রুত, লব্ধ, প্রাপ্ত নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি, কাল্পনিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আচার-আচরণ-পালা-পার্বণই তার ইমানের উৎস, ভিত্তি ও স্তম্ভ। ইহুদী-খ্রীস্টান-জৈন-বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় মানুষের আস্তিক্য জন্মসূত্রেই পাওয়া, পড়ে-শুনে-দেখে যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে বিচারে-বিশ্লেষণে যাচাই-বাছাই-ঝাড়াই করে আত্তীকৃত, আত্মীকৃত যৌক্তিক-বৌদ্ধিক আস্থার Faith-এর ভরসার প্রসূন, Trust-এর নয় তার শাস্ত্রে বিশ্বাস, এ বিশ্বাস (Belief) আরোপিত বলেই জীবনে রূপায়িত হয় না নির্ভেজাল, নিখাদ, নিখুঁত রূপে। এ জন্যে কিছু সংখ্যক ভীরুর ও দৃঢ়প্রত্যয়ীর মধ্যেই কেবল আক্ষরিকভাবে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ মেনে চলার যান্ত্রিক সংযম ও অধ্যবসায় দেখা যায়। তাদের আমরা বলি অর্থোডক্স বা গোঁড়া ধার্মিক। পৃথিবীর সর্বত্র সাধারণভাবে আমজনতা জন্ম-জীবন-মৃত্যু পরিসরে তাই বৃত্তি-প্রবৃত্তির সচেতন সযত্ন-সতর্ক অনুশীলনে অসংযত, অসহিষ্ণু লিপ্সা-ঈর্ষা-অসূয়া-রিরংসা-প্রতিহিংসা তাড়িত হয়েই জীবন যাপন করে, তাই আস্তিকরা কোনো না কোনো শাস্ত্র মেনেও সজ্জন-সুজন হয় না, অধিকাংশ মানুষ লাভে-লোভে-স্বার্থে-ঈর্ষার-অসূয়ায়-রিরংসায়-হিংস্রতায় প্রাণীসুলভ কিংবা শ্বাপদে সম্ভব কর্ম ও আচরণ করে। কাম-ক্রোধ-লাভ-লোভ-স্বার্থবশে মানুষ করে না হেন অপকর্ম নেই, এক্ষেত্রে ইহুদী-খ্রীস্টান-জৈন-বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলিম ভেদ নেই পৃথিবীর কোথাও। তবে স্থান-কাল-সমাজ-প্রয়োজন আর অবস্থা ও অবস্থান ভেদে সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে মাত্র।

এ মুহূর্তে আমাদের রাষ্ট্রে সমাজে পরিবারে ব্যক্তিজীবনে নানা শৈক্ষিক, নৈতিক, আর্থিক [বেকারত্ব দারিদ্র্য, নৈরাশ্য], সামাজিক, শাস্ত্রিক, সাংস্কৃতিক, প্রাশাসনিক কারণে এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অভাবে আর বিদেশীর দুষ্ট মতলবের প্রভাবে বিপর্যয় ঘটেছে। নীতি-নিয়মনিষ্ঠা বিলুপ্ত হয়েছে জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে। বিদ্যালয়ে-টোলে-মাদ্রাসায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে নকল করে পাস করতে পরীক্ষার্থীর মনে-বিবেকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জাগে না, দফতরে-শিক্ষায়তনেও ঘুষ-জালিয়াতি চলে, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে টোলে-মাদ্রাসায়-বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্র অর্থ আত্মসাতের ঘটনা ঘটে। ব্যবসায়ে-কলে-কারখানায়-নির্মাণে এমনকি ঔষধেও খাদ-ভেজাল-জাল-নকল সুলভ ও অবিরল। আর কালোবাজারি চোরাকারবারি-প্রতারণা তো সার্বক্ষণিকভাবে জীবিকার অপরিহার্য নিত্যকর্ম-আচরণের অঙ্গ হয়েই রয়েছে। অবস্থা এমন হয়ে উঠেছে যে, যে-কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তিই সন্দেহভাজন-বিশ্বাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

ফলে সরলতা, সততা, সজ্জনতা, সুজনতা নির্বোধতার নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রতিশব্দ হয়ে উঠেছে ঘরে ঘরে। আমরা নীতিজ্ঞানরিক্ত, 'নীতি বা নৈতিকতা' শব্দ এখন ভাষায় থাকলেও আমাদের চেতনায় বিলুপ্ত। তাই আমরা নীতিশূন্য, দুর্নীতিবাজ নই। আমাদের সাহিত্যের, দর্শনের, শিক্ষার, রাজনীতির, সংস্কৃতির, সমাজের ক্ষেত্রে অসামান্য-অনন্য মগজ-মনন-মনীষা সম্পন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি নেই, যাঁদের মনীষার, ব্যক্তিত্বের, চিন্তার-চেতনার-অবদানের প্রভাবে বা পরামর্শে আমরা উদ্বুদ্ধ, প্রবুদ্ধ, অনুপ্রাণিত হতে পারি, কল্যাণের ও প্রগতির পথ খুঁজে পেতে পারি।

AMARBOI.COM

নারীমুক্তি কি আজো সুদূরে!

বন্ধ্যা-মগজের স্থূলবুদ্ধির যুক্তিরিক্ত মানুষ কিভাবে আশৈশব লালিত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা চালিত গতানুগতিক আবর্তিত জীবন চেতনায় ও চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং বিবেক-বিবেচনাহীন হয়ে মূর্খের মতো আচরণ ও কর্ম করে, তার সাম্প্রতিক পাথুরে প্রমাণ মিলছে ভারতের বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠেয় বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার বিরোধিতায়। ভারতেই পৃথিবীর অন্য অনেক রাষ্ট্রের মতো আজো নারীর গণিকাবৃত্তি গ্রহণের, অশ্লীল নাচে-গানে-অভিনয়ে অংশগ্রহণের, বিজ্ঞাপনে মডেল হওয়ার, নারীসৌন্দর্যে আকৃষ্ট করে পণ্য জনপ্রিয় করার প্রয়াস অবৈধ বা দেশী আইনে নিষিদ্ধ নয়। এমনকি স্বেচ্ছায় পরকীয়-পরকীয়া প্রেমে-কামে লিপ্ত হয়ে স্ত্রী বা স্বামী ত্যাগও নিন্দনীয় হলেও বেআইনি নয়। এমনকি পুরুষের বা নারীর কাম-প্রেম চর্চা, নারী-পুরুষের অবাধ ও প্রকাশ্য মেলামেশা পথে-প্রান্তরে-পার্কে অবৈধ বা আইনের চোখে আজো অপরাধ নয়। অনভ্যস্ত রক্ষণশীল ব্যক্তির কাছে এ সব দৃষ্টিকটু ঘটনা, দৃশ্য বা ব্যাপার মাত্র। এবং তারা বহু বহু কাল ধরে দেখে দেখে শুনে শুনে গা-সহা, মন-সহা ও চোখ-সহা করে নিয়েছে কখনো প্রতিকার না চেয়েই, প্রতিবাদ না করেই, প্রতিরোধে প্রয়াসী না হয়েই। তারা এখন কেবল বিদেশী ও দেশী সিনেমায় নগ্নপ্রায় যৌবনবতী সুন্দরীদের নাচের, গানের কামোদ্দীপক প্রেমাভিনয়ের কখনো প্রতিবাদ করে না, বরং ঘরে ঘরে ভিসিআর-ভিসিপি যোগে ক্যাসেট বাজিয়ে অসম সম্পর্কের, সম্বন্ধের ও বয়সের আত্মীয় স্বজন নিয়ে সপরিবার সপরিজন উপভোগ করেন সানন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগ্রহে। আজ সবাই ডিস অ্যান্টেনা যোগে বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী টিভির চ্যানেলে নানা অশ্লীল ভাব-ভঙ্গীর, পোশাকের অভিনেতা-অভিনেত্রীর কাম-প্রেম জাগানো দৃশ্য সাগ্রহে দেখে থাকে বয়সের হিসেব বা স্তর নির্বিশেষে। আমরা সবাই জাগ্রত মুহূর্তগুলোতে এমনি পরিবেশে ও প্রতিবেশে বাস করছি, যন্ত্রজগতে যন্ত্রনির্ভর যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত প্রাত্যহিক জীবনে ব্যক্তিগতভাবে বা সামাজিকভাবে এ পরিবেশ এড়িয়ে চলতে পারি? আজ জীবন-জীবিকা বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে, এ কালে রুচির-সংস্কৃতির নীতি-নিয়মের, রীতি-রেওয়াজের, প্রথা-পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে কোথাও কেউ চলতে পারবে না, বৈশ্বিক স্তরে পারস্পরিক প্রভাবে মিশ্র রুচি-সংস্কৃতি-নীতি-রীতি-আদর্শ-আচার-আচরণ গ্রহণ-বরণ করতেই হবে। তা ছাড়া ইতোপূর্বে 'মিস ইন্ডিয়া' প্রতিযোগিতা হয়েছে, ভারতের এক তরুণী মিস্ ইউনিভার্স হয়েছে। এ অবস্থায় যুক্তি-বুদ্ধিহীন হয়ে আবেগবশে চব্বিশ বছরের তরুণের আগুনে আত্মাহুতি, মহিলা নেত্রীর আগুনে দেহ সমর্পণের হুমকি নিতান্ত স্থূলবুদ্ধিলোকের অর্বাচীনতার ও অন্ধ-আবেগতাড়িত সঙ্কল্পের বা অঙ্গীকারের পরিচায়ক। কোনো সুস্থ মগজের যুক্তিবাদী মানুষ এ প্রতিযোগিতার বিরোধিতা করার কারণ খুঁজে পাবেন না। নতুন কালের নতুন মানুষের জীবনের দাবি ও প্রয়োজনের চাহিদা মেটাতেই হয়– এ তথ্য, সত্য ও তত্ত্বটি স্মরণে রাখা আবশ্যিক ও জরুরী।

এ প্রসঙ্গে আর একটি দেশী সংবাদ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করতে চাই। আজকের সংবাদপত্রে (১৯.১১.৯৬ তারিখের) দেখলাম ঢাকা শহরের দুই মহিলা পরকীয়া কামাসক্ত পতির লিঙ্গ কেটে দিয়েছেন। তাঁরা ক্রোধান্ধ হয়ে কি নিজেদেরই জীবন বিড়ম্বিত করলেন না? এ স্বামী এখন তাঁদেরই দায় হয়ে রইল, সম্পদ হয়ে থাকল না। অন্যপ্রকার আঙ্গিক শাস্তি কি দেয়া যেত না ক্রোধবশে? এতে তো নির্বোধের প্রতিহিংসা বৃত্তির চরিতার্থতার প্রমাণই মিলল। এমনি কাজ তো মূলত আত্মঘাতী। তবে একটা নতুন যুগের সূচনা লক্ষণ আভাসিত হল এ ঘটনায়। নারী আর অবলা থাকছেন না, পুরুষপোষ্য-পীড়িত প্রাণী থাকছেন না, সমকক্ষ হয়ে সমান দাম্পত্য অধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার প্রয়াসী হচ্ছেন। এটি অবশ্যই ঘরে-সংসারে-সমাজে নারীর কাম্য অবস্থার ও অবস্থানের দাবির প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ ঘটনা বলে স্বীকৃত ও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আবেদনে সাড়া মিলবে কি?

সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে ঘুচাবে কে।
নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চক্ষে মুছাবে কে।
আর্তের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বসুন্ধরা,
অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা-
প্রবলের উৎপীড়নে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে বাঁচাবে দুর্বলেরে।
অপমানিতেরে করে দয়া বক্ষে লবে ডাকি।। (রবীন্দ্রনাথ)

আজ যে আমাদের দেশের, রাষ্ট্রের, জাতির মানুষের এ-ই প্রশ্ন, আহাজারি ও সমস্যা, তা অস্বীকার করবে কে? এবং এ-ও সত্য যে আগের সমাজ পরিবর্তনকামী গণদরদী, পরের জন্যে আত্মোৎসর্গকারী বিপ্লবী কম্যুনিস্ট আজ দেশে বিদেশে সর্বত্র দুর্লভ হয়ে উঠেছে এবং সমাজে আর্থিক জীবনে যারা সবার পিছে, সবার নীচে পড়ে রয়েছে, যারা নিঃস্ব-নিরন্ন-দুস্থ-দরিদ্র-অজ্ঞ-অনক্ষর, জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে বিপন্ন, অনিশ্চিত উপদ্রুত জীবন যাপনে যারা বিপর্যস্ত, সেই সর্বহারাদের অবস্থার ও অবস্থানের পরিবর্তন লক্ষ্যে কাজ করার লোক কি আজো মেলে? আজ মনে জিজ্ঞাসা জাগছে, আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অর্থসম্পদে ঋদ্ধ, আমাদের ব্যক্তিক, সামাজিক, নৈতিক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক গণতান্ত্রিক জীবনে মানবিক গুণের হ্রাস না বৃদ্ধি ঘটিয়ে আমরা উঠছি না পড়ছি! অনেকেই বলছে বিদ্যায় বিত্তে বৃত্তিতে বেসাতে কিছু লোকের উত্থান ঘটলেও পতন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে, পতন ঘটছে শতে পঁচাত্তর জনের। এসব লোকের বিদ্যা নেই অথবা স্বল্প, এ সব লোকের বুদ্ধি নেই অথবা বুদ্ধি ধূর্ততায় রূপান্তর পায়নি, এ সব লোক পুঁজিহীন, পাথেয়রিক্ত। এ সব লোক প্রজন্মক্রমে শোষিত-পীড়িত অজ্ঞ-অনক্ষর পরিবারের সন্তান। প্রয়োজনীয় ও পরিমিত অর্থ-সম্পদের এবং বল-ভরসার অবলম্বনের অভাবে এরা সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করে তথা আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে দুর্জন-দুষ্ট-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতী হতে পারেনি বলেই এরা ভাতে-কাপড়ে আত্মপোষণে অসমর্থ। এরা কারো কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্যও পায় না। পার্ষদ, পারিষদ, সাংসদ কেউ এদের পতনরোধে, উত্থানের পন্থা তৈরি করে দিতে এগিয়ে আসে না। ভাষণে, বক্তৃতায়, লেখায় ও মিসিল নারায় এদের জন্যে দরদী কথার ফুলঝুড়ি ছড়ানোর লোক যদিও আগের চাইতে এখন বেশি দুনিয়ার সর্বত্র, অবশ্য এর মধ্যে ভোট জোগাড়ের, জনপ্রিয় হওয়ার এবং আর্থ-বাণিজ্যিক-মহাজনী শোষণের সাম্রাজ্যিক ও আধিপত্যবাদের ছল-চাতুরী-কাপট্যও থাকে। শিশুশ্রম বিরোধিতায় কিংবা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে অথবা এন.জি.ওর সেবা-সাহায্য ব্যবস্থায় এমনি ছল-চাতুরী-কাপট্য ও মতলবী উদ্দেশ্য রয়েছে নিহিত। এ কালের 'গ্রেট সেভেন' এর সর্বপ্রকার চিন্তা-চেতনা-কর্ম-আচরণ ও উচ্চারণ তাদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার লক্ষ্যেই সন্তর্পণে নিয়োজিত ও প্রযোজিত রাখে, বাহ্যত পরার্থে মনে হলেও তার সঙ্গে জড়িত থাকে প্রায়োজনিত প্রেরণা। গোড়ায় উদ্ধৃত কবিতাংশের অনুসৃতি হিসেবে বলা চলে গণতন্ত্র হচ্ছে ব্যক্তির স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য, স্বাধিকার সংরক্ষণের রক্ষাকবচ। আইন ও সংবিধান লঙ্ঘন ও উপেক্ষা করলেই কেবল নালিশযোগে বিচারের ব্যবস্থা মাধ্যমে ব্যক্তিকে ন্যায়দণ্ড দেয়া যায় মাত্র। নইলে কোনো নাগরিক, প্রতিবেশী কিংবা সরকারী প্রশাসক তার কেশ স্পর্শ করার অধিকারও রাখে না, এ অবস্থায় পরামর্শে, উপদেশে, বক্তৃতায়, বিবৃতিতে কিংবা জাতিসঙ্ঘ ঘোষিত বিভিন্ন মানবিক চেতনা সঞ্চারমূলক দিবস পালনে মানুষকে প্রেরণা, প্রণোদনা, প্রবর্তনা দিয়ে কোনো ক্ষেত্রেই নগদ নারায়ণ ছাড়া বাঞ্ছিত ফল মেলে না। সবারই বাস্তব অভিজ্ঞতা এরূপই, ব্যক্তিক ব্যতিক্রম এখানে গণ্য নয়, কেননা সমস্যাগুলো মানবিক তথা সামাজিক বা বৈষয়িক। তাই কবির বাঞ্ছা পূরণ হবে না কখনো আবেদনক্রমে। আমরা জানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষতিভীরু বিপন্ন মানুষকে মন্ত্র-মাদুলি, তাবিজ-কবচ, তুকতাক-বাণ-উচ্চাটন, ঝাড়-ফুঁক কিংবা পানি-ধূলি-তাগা পড়া প্রভৃতি গ্রহণে সহজেই প্রতর্বনা দেয়া যায়। কেননা তা বিপন্ন ব্যক্তির পার্থিব অস্তিত্ব সংক্রান্ত। গণতন্ত্রে জোর-জুলুম-জবরদস্তি হারাম। কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানি নাগরিক অধিকার-বিরুদ্ধ। এ জন্যেই সংসদে আইন পাস করেই কেবল শাস্ত্রিক, নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক কিংবা বৃত্তি-বিত্ত-বেসাত সম্পৃক্ত নীতি-নিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি এমনকি পুরো সামাজিক ও আর্থিক জীবন-জীবিকা-আচার-আচরণ-নীতি-রীতি খোল নলচে সমেত পাল্‌টানো সম্ভব। কিন্তু মানবের প্রাণিসুলভ লাভ-লোভ-স্বার্থ চেতনা এতো প্রবল যে কোনো শাস্ত্রিক, নৈয়ায়িক বা বিবেকী যুক্তি-বুদ্ধিও প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে, মগজের কিংবা মর্মের দুর্গের পাথুরে দেয়াল ফুটো করতে পারে না। তাই এভাবে সমাজপরিবর্তন স্বাভাবিক নয়। দেশে দেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলন কিংবা উদার মানবিক নীতিনিয়মের প্রয়োগ তাই সমাজ ও রাষ্ট্র শাসনে বৃথা ও ব্যর্থ হয়। কায়েমী স্বার্থবাজদের বিরুদ্ধে কিংবা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত শাস্ত্রিক, লৌকিক, অলৌকিক ও অলীক কাল্পনিক আঁচে-আন্দাজে-অনুমানে স্বীকৃত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা খাঁচাবদ্ধ বন্ধ্যা মনের, মগজের লোকেরা গতানুগতিক মৌরসী নীতি-নিয়মে, রীতি-রেওয়াজে, প্রথা-পদ্ধতিতে অভ্যস্ত জীবনাচারে তুষ্ট, তৃপ্ত, হৃষ্ট ও নিশ্চিত আর নিশ্চিন্ত থাকার স্বস্তি-সুখকামী। তাই নিয়তি নির্ভর আস্তিক্যে নিঃস্ব-নিরন্ন-দুস্থ-দরিদ্র-পীড়িত-বঞ্চিত-প্রতারিত-শোষিত জনেরাও পরিবর্তনের জন্যে দ্রোহী হয় না, দ্রোহীদের সহযোগিতাও করে না। এ কারণে কম্যুনিস্টরা তাদের মুক্তিসংগ্রামী ত্রাতারূপে ভোগবিমুখ বিবাগী হয়ে আত্মোৎসর্গ করলেও তাদের সমর্থন পায় না। ফলে বহু বহু ত্যাগ ও জীবনদান সত্ত্বেও কম্যুনিস্টরা প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ। আসলে শ্রেণীচেতনা প্রবল শ্রেণীকে অর্থ-সম্পদ-সুখ-স্বস্তি-সাচ্ছল্য-স্বাচ্ছন্দ্য-ক্ষমতা-দর্প-দাপট-প্রভাব-প্রতিপত্তি আঁকড়ে থাকতে প্রলুব্ধ করে। তাই তারা অযৌক্তিক, অবৌদ্ধিক ও অবিবেকী থাকে। প্রবল শ্রেণীর কেউ কেউ বিবেকী প্রেরণায় গণমুক্তি সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করে। তাই সমাজপরিবর্তনের জন্যে– শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার জন্যে একাট্টা হয়ে জোরে-জুলুমে প্রতিরোধকারীদের পরাস্ত করতে হয়, এর নাম বিপ্লব, সংগ্রাম, সন্ত্রাস যা-ই দেয়া হোক না কেন।

চিরকেলে পরামর্শ স্মরণ করুন

আগেও বলেছি, আবার বলছি, বারবার বলতে রাজি, কারণ এর চেয়ে গুরুতর বক্তব্য এ সময়ে আর কিছু নেই। কথাটা নতুন নয়, আমার নিজেরও নয়, কথাটা চিরকেলে কল্যাণকর পরামর্শ। প্রজন্ম পরম্পরায় নীতিকথা রূপে সবাই বলে আসছে, শুনেও আসছে, কেবল যথাসময়ে যথাপ্রয়োজনে যথাস্থানে যথাপাত্রে মানা হচ্ছে না মাত্র। এতেই কালে কালে, জনে জনে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, গোত্রে গোত্রে, দলে দলে, স্থানে স্থানে দ্বন্দ্ব-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংঘর্ষ-সংঘাত-লড়াই-দাঙ্গা-যুদ্ধ লেগেই আছে লঘু গুরুভাবে দুনিয়ার কোনো না-কোনো রাষ্ট্রে, গোত্রে, গোষ্ঠীতে। জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস-পেশা-শ্রেণী পার্থক্যের দরুন নয়, কেবল মতের পথের সম্প্রদায়গত স্বার্থের ভিন্নতার দরুন দাঙ্গা-লড়াই-বিরোধ-বিবাদ সর্বত্র অবিরল রয়েছে। এ কারণেই সামাজিক মানুষ, দলবদ্ধ মানুষ নির্বিঘ্ন নিরাপদ শান্তি পায়ও না, দেয়ও না। সবাই কিন্তু এ সুখ-শান্তি-স্বস্তি-নিরাপত্তা-নিরুপদ্রুতাকামী। সবাই জিগীষুও। ফলে জিগীষা আত্মপ্রত্যয়হীন সংগ্রামী বা প্রতিযোগীর মনে পরাজয়ের ভীতি জাগায় এবং ছলে-বলে-কৌশলে-ষড়যন্ত্রে-গোপনে জয়ী হওয়ার জন্য জিঘাংসাশ্রিত হয়। কামোন্মত্ত ও ক্রুদ্ধ জিঘাংসু মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারায়, হয় আবেগচালিত, তখন সে লাভ ক্ষতি স্বার্থহানি বিপদ প্রভৃতি সে-অবস্থায় ভুলে যায়। তাই সে তখন আত্মবিনাশী কর্মে লিপ্ত হয় পরবিনাশ লক্ষ্যে। কথায় বলে জ্বালানো সহজ, নেভানো কঠিন।

আমাদের গাঁয়ের, গঞ্জের, শহরের, বন্দরের, মহল্লার, পাড়ার সবশ্রেণীর মানুষ যদি আমাদের আর্থিক-নৈতিক-সাংস্কৃতিক-সামাজিক ও রাজনীতিক সমস্যা-সঙ্কটের আলোকে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিজ্ঞতা-অভিজ্ঞতা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে যৌক্তিক-বৌদ্ধিক-বিবেকী মত-পথ-সিদ্ধান্ত চালিত হয়ে স্বাধিকারে স্ব স্ব দাবি আদায়ে ও চাহিদা মেটানোর চেষ্টায় থাকেন এবং যুগপৎ ও একাধারে দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন থাকেন, তা হলে তাঁরা সবাই সাক্ষর-নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত-শিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, চাকুরে, পেশাজীবী, বেকার কিংবা রাজনীতিক নেতা-কর্মী-ছাত্র-যুবা যে-কেউ সহজেই বুঝবেন যে প্রতিযোগিতা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই কাম্য প্রেরণা-প্রণোদনা-প্রবর্তনার উৎস ও ভিত্তিরূপে প্রতিযোগিতার স্পৃহামাত্রই মানবিক গুণের উন্মেষ, বিকাশ, বিস্তার ও উৎকর্ষ ঘটায়। আর আত্মপ্রত্যয়ই প্রতিযোগিতায় নামায়, আত্মসত্তার স্বাতন্ত্র্য ও শক্তি সম্বন্ধে সংশয়ী ব্যক্তিই কেবল চোরাগোপ্তা পথে আত্মবিস্তারের সুযোগ-সুবিধে সন্ধান করে। কিন্তু ওই পথে উত্থান ঘটে কেবল ধড়িবাজের, বিবেকী শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির ও ব্যক্তিত্বের নয়। ওই পথ অসততার, নীতিআদর্শ-চেতনারিক্ততার, অসম্মানের, অন্যায্যতার। তাই তাতে জিঘাংসা ও দুষ্প্রবৃত্তি, দুষ্কৃতি প্রশ্রয় পায়। বলা বাহুল্য, পথের আশ্রয় মানবিক গুণের অপকর্ষ ঘটায়, সমাজকে, মানুষকে দুষ্কর্মে প্ররোচিত করে, প্রভাবিত করে বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত দুর্জনকে। আমাদের পরামর্শ হচ্ছে রাজনীতিক দলগুলো সৎচিন্তায়, সতাদর্শে, সৎকর্মে উপচিকীর্ষায় পরস্পরের প্রতিযোগী হোক, চরদখলের লেঠেলদের মতো আচরণ বর্জন করুক। বিভিন্ন পেশাজীবী শিক্ষিত অশিক্ষিত শহুরে বা গ্রামীণ মানুষও সহিষ্ণু হোক, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব পরিহার করে স্বাধিকারে থেকে স্ব স্ব দাবি আদায়ের ও চাহিদা পূরণের আন্দোলন করুক এমনকি মস্তান-গুণ্ডা ও বেকারেরা যদি বেকারত্বের দরুন অনন্যোপায় হয়ে চাঁদাবাজির, জোর-জুলুমের, ছিনতাইয়ের, ডাকাতির পথ বেছে নিয়ে থাকে, তা হলে তারাও যেন নরহত্যার পথ পরিহার করে। কাড়াকাড়ি মারামারিতেই যেন তাদের অপকর্ম সীমিত রাখে।

আজ দেশের সর্বত্র হনন-দহন-ধর্ষণ লুণ্ঠন-ভাঙন নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, হয়েছে নিত্য জীবনযাত্রার অংশ। এখন সবাই যেন বাঁচার গরজেই মারমুখো হিংস্র। মানুষের সমাজ আজ হিংস্র শ্বাপদ সমাজের মতোই হয়ে উঠেছে। আমাদের রাজনীতিক বড় দলগুলোর মধ্যে এখন জিগীষুর প্রতিযোগিতার ভাব নেই, আছে প্রতিদ্বন্দ্বীর জিঘাংসার ক্রোধ। অথচ আমরা সবাই জানি গণতন্ত্র প্রতিযোগিতাই শেখায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্জনের হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহায়। হার-জিতকে সহজে ও সহিষ্ণুতায় গ্রহণের দীক্ষা দেয়। competition, contest & confrontation এর পার্থক্য স্মরণে রাখার পরামর্শ স্মরণ করার আবেদন জানাই আজকের জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে লড়াকুদের দেশের, রাষ্ট্রের, ব্যক্তির, সমাজের ও মানুষের কল্যাণের জন্যেই।

রজতজয়ন্তীকালে প্রাসঙ্গিক চিন্তা

উৎসবমাত্রই উৎসাহের, উদ্দীপনার, সুখের, আনন্দের, আবেগের, হুজুগের, অনিয়মের, অপ্রাত্যহিকতার, বেপরওয়া মুক্তির আপাতমধুর ভাবনাহীন অবসরের অনুভূতি-উপলব্ধির স্বাদ পাইয়ে দেয়। এর মধ্যে প্রাত্যহিকতার নিত্যকার নৈমিত্তিকতার নিয়ম নিগড় থাকে না। এ পার্বণিক, পারিবারিক, জাতিক কিংবা রাষ্ট্রিক উৎসবের উদ্যম-উদ্যোগ-আয়োজন মানুষকে বয়সানুসারে, অবস্থা ও অবস্থান অনুযায়ী মাপে-মাত্রায় লঘু-গুরুভাবে ভোগ-উপভোগ সম্ভোগের ক্ষণপ্রভাব চমক দেয়, ক্ষণিক সুখ আনন্দ জোগায়। কিন্তু আমাদের মুক্তিযুদ্ধের, স্বাধীনতা অর্জনের রজতজয়ন্তী উৎসবে যেন এক বিশেষ দলের গুণে-গৌরবে-গর্বে-আস্ফালনে-স্বীকৃতিতে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার একমুখী বিশেষ প্রয়াস-প্রযত্নের সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রকট হয়ে উঠেছে। যেন এ জাতীয় স্তরে নেই, ছদ্মাবরণে দলীয় কৃতি-কীর্তির স্মারক উৎসব হয়ে উঠেছে। যেন এ জাতীয় স্তরে নেই, ছদ্মাবরণে দলীয় কৃতি-কীর্তির স্মারক উৎসব হয়ে উঠেছে। আমাদের স্বরাষ্ট্রেরই দেড় হাজার মাইলের দূরবর্তী অঞ্চলের বিভাষী ও ভিন্ন সংস্কৃতির স্বার্থের লোকদের শাসন ও অর্থ-বিত্ত-বেসাতগত শোষণমুক্তি লক্ষ্যে আমরা দ্রোহী হয়ে মুক্তিযুদ্ধ করি, আমরা ওদের শাসন-শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনামুক্ত হই। ওদের বাঙলাদেশ থেকে বিতাড়িত ও উচ্ছেদ করে স্বাধিকারে স্বাধীন রাষ্ট্রে স্ব-প্রতিষ্ঠ হই। গোড়ায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং পরে প্রেরণার প্রণোদনার উৎস ছিলেন শেখ মুজিবই। তিনিই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যার যা আছে তাই নিয়ে এ মুক্তির ও স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানিয়েছিলেন বাঙালীদের। কাজেই মুক্তিযুদ্ধ তো জনসভাতেই ঘোষিত হয়েছিল। ২৬ শে-২৭ শে মার্চের ঘোষণা যিনিই দিন, তা তো নেতার নির্দেশেরই পুনরাবৃত্ত স্মারক মাত্র। এ নিয়ে আমাদের দলীয় কোন্দল অতি নিম্নমানের রাজনীতিক চিন্তা-চেতনা-কর্ম-আচরণের হাতাশাজনক সাক্ষ্য-প্রমাণ মাত্র। এখন মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের স্বাধীনতা অর্জনের রজতজয়ন্তী উৎসব উদযাপন পক্ষেও রোজ সকালে-দুপরে-বিকেলে-সন্ধ্যায়-রাত্রে রেডিয়ো-টিভিতে, পত্রিকায়, সভায়, ভাষণে, মেঠো বক্তৃতায়, কাগুজে রচনায় এবং মিছিলে-নারায়-জিগিরে-শ্লোগানে সর্বত্র একইরূপ পক্ষ-বিপক্ষ দলের তর্ক-বিতর্ক বাদ-প্রতিবাদ চলছে। অথচ আমরা সবাই জানি ক্ষোভ-ক্রোধ-যুদ্ধ ছিল বাঙলাদেশী অবিশেষের, কোনো একক দলের নয়। এ ছিল জনযুদ্ধ। এ আমাদের রাজনীতিক প্রজ্ঞারিক্ততা ও রাজনীতিক সংস্কৃতিশূন্যতারই পরিচায়ক মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেননা এতে-স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেমন ভালো ফল পাওয়ার জন্যে অব্যক্ত কিংবা সদা সচেতন প্রতিযোগিতা থাকে, জিঘাংসুর কিংবা কপটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না, গণতন্ত্রমনস্ক সংস্কৃতিমান রাজনীতিক দলেও তেমনি জনপ্রিয় হওয়ার প্রতিযোগিতাই বাঞ্ছনীয় জনসেবায়, কল্যাণ চেতনায় ও নীতি-আদর্শের উৎকর্ষ সাধনে, সংঘর্ষ সংঘাত প্রসূন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নয়। রাজনীতিক নেতা-নেত্রীর তেমনি থাকা চাই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, মগজে, চরিত্রে, শক্তিতে ও সাহসে শ্রেষ্ঠত্ব ও অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর লাভ-লোভ-স্বার্থ চেতনা, অর্থ-বিত্ত-বেসাত-লিপ্সা থাকতে নেই। সংকীর্ণ মন-বুদ্ধি-ঈর্ষা-ঘৃণার ঊর্ধ্বে উদারতা ও ক্ষমাশীলতা তাতে প্রত্যাশিত। জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিজ্ঞতা-অভিজ্ঞতা এবং বিবেকী বিবেচনা প্রয়োগে অতীত ও বর্তমান অবস্থার ও অবস্থানের বাস্তব তথ্যের ও সত্যের আলোকে সমস্যা-সঙ্কট সম্ভাবনা সম্বন্ধে যৌক্তিক-বৌদ্ধিক মত-মন্তব্য ও মীমাংসা দানের ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা থাকা চাই নেতার-নেত্রীর-দলের। যে-কোনো রাজনীতিক দলের অভিজ্ঞতা থাকা চাই সমাজের সামগ্রিক, সামূহিক ও সামষ্টিক সাধারণ চাহিদা সম্বন্ধে, এর কতটুকু এবং কি কি আবর্তনধর্মী এবং যুগপৎ ও একাধারে কতটুকু এবং কি কি প্রবণতা বিবর্তনমুখী। এ দুটো চাহিদাসচেতন এবং চাহিদা পূরণে কিংবা প্রবোধদানে দক্ষ দলই হয় ভোটে জয়ী। এ যে পক্ষকালব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের ও স্বাধীনতা অর্জনের গুণ-গৌরব-গর্ব নিয়ে উৎসব চলছে, তার মধ্যে যে একটা মস্ত ফাঁকির ফাঁক রয়ে যাচ্ছে, তা কি রাজনীতিক দলগুলো কিংবা শহুরে শিক্ষিতজনেরা দেখবার শুনবার বুঝবার চেষ্টা করছে? এ মুক্তিযুদ্ধে বিজয়, এ স্বাধীন রাষ্ট্র দেশের দশ কোটি নিঃস্ব-নিরন্ন-দুস্থ-দরিদ্র, অজ্ঞ-অনক্ষর-পঙ্গু-পাগল-রুগ্ন-অসমর্থ কিংবা বেকার ভিখিরীদের এ পঁচিশ বছরে কি দিয়েছে? তারা কেন স্তন্যবঞ্চিত অবোধ তৃতীয় ছাগবৎসের মতো অকারণ পুলকে-আনন্দে-চঞ্চলচিত্তে হুজুগে জয়ন্তী উৎসবে যোগ দেবে? স্বাধীন রাশিয়ায়, চীনে কেন স্বধর্মী-স্বজাতি-স্বদেশী-স্বভাষী শাসকের বিরুদ্ধে রক্তক্ষরা গণবিপ্লব ঘটেছিল? তা হলে প্রশ্ন ওঠে– এ মুক্তিযুদ্ধ কাদের জীবনে-জীবিকায় মুক্তি এনেছে? এ স্বাধীনতা কাদের কোন তাৎপর্যে স্বাধীন করেছে? এ মুক্তিযুদ্ধ, এ স্বাধীনতা কাদের জীবনে অর্থ-সম্পদ লুটের সুযোগ দিয়ে, অর্থ-বিত্ত-বেসাত জুগিয়ে, পদ-পদবী দিয়ে, মান-যশ-খ্যতি-ক্ষমতা-দর্প-দাপট প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের সুযোগ এনে দিয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সাচ্ছল্য, আনন্দ, আরাম, আয়েশ প্রভৃতির ব্যবস্থা দৃঢ় করেছে? অশনে-বসনে-নিবাসে-কর্মে শিক্ষায়-স্বাস্থ্যে-চিকিৎসায় বঞ্চিতরা এ মুক্তিযুদ্ধের, এ স্বাধীনতার কি প্রসাদ পেয়েছে? স্বধর্মীর, স্বসম্প্রদায়ের, স্বমতের, স্বদেশের, স্বজাতির শাসনে কি মানুষ স্বাধীন হয়, নিজেকে মুক্ত মনে করতে পারে? দাস, ক্রীতদাস, ভূমিদাস, গৃহভৃত্য, দিনমজুর কি স্বধর্মী, স্বভাষী, স্বদেশী, স্বজাতি প্রভুর-মনিবের দাস-বান্দা-ভৃত্য ছিল না? এ বিশ শতকের গোড়ার দিকেও আমাদের দেশে মানুষ বেচা-কেনার বাজার ছিল। ক্রীতদাসের পালাবার আশঙ্কা ছিল বলে সসাক্ষ্য লিখিত দলিলযোগে 'দাস' বেচা-কেনাও হত। তাছাড়া দহনের, হননের, লুণ্ঠনের, ধর্ষণের, ভাঙনের আর হরণের ক্ষতি তো ব্যক্তির বা পরিবারের পক্ষে ক্ষতিই, তা স্বধর্মী-স্বদেশী-স্বভাষী-স্বজাতি কিংবা জ্ঞাতি করলেই কি প্রবোধ মেলে? মার্কসীয় গণমানবতত্ত্ব বর্জন করেও, বিস্মৃত থেকেও পুঁজিবাদী সামন্ত-বুর্জোয়া দৃষ্টিতে ও বিচারে আমাদের মানতেই হবে যে পাকিস্তানী বিতাড়নে কিংবা তার আগে ব্রিটিশশাসন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিলুপ্তিতে আমাদের স্বদেশীর-স্বধর্মীর-স্বভাষীর-স্বজাতির একটি বিদ্যায়-বিত্তে-বেসাতে-পদে-পদবীতে প্রবল শ্রেণী আমাদের শাসক-শোষক-পীড়ক-বঞ্চক হয়ে আমাদের ঘাড়ে বসে চিরকেলে গতানুগতিক নীতিতে-আদর্শে ও নিয়মে। নিঃস্ব-নিরন্ন-দুস্থ-দরিদ্র-অজ্ঞ-অনক্ষর-অসহায়-অবল-অবোধ গণমানবের, আমজনতার আদি-আদিম কাল থেকেই দাস-ক্রীতদাস-ভূমিদাস-বান্দা-ভৃত্য-শাসনপাত্র রূপে প্রবলের-সর্দারের-শাস্ত্রীর-শাসকের হুকুমের, হুমকির, হুঙ্কারের, হামলার শিকার হয়েই প্রজন্মক্রমে হাজার হাজার বছর ধরে গতানুগতিক অভ্যস্ত জীবন যাপন করেছে প্রতিকারে-প্রতিবাদে-প্রতিরোধে নিরুপায় হয়ে। আমাদের প্রায় দশ কোটি গ্রামীণ বাঙালী আজো সেভাবেই আছে প্রকৃতপক্ষে রূঢ় বাস্তব জীবনে-জীবিকায়, মনে-মননেও হয়তো। কেননা ওরা আজো অদৃশ্য, স্থানিক, অলীক-অলৌকিক-লৌকিক, আসমানে-জমিনে, দিনে-রাতে বিচরণশীল অরি-মিত্র শক্তির প্রসাদে-প্রসন্নতায়-রোষে, লাভ-ক্ষতির আশায় আশঙ্কায়, ভয়ে-ভরসায়, অদৃষ্টে, বরাতের কপালে, কর্মফলে নিয়তি নিয়ন্ত্রণের অমোঘতায় আস্থা রেখেই জীবন যাপন করে। তাই তাদের জন্ম জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি সবটাই অমোঘ অদৃশ্য শক্তিনিয়ন্ত্রিত। তারা দৈবলীলার ঘুঁটিমাত্র বলেই জানে নিজেদের। তাই তৃতীয় বিশ্বের সর্বত্র স্বৈর-স্বেচ্ছাচারী লুটেরার শাসন-শোষণ-পীড়ন নির্বিঘ্নে চলে। আমাদের রাজনীতিকরা, শহুরে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা, বিদ্যা-বিত্ত-বেসাতের নিয়ন্ত্রকরা, ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিকরা এবং সবকার যদি দেশপ্রেমী মানবসেবী কল্যাণবাদী ও রাষ্ট্রের উন্নয়নকামী দুস্থ মানবদরদী হতেন, তাহলে তাঁরা দূর অতীতের দ্বিজাতি তত্ত্বের স্রষ্টা ও দাবিদার হওয়ার, ভাষা সংগ্রামের, শিক্ষানীতি বাতিলের, উনসত্তরের অভ্যুত্থানের, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ও স্বাধীনতা অর্জনের, নব্বই-এর সার্থক আন্দোলনের গৌরব-গর্বের কৃতি-কীর্তির আস্ফালনের সার্বক্ষণিক সগর্ব উচ্চারণে তৃপ্ত, তুষ্ট, হৃষ্ট ও পুষ্ট থাকতেন না। কৃতী-কীর্তিমান পূর্বপুরুষের খ্যাতির ও গুণের গৌরব-গর্বকে পুঁজি করে আস্ফালনের মধ্যে নিজেদের অযোগ্যতার, ধনে-মনে কাঙালপনার লজ্জা ও হীনম্মন্যতা ঢাকে উত্তরকালের দুস্থ-দরিদ্র-অযোগ্য-অবিদ্বান বংশধরেরা। আত্মপ্রত্যয়ী শক্তিমান যোগ্যরা স্বনামেই চলে, পূর্বপুরুষের গৌরব-গর্ব উচ্চারণে প্রচার করতে তাদের আত্মসম্মানে বাধে, কাজেই নিজেরা কিছুই না করে অনিচ্ছায় আকস্মিক মৃত্যুর শিকার সালাম-রফিক-জব্বার-বরকত-নূর হোসেন-মতিউর রহমান প্রমুখের আত্মত্যাগে গর্বিত শহুরে ছদ্ম দেশপ্রেমিকের অন্তত মনে মনে লজ্জিত হওয়া আত্মশোধনের গরজে বাঞ্ছনীয় বলেই মনে করি।

পাকিস্তানী বিতাড়নে আমাদের প্রাথমিক দায়িত্বের ও কর্তব্যের সমাপ্তি ঘটেছে। গণমানব মুক্তির সংগ্রাম আমরা এ পঁচিশ কিংবা ১৯৪৭ সন থেকে ধরলে এ উনপঞ্চাশ বছর ধরে অবহেলা করে আসছি। আমরা ভাষা-সংগ্রামের গৌরব-গর্ব করি, অথচ গণমানবকে সাক্ষর করে সে-লিখিত মাতৃভাষায় সার্বজনীন অধিকার দানের চেষ্টা কি আমরা কেউ করেছি? অবশ্য সরকার এ ক্ষেত্রে সরকারী নীতিরূপেই ছদ্ম আশা-ভরসা দিয়েছে, কাজ করেনি। এখনো বাধ্যতামূলক সাক্ষরতার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণে সবাইকে বাধ্য করা গেছে? আর গণআন্দোলনে গণতন্ত্র চালুই বা হয়েছে কাদের স্বার্থে? উপকৃত কারা? নির্বিশেষ জনগণের ডালভাতের তথা অনাহার কিংবা ভিক্ষাবৃত্তি বিলুপ্তির কোনো ব্যবস্থা হয়েছে কি? সমাজ ব্যবস্থার, ভূমিমালিকানার পরিবর্তনের আন্দোলন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামন্ত-বুর্জোয়া মনের লোকেরা করবে কি? কাজেই দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণা করা অনেক আগেই বাঞ্ছনীয় ছিল। গণমানুষের খেয়ে-পরে নয় কেবল, তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা পেয়ে অকালে অনাহারে অচিকিৎসায় মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্মগত অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম করা প্রত্যেক শিক্ষিত শহুরে বিদ্যা-বিত্ত-বেসাত-শাসন-প্রশাসন-সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ন্তা ও নিয়ন্ত্রক ব্যক্তি ও শ্রেণী মাত্রেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। পাগল-পঙ্গু-শিশু-বৃদ্ধ-রুগ্নদের ভাতা দিয়ে এবং সমর্থদের কাজ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের তথা সরকারের। স্বদেশী-স্বজাতি-স্বধর্মী-স্বভাষী কিংবা বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মীর শাসন এ যুগে বড় সমস্যা নয়। এ কারণেই আজকাল বাঙলাদেশীরা পৃথিবীর সব মহাদেশেই নাগরিকত্ব নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করছে। এ কালে বঞ্চক-বঞ্চিতের, শোষক-শোষিতের, পীড়ক-পীড়িতের সমস্যাই রয়েছে সব মানবিক সমস্যা-সঙ্কটের, বিরোধ-বিবাদের, সংঘর্ষ-সংঘাতের, দ্বেষ-দ্বন্দ্বের, দাঙ্গা-লড়াইয়ের মূলে।

এ শতক, দ্বিতীয়ার্ধ বিশেষভাবে গোটা পৃথিবীতে মানুষের জন্যে মুক্তির আশার-আশ্বাসের বাণী বয়ে এনেছে। রাজনীতিক মুক্তি, ভূমিদখলের দৌরাত্ম্য মুক্তি তথা পররাজ্য গ্রাস বিলুপ্তি ঘটিয়েছে এ শতকই। আশা করি, আসন্ন একবিংশ শতাব্দী মানুষকে দৃশ্য-অদৃশ্য, স্থানিক, লৌকিক-অলৌকিক, অলীক আসমানে-জমিনে প্রসৃত অরি-মিত্র শক্তির কবলমুক্ত করবে। আপাতত আমাদের জড়বুদ্ধি ভুঁইফোঁড় সমাজে ও রাষ্ট্রে ব্যক্তি জীবনে সত্তার মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য, সামাজিক জীবনে বান্দা-মনিব সম্পর্ক নয়, নাগরিকের সাম্য ও স্বাধীনতা মানসিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সম্পূর্ণ আক্ষরিক অর্থেই সেক্যুলার তথা অদৃশ্যে বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণামুক্তি, প্রগতিশীল মর্ত্যাদর্শ নীতি-নিয়ম গ্রহণ-বরণ, আর্থিক জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনে সম সুযোগ-সুবিধে-সুবিচার দান এবং রাষ্ট্রিক জীবনে অধিকার ও দায়িত্ব চেতনা দান লক্ষ্যেই আমাদের দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু ও চালু রাখতে হবে।

রজতজয়ন্তী কেন?

শহরে শহরে মুক্তিযুদ্ধে জয়ের ও স্বাধীনতা অর্জনের পঁচিশ বছরপূর্তি উপলক্ষে মহা ধুমধামে, মনমাতানো জাঁকজমকে মহোৎসব চলছে দিনে রাতে রজতজয়ন্তী উদযাপনের পার্বণিক আয়োজনে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে। জাতির জীবনে এ অবশ্যই গুণে-গৌরবে-গর্বে-কৃতি-কীর্তির অনুভবে, স্বাধীনসত্তার উপলব্ধিতে সানন্দ স্মরণীয় দিন বা বছর। তাই সব শ্রেণীর লোকই সগর্ব চাঞ্চল্যে এ উৎসবে, নাটক অভিনয়ে, স্মৃতি-স্মরণ সভার ব্যবস্থায়, চিত্র প্রদর্শনীর উদ্যোগে, শহরের সড়কপথে মঞ্চ তৈরির অনেকতায় দেশের আলো-বাতাসে এ উৎসবের, জাতীয় গৌরবানুভূতির আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে। শিশু-কিশোর-তরুণ মনে কিশোরী-তরুণীর অনুভবে একটা হুজুগে কৌতূহল ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিত্তচাঞ্চল্য যেন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। উদ্দীপিত উচ্চকণ্ঠের ভাষণে, জাতীয় কৃতি-কীর্তির বয়ানের গর্বিত উচ্চারণে ভাষণ-বক্তৃতার মঞ্চগুলো শুধু মুখরিত নয়, তার সঙ্গে নাচের, গানের, বাজনার, আবৃত্তির এবং অভিনয়ের ব্যবস্থা থাকায় সব মঞ্চগুলো দর্শক-শ্রোতার ভীড়ে চোখধাঁধানো চমক সৃষ্টি করেছে।

এ উৎসবে মুক্তিযুদ্ধের ও স্বাধীনতা অর্জনের প্রেরণা-প্রণোদনা-প্রবর্তনা দাতা মহানায়কের কৃতি-কীর্তির আলোচনাই হচ্ছে বেশি। ইতিহাসে তাঁকে যথাস্থানে ও যথাসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস-প্রযত্ন প্রচারও চলছে সর্বত্র যুগপৎ ও একাধারে। অবশ্য ক্ষীণকণ্ঠের বিরোধী দলও এ বিষয়ে প্রতিবাদে-প্রতিরোধে এবং পাল্টা তথ্য বয়ানে মুখর। তবে শ্রোতার অভাব। মানুষ স্বভাবেই সুযোগসন্ধানী সুবিধেবাদী নগদজীবী এবং কৃপা-করুণাকামী চাটুকার তোষামুদে। সরকারী দলের সমর্থক এখন শতে আশিজন। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা স্তবে-স্তুতিতে-চাটুকারিতায়-তারিফে চিরকালই পটু। তারা আরো একটা গুণে মাত্রাতিরিক্তভাবেই ঋদ্ধ; তা হচ্ছে তারা হাওয়া বোঝে, মৌসুম চেনে। কাজেই তারা বাস্তবে আর্তবজীবনে যেমন যথাপ্রয়োজনে সাড়া দেয়, তেমনি দল-মতের প্রাবল্য-প্রাধান্য অনুসারেই বোল পাল্টায়, ভোল বদলায়, রঙ মাখে, সঙ সাজে এবং জ্ঞাত-অজ্ঞাত বিষয় ও ব্যক্তি অবিশেষে কেবল 'গুণ ধর দোষ হর' নীতির আনুগত্যে সত্য-মিথ্যা বয়ানে মুখর, কৃপা-দাক্ষিণ্য প্রাপ্তি প্রবল বা সরকারী পক্ষের কেবল বানানো-মনগলানো প্রশংসা-তারিফ বয়ান করতে থাকে, জানা গুরুতর দোষও উল্লেখ করে না, আর কৃপাপ্রাপ্তি লোভে প্রবলের, মুরুব্বীর তথা সরকারের শত্রুদের গুণাবলী গোপন করে কেবলই দোষের, অপকর্ম-অপরাধের ফিরিস্তি দিতে থাকে। তাতে নগদ পুরস্কার জোটে-চাকরির, পদকের, পদের ও পদবীর আকারে। আর্তব পরিবর্তমান আবহাওয়ায় প্রাণীর জীবন যেমন নিয়ন্ত্রিত, তেমনি রাজনীতিক মৌসুমের ও শক্তির প্রভাবে আমাদের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই মত বদলায় নিন্দিত হওয়ার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও। কারণ তারা জানে ঘৃণা-লজ্জা-ভয় থাকলে জীবনে কোনো বাঞ্ছাই পূরণ হয় না। তদবীরেই তক্‌দীর বদলাতে হয়। এ ক্ষেত্রে বেহায়া-বেশরম-বেলেহাজ এমনকি প্রয়োজনে বেল্লিকও হতে হয়। ধড়িবাজ ছাড়া সাধারণত ক্বচিৎ কেউ কৃতি-কীর্তিতে, গুণে-গৌরবে মাননীয়-শ্রদ্ধেয় ও স্মরণীয় হয় সমাজে। বিশেষত উমর খৈয়ামী নীতিরও একটা যৌক্তিকতা আমরা স্বীকার করি। কারণ যখন কেউ পদে-পদবীতে স্থিত থাকেন, তখন তাঁর স্বভাব-চরিত্র মন্দ হলেও তিনি চাটুকারদের স্তবে স্তুতিতে কেবলই নন্দিত থাকেন। মানে-যশে-খ্যাতিতে-ক্ষমতায় নক্ষত্রবৎ উজ্জ্বল ও অনন্য হয়ে সমাজে সমাদৃত থাকেন। কাজেই 'নগদ যা পাও/ হাত পেতে নাও/ বাকির খাতায় শূন্য থাক।'

এ কারণেই যদিও ক্বচিৎ কেউ জনান্তিকে বলছে যে এ রজতজয়ন্তীর পক্ষকালব্যাপী উৎসবের আবরণে একটি দলের, একজন মহান নেতার অবদানের স্বীকৃতির এবং সে-সূত্রে একটি পরিবারের কৃতি-কীর্তিতে প্রতিষ্ঠার ন্যায্য দাবি জাতীয়ভাবে গ্রাহ্য করার প্রয়াস-প্রযত্ন চলছে যুগপৎ ও একাধারে। কিন্তু অন্যসব হুজুগে আমজনতার চোখে এ এক অতি সময়োপযোগী মুক্তিযুদ্ধচেতনার পুনঃসঞ্চারণ প্রয়াস গোটা দেশের মানুষের চিত্তলোকে বয়স নির্বিশেষে। কেননা আমাদের সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধ জয়ে এক ধাপ এগিয়েছে মাত্র। আমাদের লক্ষ্য মানবমুক্তি। চির শাসিত-শোষিত-পীড়িত দাস-ক্রীতদাস-ভূমিদাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃস্ব-নিরন্ন-দুস্থ-দরিদ্র মানবতার মুক্তি এখনো সুদূরে। তাদের শাসন-শোষণ-পীড়ন মুক্ত করা, দাস-মজুর-ভৃত্য অবস্থান থেকে মুক্ত করা, ব্যক্তিসত্তার মূল্য-মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত করানো, অশনে-বসনে-নিবাসে শিক্ষায়-স্বাস্থ্যে-চিকিৎসায় মানুষমাত্রেরই যোগ্যতা ও সামর্থ্য নির্বিশেষে যে জন্মগত অধিকার তা স্বীকার করিয়ে নেয়া ও বাস্তবে আক্ষরিকভাবে সে অধিকার আদায় করিয়ে নেয়া প্রভৃতির জন্যে যে-সংগ্রাম, যে-মুক্তিযুদ্ধ অনেক আগেই শুরু করা বাঞ্ছনীয় ছিল, তা এ রজতজয়ন্তী উৎসবে আমজনতাকে জানানো, বোঝানো ও মানানো উচিত ছিল, তা কিন্তু করা হচ্ছে না, হল না। দেশে প্রেমী, সেবী, দরদী মানবিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তির, ব্যক্তিত্বের ও নীতিআদর্শ-নিষ্ঠ চরিত্রবান মানুষের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। মগজী আত্মপ্রত্যয়ী শক্তিমান সাহসী ব্যক্তির নেতৃত্বে গণমানবদরদী, আমজনতার কল্যাণকামী মানুষের একটা সেক্যুলার রাজনীতিক দল ও সেক্যুলার সরকার আবশ্যিক ও জরুরী নির্বিশেষ মানুষের হিতার্থে ও রাষ্ট্রের উন্নতির জন্যে।

দুর্নীতি বিলুপ্তি পন্থা

AMARBOI.COM

সবাই স্বীকার করে যে দেশের সর্বত্র সব পেশায়, সব অফিসে-আদালতে-সংস্থায়-প্রতিষ্ঠানে, শাসনে-প্রশাসনে, বিদ্যালয়ে দুর্নীতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়েছে, ছড়িয়ে পড়েছে ক্যানসারের মতো, আইন-শৃঙ্খলার প্রয়োগ-প্রভাব-শক্তি অদৃশ্য হয়ে গেছে, ধস নেমেছে এইডস রোগের মতোই প্রতিকারহীন ভাবে। জালে-ভেজালে-ঘুষে-প্রবঞ্চনায়-প্রতারণায় সত্যের বিকৃতিতে, মিথ্যার বেসাতে গাঁগঞ্জ শহর-বন্দর কুয়াশার মতো আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আশার আলো, আশ্বাসের ভরসা মিলছে না কোথাও বাস্তবে। কেবল সরকারী উচ্চারণে ও রাজনীতিক চালেই সীমিত হয়ে পড়েছে আশার ও আশ্বাসের বাণী। দুনিয়ার তাবৎ মহৎ কথা, আপ্তবাক্য, সুভাষণ, নীতি-আদর্শের মহিমা, মুদ্রিত রয়েছে গ্রন্থে ও পত্র-পত্রিকায়। আর অন্যত্র চলছে ‘ফেল কড়ি মাখ তেল’ নীতি, এখানে ন্যায়-অন্যায় কৃপা-করুণা দয়া-দাক্ষিণ্য, মানবিকতা, মানবতা, ন্যায্যতা পাপ-নিন্দা-শাস্তি ভীতি অনস্তিত্বে বিলীন-বিলুপ্ত হয়ে গেছে অনেক আগে থেকেই। তাই কারো অন্যায়কারীর প্রতি ভয় আছে, ঘৃণা নেই, অন্যায়ের প্রতিও নেই অবজ্ঞা বরং চালু ও কেজো নীতি-নিয়ম হিসেবে আছে সাধারণের আকর্ষণ ও আসক্তি। কথায় বলে দারিদ্র্য দোষ ব্যক্তির সব মানবিক গুণ নষ্ট করে। সমাজও হয় সামগ্রিক, সামূহিক ও সামষ্টিক ভাবে অবক্ষয়গ্রস্ত। এমনি অবস্থায় ও অবস্থানে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন-জীবিকার নিত্যকার প্রয়োজনে, নিজের বাঁচার ও পোষ্যদের বাঁচানোর গরজে কালোজীবনের, কালোবাজারের ও কালোজগতের দুর্লঙ্ঘ্য আঁধার গলিতে বিচরণ করে ঘৃণা-লজ্জা-ভয় পরিহার করেই জীবনের ঐহিক-পারত্রিক ঝুঁকি নিয়েই। এ কালোজীবনে ও কালোজগতে সবাই লাভে-লোভে-স্বার্থে নগদজীবী হয়, বর্তমান মুহূর্তকে সত্য ও সার বলে মানে। তাই সবারই এ কালোজীবনে ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালোজীবিকাক্ষেত্রে লেনদেনের বেচা-কেনার নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি হয় অভিন্ন। এখানে হনন-দহন-লুণ্ঠন-বঞ্চনা-শঠতা-কপটতা-নিষ্ঠুরতা-নির্মমতা-অমানবিকতাই প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় প্রযোজ্য। আমাদের সরকারগুলো দুর্নীতি দমনে চিরকালই তৎপর। কিন্তু নানা কারণে সাফল্য আসেনি কখনো। তার কারণ বাস্তবে 'বেড়াই ক্ষেত খায় এবং সর্ষের মধ্যেই থাকে ভূত।' এর জন্যে এখন নানা জনে অমবুজম্যান (ombudsman) পদের-পদবীর একজন মান্যগণ্য সজ্জন সুজন বিদ্বান বুদ্ধিমান নীতিআদর্শনিষ্ঠ 'ন্যায়পাল' নিয়োগের কথা বলছেন। কিন্তু আমাদের অজ্ঞ-অনক্ষর-মস্তান-গুণ্ডা-খুনী ও নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্রবহুল দেশে তেমন আত্মপ্রত্যয়ী নিডর-নির্ভীক অকুতোভয় মৃত্যুর ও পরিবারের জান-মাল-গর্দানে হামলার ঝুঁকি নেয়ার লোক মিলবে বলে মনে হয় না। যিনি দৃঢ়ভাবে আদর্শচেতনা বশে বিশ্বাস করেন যে 'One must speak out and suffer' নীতিই হচ্ছে নীতি-আদর্শ নিষ্ঠ, চরিত্রবান মানুষের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, তেমন ব্যক্তিই কেবল ন্যায়পালের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সমর্থ। সে মানুষ কোটিতে গুটিক মেলে।

তাই আমাদের মতে ন্যায়পাল নিয়োগে দুর্নীতিতে আমাদের আগা-পাছতলা বিক্ষত সমাজ-ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রশাসনকে পচনমুক্ত করার ও রাখার জন্যে-নজরদারির, খবরদারির ও তদারকির জন্যে সর্বত্র সুষ্ঠু গোয়েন্দা ব্যবস্থাই আবশ্যিক ও জরুরী। দায়িত্ব ও কর্তব্যপরায়ণ আর পদোন্নতিকামী সূক্ষ্মবুদ্ধির ধূর্ত গোয়েন্দার দৃষ্টি এড়ানো সহজে সম্ভব নয়। সরকার যদি সমাজকে মানবিক গুণের প্রসারে উন্নীত ও উন্নত করতে চান, তা হলে ব্যয়বহুল হলেও সাধারণ পুলিশের চেয়ে গোয়েন্দা পুলিশের উপর বেশি নির্ভর করলে বাঞ্ছিত সুফল পাবেন। 'বসের' বা ধনীর কিংবা মাস্তানের হুমকির প্রভাব থেকে এবং অর্থের প্রলোভন থেকে গোয়েন্দাদের মুক্ত রাখতে হলে একই বিষয়ক গোয়েন্দার প্রতিবেদন (ক) দুর্নীতিদমন বিভাগে (খ) গোয়েন্দা বিভাগে (গ) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আর (ঘ) সুপ্রীম কোর্টে জমা দেয়া আবশ্যিক ও জরুরী হবে। তা হলে অদ্যাবধি জালিয়াত-জোচ্চোর-ভেজালদার-চোরাকারবারী-ঘুষখোর এতোগুলো অফিসে তদবীর করে তকদীর ফেরাতে পারবে না। ফলে অদৃশ্য-অপরিচিত গোয়েন্দাকে বড়-ছোট-মাঝারী চাকুরে, ব্যবসায়ী-কারখানাদার-চোরাকারবারী এমনকি পার্ষদ-পরিষদ-চেয়ারম্যান-সাংসদ-মন্ত্রী অবধি সবাই থাকবেন সদা সতর্ক নাগরিক এবং দুর্নীতি আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে থাকবেন ভীত বিমুখ। শুধু প্রতীচ্যের কোনো কোনো রাষ্ট্রের সরকার নয়, প্রতিবেশী ভারতসরকারও এখন মতলববাজ-দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীর-মন্ত্রীর-প্রদেশপালের 'যম' হয়ে উঠেছে। আজ ভারত রাষ্ট্রের নামী-দামী লোকেরা চোরা-গোপ্তা নানা অপকর্মের দরুন অপরাধী ও হাজতবাসী এবং অন্যরা ধরা পড়ার ভয়ে ভীত, ত্রাসে ত্রস্ত। আমাদেরও তেমনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নইলে দেশ-রাষ্ট্র-দফতর-দোকান-বাজার-রাস্তা-ঘাট দুর্নীতিমুক্ত হবে না। মাস্তান-গুণ্ডা-খুনী-রাহাজানের বিলুপ্তিও ঘটবে এ ব্যবস্থায়। তখন গাঁয়ে-গঞ্জে-নগরে-বন্দরে-পাড়ায়-মহল্লায় স্বাভাবিক জীবন যাপনের সুযোগ পেয়ে স্বস্থ হবে, স্বস্তি পাবে। সমাজ সামগ্রিক, সামূহিক ও সামষ্টিকভাবে স্বাস্থ্য প্রত্যাশিত মাত্রায় ফিরে পাবে। স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে হলে-হোস্টেলে কোনো ছাত্র-ছাত্রী সংসদ সমিতির প্রয়োজন নেই রাজনীতিক শাসন-প্রশাসনে দীক্ষা কিংবা প্রশিক্ষণ দানের লক্ষ্যে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রিটিশ আমলে এ ছিল শাসক ও সৈনিক (V.O.T.C) বানানোর ছদ্ম খেলা– মনজোগানো চোখধাঁধানো খেল এবং রাজনীতিক দলগুলোর অঙ্গদল বা উপদল রূপে সংগঠিত ছাত্রযুবা দলগুলোও বিলুপ্ত করা দরকার রাষ্ট্রের মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে, দেশের আইন-শৃঙ্খলার সুষ্ঠু প্রবর্তন ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে। কাজেই অম্বুডজম্যান নয়, আমাদের দরকার গেস্টাপো-সাবাক শ্রেণীর গোয়েন্দা।

তবে একথাও স্বীকার করতেই হবে যে অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়, বাঁচার গরজে করা কর্ম-অপকর্ম-অপরাধ অপ্রতিরোধ্য। আমাদের অধিকাংশ মানুষের জীবিকা ও আর্থিক জীবন 'নলিনীদলগত জলবৎ' অর্থাৎ পদ্ম-কচুপাতাস্থ পানির মতো অস্থির-অস্থিত ও অনিশ্চিত। এ অবস্থায় অর্থাৎ জীবিকার অনিশ্চিতি ও বেকারত্ব মানুষকে দুর্নীতিবাজ, ধূর্ত, বেপরওয়া, ধড়িবাজ করে দেয়, মানুষ নীতি-আদর্শ-চরিত্র হারায়। নিষ্ঠুর-নির্মম-অবিবেকী শ্বাপদসম প্রাণী হয়ে যায়। মানুষকে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার মতো কাজ পাইয়ে দেয়া, আর্থিক জীবনে নিশ্চিতি দেয়া সরকারেরই প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। শিশ্নোদরের অব্যবস্থা মানুষকে জন্তু করে রাখে।

AMARBOI.COM

মানী হওয়ার পন্থা

ক্ষমতায় রাজা, ধনে সওদাগর। ধন ও ক্ষমতা পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক। তাই রাজার পরই সওদাগরের স্থান কার্যত। কিন্তু বাহ্যত সওদাগর বিক্রেতা আর নির্বিশেষ জনগণ হল ক্রেতা। বাজারে পণ্যের ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে চলে দরকষাকষি। কেননা কেউ লোকসানের ঝুঁকি নিতে চায় না, ঠকতে চায় না কেউ। সওদাগর করে লাভের ব্যবসা, ক্রেতার তুষ্টি সস্তায় ক্রয়ে। কাজেই পণ্যের ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক-সম্বন্ধ বন্ধুত্বের নয়, আন্তরিক প্রীতিরও নয়, ব্যবসায়িক পরিচিতির ও সৌজন্যের।

য়ুরোপীয় কোম্পানীদের সহকারী-সহযোগী নায়েব-দেওয়ান-গোমস্তা-ফড়ে-দালালরূপে ষোল শতক থেকেই দেশী লোকেরা আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শরিক হয়। ক্রমে ব্রিটিশ কোম্পানী অধিকৃত সুবেহ বাঙ্গালায় কোলকাতা বন্দরে ও রাজধানী শহরে ইংরেজ কোম্পানীর সহযোগী, সহকারী, প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে কিছু বাঙালী বর্ণহিন্দু সওদাগরের উদ্ভব ঘটে। তারা তখন ধনে-মানে-বিলাসে-ব্যাসনে উন্নতির তুঙ্গে উঠেছিল। ইংরেজ কোম্পানী এমনি প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাদের স্বার্থ বিরোধী জেনেই সুকৌশলে গভর্নর জেনারেল ওয়ানের হেসটিংসের ও কর্ণওয়ালিসের মাধ্যমে বাঙালী ব্যবসায়ীদের বোঝাল যে সওদাগরিতে ধন মেলে, মান মেলে না। লোকে সওদাগরকে সবিনয় সালামে সম্মানিত করে না। পক্ষান্তরে জমিদারীতে সওদাগরের মতো অঢেল-অজস্র দাঁওমারা আয় নেই বটে, কিন্তু যেহেতু রায়ত মাত্রই ভূমিদাস, সেহেতু জমিদারীতেই মিলবে রাজসম্মান। মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্প-দাপট-প্রভাব-প্রতিপত্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবই অর্জিত ও আয়ত্ত হয় জমিদার হলে। এ ভুঁইফোঁড় ধনিক-বণিকদের তুর্কী-মুঘল আমলের জমিদার জায়গীরদারদের দর্প-দাপটের অশেষ অবাধ ক্ষমতা প্রয়োগের কাহিনীও শোনা ছিল অনেক, কাজেই তারা সূর্যাস্ত আইনে নিলামে বিক্রিত জমিদারী এবং দশসালা বন্দোবস্তে আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বিলিকৃত জমি ধনে জমিদার বনে দর্প-দাপটের রাজা হয়ে কৃতার্থ ও ধন্য হল। ইংরেজ কোম্পানী বিনা প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পূর্বের মতোই আন্তর্জাতিক পণ্যের আমদানী-রফতানীর মালিক হল। বেতনভুক নায়েব-দেওয়ান-গোমস্তা-ফড়ে-দালাল-সেবন্দী পূর্ববৎ দেশী লোকেরাই রইল ঠক-ঠিকেদার মধ্যস্বত্ব ভোগী রূপে। অবশ্য কিছু কিছু সওদাগর উনিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি ছিল। ১৮৬০ সনে ভিক্টোরিয়া ওয়াহাবী-সিপাহী বিপ্লব দমনান্তে সরাসরি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং কোম্পানী কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা নিষিদ্ধ করে দেন। ফলে চাকুরেদের নায়েব দেওয়ান-মুৎসুদ্দি-ফড়ে-দালাল-সেবন্দী সবাই হয়ে গেল মুরুব্বীহীন বেকার। তাছাড়া তখন ব্রিটিশ অধিকারের ভারতীয় ব্যবসায়ীরা কোলকাতায় ব্যবসা শুরু করে। বাঙালীর হাত ছাড়া হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। ব্রিটিশ কোম্পানী আমলের ও ভিক্টোরিয়া আদির ব্রিটিশ শাসনের অবসানে আমাদের দেশে চিরস্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা বিলুপ্ত হল। জমিদার ও জমিদারী হল নিশ্চিহ্ন। ফলে ধনিক-বণিক বলতে এখন অর্থ-সম্পদ নিয়ন্ত্রক ব্যবসাদার-কারখানাদার– বনজ, জলজ, খনিজ, কলজ, ভূমিজ পণ্য উৎপাদক ও নির্মাতারাই রয়েছেন। তাঁরা অর্থ-সম্পদের মালিক হন, ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ তাঁদের আয়ত্তে। কিন্তু নিজেদের চাকুরে শ্রমিক-কর্মচারী ছাড়া কারো সালাম পান না তাঁরা। সম্মান-মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্প-দাপট-প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করতে হলে তাঁদের অজস্র অর্থব্যয়ে স্কুল-কলেজ-সেতু-চিকিৎসালয়-সেবাসদন প্রতিষ্ঠা করতে হয় কিংবা অঢেল অর্থ ব্যয়ে রাজনীতিক দলের মনোনয়ন নিয়ে পর্ষদে-পরিষদে-সংসদে অথবা কোনো প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানে সঙ্ঘে-সংস্থায়-সমিতিতে সদস্যপদ-পদবী জোগাড় করে সমাজে কেউকেটা থেকে গণ্য-মান্য-বিশ্রুতকৃতি সম্মানিত ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। বড় ও বিখ্যাত হওয়ার পন্থা, বিত্তে-বেসাতে-খ্যাতিতে-ক্ষমতায়-পদে-পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এ উপায় আজকাল অবসেনানী, অবআমলা, সওদাগর-ঠিকেদার-কারখানাদার প্রমুখ সব উচ্চাশী শিক্ষিত লোকই গ্রহণ করেন। ব্যয়ে রাজি হলে অর্থে কিনা হয়? উপরে ঈশ্বরের লীলায় এবং জমিনে টাকার খেলায় দুনিয়াদারীতে এ দুটোতে ছাড়া ভয়-ভক্তি-ভরসার কি আছে কোথায়! দুনিয়া থেকে রাজা-রাজ্য বিলুপ্ত হওয়ায় রাষ্ট্রে এঁদেরই প্রতিযোগিতার-প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াই চলছে, চলবে। এবং তা কখনো প্রাণহরা-রক্তক্ষরা, কখনো বা শাঠ্য-কাপট্য-প্রতারণা-প্রবঞ্চনারূপে প্রকট হয়ে ওঠে মাত্র। জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস প্রভৃতির প্রভেদজাত সংখ্যালঘুতাই ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের স্বাধিকারে সুস্থ থাকার বড় বাধা, পীড়ন-শোষণ-বঞ্চনারও কারণ মুখ্যত এ-ই। ফলে রাজার রাজ্যে ও শ্রেণীশাসিত রাষ্ট্রে পার্থক্য ঘটেছে বাহ্যত, কার্যত নয়। বিদ্যায়-বিত্তে সবকিছু অর্জিত হয় না বাস্তবে। অভিজ্ঞতার সঞ্চয় প্রয়োগে বলা যায় উচ্চাশীর জীবনে সিদ্ধি সম্ভব হয়, সে ব্যক্তি যদি সদাসতর্ক সযত্ন সুবিধেবাদী সুযোগসন্ধানী নগদপ্রাপ্তিজীবী ছল-চাতুরী-চাটুকারিতায় পটু ধূর্ত হয়। এমনি ব্যক্তি নন্দিত হয় না বটে, কিন্তু নিন্দিত হয়েও জীবনে সফল ও সার্থক হয় বাঞ্ছিত ফল পেয়ে। একালে মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে নীতি-আদর্শের কিংবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবেকী আনুগত্যের নিদর্শন কুচিৎ মেলে। কাজেই এখন চাওয়া ও পাওয়া অর্থব্যয়ে, পেশীপ্রয়োগে, ছল-চাতুরী যোগেই সম্ভব। মান্যপন্থা। বাস্তবে ধড়িবাজ না হলে অর্থে-বিত্তে-বেসাতে-পদে-পদবীতে প্রতিষ্ঠিত ও মানী হওয়া যায় না, অবশ্য এ লোক শ্রদ্ধেয় হয় না কখনো। প্রাজন্মক্রমিক প্রভু নেই, রাজা নেই, দাস-ক্রীতদাস ভূমিদাস নেই, ঘরানা পেশা নেই, প্রাজন্মক্রমিক বিশ্বাসে-সংস্কারের ধারণায়ও চিড় ধরেছে, তাই শাস্ত্রিক, সামাজিক, গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক আনুগত্য ও ঐক্য নেই। বিজ্ঞানের বদৌলত যন্ত্রের প্রসারে ও প্রসাদে জীবন-জীবিকা হয়েছে বিচিত্র ও বিবিধ আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা শঙ্কুল এ অবস্থায় মানুষ বেহায়া, বেশরম, বেপরওয়া, বেদানাই, বেদরদ, বেলেহাজ, বেআদব, বেল্লিক হয়ে খেয়ে পরে বেঁচে বর্তে থাকার কঠিন সংগ্রামে নেমেছে। জয়ী ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে হচ্ছে ধন্য, তৃপ্ত, তুষ্ট ও হৃষ্ট, হারমানা দুর্বল-দুস্থ-দরিদ্র-নিঃস্ব-নিরন্ন মানুষ দলিত মথিত বঞ্চিত প্রতারিত হয়ে অকালে অসময়ে অস্থানে পড়ে মরে জীবন যন্ত্রণা মুক্ত হয়। আজকের মানবজীবন এমনিই। আগেও অবশ্য শোষকে-শোষিতে, শাসকে-শাসিতে, বঞ্চক-বঞ্চিতে, পীড়ক-পীড়িতে, বাদী সম্প্রদায়ে, গোষ্ঠীক-গৌত্রিক দ্বন্দ্বে, ধূর্তে-সরলে, দুর্বলে-প্রবলে, ধনীতে-নির্ধনে বিভক্ত ছিল সমাজ। কিন্তু দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত-অর্থ, সম্পদ অর্জনে উচ্চাশীর প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা এমন তীব্র ছিল না। দিন দিন শ্রেণী-জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাস স্বাতন্ত্র্যচেতনা আর্থিক অসঙ্গতির কারণে বাড়ছে। আবার শহুরে শিক্ষিত ধনী-মানী ও দেশ-বিদেশঘোরা লোকের সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিতে সমাজে তেমনি কমছে ভেদবুদ্ধি ও শ্রেণীচেতনা।

AMARBOI.COM

হাওয়াই মত-মন্তব্য-সিদ্ধান্ত

যেহেতু 'ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ' সেহেতু বাহ্যত সহ ও সমমতের ও রুচির লোকের অভাব না থাকলেও গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় লঘু-গুরু স্তরের হতেই পারে। কোনো দু'জনের কোনো মত, মন্তব্য ও সিদ্ধান্তই তাই অভিন্ন হয় না– তারতম্য থেকেই যায়। তা ছাড়া মন-মতলবের, লাভ-লোভ-স্বার্থেরও সচেতন কিংবা অবচেতন পার্থক্যও থাকে।

আমরা সবাই জানি ও স্বীকার করি যে আমাদের দেশ তথা দেশের মানুষ অর্থ-সম্পদে দরিদ্র। আমরা সবাই মানি যে বাণিজ্যে, নির্মাণে, জলজ, বনজ, কৃষিজ ও খনিজ সম্পদের উৎপাদনের, উত্তোলনের ও পণ্য রূপে বিনিময়ে বিক্রয়েই আমাদের সম্পদ বৃদ্ধি সম্ভব। আমরা শুনি যে সাক্ষরতা ও উচ্চ শিক্ষাই জাতীয় উন্নতির ভিত্তি এবং গণমানবের জীবিকা ক্ষেত্রে দক্ষতা ও মগজী উদ্ভাবন শক্তিই দৈশিক-রাষ্ট্রিক উন্নতির উৎস। আমরা এ আপ্তবাক্যও চিরকাল শুনে আসছি যে, মন-মগজ-মনন-শ্রম-সময় নিষ্ঠার সঙ্গে প্রয়োগের অঙ্গীকারে বাণিজ্যে কিংবা উৎপাদনে নির্মাণে পুঁজি বিনিয়োগ করলে পণ্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়। বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও পণ্য বাজারে গণআস্থা অর্জন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। একটা দেশের মানুষের জাতির, জনগোষ্ঠীর, রাষ্ট্রের নাগরিকের চেতনায় যে পরিমাণ নীতি আদর্শবোধ থাকলে, সততা থাকলে, শিক্ষা-সংস্কৃতি থাকলে, দেশপ্রেম ও মানব-সেবার প্রবণতা থাকলে অধিকাংশ ব্যক্তি সামগ্রিক, সামূহিক ও সামষ্টিক আত্ম ও পরার্থপরতার যুগপৎ ও একাধারে অনুশীলন করে নিষ্ঠভাবে, তবেই হয় জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি। অতি দারিদ্র্য আমাদের মধ্যে এসব গুণের উন্মেষ ও বিকাশ বিস্তার ও উৎকর্ষ পন্থা রুদ্ধ করে রয়েছে, তাই আমরা দারিদ্র্য দূর করার জন্যে প্রত্যেকেই গোপনে-প্রকাশ্যে বিচ্ছিন্নভাবে আপন আপন দারিদ্র্য দূর করার ভালো-মন্দ-মাঝারি-চোরা-গোপ্তা অপথে-বিপথে অনীতি-দুর্নীতি যোগে, ধনী-মানী-খ্যাতি-ক্ষমতাবান হতে বেপরোয়া হয়ে উঠে পড়ে লেগেছি। তাইতো উঠবার সিঁড়িতেও ভিড় ও বিপর্যয় বাড়ছে। কেউ উঠছে, কেউ পড়ছে, কেউ চাপা পড়ে প্রাণ হারাচ্ছে। নীতি নিয়ম আইন কানুন সব উপেক্ষিত ও লঙ্ঘিত হচ্ছে, কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানি বাড়ছে, ভেজালে-জুয়ায়-জোচ্চুরিতে, প্রতারণায় বঞ্চনায় সমাজ স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেছে, সমাজ শৃঙ্খলা গেছে ভেঙে। প্রেয়স-চেতনা উচ্ছেদ করেছে শ্রেয় সচেতনতাকে। ফলে মানুষ মানুষের ওপর বিশ্বাস-ভরসা-আস্থা হারিয়েছে। আমরা আজ নৈরাজ্যের অধিবাসী ও জীবনে-জীবিকায় সর্বত্র সর্বার্থক ও সর্বাত্মকভাবে হুমকি-হামলার আসন্ন আপন্ন শিকার রূপে বিপন্ন। এমনি পরিবেশে ও প্রতিবেশে সরকার নামের সংস্থা কি পারে, পারবে তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর দারিদ্র্য ঘুচিয়ে জনগণকে নিম্নতম মানের হলেও মানবিক জীবনে সাহায্য করতে? এ ঝড়ো হাওয়ায় এ বেনোজলে বিদ্যায়-বিত্তে-বেসাতে, রাজনীতিতে কিংবা ধনে সম্পদে ঋদ্ধ প্রভাব-প্রতিপত্তির ও দর্পদাপটের লোকেরা মন্ত্রী, সাংসদ, আমলা, সদাগর-কারখানাদার রূপে দেশের অর্থবাণিজ্য শাসন-প্রশাসনের সব কুক্ষিগত করে লুটেরা স্বভাবের হয়ে টাকার পাহাড় গড়ে তুলেছে তারাই গণমানবকে নিঃস্ব, নিরন্ন শোষিত বঞ্চিত অমানবিক পর্যায়ের প্রাণী করে রেখেছে। তাদের কাছে দেশ বলতে, জাতি বলতে, মানুষ বলতে তাদের শ্রেণীই বোঝায়, গণমানব থাকে অন্য প্রাণীর পর্যায়েই নগণ্য। কাজেই দেশের দারিদ্র্য ঘোচানোর এ চোরা-গোপ্তা পদ্ধতি মানুষের দারিদ্র্য হাজার গুণে বাড়িয়ে তুলছে। এ কারণেই তারা শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বশ্রেণীর জন্যে ইংরেজি মাধ্যমে প্রতীচ্যধরনে ও প্রতীচ্য বিদ্যারই ব্যবস্থা রাখে, নিরক্ষর নিঃস্ব মজুরগণের সন্তানদের জন্যে মাদ্রাসা শিক্ষার এবং আমজনতার তথা দরিদ্র সাক্ষর-অসাক্ষর লোকের সন্তানদের জন্যে বাংলা মাধ্যমে সুনীতিভিত্তিক অপ ও অকেজো তথাকথিত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয়েছে আসমান-জমিনের ব্যবধান। কতোগুলো পড়া-লেখা জানা আমজনতার সংখ্যা বাড়াচ্ছে, আর কতোগুলো প্রতীচ্যবিদ্যা পুরো বা আধা অর্জন করে হচ্ছে স্মার্ট হামবাগ উচ্চাশী মর্যাদা প্রত্যাশী আত্মরতি সর্বস্ব সমাজ অর্থ ও রাজনীতি নিয়ন্তা। এভাবে দেশে ভদ্রলোকের সংখ্যা বাড়ছে, ভালো মানুষের সংখ্যা বিরলতায় দুর্লভ হয়ে উঠছে। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণের ফলে অদক্ষ, অনিপুণ, অলস, অসৎ, দুষ্ট, দুর্জন, দুর্বৃত্ত, দুষ্কৃতী লোকের সংখ্যাই বাড়ছে মাত্র।

আমাদের ভুঁইফোঁড় দরিদ্র শিক্ষিত সমাজে উচ্চাশীরা অস্থির অধৈর্য অবিবেচক হয়ে আপাত লাভে-লোভে-স্বার্থে অপরিণামদর্শী হয়ে ভেজালে, প্রতারণায়, অসততায় খনিজ, জলজ, বনজ, কৃষিজ উৎপাদিত ও নির্মিত পণ্যের ব্যবসায়ও বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার খাচ্ছে। কাজেই ব্যক্তিগতভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে সম্পদ বাড়ানোর অপচেষ্টার ফলে জাতীয় বা রাষ্ট্রিক পর্যায়ে আমাদের রফতানি আয়জাত সম্পদ বাড়ছে না, লোভী অসৎ ব্যবসায়ীরা 'বেগুন তোলা' ব্যবসার ধৈর্য রাখে না, 'মুলা তোলা' ব্যবসাতেই উৎসাহী। কাজেই 'গরিবি হঠাও' 'দারিদ্র্য ঘোচাও' জিগির অরণ্যে রোদনে হচ্ছে অবসিত। সবচেয়ে সুদীর্ঘকালীন আশঙ্কার কথা হচ্ছে দেশে যাঁরা মেধাবী, সৃষ্টিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক এবং বিজ্ঞানী আর বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় জ্ঞানী গবেষক সেসব মেধা-মনীষা সম্পন্ন লোকেরা সরকারের কিংবা বিরোধী রাজনীতিক দলের চাটুকারিতায়, পদলেহিতায়, তোয়াজে-তোষামোদে নেমেছেন কিছু একটা নিজের জন্যে, সন্তানের জন্যে কিংবা পরিবারের জন্যে পাওয়ার লক্ষ্যে পদ-পদবী বা পুরস্কার রূপে।

এদিকে সেক্যুলারিজমের যে ধুয়া উঠেছিলো ১৯৭২ সনের সংবিধান রচনা ও প্রয়োগকালে তা কয়েকমাসের মধ্যেই গেলো উবে। তা ছাড়া সেক্যুলারিজম মানে যে সরকারের কোনো ধর্ম থাকবে না অর্থাৎ সরকার শুধু নাগরিকের অস্তিত্বই স্বীকার করবে, কোনো-সম্প্রদায়ের বা ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস সরকারীভাবে স্বীকারই করবে না তার ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে। এ সংজ্ঞাও বিকৃত করে প্রচার করা হলো যে 'সেক্যুলারিজম' is not the negation of Religion but the affirmation of Religion। এমনি অদ্ভুত ব্যাখ্যাও চালু করে জনগণকে বিভ্রান্ত করা হলো, কোনো কাপট্যই বেশিদিন ঢাকা থাকে না। ফলে কার্যত গোড়া থেকেই আওয়ামী লীগ বাঙালী রইলো না, হলো মুসলিম বাঙালী। আজো যেমন আওয়ামী লীগ সর্বার্থেই এবং সর্বাত্মকভাবেই আওয়ামী মুসলিম লীগ তবু নিরুপায় অমুসলিমরা আওয়ামী লীগে বিশ্বাস-ভরসা-আস্থা হারিয়ে অনাথ থাকতে নিরাশ্রয় হতে ভয় পায় বলেই। এ দিকে 'য পলায়তি স জীবতি' তত্ত্বে আস্থা রেখে স্বার্থপর ধূর্ত হিন্দু পালিয়ে হিন্দু সমাজকে ক্রমে দুর্বল ও অসহায় করে তুলছে। এ তাৎপর্যে হিন্দুর ক্ষতির কারণ হয়েছে মূলত হিন্দুই।

আধুনিক সংজ্ঞায় গণতন্ত্রে জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা-পেশা নির্বিশেষে সব নাগরিকই সমমানের ও সমঅধিকারের নাগরিক। বাংলাদেশ রাষ্ট্রে কাগজপত্রে নাগরিকরূপে স্বীকৃত সবাই। কিন্তু বাস্তবে সংখ্যালঘুরা নানাভাবে বঞ্চিত প্রতারিত এবং মানসিকভাবেও লাঞ্ছিত আর বিপন্ন। ফলে মুসলিমদের উদার চোখে তারা আমানত কিংবা জিম্মি। আর সরকার তাদের অর্পিত সম্পত্তি, রমনার মন্দির নির্মাণ অধিকার, সেনা বিভাগে চাকরি এবং অন্যান্য বিভাগেও জীবিকা ক্ষেত্রে অধিকার বঞ্চনার ফলে সংখ্যালঘুরা স্বঘরে, স্বভিটায় স্বদেশে মানস প্রবাস জীবন যাপন করে। ফলে আজো সবাই মিলে বাঙালী বা বাঙলাদেশী একক অভিন্ন সংহত নিখাদ নিখুঁত সুষ্ঠু জাতি ও জাতীয়তা গড়ে ওঠেনি গত পঞ্চাশ বা সাতাশ বছরেও। প্রতিবেশীকে শত্রুকল্প পর করে রাখার বিপদ যে সর্বাত্মক ও সর্বার্থক আর সার্বত্রিক তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। অতএব মত-মন্তব্য-সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নে অনীহায় ও অসততার বাধা রয়েই গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাতন্ত্র্যচেতনা ও মৌলবাদ

মানুষ স্বভাবেই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। পরিবার, গোষ্ঠী, গোত্র, শাস্ত্রিক বা মতবাদী সম্প্রদায়, সাংস্কৃতিক, ভাষিক, দৈশিক, রাষ্ট্রিক, জাতিক, বার্ণিক স্বাতন্ত্র্যে স্ব স্ব অস্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার একটা প্রবণতা সর্বত্রই সব মানুষে দেখা যায়। তারা স্বাতন্ত্র্যে স্বঅস্তিত্বে স্বপ্রতিষ্ঠ থেকে অপর গোষ্ঠী, গোত্র, জাতি, মতবাদী সম্প্রদায় কিংবা পেশাজীবী প্রভৃতির সঙ্গে শ্রম ও পণ্য বিনিময়ে সহযোগিতায় সহাবস্থান করতে রাজি। স্বাতন্ত্র্যচেতনা কখনো সচেতনভাবে সমন্বিত সংস্কৃতি সৃষ্টির ও চর্চার সুযোগ সুবিধে দেয় না। ফলে উন্নততর, সভ্যতর ও সংস্কৃতি চর্চায় অগ্রসর সমাজেও চিৎপ্রকর্ষ অঙ্গে ও অন্তরে স্থানিক, লৌকিক, অলীক, অলৌকিক শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার প্রভাবে যেন আবর্তিত হতে থাকে, সহজে যেন বিবর্তন পায় না। ফলে দেশ কাল জাতি জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস পেশানিরপেক্ষ হয় না। এজন্যেই মানুষ ব্যবহারিক যান্ত্রিক জীবনযাত্রায় যত এগিয়েছে মানস সম্পদে ও উৎকর্ষে তার বিকাশ তেমন তাল-লয়ে দেখা যায় না।

এর ফলেই পৃথিবীতে মিলনের, প্রীতির, সম্প্রীতির, ক্ষমার, সহিষ্ণুতার, সংযমের, সৌজন্যের, মহত্ত্বের, মানবতার মহিমাজ্ঞাপক আপ্তবাক্য, প্রবাদ-প্রবচন, কিস্‌সা, কিংবদন্তী যতই চালু থাকুক না কেন কার্যত ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রলুব্ধ লিপ্সু ব্যক্তি, গোষ্ঠী, গোত্র, জাতি, মতবাদী সম্প্রদায়, ভাষিক বা পেশাজীবী শ্রেণীর মানুষ যথাসময়ে যথাস্থানে যথাকারণে যথাপাত্রে কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি বাধিয়ে দেয় পৃথিবীর সর্বত্র। পরিবারের, সমাজের, মতবাদী সম্প্রদায়ের, গোষ্ঠীর, গোত্রের সবার সঙ্গে যে মানুষ মৈত্রীর, সংহতির বাঁধনে বদ্ধ, তাও নয়, কিন্তু তবু কাক-শেয়ালের মতো একটা গোষ্ঠী বা স্বাজাত্য চেতনা তাদের মধ্যে সর্বক্ষণ সক্রিয় থাকে। আপাত উদারতায়-প্রসন্নতায় কারো কারো মধ্যে সুপ্ত থাকলেও কখনো লুপ্ত হয় না, গুপ্ত থাকে মাত্র।

নাস্তিক যদি বা নানা বিবেচনায় জাতিত্ববোধ পরিহার করে নির্বিশেষ মানুষকে প্রাণীর প্রজাতির স্বপ্রজাতি রূপে আপন ভাবতে চেষ্টা করে, আস্তিকরা জন্মসূত্রেই শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধের নিগড় ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচারে-আচরণে স্বীকার করে নেয় বলেই সারাটা জীবন নির্বিচারে নির্ভাবনায় নীতিনিয়মে, রীতিরেওয়াজে, প্রথাপদ্ধতিতে গতানুগতিক আবর্তিত ও অভ্যস্ত থেকে নিশ্চিন্তে মৃত্যুবরণ করে। এ কারণেই আমাদের চিৎপ্রকর্ষের প্রয়াস বারবার আমাদের শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। আমাদের রেনেসাঁস কার্যত রিভাইভ্যালিজম-এ পর্যবসিত হয়। আমাদের নীতিআদর্শনিষ্ঠ চরিত্রবানেরা হয় অর্থোডকস, আমাদের রাজনীতিকরা হয় ধান্ধাবাজ– মতলববাজরা হয় মৌলবাদী। এজন্যেই ধার্মিকতা ও মৌলবাদিতা, অর্থোডকসি ও ফান্ডামেন্টালিজম অভিন্ন নয়। সম্ভবত জনবহুল প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা সঙ্কুল আজকের জাগতিক জীবনে জীবন-জীবিকা struggle, Resistance ও Compromise সাপেক্ষ হওয়ায় দুনিয়া-ব্যাপী সর্বত্র ইহুদী-খ্রীস্টান-হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম নির্বিশেষে কিছু ধূর্তলোক লঘু-গুরুভাবে মৌলবাদী বা ফান্ডামেন্টালিস্ট রূপে দলবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রিক ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে প্রবল হয়ে রাজনীতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষমতার ও অর্থ-সম্পদের মালিক হতে চায়। ফান্ডামেন্টালিজম কথাটা আকর্ষণীয়। কেননা আস্তিক মানুষ যদি শাস্ত্র মানবেই, তা হলে শাস্ত্রের আদি-অকৃত্রিম নির্ভেজাল অংশই তো মেনে চলা বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই বিশ্বাসী ভীরুদের মধ্যে। এমনি এক সহজ আবেদন আছে বলেই বিশুদ্ধ অবিকৃত নির্ভেজাল-খাঁটি-নিখাদ-নিখুঁত ওহির সত্যতা যেখানে প্রশ্নাতীত, সেই ইসলামের কুরআনে আস্থাবান মুসলিমরাই বিশ্বব্যাপী অধিকসংখ্যায় যে মৌলবাদী হবে তাতে বিস্ময়ের বা সন্ধিৎসার কি আছে! তা ছাড়া গোটা দুনিয়ায় মুসলিমরাই কেবল অর্থে-বিত্তে-বিদ্যায় পিছিয়ে রয়েছে ইহুদী-খ্রীস্টান-বৌদ্ধ-হিন্দুর তুলনায়। কাজেই শত শত বছরের পুরোনো কিন্তু তথাকথিত খাঁটি তত্ত্ব, তথ্য ও সত্যে Go back to Quraan, Bible, Puran, Veda and you will have all problems of life solved easily or automatically। অন্য একটি তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যেও আস্থা গাঢ় ও গভীর। তা হচ্ছে Belief, faith ও trust-বিশ্বাস, ভরসা ও আস্থা রাখা স্রস্টার কৃপায়-করুণায়-দয়ায় ও দাক্ষিণ্যে। যে-কোনো শাস্ত্রে বিশ্বাস, ভরসা ও আস্থা মানুষকে নিয়তিবাদী রাখে। যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান অভিজ্ঞতা বিজ্ঞতাও এ মনে-মগজে-মননে দাগ কাটে না, প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। এ কারণেই বিজ্ঞানের প্রসাদ পুষ্ট ও যন্ত্রজগতে যন্ত্রযুগে যন্ত্রপ্রকৌশল-প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ন্ত্রিত জন্ম-জীবন-মৃত্যুর কালেও আমরা দেশ-কাল-জীবনের দাবি বা চাহিদা অস্বীকারে দৃঢ়, গ্রহণবিমুখ, রক্ষণশীল, অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তিতে আস্থাবান। উল্লেখ্য যে ভারতের বিজেপির মৌলবাদ অভিন্ন উপাস্যের অনুপস্থিতির ফলে মূলত হিন্দু জাতিসত্তার তথাকথিত ঐতিহ্যের গৌরব-গর্বী সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যকামিতা মাত্র। অতীত ও ঐতিহ্য প্রীতিই তাদের পুঁজি-পাথেয়। ইংরেজবানানো বিকৃত ইতিহাস প্রচারের ও প্রচারণার দরুন উপমহাদেশে মৌলবাদ হিন্দু-মুসলিমে দ্রুত প্রসারমান। মৌলবাদ প্রগতি বিরোধী, বিবেক-বিবেচনা যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা বিরুদ্ধ। এ কারণে প্রগতি প্রাগ্রসরতা, মুক্ত মন-মগজ-মনন মনীষার প্রসারপথ প্রতিরুদ্ধ রাখে। বৃহত্তর তাৎপর্যে মৌলবাদ মানবিক গুণের উন্মেষের-বিকাশের-উৎকর্ষের ও সর্বপ্রকার নতুন চেতনার-চিন্তার ও সৃষ্টিশীলতার বাধা। তাই মানবিকতার, মানবতার এক কথায় মনুষ্যত্বের শত্রু। শোনা যায় ফান্ডামেন্টালিজমের উদ্ভব ফ্রান্সে, লালন ও সাম্রাজ্যিক প্রয়োগ ইংল্যান্ডে, ১৮৯৪ সনে মৌলবাদী বিষয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং পৃথিবীময় এর প্রসার ঘটছে উগ্রভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনে, প্রয়োগে, গোপন আগ্রহে ও অর্থসাহায্যে-এমনি আঁচ-আন্দাজ অনুমান করছে বুদ্ধিমানেরা। রটনাও বাড়ছে।

সভ্যতার-সংস্কৃতির ও মনুষ্যত্বের বিকাশ-বিস্তার উৎকর্ষ প্রবহমান রাখার গরজেই মৌলবাদের প্রতিবাদে, প্রতিকারে, প্রতিরোধে মানব সমাজের শ্রেয়স কামী মাত্রেরই প্রকাশ্যে সক্রিয় রাজনীতিক-সাংস্কৃতিক ও শৈক্ষিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া আবশ্যিক ও জরুরী। নির্ভেজাল সেক্যুলারিজম নিষ্ঠার সঙ্গে চালু করা ও রাখাই হচ্ছে প্রতিরোধের শ্রেষ্ঠ কিংবা একমাত্র কার্যকর পন্থা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরগুনায় তালেবান গেরিলা

সংবাদপত্রে প্রকাশ 'বরগুনা' প্রভৃতি একশ ছাব্বিশটা কেন্দ্রে আফগানিস্তানের তালেবানদের মতো মৌলবাদী রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারীদের অনুকরণে ও অনুসরণে বাঙলাদেশেও মৌলবাদী শিবির গোষ্ঠী গেরিলা যুদ্ধের কলা-কৌশলে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। আমরা সবাই জানি, মৌলবাদ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে মুসলিমদেরই বেশি প্রিয়। তাই মুসলিম রাজ্য-রাষ্ট্রগুলোতে মৌলবাদ বিশেষ সমাদৃত এবং প্রচারে প্রসারমান। মৌলবাদ দেশ-কাল-জীবনের দাবি ও চাহিদা, জিজ্ঞাসা ও সন্ধিৎসা অস্বীকার করে, মৌলবাদ অতীত ও ঐতিহ্যমুখী, নতুনের প্রতি বিরূপ-বিমুখ। তাই মৌলবাদ সমকালীন দৈশিক, রাষ্ট্রিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, শৈল্পিক, সাহিত্যিক এবং বৈশ্বিক আন্তর্জাতিক স্তরের জীবন-জীবিকার, রস-রুচির, সৌন্দর্যবুদ্ধির আর যন্ত্র-নির্ভর যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত যুগেও আবিষ্কার-উদ্ভাবন-সৃষ্টিঋদ্ধ জীবনযাত্রার বিরোধী। তাই এ কালে ঐহিক জীবনের গতি-প্রগতি বিমুখ বলেই মৌলবাদ পরিহার্য। মৌলবাদ আমাদের গ্রহণবিমুখ, সৃষ্টিবিরোধী, আবিষ্কার-উদ্ভাবন শক্তিকে বন্ধ্যা করে রাখে। কারণ মৌলবাদে সন্দেহ, জিজ্ঞাসা, সন্ধিৎসা আর সমীক্ষণে, পরীক্ষণে, পর্যবেক্ষণে শাস্ত্রাতিরিক্ত কোনো কিছুর আবিষ্কার, কোনো নতুন সত্যের উদ্ভাবন বা প্রতিষ্ঠা প্রয়াসের অনুমোদন নেই। মৌলবাদী কাল্পনিক বলেই, শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলেই নাচ-গান-বাজনার-অভিনয়ের চর্চা করতে পারে না পাপ বরণ না করে। কবিতা-গল্প-উপন্যাস সৃষ্টিও পাপাচার। বিজ্ঞান চর্চাও কি শাস্ত্রসম্মত? বিজ্ঞানের মতে নিরেনব্বইটি আবিষ্কৃত তথ্য পৃথিবীর কোনো শাস্ত্র সম্মত নয় বরং বিরুদ্ধ। এদিকে এখন কম্যুনিস্টরা ধর্মধ্বজী হয়ে গেছে, আওয়ামী লীগও এখন আওয়ামী ইসলামী মুসলিম লীগ। অতএব দেশ-কাল-জীবনের প্রয়োজনেই মানুষের জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-দর্শনে-মনে-মগজে-মননে-মনীষায় অগ্রগতি ও প্রগতি অবাধ রাখার গরজেই মৌলবাদিদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠান ঠেকানো আবশ্যিক ও জরুরী। এ অজুহাতেই তিউনিসিয়ায় মৌলবাদিদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে সেনানী বাধা দিয়েছে। আজ তুরস্ক থেকে ইন্দোনেশিয়া অবধি সর্বত্র মৌলবাদের প্রসার ঘটছে। পনেরো শতক থেকেই মুসলিমদের মন-মগজ-মনন-মনীষার বিকাশ বিরল হয়ে রয়েছে। আধুনিক বিশ্বে মুসলিম অবদান বিজ্ঞানে-দর্শনে-যন্ত্রে, আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানেও অলভ্য। গোটা পৃথিবীতেই অমুসলিম প্রতিবেশীর চেয়ে মুসলিমরা আনুপাতিক হারে বেশি দরিদ্র, বেশি নিরক্ষর, বেশি অবিদ্বান, এবং অধ্যবসায়ে, সৃষ্টিশীলতায় আবিষ্কারে উদ্ভাবনে রুচিতে বুদ্ধিতে কম। মৌলবাদের প্রসার ঘটলে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো মৌলবাদী হলে ওগুলো বিদ্যায় বিত্তে বেসাতে তলিয়ে যাবে। প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতাসঙ্কুল একালে তারা অর্থে-বিত্তে-বিদ্যায়-বেসাতে-কোথাও টিকে থাকতে পারবে না। দুনিয়াব্যাপী তাদের আক্ষরিক অর্থেই হবে ভরাডুবি। বাঙলাদেশে আমাদের গোচরে ও অগোচরে মৌলবাদ প্রসার লাভ করছে, মৌলবাদী বাড়ছে। মৌলবাদকে নীতি-আদর্শ হিসেবে বরণ করে, মৌলবাদের প্রসারে ও রাজনীতিক রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে তার সাফল্য অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে বাস্তবায়নে দায়বদ্ধতা মেনে মৌলবাদীরা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সুশৃঙ্খলভাবে দৃঢ়কল্পে শক্তি-সাহসে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মোৎসর্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কাজেই তাদের সাহস সঙ্কল্পকে গুরুত্ব দেয়া আবশ্যিক এবং এখন থেকেই দেশপ্রেমী, মানবসেবী শ্রেয়সবাদীদের উচিত এ শক্তি প্রতিরোধে রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে এগিয়ে আসা দলবদ্ধ হয়ে। নইলে দেশ-কাল-জীবনের এ বিপদ-বিপর্যয় এড়ানো যাবে না। অবিলম্বে একটা যথার্থ অকৃত্রিম সেক্যুলার রাজনীতিক দল গঠন করা, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত জাত জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-অঞ্চল-পেশা নির্বিশেষে উপজাতি, জনজাতি, আদিবাসী সবাইকে নিয়ে এ সেক্যুলার রাজনীতিক দলই কেবল দৈশিক ও রাষ্ট্রিক পর্যায়ে নির্ভেজাল নির্বিশেষ নাগরিকের জাতি ও জাতীয়তা গঠন ও লালন আবশ্যিক। নষ্ট করার মতো সময় নেই। নির্বিশেষ বাঙলাদেশী আমাদের অবস্থার ও অবস্থানের গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন আশা করছি। মৌলবাদীদের জানা-বোঝা-মানা-ভাবা দরকার যে ইসলাম গোড়া থেকেই দেশে দেশে কালে কালে স্থানিক-কালিক-সামাজিক-নৈতিক, বৈষয়িক, জীবনের প্রয়োজনে ফেকা, ফতোয়া-কেয়াজ-এজমা প্রয়োগে নতুন নতুন নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ ও প্রথাপদ্ধতি গ্রহণ বরণ করেছে, গোঁড়ামি তথা রক্ষণশীলতা কখনো টেকেনি।

WWW.AMARBOI.COM

ধৈর্য চাই: এদিন যাবে

বিদেশী এক বেতারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনীতিক অবস্থান ও অবস্থানের বয়ান বিশ্লেষণ হচ্ছিলো। পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত প্রভৃতি এশিয়ার আর আফ্রিকার, লাতিন আমেরিকার কোনো কোনো রাষ্ট্রেরও সর্বস্তরের ও সর্বপ্রকারের দুর্নীতি ও দুষ্কৃতির কথা ছিল তাতে। শুনে মনে হল গোটা দুনিয়ার অজ্ঞতা-অনক্ষরতা-নিঃস্বতা-দুস্থতা দারিদ্র্যতাদুষ্ট-রাজ্য-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে নীতি-আদর্শ নিষ্ঠ বিশ্বাস-ভরসা-আস্থাযোগ্য সৎ মানুষ বিরলতায় দুর্লক্ষ্য। গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে লক্ষ লক্ষ লোক সারাদিন নানা কাজ করে বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে সৎ মানুষের সন্ধান মেলে না। সব মানুষই যেন ধান্ধাবাজ, চালবাজ, মতলববাজ, ফেরববাজ, ফটকাবাজ, দুর্নীতিবাজ। কারো ওপর বিশ্বাস-ভরসা-অস্থা রাখা চলে না, যেন প্রতি দ্বিতীয় ব্যক্তিটিই ফন্দিবাজ, ফিকিরবাজ, ঠকবাজ।

সত্তার মূল্য মর্যাদাবোধ, আত্মসম্মানচেতনা, নীতিআদর্শনিষ্ঠা এক কথায় সততা নেই কোথাও কারো মধ্যে যেন। প্রলোভন প্রবল হলে, সুযোগ সুবিধা পেলে, নিন্দা-শাস্তির আশঙ্কা না থাকলে আত্মসম্মানবোধহীন বিবেক-বিবেচনাহীন মানুষ করে না হেন অপকর্ম অপরাধ নেই জগতে। তাই বোধ হয় মেঘে মেঘে আকাশ ছাওয়া থাকলে যেমন সূর্যের তেজ ও তাপ মেলে না, তেমনি সব মানুষই যদি দায়ে পড়ে, গরজে ঠেকে ধান্ধাবাজ, মতলববাজ, ফেরববাজ, ফটকাবাজ, ফন্দিবাজ, ফিকিরবাজ, চালবাজ, দুর্নীতিবাজ, ঠকবাজ হয়, তাহলে সৎ মানুষ ও সততা তো অলভ্য হবেই। আমাদের আজকের বিশ্বে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বে আজ নিন্দা, শাস্তি, পাপভীরু লোক দুর্লভ। একাল হচ্ছে বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জীবন-জীবিকাক্ষেত্রে কাড়ি মারি হানি অরি পারি যে কৌশলে।

যন্ত্রের, জ্ঞানের, শিক্ষার ও কৌশলের প্রসার হওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবিকা সংগ্রহ শ্রম, সময়, দক্ষতা, প্রতিযোগিতা ও সংগ্রাম সাধ্য হওয়ায় সম্ভবত সংহত পৃথিবীতে চাঁদাবাজরাও নিঃস্বতার, নিরন্নতার, দুস্থতার, দরিদ্রতার সদা শঙ্কা ক্লিষ্ট মানুষ পাপভয়, লোকভয় ও শাসকের শাস্তি ভয় পরিহার করে বাঁচার ও প্রিয় স্বজনদের বাঁচানোর গরজে বেপরোয়া হয়ে গেছে। তাছাড়া অভাব মিটলেও লাভ লোভ স্বার্থ চেতনা অশেষ বলেই সংযম, নিবৃত্তি মানুষে অলভ্য হয়ে উঠেছে। আর নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রলোভনের নিত্য নতুন ফাঁদও বিস্তৃত হচ্ছে সর্বত্র বিজ্ঞানের বদৌলতে যন্ত্রের প্রসারে।

আমাদের পাড়ার মহল্লার চেনা লোকগুলো দেখি প্রায়ই কোনো না কোনো অসততার, অপকর্মের, অপরাধের দাগে দাগী। জ্ঞাতি কুটুমের মধ্যেও দেখি প্রায় সবাই যেন লঘু গুরুভাবে লাভ লোভ স্বার্থ বুদ্ধি বশে অপরাধপ্রবণ। এ হয়তো মানবিকগুণের সচেতন সযত্ন সপ্রয়াস অনুশীলনে উদাসীন ব্যক্তির নৈতিক আদর্শিক শাস্ত্রিক জীবন উপেক্ষার কিংবা প্রবৃত্তিচালিত হয়ে স্বেচ্ছায় লঙ্ঘনের ফল, অথবা প্রাণীর মানব প্রজাতির অশেষ কাঙ্ক্ষা পূর্তি বাঞ্ছার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি চিন্তায় কর্মে আচরণে।

যে করেই হোক, আজ মানুষের শহুরে সমাজ ক্রমে দুর্বল নিঃস্ব নির্বুদ্ধি মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে। প্রাথমিক স্কুলের, মাধ্যমিক স্কুলের কিংবা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানদেরও নানা অসততার সাক্ষ্য প্রমাণ মেলে তদন্ত হলেই। আর রটনা তো আছেই, ঘটনা ছাড়া তিলকে তাল করে রটনার সুযোগ মেলেই না। আমরা বাঙলাদেশীরা হাজারে নয়শ নিরেনব্বই জনই দরিদ্র ঘরের লোক। কাজেই সাধারণভাবে আমরা ধনে মনে ছিলাম কাঙাল। ধনের কাঙালপনা ঘোচে, কিন্তু মনের কাঙালপনা একজীবনে কিংবা এক প্রজন্মে ঘোচে কি? আমাদের চরিত্র ও নীতিআদর্শগত সমস্যার মূলে সম্ভবত রয়েছে ওই কাঙালপনারই প্রভাব। দুই প্রজন্ম ধরে আমরা দালানবাসী ঐশ্বর্যবান রূপে জীবন যাপন করতে পারলে হয়তো তৃতীয় প্রজন্মে আমাদের সন্তানদের তথা নাগরিকদের আত্মমর্যাদাবোধ ও বিবেকী চেতনা বাঞ্ছিত মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে। অনেকের মধ্যেই তখন আমরা যথার্থ উদার মুক্ত মনের, মগজের, মননের, মর্জির, মেজাজের ও রুচির অজস্র, অঢেল, দেদার অগণ্য লোক পেয়ে যাব গাঁয়ে গঞ্জে, শহরে বন্দরে, মহল্লায় পাড়ায়। কেননা বাস্তব কারণেই জনপদ রূপ বিশ্বে আন্তর্জাতিক জীবনে সহযোগিতায় সহাবস্থানের গরজে পৃথিবীর সর্বত্র সমাজ বদলাবে যন্ত্রের, বিজ্ঞানের ও বাণিজ্যের অভিন্ন নিয়ন্ত্রণে। সে লক্ষণ ও আভাস এখনই সূক্ষ্ম বুদ্ধির যুক্তিবাদী মানুষের অনুভব-উপলব্ধিগত হয়েছে, হচ্ছে। জীবিকাপদ্ধতি, জীবিকাক্ষেত্র ও জীবনযাত্রা দ্রুত বদলাচ্ছে বিজ্ঞানের প্রসাদে, যন্ত্রের উৎকর্ষে, প্রসারে ও বৈচিত্র্যে। দুনিয়া বদল হচ্ছে, হবে এবং হতে থাকবে। ইতোমধ্যেই বাস্তব প্রয়োজনে নিত্যকার জীবনাচারে ও আচরণে শাস্ত্রবিধি অনিচ্ছায় উপেক্ষিত ও লঙ্ঘিত হচ্ছে। শাস্ত্রের নিষেধে ও জীবনের চাহিদায় মেরুর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েই চলেছে। ফলে জীবনচেতনায় চিন্তায় ঘটছে স্ববিরোধ ও বৈপরীত্য। প্রাত্যহিক জীবনাচারে ও আচরণে তা আজ সর্বত্র প্রকট। আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনচেতনায় ও আচারে আচরণে তাই কোথাও সামঞ্জস্য বা সমন্বিত রূপ নেই। এ অবস্থা কেউ কোনো রাষ্ট্রে কোথাও এড়াতে পারবে না। বিজ্ঞানের ও যন্ত্রের নব নব আবিষ্কারে উদ্ভাবনে পালা বদলের পালা চলতেই থাকবে অনন্ত ভবিষ্যৎকালে।

অতএব, আমাদের আজকের অসহ্য অবস্থার ও অবস্থানের অবসান আর এক প্রজন্মের মধ্যেই ঘটবে। তখন আমরা পৃথিবীব্যাপী চালু নতুন নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ ও প্রথাপদ্ধতি অনুগ জাগতিক বা ঐহিক জীবন যাপন করব আইন ও বিবেকচালিত হয়ে, বিজ্ঞান-বাণিজ্যমনস্ক হয়ে ও যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত হয়ে।

রাজনীতিকের ও সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

রাজনীতিক দলের ও নেতার কাজ হচ্ছে প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে এবং বাস্তব ও স্বনীতি অনুগ কাজ করে জনগণকে স্বমতে, স্বকর্মে ও স্বআদর্শে প্রভাবিত করে তাদের স্বদলের ও স্বনেতার সমর্থক, অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত করে তোলা। দুনিয়ার সর্বত্র যোগ্য নেতার নেতৃত্বে তিনটি গুণের লঘু-গুরু সমাবেশ দেখা যায়। একটি নেতা বা নেত্রী হবেন তিনিই যার থাকবে ১. Superior Intellect ২. Integrity ৩. Courage এতেই তিনি হয়ে যান ব্যক্তিত্বে অনন্য, এবং দলের সদস্য-সমর্থকদের বল-ভক্তি-ভরসার পাত্র। যথাসময়ে যথাস্থানে যথাপাত্রে সঙ্কটে সমস্যাকালে যথাসিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য থাকে না যে নেতার ও নেত্রীর, তার নেতৃত্বে দেশ, জাতি, মানুষ, সরকার ও রাষ্ট্র উপকৃত হয় না। বরং জনগণের মধ্যে, প্রশাসকদের মধ্যে, মন্ত্রী-সাংসদদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা, বিশৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচার, স্বৈরাচার বাড়ে।

আমাদের তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রায়ই যোগ্য নেতা মেলে না। যোগ্যতায়, ব্যক্তিত্বে, প্রাগ্রসর চিন্তায় চেতনায় দূরদৃষ্টিতে আত্মপ্রত্যয়ে গড়ে-ওঠা নেতার চেয়ে বানানো উগ্রস্থূলবুদ্ধি ক্ষমতা প্রয়োগলিপ্সু অদক্ষ নেতা-নেত্রীই তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বেশি মেলে। ফলে গেলো পঞ্চাশ, চল্লিশ, ত্রিশ বছর ধরে নতুন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর প্রত্যাশিত মাত্রায় আর্থিক মানসিক চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি চোখে পড়ে না কেবল পথঘাট উদ্যান দালান প্রভৃতির সুরুচি অনুগ প্রসারের সাক্ষ্য প্রমাণই মেলে।

আমাদের বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের শুরু হয়েছিল সেক্যুলার রাষ্ট্র হিসেবে টবের গাছের মতো পর-প্রভাবে কৃত্রিমভাবে এ রাষ্ট্রের সংবিধান তৈরি হলো বলেই, অর্থাৎ দেশের রাজনীতিকদের এবং শিক্ষিত সাধারণেরও মানস প্রস্তুতি ছিল না বলেই সেক্যুলার শব্দটিও বিভ্রান্তিকর বিকৃত অভিধা পেল, আর টিকলই না সমর্থকের অভাবে। এরপর থেকে আমাদের 'ক্যু' করে আসা জঙ্গীনায়ক শাসকরা সংখ্যাগুরু অজ্ঞ অনক্ষর গ্রামীণ নারী-পুরুষ ভোটারের ধর্মভাবে সুড়সুড়ি দিয়ে একাধারে ও যুগপৎ তাদের ঐহিক পারত্রিক জীবনে কল্যাণের আশ্বাসে আশ্বস্ত রেখে দীন-দুনিয়ায় তরক্কির সুনিশ্চয়তা দিয়ে প্রবঞ্চনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনগণকে তুষ্ট, তৃপ্ত ও হৃষ্ট রেখে জনপ্রিয় হয়ে রাজত্ব করতে থাকেন। পরে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রে চালু নামে 'গণতান্ত্রিক' কামে 'স্বৈরস্বেচ্ছাতান্ত্রিক' লুটেরা সরকারগুলো একইভাবে গণপ্রবঞ্চনা বজায় রাখে। আজ তাই গোটা পৃথিবী ব্যাপী না হোক, আফ্রো-এশিয়ার সর্বত্র মৌলবাদ দ্রুত প্রসার লাভ করছে। আমাদের বাঙলাদেশের বানানো নেতারা ১৯৯১ সন থেকেই তথাকথিত লুম্পেন বুর্জোয়ার স্বৈরস্বেচ্ছাতন্ত্রপ্রবণ গণতন্ত্রে অজ্ঞ অনক্ষর অবুঝ গ্রামীণ ভোটারদের বশে রাখার জন্যে ছদ্ম ধর্মপ্রাণ হয়ে রাজত্ব করার নীতি গ্রহণ করেছে। ফলে আধুনিককালের তথা সমকালের প্রগতিশীল ও প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে ওই অতীত, ঐতিহ্য ও শাস্ত্রমুখিতার দরুন। তিনটেই অতীতের। কাজেই তিনটে কেবল পশ্চাৎমুখী করে, পিছুটান দেয়, ধরে রাখে, মন-মগজ-মনন রাখে বন্ধ্য, বিজ্ঞান প্রয়োগে আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের, নির্মাণের, সৃষ্টির, জিজ্ঞাসার, সন্ধিৎসার, অন্বেষার কাঙ্ক্ষা রাখে সুপ্ত কিংবা করে লুপ্ত। এ বিজ্ঞান-বাণিজ্য-প্রকৌশল-প্রযুক্তি নির্ভর এবং যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জীবনে সমাজে রাষ্ট্রে অতীতপ্রীতি ও অতীতমুখিতা মুক্ত মন মগজ মনন প্রয়োগে মুক্ত আর নতুন চিন্তার ও চেতনার প্রসাদ পওয়ার পক্ষে প্রবল বাধা। আমাদের বিজ্ঞান ও বাণিজ্যমনস্ক হতে হবেই, হতে হবে জাগতিক জীবন সচেতন যন্ত্রনির্ভর সমাজমনস্ক। কাজেই রাজনীতিক দলগুলোর শহুরে শিক্ষিত সমাজের, রাজনীতিক নেতা-নেত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে মানুষকে শ্রেয়সের পথ বাতলানো, বিশ্বাস নয়, বিজ্ঞানমনস্ক করা। ঐহিক জীবনের বিকাশের ও উৎকর্ষের প্রয়োজনে সমকালীন উন্নত ও সৃষ্টিশীল জাতির অনুকরণে, অনুসরণে অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মোন্নয়নে প্রেরণা, প্রণোদনা ও প্রবর্তন দেয়া, ভোট জোগাড়ের লক্ষ্যে শোষণ বঞ্চনা প্রতারণা কায়েম রেখে শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখা নয়। দেশপ্রেমী ও মানবসেবী আধুনিক সরকারের কাছে এ-ই হচ্ছে জনগণের প্রত্যাশা। মানুষের সেকেলে তাৎপর্য ও উপযোগরিক্ত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাবর্জনে উৎসাহ দান, কল্যাণকর নতুন বিজ্ঞানসম্মত যৌক্তিক-বৌদ্ধিক জীবন রচনায় ও জীবনযাত্রায় আগ্রহী করাই হচ্ছে একালের রাজনীতিক দলের, সরকারের ও রাষ্ট্রের বাঞ্ছিত নীতিআদর্শ ও বাস্তব কর্মপন্থা।

AMARBOI.COM

আমরা অবক্ষয়গ্রস্ত

ব্যক্তির, পরিবারের, দেশের, রাষ্ট্রের, জাতির জীবন কখনো কখনো অবক্ষয়ের স্থবিরতা, পচন, পতন কবলিত হয়। উনিশ শতকের প্রথমপাদে ইংল্যান্ডের বা লন্ডন শহরের অবস্থা কিরূপ ছিল জানি না। ইতিহাস সবকথা খোলাসা করে বলে না। তাই বুদ্ধির ও দৃষ্টির মান-মাপ-মাত্রা ভেদে মনন প্রয়োগে ইতিহাস ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। ইট-কাঠ-পাথর-ফসিল থেকেও ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া যায়। সেভাবেই আঁচ-আন্দাজ-অনুমান করতে পারি যে উনিশ শতকের প্রথম দুই দশক ধরে দুই সংবেদনশীল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনন্য কবির চোখে ইংল্যান্ড বা লন্ডন ছিল আমাদের আজকের বাঙলাদেশের বা ঢাকা শহরের মতো বিকৃত অসুস্থ মন-মগজ-মনন-মনীষার ক্লেদপ্রসূ। তাই কীটস গাঢ় গভীর দুঃখে হতাশায় লক্ষ্য করে উচ্চারণ করেছিলেন 'The inhuman death of noble minds, কবি শেলীও তেমনি এক দুঃসহ নিরানন্দ পরিবেশ অনুভব করেছিলেন Out of the day and night/A joy has taken flight' ওঁরা দু'জনই স্বল্পকালজীবী ছিলেন এবং তাঁদের স্বদেশও উন্নত হয়েছিল সর্বপ্রকারে ও সর্বক্ষেত্রে তাঁদের মৃত্যুর পরে।

আজ আমরা রিক্ত, দেউলে, হতাশ, নিরাশ। আমাদের Noble minds তো নেই-ই। চরিত্রবান সজ্জনও দুর্লভ। রুচিমান সৌন্দর্য প্রিয় ব্যক্তিও সুলভ নয়। তাছাড়া ধনে ও মনে কাঙাল আমাদের সমাজে প্রায় সব লোকই অর্থ-সম্পদ অর্জনের জন্যে জীবিকা ক্ষেত্রের অনিশ্চিতিজাত আশঙ্কায় ও বেকারত্বের সমস্যা সঙ্কটে জর্জরিত বলে তাদের লাভ-লোভ-স্বার্থ চেতনা তাদের নীতিআদর্শ ও আত্মসম্মানবোধহীন করে তুলেছে। তাই প্রতিটি দ্বিতীয় ব্যক্তিতেই বিশ্বাস-ভরসা-আস্থা হারাচ্ছে ব্যক্তি মানুষ। ইংল্যান্ডে তবু কবি কীটস-শেলী ছিলেন স্বকালের সমাজ-সঙ্কট জানার ও বোঝার অনুভব-উপলব্ধি করার। কিন্তু আমাদের কাঙাল মানুষের নীতিআদর্শরিক্ত সুবিধেবাদী সুযোগসন্ধানী নগদজীবী শিল্পী-সাহিত্যিক-শিক্ষক-উকিল-ডাক্তার-সাংবাদিক নামে পরিচিত শহুরে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা ব্যক্তিগত লাভে লোভে মত-মন্তব্য-সিদ্ধান্ত বদলাতে ক্যাঙ্গারুনীতি প্রবণ, নির্লজ্জ চাটুকার মেরুদণ্ডহীন ও অনৃতভাষণে অসংকোচ।

দেশের অধিকাংশ লোক অজ্ঞ-অনক্ষর-নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ, দরিদ্র মজুর বা কায়িক শ্রমজীবী কিন্তু সাবালেগ তথা আঠারো বছর বয়স থেকে ভোটার। সেদেশে গণতন্ত্র বাস্তবে কেনা-বেচার অবুঝ লোকের ভোটতান্ত্রিক এক অদ্ভুত শাসন-শোষণ-বঞ্চনা-প্রতারণাবহুল শক্তিমানের ও ধূর্তলোকের স্বেচ্ছাস্বৈর লুটতন্ত্র মাত্র। মন-মগজ-মনন খাটায় না বলেই জনগণ স্বদেশী-স্বজাতি-স্বভাষী-স্বধর্মীর শাসনকেই স্বাধীনতা বলে জানে, বোঝে ও মানে। কিন্তু গণমানবকে শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনামুক্ত করার জন্যে যে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বদেশী-স্বজাতি-স্বজন-স্বধর্মীর বিরুদ্ধেই দ্রোহ করতে হয়, অস্ত্র ধরতে হয়, তা এ ধরনের লোকেরা বোঝে না, তারা বোঝে স্বাধীন দেশে শহরের দৈর্ঘ্যে প্রস্থে পরিসরে বাড়ে পথ-ঘাট, সেতু বিস্তৃত হয়। একশ্রেণীর লোক বিদ্যায় বিত্তে ও বেসাতে ধনী মানী ও গুণী হয়, হয় মানে যশে খ্যাতিতে ক্ষমতায় প্রভাবে প্রতিপত্তিতে দর্পে দাপটে বিলাসে বিনোদনে সুখী ও আনন্দিত, জীবনযাপনে ধন্য। মনে করে এই বুঝি স্বাধীনতার প্রসাদ ও অবদান। কেননা তারা মননশীল জীবন জানে না, তারা নিজের, পরিবারের জন্যেই বাঁচে। কিন্তু অজ্ঞতার ও ঔদাসীন্যের দরুন তাদের মনে এ যুক্তিও কখনো জাগে না যে তুর্কী-মুঘল-ব্রিটিশ শাসনেও দালান-উদ্যান-ফোয়ারা-রাস্তা-মাঠ-ময়দান শোভিত শহর দিল্লি কোলকাতা বোম্বাই লাহোর লক্ষ্ণৌ গড়ে উঠেছিল। পরাধীন দেশে উপনিবেশেও একশ্রেণীর উদ্যমী উদ্যোগী পরিশ্রমী বুদ্ধিমান উচ্চাশী কিংবা দুর্নীতিবাজ, মতলববাজ, ফেরববাজ, ফন্দিবাজ, ফিকিরবাজ লোক থাকে। পুঁজিবাদীরা এবং উচ্চাশী ধূর্ত লুম্পেন বুর্জোয়ারা এমনিভাবে অঢেল, অজস্র, দেদার, অপরিমেয় ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে বিলাসে বিনোদনে রাজদত্ত সম্মানে ভূষিত হয়ে সানন্দ সগর্ব ও সগৌরব জীবন যাপন করেছে, করে, করবে। কিন্তু রাষ্ট্র যতদিন অনাথ শিশু, রুগ্ন, বৃদ্ধ, পাগল, পঙ্গু নির্বিশেষে সবাইকে ভাতা-সেবা-চিকিৎসা-আবাস দিয়ে পোষার এবং শারীরিকভাবে সুস্থদের কাজ দিয়ে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাত-কাপড়-আবাস-চিকিৎসা-শিক্ষার সুযোগ দেয়ার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে সরকার বা রাষ্ট্র গ্রহণ না করবে, ততদিন কোথাও দুর্বল দুস্থ রুগ্ন নিঃস্ব নিরন্ন মানবমুক্তি সম্ভব হবেই না। চীন আজো শত কোটি মানুষের ভাত কাপড় জোগায়। এ ব্যবস্থা শাস্ত্রী-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যবিরোধী অনাচার ও মানসস্বাস্থ্য হানিকর বলে অবজ্ঞাত সাধারণ আস্তিকদের কাছে। এদিকে সবাই আদ্যিকালের অপরিবর্তিত রাজতন্ত্রে, সামন্ততন্ত্রে, স্বৈর-স্বেচ্ছাতন্ত্রে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়ও আর্থিক সামাজিক সাংস্কৃতিক রৌচিক ফ্যাশনের উন্নতি-উৎকর্ষ চায়, এমনকি চিন্তা-চেতনার নতুনত্বে ও বৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হয় কিছু লোক। কিন্তু নতুন চিন্তা-চেতনার মুক্তবুদ্ধির যুক্তিবাদী বিবেকানুগত মানুষ এমনি অবস্থায় দুর্লভ থাকে বলেই মানুষের সে-আশা বা চাহিদা পূরণ হয় না। কারণ যেমন মন মগজ মনন রুচি সংস্কৃতি মনীষাসম্পন্ন মানুষ অবক্ষয়পূর্ণতা না পেলে কোথাও আবির্ভূত হয় না নতুন চিন্তা-চেতনা-দ্রোহ-সাহস-শক্তি নিয়ে বেপরওয়া হয়ে।

নতুন চিন্তা-চেতনার প্রচারক, মুদ্রক, প্রকাশক চালু নীতি-রীতি-প্রথা পদ্ধতি বিরোধী কথার জন্যে লাঞ্ছিত, আহত ও নিহত হয় বটে, কিন্তু যে চিন্তা-চেতনা একবার বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে, তা আর বিলুপ্ত হয় না কখনো, মানবস্মৃতিতে স্থায়ী আসন করে নেয়। অবক্ষয়ে জাতির দেয়ালে পিঠ ঠেকলেই কেবল বাঁচার প্রাবৃত্তিক গরজেই কিছু মানুষ সম্বিৎ ফিরে পায়, উত্থানের পথ খুঁজে পায়, তখনো কবি শেলীর ভাষায়– Poets are the unacknowledged legislators of the earth-কে ঈষৎ পরিবর্তন করে বলা চলে শিল্পী সাহিত্যিক দার্শনিক বিজ্ঞানী রাজনীতিক প্রভৃতিরাই রেখার-লেখার ভাষণের-প্রচারের মাধ্যমে দেশ-জাতি-মানুষ-রাষ্ট্রের মানসিক মানবিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি-উৎকর্ষ সম্ভব করে তুলতে পারে এবং করে।

কিন্তু তবু ভরসা পারছি না। কেননা আমাদের আঁতেলরা তো এখন নীতিআদর্শ চেতনারিক্ত সুবিধেবাদী সুযোগসন্ধানী নগদজীবী আত্মসত্তার মূল-মর্যাদাবোধহীন মেরুদণ্ডশূন্য কেঙ্গারুপ্রবৃত্তিচালিত। আজ এজন্যেই সত্যি সত্যি 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে পৃথিবীতে/ আজ যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশী আজ চোখে দেখে তারা।' তাঁরাই রাজনীতিক দলের ও সরকারের উপদেষ্টা। আজ কেবল আফসোসের সঙ্গে স্মরণ করা চলে এলিওটের তিনটে হতাশ বাক্য : Where is the Life we have lost in living, where is the Knowledge We have lost in information এবং Where is the wisdom we have lost in knowledge। হায়রে স্বদেশ!

নারীর স্বাধিকার আদায়ের পূর্বশর্ত

সবাই জানে জীব-জন্তুর মধ্যে মাদী-প্রাণীর চেয়ে মদ্দা সুন্দরতর, অবয়বে বৃহত্তর বা দীর্ঘতর এবং বলবত্তর। এ দেখেই চিরকাল মানুষের সমাজে বিশেষ করে পুরুষপ্রধান সমাজে নারীকে সর্বপ্রকারে হীনতর বলে সিদ্ধান্ত করে। সেভাবেই তাদের উপরে প্রাধান্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও দৌরাত্ম্য করে এসেছে। তাদের শাসনের পীড়নের হুকুম-হুমকি-হামলার কবলে রেখেছে। জীবন-জীবিকার, বিদ্যা-বিত্ত-বেসাতের যশ, মান, খ্যাতি-ক্ষমতা-শাসন-শোষণ-পেষণ-পীড়ন-দলন-দমন, শাস্ত্র, শিক্ষা, সংস্কৃতি-সভ্যতা-আবিষ্কার-উদ্ভাবন-নির্মাণ-সৃষ্টি প্রভৃতি সব কিছুর মালিক হল পুরুষ। তাই ভাষাটাও তৈরি হল পুরুষের জন্যেই। আকার-ইকার বসিয়ে ভাষাকে নারী নির্দেশক করা হয় এবং শাস্ত্র-শিক্ষা-শাসন-সংস্কৃতি-সমাজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা ছিল না বলে ভাষায় এসব ক্ষেত্রে নারীবাচক শব্দ বা পরিভাষা মেলে না আজো। আবার মাতৃপ্রধান সমাজেও নারীর নব নব প্রয়োজন চেতনার, উচ্চাশার, শিক্ষার, আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের, নির্মাণের, সৃষ্টির উদ্যমের, উদ্যোগের, আয়োজনের, শাসনক্ষমতা বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা পুরুষের মতো প্রবল ছিল না বলে এবং মাতৃত্বের দায়িত্ব ও আবেগ বাধা হয়ে থাকে বলে মাতৃপ্রধান সমাজের বিকাশ-বিস্তার-উৎকর্ষ বিশেষ ঘটেনি। তা কালক্রমে বিলুপ্তই হয়েছে এবং হচ্ছে। পুরুষপ্রধান সমাজে নারী চির অবহেলিত ও অবজ্ঞাত। যদিও দুনিয়ায় মর্ত্যজীবনে পারিবারিকজীবনে জন্ম-জীবন-মৃত্যুকালে জননী-জায়া-জাত ব্যতীত নির্ভর করবার মতো, ভরসা রাখবার মতো, সেবায় আস্থা রাখবার মতো আপনজন কে আছে? আমরা যখন নারী নিন্দা করি তখন মনেই রাখি না যে ওই নারীই আমার মা-বোন-কন্যা-পত্নীর মতো প্রিয়জন। এমন সময় ছিল নারীর আত্মাও স্বীকার করা হত না প্রাচীন সভ্য সমাজে, যেমন স্বীকার করা হত না দাসদের আত্মা। সে জন্যেই আজো কালো মানুষের এবং নারীর সভ্যতায় কোনো অবদান নেই। যে-কোনো কারণে হোক মাতৃতান্ত্রিক ও কালো মানুষের মন-মগজ-মনন-মনীষার প্রত্যাশিত মাত্রায় আগে কখনো কোনো ব্যক্তিক বা সামাজিক স্তরে বিকাশ বিস্তার উৎকর্ষ ঘটেনি, যদিও আমরা ইতিহাসের সাক্ষ্যে ও প্রমাণে জানি কখনো কখনো কোথাও কোথাও বিশেষ পরিবেশে ও প্রয়োজনে নারী ও কালো মানুষ শক্তির, সাহসের, বুদ্ধির ও কৌশলের অসামান্য প্রমাণ দিয়েছে আদি ও আদিম কাল থেকে। এও সত্য যে অরণ্য, পর্বত ও অনুর্বর অঞ্চলবাসীর বিশ্বাস-সংস্কৃতি-সভ্যতা বিকাশ পায়নি, কেবলই আবর্তিত হয়েছে। মৌমাছিতন্ত্রে যেমন মদ্দারাই কর্মী তেমনি মাতৃতান্ত্রিক সমাজেও পুরুষরাই কঠিন শ্রমে ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ছিল এবং থাকে নিযুক্ত। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ নারীর সহযোগী, প্রভু নয়। জনজাতি আদিবাসী-উপজাতির মধ্যে আজো তা কমবেশি বিদ্যমান। নারীরা স্বাধীন।

সাধারণভাবে সুযোগের, স্বাধীনতার প্রতিবেশের অভাবে আজো নারী আর কৃষ্ণকায় মানুষেরা দীন মগজের ও হীন মনন-মনীষার বলে পুরুষপ্রাধান্যের প্রভাবে নিজেদের ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নারী আজো নিজেদের পুরুষসম্ভোগ্য ভাবে, এ জন্যেই নারীর অস্তিত্ব, জীবন কেবল স্বামীর সম্ভোগের ও সুখের জন্যেই, এ জীবনের আর কোনো উপযোগ আছে বলে বিশেষ করে হিন্দু ঘরের নারীরা আজো শাস্ত্রের প্রভাবে এবং আজন্ম লালিত বিশ্বাসের সংস্কারের ধারণার বশে আর সতীত্বের পুরুষারোপিত চেতনার গাঢ় গভীরতার ফলে জানে না, বোঝে না, মানে না। প্রমাণ হিন্দু লিখিত গল্প উপন্যাস নাটক। একালে ভারতে বিধবা বিয়ে এবং বিয়েবিচ্ছেদ বা তালাক ব্যবস্থা নারী মনের সিন্দুবাদের ভূতরূপ সতীত্ব চেতনার পতির দেবত্বের অবসান ঘটাবে, আশা করা অসঙ্গত নয়। নারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল স্বামী সম্ভোগ্যা বলেই সতীদাহ প্রথা চালু হয়েছিল উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্য সমাজে। আজো য়ুরোপে নারী পুরুষ-সম্ভোগ্যা বলেই নারী দৃষ্টিনন্দন নগ্না এবং পুরুষের বাহুলগ্না।

আমাদের ভারতবর্ষে কামশাস্ত্রও বাৎস্যায়ন নামের পুরুষের রচনা, কামসম্ভোগ-তত্ত্বালোচনা প্রভৃতি সর্বত্র পুরুষের অবদান। ফলে পুরুষেরা নারীকে তার নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণের অপব্যাখ্যা বলে পুরুষসম্ভোগ্যা বলেই ধরে নিয়েছে, যেন নারীর যৌন জীবন নেই, যেন নারী সমভাবে কোনো সুখ উপভোগ করে না। এর একটি কারণ হয়তো এই যে আমরা অন্যান্য জীব জন্তুর মধ্যে মাদী প্রাণীরা সৃষ্টির প্রয়োজনে অর্থাৎ স্যবক বা বৎস প্রজননের জন্যেই কেবল প্রাকৃতিক নিয়মে কামাসক্ত হয়, দেখতে পাই। অবশ্য চড়ুই পায়রা প্রভৃতি কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। বিশেষ করে সৃষ্ট পোষ্য লোকালয়ের প্রাণীদের মধ্যে চিরকাল মাদীদের অন্য সময়ে কামচর্চা দেখা যায় না। এ জ্ঞান থেকেই নারীদের কৃত্রিমভাবে কামাসক্ত করে সম্ভোগ করা হয়– এমন একটি ধারণা হাজার হাজার বছর আগে থেকেই হয়তো নারীকে পুরুষসম্ভোগ্যা প্রাণী রূপে ভাবতে এবং তার সতীত্ব দাবি করতে শিখিয়েছে। যদিও বা আদিকাল থেকেই পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মাঝে মধ্যে নারীর নেতৃত্ব কর্তৃত্ব শক্তি সাহস বুদ্ধি ও কৃতি-কীর্তি রূপকথায়, উপকথায় বর্ণিত হয়েছে, দেখতে পাই। সভ্যজগতে ও সুপ্রাচীন কাল থেকেই সাহিত্যে, এবং বাস্তবে নারীর নেতৃত্বের কর্তৃত্বের রাজত্বের যুদ্ধে নেতৃত্বদানের ঘটনা দুর্লভ ছিল না। রক্ষণশীল মুসলিম সমাজেও শাস্ত্রবিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দিল্লিতে নারী রিজিয়াকে তখতে বসানো হয়েছিল, যেমন এলিজাবেথ বসেছিলেন ইংল্যান্ডের রাজাসনে। রূপসী নারীর সন্ধানে রাজপুত্র কেমন নিরুদ্দেশ যাত্রায় অনুপ্রাণিত হয়েছে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে, আলেফ লায়লা যেমন সাহেরবানুর অনুগত মুনিরসামী দেশান্তরে ঘুরেছে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে, তেমনি রূপসীর প্রেমধন্য হবার জন্যে যুগে যুগে দেশে দেশে প্রজন্মক্রমে পুরুষেরা মজনু-খসরু-ফরহাদের মতো জীবন উৎসর্গ করেছে সানন্দ আগ্রহে। আজো করে গাঁয়ে গঞ্জে শহরে বন্দরে সর্বত্র। নারীপ্রেম আজো সাধনার ধন। তবু প্রাজন্মক্রমিক সুপ্রাচীন বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার প্রভাবে নারী আজো পুরুষের কাছে সর্বপ্রকার দোষের দুর্বলতার অবুদ্ধির কুটিলতার কাপট্যের আকর। উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে নারী পুরুষসম্ভোগ্যা বলেই ভোক্তা স্বামীর মৃত্যুতে বিধবাকে মরতে হত কিংবা অতৃপ্ত যৌবন যন্ত্রণা সহ্য করতে হত। হতে হয় বঞ্চিত খাদ্য থেকে, ব্যর্থ হয় যৌবন জীবন।

অন্যদিকে রূপসী নারী হরণ নিয়েই, নারীর অধিকার নিয়েই, নারীর প্রতি আসক্তি নিয়েই রচিত হয়েছে জগতের আদি মহাকাব্য। আদি দ্বন্দ্বযুদ্ধ ডুয়েল, আদি রূপকথাগুলো, নারীপ্রেমই কবির প্রেমকাব্যের উৎস। প্রেয়সী নারীর দেয়া উত্তেজনা, উদ্দীপনা, প্রেরণা, প্রণোদনা, প্রবর্তনা আজো পুরুষের যুদ্ধের, দ্বন্দ্বের, কর্মের শক্তির সাহসের উদ্যমের উদ্যোগের উৎস। এখনো নারীর অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়। হয় হত্যাকাণ্ড। নারী জড়িয়ে রয়েছে পুরুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে। একটা বিশেষ বয়সে নারী পুরুষের মনের ও মর্মের, অঙ্গের ও অন্তরের আবশ্যিক সম্পদ। পাখিদের মধ্যে সন্তান লালনে মাতার সঙ্গে পিতাও সহযোগিতা করে। পশুজগতে শাবক লালনের দায়িত্ব মায়েরই। কিন্তু মাতৃতান্ত্রিক সমাজে চালু ছিল কেবল মৌমাছিতন্ত্র। নারী ছিল স্বাধীন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষোল শতকে মার্টিন লুথার নারীকে কিছু পরোক্ষ অধিকার দেন, ইসলাম দেয় তার সম্মতির ও পিতৃ সম্পদে, স্বামীর সম্পদে অধিকার। তবু উনিশ শতকের আগে নারীও ছিল না তার অধিকার সচেতন, পুরুষরা ভাবেনি তাকে অধিকার দানের কথা। আমাদের বাঙলাদেশের চৈতন্যদেব তত্ত্বত দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি পারস্পরিক প্রেম বলে স্বীকার করেছিলেন পনেরো শতকে। উল্লেখ্য যে, নারী পর্দা কিংবা অবরোধ সব দেশে সব সমাজে সব শাস্ত্রে কখনো চালু ছিল না। কাজেই বাইরের আলো বাতাস নেয়ার সুযোগ অধিকাংশ নারী পেয়েছে। তবু নারী-পুরুষে মেলামেশা সহজ ছিল না। য়ুরোপেও উনিশ শতকের আগে অভিনেত্রী মিলত না। সভ্য খ্রীস্টান জগতে নারী পুরুষভোগ্যা রূপেই আদর কদর পায় বেশি। শীতের দেশেও নারীর পোশাক তাই সর্বাঙ্গীন নয়, যদিও পুরুষের সর্বাঙ্গ থাকে আচ্ছাদিত। আমাদের কলকাতা শহরে ১৮৮০ সালের মধ্যে কয়েকজন দেশি খ্রীস্টান ও ব্রাহ্ম নারী স্নাতক ২য় বা উচ্চশিক্ষা পান কিন্তু তখনো খাস ইংল্যান্ডে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেয়া হত না। ইংল্যান্ডের নারীরা ভোটাধিকার পায় মাত্র ১৯৩০ সালে। আমাদের স্বাধীন উপমহাদেশের প্রথম নারী বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত ও রানা লিয়াকত আলি, রাষ্ট্রদূত হন। এ ক্ষেত্রে গোটা পৃথিবীতে এ উপমহাদেশই পথিকৃত। এশিয়াতেই প্রথম গোল্ডা ম্যায়ার, বন্দর নায়েকে, ইন্দিরা, একিনো, বেনজির ভুট্টো, খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা, চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্র প্রধান হন। য়ুরোপে প্রথম মার্গারেট থ্যাচার। এর পরে তুরস্কে-কানাডায় নারী এসব পদ পেতে থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আজো কোনো নারী রাষ্ট্রপতি হননি। উনিশ শতকের য়ুরোপে নারী মুক্তির আন্দোলন শুরু করেন অবশ্য উদার মনের পুরুষরাই। জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়। আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর দিয়েই এ মুক্তি আন্দোলন শুরু। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম পাদে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনই নারীদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান দ্রোহিণী। তিনিই প্রথম সাহস করে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেন যে শাস্ত্রী ও সমাজ পুরুষের তৈরি বলেই নারী সর্বপ্রকারে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিতা। নবী-অবতারেও তাঁর আস্থা ছিল না।

তিনি প্রশ্ন করেছেন, পৃথিবীর সর্বত্র নবী-অবতার আবির্ভূত হননি কেন? কেন কোনো নারী হননি নবী-অবতার? এতেই বোঝা যায় পুরুষের স্বার্থেই এসব শাস্ত্র, সমাজনীতি বানানো। অতএব নারীকে আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন হতে হবে। তাঁর পদ্মরাগ, সুলতানাস ড্রিম, নারীস্থান, অবরোধবাসিনী, মোতিচুর প্রবন্ধাবলীই তাঁর একক দ্রোহের সাক্ষ্য। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষকেই লোভে-লাভে-স্বার্থে নারীর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। যার পরিণামে নারী লৌহকঠিন খাঁচারুদ্ধ প্রাণীতে বা সেবাদাসীতে পরিণত হয় প্রায় সব মৌল মানবিক অধিকার হারিয়ে। আমাদের একালে গোটা দুনিয়ায় নারীরা স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার জন্যে আন্দোলন করছে। পুরুষরাও মুখে অন্তত তাদের এ আন্দোলনের সমর্থক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যদিও তাদের আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত নয়। কেননা শিক্ষিত ঘরেও নারী আজো যৌতুকের জন্যে, আচার-আচরণের জন্যে, আনুগত্যাভাবের জন্যে নির্যাতিতা হয় স্বামী-শাশুড়িদের কথায়, কাজে ও আচরণে। আবার নারীরা সচেতনভাবে তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সংগ্রামে নিষ্ঠ কি-না বোঝা যায় না। কেননা তারা আজো হীনম্মন্যতায় ভোগে। তারা তাদের প্রাথমিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তরের ছোটো ছোটো অধিকারগুলোও আয়ত্ত করতে চায় না। পুরুষের মতো জীবন-জীবিকার শাস্ত্র-সমাজের রাজনীতিক-আর্থিক ক্ষেত্রে সমান স্বাধিকার আদায়ের আগে, যা তাদের সাধ্যের মধ্যে তা-ই প্রথমে গ্রহণে বর্জনে অর্জন করুক। যেমন:

১. নামের সঙ্গে পিতার স্বামীর নাম যোগ করার মতো আত্মপ্রত্যয়হীনতা পরিহার করে স্বনামে পুরুষের মতো পরিচিত হোক। নাম ও ঠিকানাই হোক পরিচিতির ভিত্তি। স্বামী যেমন স্ত্রীর নামে পরিচিত হয় না, স্ত্রীও তেমন স্বামীর নামে পরিচিতা হতে অপমানিতা বোধ করবে।

২. উচ্চশিক্ষিতা, পদে-পদবীতে ধন্য পিতার সন্তান হয়েও কাবিন নামের উচ্চমূল্যে আত্মবিক্রয়ের গ্লানি ও লজ্জা থেকে মুসলিম নারী আত্মমুক্তি বাঞ্ছিত মনে করুক, সাড়ে তেরোশ বছর আগেকার আরবে এবং পৃথিবীর অনেক সমাজে নারী রোজগেরে ছিল না বলেই কাবিন যোগে আত্মবিক্রয় করত খোরপোশ ও নগদ বাকি টাকার বিনিময়ে।

৩. হিন্দু নারীরা স্বামীকে জীবিতেশ্বর জ্ঞান করা, জন্মান্তরেরও সঙ্গী বলে জানা পরিহার করুক, বিবাহ বিচ্ছেদের, পিতৃ ও স্বামীর সম্পদের অধিকার দাবি করুক এবং বিধবারা পুনর্বিবাহে উৎসাহী হোক। ভারতে যখন এসব আইন চালু হয়েছে, এখানে দাবি করলেই আইনত অধিকার মিলবে। প্রস্তাবে-পয়গামে, নয় ঘটকের মাধ্যমে, সরাসরি পারস্পরিক সম্মতিক্রমেই হবে বিয়ে।

৪. দাম্পত্য জীবনে নারী-পুরুষ সমঅধিকারে প্রতিষ্ঠিত হোক, সেব্য-সেবিকা সম্পর্ক, স্বামীরূপ প্রভুর জীবতেশ্বরের দাসী বাঁদী ধারণা বর্জন করা আবশ্যিক ও জরুরী। নারী ও পুরুষ উভয়েই বিয়ে করবে। বিয়ে হবে না।

৫. ক্ষেত্র-বীজ তত্ত্ব অস্বীকার করতে হবে। সন্তানে নারী-পুরুষের মা-বাপের অধিকার হবে সমান। সন্তান ইচ্ছেমত মায়ের বা বাপের নামে পরিচিত হতে পারবে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অধিকারে।

৬. বিবাহপূর্ব ও বৈধবোত্তর সন্তানও সামাজিক স্বীকৃতি পাবে, যেমন পায় পুরুষের লাম্পট্য জাত সন্তান। নারীরা শরীর চর্চায় তথা ব্যায়ামে, অস্ত্র চালনায়, কারাতে, লাঠালাঠিতে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠুক। গরিব নারীরা তো চিরকালই কায়িক শ্রম করেই থাকে।

৭. নারী-পুরুষের পোশাকের প্রভেদও বিলুপ্ত হোক। স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যে রূপসজ্জাও হোক বর্জিত। স্বাধীন হতে হলে নারীকে অবশ্যই শাস্ত্রানুগত্যও ছাড়তে হবে। পুরুষের সমান অধিকার পেতে হলে এবং সমকক্ষ হলে এ সব প্রাথমিক শর্ত পূরণ প্রয়োজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেক্যুলারিজম ও অভিন্ন বিশ্বসংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের

গোষ্ঠী, গোত্র, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, নিবাস নিয়ে স্বাতন্ত্র্যচেতনা গড়ে উঠেছিল আদি ও আদিম অসহায় মানুষের যূথবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতায় স্বনির্ভরতায় সহঅবস্থানের জৈবিক গরজে। বিদ্যুৎযোগে নির্মিত ও বিদ্যুৎচালিত যন্ত্র চালু হবার আগে মানুষের অবস্থানের ও অবস্থার আবর্তনই ছিল, বিবর্তন ও পরিবর্তন ছিল কৃচিৎ এবং মন্থর আর তা ছিল অসামান্য মগজী লোকের নতুন চেতনার, চিন্তার, উদ্ভাবনের, আবিষ্কারের ও নির্মাণের প্রসূন। এমনি সমাজে ছিল Race, Religion, Region ও Language-এর স্বাতন্ত্র্যের গুরুত্ব। ছিল স্বাতন্ত্র্যে, পার্থক্যে ও বৈপরীত্যেই অস্তিত্বের নিরাপত্তা। সড়ক-সেতু-যানবাহনের অভাবে সমুদ্র-পর্বত-অরণ্য ছিল অলঙ্ঘ্য দুর্লঙ্ঘ্য কাজেই সামান্য দূরত্বের ব্যবধানেও এক একটা কৌম-গোষ্ঠী-গোত্রকে স্ব-উদ্ভাবিত হাতিয়ার, ভাষা, যূথবদ্ধ জীবন যাপনের গরজে নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করতে হয়েছে তাদের জাগ্রত জীবনের আচারে ও আচরণে। স্থানগত উর্বরতায় উচ্চাবরের ও আর্তব-প্রভাবের দরুন জীবিকাপদ্ধতির ও জীবিকার উপকরণের ধরন বিভিন্ন হয়। এভাবেই গোটা পৃথিবীর সর্বত্র এক সময়ে দুরধিগম্যতাজাত বিচ্ছিন্নতার ব্যবধান, অপরিচয়ের ও অননুকৃতির ফলে আঞ্চলিক ও গৌত্রিক ভাবে মানুষের স্থানিক অবস্থানে স্ব স্ব ভাষা, হাতিয়ার, নীতিনিয়ম তথা নীতি-আদর্শ শাস্ত্র নামে এথিকস বা নীতিশাস্ত্র এবং জীবিকা-পদ্ধতি যেমন স্বাতন্ত্র্য বা পৃথক ভাবে গড়ে উঠেছে, তেমনি সামগ্রিক, সামূহিক ও সামাজিক জীবনচেতনায় ও জগৎভাবনায়ও লৌকিক ও স্থানিক বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য, বৈপরীত্য প্রকট হয়ে উঠেছে কালক্রমে। একালে যা জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা, নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি, পালা-পার্বণ, আচার-আচরণ, খাদ্য, পোশাক, রুচি-সংস্কৃতি, জগৎ-জীবন সম্বন্ধে বিশ্বাস-সংস্কর-ধারণা রূপে অতলান্তিক ব্যবধান সৃষ্টি করেছে মানুষে মানুষে এবং বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানীর বদৌলত সৃষ্ট এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে আর এ যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রনির্ভর ব্যক্তিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক তথা মর্ত্যজীবনেও আমরা বিদ্যায় বিত্তে বেসাতে ঋদ্ধ, পুষ্ট ও হৃষ্ট হয়েও সেই অজ্ঞতার, অসামর্থ্যের, বিচ্ছিন্নতার, অপরিচয়ের ব্যবধানের কালের স্বাতন্ত্র্য, পার্থক্য ও বৈপরীত্য সযত্নে লালনে বজায় রাখতে প্রয়াসী। এ ক্ষেত্রে মনোভাবের দিক দিয়ে আমরা দ্বিদলে বিভক্ত। একদল উত্তমন্য, অন্যদল অধমন্য। একদল ঘৃণায়, অবজ্ঞায়, উন্নাসিকতায় আত্মশ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার গরজবোধে, অন্যদল ঈর্ষায়, অসূয়ায়, আত্মগ্লানির যন্ত্রণায় অস্তিত্ব বিলুপ্তির আশঙ্কায় গ্রহণ বিমুখ কমঠ স্বভাব প্রবণতায় স্বাতন্ত্র্যধর্মী। ফলে পৃথিবীর কোথাও মানুষ আজো বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের কেবল মানুষ রূপে এবং অন্যদের যোগ্যতা-বর্ণ-ভাষা-নিবাস-জীবন-চেতনা নির্বিশেষে মানুষ হিসেবে জানতে, বুঝতে ও মানতে চায় না।

দেশ-কাল-প্রজন্মের দাবি কেউ অস্বীকার করে অতীত ও ঐতিহ্যমুখী হয়ে ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায়, জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না সমকালীন হয়ে। একালে মনে-মগজে-মর্মে-মননে-মনীষায় নতুন চেতনা-চিন্তা সৃজনে এবং গবেষণায়, আবিষ্কারে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্ভাবনে, নির্মাণে-সৃষ্টিতে আর বৈচিত্র্য সাধনে নিত্য উন্মেষশীল, বিকাশশীল ও উৎকর্ষপ্রবণ থাকাতেই নিহিত বাঁচার সার্থকতা।

কালোপযোগী হয়ে সুষ্ঠুভাবে সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রতিবেশে আর বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে টিকে থাকার, সার্থক জীবনযাত্রার ও জীবনযাপনের লক্ষ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ এখন সমুদ্র-পর্বত-অরণ্যের খবর মানুষের আয়ত্তে, নভোমণ্ডল মানুষের জিজ্ঞাসার ও সন্ধিৎসার বিষয়, জন্ম-জীবন-মৃত্যু তত্ত্বও এখন জানা এবং মানুষ জীব-জীবনও স্রষ্টা, জিন বা কোষ-ক্লোন জ্ঞান মানুষকে অশেষ জ্ঞানের ও শক্তির অধিকারী করবে অচিরে। নতুন নতুন যন্ত্র আর বিজ্ঞানের তথা প্রকৃতির তত্ত্ব, তথ্য, সত্ত্ব ও সম্পদ মানুষকে করবে অমিত শক্তিধর জীবন ও জগৎ-নিয়ন্তা নিয়ামক।

অতএব, একালে ব্যক্তিচিত্তে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক নাগরিক চেতনা প্রত্যাশিত। আমরা জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা প্রভৃতির পার্থক্য সত্ত্বেও এক অভিন্ন আঙ্গিক ও মগজী সংস্কৃতির বরণে ও অনুশীলনের পক্ষপাতী আমাদের মানব প্রজাতির সবার মধ্যেই অভিন্ন উৎকৃষ্ট মানবিক গুণের, মনুষ্যত্বের, মানবতার ও মানববাদিতার উন্মেষ, বিকাশ ও উৎকর্ষ ঘটানোর লক্ষ্যে। তাহলে দেশে-রাষ্ট্রে-সমাজে ও জীবিকাক্ষেত্রে মানুষ হবে সেক্যুলার। নাগরিক নির্বিশেষে রাষ্ট্রিক বা দৈশিক জাতীয়তায় অভিন্ন মতের ও পথের, থাকবে না বিধর্মী বিদ্বেষ বা সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যচেতনা ও দ্বেষণা। আমরা ব্যক্তিক জীবনে যেমন নিজের মতো হয়ে থেকেও যুগপৎ ও একাধারে কারো মামা, কারো দাদা, কারো পিতা, কারো চাকুরে, কারো শত্রু, কারো বন্ধু, কারো খাতক, কারো প্রভু রূপে জীবনের নিত্যকার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করি, তেমনি কোনো স্থানের ও কালের অবস্থানে থেকেও বিদ্যায় বিত্তে বেসাতে কোনো অবস্থার ও শ্রেণীর হয়েও, কোনো রাষ্ট্রের, সমাজের, সম্প্রদায়ের অনুগত থেকেও আমরা বিশ্বের নির্বিশেষ নাগরিক হতে পারি মানস ও বাহ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়েই। আজকের দিনে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি আর জীবিকা ক্ষেত্রে বৈশ্বিক স্তরে অভিন্ন ও একাত্ম হতেই হবে আত্ম ও মানবকল্যাণে। আজকের মানুষের প্রগতিশীল প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার ফুল-ফল-ফসল হবে অভিন্ন মানবচেতনা ও সংস্কৃতিচিন্তা। চিকিৎসকের কাছে যেমন রোগীর জাতভেদ থাকে না– রোগের প্রতিরোধে প্রতিষেধক চেতনাই থাকে একান্ত ভাবে, তেমনি একালের শিক্ষিত সংস্কৃতিমান ব্যক্তির কাছে কেবল ব্যক্তি মানুষই থাকে মুখ্য বিবেচ্য– ইহুদী-খ্রীস্টান-হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈব-শিখ-মুসলিম নয়। এভাবেই সম্ভব জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা-মতবাদী সম্প্রদায়-নিবাস-শ্রেণী-জীবিকা নির্বিশেষে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত বিরল শ্রম ও পণ্য বিনিময়ে সহযোগিতায় স্বস্তি শান্তিতে সহাবস্থান। এর নামই হবে সেক্যুলারিজম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংখ্যালঘুর দীন-দুর্বলের বারোমাসে তেরো সমস্যা

একসময়ে পৃথিবী স্বৈর ও স্বেচ্ছাচারী শাহ-সামন্তরাই শাসন করত। রাজ্য, রাজ্যবাদী মানুষাদি সব প্রাণী জীব উদ্ভিদ জমি-জল ছিল তাদেরই ব্যক্তিগত সম্পদ। কাজেই তাদের শাসন ছিল ঐকমত্যের ও আনুগত্যের দৃঢ় অঙ্গীকারের শাসন। তাদের শাসন ও সোহাগ ছিল অনুমানাতীত। ভারতচন্দ্র রায়ের ভাষায় 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ/ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।' কথায় বলে 'বাদশাহ্‌র মন— খেয়াল খুশির মন, যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেকসম্মত নয় তা।' এজন্যে কবি মুহম্মদ খানও বলেছেন 'রাজদরবারে দায়ে না ঠেকলে যেতে নেই।' আমাদের দেশী আপ্তবাক্যেও উচ্চারিত হয়েছে সাবধানবাণী 'বশ করতে না জানলে ঘোড়ার পেছনে ও প্রভুর বা রাজার সামনে যেতে নেই।'

মানুষও যখন দাস, ক্রীতদাস ও ভূমিদাসরূপে মালিকের প্রাণিসম্পদ ছিল, সে যুগ এখন বিলুপ্ত। এখন ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্যের ও স্বাধীনতার কাল, এখন দেশ ও রাষ্ট্র রাজার ভূসম্পত্তি নয়, জনগণের জন্মগত অধিকারের ভিটে, এখন জন্মভূমির মালিক জনগণ এবং জনগণ রাষ্ট্রের নাগরিক আর দৈশিক বা রাষ্ট্রিক জাতীয়তা বোধে প্রবুদ্ধ গণতন্ত্রী, মানবিকতা, মানবতা, মনুষ্যত্ব ও মানববাদীও। এগুলো বাস্তবে সর্বদা-সর্বত্র না মিললেও বিশ্বাসে-সংস্কারে ধারণায়-প্রত্যয়ে তা মনে মর্মে মগজে দৃঢ়মূল। সমস্যার উন্মেষ বিকাশ ঘটেছে এ কারণেই। আগের কালে প্রভুর-মালিকের প্রতি অনুরাগ ও আনুগত্য এবং তার অনুগামিতা ছিল আবর্তিত জীবনে গতানুগতিক অভ্যস্ত জীবনের আবশ্যিক অংশ।

একালে সত্তার মূল্য, মর্যাদা ও স্বাধীনতা সচেতন মানুষ যুক্তি-বুদ্ধি-দায়িত্ব-কর্তব্য-অধিকারের মাপে মানে মাত্রায় যাচাই-বাছাই-ঝাড়াই করেই, উপযোগ ও তাৎপর্য সন্ধান ও বিচার করেই গ্রহণ-বর্জন করতে চায়। তাকে আদেশে-নির্দেশে-উপদেশে-পরামর্শে কিছু মানানো-করানো যাচ্ছে না। কালান্তরে, স্থানান্তরে, অবস্থান্তরে ও প্রজন্মান্তরে এমনিই ঘটে। আমাদের সঙ্কট হচ্ছে অতীত-ঐতিহ্যমুখিতার ও সমকালচেতনার ও সমকালের চাহিদা পূরণের টানাপোড়েনের সমস্যাজাত। আগের কালে অজ্ঞতা-অনক্ষরতাদুষ্ট সমাজে মানুষের মন-মগজ-মনন একান্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করত আসমানে-জমিনে প্রসৃত অদৃশ্য অলৌকিক লৌকিক-অলীক-স্থানিক নানা অরি-মিত্র শক্তি। সে-শক্তির নাম ঈশ্বর, দেবতা, অপদেবতা, দৈত্য, দানু-ভূত-ভগবান-প্রেত-পিশাচ-ওলা-শীতলা-শনি-ষষ্ঠী প্রভৃতি। দার্শনিক বা ভাবগত নামও ছিল নিয়তি, কর্মফল প্রভৃতি রূপে।

জন্মসূত্রে লব্ধ ধর্মবুদ্ধি ও শাস্ত্রচেতনাও ছিল ঋজু। নিজের ধর্মবিশ্বাস ও শাস্ত্রিক বিধিনিষেধ ব্যতীত অন্যসব ধর্মের শিক্ষা ভুল, ত্রুটি বহুল কিংবা অযৌক্তিক-অবৌদ্ধিক-অসঙ্গত। কাজেই অন্যের শাস্ত্র হল অবজ্ঞেয় পরিহার্য এবং নিজের শাস্ত্র হচ্ছে নিশ্চিন্তে পারত্রিক সঙ্কট-সমস্যা মুক্তির নির্বিঘ্ন পন্থা। সাধারণভাবে বিভিন্ন ধর্ম শাস্ত্রিক জাতির কিংবা মতবাদী সম্প্রদায়ের সঙ্গে গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে-পাড়ায় কোনো বাহ্য-বিবাদ-বিরোধ ছিল না এদের মধ্যে। যদিও ধর্মাচার নিয়ে উপহাস-পরিহাস চলত নৌকায়-আড্ডায়। কিন্তু ভিন্নতর লাভে-লোভে-স্বার্থে দীর্ঘস্থায়ী দাঙ্গা বাধাত স্থানীয়ভাবে বিত্ত-বেসাতের মালিক। সমাজের সর্দার-মণ্ডল-মোড়ল-মাতব্বর-প্রধান-জমিদার-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাজন-টাউন-প্রশাসকেরা। সেকালে লোকে অজ্ঞতার দরুন ও যানবাহনের অভাবে বিচ্ছিন্নতার ব্যবধানে বাস করত বলে এ সব দ্বেষ-দ্বন্দ্ব বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ত না, গাঁয়ের-পাড়ার-মহল্লার সীমায় ঘটে আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই থেমে যেত। ১৭৮২ সন থেকে ইতিহাসের সাক্ষ্যে দেখা যায় গোটা উনিশ শতকে যে কয়টা হিন্দু-মুসলিম, শিয়া-সুন্নী এবং হিন্দুদের মতবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ-বিরোধ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত ঘটেছে, কোনোটাই হত্যাকাণ্ড বহুল হয়নি, নররক্তে ভেজেনি ভূমি। মারামারি হয়েছে কিন্তু সুপরিকল্পিত ভাবে রক্তক্ষরা-প্রাণহরা দাঙ্গা বাধায়নি। বিশশতকী দাঙ্গাগুলোর প্রায় প্রত্যেকটার মূলে ছিল রাজনীতিক মতলব এবং তখন থেকেই জাতিদ্বেষণাগত, মতবাদী সম্প্রদায়গত, সাম্প্রদায়িক-রাজনীতিক দলীয় দাঙ্গাগুলো যেমন নর রক্তক্ষরা প্রাণহরাবহুল হতে থাকে, তেমনি পেতে থাকে স্থানিক ও কালিক বিস্তৃতি। একালে সাক্ষরতার, সংবাদপত্রের, যানবাহনের, যান্ত্রিক প্রচার মাধ্যমের বহুলতার, অনেকতার ও সহজতার দরুন বাবরি মসজিদ সম্পৃক্ত বিরোধ-বিবাদ-সংঘাত সংঘর্ষ-ধর্ষণ-দহন-হনন-লুণ্ঠন-ভাঙ্গন হয়েছে পুরো উপমহাদেশ ব্যাপী। অথচ উক্ত মাধ্যমগুলোর স্বল্পতার দরুন ১৯৪৬-৪৭ সনোত্তর দাঙ্গাগুলো ছিল শহরের সীমায় নিবদ্ধ, গ্রামগুলো ছিল মুক্ত, নিরুপদ্রুত ও নিরাপদ।

শাস্ত্রনিষ্ঠ আস্তিক মানুষ কখনো উদার, অনুগ্র ও সহিষ্ণু হতে পারে না, শাস্ত্রনিষ্ঠা মানে অর্থোডক্সি, অর্থোডকসিতে থাকে স্বাতন্ত্র্যচেতনার, অবজ্ঞার ও বর্জন বা পরিহার করে চলার সযত্ন প্রয়াস। এ জন্যেই শাস্ত্রমানা ধার্মিকমাত্রই পরধর্ম-পরধর্মীর থেকে তফাতে থাকতে চায়, অন্তরের গভীরে এক প্রকার নিষ্ক্রিয় ঘৃণা-অবজ্ঞা পোষণেই তার স্বধর্মে আস্থা এবং স্বশাস্ত্রে নিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়। কাজেই আসলে শাস্ত্রনিষ্ঠা ধর্মবুদ্ধি মানুষের স্বমতের লোকদের মধ্যে মিলন ও সংহতি স্পৃহা বৃদ্ধি করলেও, বিধর্মীর ও বিমতের লোকের মধ্যে কখনো মিলন-ময়দান তৈরি করে না, বিভেদের, বৈপরীত্যের, পার্থক্যের ও স্বাতন্ত্র্যের দেয়ালই তৈরি ও দৃঢ় করে শাস্ত্রানুগত্য ও যূথবদ্ধতা পাকাপোক্ত রাখার গরজে। কাজেই আস্তিক শাস্ত্রিক মাত্রই কূর্মস্বভাবের ও স্বাতন্ত্র্যকামী উগ্র-অসহিষ্ণু স্বধর্মীর হিতকামী আর বিধর্মীর অমঙ্গল-অকল্যাণকামী হওয়ারই কথা। এজন্যেই ধার্মিক তথা স্বধর্মপ্রিয় লোকমাত্রই কমঠ প্রবৃত্তি চালিতই থাকে। তবে সাধু-সন্ত-সন্ন্যাসী-যোগী-সুফী-ফকির-ভিক্ষু-শ্রমণ-দরবেশ প্রভৃতি মরমীয়ারা স্বধর্মী বিধর্মী পাপীতাপী নির্বিশেষে সবার প্রতি সমভাবে প্রসন্ন থাকেন। মানুষ নির্বিশেষকে 'মানুষ' রূপেই সহজে গ্রহণ করেন নিজেদের বুজুরগির মহিমা প্রদর্শনের লক্ষ্যে। তাঁরা সামাজিক মানুষ নন, তাই আলোচ্য নন। বরং আমরা মানুষের মন-মগজ-মননের আধুনিকায়ন চাই বলেই, মানুষের চেতনা থেকে পারত্রিক জীবনের গুরুত্ব কমিয়ে কিংবা মুছে দিয়ে মর্ত্যজীবনের মূল্য-মর্যাদা-প্রয়োজনবুদ্ধি জাগানোর প্রয়াসী হয়েই ধর্মবিশ্বাসকে, শাস্ত্রানুগত্যকে, আচারনিষ্ঠাকে হালকাভাবে গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছি কালিক আর্থিক জাতিক রাষ্ট্রিক জীবনের চাহিদা মেটানোর তাগিদে। বলছি ধর্মবিশ্বাস-শাস্ত্রনিষ্ঠা সামাজিক নয়, ব্যক্তিক। অথচ সত্য এই যে ধর্মবিশ্বাস ও শাস্ত্রনিষ্ঠাই আগের কালে ক্লেন-কৌম-গোষ্ঠী-গোত্র-বর্ণ-ভাষা-পেশা-শ্রেণী ব্যবধান ঘুচিয়ে মানুষকে শ্রম ও পণ্য বিনিময়ে সহযোগিতায় সমাজবদ্ধ হয়ে অভিন্ন নীতি-নিয়ম-আদর্শ-রীতি-রেওয়াজ-প্রথা-পদ্ধতি মেনে নির্বিরোধে নির্বিবাদে নিরুপদ্রবে-নিরাপদে শান্তিতে স্বস্তিতে সহাবস্থানের অঙ্গীকারবদ্ধ করেছিল এবং কালে কালে স্থানে স্থানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রজন্মক্রমে প্রয়োজনমতো পরিবর্তনে, পরিমার্জনে, পরিশোধনে ও গ্রহণে-বর্জনে-পরিবর্ধনে-চিন্তার-চেতনার অনুশীলন ও প্রয়োগে উৎকর্ষ সাধনে রয়েছে তৎপর।

আমরা যারা বিজ্ঞানীর ও বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য জেনে বুঝে বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেকবাদী হয়ে নাস্তিক-নিরীশ্বর হয়েছি একালে কিংবা বিজ্ঞানীর ও যন্ত্রীর প্রসাদে যন্ত্রযুগে যন্ত্রজগতে যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রনির্ভর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি এবং যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রায় স্ব স্ব শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ উপেক্ষা ও লঙ্ঘন করতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বাধ্য হচ্ছি, সেই আমরাই অবিনশ্বর আত্মাকে নশ্বর চৈতন্য বলে জেনে বুঝে ও মেনে, পারত্রিক জীবনকে অবাস্তব অযৌক্তিক বলে মেনে কিংবা আপাতত মর্ত্যজীবনপ্রীতি বশে যৌবনধর্মে উপেক্ষা ও বার্ধক্যপূর্বাবধি অস্বীকার করে ধর্মকে আমাদের আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক-রাষ্ট্রিক স্বার্থে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের, নিষ্ঠার, আচারের ও আচরণের স্তরে নিবদ্ধ রাখতে চাইছি, কিংবা সহ ও সমমতবাদীর সামাজিক পালা পার্বণে নিতান্ত সাম্প্রদায়িক সেকটেরিয়ান স্তরে সীমিত রাখতে চাই দৈশিক রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ নাগরিক নির্বিশেষের মনে সহ ও সমস্বার্থে দৃঢ়মূল করার প্রত্যাশায়। ধর্ম বিশ্বাসের ও শাস্ত্রের স্বাতন্ত্র্য প্রভাব থেকে জনগণকে জীবিকাক্ষেত্রে, রাজনীতিক অঙ্গনে এবং সরকারী ও রাষ্ট্রিক নীতি নিয়মে আদর্শের চেতনায় জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস পেশা শ্রেণী বিদ্যা বিত্ত বেসাত অবিশেষে রাষ্ট্রের নাগরিক মাত্রকেই স্বাধিকারে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠ করার ও রাখার লক্ষ্যে আমরা সরকারকে ও রাষ্ট্রকে সেক্যুলার করতে ও রাখতে চাই। কেবল সেক্যুলারিজমই জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা পেশা নিবাস শ্রেণী যোগ্যতা নির্বিশেষে নাগরিকমাত্রকেই ধর্মভেদের, সম্প্রদায়ভেদের, গোত্রভেদের, বর্ণভেদের, আর্থিক-বৃত্তিক শ্রেণীভেদের দরুন সংখ্যালঘু দলকে, মতবাদী সম্প্রদায়কে সরকারী ও রাষ্ট্রিকভাবে সর্বপ্রকার নাগরিক অধিকারে ও মর্যাদায় নিরাপদ নিরুপদ্রব জীবন যাপনের ব্যবস্থা করে দিতে পারে। যদিও নীরব নিষ্ক্রিয়ভাবে বিদ্যায় বিত্তে বেসাতে যারা উত্তম্মন্য, তারা দীনতায়-দুর্বলতায় অধম্মন্যদের অবজ্ঞা-উপেক্ষা করতেই থাকে। কারণ মনোবিজ্ঞানীদের মতে প্রবলমাত্রই দুর্বলকে আয়ত্তে রাখতে চায়, কারণ তার শক্তিমত্তার অনুভবসুখ সে পায় দুর্বলকে চরম তাচ্ছিল্যে হুকুম-হুমকি-হামলা চালাবার শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। সেক্যুলারিজমের আক্ষরিক প্রয়োগ সম্ভব হলেও সংখ্যাগুরুর এ উত্তম্মন্যতাজাত ঔদ্ধত্য, উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা নানাভাবে প্রকাশ পাবে। সরকারী অভিভাবনা, তত্ত্বাবধান, নজরদারি, খবরদারি ও তদারকিই এক্ষেত্রে বল-ভরসার অবলম্বন। কারণ ব্যক্তিগত ভাবে কোনো কোনো মানুষ মানবিক গুণের আধার হতে পারে বটে, কিন্তু তা কেবল লাখে একজনে হয়তো সচেতন অনুশীলনে সম্ভব। কাজেই সমাজে সবসময়ে মানব প্রজাতির প্রাণীর সংখ্যাই থাকবে লক্ষে নিরেনব্বই হাজার নয়শ নিরেনব্বই।

তার একটা-দুটো স্থূল সাক্ষ্য-প্রমাণ এখানে দেয়ার চেষ্টা করছি। ব্রিটিশ ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিমরা ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানে সংখ্যাগুরু হিন্দুর শাসন-শোষণ-পীড়ন আশঙ্কায় মুসলিমবহুল অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান নামে নিরাপদ আবাসভূমি দাবি করেছিল।

এ ছিল তাদের লাভ-লোভ-স্বার্থ বুদ্ধির প্রসূন, সংখ্যালঘু মানুষের যৌক্তিক-বৌদ্ধিক-মানবিক বিবেকী-বিবেচনার ফল নয়। তাই পাকিস্তানে তারা কখনো অনুভব উপলব্ধি করতে চায়নি যে, যে-ক্ষতি, যে-আঘাত, যে-অনিশ্চিতি, যে-ভীতি, যে-উপদ্রব, যে-যন্ত্রণা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-লাঞ্ছনা এড়ানোর জন্যে তারা 'পাকিস্তান' বানিয়েছে, যা তাদের জন্যে কাম্য ছিল না, তা কোনো সংখ্যালঘুর জন্যে কামনা করা অমানবিক। আমরা জানি ১৯৪৭ সনে চাকুরে ও ধনী ভদ্রলোকেরা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে যায়। অশিক্ষিত-অচাকুরে ভূমিনির্ভর ও বিভিন্ন উচ্চ-তুচ্ছ পেশা ও ঘরানার পেশাজীবীরা ছিল। উল্লেখ্য যে কেউ উদ্বাস্তু হয়নি। অর্থাৎ কাউকে ভিটে থেকে স্থূল ও প্রকাশ্য জোরে-জুলুমে-জবরদস্তিতে উচ্ছেদ করা হয়নি। কিন্তু নানা প্রকারের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সূক্ষ্ম উপায়ে ওদের জান-মাল-গর্দানের নিরাপত্তা-নিরুপদ্রবতা বিঘ্নিত করতে থাকে গাঁয়ে-গঞ্জে-নগরে-বন্দরে-পাড়ায়-মহল্লায় যার ফলে দলে দলে লোক দেশত্যাগ বা বাস্তুত্যাগ করে নিঃস্ব হয়েও ভারতাশ্রিত হয়ে জানে-মানে অবিপন্নতার বা নিরাপত্তার স্বস্তি লাভ করে। যেসব মুসলিম নিজেরা সংখ্যালঘুর জান-মাল-মানের অনিরাপত্তা এড়ানোর জন্যে নিজেদের আবাসভূম তৈরি করল, তারা কিন্তু তেমন বিপন্নদের প্রতি মানবিক সহানুভূতি বা সমানুভূতি অন্তরে পোষণ করল না। এর নাম নিছক আত্মরতি– নিখাদ স্বার্থপরতা– মানবিকতার ছিটেফোঁটা নেই এতে– এ একান্তই প্রাকৃতিক প্রেষণার প্রকাশ ছিল মাত্র। আমাদের ভয়ে দু'কোটি হিন্দু পালাল, অসহায়রা আজো বিপন্নচিত্তেই পড়ে রয়েছে অনন্যোপায় হয়ে। মুসলিমদের এ অনুদারতার ও অবিবেচনার ফলেই আজো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আবশ্যিক জরুরী দৈশিক ও রাষ্ট্রিক জাতীয়তা অকৃত্রিমভাবে গড়ে উঠল না। অমুসলিমদের প্রতি মুসলিমরা প্রীতিতো রাখেই না, তাদের যথাপ্রাপ্য পদ-পদবীও দেয় না, বিশ্বাসও করে না। অথচ কোলকাতায়-দিল্লীতে-মায়ানমারে-নেপালে-জাপানে-শ্রীলঙ্কায় হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান রাষ্ট্রদূত রাখলে বাঙলাদেশ অধিক উপকৃতই হত। মিথ্যা প্রচারণা ও মুসলিম নিন্দা বন্ধই থাকত। কিন্তু মুসলিমদের স্থূলবুদ্ধি পরকে আপন করার কথাই ভাবল না। উল্টো ইসলামিক রিপাবলিক বানিয়ে অমুসলিমদের অপমানিত ও হীনম্মন্য করে রাখল জিম্মি হিসেবে স্বাধীন ও সমকক্ষ নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করে। এখানেই শেষ নয়, যেই বাস্তুত্যাগ করে তাকেই শত্রু ঘোষণা করে তার সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি রূপে বাজেয়াপ্ত করে। মুসলিমরা যুক্তরাজ্যে যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা ভারত ব্যতীত যে-কোনো রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেও স্বরাষ্ট্রে তাদের নাগরিকত্ব ও সম্পদে অধিকার থেকে যায়, আর ভারতে বা অন্যত্র গেলে অমুসলিমেরা নাগরিকত্ব হারায়। এভাবে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে সংখ্যালঘুরা নাজেহাল হয়েছে, হচ্ছে। পাকিস্তান ভাঙায় স্বাধীন বাঙলাদেশ গড়ায় প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেও শত্রু সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হয়ে রইল, তার ভাই-ভাইপোর অধিকারে এল না এ মুহূর্ত অবধি। পুনঃ তৈরি করার অনুমতি মিলল না আড়াইশ বছরের পুরোনো রমনা মাঠের কালীমন্দির। বিধর্মী বলে প্রতিবেশীকে পর করে রেখে কেউ তার শুভেচ্ছা-সহানুভূতি বা সহযোগিতা পেতে পারে কি? তাই বাঙলাদেশ রাষ্ট্রে সত্যিকার ভাবে বিধর্মী জাতি, উপজাতি-জনজাতি বা আদিবাসীরা আজো নিজেদের স্বদেশে, স্বঘরে, স্বভিটায় পরবাসী-পরগাছা বলেই ভাবতে-জানতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। যে দেশগড়ায় দেশের আর্থিক-নৈতিক-বাণিজ্যিক-প্রাশাসনিক-সাংস্কৃতিক-সামরিক শক্তি-সম্পদ বৃদ্ধির সহযোগী সহকর্মী হতে পারত, তাকেই মুসলিমরা স্বেচ্ছায় সচেতন প্রয়াসে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্রসত্তায় চিহ্নিত রেখে অমিত্র ও অসহযোগী করে রাখল। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ একপ্রকার আত্মহননেরই নামান্তর। ঘরের লোককে বৈরী করে সুখ-শান্তি-উন্নতি-নিরাপত্তাই বিঘ্নিত করা হয় মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭২ সনে সাঁওতাল, মুন্ডা, গারো, চাকমা, ত্রিপুর, লুসাই, মারমা প্রভৃতি কারো স্বতন্ত্র জাতি সত্তার মূল্য-মর্যাদা-অস্তিত্ব স্বীকৃতি পেল না। সবাইকেই রাতারাতি বাঙালী জাতি বলে অভিহিত করা হল, বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের অধিবাসী রূপে পৃথক জাতিসত্তার স্বীকৃতির ভিত্তিতে বাঙলাদেশী রূপে পরিচিতি দেয়া হল না। মানবেন্দ্রনাথ লারমা প্রথম প্রতিবাদী হয়ে আর্জি পেশ করে মুক্তিযোদ্ধা সরকারের কাছে পাত্তা না পেয়ে হলেন দ্রোহী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অসমের করিমগঞ্জ-গোয়ালপাড়া থানাদুটো এবং মুর্শিদাবাদ মুসলিমবহুল অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানভুক্ত হল না। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পূর্ণ ভাবে দু'লক্ষ বৌদ্ধ মোঙ্গল অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও এদের অজ্ঞতার-অসহায়তার সুযোগে লুসাই পাহাড়ের বাধায়-ব্যবধানে, ধর্মে-ভাষায়-সংস্কৃতিতে এমনকি জীবিকার ও জীবনযাপন পদ্ধতির পার্থক্যে গুরুত্ব না দিয়ে বিশেষ করে মুসলিমদের নিরাপত্তার জন্যে প্রতিষ্ঠিত নতুন রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে দিল ব্রিটিশ সরকার। চাকমারা আজকের মতো শিক্ষিত হলে ১৯৪৭ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম হত মিজোরামের বা ত্রিপুরার অংশ। জিম্মি হত না ওরা পাকিস্তানের। তুর্কী-মুঘল-ব্রিটিশ শাসনে-প্রশাসনে ওরা শোষিত-বঞ্চিত হলেও নিজেদের কখনো তেমন পীড়িত-নির্যাতিত মনে করে নি, যদিও মাঝে মধ্যে তাদের অসন্তোষের কিছু কিছু কারণ তখনো ঘটেছে। মুঘল আমলে, ব্রিটিশ আমলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের কাঠ দিয়েই তৈরি হত সমুদ্রগামী বড় বড় মহাজনী নৌকা ও জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে প্রথম গুরুতর হামলা হয় ওদের উপরই। ওদেরই রাজবাড়িসহ ঘর-বাড়ি-ভিটে জমিজমা হারিয়ে উদ্বাস্তু হতে হল। হাজারে হাজারে লোক উত্তর-পূর্ব ভারতে হল আশ্রিত। যারা রইল তারাও প্রত্যাশিত মাপে-মাত্রায়-অর্থে-ভূমিতে অভিবাসন পেল না।

দ্বিতীয় আঘাত এল ওদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অস্বীকৃতিতে ওদের পৃথক অস্তিত্বের বিপন্নতায়। তৃতীয় ও চতুর্থ এবং চিরস্থায়ী ক্ষতির কারণ হল স্বয়ং সরকারের সুপরিকল্পিত অপকর্ম। পার্বত্য চট্টগ্রামে একবার ১৯৭২ সনের সরকার, আর একবার ১৯৭৬ সনের সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসিন্দা বৌদ্ধ মোঙ্গল উপজাতিকে সংখ্যালঘু করার মতলবী উদ্দেশ্যে সমতলের বাঙালীদের অভিবাসিত করা হল লাখে লাখে। এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক অঞ্চলেই বাঙালী মুসলমানরাই সংখ্যাগুরু। এটি ওদের জাতিসত্তার উপর, সংস্কৃতির উপর, আর্থিক জীবনের উপর হামলা। এ ভিটে-মাটি জমি-জমা কাড়ার, অস্তিত্ব বিপন্ন করার নামান্তর। আজ পার্বত্য পরিবেশ নয় কোটি মানুষের পদভারে বিনষ্ট। এদের মধ্যে সাড়ে চার কোটিরও বেশি হচ্ছে মুসলমান। সরকারের সম্প্রদায় ভুক্ত এসব অভিবাসীদের শক্তি-সাহস, ক্ষমতা-দৌরাত্ম্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি, দর্প-দাপট স্বাভাবিক ও সঙ্গত কারণেই হবে বেশি। তাদের মধ্যে জাগবে উত্তমন্যতার অহংকার, উপজাতিদের মধ্যে উন্মেষিত হবে ও বৃদ্ধিপাবে অধমন্যতা– এর চেয়ে সংখ্যালঘুর ব্যবহারিক ও মানসিক জীবনে বড় ক্ষতি আর কি হতে পারে? সংখ্যালঘুরা পৃথিবীর সর্বত্র ও সর্বদা সব রাষ্ট্রেই সংখ্যাগুরুর দৌরাত্ম্যের অবজ্ঞার, উত্তমন্যতার, বঞ্চনার, প্রতারণার পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ শিকার। সংখ্যালঘুর চিরন্তন নিয়তি হচ্ছে স্বাধীন ও স্বাভাবিক বাড় না পাওয়া মনে মগজে মননে মনীষায় বিত্তে বেসাতে ধনে মানে পদে পদবীতে। তাদের বারো মাসে তেরো সঙ্কট সমস্যা থাকেই। তবু, সেক্যুলার সমাজতান্ত্রিক কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে আজকাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুটা স্বস্তি শান্তি সুখ মেলে। আজ ন্যায়সঙ্গত ভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীরাও স্বাধিকারে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠ থাকার দাবি করছে। এ দাবির শেকড় রয়েছে তাদের মৌল মানবিক অধিকারে, জন্মগত স্বাভাবিক চাহিদায়। আশা করি বাঙলাদেশ সরকার তাদের ন্যায্য দাবি পূরণ করবে মানবতার প্রতি আনুগত্য ও অনুরাগ বশে।

এ-ও স্বীকার্য যে এ একুশ শতকের জন্মলগ্নে দাঁড়িয়েও আমরা মানব প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে মানবিক গুণের প্রত্যাশিত মানে মাপে মাত্রায় উন্মেষ বিকাশ দেখি না, লাভে লোভে স্বার্থে এবং কামে ক্ষুধায় ও ক্রোধে মানুষের প্রাণিত্ব ও হিংস্রতা শ্বাপদকেও হার মানায়। কেবল পশ্চাৎপদ হুতো-তুসসিদের মধ্যে নয়, এগিয়ে-যাওয়া বসনীয় ক্রোয়াট-সার্ব-আলজিরীয়-ভারতীয় ও পাকিস্তানীদের সকলের মধ্যে বিমতের ভিন্ন গোত্রের নরহত্যায় আজো জাঙ্গলিক ও গাড্ডলিক আগ্রহ দেখতে পাই। মানুষের মধ্যে প্রাণিত্ব না কমলে, মানবিকতা না বৃদ্ধি পেলে পৃথিবীতে কোথাও সংখ্যালঘুর স্বাধীন স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হবে না।

দেশে আরো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রয়েছে, তারাও বঞ্চনার, প্রতারণার, তাচ্ছিল্যের ও সরকারের ঔদাসীন্যের শিকার। আধুনিকতম গণতান্ত্রিক ধারণার মধ্যে নাগরিকের শাস্ত্রিক মতবাদ ভিত্তিক সংখ্যাগুরুত্ব বিবেচ্য নয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই এবং এ প্রত্যয় যুক্তি বুদ্ধি বিবেক ভিত্তিক বলে জানি, বুঝি ও মানি যে সেক্যুলার সংবিধানসম্মত সরকারী ও রাষ্ট্রিক নীতিনিয়ম চালু হলেই নাগরিক মাত্রই কেবল নির্বিশেষ মানুষ হিসেবে জীবন-জীবিকা-প্রশাসন ক্ষেত্রে নাগরিক রূপে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ থাকতে পারবে। সেক্যুলার সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রের শাসক-প্রশাসকের তথা সরকারের দফতরীর কোনো ধর্মের অস্তিত্বের স্বীকৃতি থাকবে না, যদিও ব্যক্তিগত ও মতবাদী সমাজগত ধর্ম-শাস্ত্র-আচার-আচরণ পালা-পার্বণ প্রভৃতি ব্যক্তি, পরিবার ও মতবাদীসমাজ স্বাধীনভাবে অবাধে মেনে চলতে পারবে। রাষ্ট্র বা সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সীমিত থাকবে রাষ্ট্রবাসী নাগরিকের জীবনের সামূহিক, সামগ্রিক-সামষ্টিক-সামাজিক ভাবে প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার নিত্যকার চাহিদার জোগান দেয়া, সর্ব প্রকার সমস্যা সঙ্কটের সমাধান সন্ধানে নিরত থাকা। এর ফলে আজকের সাম্প্রদায়িকতা কিংবা মৌলবাদও থাকবে সুপ্ত, গুপ্ত কিংবা হবে লুপ্ত। ১৯৭২ সনের সংবিধান পুনঃ চালু করা যায় না আমাদের সমস্যা-সঙ্কট মুক্তির লক্ষ্যে !

সাক্ষাৎকারে দেশ কাল সমাজ সম্বন্ধে মত, মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত

[বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্র কাঠামোয় পশ্চিমবাংলার বাঙালির উন্নতি নেই, অবনতি আছে]

প্রশ্ন: বাঙালি মুসলমান একবার পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করলো, দ্বিতীয় বার পাকিস্তানকে বিদায় দিয়ে প্রতিষ্ঠা করলো স্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরও এখানে (বাংলাদেশে) স্থিতি না আসার কারণ কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহমদ শরীফ: প্রশ্নটা অবশ্য করার মতো, তবে উত্তরটা জটিল। জটিল এই কারণে যে, '৪৭-এ যে আন্দোলন হয়, তার নেতৃত্ব বাঙালির হাতে ছিল না। ছিল উর্দুওয়ালাদের হাতে। বর্তমানে যা বিহার-উত্তর প্রদেশ, সেই উত্তর ভারতের উর্দুভাষী মুসলমানের হাতে। ঐ সব প্রদেশের মুসলিম নেতারাই মুসলিম লিগকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতেন। কারণ তাঁরা ছিলেন ধনে-মানে, শিক্ষা-দীক্ষায় সব কিছুতেই উন্নত। যদিও তাঁরা ছিলেন জনসংখ্যায় শ'তে বারো শতাংশ মাত্র। তাঁরাই মনে করলেন ব্রিটিশ বিতাড়নের পর তাঁরা হিন্দুর দ্বারা পীড়িত এবং অত্যাচারিত হবেন। কাজেই উর্দুভাষী মুসলমানের জন্যেই প্রয়োজন ছিল এক হোমল্যান্ডের। এটা ছিল কবি ইকবাল এবং আবদুর রহিমের স্বপ্ন। এই স্বপ্নই পরে পাকিস্তান আন্দোলনে পরিণত হয়। আর বাঙালি মুসলমান চিরকালই ছিলেন নির্জীব। কারণ হিন্দুদের মধ্যে যাঁদের তফসিলি বলা হয়, যাঁরা ছিলেন নিম্ন বর্ণের, নিম্ন বিত্তের এবং তুচ্ছ পেশার মানুষ, তাঁরাই বাঙলায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তুর্কি-মুঘল আমলেও তাঁদের নিজস্ব কোনো কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব রাষ্ট্রে অথবা সমাজে ছিল না। তাঁরা ছিলেন দেশী বর্ণ হিন্দুর শাসনে। ফলে তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষাও ছিল না। ব্রিটিশ বিদ্বেষের ফলে (বাঙলার) মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেননি বলে যে-কথা প্রচলিত আছে, তা সত্য নয়। কারণ তাঁরা আরবি-ফার্সীতেও শিক্ষিত ছিলেন না। যে অশিক্ষিত ছিল, সে আরবি-ফার্সীতেও অশিক্ষিত ছিল। কারণ নিম্নবর্ণের স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বৌদ্ধ-হিন্দুজ মুসলিম বংশধর বলে শিক্ষার Tradition বাঙালি মুসলমানের ছিল না। এর ফলে আমরা দেখি তুর্কি-মুঘল আমলেও দেশী কোনো মুসলমান শুধু বাংলায় নয়; সারা ভারতবর্ষে বড় চাকরি পায়নি। অথচ সেই সময়ে বর্ণ হিন্দুরা তাঁদের দাবিটা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। তুর্কি-মুঘল আমলেও জেলা এবং গ্রামগুলি শাসিত হতো বর্ণ হিন্দুর দ্বারা এবং তখন হিন্দু মতোই দীক্ষিত মুসলমানদের বিকশিত হবার কোনো সুযোগ সমাজ বা রাষ্ট্র কাঠামোয় তখন ছিল না। ধর্মান্তরে বাঙালি মুসলমানের পেশান্তর বা আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি, এটা অধিকাংশ বাঙালি মুসলমানের ক্ষেত্রে সত্য। মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয় সিপাহী বিদ্রোহের অবসান এবং ওয়াহাবি আন্দোলনের পর ১৮৭০ থেকে। তখন হিন্দুরা ইংরেজের করুণা এবং কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়। সেই সময় থেকে ইংরেজরা মুসলমানের তোয়াজ শুরু করে। এবং স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে কর্তৃত্বে মুসলমানরা সংহত হয়ে ইংরেজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করায় ব্রিটিশ সমর্থন পেতে শুরু করে। তখন বহু শিক্ষিত হিন্দুর, যারা কোম্পানী রাজত্বে, কোম্পানীর কর্মচারীদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো-ইংরেজের গোমস্তা কিংবা তাদের দেওয়ান হিসেবে, তাদের চাকরি চলে যায়। কারণ ভিক্টোরিয়ার আমলে কোম্পানীর কর্মচারীদের আর ব্যবসা করার অধিকার রইল না। শুধু চাকুরে হয়ে গেল। এর ফলে শিক্ষিত হিন্দুরা গাঁয়েগঞ্জে গিয়ে স্কুল দেওয়া শুরু করলো। এটা আপনি খুব সহজেই ধরতে পারবেন, ১৮৯০-এর পর যাদের জন্ম হয়েছে, তারাই শুধু ইংরেজি শিক্ষিত হয়েছে মুসলমানদের মধ্যে। সেই সূত্রে আপনি যাদের নাম জানেন, যেমন, ইব্রাহিম খাঁ, বরকতুল্লাহ, এঁদের সবার জন্ম ১৮৯০-এর পর। দু'একজন তার আগে। তবে ১৮৮০ সালের আগে কোথাও বাঙালি মুসলমান ইংরেজি শিক্ষিত হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন: মীর মশাররফ হোসেন তো...

আহমদ শরীফ: না না, বাঙালি নন। মীর মশাররফ হোসেনও ছিলেন উর্দুওয়ালা। আর তিনি বেশি শিক্ষিতও ছিলেন না, স্বল্প শিক্ষিত। ওয়ার্থ নেম যত আছে সব উর্দুওয়ালা। আমাদের সুফিয়া কামাল, বেগম রোকেয়া, বদরুদ্দিন উমর সবাই উর্দুভাষী। উমরের grand father থেকে বাংলা শিখেছেন, বাংলায় পলিটিক্স করার জন্য। তাঁরা ছিলেন বর্ধমান, কালনার জমিদার। মোমিন সাহেব তো বাংলা বলতেই পারতেন না। মীর মশাররফ হোসেনের নিজের লেখায় আছে, 'আমার পিতৃদেব বাংলা হরফ চিনতেন না।' উনি দিল দুয়ারের গোমস্তা ছিলেন। দিল দুয়ার পরিবার ছিল তাঁদের আত্মীয়। অখণ্ড বাঙলায় এক সময় গজ-চক্র মন্ত্রিত্ব ছিল। আবদুল হালিম গজনবী এবং আবদুল করিম গজনবী ছিলেন টাঙ্গাইলের দিল দুয়ারের জমিদার। এঁরা দু'জনেই ছিলেন রোকেয়ার বড় বোনের ছেলে। এঁরাও ছিলেন উর্দুওয়ালা। বাঙলাদেশে যত মুসলমান জমিদার ছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন উর্দুওয়ালা। বগুড়ার মহম্মদ আলী, পন্নিরা এবং ঢাকার নবাবরা... সবাই ছিলেন উর্দুভাষী। কোনো বাঙালি মুসলমান জমিদার আপনি পাবেন না এবং ১৮৮৪ সালের আগে কোনো বাঙালি মুসলমান graduate হয় নাই। বাড়ির কাছে স্কুল পেয়ে মুসলমান কৃষকরা ছেলেদের স্কুলে পাঠালো। কাজেই ১৮৯০ থেকে বাঙালি মুসলমান শিক্ষার সুযোগ পেল। এবং ১৯১৫ থেকে ১৯২২/২৫ এর মধ্যে বেশ কিছু বাঙালি মুসলমান ডেপুটি মুন্সেফ হয়। তার আগে নবাব আবদুল লতিফ, জাস্টিস আমীর আলী, আমীর হোসেন এবং শেষ পর্যন্ত যাঁকে দেখলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সবাই ছিলেন উর্দুভাষী। বিভাষী-বিজাতি উর্দুওয়ালারাই বাঙালি মুসলমানকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাঙালি মুসলমানও অশিক্ষা, অজ্ঞতা এবং হিন্দুর প্রতি ক্ষোভের কারণে উর্দুওয়ালাদের এই নেতৃত্ব গ্রহণ করছিল। বাঙালি মুসলমান মুসলিম লিগের সদস্য হ'য়ে উর্দুওয়ালাদের নির্দেশ এবং আদেশ পালন করেছেন মাত্র। এর পেছনে কারণ ছিল, বাঙালি মুসলমান কৃষক সন্তান মেট্রিক পাস ক'রে, কিংবা ফেল ক'রে কেরানী, পিওন, চাপরাশির চাকরি চায়, হিন্দু বাবুরা দেয় না। এই হিন্দু বাবুরাই বসে আছে সব অফিসে। বাঙালি মুসলমান ঘরের বার হলেই দ্যাখে দোকানী হিন্দু, উকিল হিন্দু, কেরানী হিন্দু, মাষ্টার হিন্দু, জমিদার হিন্দু, ডাক্তার হিন্দু। হিন্দু লুট করছে সব কিছু। তাদের ধারণা হ'ল সে নবাবের বংশধর, মুঘলের জ্ঞাতি। এবং হিন্দুরা তাদের সব কিছু কেড়ে নেওয়াতেই তারা আজ নিঃস্ব। তাদের অতীত এরকম ছিল না। ব্রিটিশই এই প্রপাগান্ডা চালিয়েছিল।

১৮৭৩ সনে W.W. Hunter লেখেন Indian Musalman বইটা। কথাটি বড় ভয়ংকর। হান্টার বলছেন, 'Hundred and fifty years ago it was impossible for a Musalman to be poor, এঁরা কোন মুসলমান? মতলববাজ বলেই স্পষ্ট করে সেকথা বললেন না। এঁরা বাঙালি মুসলমান নয় মধ্য এশীয় তুর্কী-মুঘল প্রশাসক গোষ্ঠী। কিন্তু এই প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে বাঙালি মুসলমানরাও মনে করেছেন, তাঁরা খুব ধনীটনি ছিলেন। হিন্দুরা তাদের সব কেড়ে নিয়েছেন। এবং এই ধারণার বশে ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক (Dr. A. R. Mullick) মুসলিম education সম্পর্কে যে থিসিস্ লিখলেন, সেখানে তিনিও বিষয়টি distinguish করলেন না। সেই কারণে হিন্দু কৈবর্ত থেকে দীক্ষিত মুসলমান এবং শাসক মুসলমানের মধ্যে তিনি কোনও পার্থক্য করেন নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর (Dr. A. R. Mullick) দৃষ্টিতে সব একাকার। ব্রিটিশ বলছে মুসলমানরা স্কুলে যাচ্ছে না কেন– না ওরা তো উর্দুওয়ালা, তাই ফার্সী এবং উর্দুতে না হ'লে ওরা বাংলা মাধ্যমে প্রাইমারি স্কুলে যাবে না। ব্রিটিশ আমলে হিন্দুর নেতৃত্ব দিয়েছে বাংলাভাষী হিন্দু। রামমোহন প্রভৃতিরা। কমিটি ক'রে কাজ করেছেন। আর বাঙালি মুসলমানের নেতৃত্ব দিয়েছেন মুঘল মুসলমানেরা। যাদের সঙ্গে দেশী আর বাঙালি মুসলমানের কোনও সামাজিক, বৈবাহিক, ভাষিক, সাংস্কৃতিক কোনও দিক থেকেই কোনও সম্পর্ক নেই বা ছিল না। কিন্তু সেই অবাঙালি উর্দুভাষী মুসলমানরাই প্রতিনিধিত্ব করেছেন বাংলার মুসলমানের। They represented Muslims of Bengal। এই কারণেই ইংরেজ আমলের সব কমিটিগুলোতে মুসলিম সদস্য থাকলেও মুসলিমরা উপকৃত হয়নি। নারী শিক্ষা কমিটি থেকে সব কমিটিতেই মুসলমান ছিল। কিন্তু তারা বাঙালি ও বাংলার মুসলমানদের সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তাদের অজ্ঞতা ছিল পর্বত প্রমাণ, তার সঙ্গে ছিল বাঙালি মুসলমানের প্রতি তাদের অবজ্ঞা। তাই যা হবার তাই হয়েছে।

মুর্শিদাবাদের দেওয়ান খোন্দকার ফজলে রব্বি, একটি বই লিখেছিলেন বাংলাদেশের (অখণ্ড বাংলার) মুসলমানের ইতিহাস বিষয়ে। সেই বইতে তিনি বলতে চাইলেন, সামান্য কিছু ছোটলোক দীক্ষিত বাঙালি মুসলমান বাদ দিয়ে, মুসলমান মাত্রই খানদানি, তারা দীক্ষিত নয়। এই একই কথা আমরা শুনেছি নবাব আবদুল লতিফের মুখে। তিনিও বললেন, বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা হচ্ছে উর্দু, তবে ছোটলোক যেগুলি আছে, তাদের ভাষা বাংলা। এদেরও আস্তে আস্তে উর্দুতে কনভার্ট করতে হবে। কাজেই বাঙালি মুসলমান মাত্রই উর্দুওয়ালাদের কাছে 'ছোটলোক' এবং 'ইতর' মুসলমান। এটা Recorded fact। একথার সত্যতা এখনো আপনি পশ্চিমবাংলা এবং কোলকাতায় পাবেন। সেখানে (পশ্চিমবাংলা এবং কোলকাতায়) উর্দুভাষী মুসলমান বাঙালি মুসলমানকে জ্ঞাতি বা ভাই বলে মনে করে না। ঘৃণাই করে। এ কথাগুলো বুঝতে পারলে বাঙালি মুসলমানের উপর কিভাবে উর্দুওয়ালা মুসলমানের নিয়ন্ত্রণ এবং নেতৃত্ব চেপে বসেছিল তা স্পষ্ট হয়ে যায়। কাজেই পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ে অবাঙালি মুসলমান নেতারাই বাঙালি মুসলমান জনসাধারণকে চালিত করেছে আমাদের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে, আমাদের দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে, আমাদের মূর্খতার সুযোগ নিয়ে। 'Jinnah represents Muslims of India' এই ঘোষণা দিয়ে ব্রিটিশ সরকার চালাকি ক'রে জিন্নাহকে মুসলিম ভারতের প্রতিনিধি বানিয়ে দিলেন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতেই। কিন্তু সত্য হল, এখন যা পাকিস্তান সেখানে মুসলিম লিগের কোনও Hold ছিল না। তখন মুসলিম লিগের Hold ছিল উত্তর ভারতে, আর বাংলায়। বাংলায় মুসলিম লিগের Hold এর পিছনে কারণ ছিল, হিন্দুর থেকে অর্থেবিত্তে বঞ্চিত মুসলিমদের চাকরি নেবার জন্য। এটা মনে রাখা দরকার। এর আগে মুসলমানরা যতগুলো আন্দোলন করেছে তা শুধু চাকরির জন্যই করেছে। ১৯০৬ সালের অক্টোবরে সিমলাতে লর্ড মিন্টোর কাছে মুসলিম প্রতিনিধিরা চাকরির কোটার জন্য দরবার করতে গেলে, মিন্টো তাদের পরামর্শ দেন, 'তোমরা কংগ্রেসের মতো একটা সংগঠন তৈরি করো, আমরা সমর্থন করবো। এবং সংগঠন মারফৎ দাবি পেশ করো, আমরা গ্রহণ করবো। এটা মিন্টোর স্ত্রীর সূত্রে অন্য Document-এ পাওয়া গেল। মিন্টোর স্ত্রী তার বোনের কাছে চিঠি লিখলেন, ভারতবর্ষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রিটিশ সরকারের স্থায়িত্ব দীর্ঘতর করে দিলাম আমরা। এর দু'মাসের মধ্যেই ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে, ঢাকার নবাবের উদ্যোগে মুসলিম লিগের জন্ম হ'ল ঢাকায়। এসব ইতিহাস স্মরণে রাখলে বোঝা যায়, যে-ম্যাচুরিটি এবং আত্মোপলব্ধি দরকার ছিল, বাঙালি মুসলমানের তা ছিল না। আর্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং ঐতিহাসিক কারণেই তা তখন পাওয়া সম্ভব ছিল না। পার্টিশন '৪৭-এ না হ'য়ে '৩৭-এ হলে বাঙালি মুসলমান কেরানী পাওয়া যেত না ঢাকা শহরে। কোলকাতা ইউনিভার্সিটির ক্যালেন্ডার দেখলে একথা বোঝা যাবে। আত্মোপলব্ধি বা আত্মসম্বিত তাদের ছিল না বলেই '৪৭-এ বাঙালি মুসলমান হুজুগে মেতেছে। দেখা গেল পাকিস্তান দিয়ে দেবার জন্য ইংরেজরা মোটামুটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবং বোম্বে কনফারেন্স-এ রাজাগোপাল আচারীয়াও স্বীকার করে নিলেন যে, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছাড়া মুসলমানদের আর বশে রাখা যাবে না। সাতান্ন বছর বয়সী জওয়াহেরলাল নেহরুও প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসার জন্য আর অপেক্ষা করতে রাজি নন। কমিউনিস্টরাও দ্বিজাতি তত্ত্বকে সমর্থন করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে যখন separate state হচ্ছে তখন মুসলমানদের দিল্লি কনফারেন্সে (১৯৪৬) লাহোর প্রস্তাবের 'States' কে জিন্নাহ 'State' করে দিয়ে দিলেন। এর প্রতিবাদে চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু কোনও সমর্থন না পেয়ে জিন্নাহর সামনে বিষয়টি উপস্থিত করতে পারেন নি। সোহরাওয়ার্দী একটি State-কেই সমর্থন জানিয়ে ছিলেন। আর ফজলুল হক তো তখন expelled। যখন দেশ ভাগ চূড়ান্ত হবার মুখে, তখন মুসলিমরা came to their senses। পাঞ্জাবের ফিরোজ খান নুন প্রস্তাব দিলেন, আমরা পাঞ্জাবকে এক রাখতে চাই। বাংলার হিন্দু-মুসলমান মিলে যদি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র করে তাতে জিন্নাহর আপত্তি ছিল না। কিন্তু এতে গান্ধী রাজি হলেন না। শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে গান্ধীর চিঠিপত্রে এ তথ্য পাওয়া যায়।

[বাঙালি মুসলিমদের সমর্থনের জোরেই ব্রিটিশরাজ কংগ্রেসকে ঠেকানোর লক্ষ্যে মুসলিম লীগকেই ভারতীয় মুসলিমের রাজনীতিক প্রতিনিধিত্বের অধিকারী বলে স্বীকার করে নিল। পাকিস্তান এল এভাবেই যদিও পশ্চিম ভারতে (পাকিস্তানে) মুসলিম লীগ প্রবল ছিল না কোথাও।

এ শতকে আমাদের জীবনধারার রূপরেখা: আহমদ শরীফ]

প্রশ্ন: গান্ধীর আপত্তির কারণ কি ছিল?

আহমদ শরীফ: কারণ ছিল মুসলমানরা বাঙলায় মেজরিটি। প্রথমে শর্ত দিলেন স্বরাষ্ট্র এবং অর্থ হিন্দুর হাতে থাকবে। এসব মানা হয়েছিলো। পরে বলা হয় এদের (মুসলমানদের) বিশ্বাস নেই। এই যে আসাম ভারতের সঙ্গে থাকলো, তা তো বড়দলৈকে দুষ্টবুদ্ধি দেবার কারণেই। এই বুদ্ধিটা গান্ধীও পেলেন ফজলুল হকের কাছ থেকে। ন্যাশনালিস্ট মুসলমানদের নিয়ে ফজলুল হক লখনউতে একটি কনফারেন্স করলেন। এবং সেই কনফারেন্স থেকে কথাটা প্রচার করে দিলেন সারা ভারতবর্ষে। তিনি (ফজলুল হক) বললেন, এরা (মুসলিম লীগ) বাংলা এবং পাঞ্জাব নিয়ে পাকিস্তান করতে চায়। কিন্তু পশ্চিম বাঙলায় এবং পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমান মেজরিটি নয়। কাজেই সেখানে হবে কেন? This was a very catchy thought। দেশ ভাগের কারণে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত গোটা বাংলায় মুসলমানদের যে শাসন ছিল, তা হারালো বাংলার মুসলমানেরা। হত্যাকাণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেটা শুরু হ'য়েছিল সেটা পাঞ্জাবেই শুরু হয়েছিল। তারা পলিটিক্স করে না, কিন্তু হত্যাকাণ্ডটা সেখানেই হ'ল। অন্যদিকে বাঙালিরা পলিটিক্স করে, কিন্তু হত্যাকাণ্ড ১৯৫০ সালের আগে করেনি। এগুলো খুব মূল্যবান তথ্য। শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনৈতিক চেতনা বাঙালি মুসলমানের ছিল না। কাজেই একবার মাউন্ট-ব্যাটেনরা চাপিয়ে দিলেন, অন্যবার ইন্দিরা গান্ধী। ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়োজন ছিলো পাকিস্তান ভাঙার, তাই এগিয়ে এলেন তিনি। পাশে দাঁড়ালো সোভিয়েত ইউনিয়ন। আর বাঙালির ক্ষোভ ছিল, পশ্চিমারা (পশ্চিম পাকিস্তান) তাদের শোষণ করে। এই হল মূল ব্যাপার। এরা পুরো স্বাধীনতা চেয়েছিল কিনা বলা যাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল বাঙালি পুরো স্বাধীনতা চাইল, এবং পেল। পাইয়ে দিল। দুই দুইবার বাঙালি মুসলমান প্রায় বিনা প্রয়াসে স্বাধীনতা পেল।

প্রশ্ন: বিন প্রয়াসে বলছেন কেন? তিরিশ লক্ষ মানুষের রক্ত...

আহমদ শরীফ: মিছা কথা, তিরিশ লক্ষ তো নয়, আড়াই লক্ষও নয়। Three hundred thousand। এটা মোহাইমানের বইতে আছে। যারা মারা গেছে তাদের সবাই কিন্তু বাঙালি নয়। নির্মল সেনের মুখে শুনে ছিলাম আড়াই লাখের মতো মানুষ মারা গেছে। তার মধ্যে এক লাখ বাঙালি, দেড় লাখ বিহারি এবং পাকিস্তানী। এই সত্যকে চেপে যাওয়া হয়েছে রাজনৈতিক সুবিধা পাবার জন্য।

প্রশ: যে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন–

আহমদ শরীফ: (উত্তেজিত ভাবে) না না তিনি পাকিস্তান প্রস্তাব তোলেন নাই। তিনি ঐ প্রস্তাব পাঠ করেছিলেন মাত্র। এর বেশী কিছু মাত্র নয়। তিনি (ফজলুল হক) জানতেন না যে ঐ প্রস্তাবে কি আছে। যে কারণে তিনি 'শেরে বাংলা' হয়েছিলেন। শেরে বাংলা উপাধিটা তাকে দেওয়া হয়েছিল লখনউ কনফারেন্সে।

প্রশ্ন: ফজলুল হকের সঙ্গে জিন্নাহর বিরোধ বা দ্বন্দ্বের কারণ কি ছিল?

আহমদ শরীফ: যুদ্ধের সময়ে জিন্নাহ বলেছিলেন গভর্নমেন্টের সঙ্গে কো-অপারেট করা যাবে না। কংগ্রেসও সরকারের সঙ্গে কো-অপারেট করছে না। কংগ্রেসের নেতারা জেলে ছিলেন, আগাখাঁ প্যালেসে। সেই সময়ে governer general-এর Defence council-এর মেম্বার হবার জন্য ফজলুল হক গোপনে তদ্বির করছিলেন। জিন্নাহ যখন জানলেন যে, ফজলুল হক তাঁর কথা অমান্য করে Defence council-এর সদস্য হতে যাচ্ছেন, তখন তিনি ফজলুল হককে expell করলেন। জিন্নাহ expell করাতে ইংরেজরাও তাঁকে নিল না। কারণ He does not represent the majority Muslim of India.

প্রশ্ন: যে প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেই প্রশ্নটাই আবার রাখছি– বাঙালি মুসলমান নিজেদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পাবার পঁচিশ বছর পর আজও কেন এখানে (বাংলাদেশে) স্থিতি এলো না?

আহমদ শরীফ: এখনো তো স্থিত হয়নি। এরা (বাঙালি মুসলমান) ছিলেন গরীব ঘরের সন্তান। নাইন্টিথ্ সেঞ্চুরিতে আপনি দেখবেন শিক্ষা-দীক্ষায়, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে কোলকাতায় কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব দিয়েছেন পশ্চিম বাংলার হিন্দুরা। কারণ গ্রাম থেকে হাঁটা পথে তাঁরা কোলকাতায় চলে যেতেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশব সেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবেকানন্দ প্রভৃতি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাচ্ছেন জগদীশচন্দ্র বসুদের। যাঁরা এপার (পূর্ব বাংলা) থেকে গেছেন। যাক, যে-কথা বলছিলাম, বাঙালি মুসলমানের ছিল পাটখড়ির বেড়ার ঘর, নলখাগরার ঘর, বাঁশের বেড়ার ঘর, যেখানে মাটির ঘর হয় সেখানে মাটির। কৃচিৎ কারো টিনের। building কারো ছিল না। শহরেও নিতান্ত লিমিটেড। এই গরীব অশিক্ষিত, অসহায় বাঙালি মুসলমান হিন্দুর প্রজা। জমিদার মাত্রই হিন্দু–

প্রশ্ন: মুসলমান জমিদারও তো ছিলেন–

আহমদ শরীফ: খুব কম। ঢাকায় নবাবই ছিলেন সব চেয়ে বড় জমিদার। ঢাকার নবাবের কাছাকাছি জমিদার ছিল বিক্রমপুরের কুন্ডুরা। এছাড়া অন্য মুসলমান জমিদাররা ছিলেন হিন্দুর তুলনায় খুবই ছোট। আগেই বলেছি তারাও ছিলেন সব উর্দুওয়ালা। তাই মুসলমান জমিদার ছিল, এটা বলা নিরর্থক। উকিল হিন্দু, মামলা করে মুসলমান, জমিদার হিন্দু, প্রজা মুসলমান। সেই মুসলমান শহরে এল, পাকিস্তান হল, হিন্দুরা চলে গেল, খালি বাড়িগুলো পাওয়া গেল। হিন্দুরা অপসন না দিলে তো মুশকিল হয়ে যেত। ধীরেন দত্ত তো অপসন না দেবার জন্য চেষ্টাও করেছিলেন। অনেকের কাছে গোপনে চিঠিও দিয়েছিলেন, যাতে এদিকের (পূর্ববাংলার) লোকেরা এদিকেই থেকে যায়। তা হলে হিন্দুরা অন্তত security feel করতো। বর্ণ হিন্দুরা সব চলে গেল, তফসিলি হিন্দুরা অসহায় ভাবে এখানে রয়ে গেলেন। ওপারে তাঁদের কোনও জ্ঞাতি গোষ্ঠীও ছিল না। তাঁরা শিক্ষিতও ছিলেন না। ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চল ছিল Scheduled cast বহুল অঞ্চল। মুসলমান সেখানে প্রবেশ করতে পারতো না। পাকিস্তান হবার পর, পাকিস্তান সরকার তাদের বৃত্তি দিয়ে পড়ানো শুরু করল। দেশ ভাগের পর হিন্দুরা চলে যাবার কারণে যে জগন্নাথ হল খালি হয়ে গিয়েছিল, তা আবার ভরে উঠল। এই তফসিলিরাই এখান থেকে পাস ক'রে কোলকাতায় গিয়ে পলিটিক্স করে। কোলকাতায় Scheduled cast যারা পলিটিক্স করে তারা সব পূর্ববঙ্গের লোক এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির পাস।

এসব হচ্ছে বাস্তব কথা। এরা (বাঙালি মুসলমান) আস্তে আস্তে শিক্ষিত হচ্ছে আর ঢাকা শহরে আসছে। দেশে তার কিছুই ছিল না। বিয়ে ক'রে উচ্চতর পরিবারে সম্বন্ধ করা দরকার, ঘুষ নিয়ে বাড়ি করা দরকার, গাড়ি করা দরকার। এই যে ঢাকা শহরটা গড়ে উঠেছে– নারায়ণগঞ্জ থেকে এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে উত্তরা পর্যন্ত। বাংলাদেশের আটাশখানা জেলায় আটাশখানা Building ছিল না মুসলমানের। কোলকাতা শহর দিয়ে কল্পনা করুন। এখন দ্যাখেন তো ঢাকা শহরের মতো কোলকাতা লাগে? ঢাকার মতো এমন পরিচ্ছন্ন রাস্তা কোলকাতায় এখন পাবেন? আগেকার দিনে পার্ক সার্কাস থেকে পার্কষ্ট্রীট কী চমৎকার ছিল। এখন কী নোংরা, ফুটপাথ দিয়ে হাঁটা যায় না। আমি নিজে দু'তিন বার হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছি। কল্পনা করতে পারিনি এই সব রাস্তা কী চমৎকার ছিল। Late 18th Century and early 19th century-তে হিন্দুর কথা ভাবুন। সবগুলো বাপ খ্যাদানো, মায়ে তাড়ানো বদমাইশ। কোলকাতা শহরে এসে টাকা পয়সা করেছে। দ্বারকানাথের কথা স্মরণ করুন। দ্বারকানাথ হচ্ছেন embodiment of corruption। আর তাঁর সন্তান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সততার প্রতিমূর্তি। সে-রকম রাজ নারায়ণ বসু, কেশব সেন-রা কাদের সন্তান? এঁদের বাবারা ইংরেজ কোম্পানীর সাথে নানা রকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

corruption-এ যুক্ত থেকে টাকা পয়সা ক'রে তাঁদের সন্তানদের হিন্দু কলেজে পড়িয়েছেন। তাঁদের সন্তানরা জ্ঞানী-গুণী হয়েছে। Aminities of life সব পেয়ে গেছে। কাজেই সে তো আর তার বাবার মতো ইতরামি করবে না। করাচির একটা উদাহরণ দিই। মমতাজ দৌলতানা, সে তার বাবার জমিদারি পেয়েছে, শ্বশুরের জমিদারি পেয়েছে, নানার জমিদারি পেয়েছে। তাকে আপনি দশ হাজার, বিশ হাজার, তিরিশ হাজার, চল্লিশ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে বশ করতে পারবেন? ভুট্টোর বহু দোষ ছিল। কিন্তু তাকে দশ-বিশ হাজার টাকা ঘুষ দিতে পারতেন? আমাদের সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে অন্য অনেক অভিযোগ থাকলেও, নেপুটিজমের কোনও অভিযোগ নেই। কারণ সে জমিদার পরিবারের সন্তান, মেদিনীপুরে তাদের জমিদারি ছিল। কিন্তু ফজলুল হকের বিরুদ্ধে ঐ অভিযোগ আছে। তিনি ছিলেন সাধারণ গেরস্ত বাড়ির লোক। তাঁর বাবা সাধারণ উকিল ছিলেন, এ্যাডভোকেট নয়, এবং খুব ভালো প্র্যাকটিসও ছিল না। আমি মন্ত্রী হয়েছি, আমার অশিক্ষিত বোনের ছেলে, যে থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করেছে, তাকে চাকরি না দিয়ে পারি? এটা আমার ঘরোয়া অবলিগেশন নয়? কাজেই দুর্নীতি থেকে আমি কি করে মুক্তি পাই? এই যে আমাদের দেশে সার নিয়ে কেলেঙ্কারিতে তেইশজন মানুষ মারা গেলেন, এটা কেন হ'ল? এই কারণেই গান্ধীর আহ্বানে বিয়ে না-করা, খদ্দর-পরা লাখ দুয়েক মানুষ পাওয়া গিয়েছিল। এঁরা ছিলেন জমিদার পরিবারের ছেলে, ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে, ডেপুটি মুনসেফ পরিবারের ছেলে। এসব পরিবারের একজন রোজগার করলেই যথেষ্ট। অন্যরা বেকার হ'য়ে দেশ সেবায় নামতে পারেন।

AMARBOI.COM

আমাদের এখানেও এখন এরকম কিছু কিছু হচ্ছে। আমার সন্তান আমার সঙ্গে গ্রো করেছে, সেও করাপটেড হয়ে গেছে। কিন্তু আমার grand son যার ফ্যান আছে, ফোন আছে, গাড়ি আছে, বাড়ি আছে। তার সন্তান আমার মতো ইতর হবে না। কাজেই আমাদের যে ক্যায়োটিক কন্ডিশন তার জন্য আমাদের পরিবেশটাই দায়ী। আমরা কোন্ পরিবার থেকে এসেছি? এক কথায় বলতে গেলে আমরা ভুঁইফোঁড়, তার যতগুলো দোষ, তার সব গুলো এখনো আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি, ৪৮/৪৯ বছরে। আমরা এলিম্যান্ট হিসেবে যে খারাপ– তা নয়। আমাদের (দীক্ষিত বাঙালি মুসলমানের) অতীত ছিল না, বর্তমান ক্যায়োটিক, কারণ গ্রোয়িং। একটা সিঁড়ির সঙ্গে তুলনা করুন। ভীড়ের চাপ, সবাই ঠেলাঠেলি করে উঠছে, কেউ কেউ পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এরপর আমাদের মধ্যে স্থিতধীলোক হবে, উদার মানুষ হবে, জনসেবক মানুষ হবে, তখন অন্যায়কে ঘৃণা করবে। আমাদের রাজনীতিতে জ্যোতি বসু পাওয়া যাবে। জওয়াহেরলাল পাওয়া যাবে।

খুব বড় ব্যবসায়ীদের মধ্যে এক ধরনের করাপশন আছে, সব জায়গাতেই আছে। ডালমিয়া, হিন্দুজা, গোয়েঙ্কা সবাই যা ক'রে থাকে। এটা অন্য জিনিস। কিন্তু মাঝারি মানুষের মধ্যে যে ধনী মানুষ থাকে, সেই মানুষের মধ্যে করাপশন কম। এঁদের রুচি আছে, standard আছে। যেটা আমরা ইনহেরিট করি। we could not afford to be honest. we could not afford to spare any opportunity. কাজেই আর ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে নতুন যে জেনারেশন আসছে তাদের মধ্যেই রয়েছে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন: আপনার এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে চাইছি পশ্চিমবাংলা এবং বাংলাদেশের বাঙালির ভবিষ্যৎ এবং সম্ভাবনা বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা–

আহমদ শরীফ: এখন যে অবস্থা রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের বাঙালির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, পশ্চিমবাংলার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়। কারণ পশ্চিমবাংলা ভারতের একটা অংশ। ইতিহাস ভিত্তিক আলোচনা করলে বিষয়টি সহজ হয়। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে জয়ী হয়ে ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ গোটা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। সেদিন থেকেই ব্রিটিশ বাংলা-বিহার উড়িষ্যার মালিক হ'য়ে যায়, ১৮১৮-এ তো ইংরেজ পুরো ভারত নিয়েই নিল। এর আগের কয়েক বছরও ইংরেজই প্রকৃত মালিক হ'ল দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে দেওয়ানি পেয়ে। কারণ রাজস্বই হ'ল আসল কথা। তখন থেকে বাঙালি হিন্দুর সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে ইংরেজ ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছু করেছে। অফিস আদালত চালিয়েছে। বর্ণ হিন্দুকে নিয়ে শেয়ারে কাজ করেছে। ফলে বর্ণ হিন্দু থেকে খুব বড় বড় ব্যবসায়ী হ'ল। যেমন, মল্লিকেরা। এদিকে শুধুমাত্র ইংরেজদের পরিপূর্ণ ভাবে ব্যবসায়ের সুযোগ দেবার জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিশ বুদ্ধি ক'রে একটা কাণ্ড করলেন। তিনি যাদের টাকা হয়েছে সেই হিন্দু ব্যবসায়ীদের এনকারেজ করলেন, দ্যাখো বাপু ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা হয় বটে, কিন্তু সম্মান নেই, তোমাদের রাজা হতে হবে, জমিদার হও। ফলে কর্ণওয়ালিশের এনকারেজম্যান্ট পেয়ে তারা সব জমিদার হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ইংরেজ আস্তে আস্তে দেশ জয় করা শুরু করলো। অযোধ্যা থেকে রাজপুতনা পর্যন্ত সাবসিডারির এলায়েন্সে সব চলে এল। ১৮০১ থেকে সাবসিডারি এলায়েন্স হয়ে গেল। অবাঙালিরা একসেস্ পেয়ে কোলকাতায় এল। বাঙালির তো ব্যবসায়, মিলিটারিতে কোনও Tradition তৈরি হয়নি। বাংলা হচ্ছে চিরকাল বিভাষী, বিধর্মী, বিজাতি শাসিত। কাজেই বাঙালি পিছুহটা ছাড়া আর কিছু পারলো না। দেখুন ইংরেজ আমলে বিহারি কুলি, বাঙালি কেরানী, ব্যবসা হচ্ছে ইংরেজের আর মাড়ওয়ারির। কাজেই ব্যবসা করছে ইংরেজ আর মাড়ওয়ারি, বাঙালি হচ্ছে তাদের কেরানী। তাতেই সে খুব খুশী, পাঞ্জাবী পরছে, পান চিবুচ্ছে, হাতে ঘড়িও দিচ্ছে-ঘুষ পাচ্ছে কিনা, এবং নিজেকে ভারি বাবু ভাবছে!

অন্যদিকে জমিদাররা প্রজা শোষণ ক'রে কোলকাতা শহরে পায়রা উড়িয়ে, বাইজি নাচিয়ে টাকা ওড়াচ্ছে। এই ভাবেই ব্যবসা-বাণিজ্য বাঙালি হিন্দুর হাতের বাইরে চলে গেল। এবং রাজপুতনার ও মাড়োয়ারের জৈনরা সব দখল করে নিল। এখনও ঐ দখলের মধ্যেই আছে পশ্চিমবাংলার বাঙালি। এখন যদি পশ্চিমবাংলার বাঙালি ব্যবসা করতে যায়, সে প্রতিযোগিতায় পারবে না। প্রথম কথা তার পুঁজি নেই। ব্যবসা করার ধৈর্য নেই, ব্যবসার বুদ্ধি নেই। এবং রাষ্ট্রের সহযোগিতা নেই। আর ব্যবসা করার মানসিকতাও বাঙালির নেই। শোনেন না, 'মাড়ওয়ারির গাড়ি, বাঙালির বাড়ি।' মাড়ওয়ারি বাড়ি করে না, গাড়ি করে সময় বাঁচাবার জন্য। এই তো বাস্তব অবস্থা, ভারতীয় সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে এই অবস্থাটাকে আপনি পাল্টাবেন কি ভাবে? যাদের আপনি শোষক হিসেবে দেখছেন, ইউনাইটেড ইন্ডিয়ায় আপনি তাদের তাড়াতে পারবেন না, মাড়ওয়ারির ব্যবসায় হাত দিতে পারবেন না। 'জাতীয় অখণ্ডতা' এবং ভারতীয় সংবিধান তার রক্ষাকবচ। To get ride of the Marwaries-যাদের exploiters হিসেবে দেখছেন কোনও উপায় নেই। কেরানিগিরি ছাড়া আপনি আর কোথাও excess পাচ্ছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। ভারতবর্ষের মধ্যে অবস্থান করে এদের বিতাড়ন করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। এর ওপর পশ্চিমবাংলা আঠারো আনা over populated। কাজেই দিল্লি নিয়ন্ত্রিত বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় পশ্চিমবাংলার বাঙালির উন্নতি নাই, অবনতি আছে।

এর মধ্যে বর্ণ হিন্দুদের আবার আর একটা বিপদ আছে। অ-বর্ণহিন্দুরা তিন হাজার বছর ধরে অবহেলিত-নির্যাতিত। মনু যাজ্ঞবল্ক বা রামায়ণ দেখুন। রামচন্দ্র হলেন, 'আদর্শ রাজা', তিনিও 'ছোটলোক' শম্বুক হত্যা ক'রে 'আদর্শ' হয়েছেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত তারা কোনও প্রিভিলেজ পায়নি। আজ তারা বিদ্রোহী। কিন্তু যেহেতু তারা আস্তিক সেই কারণে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বটাকে তারা অস্বীকার করতে পারছে না। আস্তিক মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। কিন্তু বৈষয়িক বিষয়ে সে তার অধিকার চাইছে। হিন্দুধর্মকে সে চ্যালেঞ্জ করছে না, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বকে সে চ্যালেঞ্জ করছে না। কারণ ওটা কেতাবে আছে। সে ভাগ চাইছে, অধিকার চাইছে সম্পদের, এবং সে জন্যই তার আন্দোলন।

প্রশ্ন: ভারতবর্ষের অন্যত্র দলিত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবাংলায় ঐ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ বিষয়ে–

আহমদ শরীফ: বিহারে, উত্তর প্রদেশে দলিতরা রাজত্ব পর্যন্ত করে ফেললো। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় তা হবে না। এর পিছনে ঐতিহাসিক কারণ আছে, সেটা বুঝতে হবে। অখণ্ড বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম খুব প্রসার লাভ করেছিল। বল্লাল সেন যখন বৌদ্ধ ধর্মের বিলুপ্তি অন্তে সমাজে বর্ণ বিন্যাস চালু করলেন, তার মধ্যেও ফাঁকি ছিল। যেমন আপনাকে ধরে বলা যায়, মুখোপাধ্যায়: মুখ্য উপধ্যায় মানে ওঝা, মানে শিক্ষক। ভারতবর্ষের আর কোথাও ব্রাহ্মণের এই উপাধি আপনি পাবেন না। দীক্ষিত মুসলমানেরা শিক্ষিত হয়ে হিন্দুদের থেকে অনুকরণ করে খোন্দকার হয়েছে। খোন্দকার, আখন্দ, আকুঞ্জি এই তিনটি শিক্ষক বাচক শব্দ। ভারতের অন্যত্র অস্পৃশ্যদের প্রতি যে ঘৃণা আছে, বাংলায় তা কোনও দিনই ছিল না। বাংলায় ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যবধান ছিল বটে, কিন্তু অন্তরের গভীর থেকে যে ঘৃণা তফসিলিদের প্রতি ভারতের অন্যত্র আছে, তা বাংলায় নেই। যে-কারণে বাংলায় অসবর্ণ বিবাহ অতি সহজেই হতে পারে। সেই কারণেই ব্রাহ্মণের সন্তান হয়েও চন্ডালের ঘরে খেতে আপনার বাধে না, মনে জাগেই না। এটা অন্যত্র নেই। সেই দিক দিয়ে বাংলার হিন্দুদের মধ্যে মানুষের প্রতি ঘৃণার ভাবটা কম। উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারতে কুয়োর পানি নিয়ে এখনো রায়ট হয়, কিন্তু বাংলায় তা কোনও দিন হবে না। আমার পৈত্রিক ভিটা যেখানে সেটা হিন্দু প্রধান গ্রাম। মুসলমান পাঁচ সাত ঘর, আর সব হিন্দু। সেখানে বামণের বাড়ির পাশে নমঃশূদ্রের ঘর। আমি দেখেছি বামণের ছেলেরা নমঃশূদ্রের বউঝিদের কাকিমা বউদি বলছে, বাধছে না।

প্রশ্ন: সারা পৃথিবীতেই ভাষা চেতনা, জাতি চেতনা বাড়ছে, ভেঙে যাচ্ছে বহু দেশ–

আহমদ শরীফ: একদিকে যেমন জাতিচেতনা, ভাষাচেতনা বাড়ছে, অন্যদিকে ভাঙছেও বটে। একটু স্থূল ভাবে যদি ধরেন, পৃথিবীর লিংগোয়া ফ্রাঙ্কা এখন একটাই, ইংরেজি। পুরুষের পরিচ্ছদ স্যুট। সংস্কৃতি হচ্ছে স্যুট সংস্কৃতি। ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স গুলোতে খাদ্যের মেনু হয়েছে ফাইভস্টার হোটেলের মেনু, পায়ের জুতো থেকে মাথার চুল কাটার স্টাইলে কোনও পার্থক্য থাকছে না। আপনার সংস্কৃতির কি আছে? আপনার নখ কাটার জন্য নরুন ছিল, দাড়ি কাটার জন্য ক্ষুর। এখন আপনি আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটাতে নেই। সব কিছুই আপনি ইউরোপের কাছ থেকে নিচ্ছেন। আপনার আচার আচরণও তাই হয়েছে। পার্টিশনের আগের দিন পর্যন্ত ছিল আসন পিঁড়িতে বসে খাওয়া। এখন ডাইনিং টেবিল। মাটির হাঁড়ি-সরাও নেই। আগে হিন্দুর বাড়িতে বিয়ালা পড়লে (প্রসূতির সন্তান হলে) হাঁড়ি পাতিল ফেলে দিত। ব্রাহ্মণ বলে আপনার ত্রিসন্ধ্যা স্নান করার কথা, এই যে মুসলমানের ছোঁয়া লাগলো, আপনার পবিত্রতা গেল, সব ছেড়েছেন না? কাজেই সংস্কৃতি একটাতেই যাচ্ছে মন্ত্রী মাত্রই বলে, আমাদের সংস্কৃতি রক্ষা করতে হবে। সংস্কৃতিটা কি সে নিজে ব্যাখ্যা করতে পারছে না। তার পোশাকটা ব্যাখ্যা করতে পারছে না। এই যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে শাড়ি ছিল না, বাঙালির শাড়ি সবাই নিয়েছে। বাঙালির শাড়ি কাজের লোকেরা যে ভাবে পরে, সেই ভাবে পরা হত। কুচি দিয়ে শাড়ি পড়ার ফ্যাশনটা বোম্বে থেকে আনেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী। কাজেই সংস্কৃতি এক হয়ে যাচ্ছে। এবং সংস্কৃতি এক হতে বাধ্য, কারণ ধর্মটা যাচ্ছে। যখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে হোমোসেক্সুয়ালিটি পাশ হয়ে যায়, তখন আর খ্রীস্টানিটি থাকে? একজন যখন কমিউনিস্ট হয় He is no longer a christian, Hindu or Muslim.

প্রশ্ন: ভাষা বিষয়ে–

আহমদ শরীফ: ভাষা চিরকাল থাকবে, আপনার জিহ্বা যতক্ষণ আছে, আপনার ভাষাও আছে। এই যে আমাদের এখানে উর্দুকে চাপাতে চেয়েছিল, পারেনি। আপনারা যে বলছেন পশ্চিমবঙ্গে হিন্দি আপনাদের গ্রাস করছে, তা কোনওদিন সম্ভব হবে না। আপনারা ভুলে যাচ্ছেন কেন, রবীন্দ্রনাথও ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে মানুষ। ১৮৪৭-এ বের হল, দাঁড়ি, কমা, সেমিকলন-সহ standard বোধগম্য বাংলায় লেখা বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। আর ১৮৮০-তে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাচ্ছি। মানে ৩৩ বছরের মধ্যে আধুনিকতম ভাষা এবং সাহিত্যের মালিক হয়ে গেলাম আমরা। এই ভাষা নেবে কে? সেই সময় স্কুলে কিন্তু ইংরেজিই ছিল medium of Instruction ক্লাস ওয়ান থেকে। ১৯৩০-এর থেকে বাংলা হল। সেই অবস্থায়ও তো বিদ্যাসাগর কিংবা রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকে ঠেকানো যায়নি। একজন বাঙালিও যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন বাংলা ভাষা যাবে কোথায়? আপনার জিহ্বা কেটে না নিলে আপনার ভাষা যাবে না। কৃত্রিম উপায়ে বাঙালি বোম্বে ফিল্ম করতে পারে, কিন্তু তার বাঙালিত্ব যাবে কোথায়? অশোককুমার, উৎপল দত্ত এঁরা তো অনেক হিন্দি ছবি করেছেন, কিন্তু তাদের বাঙালিত্ব তো যায়নি। মাতৃভাষা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। লক্ষ করবেন প্রতিটি দেশে মাতৃভাষার উন্নতি হচ্ছে। আমাদের বাংলাতে সত্তর শতাংশ সংস্কৃত শব্দ। স্বর্ণ সিং কে আপনি সরণ সিং বললেন। নরসিংহ রাও নরসীমা রাও হয়ে গেছে। বাঙালি ঐ রকম হয়নি। বাঙালি সংস্কৃত ধরে রেখেছে। আমাদের ঠেকাবে কে? আর বাংলাদেশ থাকতে বাংলাভাষাকে মারবে কে? কেউ পারবে না।

প্রশ্ন: বাংলাদেশে বাংলা ভাষাকে মারতে না পারলেও পশ্চিমবাংলায়–

আহমদ শরীফ: আপনারা ভাষা হারাবেন? হারাবেন না। তার একটা প্রমাণ দেখুন– যারা রোজগারের লোভে আমেরিকা গেছে, তারা দরিদ্র, ধনের লোভে গেছে। ধনের পরে আসে মান। মানের জন্য পদ-পদবী দরকার। প্রথম পুরুষ গেছে, ধন যখন হয়েছে এখন মান রাখার, সংস্কৃতি রাখার তাদের দায় পড়ে গেছে। লন্ডন থেকে আমেরিকা পর্যন্ত সমস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গায় আপনি একটা আন্দোলন দেখবেন। আরবি ভাষীরা বলছে, আমাদের সন্তানদের আরবি পড়াতে হবে, শিখরা বলছে গুরমুখী পড়াতে হবে। শুধু তাই নয়, আলজারিয়ানরা বলছে, আমাদের নিজেদের পোশাকে স্কুলে যেতে দিতে হবে। এটা সর্বত্র হচ্ছে। ভুটানের রাজাকে যদি খুব দামী একটা স্যুট উপহার দেওয়া হয়, তিনি কি পরবেন? কিংবা আপনাদের মতো গণদের যদি আমি একটা ব্রিফকেস উপহার দিই, আপনি ব্যবহার করবেন? স্বাতন্ত্র্য চেতনা এক রকমের থাকবে। কিন্তু উদার ভাবে গ্রহণ-বরণ করার মধ্যে কোনও পাপ নেই। যেমন আমরা স্যুট নিয়ে নিয়েছি। এই যে পায়জামা পরে আছি, এটা ইংলিশ কাট। মুঘল, শিখ বা রাজপুতরা যেটা পরত এটা তা নয়। আমরা যে পাঞ্জাবি পরি, তার হাতা পাঞ্জা পর্যন্ত আসত বলে তাকে পাঞ্জাবি বলা হয়। কিন্তু পাঞ্জাবির হাতা এখন ছোট হ'তে হ'তে বাঙালি হয়ে গেছে। বাঙালির খুতিটা এসেছে কৌপিন থেকে। ধুতি পরে বাসে উঠতে অসুবিধে, কারখানায় কাজ করতে অসুবিধে, দৌড়তে অসুবিধে, পানিতে নামতে অসুবিধে। তাই রাখা সম্ভব নয়। ব্রিটিশ আমলে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য ধুতি পরা শুরু হয়। ১৯৩৩ সালে সরকারী কলেজের মাস্টারদেরও স্যুট পরতে হ'ত। ১৯৩৩-এ রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হয়ে গেছে, সেই সময়ে সরকারী কলেজের হিন্দু শিক্ষকরা সরকারের কাছে ধুতি পরার অনুমতি চাইলেন। এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে, হিন্দু শিক্ষকরা ধুতি পরা শুরু করে দিলেন। অবশ্য অধ্যক্ষদের স্যুট পরতেই হ'ত। পাকিস্তান হবার পর এখানে (পূর্ব বাংলায়) শেরোয়ানি পায়জামা পরা শুরু হ'য়ে গেল। কিন্তু ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে দেখা গেল শেরোয়ানি পায়জামা যে পরে, সে নয়, চাকরি পায় স্যুটপরা প্রার্থীরাই। তারপর শেরোয়ানি পায়জামা উঠে যায়।

AMARBOI.COM

প্রশ্ন: কারো কারো ধারণা ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব কার্যকর হলে মুসলমান মধ্যশ্রেণীর বিকাশ ঘটতো এবং–

আহমদ শরীফ: (উত্তেজিত ভাবে) না না, আর বলার দরকার নেই, বুঝেছি। একেবারে মিছে কথা। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব আনা হয়েছিল বিকাশমান বাঙালি হিন্দুকে জব্দ করার জন্য। বাঙালি হিন্দুরা শিক্ষিত হয়ে গেল, কোলকাতার হিন্দু কলেজ থেকে যার শুরু। তার মধ্যে দেশপ্রেম জাগলো। আগে তো ঈশ্বরগুপ্তরা ব্রিটিশের জয় ঘোষণা করেছেন। এবার ১৮৬০, ১৮৭০-এর পর ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা লক্ষ করা গেল, যে-কারণে ১৮৯৫-এর মধ্যে অরবিন্দ ঘোষদের পাওয়া যাচ্ছে। ১৯০৫-এর মধ্যে তৈরি হচ্ছে 'যুগান্তর' প্রভৃতি। কী রকম দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, সে স্বাধীনতা চায়। ইংরেজ এটা বুঝতে পেরে বাঙালি হিন্দুকে তিন ভাগে ভাগ ক'রে সর্বত্র তাকে সংখ্যালঘু করে দিতে চায়। ওড়িষ্যার সঙ্গে, বিহারের সঙ্গে, আসামের সঙ্গে। ওটা কার্যকর হলে বাঙালি মুসলমানের উপকার হতো, এটাও বাজে কথা, আমার একটা প্রবন্ধ আছে এ বিষয়ে। বাঙালি মুসলমানের উন্নতি হবার কথাটা ভ্রান্ত এবং প্রতারণা মূলক। পূর্ববাংলা আর আসাম নিয়ে যা হল, তাতে দেখা গেল বাঙালি মুসলমান মাত্র পঞ্চাশ হাজারে মেজরিটি। আসামের Non regulated area গুলো যখন regulated হয়ে এর মধ্যে এসে যেত, তখন বাঙালি মুসলমানও মাইনোরিটি হয়ে যেত। প্রথমে নবাব সলিমুল্লাহ দুটো মিটিং বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে করলেন ঢাকা শহরে, তারপর কার্জন দশ লক্ষ টাকা ঋণের নামে ঘুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে সলিমুল্লাহকে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে নিয়ে এলেন। রাইটার্স বিল্ডিং-এ এখনো সেই ফাইল দেখতে পাবেন। বাঙালি মুসলমানের যে উন্নতি হত না, তার নমুনা আপনি পাবেন ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস দেখলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক মুসলমান মাস্টার ডঃ শহীদুল্লাহকে পাওয়া গেল, উনি রিসার্চ এ্যাসিসটেন্ট ছিলেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর ইংরেজির জন্য পাওয়া গেল উর্দুওয়ালা মুসলমান ফার্স্ট ক্লাস এবং অক্সফোর্ডের ডিগ্রিধারী ডঃ মাহমুদ হাসানকে। আরবি-ফার্সীর জন্যও আনতে হল বিহার থেকে, ইউ.পি থেকে। ফার্সীর জন্য ফিদা হোসেন এলেন ইউ-পি থেকে। আরবির জন্য ফুক সাহেব এলেন জার্মানী থেকে। Science-এ প্রথম মুসলমান যাকে পাওয়া গেল তিনি কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র, কাজী মোতাহার হোসেন। রেজাল্ট বের হবার আগেই তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারশিপ দিয়ে দেওয়া হয়। ভাবা হয়েছিল তিনি সেকেন্ড ক্লাস পাবেন। কিন্তু রেজাল্ট বের হবার পর দেখা গেল থার্ড ক্লাস পেয়েছেন। ফলে তাঁর ডিমোশন হয়। তা হলে মুসলমানদের কি উন্নতি হ'ল? '৪৭ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান শিক্ষক পনেরজনও ছিলেন না।

[উনিশ শতকের প্রথম পাদ থেকেই কোলকাতায় রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন যখন অমূর্ত উপাস্যবাদ প্রচার করেন, কিংবা নিরীশ্বর ডেভিড হেয়ারের আর যুক্তিবাদী যুবক ডিরোজিওর প্রভাবে হিন্দু ধর্মে অবজ্ঞা প্রকাশ করছে ছাত্ররা অথবা ম্লেচ্ছ স্পর্শদোষে সমাজে পতিত কেউ কেউ খ্রীস্টান হয়ে যাচ্ছে, অক্ষয় কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রমুখ স্বধর্মাচার ত্যাগী বলে, নাস্তিক বলে, স্বসংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ বলে সমাজে নিন্দিত ও ধিক্কৃত হলেও কেউ তাঁদের হত্যা করার জন্যে আন্দোলন করেনি, চায়নি তাঁদের ফাঁসি।

সহিষ্ণুতার সংস্কৃতি: আহমদ শরীফ]

প্রশ্ন: শিখা পত্রিকা এবং বুদ্ধি মুক্তি আন্দোলন বিষয়ে—

আহমদ শরীফ: সৈয়দ আবুল হোসেন ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি মনে মনে নাস্তিক ছিলেন। তিনি ছিলেন অর্থনীতির শিক্ষক। মুসলমানদের মধ্যে আধুনিকতা জাগাবার জন্য ১৯২৪ সালে তিনি 'আল্-মামুন তরুণ সঙ্ঘ' বলে একটা সংগঠন করেছিলেন। পরে করেন মুসলিম সাহিত্য সমাজ। কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী আনওয়ারুল কাদির এবং শহীদুল্লাহকে তিনি এর সঙ্গে যুক্ত করেন। এর মধ্যে ডঃ শহীদুল্লাহ ঐ মতের ছিলেন না। তাঁরা 'শিখা' বলে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। যিনি এর মধ্যমণি ছিলেন, এবং আধুনিকতাকে গ্রহণ করার জন্য সব কিছু করলেন তিনি সৈয়দ আবুল হোসেন। তাঁর উপর মুতাজিলা মতের প্রভাব ছিল। কিন্তু তাঁর একটি ত্রুটি ছিল, তিনি বাঙলাটা ভালো লিখতেন না। তখনকার দিনের হিন্দু গদ্যকারদের সমকক্ষ পাকা হাতে বাংলা লিখতে পারতেন কাজী আবদুল ওদুদ। কিন্তু কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন যুক্তিবাদী রামমোহন ভক্ত মুসলমান। তিনি র‍্যাশনাল কথা বলতেন বটে, কিন্তু ইমানটা ঠিক রাখতেন, তিনি ছিলেন Hero worshiper। তিনি গ্যাটে, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ বসু, মুহম্মদ, রামমোহনের ভক্ত ছিলেন। বিশেষ করে রামমোহন ছিলেন তাঁর আদর্শ। রামমোহনের ধাচেই তিনি সংস্কারটা করতে চেয়েছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদ শেষ পর্যন্ত মুসলমানিত্ব ছাড়েননি, ইসলাম ছাড়েননি, শেরওয়ানীও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়েননি। আবুল হোসেন তিনজন ছাত্রকে এর মধ্যে জুটিয়ে ছিলেন যাঁরা ছিলেন Born Musalman একজন হলেন আবদুল কাদির তাঁর প্রথম কবিতার বইতে প্রথম কবিতার নাম 'ফাতেহা দোয়াজদম'। তিনি মডার্ন ছিলেন না। আর একজন ছিলেন আবুল ফজল। তিনি কোরানের বাণী, হাদিসের বাণী সংকলন করেছেন, কায়েদে আজম, নজরুল ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানী দৃষ্টিকোণে নাটক লিখেছেন। সর্বত্র তিনি ছিলেন মুসলমান। পরে student union-এর ডাকে বক্তৃতা দিতে এসে একজন উদার মনস্বী হয়ে গেলেন। Vernacular teacher থেকে became vice-chancellar and then minister। আসল কথা তাঁদের মনের কোনও মুক্তি ছিল না। ১৯৭৩ সালে ডঃ কুদরতে খোদার নেতৃত্বে education reformation committee হলে আবুল ফজল জবানবন্দী দিলেন যে, ধর্মকে ছাড়া যাবে না, ধর্ম শিক্ষা আবশ্যিক করতে হবে ইত্যাদি। এঁরা আসলে পত্রিকার প্রুফ আনা-নেয়া করতেন। meeting arrange করতেন একজন ছাত্র। আবদুল কাদির বিএ পাস করতে পারেননি। আবুল ফজল একবার ফেল করে পরে বি-এ পাস করেন। আর শামসুল হুদা কাজী আবদুল ওদুদের বাড়িতে House tutor ছিলেন। সেখানে ওদুদের মেয়ের সঙ্গে তাঁর প্রেম হয়। শামসুল হুদা হলেন নাস্তিক। তিনি এক ঘরোয়া সভায় মহম্মদ এবং ইসলামকে নিন্দা করে বক্তৃতা দেওয়াতে ঢাকায় হইচই পড়ে যায়। নবাববাড়ির কর্তা শিখা গোষ্ঠীর সবাইকে ডেকে ধমকান। ডঃ শহীদুল্লাহ ছিলেন শিখা কমিটির মেম্বার। তিনি ঐ ঘরোয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন না। অধ্যাপক এ ডবলিউ মাহমুদের কাছে শুনেছি, ডঃ শহীদুল্লাহকে ঢাকার নবাব বাড়িতে (আহসান মঞ্জিল) ডাকলে শহীদুল্লাহ বলেন, এমন কথা বলে থাকলে তো শামসুল হুদার মাথা কেটে নেওয়া উচিত। তবে সবাই ক্ষমা টমা চেয়ে রক্ষা পেলেন। আবুল হোসেন (পরে সৈয়দ তিনি আর লিখতেন না) বিরক্ত হয়ে এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোলকাতায় চলে গেলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে ৪৪/৪৫ বছর বয়সে কর্কটরোগে মারা গেলেন। কাজী আবদুল ওদুদ শিখা পত্রিকায় খুব কম লিখেছেন, কোনও রকমে গা বাঁচিয়ে innocent লেখাগুলো এখানে লিখেছেন। 'সম্মোহিত মুসলমান' বলে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন কিন্তু শিখায় ছাপেন নি। অনেক পরে বইতে ছেপেছেন। তিনি খুব গা বাঁচিয়ে চলতে পারতেন। আর কাজী আবদুল ওদুদের লক্ষ্য ছিল প্রমোশন পাওয়া। তিনি ছিলেন vernacular teacher এতে Proffesorship ছিল না। এইজন্য তিনি অনেক তদবির করে Text Book Board-এর secretary হ'য়ে কোলকাতায় গিয়েছিলেন এবং Proffesorship পেয়েছিলেন। এই হচ্ছে কাজী আবদুল ওদুদ। অথচ all credits are given to Kazi Abdul Wadud. আর আবদুল কাদিররা কিছুই করেননি, তারা তো প্রথম থেকেই মোল্লা মুসলমান।

প্রশ্ন: ধর্মীয় মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে–

আহমদ শরীফ: যারা রাজনীতি করেন, ভোটের জন্যই তাদের দরকার সাম্প্রদায়িকতা। যেমন ইন্দিরা গান্ধী নাস্তিক ছিলেন, রাজীব গান্ধীও তাই। কিন্তু ভোটের প্রয়োজনেই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে তাঁরা ব্যবহার করতে চেয়েছেন, অপর দিকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকেও। শেষ পর্যন্ত অবশ্য রাখতে পারলেন না। এতদিন তত প্রবল ছিল না। ব্রিটিশ আমলের শেষাশেষি যখন স্বাধীনতার কথা এল, তখনই devide and rule

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীতি গুরুতর শুরু হল। পুরো মুঘল আমলে সাম্প্রদায়িকতা নেই। কারণ তুর্কী-মুঘল আমলে শহরে শাসক হচ্ছে মুসলমান, আর গ্রামে শাসক হচ্ছে হিন্দু। গ্রামের শাসক হিন্দু এবং মুসলমান মাইনোরিটি বলে দাঙ্গা হতে পারে নাই। আবার শহরে শাসক মাইনোরিটি বটে কিন্তু বাদশাহর জাত বলে সেখানেও হয় নাই। হিন্দু-মুসলমানের মারামারির প্রথম রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে ১৭৮২ সালে গুজরাটে। তাও আজকের মতো দাঙ্গা নয়। এই যে এত ঘটনা ঘটলো, কিন্তু ১৯৫০ সালের আগে এখানে শহরেও দাঙ্গা হয়নি বাংলাদেশের গাঁয়ে কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় নি। ছোটলোক যাদের বলে মুচি, মেথর এদের নিয়েও কোথাও রায়ট হয় নাই।

প্রশ্ন: Direct action এবং ১৬ আগস্ট ১৯৪৬-এর 'great Calcutta killing' সম্পর্কে–

আহমদ শরীফ: ওটাও Politically হল। সহজ কথা জিন্নাহ বললেন, ব্রিটিশের পলিসির বিরুদ্ধে Direct action এ যাবো। এখন দেখুন জিন্নাহ বা মুসলিম লিগের অধীনে সিন্ধু নেই, ফ্রন্টইয়ার (Frontier) নেই, পাঞ্জাব নেই। উত্তর ভারতে, ইউ-পি, বিহারে, মুসলমান মুসলিম লিগ করে বটে, কিন্তু সেখানে মুসলমান মাইনরিটি, শতকরা বার জন মাত্র। এছাড়া দক্ষিণ ভারতে মুসলমান বিভিন্ন জায়গায় ১০%, ৯%, ৮% মাত্র। কাজেই Direct action করতে হলে বাংলাতেই করতে হয়। এবং রাজধানীতেই করতে হয়। সেই কারণেই তা কোলকাতায় শুরু হয়। সেই রায়ট-এও বেশি মার খেল মুসলমানরা। কোলকাতার রাস্তার ধারে দু'তিন তলা বাড়ি। পার্কসার্কাস অঞ্চলের কয়েকটি বাড়ি ছাড়া সব বাড়ি হিন্দুর। হিন্দুরা গরম পানি, ইট রাখলো ছাদের ওপরে। বিহারি মুসলমান কুলি মজুরেরা, খিদিরপুরের খালাসীরা, এবং বাঙালি (মুসলমান) বাসার চাকরেরা এলো হিন্দুকে মারতে। তারা রাস্তার উপরে। হিন্দুরা ছাদের ওপর থেকে ইট আর গরম পানি ফেলছে, ফলে ওরাই মরেছে সবচেয়ে বেশি। আর নোয়াখালীর রায়ট-এর কারণ অন্য। গোলাম সারওয়ার নির্বাচনে কংগ্রেসের নমিনেশন চেয়েছিল, রাজেন বাবু নমিনেশন দিলেন না। রাজেন বাবুর উপর রাগ। তাই রাজেন বাবুর বাড়ি আক্রমণ করার সুযোগ নিল গোলাম সারওয়ার। তারপর রায়ট মাত্রেই লুটের একটা সুযোগ থাকে। সেই কারণে রায়টে গরীব লোক অংশ নেয়। রায়ট এর অর্ডারটা দেয় ভদ্রলোকেরা, গরীব লোকেরা কিছু পাওয়ার জন্য যায়, হত্যার উদ্দেশ্যে নয়। কিছু পেতে গেলে কিছু হত্যা করতে হয়, এই হল ব্যাপারটা। গরীব লোকেরা কিছু নিয়ে বাড়ি ফিরলে, যাদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা, তাদের বাড়ি, ভিটে, জমি, ব্যবসা দখল করে ভদ্রলোকেরা।

প্রশ্ন: উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে আপনি কার নাম করবেন?

আহমদ শরীফ: চরিত্র হিসেবে রামমোহনের কোনও চরিত্র ছিল না, কিন্তু তাঁর ব্রেন ছিল অসাধারণ। Highly intellectual এবং যুক্তিবাদী ছিলেন। কিন্তু বাস্তব জীবনে চরিত্রহীন এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর মা ভিক্ষে করেছেন, দাদা জেল খেটেছেন, বাবা জেল খেটেছেন। কিন্তু রামমোহন টাকা দিতে রাজি হন নাই। পরে এক হাজার টাকা দিলেন উচ্চ সুদে। চরিত্র না থাকলেও সে যুগে ইউরোপের যে-কোনও প্রথম সারির intellectual-এর সমকক্ষ ছিলেন রামমোহন। তিনি ছিলেন সংস্কার মুক্ত মানুষ এবং প্রকৃত শিক্ষিত। আরবি, ফার্সী সংস্কৃত, ইংরেজি পুরো শিখেছিলেন। খবর রাখতেন সারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর। তিনি ধার্মিক ছিলেন না, এক মুহূর্তে পৌত্তলিকতাকে ছাড়তে পেরেছিলেন। আত্মীয় সমাজে মদ আর গরুর মাংসের শিককাবার খাওয়া হত। কিন্তু যখন ইউরোপ গেলেন হিন্দুয়ানি দেখাবার জন্যে কিংবা জাহাজে দুধ পানের জন্যে সঙ্গে একটা গরুও নিয়েছিলেন। অথবা যেন লন্ডনের গরু খ্রীস্টান গরু, তার দুধ খাওয়া যাবে না। রান্নার জন্য একজন ব্রাহ্মণ নিয়েছিলেন সঙ্গে। তার উপপত্নীর ঘরে একটি সন্তান ছিল। আর বিদ্যাসাগর সর্বসংস্কার মুক্ত নাস্তিক ছিলেন। এটা কোনও সোজা কথা নয়। জ্ঞান, সাহস, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, যুক্তিবাদ না থাকলে কেউ নাস্তিক না হলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়ে সর্বপ্রকার ধর্মাচার পরিহার করতে পারতেন না। সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর যে বিদ্যা অর্জন করেছেন, সে বিদ্যা হল এক হাজার বছর, দেড় হাজার বছর আগের। তার সমস্ত সিলেবাস ছিল এক হাজার বছর আগের। রঘুনাথ, রঘুনন্দন, বুনো রামনাথ, ন্যায় শাস্ত্র প্রভৃতি সামান্য কিছু পাঁচশ বছর আগের। বেদ, সংহিতা, মনুসংহিতা, কাব্যনাটক যা পড়েছেন সব হাজার-দেড় হাজার বছরের প্রাচীন। কাজেই একেবারে Backward লেখাপড়া। সেই মানুষ নিজে নিজে ইংরেজি শিখেছেন। এবং সেই Backward মানুষ সবচেয়ে Forward হলেন। হিন্দু কলেজে ছাত্র জীবনে যারা উচ্ছৃঙ্খল হয়েছিলেন, তাঁরা চল্লিশোত্তর বয়সে নিষ্ঠাবান হিন্দু, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম, নিষ্ঠাবান খ্রীস্টান হয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর জীবনে তা হন নাই। বিদ্যাসাগরের মধ্যে সব কিছু আছে, শুধু দেবতা নাই। আত্ম সম্মানে নাস্তিকতায় সর্বসংস্কার মুক্ত একজন মানবতাবাদী ছিলেন তিনি। বিদ্যাসাগরের ত্রুটি হল, তাঁর আবেগ ছিল বড় বেশি। বিদ্যাসাগর যখন বিধবা বিবাহ চালু এবং বহু বিবাহ-বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে চাইলেন, তখন সারা কোলকাতা শহরে এক ডজন graduate ছিল না। একটা মধ্যযুগীয় পরিবেশে তিনি এসব চালাচ্ছেন। কাঁঠাল matured হলে রোদে দিলে পাকে। আম matured হলে ছালাতে পুরলে পাকে। কিন্তু কাঁঠালের মুচি যদি আপনি রোদে দেন তা তো পাকবে না। অকালে অসময়ে তিনি আরম্ভ করেছিলেন। সেই কারণে বহু বিবাহ এবং বাল্য বিবাহ নিরোধ তার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বিধবা বিবাহ চালু করাও তার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে বহু বিবাহ নিরোধ হল। কারণ লজ্জা পেয়ে গেল। আমাদের দেশে (বাংলাদেশে) শিক্ষিত মুসলমান দুটো বউ থাকলে একেবারে লজ্জায় মরে যায়। একটাকে গ্রামে রাখে, এবং দু'টো বউ যে আছে, তা স্বীকারই করতে চায় না। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই দু'জনকে শহরে রাখে না।

প্রশ্ন: বাংলাদেশে তো দু'টো বিয়ে নিষিদ্ধ–

আহমদ শরীফ: নিষিদ্ধ হয়েছে আইয়ুব খানের সময়। দুটো বিয়ে করতে ওটা কোনও বাধা নয়। দ্বিতীয় বিয়েতে প্রথম বউয়ের সম্মতি লাগে। তো প্রথম বউকে একদিন পিট্টি দিলেই দ্বিতীয় বিয়ের সম্মতি সহজেই পাওয়া যায়। কিংবা তালাকের ভয় দেখালেই কাজ হয়ে যায়।

প্রশ্ন: এখনো কি তালাক সেই ভাবে দেওয়া যায়?

আহমদ শরীফ: তালাক তো পুরুষের একচেটিয়া অধিকার। নারীর তো কোনও অধিকার নেই। এক পুরুষ বহু নারীতে উপগত হবে। মুসলমান, খ্রীস্টান, ইহুদিদের আরও একটি সুবিধা আছে– War Captives and slaves any number you can

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

enjoy without marring। কি রকম মজা! কাজেই নারীর তো কোনও সত্তা এখনো স্বীকার করা হয় নাই।

যাক যে কথা বলছিলাম। সব দিক বিবেচনা করলে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা ভূয়োদর্শন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত নাস্তিক ছিলেন। বিদ্যাসাগর নাস্তিক reformer হিসেবে বাঙালির উপকার করতে চেয়েছিলেন শিক্ষা-দীক্ষায়, বিশেষ ক'রে নারীর। নারী সত্তার মর্যাদা প্রথম উপলব্ধি করলেন বিদ্যাসাগর। তার পরে যাঁর নাম করতে হয় তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শন, চিন্তা-চেতনা ছিল অন্তত উন্নত মানের। বাংলা ও বাঙালি সম্পর্কে সামগ্রিক দৃষ্টি রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগরের ছিল না। এই সামগ্রিক দৃষ্টি ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের। তিনিই 'জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা' একথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চিন্তা-চেতনায় রবীন্দ্রনাথের থেকে অনেক উঁচু মানের এবং উঁচু দরের ছিলেন। Till this moment আমার নিজের ধারণা বঙ্কিমের মতো এমন সামগ্রিক, সামূহিক, সামষ্টিক জাতি চেতনা, কল্যাণ চেতনা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কখনো জাগেনি। রবীন্দ্রনাথ অনেক ব্যাপারে conservative হিন্দু ছিলেন, ৪৭ বছর বয়স পর্যন্ত Conservative হিন্দু, ব্রাহ্মও নন। ৫৩ বছর বয়সে তিনি উদার হলেন নোবেল পুরস্কার পেয়ে। যেমন মন্ত্রী হয়ে মন্ত্রীরা এখানে সেখানে বক্তৃতা দিতে যান। বৌদ্ধরা ডাকলে 'ভগবান বুদ্ধের মতো বড় মানুষ আর নেই', আবার রামকৃষ্ণ ডাকলে, 'রামকৃষ্ণের থেকে বড় লোক নেই' এমন বলে না? রবীন্দ্রনাথও সেই রকম international হলেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্রতা এবং সংকীর্ণতা শেষ পর্যন্ত ছিল। যা কখনো বঙ্কিমচন্দ্রকে স্পর্শ করে নাই। ডায়বেটিস ও হাঁপানি রোগ, পুত্র সন্তানহীনতা, চাকরিতে গোলমাল, ইত্যাদি কারণে জীবনের শেষ দশ/বারো বছর বঙ্কিম হিন্দুয়ানির চর্চা করেছিলেন। স্কটিশচার্চ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এক জমিদার বাড়ির শ্রদ্ধানুষ্ঠানে পরিহাস ছলে হিন্দুয়ানির নিন্দে করাতে তাঁর লেগেছিল। তারপর তিনি বেদ-পুরাণ ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করে দিলেন, কৃষ্ণ চরিত্র ইত্যাদি লিখলেন। এবং এতেই তিনি ভক্তিধর্মে আশ্রিত হলেন। মানে, যিনি সমুদ্র সাঁতারের ক্ষমতা রাখতেন, তিনি হিন্দুয়ানির বদ্ধকূপে আবদ্ধ হয়ে গেলেন, শেষ জীবনের দশ/বারো বছর। তার আগে বঙ্কিমের যে দৃষ্টি, যে উদারতা তার তুলনা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম কৃষকের কথা বলেছেন। একটা sentance দিতে হয়েছে ডেপুটিগিরি করেন বলে– আমরা সমাজ বিপ্লব চাইনা, কাজেই আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে কিছু বলিবো না। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পছন্দ করতেন। তাঁর মধ্যে দেশপ্রেম প্রথম থেকেই ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র আগাগোড়া ব্রিটিশ বিদ্বেষী ছিলেন। তাদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপও করেছেন। এবং তাঁর বিরুদ্ধে মুসলমান বিদ্বেষের যে অভিযোগ আনা হয়, তাও ঠিক নয়। 'আনন্দমঠ'-এ তিনি হিন্দুয়ানিকেও পছন্দ করেন নাই। পত্রিকায় আনন্দমঠের শুরু ব্রিটিশ বিদ্বেষ দিয়ে, চাকরি হারাবার ভয়ে ইংরেজের জায়গায় মুসলমান বসান। এসব জানলে-বুঝলে বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলমান বিদ্বেষী বলা যায় না। তিনিই প্রথম বলেন, যতদিন পর্যন্ত উর্দুওয়ালা মুসলমানেরা মানে ভদ্র মুসলমানেরা বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করবেন না, ততদিন উন্নতি নাই। তিনি প্রসন্ন চিত্তে বলেছেন, পাঠান যুগ ছিল বাংলার স্বর্ণ যুগ। তাঁর 'বন্দেমাতরম্' হচ্ছে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সাতকোটি মানুষকে নিয়ে লেখা। বাংলা, বিহার উড়িষ্যা এখন প্রভিন্স, তখন ছিল সুবে বাংলার অন্তর্গত। এই সুবে বাংলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন মুসলমানকেও তো তিনি তাঁর সংগীতে বাদ দেন নাই। তিনি প্রথম স্বদেশকে মাতৃরূপে চিহ্নিত করেছেন। তবে শেষ জীবনে তিনি Hindu code of life তৈরি করেন। এবং হিন্দু পুনর্জাগরণ কামনা করেছেন।

[আমাদের দেশে নারীর মধ্যে প্রথম স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার জন্যে দ্রোহাত্মক যুক্তি উচ্চারণ করেন সম্ভবত (মোতিচুর, অবরোধবাসিনী) বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩১) এ শতকের প্রথম দশক থেকেই। আর শেষ দশকে তসলিমা নাসরিন আর তাঁর প্রেরণা-প্রবর্তনায় এখন মল্লিকা সেনগুপ্ত প্রমুখ অনেকেই। আর আফ্রো-এশিয়ার অসংখ্য মহিলা সমিতি স্বাধিকারের সংগ্রামে সদা নিরত রয়েছে। কিন্তু শাস্ত্রমানা আস্তিক নারী স্বাধীনতা পেতেই পারে না, সুযোগ-সুবিধে আদায় করতে পারে মাত্র। কারণ কোনও শাস্ত্রই নারীর স্বাধীন সত্তা স্বীকার করে না। নারীকে স্বাধীন ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে নাস্তিক হতে হবে।

নারীবাদ-পুরুষবাদ নয়: বিশ্বমানববাদ, আহমদ শরীফ]

প্রশ্ন: 'বন্দেমাতরম্' তো বাংলাকে বন্দনা করে লেখা, অথচ সেই সংগীতকেই পরে ভারত বন্দনা বলে চালানো হয়—

আহমদ শরীফ: 'বন্দেমাতরম্' হচ্ছে সম্পূর্ণ ভাবে বাংলাকে তথা সুবেহ বাঙ্গলা বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে বন্দনা ক'রে লেখা। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও ভারত ধারণা ছিল না। কারণ তাঁর ফরমেটিভ প্রিয়ডে ইংরেজ ভারতবর্ষ জয় করেনি। সেটা এসেছে রবীন্দ্রনাথে, যে রবীন্দ্রনাথ সত্য গোপন করেছেন। জনগণমন তিনি লিখেছেন আশুতোষ চৌধুরীর পরামর্শে, 'ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ'-এর অভিষেক উপলক্ষে। আশুতোষ চৌধুরী ছিলেন তাঁর ভাইঝি জামাই, প্রমথ চৌধুরীর বড় ভাই। এই রবীন্দ্রনাথই ডঃ ডেভিটের মধ্যস্থতায় এ্যান্ডারসনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে 'চার অধ্যায়' লেখেন। এটা এখন প্রমাণ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, 'ঘরে বাইরে'ও তাঁকে টাকা দিয়ে লেখান হয়। অনেক অন্ধ রবীন্দ্রভক্ত বলেছেন যে, পঞ্চম জর্জকে বন্দনা করে নয়, 'জনগণমন' আসলে ঈশ্বরকে বন্দনা করে লেখা। ঈশ্বর তো বিশ্বব্যাপী, রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর কেন শুধু ব্রিটিশ ভারতের উপনিবেশের ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ রইলেন? এ প্রশ্নের কী জবাব দেবেন তাঁরা!

প্রশ্ন: রবীন্দ্রনাথকে আপনি আলোর পুরুষ বলেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম জন্ম বর্ষে 'রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন' এই লেখাটির জন্য দু'বাংলাতেই আপনি চিহ্নিত হয়েছেন 'রবীন্দ্র বিরোধী' মানুষ হিসেবে। আপনার ঐ লেখাটির বিরুদ্ধে কবি শামসুর রাহমান ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, শওকত ওসমান জানিয়েছিলেন প্রতিবাদ, এবং সৈয়দ শামসুল হকের ভাষায় তা ছিল 'এক কলংকিত কাজ'। এই সব কারণেই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাদের অষ্টাদশ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আপনাকে সাম্মানিক ডি-লিট উপাধি প্রদান করায় (২৪ বৈশাখ ১৪০০, ৭ মে ১৯৯৩) 'লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ' এই অভিযোগ এনে কোলকাতার সংবাদপত্রে তার প্রতিবাদ করেন কেউ কেউ। এ বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া—

আহমদ শরীফ: প্রথম কথা রবীন্দ্রবিরোধী আমি নই। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে কথাগুলো বললাম, তা তো প্রমাণিত হয়ে গেছে। আমি রবীন্দ্রনাথের একটা True assessment করতে চেয়েছিলাম তিন পুরুষ পরে। এই কারণেই ঐ লেখার ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিরোনাম। আমার ঐ লেখাটির বিরুদ্ধে রবীন্দ্র স্তুতিকাররা ক্ষ্যাপা। এর আগে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কয়েক হাজার বই লেখা হয়েছে। সবগুলো হচ্ছে স্তাবকতা। মহাকবিকে মহামানব বানানোর অপচেষ্টায় সবাই মহাকবিকে মহামানব রূপে দেখতে-দেখাতে চান। রক্ত মাংসের মানুষমাত্রই প্রবৃত্তিচালিত থাকে লঘু-গুরু ভাবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাবে-চিন্তায় কর্মে-আচরণে মর্ত্য মানব বা প্রাণীসুলভ কোনও প্রাবৃত্তিক দোষ বা অসংযত রূপ বা সাধারণ স্বাভাবিক কর্ম-আচরণ দেখতে পান না, সব তথ্য গোপন করেন, কোনও ভদ্রলোক লিখতে পারেন না। আগাগোড়া চাটুকারিতা আর স্তাবকতা। নারায়ণ বিশ্বাস প্রথম ধরে দেন 'গোরা' এবং 'ঘরে-বাইরে'র নকল। একথা অবশ্য আগে বলবার চেষ্টা করেছিলেন, প্রিয়রঞ্জন সেন। তারপর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত একটি মেয়েও 'গোরা' এবং 'ঘরে-বাইরে'-এর সঙ্গে দুটি ইংরেজি উপন্যাসের সাদৃশ্যের কথা বলেছিলেন। এর বেশি বলতে সাহস পাননি। কালীমোহন ধরে দিয়েছিলেন কিছু রবীন্দ্র কবিতার নকল। স্তাবকতা থেকে মুক্ত হয়ে নির্মোহ দৃষ্টিতে আমি রবীন্দ্র মূল্যায়ন করতে চাই। নজরুল সম্পর্কেও আমি একই ভাবে মূল্যায়ন করেছি ১৯৫৮ সালে লেখা 'এক বিরূপ পাঠকের দৃষ্টিতে নজরুল' প্রবন্ধে। আমি চেয়েছি As he is তুলে ধরতে। এবং আমার সমস্ত কিছু documented. আমরা হচ্ছি ভক্তিবাদী। ভক্তিবাদী মানুষ যুক্তিবাদী হতে পারেন না, এবং সত্যকেও জানতে বা উপলব্ধি করতে পারেন না। আমি রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে এবং গ্রহণ করতে চাই ভক্তির দৃষ্টিতে নয়, যুক্তির এবং তথ্যের ভিত্তিতে। এতে রবীন্দ্রনাথ ছোট হন না। আমার যে প্রবন্ধের কথা আপনি উল্লেখ করলেন, সেই প্রবন্ধ আমি শেষ করেছি ভারতচন্দ্রের উদ্ধৃতি দিয়ে–

'কবিতা কমলে তুমি রবি মহাশয় নরলোকে সম নাহি দেবলোকে কয়।' আমি রবীন্দ্রনাথকে মানুষের মন-মগজ-মনন-মনীষার সর্বোৎকৃষ্ট চরম ও পরম বিকাশরূপে দেখতে ও দেখাতে চেয়েছিলাম, মানবশক্তির চরম ও পরম প্রতীক-প্রতিম ও প্রতিভূ হিসেবে দোষে গুণে বাস্তব ও স্বাভাবিক মানুষটিকে জানতে, বুঝতে ও দেখতে আর দেখাতে। আমি বলেছি রবীন্দ্রনাথের থেকে বড় প্রতিভা গ্যয়টে, সেক্সপিয়ার, টলস্টয়, ভিকতর য়্যুগো, দস্তয়ভস্কি প্রভৃতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে এমন versatility আর কোনো প্রতিভাবান অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। সব ক্ষেত্রে এমন দক্ষতা, এমন কী শেষ জীবনে রচিত নৃত্যনাট্যে বা গীতিনাট্যে এবং চিত্রকলায় পর্যন্ত। এর অপর একটি তুলনা পৃথিবীর আর কোনো গুণী সাহিত্য প্রতিভাবানে আপনি দেখাতে পারবেন না। এখানেই রবীন্দ্রনাথ অনন্য। গ্যয়টে, সেক্সপিয়ার, টলস্টয় সবারই মানস বিচরণ ক্ষেত্র সীমিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো এমন সর্বক্ষেত্রে অনায়াস আত্মবিস্তার এবং সমান পারদর্শিতা অলভ্য। এমন প্রতিভা য়ুরোপে জন্মায়নি। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে তাঁর versatility, তাঁর বহুমুখিতা, বিচিত্রগামিতা, সর্বশাখায় প্রায় সমান নৈপুণ্য ও দক্ষতা, যা আর কারো মধ্যে ছিল না। তাই তিনি অনন্য, অসামান্য, অতুল্য আশ্চর্য শক্তিধর ব্যক্তি।

আমাদের প্রয়োজনেই রবীন্দ্রনাথের যথার্থ মূল্যায়ন প্রয়োজন। তাঁর সুদীর্ঘ আশি বছরের জীবনে কোনও ত্রুটি নেই, এটা কোনও কথা হল! অথচ পাওয়া যায়। অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, শান্তিনিকেতনে একটা চাকরি পেয়ে তাঁর সরকারী চাকরি ছেড়ে দেবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইচ্ছে ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হলেন জমিদার, মর্জির ঠিক নেই, কখন আবার চাকরি নট করে দিলে তাঁর খাবার অভাব হবে। রবীন্দ্রনাথ ইনটলারেন্ট ছিলেন, যে-মাস্টার রবীন্দ্রনাথের কথার প্রতিবাদ করতেন, তাঁর চাকরি থাকতো না। তাঁর লেখার নিন্দাও সহ্য করতে পারতেন না, ছদ্ম নামে প্রতিবাদ লিখেছেন কখনো কখনো। রবীন্দ্রনাথ মদ খেতেন একথা কেউ বলেছেন? সুন্দর সুপুরুষ জমিদার সন্তান শক্তিমান কবি-লেখক কিশোর-যুবক-প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথের প্রেমে পড়বে নারীরা সান্নিধ্যে এলেই, তাতে দোষের কি আছে! তাছাড়া কবিরা আবেগপ্রবণ ও সম্ভোগ প্রিয় হনই। তাঁর শেষ প্রেম ষাটোত্তর বয়সে হয় ওকাম্পোর সঙ্গে। তিনি যেখানে গেছেন মেয়েদের প্রেমে পড়েছেন, টিজ্ করেছেন। জগদীশ ভট্টাচার্য ইনিয়ে বিনিয়ে বহু নারী সম্পর্কে বলবার চেষ্টা করেছেন, এমন ভাবে যেন গুরুদেবের নিন্দে না হয়। রবীন্দ্রনাথের আরো একটি লোভ ছিল পৌরহিত্যের লোভ। মুসলমানের এমামতির মতো খুতবা দেওয়া। শান্তিনিকেতন সিরিজ। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন, আর বক্তৃতা দেবার সময় মানব ধর্ম করেছেন। বরং প্রবোধ চন্দ্র সেন, অমিয় চক্রবর্তী এঁরা নাস্তিক ছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথের সেন্টিমেন্ট মেনে সবাই চলেছেন। জমিদারের আভারে চাকরি করতে হলে তা-ই বোধহয় করতে হয়। আমি বলতে চাই, মানুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, রাগ, ক্ষোভ থাকবে না? আর বয়ান চাই?

প্রশ্ন: এ বছর ১৯৯৬ কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের মৃত্যু শতবর্ষের বছর। সেই সূত্রে জানতে চাইছি ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর বিরোধের বিষয়ে–

আহমদ শরীফ: জমিদার হিসেবে ঠাকুর পরিবার ছিল অত্যাচারী। গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিল। বুট পরে প্রজাকে লাথি মেরেছেন, পায়ে দলেছেন দেবেন ঠাকুর। সহোদর ভাই নগেন্দ্রনাথ ছোট ভাইয়ের সন্তানকে দত্তক নিতে চাইলে সম্পত্তি তিন ভাগ হবে দেখে ভাইকে ভিটে ছাড়া করেছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম ধারণ করে ভাইদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। এটাই রেকর্ড করেছিলেন হরিনাথ মজুমদার। যিনি মহর্ষি বলে পরিচিত, তিনি এরকম ভাবে মানুষকে পদাঘাতে দলিত করেন! গ্রাম জ্বালাবার কথাও আছে। আবুল আহসান চৌধুরীর কাছে এর সমস্ত document আছে। সমগ্র ঠাকুর পরিবার কখনো প্রজার কোনও উপকার করেনি। স্কুল করা, দিঘি কাটানো এসব কখনো করেনি। নোবেল পুরস্কার পাবার পর রবীন্দ্রনাথ কিছু কাজ করেছিলেন। ব্যাঙ্ক, কৃষির উন্নতির জন্য শ্রীনিকেতন ইত্যাদি। রবীন্দ্রসাহিত্যের একটা বড় অংশ সৃষ্টি হয়েছে পদ্মা পারে। কিন্তু পদ্মার পার ভাঙার কারণে যে মানুষরা সর্বস্বান্ত হতো, তাদের কথা বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যের কোথাও নেই। জমিদার হয়ে প্রথম শিলাইদহে গিয়ে চার বছরের বকেয়া খাজনা তিনি উসুল করেছিলেন, খাজনা বাড়িয়ে ছিলেন। মুসলমান প্রজাদের ঢিঢ করার জন্য নমঃশূদ্র প্রজা এনে বসতি স্থাপনের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি-ও রবীন্দ্রনাথের মাথা থেকেই বের হয়েছিল। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার তাঁর 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় ঠাকুর পরিবারের প্রজা পীড়নের কথা লিখে, ঠাকুর পরিবারের বিরাগ ভাজন হয়েছিলেন।

প্রশ্ন: ভবিষ্যতে দু'বাংলা কি এক হবে?

আহমদ শরীফ: দু'বাংলা যদি কমিউনিস্ট হয় তবে হবে। আর হিন্দু যদি হিন্দু থাকে, মুসলমান যদি মুসলমান থাকে তবে মারামারি হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন: যদি এক হয়, তবে পশ্চিমবাংলা কি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হবে, নাকি বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে?

আহমদ শরীফ: দুটো কারণে ভারতের মধ্যে থেকেই এটা হতে পারে, যদি বাংলাদেশের অবস্থা আরো খারাপ হয় এবং ভারত যদি কনফেডারেশনে ফেডারেল স্টেট হয়।

প্রশ্ন: ভারত রাষ্ট্রের বর্তমান ভৌগোলিক কাঠামো কি পরিবর্তন হতে পারে?

আহমদ শরীফ: হ্যাঁ, সেই সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। তবে এখন বিচ্ছিন্ন হলেও ভবিষ্যতে আবার সব এক হবে, নিজেদের বাঁচার তাগিদেই। যে কারণে ইউরোপ সংহত হচ্ছে। ফরাসী জার্মানী ইত্যাদিরা আজ তাদের Pride and Prestige ত্যাগ করে, Tradition ত্যাগ করে, Independence ত্যাগ করে সবাই এক Administration-এ আসার জন্য ছটফট করছে বাঁচার গরজে। কাজেই সেই রকম গরজ আমাদের এখানেও হবে। তবে একথা ঠিক যে ভারত প্রথমে বিচ্ছিন্ন হবে। ভারত আসাম রাখতে পারবে না, seven sisters রাখতে পারবে না, কাশ্মীর রাখতে পারবে না। তবে পাঞ্জাব বিপদে পড়েছে। মুসলমানকেও সে বিশ্বাস করতে পারছে না, যারা তাদের encourage করছে। আবার হিন্দুদেরও বিশ্বাস করতে পারছে না, যারা তাদের accept করেও করছে না। সব সন্ত ধর্ম হিন্দু ধর্মে বিলুপ্ত হয়েছে। যেমন কবির, রামানন্দ, রামদাস প্রমুখের। এরকম অন্য সমস্ত সন্ত সম্প্রদায়গুলো হিন্দু হিসেবে নিজেদের মার্জ করেছে। কেবল শিখরা করেনি। কাজেই শিখরা তাদের Identity রাখতে চায়। মুসলমানের ওপর ভরসা ক'রে স্বাধীনতা নিলেও তারা (শিখরা) টিকতে পারবে না। মুসলমান আবার বিদ্রোহ করবে। আবার হিন্দুর মধ্যে থাকলে তারাও শোষণ করবে। সেই কারণেই শিখরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। কাজেই তারা স্বাধীন হবে কিনা বলতে পারি না। তবে কাশ্মীরকে রাখা যাবে না। আমার মতে লাদাকটা চায়নাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। কাশ্মীরে যা রক্তপাত ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, এটা অমানবিক। You can't ride a reluctant horse, why should you? কোন্ অধিকারে ভারত কাশ্মীর দখলে রাখবে? কাশ্মীর কখনো ভারতের অংশ ছিলো না। কাশ্মীর আলাদা রাষ্ট্রই ছিল। তাদের ভাষা আলাদা, ধর্ম আলাদা, অবস্থান আলাদা। এসব বুঝতে হবে, যেমন আসাম। মুঘলরা ব্রহ্মপুত্র পার হতে পারে নাই। ব্রিটিশরা গিয়ে দখল করেছে। কাজেই এখনই ভারতের উচিত– India should declare a fedaration। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা থাকলে ভারত তাই করবে, এবং এতেই ভারতের অস্তিত্ব রক্ষা পাবে। না হলে হিন্দি বিরোধী দাক্ষিণাত্যকেও ভারতের মধ্যে রাখা যাবে না। ইংল্যান্ড যেমন উত্তর আয়ারল্যান্ডকে দখলে রাখতে চায় গায়ের জোরে।

প্রশ্ন: কয়েক বছর আগে কোলকাতার একুশে উদ্‌যাপন কমিটির এক সভাতে আপনি বাংলা, অসমিয়া, ওড়িয়াকে অভিন্ন ভাষা বলে বর্ণনা করেছিলেন–

আহমদ শরীফ: হ্যাঁ, মধ্যযুগে ওড়িয়া, অসমীয়া এবং বাঙাল যদি এখানকার কোনও ভূমিপুত্রের একক শাসনে থাকতো, তবে বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া এ তিনটে ভাষার বদলে একটিই লেখ্য বা লিখিত ভাষা হত। এবং ভাষা সূত্রে সেই একক তাত্ত্বিক জাতি বিপুল শক্তিমান এক অভিন্ন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতো। সেই সুযোগটা আমরা এই তিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষার মানুষরাই হারিয়েছি। তবে এখনো ইচ্ছে করলে এই তিনটে ভাষাকে অভিন্ন করে তোলা যায়। অবশ্য কেউ রাজি হবে না।

প্রশ্ন: রবীন্দ্রনাথ বাংলা এবং অসমিয়া ভাষাকে অভিন্ন বলায় ঠাকুর পরিবারের জামাই লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া তার প্রতিবাদ করেছিলেন–

আহমদ শরীফ: হ্যাঁ, এর কারণ তিনি যখন শ্বশুর বাড়ি (ঠাকুর পরিবারে) যেতেন তখন তাঁর অসমীয়া উচ্চারণের জন্য তাঁর শ্যালকেরা তাঁকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতেন। এতেই তাঁর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, এবং অসমীয়া ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। অসমীয়া ভাষার উন্নতির এবং গড়ে-ওঠার পিছনে লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়ার বিশেষ অবদান আছে।

প্রশ্ন: যে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধ, মুজিব হত্যার পর মেজর জিয়াউর রহমানের শাসনের সময় তা পাল্টে করা হ'ল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। কোনটি আপনার কাছে যুক্তিগ্রাহ্য?

আহমদ শরীফ: বর্তমান রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের সূত্রে কেউ বাংলাদেশী বাঙালি, কেউ ভারতীয় বাঙালি হলেও, ভাষা-সংস্কৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান, মানসিক গঠন এবং রক্তে ও জাতিগত ভাবে বাঙালি এক ও অভিন্ন। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ হচ্ছে– এপারের বাঙালির রাষ্ট্রীয় পরিচয়কে বড় ক'রে তোলা। এবং সেই সূত্রে বাঙালির মধ্যে কৃত্রিম পার্থক্য সৃষ্টির ষড়যন্ত্র। বাংলাদেশের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হলেন এই ষড়যন্ত্রের নায়ক। পাকিস্তান আমলেও এসব হয়েছে। কখনো বাংলা বর্ণমালার পরিবর্তে আরবি-ফার্সি বর্ণ ও শব্দ চালু করা, বাংলা সংস্কৃতিকে ইসলামীকরণের জন্য রবীন্দ্রনাথকে বাতিল করা, নজরুলের গান কবিতা সংশোধন করা ইত্যাদি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই সব ষড়যন্ত্র সফল হয় নাই। তবে বাঙলাদেশে উপজাতি আদিবাসী জনজাতির স্বাতন্ত্র্যে গুরুত্ব দিয়ে রাষ্ট্রিক জাতিচেতনা বশে স্বীকার করা চলে।

সাক্ষাৎকার: কেশব মুখোপাধ্যায়

(সাক্ষাৎকারটি ঢাকায় ডঃ আহমদ শরীফ-এর বাড়িতে ৫ মার্চ '৯৬ তারিখে গ্রহণ করা হয়)

আমার সদ্যপ্রয়াত বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্রুত কৃতি-কীর্তি অধ্যাপকদ্বয় ডক্টর আবদুল্লাহ ফারুক [১৯২৬-৯৭]

ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার [১৯২৮-৯৭] স্মরণে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বদেশের স্বকালের সমাজের চালচিত্র

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

শাহেদা খাতুন টুকুন

স্নেহভাজনীয়াসু

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের বিগত পঞ্চান্ন বছরের রৈখিক চালচিত্র

উচ্চাশী ধূর্তলোকেরা জীবন-জীবিকাক্ষেত্রে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে প্রবলের পায়ে হাত এবং দুর্বলের মাথায় রাখে পা। আর স্থূলবুদ্ধি মাঝারি লোকদের মাথায় হাত বুলায় কিংবা পিঠ চাপড়ে বশে রাখে। তাতেই তারা আত্মরক্ষণে ও আত্মপ্রসারে থাকে নিরুপদ্রব, নির্বিঘ্ন নিরাপদ। তারাই বিত্তেবেসাতে এবং খ্যাতিতে ক্ষমতায় হয় স্ব স্ব জীবন-জীবিকা পরিসরে সফল, সার্থক ও ধন্য। ধূর্তলোকের বহুলতায় নষ্ট হয় সমাজ-স্বাস্থ্য, আর টিকে থাকে এদের স্বল্পতায়। আমাদের অজ্ঞ অনক্ষর দুস্থ দরিদ্রবহুল ভারতবর্ষে বিশেষ করে আমাদের দেখা-জানা-শোনা এবং অভিজ্ঞতার বাঙলায় আমরা ১৯২৯ সন অবধি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে আর্থিক দুর্গতির একটা কাল দেখেছি, কিন্তু ধূর্ততার, অসততার ও দুর্নীতির বাহুল্য দেখিনি, হয়তো সে-সময়কার জীবন-জীবিকাক্ষেত্রে আর্থ-বাণিজ্যিক দুস্থতার দরুন নিঃস্বতা, নিরন্নতা, দুস্থতা, দরিদ্রতা ও বেকারতা-থাকা সত্ত্বেও ভূতে-ভগবানে বিশ্বাসী অজ্ঞতা অসহায় লোকেরা অদৃশ্য শক্তিতে ও অদৃষ্টে বা নিয়তিতে আস্থাবান হলে মানুষের মনে একটা ভয়-ভক্তি-ভরসার পুঁজি-পাথেয় ছিল। তাই তাদের বিশ্বাস-সংস্কার ধারণা অনুগ একটা নৈতিকচেতনা এবং শাস্ত্রপ্রভাবিত একটা আদর্শিক দার্ঢ্য ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আঁচ উপমহাদেশের গায়েও লেগেছিল। বাঙলাদেশই প্রথম আক্রান্ত হয়। তাই ব্রিটিশ সরকার বাঙলাদেশে পোড়ামাটি নীতি চালু করে বাঙলায় দুর্ভিক্ষ ঘটায়, যার ফলে তফসিলী হিন্দু তথা বিভিন্ন পেশার নমশূদ্র ও দরিদ্র মুসলিম মরে খাদ্যাভাবে পথে-ঘাটে। এদের সংখ্যা অন্যূন পঁয়ত্রিশ লক্ষ।

প্রধোঁর (১৭৮০-১৮৬৫) 'প্রপার্টি ইজ রবারি' তত্ত্বের তথ্যের ও সত্যের বাস্তবায়ন দেখেছি আমরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে। কেউ পেটের দায়ে, কেউ মনের সুখে, কেউবা লাভে, লোভে, স্বার্থে ও হুজুগে জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে দুষ্ট-দুর্জন, দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতি হয়ে ওঠে। দুর্নীতিবাজে গাঁ-গঞ্জ, নগর-বন্দর, পাড়া-মহল্লা আকীর্ণ হয়ে ওঠে। তখন থেকেই মানবিক গুণের বিরলতা, দানবিক নিষ্ঠুরতার ও লুব্ধতার বিস্তার ঘটতে থাকে সমাজে। মজুদদারি, আড়তদারি, চোরাচালানি, ভেজাল, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, অকৃতজ্ঞতা, বিশ্বাস ভাঙা প্রভৃতির বহুলতা প্রত্যেক দ্বিতীয় ব্যক্তিকেই সন্দেহভাজন ও শত্রু ভাবতে বাধ্য করল গণমানবকে। পরিবার ও সামাজ হল আস্থাভাজন বন্ধুহীন। তবে এ সময়ে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষও যুদ্ধের নানা কাজে নিয়োগ পেয়ে দেশে-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোর, বিচরণ করার, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি দেখার সুযোগ পেয়ে বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ হল, চোখ খুলে গেল কারো কারো। মন প্রসারিত হল কিছু লোকের, বিত্তবান একটা শ্রেণী গড়ে উঠল, কিন্তু চিত্তবান হল না। এ সময়ে রাজনীতিক দ্বেষ-দ্বন্দ্বও

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেড়ে গেল ব্রিটিশ সরকারের সামগ্রিক বিপর্যয়ের ও শক্তিহীনতার ফলে আসন্ন স্বাধীনতা লাভের স্বপ্নে বিভোর ও আশ্বাসে আক্রান্ত ভারতবাসীর মধ্যে। সে-সময়ে আমরা সাম্প্রদায়িক দ্বেষণাজাত স্বধর্মীর সংহতি ও বিধর্মী দলনের উত্তেজনা দেখেছি, অজ্ঞ-অনক্ষর নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র গ্রামীণ মানুষবহুল সমাজ ও সম্প্রদায় তখন কেবল হুজুগে চলে ও চালিত হয়। বিবেক-বুদ্ধি, যুক্তি–প্রজ্ঞা বর্জিত সে-হুজুগ। তাই নির্বাচনে আমরা বিভিন্ন মতবাদী সম্প্রদায়কে একাট্টা হয়ে দলের বা নেতার নির্দেশে ভোট দিতে দেখেছি ১৯৪৬, ১৯৫৪-তে এবং ১৯৭০ সনেও। ব্যালট বাক্স বদলানো, শূন্যবাক্স পূর্ণ করা, পূর্ণবাক্স শূন্য করা, জাল ভোটদান, ভোটাররা ভোটদানে বিরত থাকলেও নির্বাচন সুসম্পন্ন বলে ঘোষণা করা ভোট গণনায় ও প্রকাশে কারচুপি করা, অনির্বাচিতকে নির্বাচিত আর নির্বাচিতকে অনির্বাচিত বলে চালিয়ে দেয়া প্রভৃতি শুরু হয় ১৯৭৩ থেকে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তিমুহূর্তে পাঞ্জাবে, তারপরে তা ছড়িয়ে পড়ে ভারতের সর্বত্র। ১৯৫০ সনের আগে পূর্ববঙ্গে বা পূর্ব পাকিস্তানের শহরে শুরু হয়নি হিন্দু হনন ও লুণ্ঠন। দাঙ্গা হচ্ছে দ্বিপাক্ষিক মারণ-হনন-লুণ্ঠন সম্পৃক্ত লড়াই। এখানে তা হয়নি, হিন্দুরা রুখে দাঁড়ায়নি। আর গাঁয়ে এ রাজনীতিক নেতৃত্ব ছিল না বলে কোনো গাঁয়েই ভারতে কিংবা পাকিস্তানে ১৯৪৮ সন থেকে ১৯৮৯ সনে বাবরী মসজিদ বিরোধ ও ভাঙন অবধি দাঙ্গা বা হনন-দহন-ধর্ষণ-লুণ্ঠন ও ভাঙন ঘটেনি। সেবার ঘটল রেডিও, টিভি, ডিস অ্যান্টেনা, শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি, রাজনীতিক চেতনা অনক্ষরদের মধ্যেও উন্মেষিত হওয়া প্রভৃতি অনেক কারণ-কার্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে। ভবিষ্যতেও তা কোনো স্থানে নিবদ্ধ থাকবে না।

AMARBOI.COM

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য, পূর্ববঙ্গ থেকে কোনো হিন্দু এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে কোনো মুসলমান উদ্বাস্তু বা বাস্তহারা হয়ে দেশ ছাড়েনি। বস্তুত নিজেদের সম্পদ-জান-মালের নিরাপত্তা সম্বন্ধে অনিশ্চিতির ও অসহায়তার কারণেই সংখ্যালঘুরা বস্তু ও জমি এবং অন্যান্য সম্পদ সস্তায় বিক্রি করে দেশত্যাগ করেছে। কেউ কেউ ঠকেছেও। কেননা ঠকানোর লোক কোথাও কম থাকে না। লাভে, লোভে, স্বার্থে লোকে ঠকায়। প্রথমে যায় শিক্ষিত চাকুরে ও জমিদার বর্ণহিন্দুরা, পরে তফসিলী ও অন্যান্য অশিক্ষিত ও ভূমিনির্ভর হিন্দুরা সন্তানদের শিক্ষিত করে কিংবা এখানকার জমি বিক্রি করে ওখানে জমি ক্রয় করে বা বদল করে যেতে শুরু করে, আজো তার অবসান ঘটেনি। ১৯৭১ সনে যারা যায় তাদেরও সাত লক্ষ নাকি পশ্চিমবঙ্গে থেকেই যায়। পশ্চিমবঙ্গের অন্ত্যজ শ্রেণীর বৌদ্ধ-হিন্দু থেকে দীক্ষিত মুসলিমদের অনক্ষর, মজুর, বর্গাচাষী কিংবা তুচ্ছ পেশাজীবী অথবা জমিনির্ভর চাষী অপরিচিতের অনাত্মীয়ের পূর্ববঙ্গে বাস্তু ত্যাগ করে আসেনি। সীমান্ত অঞ্চলে মুর্শিদাবাদে, যশোহরে, খুলনায় কিংবা রংপুরে, কুমিল্লায়, ফেনীতে কিছু লোক এসেছিল মাত্র। তাই পূর্ববঙ্গে মহাজের বাস্তুত্যাগী সমস্যা দেখা দেয়নি। এসেছিল বিহারীরা এবং ওরা ছিল নানা কাজের কুশল। তাই তারাও বোঝা হয়ে দাঁড়ায়নি, স্বনির্ভরই ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তা প্রথম ও প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ভয় দেখিয়ে, গোপনে হুমকি দিয়ে, প্রকাশ্যে দরদী-হিতকামী বন্ধু সেজে পুরো দামে সম্পত্তি ক্রয় করার আশ্বাস দিয়ে পরে অনেকেই ঠকিয়েছে চুক্তি ভঙ্গ করে, কথার খেলাপ করে। সেই ১৯৫০ সন থেকেই এ জোর-জুলুম, প্রতারণার-বঞ্চনার শুরু। তাতে যোগ দেয় সরকারও, পরিত্যক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পত্তি ও অবশেষে অর্পিত সম্পত্তি নাম বদল করে করে হিন্দুদের তাদের জ্ঞাতির সম্পত্তিতে ন্যায্য উত্তরাধিকার থেকে আজো বঞ্চিত রেখেছে, হয়রানি করছে হিন্দুদের। পরে এসব মুসলমানই এই কর্মে পাকা হয়ে, অভ্যস্ত হয়ে শহরে-বন্দরে, সৈয়দপুরে, সান্তাহারে, ময়মনসিংহে, ঢাকায়, চট্টগ্রামে বিহারীদের ও পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের কল-কারখানা, দোকান, বাড়িঘর সব বিনে পয়সায় দখল করে নেয় ওদের উচ্ছেদ করে। ওদের কেউ কেউ পালিয়ে যায়, অনেকে নিহত হয়, আর অধিকাংশ উদ্বাস্তু ও চাকরি-পেশাচ্যুত হয়ে জেনেভা ক্যাম্পে আশ্রিত থাকে। আন্তর্জাতিক ত্রাণ শিবিরে যারা আছে এখনো, তাদের অনেকের বাড়ি ছিল ঢাকার লালমাটিয়ায়, মোহাম্মদপুরে, মিরপুরে ও অন্যত্র।

শিক্ষাক্ষেত্রেও ঘটল হুজুগে পরিবর্তন। আইয়ুব খানের আমলে শিক্ষালয়ের উন্নয়নের ও বিকাশের জন্যে সরকার দালান নির্মাণের, শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সংখ্যার শিক্ষক নিয়োগের জন্যে স্কুল-কলেজে মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য দিতে থাকে, তবে শর্ত ছিল একটি বিদ্যার বিস্তারে শিক্ষকদের প্রলুব্ধ করার লক্ষ্যে, তা হল পরীক্ষার ফল ভালো আরো ভালো করতে হবে এবং এ শর্ত পূরণ হলেই আরো টাকা দেয়া হবে। তার পরে প্রলুব্ধ শিক্ষকরা পরীক্ষার্থীদের দিয়ে ঢালাওভাবে নকল করাতে লাগলেন, ক্রমে শিক্ষার্থীদের অভিভাবক, আত্মীয়-স্বজন সবাই মাইকযোগে প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে দিতে শুরু করল, পরীক্ষাগৃহের বাইরে থেকে লিখিত উত্তরপত্রও সরবরাহ করার রীতি চালু হল দেশব্যাপী। পরীক্ষা একটা লোকদেখানো প্রথায় কিংবা বার্ষিক ক্রীড়া উৎসবের রূপ নিল কার্যত। কয়েকবছর ধরে নকল নিয়ন্ত্রণের আন্তরিক চেষ্টা হচ্ছে, নকলবাজি কমেছে, কারণ ফলের উপর শিক্ষকের ও শিক্ষালয়ের তরক্কী নির্ভর করে না। এখন শিক্ষালয় রাজনীতিকের জনপ্রিয়তা লাভের, কাজ দেখিয়ে ভোট জোগাড়ের মুখ্য অবলম্বন হওয়ায় স্কুলে-কলেজে মাসে মাসে মোটা টাকার সরকারি সাহায্য মেলে এবং সর্বত্র বহু বহু সরকারি স্কুল কলেজ হয়েছে রাজনীতিক ফায়দা লাভের লক্ষ্যে। কারণ যদিও ১৯৫৭ সনের দিকেই ভোট জোগাড়ের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারি চাকুরে করে নেয়া হয়, প্রাথমিক স্কুলের দায়িত্ব কিন্তু সরকার গ্রহণ করেনি, ফলে স্কুলে বেড়া থাকে তো বেঞ্চ থাকে না, চেয়ার থাকে তো ব্লাকবোর্ড বা খড়ি থাকে না, শিক্ষার্থী আসে তো শিক্ষক আসেন না– এমন অবস্থা আজো বিলুপ্ত হয়নি সর্বত্র। তেমনি কলেজেও বিজ্ঞান-বাণিজ্যাদি নানা বিষয় শিক্ষাদানের জন্যে গবেষণাগার ও অন্যান্য উপকরণ, গ্রন্থাগার, আবশ্যিক সংখ্যার শিক্ষকও মেলে না এ মুহূর্তেও। এমনকি বিভিন্ন অঞ্চলের মেডিক্যাল কলেজ ও প্রকৌশল কলেজ সম্বন্ধেও এ মত ও মন্তব্য প্রযোজ্য।

বাঙলাদেশে সাধারণের সন্তানদের শিক্ষার শেকড় কেটে দেয়া হয়েছে দুইভাবে; এক. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের আটকানো হয় না, পরবর্তী শ্রেণীতে পড়তে দেয়া হয়। ফলে প্রবেশিকা শ্রেণীতে পড়লেও তার পড়া ও লেখা বিদ্যায় পরিণত হয় না। সে সাক্ষর হয়, কিন্তু বাঞ্ছিত মাত্রায় জ্ঞানী ও শিক্ষিত হয় না। শতে প্রায় পঞ্চাশজনকে– যারা পাস করে– বলতে গেলে নিজেদের দায়িত্ববোধ ও আগ্রহে স্বশিক্ষিতই হতে হয়। দুই. রাজনীতিক সংস্কৃতিসেবী নামের তথাকথিত দেশপ্রেমীরা ইংরেজির গুরুত্ব অস্বীকার করতে এবং কেবল মাতৃভাষায় গুরুত্ব দিয়ে বাঙালি হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসাহিত করতে থাকে এবং কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়েও বাঙলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ও গ্রহণের ব্যবস্থা করা হল। ফলে আধুনিক সর্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস ইউরোপীয় ভাষা ইংরেজির সঙ্গে আমাদের শিক্ষার্থীদের বিচ্ছেদ ঘটল। শিক্ষক-ছাত্র অবশেষে প্রশ্নোত্তরে শিক্ষাদান ও গ্রহণ করতে লাগল। অথচ ইংরেজি ভাষা ছিল আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের নাভিমূল স্বরূপ। এ বাঙলা মাধ্যমে শিক্ষায় উৎসাহিত হল গ্রামীণ গৃহস্থঘরের অসহায় শিক্ষার্থীরা এবং শিক্ষিত নিম্নবিত্ত ঘরের মন্দ-মাঝারি ও বখাটে সন্তানরা। অথচ ধনিক-বণিক-রাজনীতিকরা ও সংস্কৃতিসেবীরা নিজেদের সন্তানদের ঘরে-বাইরে-স্কুলে সতর্ক ও সযত্ন তত্ত্বাবধানে বহু অর্থব্যয়ে ইংরেজি শেখানো কখনো ছাড়েনি, কেবল বিবৃতিতে, ভাষণে ও লেখায় তারা অন্যদের বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করেছে নিজেদের বিদ্যায়, বিত্তে, বেসাতে ও নেতৃত্বে-কর্তৃত্বে সমাজে ও রাষ্ট্রে সপরিবার বিশিষ্ট রাখবার জন্যেই। একেই বলে শ্রেণীস্বার্থ ও কায়েমী স্বার্থচেতনা। একেই রাজনীতিক ও আর্থ-বাণিজ্যিক স্বার্থে গাঁয়ের অজ্ঞ-অনক্ষর দুস্থ-দরিদ্রজনদের দ্বীন-দুনিয়ার ফসল ও ফজিলিয়াত যুগপৎ ও একাধারে অর্জনের পন্থা বাতলানোর নামে তাদের সন্তানদের জন্যে [নারী-পুরুষ নির্বিশেষের জন্যে] মাদ্রাসা শিক্ষাদানের ও গ্রহণে সুপরিকল্পিতভাবে প্রচার-প্রচারণা, আর্থিক সহায়তা এবং মাদ্রাসা স্থাপনে উৎসাহ জুগিয়ে তাদের লেখাপড়া জানা খাঁটি মুসলমান রাখার প্রয়াস চালায় ওই রাজনীতিক-ধনিক-বণিক শ্রেণীর কায়েমি স্বার্থবাদীরা চিরকাল শাসন-শোষণ, দমন-দলন অপ্রতিরোধ্যভাবে চালু রাখার মতলবে। তার নগ্ন প্রমাণ নারীদেরও মাদ্রাসা মাধ্যমে এমএ, এমএসসি, এমকম ডিগ্রি লাভের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে, যাতে তারা স্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হয়ে আম-জনতার সন্তানদের কেবল মুমিন রাখার লক্ষ্যে শিক্ষাদান করে ও প্রভাবিত করে। তাহলে মুক্তবুদ্ধির যুক্তি-বুদ্ধি-প্রজ্ঞাসম্পন্ন মগজী মনন-মনীষার মানুষ হতে পারবেই না তাদের ছাত্র-ছাত্রীরা আবাল্যপ্রাপ্ত বিশ্বাস-সংস্কার ধারণার খাঁচায় বদ্ধ থাকবে বলে। এভাবে দুষ্টবুদ্ধি প্রয়োগে ত্রিধারার শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে তথাকথিত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে; একটি শাসন-প্রশাসন-অর্থ-বাণিজ্য নিয়ন্তাশ্রেণীর জন্যে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা, একটি বাঙলা মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা, তৃতীয়টি আরবি ও শাস্ত্রমুখ্য তথা অতীত ও ঐতিহ্যমুখী শিক্ষাব্যবস্থা। ছাত্ররা লেখাপড়া শেখে, নকলে পাস করে কিন্তু বিদ্বান হয় না, স্বশিক্ষিতরাই কেবল বিদ্বান হয়, তাদের সংখ্যা কম। ফলে বেকার হয় যোগ্যতার অভাবে। তারা নামে ছিনতাই ও চাঁদাবাজিতে।

শিক্ষাক্ষেত্রে এ বিচিত্র বিপর্যয়ের ফলে আমাদের সাহিত্যে-শিল্পে, বিজ্ঞানে-দর্শনে স্রষ্টার, বিদ্বানের ও গবেষকের সংখ্যা প্রত্যাশিত সংখ্যায় মেলে না। সংস্কৃতিক্ষেত্রে নির্ভেজাল সুরুচির ও সৌন্দর্যবোধের কিংবা বাঞ্ছিত নীতি-আদর্শ অনুগ কিছু আর কখনো মিলবে না। কেননা আজকের বিচিত্র যান-যন্ত্রবহুল জগতে যান-যন্ত্রনির্ভর বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-সম্বন্ধযুক্ত জীবনে সুষ্ঠু সংস্কৃতি বলে কিছু কল্পনা করাও যাবে না। শ্লীল-অশ্লীল, নৈতিক-অনৈতিক, আদর্শিক-প্রায়োজনিক বলে কিছু ভাবাও যাবে না। রেডিও, টিভি, ক্যাসেট, সিনেমা, ভিসিআর, ডিস অ্যান্টেনা, সেটেলাইট ও কম্প্যুটার মাধ্যমে আজ গোটা পৃথিবী একটা প্রায় অভিন্ন জনপদ বা শহর হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা যাবে না চিন্তায়-চেতনায়-রুচিতে-ফ্যাশনে প্রাত্যহিক জীবনাচারে ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচরণে।

১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধকাল থেকে বাঙালিরা মাছ-মোরগের মতোই নরহত্যা করতেও শিখেছে। এখন নরহত্যা আমাদের দেশেও সার্বক্ষণিক ও সার্বত্রিক ঘটনা। প্রথমে সুপরিকল্পিতভাবে রাজনীতিক গুণ্ডা তৈরি করেন ছাত্র দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোনেম খান, পরে নতুন করে ভালো ছাত্রদের গুণ্ডা বানান জিয়াউর রহমান।

১৯৪০ সন থেকে আমরা এ পঞ্চান্ন-ছাপান্ন বছর ধরে ভেজালে, চোরাচালানে, মজুতদারিতে, প্রতারণায়, বঞ্চনায়, নকলবাজিতায়, নীতি-আদর্শ-বর্জনে, হায়া-মায়া-শরম-সংকোচ পরিহারে, পরের ধন-সম্পদ আত্মসাতে, শ্রেণীস্বার্থে বিবেক-বুদ্ধি-যুক্তি-পাপবোধ বিসর্জনে, উচ্চাশী হয়ে হননে-দহনে-লুণ্ঠনে স্বপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়াসে, বেকার হয়ে ভদ্রঘরের শিক্ষিত সন্তান হয়েও ছিনতাই-রাহজানি-নরহত্যায় বেপরোয়া হওয়ার সাহসে, যৌনক্ষুধায় তাড়িত হয়ে ধর্ষণান্তে গাঁয়ের পরিচিত নারীহত্যায়, সত্য ও সততা-প্রীতিমুক্ত হয়ে, চালবাজি ও মিথ্যাচারকে পুঁজি-পাথেয় করে সংসার সমুদ্রে জীবনতরী ভাসিয়ে, অন্যায়ের ও অন্যায়কারীর প্রতি ঘৃণা পরিহার করে, ব্যক্তিগত জীবনেও আত্মসম্মান বোধের ও মানিবকগুণের অনুশীলনে অনীহ ঘৃণা-লজ্জা-ভয় ত্যাগ করে শক্তি, সাহস ও ধূর্ততা প্রয়োগে আমরা দৈনন্দিন জীবন-জীবিকাক্ষেত্রে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমাদের রাজনীতিও তাই ক্ষমতার গদি দখল লক্ষ্যে চালিত, লোকহিতৈষণাবর্জিত। আমাদের আজ কালোবাজার, কালোজগৎ, দুর্নীতির দুনিয়া– এখানে কোনো নীতি-নিয়মে চলে না জীবন। রীতি-রেওয়াজে আদর-কদর আছে, তাই 'ফেল কড়ি মাখ তেল' শ্রেণীর ঘুষ, পাওন, কমিশন, বখশিশ, উপহার, উপঢৌকন নামের লেন-দেনে কাজ করে দেয়ার ও কাজ আদায় করার নির্বিঘ্নতায় সেজন্যে সহজ ও সরল নির্ঝঞ্ঝাট পন্থা। আমাদের মধ্যে লাভনিরপেক্ষ মানবিকতা, মানবতা, মনুষ্যত্ব. কৃপা-করুণা, দয়া-দাক্ষিণ্য বিরল। আমরা জাঙ্গলিক ও গাড্ডলিক জীবনই যাপন করি।

অনক্ষর কিন্তু চৌকষ মাতব্বরের গোহারী

এক নিরক্ষর চৌকষ মাতব্বর ব্যক্তির পাল্লায় পড়েছিলাম সেদিন। আসলে সাক্ষরে-নিরক্ষরে, শিক্ষিতে-অশিক্ষিতে কাণ্ডজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য ঘটে না। জিজ্ঞাসার ও অন্বেষার স্তরভেদে, পরিসরভেদে এবং মগজী শক্তির মান মাপ মাত্রাভেদেই যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা আয়ত্তের অর্জনের, সঞ্চয়ের পরিমাণে পার্থক্য প্রভেদ ঘটে মাত্র। দারিদ্র্য ও অসহায়তা মানুষের দেহ-প্রাণ-মন-মগজ-মনন-মনীষা বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়। নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র মানুষের সুপ্তশক্তি অব্যবহারে লুপ্তই হয়ে যায়। আবার এ শ্রেণীর মানুষ কোনো আকস্মিক কারণে সুযোগ সুবিধা কিংবা অর্থ-বিত্ত-বেসাত পেয়ে গেলে তার বুদ্ধি বিজ্ঞতা দ্রুত বাড়তে থাকে, তখন তার মগজে সহজেই জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা ঠাঁই পায়। যৌক্তিক-বৌদ্ধিক-বিবেকী জীবন যাপনে, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে প্রেয়স ও শ্রেয়স চেতনাও পায় অভিব্যক্তি। আর্থিক জীবনে নিশ্চিত এবং ধন-প্রাণের নিরুপদ্রবতা ও নিরাপত্তা না থাকলে মানুষ তার দৈহিক-মানসিক শক্তি-সাহস প্রয়োগে ভরসা পায় না। জান-মাল হারাবার ভয়ে-আতঙ্কে থাকে বলে সে স্বাধীনভাবে দেহে-প্রাণে-মনে সুস্থ থেকে মুক্ত বুদ্ধি-মনন প্রয়োগের সামর্থ্য হারায়। দারিদ্র্যদোষ ও অসহায়তা মানুষের মানবিক গুণ নষ্ট করে– এ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য জানা আছে বলেই হয়তো আমরা সাধারণভাবে নিঃস্ব নিরন্ন অজ্ঞ অনক্ষর দুস্থ দরিদ্র মানুষকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে থাকি। কিন্তু ভেবে দেখি না যে, এক সময়ে ভাব-চিন্তা-ঘটনা-আদেশ-নির্দেশ-উপদেশ-জ্ঞান-অভিজ্ঞতা হরফের মাধ্যমে অনুপস্থিত মানুষের কাছে পরপ্রজন্মের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। শ্রুতি-স্মৃতিযোগেই গোষ্ঠীগত বা গোত্রগতভাবে প্রজন্মক্রমে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিজ্ঞতা-অভিজ্ঞতা ধরে রেখে, মুখে মুখে উচ্চারণ করে কান থেকে কানান্তরে পৌঁছে দিত। তখনো লৌকিক-অলৌকিক-অলীক আসমানী বিভিন্ন ও বিচিত্র শক্তিধর অদৃশ্য-অরি মিত্র-শরীরী বা শারীর নিয়ন্তা মানুষের জীবন-জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করত। এভাবেই অন্যপ্রাণীর মতো প্রকৃতিলালিত না হয়ে মানুষ স্বনির্ভর কৃত্রিম জীবন যাপন পদ্ধতি আবিষ্কার করে চলেছে, আজো যার ধারা চলছে বরং বিজ্ঞানের প্রসাদে দ্রুততর ও বিচিত্র হয়েছে আবিষ্কার ও উদ্ভাবন। মানুষ রোদ-বৃষ্টি-শৈত্যের, ঝড়-বন্যা-খরা-মারীর অসহায় শিকার নয় আজ। নানা মগজীবুদ্ধি ও কৌশল-প্রযুক্তি প্রয়োগে সে একে আয়ত্তে বা নিয়ন্ত্রণে এনেছে অনেকাংশে।

ধনী হলে যে-কোনো মানুষ আত্মপ্রত্যয়, শক্তিমান ও সাহসী হয়, তখন তার মধ্যে আত্মপ্রত্যয়জাত জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগের শক্তি-সাহস জন্মে। তার হীনম্মন্যতা ঘুচে যায়। এমনি নতুন ধনী লোককে আমরা পূর্বের ইউনিয়ন বোর্ডের নিরক্ষর সদস্য হিসেবে বা কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন যুক্তিনিষ্ঠ, বিবেকানুগত সুজন সজ্জনরূপে দেখেছি। একালেও ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যরূপে কিংবা গ্রামীণ সমাজে সর্দার ও সালিশদাররূপে আজো দেখতে পাই। আমি যে-জাঁদরেল গৃহস্থ মাতব্বরের অনর্গল বাকপটুতায় মুগ্ধ ও জব্দ হয়েছিলাম তার কথারম্ভই হয়েছিল এভাবে : আপনারা শহুরে শিক্ষিত ধনী মানীরা দেশ বলতে, রাষ্ট্র বলতে, মানুষ বলতে, নাগরিক বলতে কেবল আপনাদের শ্রেণীর লোকদেরই জানেন ও বোঝেন এবং আপনারা আত্মস্বার্থেই পরপ্রবঞ্চনার জন্যেই কালিক প্রয়োজনে ভোট জোগাড়ের লক্ষ্যে জনগণের কথা অন্তরে ঠাঁই না দিয়েও মুখে উচ্চারণ করেন ঘন ঘন। আপনারা কেবল নিজেদের বিদ্যা বিত্ত-বেসাত আর্থ-সম্পদ মান-যশ, খ্যাতি-ক্ষমতা দর্প-দাপট, প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের চিন্তায়-চেতনায় প্রয়াসে আপনাদের জাগ্রত মুহূর্তগুলো ব্যয় করেন, আমাদের কোটি কোটি জনগণের কথা ভাবেন না। এ সব আমরা আগে জানতে, শুনতে বা বুঝতে পারতাম না। এখন সিনেমা, ক্যাসেট, ভিসিআর, ডিসএ্যান্টেনার মাধ্যমে এবং রেডিও-টিভিযোগে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক হালচাল সম্বন্ধে আমরাও ওয়াকেবহাল হচ্ছি। এমনকি হাটে-বাজারে দোকানে বসেই অন্যদের পড়া-পত্রিকার সংবাদও রোজ আমরা পেয়ে থাকি। কাজেই আমাদের অজ্ঞ-নির্বোধ বলে ঘৃণা-অবজ্ঞা করার দিন অপগত। এখানেই শেষ নয়, আমরা এখন সিনেমা-ক্যাসেট মাধ্যমে অতীত পৃথিবীর রাজা-রাজড়ার পীর-ফকির-গুরু পুরোতের, সন্ত-সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-শ্রমণ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিক্ষুক-মুনি-ঋষির, নবী অবতারের অনেক বৃত্তান্ত বই না পড়েও জানতে পাই। আমাদের আজকাল আর ফাঁকির ফাঁদে আটকে রাখবেন কি করে? আমরা শুনেছি, আগের কালে হরফ ছিল না, একালের মতো শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না। কাজেই লিখিত পুঁথিপত্রে তখন জ্ঞান-ভাব-চিন্তা-ঘটনা হরফবদ্ধ করা ছিল না। নিরক্ষর লোকেরাই ছিলেন মুনিঋষি, নবী, অবতার, সন্ত-শ্রমণ-জ্ঞান-প্রজ্ঞাবান মানুষ। তাঁরাই দুনিয়ার মানুষকে সৃষ্টির কথা, স্রষ্টার কথা, শাস্ত্রকথা, নীতিকথা, হিতকথা শিখিয়েছেন নিজেদের মগজী চেতনা-চিন্তা-মনন-মনীষার অনুশীলন করে করেই। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন-জীবিকার নিরুপদ্রতা, নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনে সম ও সহ স্বার্থে সংযমে পরমত-পরকর্ম-আচরণ-সহিষ্ণুতায় প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও শ্রম বিনিময়ে প্রকৃতির বা প্রাণীর হামলা থেকে পারস্পরিক সাহযোগিতায় যূথবদ্ধ বা দলবদ্ধ তথা সমাজবদ্ধ হয়ে সহাবস্থান করার তত্ত্বে দীক্ষিত হয়ে, তথ্যে ও সত্যে আস্থা রেখে সহযোগিতার ও সহাবস্থানের দায়বদ্ধতা অঙ্গীকার করেই মানুষ সংস্কৃতি ও সভ্যতায় আজকের প্রাগ্রসর অবস্থায় আত্মোন্নয়ন ঘটিয়েছে। আগের কালে যাঁরা মানুষকে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-প্রেয়স ও শ্রেয়স বুদ্ধি দিয়েছে, যাঁরা শাস্ত্র দিয়েছেন, সমাজ-সম্প্রদায় গড়েছেন, যাঁরা রাজ্য-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, তারা কেউ একালে আপনাদের মতো স্বাক্ষর-বিদ্বান ছিলেন না। মুনি-ঋষি-নবী-অবতারের মধ্যে কৃচিৎ কেউ স্বাক্ষর ছিলেন, এটিলা-চেঙ্গিস-হালাকু-কুবলাই থেকে আকবর বাদশাহ অবদি অনেক জানা-অজানা রাজা-বাদশাহ্-ই ছিলেন নিরক্ষর, এ যুগের ভাষায় অশিক্ষিত-অনক্ষর। কাজেই আমাদের 'আনপড়া' বলে নির্বোধ মনে করে ঘৃণা-অবজ্ঞা-অবহেলা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সুযোগ পেলে ও দিলে আমরাও পর্ষদ, পরিষদ, সংসদ, সংস্থা, সমিতি, প্রতিষ্ঠান যোগ্যতার ও দক্ষতার সঙ্গে চালাতে পারি, সে সাক্ষ্য-প্রমাণও দুর্লভ নয় আজো। তবু আমাদের অজ্ঞ-অবুঝ-আমজনতা হিসেবে আপনারা অবজ্ঞা করেন, কিছুতেই আমাদের মন-মত-মন্তব্যে গুরুত্ব দেন না, দলিত-পীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত-প্রতারিত করেন আমাদের, উপেক্ষা করেন আমাদের স্বার্থ, আমাদের দেহ-প্রাণ-মনের কোনো মূল্য-মর্যাদা-গুরুত্ব স্বীকৃত হয় না। আমরা আর গৃহপোষ্য গরু-ছাগল-মেষ হাঁস-মোরগ আপনাদের স্বার্থসচেতন মনে-মর্মে অভিন্ন।

তাই আপনারা আমাদের খাদ্যবস্তুতে প্রাণবিনাশী ভেজাল মেশান। সয়াবিনে-পাম অয়েল মিশিয়ে আমাদের আয়ু কমাতে রোগাক্রান্ত করতে আপনাদের বিবেক বাধে না, চোরাচালানে, মৌজুতে, কৃত্রিমভাবে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে আপনাদের বাধে না। অর্থাভাবে এবং পদ-পদবীর আত্মীয়ের দুর্লভতায় আমরা কোথাও আমাদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা করতে পারি না, পাইনে অন্যায়ের-অবিচারের প্রতিকার। আপনাদের সন্তানের জন্যে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল-কলেজ হয়, সামরিক চেতনা-চিন্তা-শৃঙ্খলা শিক্ষাদানের জন্যে ক্যাডেট স্কুল-কলেজ থাকে, আর যত্রতত্র মেডিক্যাল কলেজ, প্রকৌশল কলেজ, স্কুল প্রভৃতি সরকারি পয়সায় তৈরি হয়। আমাদের সন্তানদের জন্যে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা আবশ্যিক ও সুলভ করার কথা প্রচার করেন বটে, এসব গণহিতকর কাজের জন্যে মোটা অঙ্কের বৈদেশিক অর্থ সাহায্য আপনার আদায় করেন বটে, কিন্তু কিছুতেই আমাদের সপরিবার অন্নে, বস্ত্রে, আবাসে, স্বাস্থ্যে, শিক্ষায়, চিকিৎসায় কোনো দৃশ্য উন্নতি ঘটে না। বরং আমাদের দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে চেতনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও জানা-শোনা-বোঝার পরিধি-পরিসর বেড়েছে বলে আমরা ন্যায্য অধিকাররিক্ত ও বঞ্চিত গণমানব দেহে-প্রাণে-মনে অর্থে-বিত্তে আরো বেশি করে হীনতায় ও হীনম্মন্যতায় ভুগি। নিয়তিতে আগের মতো দৃঢ় আস্থা নেই বলে আমাদের মনে প্রবোধ এবং চিত্তে প্রশান্তিও মেলে না পার্থিব জীবনে দারিদ্র্য গৌরবে। তাই আমরা ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হই মাঝে মধ্যে, দ্রোহও করি কোনো কোনো ব্যক্তির চরিত্র ও নেতৃত্বে আস্থা রেখে। তারাও আমাদের উত্তেজিত করে উদ্দীপিত করে এগিয়ে দিয়ে, লেলিয়ে দিয়ে নিজেদের গা-পা বাঁচিয়ে সরে পড়ে। ব্যর্থ ও বৃথা প্রয়াসে ও দ্রোহে আমরা হারাই জান-মাল। যা চাই তাতো পাই না, যা আছে তাও হারাই। আমরা দুর্বল অজ্ঞ অসহায়রা চিরকালই আপনাদের শাসন ও শোষণ পাত্র। আমাদের শ্রম-সময়, মগজীবুদ্ধি, কর্মকুশলতা দিয়ে প্রজন্মক্রমে আপনাদের ভোগের উপভোগের সম্ভোগের সামগ্রী ও পরিবেশ সৃষ্টির ও রক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্যেই যেন আমাদের মর্ত্য জীবনপ্রাপ্তি। আপনারা সেব্য, আমরা সেবক, আপনারা মখদুম, আমরা খাদেম, আপনারা ভোক্তা, আমরা ভোজ্যের জোগানদার, আপনাদের সুখের আনন্দের, আরামের বিনোদনের জন্যে দালান, উদ্যান, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, মাঠ-ঘাট-স্নানাগার, জলসাঘর, নৃত্য-গীত-নাট্য রঙ্গমঞ্চ, মিলনায়তন, ক্লাব, ক্রীড়াঙ্গন, জাদুঘর প্রভৃতি তৈরির জন্যে সামান্য অর্থের বিনিময়ে আমরা কায়িক শ্রম, মানসিক বুদ্ধি, প্রশিক্ষণলব্ধ কুশলতা প্রভৃতি জীবনব্যাপী উৎসর্গ করি। আপনারা গাড়ি চড়েন, আমরা গাড়ি টানি, নৌকা-জাহাজ মোটরকার চালাই। আমরাই স্রষ্টার সৃষ্ট দুর্গম সমুদ্র-পর্বত-অরণ্যকে সুগম করে আপনাদের ভোগ-উপভোগের আয়ত্তে এনে দিয়েছি। অথচ স্রষ্টা তরু-লতায়-অরণ্যে সৃষ্টি করেছেন, আমরা শ্রম, সময় ও মগজী বুদ্ধি প্রয়োগে তা উদ্যানে ও শহরে সৌন্দর্যে সাজিয়েছি। দুনিয়ার সর্বত্র চিরকালই ভাস্কর্যে-স্থাপত্যে-সৌন্দর্যে আমাদের শ্রমের, সময়ের মানস-প্রযত্নের সাক্ষ্য-প্রমাণ বহন করছে। কিন্তু আমাদের কিছুই ভোগ্য থাকেনি। এক্ষেত্রে গাড়ি টানা গরু-ঘোড়া- মোষ-কুকুর ও আমরা শ্রমিক-মজুর-কর্মী-ভৃত্য-দাসেরা অভিন্ন। ভোগেই আমাদের অধিকার নেই, আমাদের গড়া দালানে-উদ্যানে-ক্লাবে-মিলনায়তনে-সুইমিংপুলে আমাদের প্রবেশাধিকার থাকে না। আমাদের তৈরি করা চেয়ারে-সোফায়-খাটে-পালঙ্কে বসার-শোয়ার এমন কি ছোঁয়ার অধিকারও থাকে না আমাদের মেরামতের প্রয়োজনে ছাড়া।

এমনি সর্বপ্রকারের বঞ্চনার মধ্যেও আমরা আপনাদের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত সেবক খাদেম ভৃত্য দাস রূপে আজ্ঞাবহ রয়েছি।

আমাদের জীবন কেবল আপনাদের ভোগের-উপভোগের-সম্ভোগের সামগ্রী তৈরি করার, জোগান দানের জন্যেই– স্রষ্টারও এ-ই ছিল হয়তো উদ্দেশ্য। কারণ আপনারাই বলে থাকেন– পৃথিবীর যাবতীয় জীব-উদ্ভিদ পিঁপড়ে থেকে হাতি-তিমি অবধি জলচর, স্থলচর ও খেচর সবকিছুই মানুষের প্রয়োজনেই, মানুষের জন্যে সৃষ্ট। আমরা তো তা-ই। আপনারা রাজত্ব করবেন, রাষ্ট্র-রাজ্য গড়বেন, রাজা-উজির-আমলা-সওদাগার-মালদার-অর্থবিত্ত-বেসাতবান হবেন। যুদ্ধে-লড়াইয়ে-দাঙ্গায়-পর্বতে-অরণ্যে-সমুদ্রে-খনিতে আমরাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জীবনপণ করে আপনাদের কাজ করে দেব। আপনাদের আদেশে-নির্দেশে প্রয়োজনে, আমরা মরব, মরে আপনাদের বাঁচাব, জয়ী করব, গৌরব-গর্বের মালিক করব, সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক-বাহক-প্রচারক হবার অহঙ্কার করার অধিকারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করব। আমাদের মরণে, আমাদের আত্মত্যাগে, আপনাদের জীবন ও গৌরব-গর্ব সুখ-শান্তি-আনন্দ-আরাম-আয়েশ-অর্থবিত্ত-বেসাত প্রাপ্তি। তবু আপনাদের বিবেক-বিবেচনা শক্তির, আপনাদের নীতি-আদর্শ চেতনার তারিফ না করে পারি না,পারি না আপনাদের বুদ্ধির ও ধূর্ততার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করে। কেননা আপনারা আজো এ মুহূর্তেও আমাদের সার্থক ও সফলভাবে মিষ্টকথায় আশা ও আশ্বাস দিয়ে আমাদের মনে বল-ভরসা-আস্থা ও আনুগত্য জিইয়ে রেখে আমাদের গৃহপোষ্য প্রাণীর মতো অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত গতর খাটিয়ে দাস করে রাখতে পেরেছেন। পেরেছেন হাজার হাজার অতীত ও ঐতিহ্য অনুগ বৈষম্যের, সেবক-সেব্যের, ভোক্তা-ভোজ্যের জোগানদার সমাজ টিকিয়ে ও অটল করতে। আপনারা রাজনীতি করেন আমাদের নিয়ে, দাঙ্গা বাধান আমাদের দিয়ে, দেশ-জাতি-রাষ্ট্র চালান শাসনে-শোষণে-লুণ্ঠনে আমাদের নামেই। আমরা কাজে আছি, নামে আছি, ভোগে নেই।

এমন কি আপনারা আপনাদের শাস্ত্রসম্মত পারত্রিক সুখ-শান্তি-আনন্দ আরাম প্রাপ্তি লক্ষ্যে আমাদেরই ব্যবহার করেন। আমাদের নিঃস্বতা, নিরন্নতা, দুস্থতা, দারিদ্র্য আপনাদের পাপ বিমোচনের কাজেও লাগান দরিদ্রকে নারায়ণের প্রতীম, প্রতিক ও প্রতিভূ বলে স্তোকবাক্য প্রয়োগে। কাঙাল-মিসকিন-গরিব-দুঃখী, অনাথ, এতিম, অসহায় রুগ্ন শিশু, নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা প্রভৃতিকে তখন পারত্রিক বৈতরণী বা পুলসিরাত পার হওয়ার অবলম্বন করেন, পরলোকের সম্বল বা পুঁজি-পাথেয় সংগ্রহ করেন, খুদ-কুঁড়ো, পয়সা-কড়ি, ডাল-চাল দান করে, তখন আপনারা মৃত ব্যক্তির কল্যাণে কাঙাল-বামুনের, মিসকিন-মোল্লার ভোজনের ব্যবস্থা করেন, অসুখে-বিসুখে, বিপদে-আপদেও কৃপা-করুণা দয়া দাক্ষিণ্য যোগে দান-খয়রাত করে, অন্ন-বস্ত্র-দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে প্রিয়জনকে স্বর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ফিতরা-জাকাত দেয়ার জন্যে, দানের পুণ্য অর্জনের জন্যে তখনি আপনাদের দরকার হয় সমাজে কিছু নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র লোক রাখার ও পাওয়ার। আপনাদের ঐহিক-পারত্রিক জীবনও আমাদের ছাড়া চলে না। আপনারা আমাদের এমনি ধরনের আদর-কদরের পাত্রপাত্রী। আমাদের যে সাধ-আহ্লাদ আছে, তা আপনাদের স্বীকৃতি পায় না। আপনারা আমাদের আপনাদের ঐহিক-পারত্রিক কল্যাণে ও প্রয়োজনে ব্যবহারেই অভ্যস্ত, এ যেন আপনাদের কায়েমি অধিকার। ভাষাটা আমার কিন্তু পুরো বক্তব্যই মাতব্বরের।

গৃধাচারের কারণ সন্ধানে

দেশজ মুসলিমের উদ্ভব ঘটে তেরো শতকের উষাকাল থেকে দরবেশ নামের প্রচারকদের প্রচেষ্টায়। এবং বর্ণহিন্দুরা নিজেদের কায়েমি সুযোগ-সুবিধে-সম্পদ-মর্যাদা ও প্রয়াসবিহীন প্রাপ্তি আর ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিনিয়ত আনুগত্য চিরন্তন রাখার লক্ষ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলামী সাম্যে কোথাও আকৃষ্ট হয়নি। উচ্চবর্ণের লোক দায়ে না ঠেকলে কোথাও কখনো ইসলাম বরণ করেনি সপরিবার। ফলে প্রায় আটশ বছর ধরে গড়ে-ওঠা বাঙালি মুসলিম সমাজ ছিল সর্বত্র সামগ্রিক, সামষ্টিক ও সামূহিকভাবে নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ, দরিদ্র নিম্নবর্ণের, নিম্নবিত্তের, নিম্নবৃত্তির ও তুচ্ছ ঘরানা পেশাজীবী শ্রেণী ও সম্প্রদায় থেকে। যেহেতু অস্পৃশ্য-স্পৃশ্যদের কেউ বুনো বা যাযাবর নয়, সেহেতু তাদের নির্বিশেষে গৃহস্থ বলে অভিহিত করা চলে। এবং তাদের জীবনযাত্রাকে স্থূল অর্থে খেয়ে না-খেয়ে কোনো প্রকারে **'কষ্টক্লিষ্ট'** প্রাণে প্রজন্মক্রমে বেঁচে থাকা বলে বয়ান বা চিহ্নিত করা চলে। আর তাদের সংস্কৃতিও তাই ছিল লোকসংস্কৃতি যা বিজ্ঞানের যান্ত্রিক প্রসাদে যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জীবনে এখন দ্রুত বিলুপ্তির পথে। তাদের ফোকলোর লোকসাহিত্য-শিল্প প্রভৃতিও তাই আজ আর প্রাকৃত ও স্বভাবজ থাকেনি। কৃত্রিম অনুশীলনে ও সৃষ্টিতে বিকৃতি পাচ্ছে। যদিও দেশজ মুসলিমদের জাত-জন্ম-বর্ণ পেশা-বিত্ত-বেসাত সম্বন্ধে আজকাল আর কেউ দ্বিমত পোষণ করে না। তবু ইসলামে দীক্ষিত নির্জিত শ্রেণীর হিন্দু-বৌদ্ধের বংশধরদের কেউ কেউ ইসলামী সাম্যের ও শিক্ষার প্রভাবে বাঙলা-ফরাসী-আরবী শিখে ঘরোয়া পেশান্তরে স্বপ্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছে গোড়া থেকেই। তাদের মধ্যে মুনশি-মোল্লা-কাজী-হেকিম-উকিল-দারোগা-দোকানদারও স্বল্পসংখ্যায় হলেও দেশের সর্বত্র সুলভ হয়ে ওঠে। কিন্তু সমাজ হিসেবে তারা অজ্ঞ-অনক্ষর নিঃস্ব-নিরন্ন-দুস্থ-দরিদ্র-বিত্ত-বেসাতরিক্ত থেকেই যায়। এ বিষয়ে রিজলি, বিভারলি, রমাপ্রসাদ চন্দ, গ্যাইট, রবার্ট ওর্মে, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, হান্টার, ওয়াইজ পার্সিজ্যাল স্পিয়ার প্রমুখ সবাই স্বীকার করেন যে, দীক্ষিত মুসলিমরা শোষিত-পীড়িত-অবজ্ঞাত-বঞ্চিত হিন্দু-বৌদ্ধ বংশজ। কিন্তু ধর্মান্তরে সাধারণভাবে আমজনতার ঘরানা পেশান্তর ঘটেনি বলে তাদের অর্থ-সম্পদ অর্জনে কোনো উন্নতি হয়নি। কাজেই তাদের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রত্যাশিতমাত্রায় উন্মেষ বিকাশ পায়নি। বিদেশী-বিভাষী-স্বধর্মী শাসক-প্রশাসকের কোনো আনুকূল্য পায়নি এসব আতরাফ-আজলাফ মুসলিমরা। প্রমাণ রাজশাহী-মালদহ-রাজমহল-মুর্শিদাবাদের অনক্ষর দুস্থপেশাজীবী মুসলিমরা নামে-কামে-সংস্কৃতিতে আজো অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এতেই বোঝা যায় এরা তুর্কি-মুঘল শাসক-প্রশাসকদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্পর্শ কখনো পায়নি। দেশী বর্ণহিন্দুরাই ছিল গাঁয়ে-গঞ্জে-দফতরে তাদের শাসক সর্দার ও দিশারী। তাদের এ অবস্থা ও অবস্থান ব্রিটিশ আমলের শেষ দিন পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল। বরং ইংরেজ কোম্পানির বৈশ্বিক বাণিজ্য ও কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বান্দোবস্ত ঘরানাপেশাজীবী হিন্দ-মুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে আকস্মিকভাবে গ্রামীণ পণ্য বিনিময় নির্ভর আর্থনীতিক নিস্তরঙ্গ জীবনে ঝড় তুলে তাদের আর্থিক জীবনে প্রায় দু'শ বছর (আঠার-উনিশ শতকে) ধরে বিপর্যস্ত করে রেখেছিল।

আবার আগের কথায় ফিরে আসি। এসব নির্জিত বঞ্চিত শোষিত চির নিঃস্বগোষ্ঠীর লোক আরণ্যকও নয়, যাযাবর নয়, ছিল লোকালয়বাসী সভ্য-ভব্য বিদ্যা-বিত্ত-বেসাতধারী সংস্কৃতিমান সমাজের আন্তেবাসী কিন্তু প্রতিবেশী ও সেবক-মজুর, তাদের জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ও শ্রমের জোগানদার। তারা নিজেরা ভালো খাদ্য, ভালো পোশাক, ভালো ঘর পায়নি প্রজন্মক্রমে প্রায় দু'হাজার বছর ধরে। কিন্তু তারা দূরে থেকে, কাছে থেকে, পাশে থেকে এবং শ্রমের ও সামগ্রীর জোগানদার হিসেবে দেখেছে, শুনেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেনেছে ভালো থাকা, সুখে থাকা, আনন্দে-আরামে থাকা, বিলাসে-বিনোদনে থাকা কাকে বলে এবং তার রূপ-স্বরূপ কি? এবং এও জেনেছে যে অর্থ-সম্পদ অর্জন আয়ত্ত করা সম্ভব হলে তুর্কি-মুঘল-ব্রিটিশ আমলে যে-কেউ যে-কোনো ভাবে জীবন ইচ্ছেমতো ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ করতে পারে অবাধে– কারণ রাজশক্তির আশ্রয়-প্রশ্রয়রিক্ত ব্রাহ্মণ্যদাপট মানুষের স্বপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে তখন বাধ্য হয়ে ছিল না। আগেও এ বাঙলাদেশেই কিছুদিনের জন্যে দ্রোহীকৈবর্ত দিব্যক-রুদ্রক-ভীম সগোষ্ঠী আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ-সুবিধে পেয়েছিল। কিন্তু তা ছিল ক্ষণপ্রভা মাত্র। তেরোশতক থেকে তুর্কি-মুঘল-ব্রিটিশ আমলে ওই অস্পৃশ্য শূন্য অবজ্ঞাত নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র ক্ষুদ্র ঘরানাপেশাজীবীদের উচ্চাশী সন্তানরা বিত্তে বেসাতে সম্পদশালী হয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্য ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ করার স্বপ্ন দেখতে থাকে, সাধ পুষতে থাকে অন্তরে। এভাবেই তাদের কেউ কেউ স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে তুর্কি-মুঘল আমলে ধর্মান্তরিত হয়ে কিংবা কৃচিৎ কোনো ক্ষেত্রে না হয়েও। ব্রিটিশ আমলে আমরা কোলকাতা শহরে রানী রাসমনিকে ব্রাহ্মণ্য সমাজেই সদাপট স্বপ্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছি।

নিম্নবর্ণের, নিম্নবিত্তের, নিম্নবর্গের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘরানাপেশাজীবী হিন্দু-মুসলিমকে বিগত আটশ' বছর ধরে অর্থ-সম্পদজাত সুখের স্বপ্ন স্বাধ হৃদয়ে-মগজে পুষে রাখতে দেখেছি। তারা স্বপ্রতিষ্ঠায় প্রয়াসীও হয়েছিল, কেউ কেউ তালুকদার, তরফদার, শিকদার, হাওলাদার, জোতদার রূপে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্যেরও ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগের বিলাস-বিনোদনের সুযোগ-সুবিধেও পেয়েছিল বটে, কিন্তু এ শ্রেণীর বাঙালি সমাজের শীর্ষে উঠে সমাজ-সরকার-রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের, ব্যবসা-বাণিজ্য আয়ত্ত করার অবাধ নির্দ্বন্দ্ব অধিকার পেল ১৯৭২ সন থেকে, যখন বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষী-প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বী শাসক শোষক বঞ্চক নিঃশেষে দেশ থেকে বাস্তুত বিতাড়িত হল।

আর সেদিন থেকেই স্বাভাবিক ও সঙ্গত কারণেই নিজেরাই অর্থ-সম্পদ-বিত্ত-বেসাত আর মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্প-দাপট-প্রভাবপ্রতিপত্তি অর্জন ও আয়ত্ত করার প্রতিযোগিতায়-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামল পরস্পরের বিরুদ্ধে। শুরু হল কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি। বিগত দু'হাজার বছর ধরে তারা সভ্য জগতে ধনী-মানীর প্রতিবেশী সেবক-মজুররূপে, শ্রমের সেবার ও সামগ্রীর জোগানদার রূপে আহ্লাদ পূরণের ক্ষেত্রে বঞ্চিতের-কাঙালের জীবন যাপন করেছে প্রজন্মক্রমে। কাজেই ভালো খাদ্য, ভালো পোশাক, ভালো ঘর, বিলাস-বিনোদন, মান-যশ-ক্ষমতা তাদের অধৈর্য অস্থৈর্য কামনা-বাসনার বিষয় হয়েছে। ফলে সব শ্রেণীর মানুষই সংযম, সহিষ্ণুতা আত্মসম্মানরিক্ত হয়ে মরণে হননে দহনে ধর্ষণে লুণ্ঠনে ভাঙনে শকুনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে অর্থ সম্পদ সম্মান আহরণের লুটের বাজারে গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে-পাড়ায়-মহল্লায়। তাই আজ আমাদের জীবন মতলাববাজ কবলিত।

প্রত্যেক দ্বিতীয় ব্যক্তি আজ শত্রুকল্প-কপট-প্রতারক কিংবা মস্তান-গুণ্ডা-খুনি-লম্পট। কাড়া-মারা-হানাই নীতি ও রীতি। তাই আমরা বিপন্ন ও ত্রস্ত ত্রাশমুক্তি চাই বটে, কিন্তু তার জন্যে আর এক প্রজন্মকাল অপেক্ষা করতেই হবে, আমাদের ভুঁইফোঁড়ত্ব ঘোচানোর জন্যেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতি সম্বন্ধে

আমাদের শিক্ষিতজন মাত্রই বিশেষ করে লেখক সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী সাংসদ মন্ত্রী প্রমুখ সবাই ভাষণে-বক্তৃতায়-বিবৃতিতে-লেখায় সুযোগ-সুবিধে পেলেই কোনো কারণে প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেই স্বদেশী বা জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষার, চর্চার, স্বসংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনের ও প্রসার ঘটানোর আর ভাব-চিন্তা কর্ম-আচরণে রূপায়ণের জন্যে আবেদন জানান, আবার মাঝে মধ্যে লেখায়, মেঠো বক্তৃতায় কিংবা সেমিনারে সভায় স্বদেশী বা জাতীয় সংস্কৃতির উপর হামলার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠ উচ্চারণও শোনা যায়। শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ে সাধারণভাবে সবাই এবং সব সরকারই ভাবে এবং সযত্ন ও সতর্ক প্রয়াসে তার রক্ষণ, পরিমার্জন, উৎকর্ষসাধন সম্বন্ধে সবাই অভিন্ন মতও পোষণ করেন। তবে মজার কথা এই যে, কেউ এযাবৎ সংস্কৃতি কি এবং কেন, তা কখনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন না। একটা নির্লক্ষ্য নিরুদ্দিষ্ট, অদৃশ্য হাওয়াই বিষয়ই থেকে যায় 'সংস্কৃতি' যা রক্ষার ও চর্যার ও চর্চার জন্যে আবেদন জানানো হয়। কখনো কখনো অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশে উৎকণ্ঠা এবং ক্ষোভ-ক্রোধ প্রকাশ করা হয়।

আমাদের মতো অজ্ঞ-আনাড়ি আমজনতার জন্যে সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে 'সংস্কৃতি' ব্যাখ্যাত হওয়া দরকার, তাহলে হয়তো আমরা সংস্কৃতি রক্ষার, চর্যার, চর্চার ও সেবার জন্যে আত্মনিয়োগ করতে পারতাম অবসর সময়ে। সংস্কৃতি কি মানসিক? সংস্কৃতি কি ব্যবহারিক ও বৈষয়িক? সংস্কৃতি কি দেহ-প্রাণ-মন-মগজ- মনন মনীষা সম্পৃক্ত? সংস্কৃতি কি কারো শাস্ত্রিক, বিধিনিষেধ সম্পৃক্ত? সংস্কৃতি কি স্থানিক ও ভাষিক, খাদ্যিক কিংবা পোশাকী? অথবা সংস্কৃতি স্থান-কাল-শাস্ত্র-সমাজ প্রকৃতি-প্রতিবেশি-অরণ্য পর্বত-সমুদ্র প্রভাবিত মাটির বন্ধুরতা-সমতা, উর্বরতা ও অনুর্বরতা, আবহাওয়ার উষ্ণতা ও শৈত্য জীবন-জীবিকা পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি সামঞ্জস্য প্রসূত কিছু? অবিমিশ্র সংস্কৃতি সম্ভব ও স্বাভাবিক কিনা, রক্ষণশীলতা ও গ্রহণবিমুখতা সংস্কৃতির দেহ-প্রাণের অনুকূল কিংবা প্রতিকূল কিনা, এসব জিজ্ঞাসার উত্তর অন্বেষণ সংস্কৃতি সম্বন্ধে পূর্ণ, সুস্থ ও স্পষ্ট সহজ ও সামান্যকৃত ধারণা লাভের জন্যে আবশ্যিক। তাছাড়া সংস্কৃতি পর্বত প্রমাণ বা পাথুরে অচল কোনো আবর্তিত আচরণ কিংবা গতিময় স্রোতধারার মতো বাঁকে বাঁকে কালে কালে, জনে জনে, মনে মনে পরিবর্তমান অর্থাৎ যথাস্থানে যথাকালে যথাপ্রয়োজনে জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত হয়ে যথাপাত্রে যথাসমাজে বিবর্তমান কিছু, এ প্রশ্নের উত্তর আবশ্যিক। সংস্কৃতি কি এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রনির্ভর বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক অভিন্ন জীবন-জীবিকামুখী জানপদিক হাটুরে প্রতিবেশে গোষ্ঠীক, গৌত্রিক, স্থানিক, দৈহিক, জাতিক, শাস্ত্রিক, বার্ণিক বা ভাষিক স্তরে রাখা থাকা বাঞ্ছনীয় ও কল্যাণকর?– এ জিজ্ঞাসারও উত্তর জরুরি। এরশাদী অভিপ্রায়ে আলী আহসান কমিশন নির্মিত সংস্কৃতি কিংবা খোমেনী নির্দেশিত শাস্ত্রিক সংস্কৃতি তথা আচার-আচরণ বিধি কি সংস্কৃতি, না সংবিধানের মতো সরকারি বিধিনিষেধের মতো প্রাশাসনিক নিয়ম-কানুন? উক্ত দুটোই হচ্ছে সংস্কৃতির নামে হামলা। যা কিছু সমকালীন চেতনা-চিন্তার জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে-ওঠা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীতিনিয়মের রীতিরেওয়াজের প্রথাপদ্ধতির, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্বের, তথ্যের ও সত্যের এবং যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জীবনের প্রতিকূল তা-ই অ ও অপসংস্কৃতি।

পূর্বলব্ধ শ্রুত বিশ্বাস-সংস্কার ধারণাজাত নয়, বরং পূর্বের বিশ্বাস সংস্কার-ধারণা শূন্য মুক্ত মন-মগজ-মনন-মনীষা প্রসূত নতুন চেতনার-চিন্তার প্রকাশ, প্রচার যন্ত্রনির্ভর জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে উদ্ভাবিত ও গৃহীত নতুন আচার-আচরণ ও জীবন-যাপন পদ্ধতিই গতিশীল বিকাশশীল স্বাভাবিক সংস্কৃতির দেহ ও প্রাণ।

যা-ই হোক, এ বিষয়ে সংস্কৃতিপ্রাণ ও সংস্কৃতিমান ব্যক্তিদের চেতনা-চিন্তা মুদ্রিত আকারে পরিব্যক্ত হওয়া জনহিতার্থে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

প্রগতিশীলদের গণসংস্কৃতিচর্চা সম্বন্ধে

জলপ্রবাহের মতো, বায়ুপ্রবাহের মতো একটা কালপ্রবাহও অনবরত চলছে। এবং কালের ছাপ পড়ে জীবজগতে সামগ্রিক, সামূহিক সার্বত্রিকভাবে অর্থাৎ এ প্রভাব হয় সর্বাত্মক ও সর্বার্থক। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সবকিছুই কালস্রোতে প্রভাবিত হয়ে পরিবর্তিত হয়ে এগিয়ে চলছে, পুরোনো জরায় জীর্ণতায় জড়তায় বিলুপ্ত হচ্ছে, নতুন দেহে-প্রাণে-মনে বর্ধিষ্ণু হয়ে পরে অবক্ষয়ের শিকার হয়ে ঝরে যাচ্ছে। নতুন জন্মে, পুরোনো মরে, মাঝখানে থাকে জীবন। এ জীবনের থাকে আদি-মধ্য-অন্ত– ঠিক নাটকের মতোই। তাই জীবনলীলাকে তথা চাওয়া-পাওয়া বা লাভ-লোভ ও স্বার্থ চালিত জীবনকে বলা হয় রূপকার্থে জীবননাট্য।

আমরা জীবনে গতি চাই, গতি শারীরভাবে বয়সবৃদ্ধি এবং আয়ু হ্রাস। তবু গতিই জীবন, স্থিতিই মৃত্যু। নিষ্ক্রিয়তা, নিস্পৃহতা, নিরুদ্দিষ্টতা মাত্রই মৃত্যুতুল্য জীবন্মৃতাবস্থা মাত্র। আমরা গতিকেই-প্রগতিকেই-প্রাগ্রসরতাকেই মনের মগজের মননের মনীষার, আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের, নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুন নির্মাণের উৎস ও ভিত্তি বলে মানি।

তবু এক অবচেতন অলসপ্রবৃত্তির চালনায় কিংবা তাড়নায় আমরা অতীতকে, ঐতিহ্যকে, স্থিতিকে গতানুগতিকতাকে, আবর্তিত অবস্থাকে নিশ্চয়তার নিশ্চিন্ততার নিরাপদ আশ্রয় বলে মানি। তাই আমাদের পিছুটান বেশি। মানসিকভাবে আমরা এগুতে সচেতনভাবে কখনো প্রয়াসী হই না। তাই নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার, নতুন আবিষ্কারের, নতুন উদ্ভাবনের, নতুন সৃষ্টির ও নতুন নির্মাণের লোক কোটিতে গুটিক মেলে না। পুরোনো আজো– এ শিক্ষা-সংস্কৃতির বৈশ্বিক আন্তর্জাতিক বিকাশের, বিস্তারের উৎকর্ষের কালেও– আমাদের পিছুটান দেয়, ধরে রাখে, চিত্তলোক আচ্ছন্ন করে রাখে, নতুনের স্পৃহা চাপা দিয়ে রাখে, মন-মগজ-মনন-মনীষার পরিচর্যার কোনো 'স্পৃহা' জাগায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব কথা আজ মনে জাগল ইদানীং আমাদের শিক্ষিত প্রগতিশীল মানববাদী, মানবদরদী, গণমানবপ্রেমী ও আমজনতাসেবী সংস্কৃতিচিন্তক ও সংস্কৃতিকর্মী তরুণ-তরুণীদের ভাব-চিন্তা-কর্ম আচরণের ধরন দেখে, তারা আজকাল গণমানব সেবার ও গণমানবকে শোষণ-পীড়ন-শাসন-বঞ্চনা প্রতারণামুক্ত করার লক্ষ্যে গণসংস্কৃতি চর্চায় ও চর্যায় বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। তারা ধরেই নিয়েছেন যে, নিঃস্ব নিরন্ন অজ্ঞ-অনক্ষর-দুস্থ-দরিদ্র জনগণের একটা শ্রেণী বা সমাজ চিরকালই থাকবে, কাজেই তাদের স্বার্থেই তাদের সমকালীন সঙ্কট-সমস্যা সচেতন করে তোলার জন্যে শহুরে শিক্ষিত গণদরদী সংস্কৃতিসেবীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে লোকসাহিত্য ও লোক সংস্কৃতি জিইয়েই রাখা, লোকগীতি, লোকনৃত্য, লোকবাদ্য, লোককবিগান, লোককথকতা এবং লোকব্যবহার্য তৈজস, আচার-আচরণ, পালা-পার্বণ, শিক্ষা, দারিদ্র্য বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা প্রভৃতি যা কিছু আদি ও আদিম সবটাই সামগ্রিক, সমূহিক ও সামাজিকভাবে নতুন করে চর্চা ও চর্যার মাধ্যমে জিইয়ে রাখা, এই নাকি জাতির কাছে গণদরদী মানববাদী জনগণসেবীদের দায়বদ্ধতারই গুরুত্বপূর্ণ জরুরি অংশ।

জনগণের কাছে পৌঁছার ও থাকার জন্যে মাটিলগ্ন জীবনকে মহিমান্বিত করে তোলার জন্যে আমাদের সংস্কৃতিকর্মীরা, সৃষ্টিশীল সংস্কৃতিমানেরা মাটি ও দারিদ্র্যগন্ধী জীবনচিত্র তুলে ধরার জন্যে সংলাপপ্রধান মুক্তবাঁধন মৌখিক ও মুক্তাঙ্গন নাটিকা রচনায় ও অভিনয়ে, কবিগানের নতুন পরিচর্যায়, কথকতার নবপ্রবর্তনে, যাত্রার বহুলপ্রচলনে, কৃষাণী-বেদেনী-জেলেনী নৃত্যে, ঢোল-খোল-করতাল-একতারা-দোতারার ব্যবহারে নতুন এক গণসংস্কৃতি প্রসারের পরিবেশ তৈরিতে আগ্রহী। এদের উদ্দেশ্য অকৃত্রিম। কিন্তু যেখানে আমরা শহুরে অর্থ-বিত্ত-বেসাতের মালিকেরা মানস ও ব্যবহারিক জীবনকে সর্বাত্মক ও সর্বার্থকভাবে প্রতীচ্য আদলে সাজাচ্ছি, সাজিয়েছি, ঘরদোর, তৈজস, আসবাব, পোশাক, খাদ্য, আচার-আচরণ প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে, সেখানে জনগণকে সেকেলে অবস্থায় সুপ্রাচীন স্থনিক-লৌকিক-অলৌকিক-অলীক বিস্ময়ে-বিশ্বাসে-সংস্কারে– ধারণায়-চিরকেলে সংস্কৃতিকে খাঁচায় আবদ্ধ রেখে জাতীয় সংস্কৃতির ও সত্তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার প্রয়াসী যে হয়েছি, তা কতোখানি যৌক্তিক, বৌদ্ধিক, কালিক ও মানবিক তা ভেবে দেখা আবশ্যিক ও জরুরি বলে মনে করি। একালে যে অজ্ঞ-অনক্ষরদেরও রেডিও-টিভি-ভিসিআর-ক্যাসেট-সিনেমা-গণসংযোগ মাধ্যমে জিজ্ঞাসু, সন্দেহপ্রবণ, যুক্তিবাদী ও দ্রোহী করা চলে, তাদের রুচি-বুদ্ধি-চিন্তা-চেতনা উন্নত করা সহজ, এ তথ্যে ও সত্যে আস্থা রাখাই বাঞ্ছনীয়।

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নয়– নতুন চিন্তা-চেতনাই জিয়নকাঠি

মানুষের জীবনের সার্থকতা হচ্ছে কৃতিতে-কীর্তিতে স্বপরিবারে, স্বসমাজে স্বগাঁয়ে, স্বঅঞ্চলে বা স্বদেশে স্বনামখ্যাত হওয়া, এমনি মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী হয়, বাপ-দাদার পরিচয়ে পরিচিত হওয়াকে আত্ম অবমাননা বলেই জানে, বোঝে ও মানে। যারা অসমর্থ, অযোগ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং দরিদ্র তারাই যোগ্যতর, খ্যাতিমান কিংবা ধনবান পিতৃপুরুষের নামে আত্মপরিচয় দিয়ে জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে অন্যের কৃপা-করুণা, দয়া-দাক্ষিণ্য কিংবা সম্মান-শ্রদ্ধা পাওয়ার প্রয়াসী হয়। এবং নিজের হীনতা, অকৃতি, অযোগ্যতা ঢাকার জন্যে পূর্বপুরুষের তথা বংশের পূর্ব গুণ-গৌরব-গর্ব, কৃতি-কীর্তি-খ্যাতি ঘনঘন স্মরণ করে, অন্যদের স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অসমর্থ অযোগ্য অদক্ষ নির্গুণ বংশধরেরা বংশের গৌরব-গর্বের আস্ফালনের মাধ্যমে হাস্যকরভাবে নিজেদের আর্তনাদ ঢাকবার চেষ্টায় থাকে সদানিরত। অন্যেরা অবশ্য নীরব উপহাসে পরিহাসে তাদের সামাজিকভাবে কার্যত উপেক্ষাই করে থাকে। অতীত ও ঐতিহ্য বাস্তবে কখনো সাধারণভাবে নিজেকে পরিবারের, দেশের, গোষ্ঠীর, গোত্রের, জাতির পূর্ব কৃতি-কীর্তির, গুণ- গৌররের অবস্থায় ও অবস্থানে ধরে রাখার জন্যে অনুপ্রাণিত বা প্রণোদিত হয় না। উত্থানের জন্যে ঐতিহ্যের সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয় না। আবার পতনও ঐতিহ্য আটকাতে পারে না। ব্যক্তিক মেধার অনুশীলনে উচ্চাশী আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিই কেবল জীবনে যোগ্যতা-সামর্থ্য-দক্ষতা অনুযায়ী স্বপ্রতিষ্ঠিত হয় পরিবারে, অঞ্চলে, সমাজে, রাষ্ট্রে কিংবা বৈশ্বিকস্তরে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে। এ কারণেই পরিবার, দেশ, রাষ্ট্র, জাতি কখনো সুদীর্ঘকাল ধরে গুণে- গৌরবে, কৃতিত্বে, কীর্তিতে লোকবন্দ্য হয়ে টিকে থাকে না। পরিবার তিন প্রজন্মের বেশিকাল. দেশ দুশ' তিনশ' বছরের বেশি সময়, জাতি শ' দেড়শ বছর ধরে বলে—বীর্যে—শৌর্যে, উদ্যমে-উদ্যোগে, শক্তিতে-সাহসে, আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে সৃষ্টিতে নির্মাণে চন্দ্র-সূর্যের মতো ভাস্বর থাকে বটে, তার পরে কোথাও আকস্মিকভাবে, কোথাও ক্রমান্বয়ে সেই পরিবারে, দেশে, রাষ্ট্রে, জাতিতে বল-বীর্যের, উদ্যম-উদ্যোগের, শক্তি-সাহসের, আত্মপ্রত্যয়ের-উচ্চাশার অভাব ঘটে। অবক্ষয়ের ম্লানিমা ও গ্লানি গ্রাস করে পরিবারকে, দেশকে, রাষ্ট্রকে, জাতিকে। ইতিহাসে এ সাক্ষ্যই মেলে। প্রাচীন মিশর, গ্রীস, রোম, ব্যাবিলন, ভারত, চীন, বাগদাদ নয় শুধু, আধুনিক ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোতেও এ ধরনের উত্থান-পতন আমরা প্রত্যক্ষ করি। ইতহাসে এ সবের পাথুরে-সাক্ষ্য প্রমাণ মেলে। কাজেই অতীত কৃতি-কীর্তির, গুণ-গৌরবের ঐতিহ্যগর্ব প্রেরণার উৎস ও ভিত্তি নয়, আত্মপ্রত্যয়ীর উচ্চাশা এবং শক্তি-সাহস আর উদ্যম-উদ্যোগই জীবনে ভাব-চিন্তা-কর্মের বাস্তবায়নে সাফল্যের ও স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার পুঁজি-পন্থা। এ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য বুঝি না বলেই আমরা অতীত ও ঐতিহ্যমুখী, আত্ম উন্নয়নে উদ্যমহীন, উদ্যোগহীন, অতীত কৃতি ও কীর্তিগর্বী আস্ফালন প্রবণ।

অতীত ও ঐতিহ্য প্রবহমান সংস্কৃতিরও সহায় নয়। সংস্কৃতি হচ্ছে নিত্যকার মানসিক ও ব্যবহারিক চাহিদা অনুগ ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের অভিব্যক্ত, পরিব্যক্ত ও বাস্তবায়িত রূপের সামগ্রিক, সামূহিক ও সামষ্টিক চালচিত্র মাত্র। সমকালীনতা এর প্রাণ।

প্রয়োজনানুগ কর্মাচরণই এর দেহ। বিচিত্র উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনযাত্রায় পরিস্ফুট সাধারণ ও সামান্যীকৃত রুচি ও আচার-আচরণই সংস্কৃতি রূপে অনুভূত ও উপলব্ধ হয়, এজন্যেই সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে সংস্কৃতি কি ও কেমন, তা জানানো দেখানো বোঝানো যায় না। একই কারণে সংস্কৃতির রূপ-গুণ-মান-মাপ মাত্রাও কেবল ব্যক্তিগতভাবে অনুভব উপলব্ধি করা হয়তো সম্ভব, কিন্তু অন্যদের মনে-মগজে-মননে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঞ্চারিত করে দেয়া সম্ভব নয়। সংস্কৃতি- দেশ-কাল জীবনের প্রাত্যহিক চাহিদা অনুগ প্রবহমান জীবনধারার পরিব্যক্ত রূপ বলেই তা গতিশীল ও সদা পরিবর্তমান। সংস্কৃতিকে তাই বহতানদীর সঙ্গেই তুলনা করা চলে। সংস্কৃতির কোনো অচল অটল স্থির রূপ নেই। সংস্কৃতি রূপ বদলায়, রঙ বদলায়, ঢঙ বদলায়– বহুরূপীর মতো রূপান্তরেই তার গতিশীলতা-প্রবহমানতা সদা প্রমাণিত। সমকালীন জগৎচেতনা ও জীবনভাবনা যাদের থাকে, তারা সংস্কৃতির রূপান্তরকে স্বাভাবিক বলেই জানে বোঝে মানে, রক্ষণশীল বন্ধ মগজের-মননের ব্যক্তির কাছে এ গতিশীলতা, এ রূপান্তর সংস্কৃতির অপকর্ষজাত অপসংস্কৃতি মাত্র। রক্ষণশীল ব্যক্তিরা সংস্কৃতি শাস্ত্রিক, আঞ্চলিক, গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক, দৈশিক, রাষ্ট্রিক, জাতিক, সাম্প্রদায়িক স্থায়ীরূপে আস্থাবান বলেই নতুন চিন্তা-চেতনাজাত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণের বাস্তবায়নকে অপসংস্কৃতিজাত অপকর্মাচরণ বলে অবজ্ঞা করে। খরস্রোতের অভাবে নদীর বুকে জমে যায় বালি ও মাটি, তাতে নদী যেমন নব্যতা হারায়, তেমনি মগজী অনুশীলনে সমকালীন বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক চিন্তা-চেতনা জীবনভাবনা ও জীবিকাপদ্ধতি সম্বন্ধে সদাসচেতন না থাকলে পিছিয়ে পড়া রুচি-বুদ্ধি-সংস্কৃতিমান বন্ধ্য মগজ-মননের রক্ষণশীল ব্যক্তিরা কল্যাণের পথভ্রষ্ট হয়ে হয় দিশেহারা। গভীর নদী বন্যার জল ধারণ করতে ব্যর্থ হয় বলেই বন্যা গ্রাস করে জনপদ-ফলে-ফসলে ধনে-প্রাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জনগণ। তেমনি সমাজে বন্ধ্য মন-মগজ-মননের মানুষের সংখ্যাধিক্য নৈতিক-আদর্শিক চেতনারিক্ত করে সমাজকে, কল্যাণবুদ্ধি পায় লোপ, সমাজ সাধারণভাবে হয় ধনে-মনে কাঙাল। কল্যাণবুদ্ধির ও দূরদৃষ্টির অভাবে আজ ঢাকা শহরে শিক্ষিত লোকেরা সব সুযোগসন্ধানী সুবিধেবাদী ও নগদজীবী হয়ে উঠেছে সাময়িক ফায়দা লোটার লক্ষ্যে। জাতি আজ অবক্ষয়গ্রস্ত। নতুন চিন্ত-চেতনায়-উদ্যমে-উদ্যোগে আশায় আশ্বাসে শক্তিতে সাহসে আমাদের এগুতে হবে।

রুচির-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের দেয়াল ভাঙছে

বাজেমালের দোকানে তথা মুদীর দোকানে হরহামেশা হরেক রকমের দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য এবং ক্বচিৎ রোগের চিকিৎসায় কিংবা বিশেষ খাদ্য-ব্যঞ্জন তৈরিতে ব্যবহৃত হয় তেমন ফল-মূল-ঔষধি মেলে। যেমন যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকি, চিরতা, অর্জুনগাছের ছাল, নানা জাতের মসলা, গাছ-গাছড়ার শেকড়, হরিতাল, বাঘের দুধ প্রভৃতি শত প্রকারের ক্বচিৎ প্রয়োজনীয় সামগ্রী মেলে অন্তত আধাশতক আগে মিলত, হাটে হাটে বড় দোকানে বৈয়ামে রক্ষিত থাকত। অবশ্য তখনো কবিরাজের জনপ্রিয়তা ছিল, অন্যভাবে বলতে গেলে অর্ধশতাব্দ আগেও গ্রামীণ গরীবেরা কবিরাজ নির্ভর ছিল। আদা-মধু-ধন্যা-পান-তুলসীপাতা প্রভৃতির অনুপান ছিল আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার আবশ্যিক উপাদান উপকরণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একালের টিভিতে ডিস অ্যান্টেনার প্রয়োগে আমরা বিভিন্ন চ্যানেলে বিচিত্র সব অনুষ্ঠানে অভাবিত নানা দৃশ্য-কাহিনী-জীবনযাপনপদ্ধতি, জাঙ্গলিক, সামুদ্রিক নানা অদ্ভুত পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ এক কথায় জীবউদ্ভিদ দেখতে পাই। দেখতে পাই গ্রহলোকের নানা কিছু, জানতে পারি তাদের সঙ্গে নানা তথ্য, তত্ত্ব ও সত্য ঘরে বসে শয্যায় শুয়ে থেকেই আরামে-আয়েশে। এখন আমার কাছে টিভি পসারীর, মুদীর, দোকানীর মৌজুতে ভাণ্ডারের মতোই, আড়তের মতোই। যা চাওয়া হয়, তা-ই যেন পাওয়া যায়। একালের 'ডিপার্টমেন্ট স্টোর'ই কেবল এর সঙ্গে তুলিত হতে পারে, এ কারণেই বাজেমালের দোকানের বয়ান দিয়েই কথা শুরু করতে মন চাইল। কারণ আমরা কেবল লাভ চাই, প্রাপ্তি চাই, লোকসান চাইনে, হারাতে চাইনে কিছু। সবটা কিন্তু ভালো-মন্দ-মাঝারি মিশানো। ক্ষতির ঝুঁকি থাকেই, নির্ভেজাল কিছু মেলে না মর্ত্যে। এখন আমাদের নিত্যকার ব্যবহারিক পারিবারিক প্রয়োজনের সব জিনিসেরই খবর পাই বেতার-টিভির বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে। আমাদের জ্ঞানের পরিধি প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ যেন গতিশীল পৃথিবীর মতো, পৃথিবীর মানুষের জ্ঞানের সঞ্চয় পৃথিবীময় দেখে শুনে ও জেনে চাক্ষুষ ও মানসিকভাবে প্রজ্ঞাবান হচ্ছে প্রতি মুহূর্তেই। যথার্থ অর্থে এখন সেই ঔপনিষদিক 'চরৈবেতি' জীবনে-মনে-মগজে-মননে গতি সঞ্চার করেছে। মানুষকে করেছে উচ্চাশী, জিজ্ঞাসু, সতৃষ্ণ, সদাঅতৃপ্ত। আরো চাই, অল্পে সুখ নেই। ফলে বেতার-টিভি-ক্যাসেট-ভিসিআর-ডিস অ্যান্টেনা, স্যাটেলাইটে আমাদের এখন বৈশ্বিক স্তরে আন্তর্জাতিক জীবন সম্পৃক্ত করে তুলেছে। এখন আমরা মানব-অবদানের সবকিছুর ব্যক্তিগত অধিকারীও, বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত, উদ্ভাবিত, নির্মিত যন্ত্র-প্রকৌশল প্রযুক্তি এখন চন্দ্র-সূর্যের মতোই ভাগ-বন্টন না করেই একাধারে ও যুগপৎ নির্বিশেষে ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ করার অধিকার পেয়ে গেছি। ফলে এখন কাজের প্রয়োজনের বিনোদনের, বিলাসের, আরামের, আয়েশের সর্বপ্রকার দেখার, শোনার, জানার, বোঝার বিষয় আমাদের দেহ-প্রাণ-মন-মগজের-মননের আয়ত্তে। ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ সম্ভব সবকিছুই এখন মৌজুত।

এখন বেতার-টিভি বহুরূপী। এ রঙ বদলায়, ঢঙ বদলায়, ভঙ্গি বদলায়, রূপ বদলায়, বদলায় বিষয়। বদলায় দৃশ্য, বদলায় রস, বদলায় রুচি, বদলায় লক্ষ্য, বদলায় আদর্শ ও উদ্দেশ্য। ফলে এখন বিভিন্ন শাস্ত্রপন্থী আস্তিকের ধার্মিকের গতানুগতিক নীতি নিয়মে-রীতি-রেওয়াজে প্রথা-পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ও স্বস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ঘটিয়েছে, ঘটাচ্ছে ও ঘটাবে এক অস্বস্তিকর মানসিক অস্থিরতা। একদিকে তাদের শাস্ত্রিক, নৈতিক আদর্শিক ও দার্শনিক জীবনচেতনা যা আমাদের অপরিশীলত অননুশীলিত মনে-মগজে-মননে আশৈশব লালিত এবং যাতে বিশ্বাস-ভরসা অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত, অন্যদিকে দেশকালের ও জীবনের দাবি হিসেবে বিজ্ঞানের বদৌলত– যন্ত্রের প্রসাদে প্রাপ্ত দেহ-প্রাণ-মনের স্থূল-সূক্ষ্ম চাহিদা পূরণের সহজ-সস্তা ব্যবস্থা ও সামগ্রীর প্রাচুর্য। এ সবের প্রভাব আমাদের সমবয়সী নারী-পুরুষের খাদ্যে-পোশাকে-আচারে-আচরণে-রুচিতে এখন সুপ্রকট, তার বিস্তৃতি গাঁ-গঞ্জ অবধি সর্বত্র লক্ষণীয়। স্যাটেলাইট-ডিস অ্যান্টেনার মাধ্যমে আমরা এখন হেন আলোচ্য বিষয় নেই, যা টিভি মাধ্যমে আলোচিত হতে দেখি না বা শুনি না– বিজ্ঞানের সর্বশাখার নতুন নতুন আবিষ্কৃত তথ্য যেমন জানতে পাই, আয়ুর্বিজ্ঞানের ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের সার্বক্ষণিক উৎকর্ষের যান্ত্রিক ও প্রতিষেধক উদ্ভাবিত খবর যেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের আয়ু ও চিকিৎসা সম্বন্ধে আশান্বিত ও আশ্বস্ত করে, তেমনি আমাদের শৃঙ্গারাদি বিভিন্ন রসের মানসোপভোগে আমাদের সুপ্ত বাসনা তৃপ্ত করে নগ্ন নারী-পুরুষের ক্রীড়া কিংবা নাচ-গান-বাজনা-অভিনয় যেমন দেখা-শোনা-জানা সম্ভব হয়। আমাদের মনের অজ্ঞাত কন্দরের সুপ্ত গুপ্ত বাসনা যেমন চরিতার্থতা খোঁজে নানা চিত্রে, দৃশ্যে, গানে-নাটকে-অভিনয়ে দেহভঙ্গির বিচিত্র প্রদর্শনীতে, তেমনি এ টিভির মাধ্যমে মানুষের মনের ঈশ্বরানুরক্তি জাগানো, ভূত-প্রেত-পিশাচে, মানুষের অলৌকিক সাধনায় সিদ্ধিজাত দৈবশক্তি অর্জনের, কিংবা দৈবানুগ্রহ লাভের শক্তি অর্জনের সামর্থ্যে অলীক বিশ্বাস ও আস্থা জাগানো প্রভৃতি কাজেও অবহেলা নেই প্রতিষ্ঠানের মালিকদের ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপকদের। এতে মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি-মগজ প্রয়োগে অনীহ হয়ে পড়ে। একদিকে আধুনিকতম পর্নগ্রাফিক কাহিনী ও অভিনয় যেমন সুলভ, নারীর নগ্ন দেহের প্রদর্শনী যেমন সর্বত্র সুলভ, যৌন শিক্ষাদানে জনগণকে নানা রোগ সম্বন্ধে সতর্ক করার জন্যে যেমন সযত্ন প্রয়াস দেখা যায়, তেমনি আদিরসে দর্শক মন সিক্ত ও তৃপ্ত করার উদ্দেশ্যও থাকে সুপ্রকট। এখন সবটাই বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক। কেননা আকাশ খোলা, এবং সব চিত্র ও শব্দই বায়ুবাহিত। এখানে রাষ্ট্র সীমান্ত চৌকি অচল।

যারা কালগত জীবনে প্রজন্মক্রমে উচ্চাশী স্বচ্ছন্দ্যবিলাসী সন্ধিৎসু মানুষের নতুন চেতনার ও চিন্তার অনুশীলনের, আবিষ্কারের, উদ্ভাবনের নেশা, জিজ্ঞাসুর জ্ঞান পিপাসার স্বাভাবিকতা ও আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিদের আত্মপ্রসারে প্রেরণায় আজন্ম লব্ধ, দৃষ্ট ও শ্রুত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা বর্জনের প্রবণতা আর মুক্ত চিন্তাযোগে যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবন চর্যার ও চর্চার আগ্রহ হাত ও ঋজুমেরুদণ্ডের উঁচুশির মানবপ্রজাতির প্রাণীর পক্ষে নিতান্ত স্বভাবিক বলেই জানে, বোঝে ও মানে, তাদের যন্ত্রনির্ভর ও যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জীবনে ও জগতে মানুষের শাস্ত্রিক, নৈতিক, আদর্শিক, সাংস্কৃতিক, রৌচিক জীবনধারায় এলো বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সে-পরিবর্তনে আপত্তি রইল না বরং সহযোগিতা পাওয়া গেল নিরীশ্বর নাস্তিক ফ্রিথিংকার বা মুক্ত বুদ্ধির মুক্ত চিন্তকদের এবং পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার ধারণার ও আচার-পালা-পার্বণের লৌহকঠিন খাঁচায় বদ্ধ বন্ধ্যমনের মগজের-মননের মানুষের মানসমুক্তিও কাল প্রভাবে আসন্ন জেনে সমাজপরিবর্তনকামীও সমাজবাদী হচ্ছে অনেকেই। কারণ তারা গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক, বার্ণিক, ধার্মিক, ভাষিক— দৈশিক, সাংস্কৃতিক, স্বাতন্ত্র্যবাদে আস্থাবাদে আস্থাবান নয় এখন। তারা মানব সংস্কৃতিতে তথা বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক অভিন্ন সংস্কৃতিতে উন্মেষ, বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের পক্ষপাতী। তারা মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে।

বিচলিত কেবল স্বশাস্ত্রের, স্বগোত্রের, স্ববর্ণের, স্বভাষার, স্বসংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যবাদীরাই। কারণ তাদের ওই স্বাতন্ত্র্যেই নিজেদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব, এবং স্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে অস্তিত্বের নিরাপত্তা নিহিত বলে জানে ও মানে। আজকের বেতার-টিভি প্রভৃতি এবং বই-পত্রপত্রিকাও স্বাতন্ত্র্যচেতনার উপর নিত্য হামলা চালায় বলেই রক্ষণশীল অর্থোডকস ও মৌলবাদীরা সদাশঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন। এ উদ্বিগ্নতা এ শঙ্কা কিংবা ত্রাস অকারণ নয়। তাদের মতের পথের নিশ্ছিদ্র পাথুরে দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গে বেতার-টিভি-তথা একালীন যন্ত্রনির্ভর ও যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জীবনভাবনা ও জগৎচেতনা ফাটল ধরিয়েছে। তাদের সে-দুর্গের দেয়াল এখানে সেখানে খণ্ড খণ্ড রূপে ভেঙে পড়েছে। মেরামত চলছে না। বৈরী যুগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো মেরামত টিকবেও না। বন্যার জল, ঢেউয়ের বাঁধ ও তীর ভাঙার মতোই তাদের বিশ্বাসের সংস্কারের ধারণার আচারের আচরণের, নীতি-নিয়মের রীতি-রেওয়াজের প্রথা-পদ্ধতির দেয়ালে কেবলই আঘাতে আঘাতে ফুটো করে দিচ্ছে। ভাঙা পদ্যেই কথা শেষ করি : নতুন চিন্তা-চেতনার ফুল যে দিন দিন ফুটে ওঠে/ পুরোনো সমাজের দেয়াল ভেঙে যে ভূমে লোটে/ পুরোনো নীতি-নিয়ম-রুচি যে ধরে রাখা হল ভার/ ধ্বনি ওঠে বৈশ্বিকস্তরে সংস্কৃতির অভিন্নতার।

প্রাণিত্ব বনাম মনুষ্যত্ব লক্ষণ

'ডিসকভারি চ্যানেলে' আকস্মিকভাবে এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখলাম। কোন অঞ্চল বা দেশ বুঝতে পারিনি, কারণ গোড়া থেকে দেখিনি, মনোযোগও দিইনি। হঠাৎই বলতে গেলে দৃষ্টি আটকে গেল। এ দৃশ্য আমাকে বিস্মিত করেছে, এক তত্ত্বচিন্তায়ও আবিষ্ট করেছে, এমনি জ্ঞান-অভিজ্ঞতাই হয়তো ব্যক্তিকে গভীর অনুভবের ও উপলব্ধির জগতে বিচরণ করায়, মনে-মগজে-মননে সৃষ্টি করে আলোড়ন। কেউ কেউ এভাবেই দার্শনিক হয়ে যায়। বকের চেয়ে অনেক বড়ো, কিন্তু উটপাখির চাইতে অনেক ছোটো, তবু ময়ূরের মতোই অনেকটা অবয়বে– সৌন্দর্যে নয়। সে পাখি নীড় তৈরি করেছে মজবুত ও গোলগাল বৃক্ষশাখায়। ডিম পেড়েছে চারটে। ডিমগুলো ছোটো নয়, আমাদের হাঁসের ডিমের দ্বিগুণের চেয়েও বড়ো।

দেখলাম একটা ছানা খোলস ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। পক্ষীমাতা ডিমের ভাঙা টুকরোগুলো ঠোঁটে তুলে ফেলে দিল নিচে পানিতে। কারণ গাছটির তলা ছিল জলময়। তারপরই ঘটল সেই বিস্ময়কর ঘটনা। সদ্যোজাত ছানাটি সামান্য কিছুক্ষণের মধ্যেই বাকি তিনটে অস্ফুট বা আভাঙা ডিমকে এক অদ্ভুত কৌশলে বিজ্ঞ বুদ্ধিমানের মতো পিঠে ঠেলে তুলে নীড়ের খড়কুটোর বেষ্টনরূপ দেয়ালের ওপর দিয়ে নিচে ফেলে দিল। একটি একটি করে, প্রায় সামান্য প্রয়াসে। জন্মমুহূর্তেই তার এ বুদ্ধি। ডিমের অন্ধকার খোলসের ভেতর থেকে পক্ষীশাবক বের হয় দেহের ক্ষুধা আর আলোর পিপাসা নিয়ে– এ হচ্ছে গর্ভমুক্তি। এ শাবকটি জন্মেই নিজেকে নীড়ের পরিসর বৃদ্ধির কাজে নিয়োগ করল স্বচ্ছন্দে স্বপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার অবচেতন গরজবোধে। ডিমস্থ সহোদর হত্যায় তার দ্বিধা ছিল না, আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রসারের বৃত্তি প্রবৃত্তিবশেই সে মর্ত্যজীবনে প্রথমেই বিনষ্ট করল নীড়ের এ খাদ্যের ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বীকে ও প্রতিযোগীকে। তারই পরে দেখলাম মা ও বাবা ঘনঘন ওই তরুণ গরুড়ের পেটের অনন্ত ক্ষুধা মেটাচ্ছে। নির্লোম ছানাটি হাঁ করছে আর মা-বাবা সংগৃহীত খাদ্যটি টাকরার মধ্যে পুরে দিচ্ছে।

কিছুক্ষণের জন্যে আমিও তাত্ত্বিক-দার্শনিক হয়ে গেলাম সদ্যোজাত শাবকটির বিস্ময়কর ক্রিয়াকাণ্ড দেখে। মানুষও তো প্রাণী। মানুষও জন্মে আত্মচিন্তাবশে আর্তনাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে অসহায়তার সহজাত বোধ নিয়ে। শিশু কোলে আশ্রিত হয়েই, ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির দুধ-মধু-পানি পেয়েই হয় নিশ্চিন্ত। শিশু যার আশ্রয় পায়, তাকে নিরাপদ আশ্রয় ভেবে ক্রমে তার প্রতি আকৃষ্ট হয় অনুরাগে, কিন্তু কৃতজ্ঞ হয় না কারো কাছেই। সমাজ বা সাহচর্যবোধ জাগার আগে সে যে কারো কাছ থেকে তার প্রয়োজনের, আকর্ষণের, চোখে ভালো লাগা বা মনে ধরা বস্তু কিংবা খাদ্য কেড়ে নিতে থাকে সদা উদ্যত, কিন্তু কাউকে কিছু দেয়ার আগ্রহ তার মধ্যে থাকে অনুপস্থিত, অনুন্মেষিত। এককথায়, প্রাণীর মানব প্রজাতিও কাম-ক্রোধ-ক্ষুধা ও প্রাণ হারানোর ভীতি– এ চার অনুভূতিচালিত। তবে শৈশবে ও বার্ধক্যে দৈহিকভাবে কাম অনুভূত না হলেও আমৃত্যু মানসিকভাবে কামাসক্তি থেকেই যায় ফলে মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে এক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য থাকে না। তফাৎ এই যে, মানুষ দুটো হাতের বদৌলত প্রকৃতিনির্ভর না থেকে স্বরচিত ও স্বনির্ভর কৃত্রিম জীবন যাপন করে। তার সে-সূত্রেই দলীয় তথা সামাজিক জীবন যাপন করতে হয় পারস্পরিক সহযোগিতার ও সহাবস্থানের নিরাপত্তার অঙ্গীকারে। এ জন্যেই মানুষকে লোকনিন্দার, শস্তির, পাপের, এবং আসন্ন বিপদের ও সমাজচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় সংযত ও সহিষ্ণু হতে হয়। জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার ও নিরুপদ্রবতার কথা ভাবতে হয়। তাই বলে তার প্রাণীসুলভ সহজাত বৃত্তিপ্রবৃত্তি লুপ্ত হয় না। কেবল গুপ্ত ও সুপ্ত থাকে মাত্র, যা বাহ্যত নিবৃত্তি, বিরাগ ও সংযম বলে মনে হয়। আসলে লাভ-লোভ-স্বার্থ চালিতই প্রাণী মাত্রেরই জীবন। এ জন্যে প্রাণী নির্বিশেষে গা-পা-প্রাণ বাঁচিয়ে লাভ-লোভ-স্বার্থ হাসিল করতে চায়। তাই আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মপ্রসারের প্রয়োজনে আপাত নিরাপত্তাবোধে প্ররোচিত হয়ে প্রলোভন প্রবল হলে লোকচক্ষুর অন্তরালে করে না হেন অপকর্ম-অপরাধ নেই। এ ক্ষেত্রে শাস্ত্রপন্থী আস্তিকে, নিরীশ্বর নাস্তিকে এবং যৌক্তিক বৌদ্ধিক জীবন যাপনে আগ্রহীর মধ্যে হয়তো মাত্রাগত পার্থক্য নেই-ই। পার্থক্য যা ঘটে তা মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-পদ-পদবীগত কিংবা অর্থ-বিত্ত-বেসাতগত সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানগত মাত্র। কারো নিজেকেই সব অপকর্ম করতে হয়, আবার অর্থ-বিত্ত-বেসাত-বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞাবানেরা অন্যকে দিয়ে করিয়ে নেয়– পার্থক্য এটুকুই। মানবিক গুণের উন্মেষ, বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন লক্ষ্যে সমাজ প্রতিবেশীর প্রয়োজন– সচেতন থেকে চর্যাগ্রহণ করে নিয়মিত সযত্ন সতর্ক অনুশীলন করলেই কেবল প্রাণীর মানব প্রজাতি মানবিকতা, মানবতা কিংবা মনুষ্যত্বরূপ অন্তত ষড়গুণের অধিকারী হতে পারে। সেগুলো হচ্ছে : প্রবৃদ্ধি সংযমন, পরমত-কর্ম-আচরণ, সহিষ্ণুতা, যৌক্তিক বৌদ্ধিক ন্যায়চেতনা, বিবেকানুগত্য, দায়িত্ব ও কর্তব্যবুদ্ধি এবং সৌজন্য। এসব গুণনিষ্ঠ অনুশীলনে আয়ত্ত না করলে মানুষও অন্য প্রাণীদের মতো লাভে-লোভে-স্বার্থে অর্থাৎ আত্মরক্ষার, আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মপ্রসারের লক্ষ্যে জোরে-জুলুমে-হননে-দহনে-ধর্ষণে-ভাঙনে-লুণ্ঠনে স্বপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার অপকর্মে ও অপরাধে লিপ্ত হয়। আত্মশক্তি ও সাহস সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয়ী উচ্চাশী মানুষ মাত্রই তাই মর্ত্যজীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-আরাম-আয়েশ, মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-দর্প-দাপট-প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন লক্ষ্যে এ জোর-জুলুমের পন্থা বেছে নেয়। তাই শাসন-শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা-প্রতারণা-কাপট্যই হয় তাদের পুঁজিপাথেয়। পৃথিবীতে এ মানুষের সংখ্যাই হাজারে নয়শ' নিরানব্বই। ফলে দুর্বল মাত্রই প্রবলের দৌরাত্ম্যের শিকার। প্রবলেরা ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে তুষ্টি, তৃপ্তি ও হৃষ্টি সন্ধান করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্নেহে মমতায় প্রীতিতে ভালোবাসায় ত্যাগে তিতিক্ষায় পরার্থপরতায় ভোগবিমুখতায়ও যে সুখ আছে, তৃপ্তি, তুষ্টি, হৃষ্টি আছে, তা তাদের অজ্ঞাতই থেকে যায়। তারা সাময়িকভাবে মান্য থাকে, ভয়ের কারণ হয়ে থাকে বটে, কিন্তু কখনো শ্রদ্ধার-ভক্তির-অনুরাগের পাত্র হয় না। যদি তাদের মৃত্যুতে পরিচিত প্রতিবেশী 'আহা লোকটা ভালোই ছিল' বলে দীর্ঘশ্বাস না ছাড়ে, যদি অন্তরে কিছু সময়ের জন্যে শূন্যতাবোধ না করে, তাহলে বুঝতে হবে ওই মৃত ব্যক্তির সুদীর্ঘ মর্ত্যজীবন ব্যর্থই হয়েছে। মানুষ লোকস্মৃতিতে বাঁচে সৎগুণে শ্রদ্ধেয় হয়ে– তা না হলে অবজ্ঞেয় নরদানব হয়ে স্মরণ্যে হয়ে বংশধরদের লজ্জিত রাখে মাত্র। তাছাড়া 'কীর্তিযস্য জীবিত'। লোকহিতে পরার্থপরতায় অনন্য মানবিক গুণেই অসামান্য মগজ-মনন-মনীষার অবদানেই ব্যক্তি কৃতী কীর্তিমান হয়। 'আপনাকে লয়ে বিরত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে/ সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'– এ কবিতাংশে কবি মানুষের মধ্যে মানবিক গুণ তথা মানুষ্যত্বই প্রত্যাশা করেছেন। তেমনি একই ভাব প্রকাশ পেয়েছে কবি যখন বলেন' 'সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে'। আমরাও প্রাণী। কিন্তু প্রাণীশ্রেষ্ঠ বলে দাবি করতে হলে মানবিক গুণের সযত্ন, সতর্ক, সপ্রয়াস অনুশীলনে উন্মেষ. বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। নইলে সমাজে কাড়াকাড়ি মারামারি হানাহানি কমবে না কোনো স্তরেই, কোনো শ্রেণীতে, কোথাও কখনো। 'জোর যার মুলুক তার' নীতির বিলুপ্তি আবশ্যিক ও জরুরি। লাভ-লোভ-স্বার্থচালিত প্রাণী প্রবৃত্তির মানুষকে ন্যায়বুদ্ধি ও বিবেকচালিত জীবনযাপনে আগ্রহী হতে হবে সচেতন সযত্ন প্রয়াসে।

AMARBOI.COM

কালের পুতুল

মানুষ সাধারণভাবে শাস্ত্র-সমাজ-স্বদেশ শাসিত পুতুলই। কালের প্রভাবে, ফ্যাশনের প্রভাবে, নীতিনিয়মের রীতিরেওয়াজের প্রথাপদ্ধতিতে চাপে ও নিয়ন্ত্রণে কাটে তার মর্ত্যজীবন, কাজেই মানুষমাত্রই দেশ-কাল-পাত্র-সমাজ-সরকার রাষ্ট্রচালিত ও তাড়িত পুতুলমাত্র। জীবন মর্ত্যমঞ্চে গভীর তাৎপর্যে নাচেই। তাতে কারো কারো কাঙ্ক্ষাপূর্তির ফলে জীবন সফল ও সার্থক হয়। কারো কাঙ্ক্ষা অপূর্তির আফসোসে জীবনের বেদনাময় অবসান ঘটে। জীবননাট্যেও প্রযোজক পরিচালক থাকে যৌথজীবনে শাস্ত্র সমাজ-সরকার নিয়ন্ত্রণে অর্থ-সম্পদের প্রাপ্তির অপ্রাপ্তির সুলভতার দুর্লভতার মন-মগজ-মনন-মনীষার গুণ-মান-মাপ-মাত্রা ভেদের তারতম্যে মানুষের নানাপ্রকারে বন্দিত্বেই কাটে জীবন। ব্যক্তি জীবন মন-মগজ-মনন-মনীষা প্রয়োগে স্বাধীন চেতনা-চিন্তার প্রকাশে-প্রচারে বিকাশে উৎকর্ষসাধনে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ-বিস্তার পায় না। নানা বাধাবিঘ্ন বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণারূপে স্থানিক লৌকিক অলৌকিক অলীক অদৃশ্য নানা অরি-মিত্রশক্তির কাল্পনিক প্রভাবভীরু মানুষ নিজেকে ফুলের মতো বিকশিত করতে পারে না। অর্ধস্ফুট কলিই থেকে যায়। ক্বচিৎ কেউ কোনো একস্থানে কয়েক শতকের মধ্যে সর্ব সংস্কার-ধারণামুক্ত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীতিনিয়ম রীতিরেওয়াজ প্রথাপদ্ধতি ভেঙে জগতের ও জীবনের নতুন তাৎপর্য ঋদ্ধ কালোপযোগী জীবন যাপনপদ্ধতি চালু করেন। গণসমাজের একাংশের গণমন প্রভাবিত করে। অবশ্য তেমন ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব চিরকালই কোটিতে গুটিকেই মেলে এবং তাও সর্বত্র নয় সর্বকালেও নয়। তেমন মানুষ অবশ্য দেশ-কাল-শাস্ত্র-সমাজ-সরকার কিংবা স্থানিক লৌকিক অলৌকিক অলীক কাল্পনিক আন্দাজী-আনুমানিক অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির ও আচার-আচরণের নীতিনিয়ম রীতিরেওয়াজ পাল্টে দিয়ে নতুন আন্দাজী-আনুমানিক অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির ধারণা চালু করেই নতুন সমাজ-সম্প্রদায় বা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে মর্ত্যমানবের সমাজ এক অর্থে আবর্তিতই হয়েছে, নতুন নতুন ধারণায় এগোয়নি, আসমানে-জমিনে প্রসৃত অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির জলাবদ্ধ মাছের মতোই মানুষ আত্মশক্তির সন্ধানরিক্ত, আত্মপ্রত্যয়হীন ভীরুর দিশেহারা জীবনই যাপন করে চলেছে আজো। নিরীশ্বর নাস্তিক্য মতবাদ ব্যক্তিক পর্যায় অতিক্রম করে দৈশিক-জাতিক-সাম্প্রদায়িক রূপ পায়নি কখনো কোথাও স্বরূপে। কেউ জন্মান্তরবাদে, কেউ মার-স্কন্দবাদে, দেহাত্ম বা দৈহিক চৈতন্যবাদে আস্থা রেখে কেউ যেন অজ্ঞেয়বাদী-রহস্যবাদী কিংবা প্রাকৃত প্রত্যক্ষলীলাবাদী হয়েই থাকে।

ফলে নতুন কালস্রষ্টা, সমাজ সংগঠন, দর্শনদাতা, বিধি-নিষেধের নিগড় নির্মাতা অনন্য অসামান্য ব্যক্তি জগৎ-সংসারের কিছু মানুষকে চমকিত, বিস্মিত, মুগ্ধ এবং অনুরাগী অনুগামী ও অনুগত ভক্ত করেন। এভাবেই আজ অবধি চলেছে। বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য, যন্ত্রের প্রসাদভোগী লোকেরা আজো যন্ত্রী মানুষে, মগজী মানুষের দেহ-প্রাণ-মগজ-মনন-মনীষার অসামান্য অশেষ শক্তিতে আস্থা রাখে না। মানুষের সমাজের ও রাষ্ট্রের গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় বিকাশ-বিস্তার-উৎকর্ষ ঘটছে না। প্রতিটি মানুষের সম্মুখদৃষ্টির চেয়ে অতীত-ঐতিহ্যপ্রীতিই বেশি। তাই অগ্রগতির আকর্ষণের চেয়ে পিছু টানের শক্তিই অধিক। তাই মানুষ অগ্র-পশ্চাতের টানাপোড়েনে অসঙ্গত, অযৌক্তিক-অবৌদ্ধিকভাবে একদিকে একবার এগিয়ে যায়তো অন্যদিকে বারবার পিছু হটে, দাঁড়িয়ে থাকে ধৈর্যে স্থৈর্যে তার আস্থা ছাড়তে মায়া ও ভয়, নতুন কিছু গ্রহণে বরণে তার দ্বিধা ও অনিশ্চিতির আশঙ্কা।

কাজেই এক একটা মানুষ স্বরূপে পুতুল, ষড়রিপু তাড়িত পুতুল, স্নেহ মায়া-মমতা-প্রেম-প্রীতি-রুচি-সৌন্দর্য চালিত পুতুল, ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ লিপ্সু পুতুল, অর্থ-বিত্ত-বিদ্যা-মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-প্রভাব-প্রতিপত্তি-দর্প-দাপট অর্জনকাঙ্ক্ষী পুতুল। কাঙ্ক্ষা-বাঞ্ছা-বাসনা চালিত মানুষ, ঈর্ষা-অসূয়া-রিরংসাতাড়িত মানুষ, ভোগে উপভোগে সম্ভোগে উৎসুক মানুষ, লিপ্সার, তৃষ্ণার, ক্ষুধার শিকার মানুষ, তাই সর্বার্থেই এবং সর্বাত্মকভাবেই পুতুল। এ-ই জীবন, একে জীবনতৃষ্ণাও বলা চলে, মানুষ দেহ-মনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা-লিপ্সা তাড়িত ও চালিত পুতুলমাত্র। কারণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা-লিপ্সা একবার চরিতার্থ হলে আবার প্রায় কিছুক্ষণ পরেই নতুন করে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-লিপ্সা জাগে। এই পৌনপুনিঃকতাই মানুষকে বৃত্তি-প্রবৃত্তিতাড়িত পুতুল বানিয়ে রেখেছে। এ জন্যেই কামে-ক্রোধে মানুষ মানবে প্রত্যাশিত সংযম-সহিষ্ণুতা হারায়। এক কথায় প্রলোভন প্রবল হলেই তা থেকে আত্মরক্ষা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। মানুষ তখন হেন অপরাধ-অপকর্ম নেই যা করে না, তখন মানুষ যে- কোনো হিংস্র প্রতিশোধপরায়ণ প্রলুব্ধ প্রাণীর চেয়ে অধিক হিংস্র প্রতিহিংসাপরায়ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামুক-লোভী রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তখন তার শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতা-সংযম-সহিষ্ণুতা-আত্মসত্তার মূল্য-মর্যাদা চেতনা কিছুকালের জন্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই মানুষে প্রাণিত্বেই বেশি, মনুষ্যত্ব কম, এবং মানুষের প্রত্যাশিত মানবতা বা মনুষ্যত্ব গুণে-মানে-মাপে-মাত্রায় কৃচিৎ কারো মধ্যে কখনো কোনো বিশেষ আবেগ চালিত মুহূর্তে দেখা যায় মাত্র। অতএব মানুষের মধ্যে প্রাণিত্বের হ্রাস এবং মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি না ঘটলে বিশ্বের মানুষ বৈশ্বিক আন্তর্জাতিক স্তরে কিংবা রাষ্ট্রাভ্যন্তরে স্বস্তিতে, শান্তিতে, শ্রমের ও পণ্যের বিনিময়ে সহ ও সমস্বার্থে সংযমে, পরমত-কর্ম-আচরণ সহিষ্ণুতায়, ন্যায়নিষ্ঠায়, বিবেকানুগত্যে যৌক্তিক বৌদ্ধিক পন্থায় সহযোগিতয় স্বাধিকারে নির্বিরোধ নির্বিবাদ না হোক. বিরোধ-বিবাদবিরল সহাবস্থান করতে পারবে না। মানবিক গুণের আধিক্যই মানুষের ব্যক্তি জীবনে বৃত্তি-প্রবৃত্তি তাড়িত পুতুলত্ব ঘোচাতে পারে অন্তত কমাতে পারে।

নির্লক্ষ্য জীবন নেই

AMARBOI.COM

ছেলেবেলায় যখন দু'চাকার বাইসাইকেল চড়তে ও চালাতে শিখতে গেলাম মাঠে, তখন প্রথম যে-কথা বললেন শিক্ষাগুরু তা আমার সারাজীবনের সবকাজেই কুঞ্জি হয়ে রয়েছে। তিনি বলেছিলেন দৃষ্টি প্রসারিত রাখবে দূরে, সাইকেলের দিকে তাকাবে না, তাকাবে সাইকেলের গতিপথের দিকে দূরে। পরে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েও উপলব্ধি করেছি যে, পায়ের আঙুলের ডগার উপর নজর রেখে চললে গতি যে শ্লথ করতেই হয়, তা নয়, আকস্মিক বাধা-বিঘ্ন-বিপদ দেখা দেয় চলার পথের খাদ, খন্দ, কাঁটা বা অন্যকিছুর বা কারো সঙ্গে ধাক্কার আকারে। দূরদৃষ্টি নিয়ে, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে, পরিণতি ও পরিণাম ভেবে, লাভ-ক্ষতি-স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন থেকে ভয়-লজ্জা-নিন্দার আশঙ্কা স্মরণে রেখে, নিজের ব্যক্তিগত বুদ্ধি-যুক্তি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য ও বিবেক অনুগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ বিফল হলেও প্রবোধ মেলে। আমাদের দেশে তাই বহুজনের অভিজ্ঞতালব্ধ আপ্তবাক্য প্রাবচনিক ও প্রাবাদিক মর্যাদায় গৃহীত ও সার্বক্ষণিক প্রয়োজনে ঘরে সংসারে উচ্চারিত ও আবৃত্ত হয় 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।' এর গর্ভে সব তাৎপর্য সব সতর্কবাণী নিহিত রয়েছে।

'কি করব এবং কেন করব'– এ বিবেচনাকে জীবনের নীতিরূপে, পুঁজি-পাথেয়রূপে গ্রহণ করলে সংসার জীবনে ব্যক্তি কমই ঠকে ও ঠেকে। কারণ কথায় বলে 'সাবধানের মার নেই।' কিংবা 'Look before you move' এ সব আপ্তবাক্য সত্যই জীবনে অনেক দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করে। তাছাড়া জীবন হচ্ছে লাভে লোভে স্বার্থে, ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে নানাকিছু করার, মানার, হওয়ার কাঙ্ক্ষা, অঙ্গীকার বা সঙ্কল্প আর তার বাস্তব সার্থক বা অসার্থক কিংবা সফল বা ব্যর্থ রূপায়ণ প্রয়াসমাত্র। তাহলে বাল্যে না হোক, কৈশোরে, যৌবনে এমনকি প্রৌঢ়ত্বে কি জানব, কি মানব, কি হব, কি করব, কেন জানব, কেন মানব, কেন হব এবং কেন করব তার একটা স্পষ্ট, সুষ্ঠু পরিকল্পনা আকাঙ্ক্ষার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশার, অঙ্গীকারের, আদর্শের, উদ্দেশ্যের বা লক্ষ্যের আকারে মনে মর্মে মগজে-মননে জাগরূক থাকা আবশ্যিক ও জরুরি। কারণ আমরা সবাই সুখ-আনন্দ-আরাম পেতে চাই। আমরা সবাই নিন্দা নয়, তারিফ পেতে চাই, আমরা সবাই আত্মদোষ গোপন রাখতে এবং স্বগুণ প্রচার করতে চাই। আমরা সমাজে গুণে-মানে খ্যাতিতে-ক্ষমতায় বিত্তে-বেসাতে, দর্পে-দাপটে, প্রভাবে-প্রতিপত্তিতে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে চাই। কিন্তু বিদ্যায়-বিত্তে, মনে-মর্মে-মগজে-মননে আর দেহের প্রাণের শক্তিতে সাহসে অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানসিকভাবে হার মানতে মানতে ক্রমে আকাঙ্ক্ষার সংখ্যা, পরিমাণ, পরিসর কমিয়ে কমিয়ে বাস্তবে যা সম্ভব ও সাধ্যানুগ বলে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ভাবতে, জানতে, বুঝতে ও করতে পারি, তার সীমাতেই নিজেকে আবদ্ধ করি। এভাবেই তিলে তিলে দিনে দিনে আমাদের অধিকাংশ মানুষের কাঙ্ক্ষার বিলুপ্তি ঘটে, স্বপ্নের সৌধ উবে যায় সাধের অবসান ঘটে। লক্ষে নিরানব্বই হাজার নয়শ নিরানব্বই জন এভাবে জীবনভাবনায় ও জগৎচেতনায় মার খেয়ে খেয়ে মৃত্যুর স্বল্পকাল পরেই বংশধরদের স্মৃতি থেকেও বিলুপ্ত হয়ে যায়। 'ভেনি, ভিসি, ভিডি' তাদের ক্ষেত্রে কখনো প্রযোজ্য হয় না। গুণের মানুষ না হলে ধনের ও মানের মানুষও পরিণামে এমনি বিস্মৃতির শিকার হয়ে একদা যে তার অস্তিত্ব ছিল, পদ-পদবী ছিল, স্থানিকভাবে দর্পদাপট ছিল, ভয়-ভক্তি-ভরসার পাত্র ছিল সে তা হারায়। 'কাল ঘসতি ভূতানি' 'কাল সবকিছু বিলীন করে' এ-ই চিরন্তন সত্য হয়ে দাঁড়ায়। নির্লক্ষ্য জীবন নেই। লক্ষ্যবিহীন কর্মপ্রয়াস নেই। কাঙ্ক্ষাই, অভাবই, প্রাপ্তিবাঞ্ছাই জীবনের চালিকাশক্তি। যে স্তরের বা মানের-মাপের-মাত্রারই হোক না কেন, মানুষের সংস্কৃতি-সভ্যতার রেশ ও রেশ মেলে অন্তত সাত/আট হাজার বছর আগে থেকেই। আজ পৃথিবীব্যাপী জীবন্ত মানুষের সংখ্যা পাঁচশত কোটিরও বেশি। কিন্তু বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক স্তরে কৃতী-কীর্তিমান মানুষ আজো করগণ্য। রাজ্যে বা রাষ্ট্রের ইতিহাসে ঠাঁই মেলে তেমন মানুষ ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখা যায়। লক্ষ লক্ষ কোটি মানুষ জন্ম-জীবন-মৃত্যুর পরিসরে হ্রস্ব-দীর্ঘ জীবন যাপন করে সর্বার্থে অনস্তিত্বে বিলীন হয়। তাতে কারো কোনো স্থায়ী ক্ষতিই হয় না– অস্থায়ী ক্ষতি হয় নিরন্ন অনাথ-অনাথার। কজেই কৃতী-কীর্তিহীন, গুণহীন মানুষের জীবন হচ্ছে বুনোফুল বা কুসুমের সঙ্গে তুলনীয় কিংবা আমের বোলের সঙ্গে। সংখ্যায় অঢেল অজস্র, কিন্তু অদেখা, অজানা এবং নিষ্ফল বলেই কবির দরদী ভাষায়, হায়রে জীবন/মানব জীবন/ফুল ফোটা, ফুলঝরা/মাত্র অন্যের কাছে তার কোনো মূল্য মর্যাদা নেই। অবশ্য নিজের কাছে প্রাণ মাত্রই অমূল্য সম্পদ। জীবন পরম ধন। জীবনে আর কিছু না থাক, আছে নিদ্রার প্রশান্তি আর যৌন সম্ভোগের সুখ। এজন্যেই নিঃস্ব-নিরন্ন-রুগ্ন মানুষও মরতে চায় না। আপাতদৃষ্টিতে জীবনধারণ রাষ্ট্রনায়ক থেকে পথের ভিখারী অবধি সবার পক্ষেই বাধা-বিঘ্ন বিপদ-আপদ, বাঞ্ছার অপূর্তি বহুল হলেও তবু জীবনে দুঃখানুভূতির চেয়ে সুখানুভবের পরিমাণ বেশি। তাই জীবন অভাব দুশ্চিন্তা ও রোগমুক্ত না হলেও জীবন সুন্দর, জীবন মধুর, পৃথিবী আকর্ষণীয়। ফলে সবাই দীর্ঘ জীবনকামী।

আমাদের দেশের লোকেরাও শৈশবে-বাল্যে-কৈশোরে-যৌবনে বুকে নানা সাধ পোষণ করে, মনে-মর্মে ধারণ করে বিভিন্ন স্বপ্ন। ভাবী জীবন গড়ার ও জীবনে ভোগ-সম্ভোগের এসব সাধ ও স্বপ্ন এদের মধ্যেও কারো পূরণ হয়। অতএব কি হব, কি করব,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি জানব, কি মানব এবং কেন হব, করব, জানব ও মানব এদের জীবনস্বপ্নের ও সাধের উৎস ও ভিত্তি। পার্থক্য ও ভিন্নতা কেবল অবস্থা ও অবস্থানগত। প্রাজন্মক্রমিক ভাবে দুস্থ দরিদ্র ও অশিক্ষাদুষ্ট সমাজভুক্ত হওয়ায় এদের মধ্যে নৈতিক-আদর্শিক দার্ঢ্যের এবং রুচি-সংস্কৃতির প্রত্যাশিত মানের, আত্মসত্তার মূল্য-মর্যাদা চেতনার, অন্যায়ের ও অন্যায়কারীর প্রতি ঘৃণা-অবজ্ঞার এবং নিজেদের মধ্যেও অপরাধের-অপকর্মের ঘৃণা-লজ্জা-নিন্দা ভীতির উন্মেষ ঘটেনি। ফলে নিজের মধ্যে সব লাভ-লোভ-স্বার্থচেতনা সংযত ও স্বাধিকারে সীমিত রাখার মতো রুচি-সংস্কৃতি ও আত্মসম্মানবোধ জাগেনি আমাদের মধ্যে। এ কারণে আমাদের মধ্যে অতি-আদর্শ-চেতনা, যুক্তিনিষ্ঠা, সংযম, পরমত-পরকর্ম পরআচরণ সহিষ্ণুতা, সততা, পরার্থপরতা, বিবেকানুগত্য ও সৌজন্য প্রভৃতি গুণের একান্ত অভাব। আমরা ধনের ও মানের মানুষ হতে চাই, গুণের মানুষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে দুর্লভ। ধনে আমরা অহঙ্কারপুষ্ট হয়ে গৌরব-গর্ব করি, মান পেতে আমরা ক্ষমতার পদ-পদবী অর্জনের জন্যে ঘৃণা-লজ্জা-সংকোচ পরিহার করি। ক্ষমতাবানের পদসেবা করি, আবার ক্ষমতা দেখানোর জন্যে অন্যের মাথায় পা রাখি। আমাদের মানের উৎস, ভিত্তি, পুঁজি, পাথেয় হচ্ছে জোর-জুলুমের শক্তি ও সাহস। গুণের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিজাত যে মান গুণী মানুষ গুণ-গৌরব রূপে পেয়ে থাকেন, তার মূল্য-মর্যাদা গুরুত্বচিরন্তনতা ও অকৃত্রিমতা এদের তা বোধ-বুদ্ধির আয়ত্তে আসেনি আজো। তাই তারা নগদপ্রাপ্তিতে আপাত সুখের প্রত্যাশী– স্থায়ী মানের কাঙ্ক্ষী নয়। তারা চায় কৃপা-করুণা করার এবং ভয়-ত্রাস সৃষ্টির শক্তির অধিকারী হয়েই তুষ্ট থাকতে। ভক্তি-শ্রদ্ধা-সুনামে তাদের আকর্ষণ নেই।

এসব কারণেই আমাদের সামাজিক জীবনে নেই শান্তি-শৃঙ্খলা-নিরুপদ্রবতা-নিরাপত্তা, ব্যবসায়িক জীবনে ভেজালে বঞ্চনা-প্রতারণাই পুঁজি, প্রশাসনে স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাত, ঘুষ প্রভৃতিই চালিকাশক্তি। রাজনীতিক জীবন হচ্ছে জুয়া-জোচ্চুরি তুল্য। আমাদের সর্ব শাখায় সাংস্কৃতিক জীবন হচ্ছে সুবিধাবাদীর, সুযোগসন্ধানীর ও নগদ-জীবীর। সবাই যেন ঘোলাজলে মাছ শিকারীর মতো স্বভাবে আমরা হয় বক কিংবা কমঠ। গ-পা বাঁচিয়ে ঝোপ বুঝে কোপ মারাই আমাদের নীতি-প্রকৃতি।

নিয়তি না নির্মিতি!

প্রসবকালে প্রসূতি মরে নিয়তি অমোঘ বলেই, মাতৃগর্ভে শিশু মরে নিয়তি লীলা নির্দিষ্ট বলেই, সদ্যোজাত শিশু মরে নিয়তি অপ্রতিরোধ্য বলেই। বন্যায় দেশ ভাসায়, খরায় মাটি চৌচিড় করে, ঝড়ে ঘর ভাঙে, গাছ উৎপাটিত হয় নিয়তির রোষে, মানুষের কোনো হাত নেই। ব্যক্তিরও কপালে যা আছে তা-ই ঘটে। সব আসমানী অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির রোষ-ক্ষোভ কিংবা কৃপা-করুণা প্রকটিত হয় কখনো আকস্মিকভাবে কখনো বা আভাসে ইঙ্গিতে সতর্ক করেই। এর সঙ্গে মানুষের ধারণা গ্রহ-নক্ষত্র, দিন-ক্ষণ-তিথি-মাস-রাতদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং বিভিন্ন রাশির প্রভাবও থাকে ক্রিয়াশীল। তাছাড়া স্রষ্টা ঈশ্বর বা ইষ্টদেবতা তো আছেনই ভক্তের, সৃষ্ট প্রাণীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে সদা তৎপর। অথবা জন্মপূর্বেই ব্যক্তির জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা নীলনকশার মতো অবিমোচ্য কিংবা অমোঘভাবে তৈরিই থাকে, জীবনে তা ধরাবাঁধা পথে ব্যক্তি তার নিজ জীবনের স্থপতি কিংবা ভাস্কর রূপে রূপায়িত বা বাস্তবায়িত করে মাত্র। সেজন্যেই বলা হয় মনুষ্যজীবন স্বনিয়ন্ত্রিত নয়, লীলাময়ের লীলার পাত্র মাত্র, তিনি যেমন খেলান, তেমনি খেলে মানুষ। মানুষের হাতে কিছুই নেই, মানুষ নিমিত্ত মাত্র বাহ্যত, কার্যত সে-অদৃশ্য শক্তি পুতুল নাচায় হাসায় কাঁদায়।

পুনঃপুনঃ জন্মান্তরে দৃঢ়প্রত্যয়ী হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈনরা বিশ্বাস করে যে, পূর্বজন্ম জীবন মৃত্যুর পরিসরে তারা যেসব সুকৃতি কিংবা দুষ্কৃতি করে তারই ফল ভোগ করে পরবর্তী জন্মোত্তর জীবনে। কাজেই পরীক্ষায় ফেল করে পূর্ব জীবনের দুষ্কর্মের ফলেই, পাস করে পূর্বতন জীবনের কোনো সুকৃতির দরুনই। এককথায় এদের জীবনের অধিকাংশ সাফল্যের ও ব্যর্থতার জন্যে দায়ী পূর্ব জীবনের সুকৃতি-দুষ্কৃতিই । এরই অপর নাম অদৃষ্ট বা কপাল কিংবা বরাত।

আমাদের দেশে সুপ্রাচীন কাল থেকেই দেও দানো ভূত পিশাচ পরী প্রভৃতি দিনের বেলায় পেচক-হুতুম-বাদুড় ছুঁচো প্রভৃতির মতো আত্মগোপন করে থাকলেও সূর্যাস্তের পর থেকে সূর্যোদয়ের আগ অবধি রাত্রিকালে এরাই বিশেষ করে ভূতই মর্ত্যে রাজত্ব করে। তখনই মানুষ নানাভাবে ভূতে পায়। ভূত কারো কারো ঘাড়ে চাপে, দিনেও তাদের ঘোড়সওয়ারের মতোই চালিত করে। জীন-পরী-প্রেতের 'আসর' কুদৃষ্টি পড়লে কিংবা প্রেম-পাত্র-পাত্রী হলে কোনো কোনো নারী-পুরুষ পাগলের মতো অস্বাভাবিক আচরণ করে। কাজেই ভূত-প্রেত-জীন- পরীও ঈশ্বর ও রাশির মতো মানুষের প্রাত্যহিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। অবশ্য এখন শহরে শহরে ভূত-প্রেত-জীন-পরী আর শ্মশানে গোরস্তানে, বট-অশ্বথ-তাল-তেঁতুল গাছে থাকে না, শকুনের মতোই শহর ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু গ্রামে এখনো রয়েই গেছে, তবে আশা করছি, টিভি-ভিসিআর-ক্যাসেট-ডিস অ্যান্টেনার বদৌলত ওরা শিগগিরই গ্রামও ছাড়বে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রসারে এর মধ্যেই মৃত্যু ঘটেছে তিন দেবতার– ওলার, শীতলার ও ষষ্ঠীর।

কিন্তু আমাদের মতো কাল্পনিক ভয়–ভক্তি-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা চালিত মানুষের মন-মগজ-মনের ভূত কে ছাড়াবে। এ ভূতই তো আমাদের জগৎভাবনা, জীবনচেতনা সম্বন্ধে ও সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও অন্বেষা থেকে বিরত রাখে। আমাদের অর্জিত জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিজ্ঞতা-অভিজ্ঞতা-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগে জীবন কি, জগৎ কি, জীবন কেন প্রভৃতি যাচাই-বাছাই ঝাড়াই করতে দেয় না সেই আশৈশব শ্রুত, দৃষ্ট, লব্ধ ইহ-পরজগতে প্রসৃত কাল্পনিক ভয়ে-ভক্তি-ভরসা-বিশ্বাস-সংস্কার ধারণা চালিত গতানুগতিক জীবনাচারে সারাটা জীবন শিক্ষিত-অশিক্ষিত নারী-পুরুষকে অভ্যস্ত, আশ্বস্ত আর নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত রাখে। আমাদের অনগ্রসরতার, মানসিক জীবনে সমকালীন জগৎ বিচ্ছিন্নতার সমস্যার কারণ নিহিত এখানেই। আমরা বাস করি একালে, কিন্তু আমাদের মানস বিচরণ ঘটে আমাদের শাস্ত্রের উদ্ভবের কালে ও দেশে। আমরা ইহুদি-খ্রীস্টান, ব্রাহ্মণ্যবাদী নির্বিশেষে অধিকাংশ মানুষ হচ্ছি অতীত ও ঐতিহ্যমুখী, আমাদের নাভিমূল সেই শাস্ত্রের কালে ও দেশে আর সমাজে রয়েছে প্রোথিত, আমরা সেখানে থেকেই আমাদের প্রাত্যহিক চিন্তা-চেতনা-কর্ম-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচরণের দিশারূপ জীবনরস আহরণ করি। এর ফলেই ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রিক মতের দু'ব্যক্তি পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেও যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগে ও জীবনদৃষ্টিতে মেরুর ব্যবধানে বাস করি। আস্তিকে আস্তিকে তাই আপোস হয় না মতে পথে চিন্তায় চেতনায়। চিন্তার বাহ্য সাদৃশ্য অভিন্নতার সাক্ষ্য-প্রমাণ নয়।

অথচ এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে যন্ত্রনির্ভর ও যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জীবনেও সমাজে নিত্যকার সম্পর্কে এসেছে সহগামিতার, সহচারিতার, সহকর্মিতার, সহযোগিতার, শ্রমের ও পণ্যের বিনিময়ে সহাবস্থানের আবশ্যিকতা বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিকস্তরে। একালে বিচ্ছিন্নতায় স্বাতন্ত্র্যে কেউ বাঁচতে পারে না, চেষ্টা করেও পারবে না। কিন্তু মন-মগজ-মনন অধিকাংশ মানুষ অননুশীলনে বন্ধ্য রেখেছে বলেই এখনো কালবিরুদ্ধ জাতজন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা গোত্র গোষ্ঠী মতবাদী সম্প্রদায় ও নিবাস চেতনা ও স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধিজাত দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রাষ্ট্রাভ্যন্তরে এবং বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ সম্পর্ক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ-বিবাদের আকারে নানা সমস্যার দুঃখের ও ক্ষতির কারণ হয়ে রয়েছে। এখন মনে রাখতে হবে একটি সত্য কথাই 'আ ম্যান ইজ দি আর্কিটেক অব হিজ অওন ফরচুন' সর্বসংস্কার মুক্ত হয়ে মুক্ত চিন্তকরাই বা ফ্রিথিংকারেরাই একালে মানুষকে মর্ত্যজীবনে সচেতনতা প্রেয়স ও প্রেয়সকামী বিবেকী ব্যক্তি করে তুলতে পারে, গড়তে পারে সংযত, উদার, পরমত-কর্ম-আচরণ সহিষ্ণু, ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ। রেডিও-টিভি-কম্পিউটার, চলচ্চিত্র প্রভৃতি এখন প্রচার-প্রচারণা মাধ্যম মানুষকে মুক্ত মনে যৌক্তিক বৌদ্ধিক জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ করে তুলতে পারে। যে করেই হোক, হৃতপ্রয়োজন বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করতেই হবে– নির্বিশেষ মানবিক গুণের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে, নইলে একালে অতি আবশ্যিক বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে মানুষকে চিন্তায় চেতনায় কর্মে আচরণে বিশ্বের নাগরিক করে গড়ে তোলা যাবে না। একালে আকাশচারী মানুষকে আকাশের মতো সীমার বেষ্টনীমুক্ত মন-মগজ-মনন ও রুচি নিয়ে জীবন যাপন করতে হবে। অবশ্য ইতোমধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালেই বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার স্বাতন্ত্র্যের দেয়াল ভাঙছে পদ্মার পারের মতোই।

AMARBOI.COM

মগজী অবদানে পৃথিবী ঋদ্ধ– হার্দিক অর্জনে ব্যর্থ

আমরা যদি জানি, বুঝি ও মানি যে, দুনিয়াতে যা কিছু সৃষ্ট, নির্মিত, পরিত্যক্ত ও অভিব্যক্ত সবটাই আত্মপ্রত্যয়ী উচ্চাশী শক্তিমান সাহসী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিরই লোকগ্রাহ্য সৃষ্টি, নির্মাণ, পরিব্যক্তি ও অভিব্যক্তি, এবং এ-ও মানি যে রাজ্য, রাষ্ট্র, হাতিয়ার, যন্ত্র, তৈজস প্রভৃতি সর্বপ্রকার ব্যবহারিক জীবনের চাহিদা পূরণের উপকরণ এবং সাহিত্য-চিত্র-সঙ্গীত-ভাস্কর্য-স্থাপত্য-দর্শন-বিজ্ঞান আর নানা প্রকারের আবিষ্কার-উদ্ভাবন-নির্মাণ-সৃষ্টি মাত্রই অনুশীলিত পরিশীলিত মগজী অবদান, তা হলেও সে-মগজের অবদান দ্বিবিধ ভালো ও মন্দ গণমানবের সুখ-অসুখের, লাভ-লোকসানের, শান্তি-অশান্তির, স্বাধীনতা-অধীনতার মাপে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সলোমন থেকে হিটলার অবধি যাঁরাই পেশীশক্তি প্রয়োগে নররক্ত ঝরিয়ে পরভূম কেড়ে মহাবীর রূপে জগৎ-ত্রাস আলমগীর কিংবা 'জাহাঁপনা' হয়েছেন, তাঁরাও সমকালের মানুষের আনুগত্য ও তারিফ পেয়েছেন। খ্যাতিতে ক্ষমতায়, মানে-যশে-দর্পে-দাপটে, প্রভাবে-প্রতিপত্তিতে, গুণে-গৌরবে, কৃতি, কীর্তিগর্বে অনন্য, অতুল্য অসামান্যরূপে এমনকি আসমানী শক্তির মদদপুষ্ট প্রিয়জন রূপেও হয়েছেন প্রশংসিত ও মান্য দিগ্বিজয়ীর সম্মান আজো রয়েছে তাঁদের অক্ষুণ্ন। সেনাবাহিনী আজো নরহত্যাব্রতীরূপে নিন্দিত নন, রাষ্ট্রসীমা রক্ষাকারী কিংবা বর্ধনকারী অথবা রাষ্ট্রাভ্যন্তরে দ্রোহী হন্তারূপে আজো নন্দিত দুনিয়ার সর্বত্র। আগে দিগ্বিজয় ছিল আক্ষরিক অর্থেই ভূখণ্ড জয়, পররাজ্যহরণ–রাজাবিতাড়ন বা হনন। এখন রাজার রাজ্য নেই সনাতনী অর্থে কিন্তু রাজ্যরাষ্ট্র হয়েও জনগণের সম্পদ হয়েও রাষ্ট্র শাসকের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে দেহাংশে অস্ত্রোপচারে বিখণ্ডিত বর্জন ও বদল করেও আবার তাকে জিইয়ে রাখা যায়, তেমনি সূক্ষ্ম ব্যবস্থায় আর্থ-বাণিজ্যিক-মহাজনী আধিপত্যবাদ বা সাম্রাজ্যিক স্বার্থ ও শোষণ বজায় রাখা হয় একালে।

অনুশীলনে পরিশীলনে কেবল মগজের নয়, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুপ্ত-সুপ্ত শক্তির অসামান্য বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন করা যায়– কেউ কেউ তা সযত্ন চর্যায় চর্চাও করে থাকে। সুপ্রাচীন যোগতান্ত্রিক সাধনার কথা আমরা শুনেছি। একালে ক্রীড়ায় সার্কাসে শারীর শক্তির বিস্ময়কর বিচিত্র প্রদর্শনী আমরা দেখে থাকি। মানুষের মগজের শক্তিও শারীর শক্তির হাজার লক্ষগুণ বেশি। নইলে ঘরে বসে কাগজে কলমে হিসাব করে গ্রহ নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন কি করে বিদ্বান গবেষকরা! এ মগজী বুদ্ধির প্রয়োগেই তো রক্ত মাংসের চোখে দেখা মানুষ, ঘরের সন্তান অসামান্য হয়ে ওঠে গুণে গৌরবে শক্তিতে-বুদ্ধিতে নৈপুণ্যে দক্ষতায়। এভাবেই কোনো মানুষের পরিব্যক্ত বুদ্ধির প্রয়োগে জল-স্থল-আকাশ আজ মানুষের জ্ঞানের ও গমনের আয়ত্তে, যন্ত্রের প্রয়োগে ব্যবহার্য ও নিয়ন্ত্রিত। বেতার-টিভি-স্যাটেলাইট-ফ্যাক্স-কম্পিউটার প্রভৃতি তার-বেতার যন্ত্রই মানুষের এ অশেষ মগজী শক্তির কিছু কিছু নমুনা মাত্র। পৃথিবীর সব রাষ্ট্রে শক্তিমান মগজী মানুষেরা নিষ্ঠ গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলে শুধু সমুদ্র-পর্বত-অরণ্যে নয়, মাটির ও নভের জ্যোতিষ্কমণ্ডলের নয়, ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুতেও আরো অনেক অজ্ঞাত শক্তির প্রয়োগ সম্ভব হবে ক্রম আবিষ্কারে আবিষ্কারে।

বস্তুজগতে একালে উচ্চাশী আত্মপ্রত্যয়ী মানুষের নানা স্বপ্ন ও সাধ, নানা অভিপ্রায় নিষ্ঠ একাগ্র সাধনায় বাস্তবায়িত হয়েছে, হচ্ছে, তা মারণাস্ত্রের আকারে হোক, কিংবা রোগ-মৃত্যু ঠেকানোর লক্ষ্যেই হোক অথবা নিছক অপার্থিব কৌতূহল নিবারণের জন্যেই হোক। মানুষ এভাবে জ্ঞানী হয়েছে, বিজ্ঞ হয়েছে, অভিজ্ঞ হয়েছে, হয়েছে প্রজ্ঞাবানও। বোঝা যাচ্ছে ঋজুমেরুর হাতওয়ালা মানুষ তাদের সামবায়িক জীবনে দায়বদ্ধতা কিংবা অঙ্গীকার সচেতন হয়ে মগজ খাটাতে থাকলে তার পক্ষে অসম্ভব কিছু থাকবে না। বলতে গেলে ১৮৭০ থেকেই মানুষের আবিষ্কার উদ্ভাবন সৃষ্টি ও নির্মাণ প্রয়াস অবিচ্ছিন্ন ও পরিকল্পিতভাবে শুরু হয়েছে এক এক গবেষকের কিংবা নির্মাতার একাগ্র সাধনার বিষয়রূপে। এরপর থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের-যন্ত্রের-প্রকৌশলের-প্রযুক্তির-মারণাস্ত্রের, যানবাহনের, চিকিৎসাবিজ্ঞানের জীব-উদ্ভিদাদি সর্বপ্রকার বস্তুর বা পদার্থের ও প্রাণীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুণাগুণ সন্ধিৎসার ও অন্বেষার কাজ করে যাচ্ছেন গবেষকরা ইউরোপে-আমেরিকায় ধনী রাষ্ট্রগুলোর আর্থিক প্রবর্তনায় ও ব্যক্তিক প্রেষণায়। আজ-মানুষের শ্রমের ও সময়ের বহুব্যয় ও অপব্যয় বন্ধ হয়েছে, হচ্ছে, জীবনযাত্রায়-জীবন ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে এসেছে বৈচিত্র্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও সহজতা। আয়ু বেড়েছে, রোগমুক্তি সহজে হয়েছে, বিনোদনের বিষয় ও ক্ষেত্র পেয়েছে প্রসার। পৃথিবী এসেছে যোগাযোগের ক্ষেত্রে জনপদের সীমায়। ঘরে বসে শয্যাশায়ী থেকেও গোটা পৃথিবীর যে-কোনো ঘটনার ও অনুষ্ঠানের অকুস্থল দেখা যায়। পৃথিবীর যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে প্রয়োজনে কথা বলা চলে। এ জীবন আগেকার রূপকথায়ও ছিল কল্পনাতীত।

আজ মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বিশ্বজগৎ সৃষ্ট কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে-ওঠা আকস্মিকভাবে, এ সবের সপ্রমাণ মীমাংসায় আগ্রহী। বিগত কয়েক হাজার বছর ধরে মানুষ শাস্ত্রিক সত্যে গুরুত্ব দিয়ে পারত্রিক জীবনকেই সত্য ও স্থায়ী বলে জেনেছে বুঝেছে মেনেছে। এখন সে মর্ত্যজীবনকেই বাস্তব ও সত্য বলে মানে, পারলৌকিক জীবনে তার বিশ্বাস দৃঢ় আস্থাভিত্তিক নয়, সন্দেহ-সংশয়-জিজ্ঞাসা থেকেই যায়। কেননা তা কেবল শোনাই আছে সবার, জানা নেই কারো। প্রতীচ্যজগতে শাস্ত্রানুগত belief (বিশ্বাস), Faith (ভরসা), Trust (আস্থা) দ্রুত বিলুপ্ত হচ্ছে, নাস্তিক, নিরীশ্বর তো হচ্ছেই, সমকামিতাও প্রসার লাভ করছে। এগুলো নাস্তিক্য-নিরীশ্বরতার এবং জাগতিক জীবনে আস্থারই সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ।

সাহিত্যের সঙ্গীতের বিজ্ঞানের দর্শনের ইতিহাসের সমাজবিজ্ঞানের বিচিত্র বিকাশ ও বিভিন্নমুখী উৎকর্ষও গুণে মানে মাপে মাত্রায় কম হয়নি গত দুশ' বছর ধরে। আর শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ হওয়ার, মানুষ গড়ার, মানুষ রাখারই নীতিনিয়মের, রীতিরেওয়াজের, প্রথাপদ্ধতির ও বিধিনিষেধের নিগড়ও রয়ে গেছে পূর্ববৎ। শাস্ত্রের ও দর্শনের লক্ষ্য নাকি 'সুপারম্যান' বা ইনসান আল কামেল কিংবা মুনি-ঋষি রূপে ব্যক্তির মধ্যে শাস্ত্রকে প্রমূর্ত করে তোলা। তবু বিজ্ঞানে দর্শনে সাহিত্যে সমাজবিজ্ঞানে মানুষের মগজী বিকাশ ও প্রকাশ যতো বিস্তৃতভাবে ঘটেছে, বাস্তবে ব্যক্তিমানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচারে-আচরণে ও বিবেক বিবেচনায় তার সিকি পরিমাণও ঘটেনি, ফলে প্রত্যাশার ও প্রাপ্তির মধ্যে রয়ে গেছে আসমান-জমিনের তফাত। মানুষ যতোটা প্রাণী ততোটা মানুষ নয়, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে অধিকাংশই প্রাণী বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত এবং মানবিকগুণের অনুশীলনে ও পরিচর্যায় অনীহ। তার উপর অন্যসব প্রাণী সহজাত প্রবৃত্তি চালিত বলেই নিয়ম-নিগড়ের সীমার মধ্যেই থাকে। মানুষ আত্মনিয়ন্তা বলেই দোষের ও গুণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাতে পারে ইচ্ছেমতো এবং ঘটায়ও। ফলে মানুষের ভালোত্বের যেমন তুলনা নেই, তেমনি কামে ক্রোধে লাভে লোভে স্বার্থে করে না, করতে পারে না, মানুষ হেন অপকর্ম দুনিয়াতে নেই। এ জন্যেই কোনো কোনো মানুষের মতো পরার্থপরও অন্যপ্রাণী যেমন 'ডলফিন' বা পোষা কুকুর, বানর, পায়রা প্রভৃতি হতে পারে। কিন্তু মানুষের মতো হিংস্র ও প্রজন্মক্রমে গৌষ্ঠীক গৌত্রিকভাবে প্রতিহিংসাপরায়ণ কোনো শ্বাপদাদি প্রাণী হতেই পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মে খাদ্য-খাদক সম্পর্কজাত শত্রুভাব থাকে মাত্র।

সুপারম্যান, ইনসান আল কামেল, মুনি-ঋষিতুল্য আদর্শ মানুষ তা স্বপ্নের ও সাধের হলেও বাস্তবে প্রত্যাশিত নয়, একালে প্রাপ্তি সম্ভব নয় বলে এবং প্রয়োজনীয় নয় বলেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ন্যূনতম মানবিক গুণ ও গুণশূন্য মানুষে প্রত্যাশিত নয়? মানিবকতা, মানবতা, মনুষ্যত্ব কি কেবল বাকে বাক্যেই চালু থাকবে? কারো চরিত্রে, আদর্শে, কর্মে, আচারে-আচরণে রূপায়িত হওয়া কি দেশ-কাল-সমাজ-সরকারের ও রাষ্ট্রের কল্যাণের কাম্য নয়?

এদিক দিয়ে বলতে গেলে আজকের মনুষ্য সমাজ টানাপোড়েনে সমতা হারিয়েছে। আগের কালে অজ্ঞ-অনক্ষর নিয়তি-নির্ভর ভীরু লোকেরা অদৃশ্য ভূত-প্রেত-পিশাচ-জীন-পরী-ভগবান-ঈশ্বর-শয়তান-মার-তিথি-ক্ষণ-নক্ষত্র-রাশি প্রভৃতির ভয়ে-ভরসায় সতর্ক-সংযত-সহিষ্ণু জীবনযাপন করত। একালে বিজ্ঞান ও যন্ত্র মানুষকে ঐহিক জীবনে গুরুত্বদানে অনুপ্রাণিত করেছে, নীতি-শাস্ত্রবাদীদের ভাষায় প্ররোচিত করেছে, নিত্য করছে সার্বক্ষণিকভাবে। তাই মর্ত্যজীবনই সত্য ও বাস্তব। তাই কল্পিত অনুমিত শ্রুত স্বর্গ-নরক তাদের আগের মতো ভয়ে-ভরসায় আকৃষ্ট করে না। এজন্যে গতানুগতিক নীতিতে নিয়মে রীতিতে রেওয়াজে, প্রথায় পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ও নিষ্ঠ থেকে আজকাল যন্ত্রনির্ভর যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রায় কেউ আর জীবন যাপন করে না। ঘুষ গ্রহণে, মিথ্যাশপথে, মিথ্যাসাক্ষ্যদানে, নরহত্যায়, প্রতারণায় আপাত কোনো আকস্মিক জান-মান হানির আশঙ্কা থাকে না। পাপ হয়তো এখনো হয় এমনি মনোভাব আমজনতার মধ্যে দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। তাই আজকের মানুষের মধ্যে পাপভীতি নেই বা কম, প্রাপ্তিপ্রীতিই বেশি। ফলে আজকের দিনে জীবিকাক্ষেত্র প্রসৃত হয়েছে কালোজগতে ও কালোবাজারে। বঞ্চনা-প্রতারণা জোর-জুলুম হুকুম-হুমকি-হামলাযুক্ত হয়েছে পূর্বেকার শাসন-শোষণ-পীড়ন-প্রতারণা-বঞ্চনার চালুনীতি রীতির সঙ্গে। পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিমান অস্ত্র-বিক্রেতা রাষ্ট্রগুলো পূর্বে রুশ-মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতিযোগিতায় তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিরোধ-বিবাদ জিইয়ে রেখেও মৌসুমী উস্কানি দিয়ে লড়াকু করে তুলে নিজেদের অস্ত্র বিক্রয় করত নগদ দামে। এখন মার্কিন সরকার স্বঘোষিত বিশ্বনেতৃত্বে অধিষ্ঠিত। তাই তৃতীয় বিশ্বের সব রাষ্ট্রের অভিভাবকত্বের ও তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বকাঁধে নিয়ে মার্কিন সরকার রাষ্ট্রগুলোর অবিভাবনায়, তত্ত্বাবধানে, তদারকিতে ও নজরদারিতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে-আর্থ-বাণিজ্যিক-মহাজনী আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ-হুকুম-হুমকি-হামলা-দলন-দমন ক্ষমতা স্বহস্তে রেখেছে নির্বিবোধে ও অবাধে। তাই তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো পরস্পরের মধ্যে বিরোধ-বিবাদ ও সাময়িক লড়াই চালু রেখে আত্মবিকাশের আত্মোন্নয়নে বিমুখ হয়ে ক্রুদ্ধ প্রাণীর মতো কলহে লড়াইয়ে আত্মহননের পন্থা গ্রহণে সহজেই প্ররোচিত হয়। আজ গোটা পৃথিবী রাষ্ট্রিক ও সরকারি স্তরে অস্থির, অশান্ত, দাঙ্গা-লড়াই বিক্ষত।

আমরা আমাদের স্বদেশে, স্বসমাজে ও স্বরাষ্ট্রে এখন মার্কিন অভিভাবকত্বে, বিশ্বব্যাংকের তত্ত্বাবধানে এনজিও'র সেবায় ও নজরদারিতে আর মার্কিন দূতাবাসের খবরদারিতে বাস করছি। আমাদের সরকার তাই নামত গণতান্ত্রিক সরকার হলেও সীমিত শক্তির মুৎসুদ্দী সরকার মাত্র। অতএব পৃথিবী আজ মানুষের মগজী অবদানে ঋদ্ধ গর্বিত, তাতে মানুষ প্রত্যাশিতমাত্রায় চিত্তবান হয়নি। তার ফলেই হার্দিক অবদানেও রিক্ত। নানা কারণ-কার্য প্রভাবিত বিশ্বে বিজ্ঞানে দর্শনে-সাহিত্যে-শিল্পে সংগীতে তত্ত্বে, তথ্যে, সত্যে মগজী বিকাশ ও বিস্তার ঘটলেও সমতালে মানুষের মধ্যে মানবিক গুণের, মানবতার, মনুষ্যত্বের আনুপাতিক উন্মেষ-বিকাশ-উৎকর্ষ ঘটানো সম্ভব হয়নি। প্রত্যাশার ও প্রাপ্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে রয়েছে আসমান-জমিনের কিংবা মেরুর ব্যবধান। আমরা মানুষের মধ্যে ইতোমধ্যে ষড়গুণ প্রত্যাশা করেছিলাম সহ ও সমস্বার্থে সংযম, পরমত-কর্ম-আচরণ সহিষ্ণুতা, যৌক্তিক-বৌদ্ধিককর্ম-আচরণ, ন্যায়নিষ্ঠা, বিবেকানুগত্য ও সৌজন্য। বাঞ্ছা পূরণ হয়নি, হবে কি শিগগির?

নির্বিশেষ মানববাদই কাম্য

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম ষোলআনা ইউরোপভক্ত বাঙালী। তিনি ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনার জারকে সাহিত্য সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হন। ইউরোপীয় আদলে বাঙালী রুচি-সংস্কৃতি গড়ে তোলায় উৎসাহী হন। ম্যাকলীয় ভাষায় তিনি বর্ণে অবয়বে দেশী, কিন্তু মনে মর্মে মগজে মননে, চিন্তা-কর্ম-আচরণে ও চরিত্রে বাঙালীকে ইংরেজ বানাতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইতিহাস সচেতনতা ছিল গাঢ় গভীর। তাঁর উপন্যাসগুলোতে কালানুক্রমিকভাবে না হলেও ধারাবাহিকভাবে তেরো শতকের তুর্কী বিজয় থেকে ব্রিটিশ আমলের ব্রাহ্মমতের প্রতিষ্ঠা অবধি সাতশ' বছরের বাঙালীর রাজনীতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনধারার একটা আলেখ্য রয়েইছে, তা যতই কাল্পনিক ও রোমান্টিক হোক না কেন! পরবর্তীকালে আমরা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও দেখি প্রকৃতিলগ্ন জীবন ও সমাজ চিত্রদানের ছলে অঘোষিতভাবে উনিশ-বিশ শতকের শতবছরের বাঙালী গ্রামীণ ও শহুরে জীবনের অর্থে-বিত্তে-বেসাতে নিঃস্বতায় নিরন্নতায়-দুস্থতায়-দারিদ্র্যে, সম্পদে-চরিত্রে-রুচিতে-সংস্কৃতিতে, ভাবে-চিন্তায়-কর্মে-আচরণে বিবর্তনধারার ইতিবৃত্তান্ত বয়ান করেছেন। জীবন প্রতিবেশের পরিবর্তনে যে জীবনাভূতির, জীবনভাবনার ও জগৎচেতনার পরিবর্তন ঘটে তা বঙ্কিমের ও বিভূতিভূষণের রচনায় গুহায়িত নেই। তবু কিন্তু মানবতার, মানুষের মানবিক গুণের প্রসার নিতান্ত মন্থর। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা ও ইংরেজি সাহিত্যে প্রকটিত জীবনদৃষ্টি জগৎচেতনার পারিবেশিক উৎস ও ভিত্তি জেনেছিলেন, এবং বাঙলা ও ইংরেজি সাহিত্যের ব্যবধান যে আসমান-জমিনের, ইংরেজি না-জানা বাঙালীর ও ইংরেজি শিক্ষিত সচেতন বাঙালীর চিন্তা-চেতনায়, মনে-মর্মে, মগজে-মননে পার্থক্যও যে দুই মেরুর তাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তিনি নিঃসংশয়ে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন যে, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙালীর কবি, ঈশ্বরগুপ্ত বাঙালীর, কবি .... ঈশ্বরগুপ্ত খাঁটি বাঙালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ,...বাঙালী কবি আর জন্মিবে না, জন্মিয়া কাজ নাই এবং ডাহা ইংরেজ মধুসূদনেই এবং তাঁর অনুসারীদের উপরই ছিল তাঁর ভরসা। তাই দেশবাসীকে মধুসূদনের মৃত্যু উপলক্ষে লেখায় শ্রেয়োবোধে আহবান জানিয়েছিলেন উদাত্তকণ্ঠে 'কাল প্রসন্ন, ইউরোপ সহায়, সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও, তাহাতে নাম লেখ 'শ্রী মধুসূদন'। মধুসূদন ছিলেন একাগ্রচিত্তে কবিভাষার ও কাব্যশিল্প-শৈলীর সন্ধানী। তাই তিনি বঙ্কিম-বিহারীলাল প্রমুখ কারো খবরই রাখতেন না। মধুসূদনের মতো আত্মপ্রত্যয়ী দাম্ভিক ছিলেন বঙ্কিমও। কিন্তু তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের সাগ্রহ খবর রাখতেন এবং সমঝদার হিসেবে গুণ-গৌরব স্বীকার করতেন। তবে তিনি কেন যে বিহারীলালকে অনুল্লেখ উপেক্ষা করেছেন বোঝা যায় না। যদিও সমবয়সী বিহারীলাল বঙ্কিমের চেয়ে ভালো কবিতা লিখতেন।

বিহারীলাল চক্রবর্তী ছিলেন ইউরোপ প্রভাবিত আধুনিক কবি। ঈশ্বর গুপ্তের মতো বাঙলার ও বাঙালীর কবি ছিলেন না। কেননা তিনি ছিলেন মর্ত্যজীবন রসিক, মর্ত্য-জীবনবাদী, মর্ত্যের রূপ-রসপ্রীতিই তাঁর কাব্যে পরিব্যক্ত।

ব্রিটিশ ভারতের প্রত্যন্ত শহর কোলকাতায় রামমোহন রায়ই প্রথম প্রতীচ্য প্রভাবিত মুক্তবুদ্ধির যুক্তিবাদী ব্যক্তি। তিনি ঔপনিষদিক 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি অভিন্ন' এ দার্শনিক তত্ত্বে আস্থা রেখে নিরাকার অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী হলেন এবং সুপ্রাচীন স্মৃতি-পুরাণ-গীতা-অনুগ দেবতাপ্রতিম মূর্তিপূজা পরিহার করলেন। সর্বসংস্কারমুক্ত অন্তরে অভীক যুক্তিবাদী ও মর্ত্যজীবনরসিক রামমোহন প্রচলিত অর্থে ধার্মিক ছিলেন না, জগৎচেতনায় ও জীবন-ভাবনায় ছিলেন বৈষয়িক ও আন্তর্জাতিক। তাঁর মৃত্যুর পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন, রামতনু লাহিড়ী, দীননাথ সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ অচিরে ত্রিভাগে বিভক্ত ব্রাহ্মমত চালু রাখলেন প্রচারে ও প্রসারে। প্রাজন্মক্রমিক বৃদ্ধির ফলে এখন কয়েক লাখ ব্রাহ্ম হিন্দু নামে স্বমতে সুস্থির রয়েছে— অস্তিত্ব হারায়নি।

প্রতীচ্য শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের কেউ কেউ খ্রীস্টান, ব্রাহ্ম, এবং নিরীশ্বর নাস্তিক হয়েছিলেন। আমরা কৃতি ও কীর্তিমানদের মধ্যে নিরীশ্বর দেখি বহুভাষাবিদ অক্ষয় কুমার দত্তকে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে এবং প্রৌঢ়ত্বের পূর্বেকার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। আর অন্য অনেকে হন অজ্ঞেয়বাদী কিংবা পজিটিবিস্ট বা প্রত্যক্ষবাদী। এঁরা সাধারণভাবে ছিলেন সংস্কারমুক্ত, শাস্ত্রে আস্থাহীন যুক্তি ও বিবেকচালিত ব্যক্তি ভাবে চিন্তায় কর্মে ও আচরণে। উল্লেখ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র শুধু কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নন, গোটা উপমহাদেশেরই প্রথম স্নাতক। এখন উপমহাদেশে কয়েক কোটি স্নাতক রয়েছেন। কিন্তু শাস্ত্রিক স্থানিক লৌকিক অলৌকিক অলীক অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তিতে বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা-আস্থাহীন লোক আজো কিন্তু লক্ষ স্নাতকে একজনও সহজে মেলে না। উনিশ শতকে শহরে স্বল্পসংখ্যক বলতে গেলে বাস্তব ইংরেজি জানা করগণ্য বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তাতেই শহরে শহরে ঘটেছিল ভাব-বিপ্লব, সমাজবিপ্লব, চেতনায়-চিন্তায় বিপ্লব স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যেই এবং তার লঘু-গুরু প্রভাবে বিচলিত করেছিল গতানুগতিক আবর্তিত বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণায় আস্থায় আহ্বানে লালিত ও অভ্যস্ত পুরো সমাজকে।

আজ পৌনে দুশ' বছর পরে দেখতে পাচ্ছি আমরা উনিশ শতকী মুক্তবুদ্ধি, যুক্তিবাদ ও বিবেকনির্ভরতা হারিয়ে ফেলেছি, প্রতীচ্য জ্ঞানে-বিজ্ঞানে দর্শনে ইতিহাসে বিজ্ঞ ও বিদ্বান হয়েও। এখন উপমহাদেশে কোটি কোটি স্নাতক অথচ নাস্তিক, নিরীশ্বর, অজ্ঞেয়বাদী, প্রত্যক্ষবাদী, যুক্তিবাদী বিবেকী ও ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের সংখ্যা প্রত্যাশিত সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়নি। এখন বাঞ্ছিত ছিল লক্ষ কোটি বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক চেতনা-চিন্তার সংস্কারমুক্ত উদার নাগরিক। তার বদলে পাচ্ছি অবাঞ্ছিত সাম্প্রদায়িক চেতনাপুষ্ট Relligion, Region, Language বা Regional বা Religious Culture-এর স্বাতন্ত্র্যসচেতন গোষ্ঠী-গোত্র-অঞ্চল-মানুষই অধিক সংখ্যায়। পাকিস্তানে ও বাঙলাদেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনানী-রাজনীতিক সাংবাদিক-শিক্ষকদের মধ্যে সার্বক্ষণিক উচ্চারণে ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতিপ্রীতি ও নিষ্ঠা পরিব্যক্ত হয়। ভারত ১৯৭৬ সনে সেক্যুলার হওয়ার পরেই পরোক্ষ হিন্দুয়ানীর চর্চায় ও প্রতিষ্ঠায় হয়েছে সযত্ন প্রয়াসী। রাজনীতিক ও আর্থসামাজিক ফায়দা প্রাপ্তি লক্ষ্যে মুসলিম বলে ইসলামই হচ্ছে অতুল্য সত্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম, হিন্দু বলে তার ধর্মই শ্রেষ্ঠ। রামায়ণের রামকে নিয়ে নয় শুধু হনুমান, সুগ্রীব প্রভৃতি নিয়েও ধারাবাহিক নাটক প্রচারিত হচ্ছে দূরদর্শনে, মহাভারতেরও বিভিন্ন কাহিনী চিত্রনাট্য রূপে প্রদর্শিত হচ্ছে কয়েক বছর ধরে, আর এসব ছাড়াও রয়েছে অন্যান্য দেবতার মহিমা প্রচার। আবার মুসলিম ভোট জোগাড়ের প্রয়োজনে প্রচার করতে দেয়া হল অবশেষে অভীক অসাম্প্রদায়িক আদর্শ দেশপ্রেমী ও ন্যায়নিষ্ঠ সুশাসক বীরযোদ্ধা টিপু সুলতানের জীবননাট্য, আরব্য উপন্যাসকে আদর্শ মুমিনের চরিত্রচিত্র হিসেবে ইসলামী রূপ দিয়েও প্রচার করা হয়েছে, তাছাড়া আকবর-বীরবল কাহিনীরও চিত্র্যনাট্য প্রদর্শিত হয়। যদিও আকবর কোরআনের ইসলাম বর্জন করে 'ইলাহি ধর্ম' প্রচারে উদ্যোগী হয়ে মুসলিমদের ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করেছিলেন সাম্রাজ্য রক্ষার ও বিস্তারের গরজে। অবশ্য কাম-প্রেম, বন্ধুত্বের-ক্ষেত্রে আবার লাভে-লোভে-স্বার্থে পরস্পর বিশ্বস্ত সহযোগী ও ব্যক্তি হিন্দু ও ব্যক্তি মুসলিম ব্যক্তিগত সম্পর্কে সুজনই। তবে এ মুহূর্তের ভারতে বিজেপি, শিবসেনা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ, জরংবং প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক রাজনীতিক দলগুলোই প্রবল। সেক্যুলারিজম রইল নামে, কামে কিন্তু হিন্দুত্বই হল প্রবল। যদিও হিন্দু-মুসলিম শিক্ষিতরা ইউরোপীয় আদর্শেই তাদের জীবন যাপন করে। আজ উপমহাদেশে হিন্দুর চোখে মুসলিম মাত্রই উগ্র-অসহিষ্ণু হিংস্র অনুদার, হিংসাপরায়ণ বিজাতি বিধর্মী-বিভাষী-বিদেশী প্রেরণা দুষ্ট। আর মুসলিম চোখে ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণহিন্দুমাত্রই অমানবিক সংস্কারদুষ্ট সংকীর্ণচিত্ত স্বধর্মী-বিধর্মী নির্বিশেষে ভিন্ন বর্ণের, ধর্মের, ভাষার, অঞ্চলের, সংস্কৃতির, আচারের, আচরণের মানব বিদ্বেষী গ্রহণবিমুখ কমঠ স্বভাবের ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। হিন্দু কখনো বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক চেতনায়-চিন্তায় ঋদ্ধ হতে পারেই না– নিরীশ্বর নাস্তিক না হলে। কেননা তারা মানুষকে অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ বলে ঘৃণা করে, কুকর-বিড়ালের চেয়ে অধম মনে করে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ ধারণা নিতান্ত স্থূল, অবৌদ্ধিক ও অযৌক্তিক, অসঙ্গত ও অবৈজ্ঞানিক ও অমনো-বৈজ্ঞানিক। জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা ও অঞ্চল কিংবা শাস্ত্রভেদে মানুষকে স্বভাবে চরিত্রে মনে-মেজাজে চিহ্নিত করা যায় না। মানুষ ভালো-মন্দ-মাঝারি হয় ভাবে-চিন্তায় কর্মে-আচরণে স্বভাবে, চরিত্রে, কোনো জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক স্ব স্ব পারিবেশিক, পারিবারিক, সামাজিক আর্থিক শাস্ত্রিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার ও অবস্থানের প্রভাব সত্ত্বেও মন-মগজের ব্যক্তিক অনুশীলনে ও অননুশীলনে এবং সামর্থ্যগত স্তরের পার্থক্যানুসারে।

দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ হয়, দস্যু হয় দরবেশ। ব্যক্তিমানুষ সুদীর্ঘ জীবনে কারো প্রভাবে কিংবা কোনো আঘাতে নতুন চেতনায়-চিন্তায়-স্বভাবে চরিত্রে নীতি-আদর্শে জেগে ওঠে। মন্দ ভালো হয়, ভালোও পামর হয়, সবটা কারণ-ক্রিয়াজাত, যা অন্যের অদেখা, অজানা থেকেই যায়। কাজেই জন্মসূত্রে কেউ ভালো-মন্দ হয় না, হয় না নন্দিত কিংবা নিন্দিত মন-মেজাজের ও কৃতি-কীর্তির। জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগের মানুষ স্বমতে স্বপথে চলতে না জানলে, না শিখলে, অন্যে নৈতিক-আদর্শিক দেশনা যোগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাউকে বাঞ্ছিত গুণের মানের মাপের ও মাত্রার মানুষরূপে দাঁড় করাতে পারে না। চৈতন্যদেবের নদীয়ায়, রবীন্দ্রনাথের কোলকাতায়, জওয়াহেরলালের উত্তরপ্রদেশে, গান্ধীর গুজরাটে সংখ্যালঘু হত্যাই বা ঘটে কি করে, বিজেপি বা ভোটে জেতে কি করে? কাজেই মহৎ ব্যক্তির, সন্ত-দরবেশের, নবী-অবতারের প্রভাবটাও ব্যক্তির উপরই কার্যকর। জাতির, গোষ্ঠীর, গোত্রের উপর সামূহিক, সামষ্টিক ও সামগ্রিক প্রভাব বাহ্যত প্রাতিভাসিকরূপে দেখা গেলেও কার্যত প্রভাব মাত্রই ব্যক্তিগত।

বিশেষ করে আস্তিক তথা শাস্ত্রে আস্থাবান ব্যক্তি কখনো সেক্যুলার বা বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক চেতনায় প্রবুদ্ধ হয়ে উদার অবিশেষ বিশ্বমানববাদী হতেই পারে না। আস্তিকের মন শাস্ত্রের অনুশাসনের ডিকদড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে। তাই আস্তিকমাত্রই বিশ্বাসের-সংস্কারের ধারণার পার্থক্য সচেতন থেকে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় হয় জীবনের-মননের সর্বক্ষেত্রে। মিলনের বাধা এখানেই । দেখা গেছে ভাঙা সোভিয়েত রাশিয়ার ও অন্যত্র আশৈশবে সংগোপনে শ্রুত, দৃষ্ট ও লব্ধ বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা বর্জন করতে পারেনি সত্তর বছরেও। তাই ভাঙা রশিয়ায় খ্রীস্টান, মুসলিম, ইহুদী, বৌদ্ধমত পূর্ববৎ উন্মেষিত ও প্রকাশ্যে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হল গির্জায়-সিনাগগে-মসজিদে-মঠে।

মনে হয় মানুষ আশৈশব শাস্ত্রিক বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণামুক্ত পরিবেশে লালিত হলে অর্থাৎ নাস্তিক-নিরীশ্বর প্রাকৃতজন হিসেবে গড়ে উঠলে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনায় প্রয়োগে যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক জীবন যাপনে সমর্থ হবে অনেক পরিমাণে, জাত-জন্ম বর্ণ ভাষা অঞ্চল প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি এমন প্রবল থাকবে না। বিরোধ-বিবাদ হনন-দহন দমন-লুণ্ঠন-শোষণ কমবে– মানুষ বিবেকানুগত হবে, হবে ন্যায়নিষ্ঠ। যে ক্ষতি নিজের জন্যে কাম্য নয়, তা অপরের জন্যেও অভিপ্রায় হবে না, অধিকাংশ ব্যক্তি হবে মানবতাবাদী। আপাতত এমন অলীক আশা ও আশ্বাস নিয়ে বাঁচব। কারণ-আশা-ভরসা-আস্থাহীন জীবন দুর্বহ। নির্মোহ মুক্তিচিন্তক চাই। কেননা, শাস্ত্রনিষ্ঠ মানুষমাত্রই লঘু-গুরুভাবে গুণে-মানে-মাপে সামান্য পরিমাণে হলেও আর্থোডকস থাকেই।

মানুষের জন্যেও 'অভয়শরণ' চাই

মানুষ জাগ্রত মুহূর্তে কখনো হয় রিপুচালিত, কখনো হয় মগজী কূটবুদ্ধিতাড়িত, কখনো বা হয় নিছক হুজুগ বা আবেগ প্ররোচিত। এজন্যে মানুষের ব্যক্তিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক, আদর্শিক-নৈতিক চিন্তা-চেতনায় কোনো নিত্য অনুসৃত নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি মানায় সঙ্গতি, যৌক্তিক বৌদ্ধিক ন্যায়নিষ্ঠা দেখা যায় না। এর ফলেই গণমানবের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা নিয়ে শাস্ত্রী, সমাজসর্দার, শাসক-প্রশাসক রাষ্ট্রপতিরা আজো মাথা ঘামান না। তাঁদের খেয়াল-খুশি, লাভ, লোভ, স্বার্থবশে তাঁরা যা যা করেন, সে-সবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে ক্ষয়-ক্ষতি, অনিশ্চিন্তি-অনিশ্চিতি দেখা দেয় আমজনতার জীবনে ও জীবিকায়। বিশ শতকের এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদায়কালেও সভ্যতম জগতেও আদি ও আদিমকালের গৌষ্ঠীক-গৌত্রিক জাতিক ভাষিক বার্ণিক শাস্ত্রিক মতবাদীর দ্বেষ-দ্বন্দ্ব রক্তক্ষরা প্রাণহরা সংঘর্ষ-সংঘাত-লড়াই-যুদ্ধ জিইয়ে রেখেছে। উত্তর আয়ারল্যান্ড, বসনিয়া, সার্বিয়া, চেচনিয়া, কুর্দিস্তান, আফগানিস্তান, ইরাক, আলজেরিয়া, জর্জিয়া, আরমানিয়া, সুদান, রুয়ান্ডা, বরুন্ডী, পাকিস্তান, ভারত, বাঙলাদেশ, চীন, তাইওয়ান, ফিলিপাইন, মায়ানমার, কম্বোডিয়া, কানাডা, লাতিন আমেরিকা– আর কতো নাম করব। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এবং ক্বচিৎ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব রাষ্ট্রেই অভ্যন্তরীণ গৌষ্ঠীক আঞ্চলিক দ্বন্দ্বে কিংবা প্রতিবেশীর সঙ্গে বিরোধে বিবাদে গোটা পৃথিবীর গণমানব আম-জনতা জীবন জীবিকার নিরাপত্তা ও নিরুপদ্রবতা সম্বন্ধে কখনো সুদীর্ঘকাল নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। প্রাণীর মানবপ্রজাতি নিজেদের স্বপ্রজাতিকে জীবনে-জীবিকায় জান-মালের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশা জাগিয়ে আজো আশ্বস্ত করতে পারেনি বটে, সে চেষ্টাও কখনো কোথাও অবিচ্ছিন্ন আন্তরিকতায় ও সযত্ন সতর্ক উদ্যোগে-আয়োজনে চালিয়ে যাওয়া হয়নি, লাভ-লোভ-স্বার্থ চালিত শাস্ত্রী সর্দার মাতবর সরকার রাজা রাষ্ট্রপতি কখনো খ্যাতি-ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রেরণায়, কখনো বা নতুন কিছু করার উচ্চাশায় গণমানবের জীবনে স্বস্তি-শান্তি-জান-মাল-চিস্থিতি বিপন্ন করেন। ফলে নিঃস্ব-নিরন্ন-দুস্থ-দুর্বল দরিদ্র গৃহস্থ মানুষের জীবনে সুখ প্রজন্মক্রমে ক্ষণপ্রভাই থেকে যায়– মরীচিকা হয়েও থাকে অনেকের জীবনে। সুখ কি, সুখ কেমন তা নিম্নবৃত্তের, নিম্নবিত্তের, নিম্ন ও তুচ্ছপেশার বা শ্রমজীবী মানুষের জীবন শ' শ' বছর ধরে প্রজন্মক্রমে স্বপ্নের ও সাধের জগতের কাল্পনিক জিজ্ঞাসার ও সন্ধিৎসার স্তরেই থেকে যায়।

একালে সরকারি মেঠো বক্তৃতায় কাগজে বিবৃতিতে বিজ্ঞাপনের প্রচারে-প্রচারণায় গণকল্যাণই হচ্ছে পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে স্বীকৃত ও বিঘোষিত। গণমানবের অশন-বসন-আবাস-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কর্ম জোগানোর এবং সুখ ও সম্পদ বৃদ্ধির দায়িত্ব সরকার মাত্রই স্বীকার করে বটে, কিন্তু হয় সরকারি লোকের আত্মরতির আধিক্যে কিংবা সরকারের আর্থিক দারিদ্র্যের কারণে সরকার সে-দায়িত্ব প্রত্যাশিত ও প্রয়োজনীয় মাত্রায়- মাপে-মানে পূরণ করতে পারে না। ত্রুটি ও ঘাটতি থেকেই যায়। ফলে গণমানব বাঞ্ছিত স্বস্তি-সুখ পায় না। ভাতে-কাপড়ে নিশ্চিতি-নিশ্চিন্তি আসে না।

একালে প্রায় সাতচল্লিশটি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে একটি বিশেষ সমস্যা-সঙ্কট সমাধানের মুখে নয়, বরং জটিলতর হয়ে বৃদ্ধির এবং অপ্রতিরোধ্য অকালিক বৈনাশিক রূপ নিচ্ছে। আমরা জানি ইউরোপে রেনেসাঁসের পাশাপাশি চলছিল অতীত ও ঐতিহ্যমুখী পীড়নপ্রবণ রক্ষণশীল শাস্ত্রীদের শাসনের ও ক্ষমতা প্রয়োগের বাড়াবাড়ি। ধর্মধ্বজী খ্রীস্টানরা ভোগবিমুখ শাস্ত্রসেবীরূপে ইউরোপের রাজা-রাজ্য সমাজ-সংস্কৃতি জমি-জমা সব প্রায় রাহুর সূর্যগ্রাসের মতোই গ্রাস করে সর্বশ্রেণীর মানুষের জান-মাল-গর্দানের, জীবন-জীবিকার, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণের মালিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের সেই রাক্ষসী কিংবা দানবিক কবল থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ষোল শতক থেকে রাজার, ধর্মসংস্কারকের, কৃষকের, ও বিজ্ঞানীর দ্রোহের প্রয়োজন হয়েছিল, হয়েছিল শত বছরের, ত্রিশ বছরের অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধাবস্থার কোনো কোনো অঞ্চলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেনেসাঁস ছিল ব্যক্তিক নতুন চেতনার-চিন্তার-মননের ও মনীষার প্রসূন- তা কোনো মানবমুক্তির জন্যে গণআন্দোলনের রূপ নেয়নি। যদিও দার্শনিকরা মরীয়া হয়ে নানা তত্ত্ব, তথ্য ও যুক্তিযোগে ধর্মধ্বজী পীড়ক-প্রতারকদের প্রভাব হ্রাস করার চেষ্টা করেছিলেন। দেকার্ত, হিউম, হবস, লক, স্পিনোজা, মিল-কোঁতে, কান্ট-হেগেল বার্গস-নিটশে-মার্কস-সার্ত্রে অবধি অনেক কাল বয়ে যাওয়ার পরে আজ ইউরোপ নিরীশ্বর নাস্তিক-সমকামী এবং পরমত-কর্ম-আচরণ সহিষ্ণু, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যমনস্ক, মগজী ও হার্দিক শক্তির সমন্বিত প্রয়োগপ্রয়াসী মানুষ ও সমাজ তৈরি করতে পেরেছে অনেক পরিমাণে। যদিও রাজনীতিক বা সরকারি তথা রাষ্ট্রিক স্তরে ইউরোপ আজো নবরক্তক্ষরা প্রাণহরা হিংস্রতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা এবং ক্ষুধার্ত বাঘ-সিংহের হিংস্রতার রীতিতে তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে নবপদ্ধতিতে আর্থ-বাণিজ্যিক-মহাজনী শোষণের সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী নীতি-নিয়ম চালু রেখেছে।

ইউরোপের মধ্যযুগের গির্জাশাসন-শোষণ-পীড়ন-হুকুম-হুমকি-হামলা-দলন-দমন একালে চালু হয়েছে, হচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে অর্থোডকস ও মৌলবাদী ইসলাম পছন্দদের রাজনীতি-চেতনার প্রসারের ফলে। তারা এভাবেই অজ্ঞ-অনক্ষর ও পারত্রিক কল্যাণকামী ভীরু মুসলিমদের সমর্থনে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। বিশ শতকের অন্তিমকালে আলজিরিয়ায়, তিউনিসিয়ায়, সৌদি আরবে, আমীর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, ইরানে-আফগানিস্তানে-পাকিস্তানে এবং লঘুগুরুভাবে বাঙলাদেশ-মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি সব মুসলিম রাষ্ট্রে কুরআন সুন্না সম্মত (যদিও সুন্না বিভিন্নমতের মুসলিম সম্প্রদায়ে বিভিন্ন) শাসন প্রবর্তন বাঞ্ছা নিয়েই রাজনীতি চলে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যখন বিজ্ঞান-বাণিজ্য ও মর্ত্য জীবনমনস্ক, তখন মুসলিমরা তাদের কল্পনার, বিশ্বাসের, ধারণার এবং শাস্ত্রের উদ্ভবকালের অবস্থায় ও অবস্থানে অটল-অচল হয়ে স্থির বিশ্বাসে গতানুগতিক অভ্যস্তরীতিতে আবর্তিত জীবনে ও জগতে চিরন্তন স্বস্তি-সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে। এদিক দিয়ে ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে ভিন্ন মতে, মন্তব্যে ও সিদ্ধান্তে হিন্দুরা ইতোমধ্যে অবিচল থাকতে অভ্যস্ত হয়েছে। সংযত ও পরমত কর্ম-আচরণ-সহিষ্ণু হয়ে উঠেছে অন্তত স্বসমাজে। তাই ভারতে-কোলকাতায় শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণে এমন কি বেদান্তে বা গীতায় অনাস্থা কেউ মুখে বা লিখিতভাবে প্রকাশ করলেও তাকে নিন্দিত-অবজ্ঞেয় ধিকৃত করার জন্যে তেমন কেউ এগিয়ে আসে না। তারা সংস্কৃতিমান ও সহিষ্ণু হয়েছে। ভলতেয়ারি কায়দা তারাও যেন রপ্ত করেছে। তারাও যেন মন থেকে বলে' 'Disapprove what you say, but I will defend to death to your right to say it' তাই ডক্টর অশোকরুদ্র ব্রাহ্মণ্য ফ্যাসিবাদের নিন্দায় মুখর হতে পারেন, প্রতিভাবসু সত্যবতী-ব্যাসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কারে উৎসাহ পান, ডক্টর জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণচরিত্রে কাপট্য ও গীতায় প্রক্ষিপ্ত পাঠ প্রত্যক্ষ করেন। বহু ঐতিহাসিক রামায়ণকে কাল্পনিক কাব্য বলতে দ্বিধা করেন না। মানবেন্দ্রনাথ রায় অভীকচিত্তে উচ্চারণ করেন শাস্ত্র বা ধর্ম হচ্ছে 'A body of superistitions, prejudices, social customs and irrational modes of living' (Fragments of prisoner's Dairy part 1 p 27). যেমন রোমান মনীষী খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে 'Religion is regarded by the common pepole as true, by the wise as false and by the rulers as useful'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(Senecca)। এ দিক দিয়ে ভারত বা কোলকাতা আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। বিজেপি তাই ধার্মিকদের নয়, ভোট শিকারী রাজনীতিকদের সঙ্ঘ।

এতক্ষণ প্রাণীর মানবপ্রজাতির হয়তো নিন্দাই করলাম। এবার তাদের মনুষ্যত্বের গুণ-গৌরবের কথা বলি। এ কাড়াকাড়ি মারামারি-হানাহানি প্রবণ লাভ-লোভ-স্বার্থবাজ মানুষই আবার মানবিক গুণেগৌরবে প্রাণিজগতে অনন্য, অতুল্য অসামান্য। তারা নিজেদের মধ্যে ঈর্ষায়-অসূয়ায়-ঘৃণায় প্রতিহিংসায়-রিপুবশ্যতায় করে না হেন অপরাধ অপকর্ম নেই বটে, আবার যাদের ভালোবাসে তাদের জন্যে পারে না হেন সুকর্ম বা ত্যাগ-তিতিক্ষাও নেই। তারা কামে-ক্রোধে-মোহে-মদে-মাৎসর্যে আদি অকৃত্রিম প্রবৃত্তি চালিত প্রাণী মাত্র, তেমনি স্নেহে-মমতায় প্রেমে-প্রীতিতে-ভালোবাসায়-ভক্তিতে-শ্রদ্ধায় ত্যাগে-তিতিক্ষায় পরার্থপরতায় আত্মোৎসর্গেও তাদের সদা প্রস্তুত দেখা যায়। তাই সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে মানুষ ভালোও নয়, মন্দও নয়, কখনো ভালো কখনো মন্দ, কারো জন্যে ভালো কারো জন্যে মন্দ। কারো প্রতি ভালো কারো প্রতি মন্দ।

এ প্রাণীখেকো মানুষই আবার জাতি-প্রজাতি হিসেবে সমুদ্রে, পর্বতে, অরণ্যে জনপদে বিরল বিলুপ্তপ্রায় পশু-পাখি-মাছ-কীট-পতঙ্গ সামুদ্রিক নানা প্রাণী এবং তরুলতা অবলুপ্তির থেকে রক্ষা করার জন্যে, পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধ করার জন্যে এমনকি অকারণ-সকারণ প্রাণী হত্যা প্রতিহত করার জন্যে চিত্তবান সহৃদয় ব্যক্তিরা বেসরকারিভাবে একালে রাষ্ট্রে অভয়াশ্রম বা নিরাপদ আশ্রয়স্থলরূপে সমুদ্রে, অরণ্যে, পর্বতে ও জনপদে বিশেষ স্থান বা অঞ্চল সংরক্ষিত করেছে, করছে। খাদ্য জুগিয়ে জলে সারে চিকিৎসায় সযত্ন সেবায় জীব-উদ্ভিদ লালন-পালন করে মানুষ মনুষ্যত্বে পরম অভিব্যক্তি দেয়। জীব-উদ্ভিদের প্রতি এমন গাঢ় গভীর মমতা যারা হৃদয়ে পোষণ করে, তাদের অনেকেই সমাজের-রাজনীতির-সরকারের-রাষ্ট্রের উচ্চপদ-পদবীর, অবস্থার ও অবস্থানের প্রতিপত্তিশালী লোক। তাঁরাই প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে দেশ-জাত-অর্থ-বিত্ত-বিজ্ঞান-বণিজ্য, সাহিত্য-শিল্প, দর্শন-সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ন্তা। তাঁরা কি পারেন না পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরে কিংবা প্রতি রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহ ও সমস্বার্থে সংযমে, সহিষ্ণুতায়, ন্যায়নিষ্ঠায়, বিবেকানুগত্যে, সৌজন্যে, শ্রম ও পণ্য বিনিময়ে সহযোগিতার অঙ্গীকারে মানুষে মানুষে নির্ববাদে সহাবস্থানে সম্মত করাতে, অভ্যস্ত করাতে? মানুষের জন্যেও অভয়শরণ চাই।

কালিক জীবনের তাগিদ

স্থানের কালের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পরিবেশ অনুসারে, খাদ্যসংগ্রহের সহজতা ও শ্রমসাধ্যতা, খাদ্যের প্রাচুর্য ও দুর্বলতা, বিভিন্ন অঞ্চলের অপরিচয়ের ও বিচ্ছিন্নতার ব্যবধানে অজ্ঞাতবাসে গড়ে-ওঠা বিভিন্ন গৌত্রিক গৌষ্ঠীক বুনো-বর্বর-ভব্য-সভ্য সমাজ স্থূল-সূক্ষ্ম নানা স্থানিক, লৌকিক, অলৌকিক, অলীক অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির জন্ম জীবন-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যু ও জীবিকা নিয়ন্ত্রণের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণাচালিত হয়ে নির্বিরোধে-নির্বিবাদে পণ্যবিনিময়ে পারস্পরিক সহযোগিতায় সহাবস্থান লক্ষ্যে নানা নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ প্রথা পদ্ধতি চালু করেছে সদিচ্ছায় ও যৌথ জীবনে স্বস্তি, শান্তি নিরুপদ্রবতা ও নিরাপত্তা প্রাপ্তি লক্ষ্যে।

এভাবেই যানবাহন-পথ-পুস্তকবিহীনকালে বিচ্ছিন্নতার অপরিচয়ের ব্যবধানে অজ্ঞাতবাসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রগুলো স্ব স্ব সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতা আর প্রয়োজন-চেতনা নিয়েই রচনা করেছে দলবদ্ধ জীবন যাপনের নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি। পাছে শক্তিমান সাহসী উচ্চাশী তা উপেক্ষা ও লঙ্ঘন করে এ ভয়ে তারা সবকিছুতেই অদৃশ্য অলীক অলৌকিক বা আসমানী অরি-মিত্র শক্তিতেই সার্বভৌমত্ব আরোপ করেছে। এমনি করে কাল্পনিক, আনুমানিক অদৃশ্যশক্তির অস্তিত্ব প্রাজন্মক্রমিক চিন্তা-চেতনার বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার উৎস ও ভিত্তি হয়ে হয়ে পরম্পরাগত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচারে-আচরণে প্রতিফলিত হয়ে এবং মনের, মগজের, মননের, মনীষার প্রথাগত পরিসরে ও পরিমাণে গতানুগতিক অনুশীলনে নিবদ্ধ থেকে কোনোটা বদ্ধমূল কোনোটা Faith-এ এবং কোনোটা Trust বা আস্থায় পরিণতি পেয়ে ব্যক্তিমানুষের দেহ-প্রাণ-মন-মগজ-মনন-মনীষা করেছে শৃঙ্খলিত। তাই আজো আস্তিক মানুষ প্রজন্মক্রমে পরম্পরাগত মানসিক ও পার্বণিক জীবন যাপন করে, বাস করে belief-এর, faith-এর ও Trust-এর জগতে। তাদের মানসজীবনে চিন্তা-চেতনায় কোনো সমকালীনতা নেই, নেই যৌক্তিক-বৌদ্ধিক বিবেকী বিবেচনা। অপরিচয়ের বিচ্ছিন্নতার ব্যবধানে অজ্ঞাতবাসী সেই আদি ও আদিম মানুষ যানবাহন-পথ-পুস্তকবিহীন জীবনে স্ব স্ব জ্ঞান-বুদ্ধি-বিজ্ঞতা-অভিজ্ঞতার কিংবা স্থূল-সূক্ষ্ম কল্পনায় অনুমানে-আন্দাজে গৌত্রিক ও গোষ্ঠীক জীবনে সংহতি, শান্তি রক্ষার লক্ষ্যে, বিরোধ-বিবাদ ঠেকানোর গরজে জন্ম-মৃত্যু জীবন-জীবিকা সম্বন্ধীয় তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক চিন্তা-চেতনার এবং ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণের নীতি-নিয়ম বিধি-নিষেধ সূত্রবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচার করা হয়– এভাবেই গড়ে ওঠে অবশ্যমান্য নীতিশাস্ত্র। সমাজ-সর্দার ও বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ-বুদ্ধিমান সমাজ-হিতৈষী সজ্জনেরাই এ শাস্ত্রের প্রবক্তা ও নির্মাতা। এভাবেই নীতি-শাস্ত্র কালে কালে স্থানে স্থানে জ্ঞানের-বুদ্ধির-যুক্তির-অভিজ্ঞতার বিকাশের ও উৎকর্ষের ফলে বদলে গেছে। পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা আংশিকভাবে লোপ পেয়েছে। জীবনের দৈনিক-কালিক দাবি পূরণের প্রয়োজনে আবির্ভূত হয়েছে বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান যুক্তিনিষ্ঠ সংস্কারক। যেসব স্থানে ও যেসব গোত্র-গোষ্ঠীতে মনে-মগজে-মননে-মনীষায় ঋদ্ধ জনহিতকামী উদ্যমশীল উদ্যোগী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেনি, সেসব স্থানে সেসব গোত্রে-গোষ্ঠী আজো আদি ও আদিম স্তরে রয়ে গেছে এবং গতানুগতিক বিশ্বাসে-সংস্কারে-ধারণার জালে আবদ্ধ থেকে লাটিমের মতো চিন্তায়-চেতনায় জীবনে-জীবিকায় আবর্তিত হচ্ছে-তাদের হ্রাস আছে, বৃদ্ধি নেই কোনো প্রকারের কোনো ক্ষেত্রেই। তারা জীবন্ত কিন্তু প্রাণবন্ত নয়। আর একদল মানুষ নিত্যই এগিয়ে চলছে চেতনায়-চিন্তায়-মনীষায়-কর্মে-আচারে-আচরণে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে যন্ত্রে, প্রকৌশলে প্রযুক্তিতে যেমন ইউরোপের ও আমেরিকার অধিকাংশ রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক সমাজ বা শ্রেণী। সর্বসংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিন্তক ও যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক অনুগত না হলে কেউ এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে জ্ঞাননির্ভর যৌক্তিক বৌদ্ধিক জীবন যাপনে সমর্থ হয় না। ওরা মন-মগজ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনীষা দিয়ে অনুভব-উপলব্ধি করেছে যে, মনুষ্য জীবনে তথা জীবজগতে মাতৃস্তন্য, মাতৃকোলে কিংবা মাতার পরিচর্যা কিংবা সঙ্গ-সাহায্য স্বল্পকালের জন্যেই আবশ্যিক ও জরুরীমাত্র, চিরকালের জন্যে নয়। মাতৃস্তন্যের প্রয়োজন ফুরোলেই মাতৃকোলের উপযোগও ফুরায়। তরল দুধে তখন প্রাণ বাঁচে না, দেহ বাড়ে না, তখন অন্য প্রকারের খাদ্য আবশ্যিক হয়। তেমনি জীবনে চেতনার চিন্তার বিকাশ বিস্তার প্রয়োজন মানবিক শক্তির উন্মেষ-বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের জন্যে। তখন আদি ও আদিম মানুষের তৈরি স্থানিক লৌকিক অলৌকিক অলীক কাল্পনিক, আনুমানিক belief [বিশ্বাস], faith {শ্রদ্ধা] ও Trust [আস্থা] বর্জন জরুরী হয়ে পড়ে। অতীত ও ঐতিহ্য মানুষের ঐহিক জীবনের গতির-প্রগতির বিঘ্ন সৃষ্টি করে, কেননা পিছুটান গতির রোধক। অতীত ও ঐতিহ্য হচ্ছে ফেলে আসা দিনের সম্পদ, স্বকালের স্বজীবনের নয়, অতিক্রান্ত কালের ও জীবনের বলেই। অতীতের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা faith, Trust, belief বর্জন না করলে সংস্কৃতি-সভ্যতার বিকাশ সম্ভব নয় এ কালে।

তাছাড়া বাস্তবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবন প্রসূন যন্ত্র-নির্ভর জীবনে যখন পৃথিবীর কোথাও কেউ প্রযত্ন-প্রয়াস সত্ত্বেও শাস্ত্রসম্মত জীবন যাপন করতে পারছে না, অনিচ্ছায় শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ উপেক্ষা ও লঙ্ঘন তাদের করতেই হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের নিত্য কর্মে-আচারে ও আচরণে, তখন মানসিকভাবে শাস্ত্র-মগ্ন থেকে নিজেকে কাজে ও কথায় মনে-মননে ও আচারে আচরণে অনেক ও হরেক অসঙ্গতির, বৈপরীত্যের ও অসামঞ্জস্যের দ্বান্দ্বিক অবস্থায় ও অবস্থানে স্থিত রেখে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। মনে-মগজে, অন্তরে-বাইরে আর বাহ্য আচারে-আচরণে এবং কথায়-কাজে এ দ্বান্দ্বিক অসঙ্গতি কেবল প্রগতির অগ্রগতির এবং যুক্তির বুদ্ধির ও বিবেকের সুপ্রয়োগের পথে বাধা হয়েই দাঁড়ায় মাত্র। এর ফলেই পরিবারে, সমাজে, সম্প্রদায়ে, রাজনীতিতে, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রিক জীবনে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, বিরোধ-বিবাদ বাড়ে। ক্ষতি হয় সবারই। মানবিক গুণের ঘটে অপকর্ষ।

কাজেই এ নাচ-গান-বাজনার-সিনেমার-নাটকের, সহশিক্ষার নারী-পুরুষের সমানাধিকারের ও কর্মক্ষেত্রে পরপুরুষের ও পরনারীর সহযোগিতার ও সহাবস্থানের কালে, সর্বজনীন ভাষা ইংরেজির বদৌলতে সাহিত্যে-দর্শনে-ইতিহাসে-সমাজবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখার ক্ষেত্রে অভিন্ন জীবনচেতনার ও জগৎভাবনার উন্মেষের বিকাশের ও উৎকর্ষের কালে শাস্ত্রিক কিংবা সাংস্কৃতিক অথবা নৈতিক-আদর্শিক বা রুচির ও শ্রেয়বোধের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলা যে অসম্ভব, তা এই যানবাহন-পথ-পুস্তকেব বাহুল্যের যুগে, এ সর্বপ্রকারে যন্ত্রনির্ভর যন্ত্রচালিত, কম্প্যুটার নিয়ন্ত্রিত প্রাত্যহিক জীবনে যদি আমরা অনুভব উপলব্ধি না করি, সত্যের ও বাস্তবের প্রতি বিমুখ হয়ে থাকি, তা হবে আত্মহননেরই নামান্তর মাত্র।

আজ বৈশ্বিক স্তরে আন্তর্জাতিক সমাজে সবার রঙে রঙ মিলিয়ে সবার মনের সঙ্গে মনের সমতা রেখে, সহযাত্রায় সবার সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে, বোলে-চালে তাল রেখে যে চলতেই হবে-হচ্ছে, নইলে যে স্বাতন্ত্র্যবাদী রক্ষণশীলের অস্তিত্বই হবে বিপন্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রগতিশীল কালিক জীবনের প্রয়োজনে

জর্জ ওয়াশিংটন নাকি বলেছিলেন যে, মানুষ স্বাধীন হয়েই জন্মায়, কিন্তু জন্মের পরেই নানাভাবে শৃঙ্খলিত জীবন-যাপন করে। কার্ল মার্কসও বলেছেন যে, দার্শনিকরা জগৎ ও জীবন নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বটে, কিন্তু সমস্যা এই যে, তাঁরা সমাজ পরিবর্তনের পন্থা বাতলাননি।

কিন্তু এঁদের এসব উক্তির মধ্যে সত্য নেই। কেননা আমরা জানি জগৎচেতনা ও জীবনভাবনা নিয়ে মিশরে-এশিয়ায় আদি ও আদিমকাল থেকেই মানব প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে নানা চিন্তা-ভাবনা চলে আসছে। তাতেই তো মিশরে, পশ্চিম এশিয়ায়, তার সংলগ্ন গ্রীসে, চীনে-ভারতে সুপ্রাচীন কাল থেকেই জগৎ কি, জীবন কি ও কেন নিয়ে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের মধ্যে উত্তর অন্বেষার অন্ত ছিল না। এর ফলেই অদৃশ্য আসমানী অরি-মিত্র শক্তিতে জগতের ও জীবনের স্রষ্টা নিয়ন্তা হিসেবে কল্পনায়, আন্দাজে অনুমানে জানার বোঝার মানার স্থূল-সূক্ষ্ম সতর্ক-সযত্ন প্রয়াস চলে আসছে আজ অবধি এখনকার গোটা দুনিয়ায়। আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রসারের সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তি বশে অরিশক্তির রোষমুক্ত থাকার লক্ষ্যে এবং মিত্রশক্তির কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য প্রাপ্তির জন্যে অরি-মিত্রশক্তি আনুগত্য স্বীকার করে তাদের প্রতি ভয়-ভক্তি-ভরসা-অনুরাগ রেখে। তাদের আদেশের-নির্দেশের অনুগত থেকে, তাদের অভিপ্রেত পন্থায় চলে তাদের নানা উপচারে, স্তবে, স্তুতিতে তুষ্ট, তৃপ্ত ও হৃষ্ট রাখার সার্বক্ষণিক সর্বাত্মক ও সর্বার্থক প্রয়াস চালায় জগদ্ব্যাপী আস্তিকমাত্রই।

WWW.AMARBOI.COM

কিন্তু সংখ্যায় স্বল্প হলেও আর একদল ছিল গোড়া থেকেই, যারা ছিল আত্মপ্রত্যয়ী নিরীশ্বর নাস্তিক। সাদ্দাদ, নমরুদ, কেনান প্রমুখ অনেক স্রষ্টাদ্রোহী নাস্তিকের কিস্‌সা কাহিনী পাই আমরা পশ্চিম এশিয়ার নবী কাহিনীতে ও কেতাবে। ভারতেও আমরা আদি সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক প্রভৃতি নাস্তিক্যদর্শন পাই। বৌদ্ধ দর্শনের কথা বাদ দিলেও লোকায়ত দর্শনমাত্রই নাস্তিক্য দর্শন। চার্বাকাদির নাম আজো ঘরে ঘরে জ্ঞাত। এক লোকায়ত দার্শনিক বলেছেন,

"ন স্বর্গো না পোবর্গো বা নৈরাত্ম্য পারলৌকিকঃ।

নৈব বর্ণ্যশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকা–

স্বর্গ নেই, নরক নেই, আত্মা নেই, পরলোক নেই। বর্ণাশ্রমও নয় সত্য এবং সুফলদায়ক।

আর চার্বাকের নামে চালু শ্লোকাংশ তো আজো উপমহাদেশে লোকের মুখে মুখে চলে ঃ 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ/ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ/ভস্মভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কূতো'। ঠিক এ কথাই বলেছেন ইরানের কবি উমর খৈয়ামও ঃ 'সব বুলি মিছা/শুনহ গোপনে একটি বচন সত্য সার/ যে ফুল নিশীথে পড়িছে ঝরিয়া/ সে নাহি কখন ফুটিবে আর/' – অতএব জন্মান্তর মিথ্যে, পারলৌকিক জীবনও অনুমিতমাত্র।

এসব মতবাদীরা অর্থাৎ নিরীশ্বর নাস্তিকরা নীতি-আদর্শের, শাস্ত্র-সমাজের বন্ধন কার্যত স্বীকার করেননি। এ কালের কম্যুনিস্টরা-নাস্তিকেরাও আস্তিক্যে আস্থা রাখে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু গোটা দুনিয়ায় জনসংখ্যার তুলনায় নাস্তিক আর কয়জন। সর্বপ্রাণবাদের, জাদুবিশ্বাসের, ট্যাবু-টোটেম নিয়ন্ত্রিত ধারণার এবং নানা স্থানে প্যাগন চিন্তা-চেতনার কাল থেকেই মানুষ আস্তিক-স্রষ্টাবাদী। আসমানে-জমিনে পাতালে প্রসৃত অদৃশ্য মহাশক্তির বিভিন্ন ও বিচিত্র মনের ও চাহিদার অরি ও মিত্র শক্তি মানুষের জগৎ ও জীবন নিয়ন্ত্রণ করে আজ অবধি– এ কল্পনা, এ বিশ্বাস, এ সংস্কার, এ ধারণা নিয়তি ও নিয়ন্ত্রণবাদী মানসিকদের ভীরু-অসহায় মানুষের ভয়-ভক্তি-ভরসা-অনুরাগের উৎস ও ভিত্তি। তাদের প্রত্যয়ীমন মগজ-মনন তাই প্রাত্যহিক জীবনের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণ এক ধরাবাঁধা নিয়মের ও নীতির পথ ধরে পরিব্যক্ত ও প্রকটিত হয়। স্রষ্টাবাদী শাস্ত্রনিষ্ঠ মানুষ তাই জর্জ ওয়াশিংটনের ভাষায় আশৈশব শ্রুত, দৃষ্ট ও প্রাপ্ত নীতিনিয়মে স্বেচ্ছায় সানন্দ শৃঙ্খলিত জীবন বরণ করে স্বস্থ থেকে স্বস্তির, নিশ্চিতির ও নিশ্চিন্তির সুখ উপভোগ করে। ফলে বিশ্বাসের কারা, সংস্কারের কারা, ধারণার কারা, শাস্ত্রের কারা, পাপবোধের কারা, পুণ্যচেতনার কারা, সমাজানুগত্যের কারা, সরকারানুগত্যের কারা, জাতীয়তাবোধের কারা, রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যচেতনার কারা আর এসব ছাড়াও আছে ব্যক্তি জীবনের সংযমের, সহিষ্ণুতার, ন্যায়বোধের, দায়িত্ব-কর্তব্যবুদ্ধির, বিবেকানুগত্যের ও আত্মসত্তার মর্যাদাবোধের শৃঙ্খল। কাজেই দলবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ মানুষের যৌথ জীবনে কারা বা শৃঙ্খলমুক্তি বলতে গেলে নেই।

সংস্কৃতি ও সভ্যতা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, যুক্তি-বুদ্ধি মানুষকে স্বাধিকারের সীমায় স্বপ্রতিষ্ঠ থাকার দেশনাই দান করে অর্থাৎ তাকে পঞ্চইন্দ্রিয়ের, ষড়রিপুর প্রভাব ও প্রাণীসুলভ ভোগবাঞ্ছা থেকে দূরে থাকার নির্দেশই দান করে। সংযত ও সহিষ্ণু হতে পরামর্শ দেয়। এ সবকিছুই সমাজের সরকারের ও রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য, শৃঙ্খলা, স্বস্তি ও শান্তিরক্ষার জন্যে আবশ্যিক ও জরুরী।

AMARBOI.COM

কিন্তু এরপরেও কথা থেকে যায়। বদ্ধতার মধ্যে, শৃঙ্খলা মানার মধ্যে গতানুগতিকতার মধ্যে, অপরিবর্তনীয় অভ্যাসের মধ্যে, যোজন-বর্জনহীন আবর্তিত নীতিনিয়মের, রীতিরেওয়াজের, প্রথাপদ্ধতির মধ্যে, হৃতউপযোগ উনোক্তি-অত্যুক্তির মধ্যে, বৈশ্বিক আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের কালের ও জীবনের পরিবর্তমান দাবির বা চাহিদার সঙ্গে সম্বন্ধে সম্পর্কে সমকালীনতা ও সমতাল না রাখার মধ্যে সর্বাত্মক অবক্ষয় থাকে।

বন্ধন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে আবশ্যিক। কিন্তু সে-বন্ধন যে জীবনের ও সময়ের চিন্তার ও চেতনার, জীবিকার ও প্রয়োজনের পরিবর্তনের, বিকাশের উৎকর্ষের সঙ্গে সমতালে পরিবর্তিত হয় আকারে ও প্রকারে, উৎকর্ষে বৈচিত্র্যে ও সুরুচির সৌন্দর্যে। বন্ধনের লোহার শিকলে যেন হাতে-পায়ে-মগজে কড়া না পড়ে– 'জঙ' না ধরে। মুক্তচিন্তার চেতনার অবদানে মানুষেরও মনুষ্যত্বের বিকাশ ও উৎকর্ষ ঘটাতেই হয়। বৃক্ষ যেমন পুরোনো পাতা ঝরিয়ে নতুন কিশলয় গজিয়ে পরিপূর্ণ বিশ্বাস-বিস্তার পায়, তেমনি দেশ-কাল-জীবনের দাবি বা চাহিদা পূরণ লক্ষ্যে পুরোনো হৃত উপযোগ, তাৎপর্যরিক্ত অপ্রয়োজনীয় নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি বর্জন করে নতুন দেশ-কাল-জীবনোপযোগী নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ যোজন ও চালু করে চলারগতি বাঞ্ছিতমানের ও মাত্রার রেখে প্রগতির ও প্রাগ্রসরতার পন্থা অবলম্বনই হচ্ছে ব্যক্তিক, জাতিক ও রাষ্ট্রিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের আদর্শ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এজন্যেই এ কালে অর্থাৎ এ যন্ত্রযুগে যন্ত্রজগতে যন্ত্রনির্ভর ও যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জীবনে বিজ্ঞানের প্রসাদে প্রমাণিত ও প্রমাণসাধ্য না হলে অদৃশ্য কিছুতেই আন্দাজে-অনুমানে-বিশ্বাসে আস্থা রেখে জীবনে অনর্থক প্রতারিত প্রবঞ্চিত হওয়া যুক্তিসম্মত, বুদ্ধিসঙ্গত, বিবেকগ্রাহ্য নয়। এজন্যেই একালে মুক্তচিন্তা বা ফ্রিথিংকিংই মানুষের মন-মগজ-মননের অবলম্বন ও অনুশীলনের বিষয় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একাল বিজ্ঞান ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তিক, জাতিক ও রাষ্ট্রিক স্তরে এ দুটোর অনুশীলন ও উৎকর্ষই ব্যক্তির, দেশের, কালের, রাষ্ট্রের ও মানবজাতির গুণের ও গৌরবের এবং জীবনের সাফল্যের ও সার্থকতার সাক্ষ্য ও প্রমাণ। কাজেই প্রগতিশীল কালিক জীবনযাপনের প্রয়োজনেই আমাদের বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিপ্রবণ, বিবেকানুগত ও মুক্তমননের, মুক্তচিন্তক বা ফ্রিথিঙ্কার হওয়া আবশ্যিক। তাহলেই আমরা সহজেই কল্যাণকে, শ্রেয়সকে, প্রেয়সকে অনুকরণে অনুসরণে, আবিষ্কারে উদ্ভাবনে নির্মাণে সৃষ্টিতে গ্রহণ, বরণ ও আয়ত্ত করতে পারব। আমরা উন্নত জাতি হব অঙ্গে, অন্তরে ও অন্দরে।

স্বদেশে স্বকালে সমাজে বৈশ্বিক সমকালীনতা আবশ্যিক

AMARBOI.COM

স্বদেশের স্বকালের সমাজের সচেতনভাবে কিংবা অবচেতনভাবে অনুভূত পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে উপলব্ধ অভাব বা চাহিদা থাকে। সেগুলোই সমকালের জনগণের মধ্যে থেকে কারো না কারো চেতনায়-চিন্তায় তা প্রথমে 'ভাব' রূপে পরে উদ্যম, অঙ্গীকার, আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্যরূপে কারো না কারো কথায়, কাজে, উদ্যোগে, আয়োজনে প্রয়োজনে বা চাহিদা পূরণ লক্ষ্যে বিভিন্ন কলার চর্চায়, বিজ্ঞানের বাণিজ্যের অনুশীলনে, নতুন কিছু আবিষ্কারে উদ্ভাবনে, নির্মাণে, উৎপাদনে, সৃষ্টিতে বাস্তবায়িত হয়। এভাবে স্বপ্নের ও সাধের এবং অবচেতন প্রয়োজন প্রেরণার বাস্তবে রূপায়ণ ঘটে। ব্যক্তিমানসের এমনি অবদান ব্যক্তিক সাধনার সাফল্যের ও সার্থকতার প্রমাণ, সংস্কৃতি সভ্যতা বিশ্বের সর্বত্র এভাবেই এগিয়েছে। যেখানে নতুন চেতনায় চিন্তায় আগ্রহী এবং দেহে প্রাণে মনে-মগজে-মননে-মনীষায় শক্ত সমর্থ আর গুণে মানে-মাপে-মাত্রায় বেশি উদ্যমশীল উদ্যোগী সাহসী অধ্যবসায়ী একাগ্রচিত্তের মানুষের সংখ্যা অধিক, সেখানেই সংস্কৃতি সভ্যতা দ্রুত বিকাশ বিস্তার লাভ করেছে– মনন সম্পদে ও জীবনযাত্রার নানা প্রয়োজনীয় উপকরণের সৃষ্টিতে, নির্মাণে ও ব্যবহারে। একালের বিজ্ঞানের প্রসাদে নানা যন্ত্রের, প্রকৌশল-প্রযুক্তির প্রয়োগজাত উন্নতির সর্বাত্মক ও সর্বার্থকরূপ এ সূত্রে বিবেচ্য। এ যাবৎ দেখা গেছে, প্রজন্মক্রমে যারা স্থির ও স্থবির নীতিনিয়মের, রীতিরেওয়াজের প্রথাপদ্ধতির গতানুগতিক ও অভ্যস্ত নিয়মে ভাব-চিন্তা-রুচি-কর্ম-আচার-আচরণের ধারক বাহক ও জীবনাচারের রূপায়ক, তারা কখনো পুরোনো প্রীতি এবং নতুন ভীতিরূপ আধি থেকে সাধারণভাবে মুক্ত হতেই পারে না। সেজন্যেই প্রাচীন-প্রবীণ ও বন্ধ্য মন-মগজ-মননের মানুষমাত্রই হয় রক্ষণশীল, নতুন বিদ্বেষী, নতুনের প্রাণপণে প্রতিরোধক। আরো দেখা যায় তরুণ বয়সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যারা সর্বসংস্কারমুক্ত নতুনের আবাহনে ও প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠ, তারাই পড়তি বয়সে রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যায়। এভাবেই দেশে দেশে সমাজে-সংস্কৃতিতে দ্বান্দ্বিক অবস্থায় ও অবস্থানের মানুষ বাস করে। এক সময়ে প্রবীণদের মৃত্যুতে সম্ভবত নতুন সমাজে-সংস্কৃতিতে নির্দ্বন্দ্ব নির্বিঘ্ন প্রতিষ্ঠা পায়। পৃথিবী এভাবেই এগিয়েছে, এগুচ্ছে, এগুবে। এ-ও উল্লেখ্য যে, মানুষ জ্ঞান-অভিজ্ঞতা বিজ্ঞান থেকে, ইতিহাসের নিত্য ঘটনার ও পরিণামের কারণ-কার্যের বয়ান থেকেও কোনো শিক্ষা গ্রহণ করে না। নতুন মোহে, নতুন ক্ষোভে নতুন ক্রোধে নতুন উত্তেজনায় যে কোনো নতুন চিন্তা-চেতনায়-কর্মে-আচার-আচরণে বাধা দেয়ই। যদিও আবহমানকালের ইতিবৃত্তান্ত থেকে আমরা জানি পুরোনো কল্পনা-আন্দাজ-অনুমান-বিশ্বাস-সংস্কার ধারণ-শ্রেয়স-প্রেয়সতত্ত্ব পরিণামে নতুন চিন্তা-চেতনার কর্ম-আচার-ফ্যাশন-আচরণের ও শ্রেয়সবুদ্ধির কাছে হার মানেই। নতুন আসে অমোঘ নিয়তিরূপে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার শক্তি নিয়েই আসে। পৃথিবীর কোথাও এ যাবৎ নতুন শাস্ত্র, নতুন দর্শন, নতুন পদ্ধতি আকস্মিকভাবে এসে ক্ষণজীবী হয়ে বিলুপ্ত হবার জন্যে আসেনি। নতুনের একটা সীমিত উপযোগকাল, জীবনের প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণ সামর্থ্যকাল থাকে। কালান্তরে স্থানান্তরে যে কোনো তথ্য, তত্ত্ব, সত্যও তাৎপর্যরিক্ত হয় ও উপযোগ বা প্রয়োগ মূল্য হারায়। দুনিয়ায় কিছুই স্থান-কাল-জীবনের প্রয়োজন নিরপেক্ষ হয়ে টিকে থাকতে পারে না। এ কারণেই বা এ উপযোগশূন্য বা হৃততাৎপর্য হয়েই ধর্মশাস্ত্রের, কল্পনাজাত আসমান-জমিনে বিচরণশীল নানা অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির কালিক ও স্থানিক এবং সামাজিক ও গৌষ্ঠীক জন্ম-মৃত্যু ঘটে ঘটে বিভিন্ন দেশের মতবাদী সম্প্রদায়গুলো গড়ে উঠেছে। এ কালের মৌলবাদীরা কোনো মূল স্থির ও স্থায়ীভাবে অবলম্বন করে কোনো পর্বতপ্রমাণ স্থাবর তথ্যের তত্ত্বের ও সত্যের চিরন্তন প্রতিষ্ঠা চায় তা তারা জানে না, বোঝে না। কেননা তাদের বিভিন্ন মতবাদী সম্প্রদায়ের মৌলতত্ত্ব, মৌলতথ্য ও মৌলসত্য অভিন্ন থাকেনি পৃথিবীর কোথাও কোনো ধর্মশাস্ত্র ধারকদের মতেই দৃঢ় প্রত্যয়ে ও পাথুরে প্রমাণ যোগে ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ-হিন্দু মুসলিম প্রভৃতির বিভিন্ন ও বিচিত্র শাখার উপমতের পালা-পার্বণ, বিশ্বাস সংস্কার ধারণা-আচার আচরণ। এ ভিন্নতার উদ্ভব ও বিকাশ-বিস্তারই প্রমাণিত করে যে মতবাদের, ধারণার, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কালিক ও স্থানিক জন্ম-মৃত্যু আছে।

আমাদের দেশেই সোয়াশ' বছর আগে তান্ত্রিক কাপালিকরা নরবলি যোগে সাধনায় সিদ্ধি, ঈশ্বরের তুষ্টি, পারত্রিক মুক্তি অর্জন করত। গঙ্গা সাগরে জীবন্ত সন্তান ডুবিয়ে দিয়ে, জোরে জুলুমে মৃত স্বামীর সঙ্গে কিশোরী-যুবতী নারীকে পুড়িয়ে মেরে, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কিশোরীর সঙ্গে সত্তর আশি বছরেরও বড় বুড়োর বিয়ে শাস্ত্র ও সমাজসম্মত রেখে এবং বিবাহবিচ্ছেদের ও নারীর পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা না রেখে আড়াই-তিন হাজার বছর ধরে শাস্ত্রানুগত ধর্মসাধনা করেছে এমনি সমাজব্যবস্থাকে ও জীবন যাপনকে আদর্শ জীবন ও সমাজ বলে স্বীকার করেছে। প্রতীচ্য শিক্ষার প্রভাবে প্রথম ইংরেজি শিক্ষিতরাই প্রতিবাদী হয়ে দ্রোহী হয়ে শ্রুতি-স্মৃতিপুরাণের সমর্থন নিয়ে উক্ত সব দৃঢ় প্রত্যয়ভিত্তিক আবশ্যিক শাস্ত্রাচার অর্জন করেছে। এমনকি ব্রাহ্মরা অপৌত্তলিক একেশ্বরবাদী হয়েছে। এতেই বোঝা যায় মন-মগজ-মনন ও শ্রেয়সচিন্তা-চেতনাযোগে যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বিবেক-বিবেচনা শক্তি প্রয়োগে কালান্তরে স্থানান্তরে ও প্রজন্মান্তরে তাৎপর্যহীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজনরিক্ত কল্পনাজাত আন্দাজী-আনুমানিক বিশ্বাস-সংস্কার ধারণা ছাড়া ও ছাড়ানো যায়। এভাবেই দুনিয়ায় বারবার নতুন নতুন নবী-অবতার-সন্তরা নতুন নতুন মতবাদের শাস্ত্রশাসন চালু করেছে তাঁদের অনন্য, অতুল্য অসামান্য জ্ঞান-প্রজ্ঞা-ব্যক্তিত্ব প্রভাবে গণমন প্রভাবিত করেই।

জীবনে সমকালীনতা আবশ্যিক ও জরুরি। একালে বিজ্ঞানের প্রসাদে ও যন্ত্রযুগে যন্ত্রজগতে যন্ত্রনির্ভর জীবনে যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জীবিকাক্ষেত্রে মানুষকে স্বদেশের স্বকালের ও স্বসমাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে হয় বেঁচে থাকার গরজেই। পুরোনো মগজী ধারণা এবং ব্যবহারিক-আচরিক নীতিনিয়ম রীতিরেওয়াজ প্রথাপদ্ধতি বর্জন এবং কল ও কাল উপযোগী চিন্তা-চেতনা-কর্ম-আচার-আচরণ যোজনা করেই এ যুগ বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক স্তরে আমাদের ব্যক্তি হিসেবে মানুষ হিসেবে জাতি হিসেবে রাষ্ট্র হিসেবে শির উঁচু করে বাঁচতে জানতে হবেই। দায়ে ঠেকে নয়, পরম মমতায় প্রিয়জনকে দু'বাহুর বেষ্টনীর মধ্যে এনে বুকে জড়িয়ে ধরে যেমন সুখ পাওয়া যায়, প্রিয়জনও কোল পেয়ে আদর-কদরকে পরম সমাদর রূপে জেনে তৃপ্ত, তুষ্ট ও হৃষ্ট হয়, আধুনিক ও নতুন চিন্তা-চেতনাকে তেমনি আগ্রহ মন-মগজ-মনন ও অন্তর দিয়ে বরণ করে আত্মীকৃত ও আত্মস্থ করতে হবে। আমরা ইচ্ছে করলেও এ যন্ত্রনির্ভরতা পরিহার করে মধ্য কিংবা প্রাচীন যুগে আমাদের শাস্ত্রের উদ্ভবকালের জগতে ও জীবনাচারে, নীতিবোধে ও আদর্শ চেতনায় ফিরে যেতে পারব না। কেননা, অতীত মানেই মরাকাল, মৃত জগৎ ও মৃত জীবন। মৃত কিছুই কোনো কেরামতিতেই পুনরুজ্জীবিত হয় না। 'অমরত্ব' তো আলঙ্কারিক সুভাষণ মাত্র।

আমাদের অনিচ্ছায় নিত্যকার ঘরোয়া, সামাজিক, ব্যবসায়িক, বাণিজ্যিক জীবনে কিংবা শ্রম ও সময় অথবা কাঁচা-পাকা জলজ, খনিজ, কৃষিজ, ফলদ পণ্য বিনিময় বাজারে কোথাও না কোথাও আমাদের বিশ্বাসের আদর্শের নীতিনিয়ম, বিধিনিষেধ, রীতিরেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি এবং শাস্ত্রসম্মত, কর্ম-আচার-আচরণ লঙ্ঘন বা উপেক্ষা করে চলতে বাধ্য হচ্ছি, যন্ত্র আমাদের বাধ্য করেছে, করছে আরো করবে। আমরা আজ আর কোনো কোনো বা কারো কারো শাস্ত্রে নিষিদ্ধ গান-নাচ-বাজনা-অভিনয় ছাড়তে পারব না– ইরানে খোমেনীও পারেননি। নাটক চলচ্চিত্র-চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, এমনকি রসুলের সময় থেকে আরবে নিষিদ্ধ কবিতা-গল্প প্রভৃতি সাহিত্য রচনা না করে একালে বঞ্চিত করতে পারব না নিজেদের। এখন হজের মতো ফরজ আদায় করতেও আমাদের বিলকুল হারাম যে ছবি বা ফটো তারও বারোখানা লাগে। বুকের পকেটে থাকে কাগুজে অর্থের নোটে প্রাণীর ছবি। ভাস্কর্যের মতো এমনি পৌত্তলিকতাও কি আমরা পরিহার করতে পারি আন্তর্জাতিক জীবনে। উনিশ শতকে ও বিশ শতকের মধ্যকাল অবধি নাটকে চলচ্চিত্রে গণিকাই ছিল নারী ভূমিকায় অভিনয়ের পাত্রী। আজ কি অভিনয়ে নারীর নিন্দা আছে? আমরা কি এখন ইচ্ছে করলেই সহশিক্ষা, সহকর্মিতা, সহযোগিতা, সহচারিতা সহযোগে সহাভিনয় থেকে নারীকে কিংবা পুরুষকে বাজার-দোকান-দফতর-সমিতি-সঙ্ঘ-সংস্থা- সংসদ-পর্ষদ-পরিষদ থেকে বঞ্চিত বা আলাদা করে রাখতে পারি জীবনের ও জীবিকার কোনো ক্ষেত্র থেকে? এবং আমাদের প্রচলিত প্রধান শাস্ত্রগুলোর ইহুদী, খ্রীস্টান-হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম কোনো শাস্ত্রই এ কালের জীবনের অপরিহার্য জীবনযাত্রায় আবশ্যিক সব কিছু অনুমোদন করে না। আমরা তাই দোকানে বাজারে দফতরে বিদ্যালয়ে নয় কেবল, হাসপাতালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেবায় ও চিকিৎসায় নারী-পুরুষের ভেদাভেদ অনেককাল আগেই তুলে দিয়েছি। পুরুষ নারীর চিকিৎসা করেছেন। নারী পুরুষ রোগীর চিকিৎসা ও সেবা করছেন পাপভীতি মনে না রেখেই– শাস্ত্রকে লঙ্ঘন বা উপেক্ষা করেই। অতএব বিজ্ঞানের প্রসাদে যন্ত্রের প্রয়োগে জীবনকে সুখের স্বাচ্ছন্দ্যের সাচ্ছল্যের আরামের ভোগের উপভোগের সম্ভোগের বিলাসের ও বিনোদনের উপকরণে ভূষিত ও সম্পৃক্ত করার জন্যেই শাস্ত্রের অনেক কিছু বর্জন করছি সচেতনভাবেই এবং যোজনা করছি সব কিছুই মর্ত্যজীবনকে গুরুত্ব দিয়েই এবং পারত্রিক জীবনকে গুরুত্বহীন করেই। সুতরাং আত্মকল্যাণেই স্বদেশে স্বকালে সমাজে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচার-আচরণে বৈশ্বিক-বৈজ্ঞানিক-যান্ত্রিক-চৈত্তিক আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সমকালীনতা আবশ্যিক বলে মানতে হবেই।

গণমানস-মুক্তি কত দূরে!

আগের দিনে উচ্চাশী শক্তিমান-সাহসী এবং বুদ্ধিমান দূরদর্শী ধূর্তলোকেরাই রাজা হয়ে প্রজা শাসন-শোষণ করত। জনগণ থাকত চিরকালই প্রবলের হুকুম-হুমকির-হামলার এবং শাসন-শোষণ-পীড়নের পাত্র। তাই পরিবারে ও পাড়ায়, গোষ্ঠীতে গোত্রে জনগণ ছিল সর্দার, মাতবর, শাস্ত্রী ও প্রবল প্রশাসক শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত। কোনো কোনো শ্রেণীর বা প্রজাতির পশু-পাখির এবং মৌমাছি, ভীমরুল, বোলতা, উই, পিঁপড়ে প্রভৃতি কীট-পতঙ্গের মধ্যে এমনি নেতৃনিয়ন্ত্রিত দলবদ্ধ বা যূথবদ্ধ জীবন যাপন পদ্ধতি দেখা যায়। এক্ষেত্রে প্রাণী হিসেবে মানুষে কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। ব্যক্তিস্বাধীনতা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যচেতনা কখনো কোথাও প্রকট হয়ে ওঠেনি বা উঠতে পারেনি গোষ্ঠী-গোত্রপতি-সর্দার-শাস্ত্রী গুরুশাসনের অগ্রসর-উন্নত সমাজে রাজা গড়ে ওঠে, প্রতিষ্ঠিত হয় রাজ্য সাম্রাজ্য, অর্থ-সম্পদ কিংবা খোরপোশ দিয়ে পোষা লোকেরাই উচ্চাশী সাহসী ধূর্ত বা বুদ্ধিমান ব্যক্তির নেতৃত্বে ও পরিচালনায় রাজ্য-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে, আকস্মিক আক্রমণে মারণে হননে-ধর্ষণে-লুণ্ঠনে-আগুনে-ভাঙনে পরের ভূ-সম্পদ– গোষ্ঠী-গোত্র-বর্ণ-ভাষা-অঞ্চল-শাস্ত্র-আচার-আচরণ-বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা নির্বিশেষে। সাধারণ মানুষের মনে স্বাধিকারচেতনা বলতে গেলে প্রবল শ্রেণীর কিছুলোকের মধ্যে ছাড়া গ্রীক-সিটিস্টেটেও নারীর-দাসের ও অনীহ নাগরিক মনে জাগেনি কখনো। ইসলামের উন্মেষকালে প্রথম চার খলিফার আমলে ব্যতীত অ-রাজতন্ত্রও কোথাও দেখা যায়নি– আরণ্যমানব সমাজে ছাড়া। ইংল্যান্ডে ওলিভার ক্রমোয়েল দ্রোহী হয়েও রাজতন্ত্রেই গণকল্যাণ সন্ধান করেছেন, ফ্রান্সে বুরবন বংশ নির্বিচার হত্যায় বিলুপ্ত করেও 'গণতন্ত্র' চারবছর ধরে প্রায়-প্রাত্যহিক রক্তক্ষরা প্রাণহরা ত্রাসের মধ্যে চালু থেকে অবশেষে সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে রাজা বানিয়ে রাজ্যবাসীর নিরাপদ নিরুপদ্রব স্বস্তি-শান্তি খুঁজল। নানা কারণে সংঘর্ষ-সংঘাতবহুল হলেও গোটা পৃথিবীতে আধুনিক সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো প্রথম এ কালের যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৭৮ সনে ব্রিটিশ শাসন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচ্ছেদের ফলে। যদিও বা ১৮৬৩ সনের আগে দাসের-ক্রীতদাসের সে-গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ-উপভোগের এবং এ শতকেরও তৃতীয় পাদের আগে সমনাগরিক অধিকার প্রাপ্তি আইনত ঘটেনি কালো মানুষের। সেখানেও কার্যত অশ্বেতাঙ্গরা অনেক অধিকার থেকে আজো বঞ্চিত। এবং ইউরোপেও নারীদের ও দরিদ্র গণমানবদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালাবধি সময় লেগেছে।

২.

আমাদের 'ভারতবর্ষ' নামের উপমহাদেশে চিরকাল বিদেশী বিজাতি বিভাষী ও বিধর্মী শক্তিশাসিত বলে ইতিহাসে বর্ণিত রয়েছে। অবশ্য বিজেতারূপে যারাই এসেছে তারাই এখানে স্থায়ীবাসিন্দা হয়েছে তবে সেকালের নিয়মানুসারে যারা পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া থেকে অর্থোপার্জন লক্ষ্যেই কেবল সওদাগর ও সৈনিক হিসেবে এসেছিল, তারা সাধারণত যথাকালে স্বাদেশে ফিরে যেত। তাছাড়া ভারতবর্ষের আদি তথা ভূমিপুত্র-কন্যা বা সন্তান কারা তা ইতিহাস পষ্ট করে বলতে পারে না। বিদেশাগত বলে অনুমান করে দ্রাবিড়দের, আর্যদের, অস্ট্রিকদের, মঙ্গোলদের [নিষাদ ও কিরাত নামে যথাক্রমে পরিচিত এরা] আর বিজেতা ইরানী, গ্রীক, শক, হুন, কুশান, আরব ও পরবর্তীকালের তুর্ক-আফগান-মুঘল দাসবংশীয় শাসকরা বরবক-ঘোরী, তুঘলক-খালজী-লোদী প্রমুখরা।

কাজেই প্রাচীন ভারতীয় বলতে, মধ্যযুগের ভারতীয় বলতে কোনো একক ভাষার, শাস্ত্রের, গোত্রের এবং সংস্কৃতি-সভ্যতার লোক নির্দেশ করে না। একালের ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুরা ভারতীয় ধর্ম, ভাষা ঐতিহ্য, সংস্কৃতি-সভ্যতাকে যে নিজেদের একক, প্রথম ও প্রধান এবং সনাতন অবদান ভিত্তিক বলে দাবি করে তার মধ্যে কোনো তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য নিহিত নেই। মহেনজোদারো-হরপ্পায় নয় শুধু আরো বহু বহু গোষ্ঠীর, গোত্রের, বিজেতার, বাসিন্দার ও মতের পথের লোকের মন-মগজ-মনন-মনীষার ও ব্যবহারিক জীবনের নানা প্রয়োজনে আবিষ্কৃত, উদ্ভাবিত, সৃষ্ট ও নির্মিত অবদানে, উপকরণে উপাদানে গড়ে উঠেছে সুদীর্ঘকাল ধরে ক্রমবিকাশের ও ক্রমোৎকর্ষের ধারায়। তর্কে আমরা কোনো সমাধান বা মীমাংসা পাব না এতোকাল পরে। তাই এক হিসেবে আমরা কেউই ভূমি সন্তান নই এককালের বিদেশাগতের নানা যাযাবর মানুষের বংশধর, অন্য হিসেবে আমরা সবাই ভূমি সন্তান এবং সর্বশেষ বিদেশাগত বাসিন্দা তুর্কী-মুঘলরাও আটশ বছরের আর আরবেরা বারোশ' বছরের, পার্সীরাও বারোশ বছরের পুরোনো ভারতবর্ষীয়। কেবল ইউরোপীয়রাই ভারতীয় হল না কখনো, শুধু অর্থ-সম্পদ লুটই করল, ভালোবাসলো না এদেশকে ও মানুষকে।

৩.

তিন-সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে আমরা ভারতবর্ষে রাজতন্ত্রের আভাসই পাই, এমনকি দেব-দৈত্যের মধ্যেও তাদের কল্পনায় চালু ছিল রাজতন্ত্র। এজন্যেই দেবরাজ ইন্দ্র ও দৈত্যরাজ 'বৃত্র' প্রভৃতির কিস্সা শুনতে পাই। ভারতবর্ষে নবাগতরা আসত বিজেতা রূপেই। তাই পুরোনো রাজ্যপাট দখল করত সদ্য বিদেশাগত প্রবলতর শক্তির রাজারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামন্ত ও স্থানীয় শাসক হিসেবে পুরোনোরাও থাকত, তবে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হতো নতুনরাই। আর ফাঁকে ফাঁকে ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যও কম ছিল না কখনো।

এখানে একটা স্মর্তব্য, জম্বুদ্বীপ, ভারত নামের পরেই সিন্ধুনদের উপত্যকা অর্থে সিন্দ, হিন্দ নাম চালু হয় প্রায় গোটা উপমহাদেশ নির্দেশক নাম হিসেবে এ নিশ্চিতই অজ্ঞতাপ্রসূন বটে। তবে হিন্দের অধিবাসী হিন্দ নামে অভিহিত হওয়া ছিল স্বাভাবিক। কেননা দেশের বা অঞ্চলের তথা স্থানের নামে অধিবাসী ও ভাষা আখ্যাত হয় আজো। যেমন, ফ্রান্স-ফ্রেন্স, ফ্রেন্স, ইংল্যান্ড-ইংলিশ-ইংলিশ, বাঙলা-বাঙালী-বাঙলা, সিন্ধু-সিন্ধি-সিন্ধি দেশ-মানুষ-ভাষা এভাবেই অভিহিত হয়। তবে 'হিন্দু' অজ্ঞতাপ্রসূত বিকৃতি পেয়ে 'হিন্দু' অধিবাসী প্রধান 'হিন্দুস্তান' রূপে বিভ্রান্তিকর নাম পায়। এরফলেই ব্রাহ্মণ্যবাদীর 'হিন্দুত্ব' নতুন তাৎপর্যে নতুন গুরুত্ব পায়। এবার 'হিন্দু' যথা অর্থ হারাল, নতুন অভিধায় হিন্দ-হিন্দি ও হিন্দুস্তান হল। একেই এখন নতুন চিন্তায় চেতনায় জড়িত করে হিন্দু-হিন্দি এ আরোপিত অভিধায় চালু করার প্রয়াসী হয়েছে ভারত রাষ্ট্রের উত্তর ভারতীয় কর্তৃপক্ষ জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতিকর্মীরা। ঐতিহাসিক বিচারে এ আপাত নির্দোষ অভিধায় রাজনীতিক-কূটনীতিক ও সাংস্কৃতিক চাল থাকায় এতে ভারতীয় মুসলিমদের অন্তরে রয়েছে বিক্ষুব্ধ আপত্তি। তারা হিন্দের অধিবাসী হলেও 'হিন্দু' নামে অভিহিত হয়ে তাঁদের ভিন্ন সত্তার স্বাতন্ত্র্য হারাতে চায় না।

আমাদের বাঙলাদেশে প্রথম পালরাজা গোপাল সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা চালু রয়েছে। তাহলো 'প্রজারা মিলিয়া গোপালকে রাজা করিল' যখন দেশে বা রাজ্যে মাৎস্যন্যায় চলছিল তখন ত্রস্ত প্রজারা নিরাপদ নিরুপদ্রব স্বস্তির ও শান্তির জীবনযাপন লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় যেন সমবেত হয়ে এ ব্যবস্থা করল, এমন একটা ধারণা আমাদের চেতনায় বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। আসলে সে-যুগে প্রজারা এ স্তরে উন্নীত হয়নি মনে-মগজে-মননে ও সামর্থ্যে। বিবাদে-বিরোধে ক্ষত-বিক্ষত ও ক্ষতি স্বীকারে অপারগ আর আত্মরক্ষায় অসমর্থ সামন্তরা মিলে সেকালের পুন্ড্রের সামন্ত গোপালকে সার্বভৌম শক্তি অর্পণ করে, তাঁর আনুগত্যে ও নিয়ন্ত্রণে নিশ্চিন্তে নিশ্চিত নিরাপদ নিরুপদ্রব জীবনই ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ করতে চেয়েছিল। প্রজারা এ বিশ শতকের অন্তিমসময়েও অসহায় শাসিত-শোষিত-বঞ্চিত-প্রতারিত কেজো প্রাণী মাত্র। কাজেই সেকালে প্রজার কোনো ভূমিকা থাকার কথা নয়। কবি বর্ণিত এ সুভাষণ আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। তাছাড়া সেকালের পুন্ড্রের গোপাল বাঙালী ছিলেন না, তাঁর রাজধানী ছিল রাজগৃহে-পাটলিপুত্রে। করতোয়ার এপারে পালদের রাজত্ব একালের উভয়বঙ্গের অনেকটা জুড়ে থাকলেও, পুরোবঙ্গ পালদের অধিকারে ছিল না কখনো। পাহারপুরে সোমপুরীবিহার ব্যতীত গোটা আধুনিক 'বঙ্গ' সীমার মধ্যে পালদের কোনো কৃতি-কীর্তি মেলে না, যা উড়িষ্যার জগদ্দলে ও বিহারের নালন্দা হয়ে উত্তর ও মধ্য ভারতের অনেক স্থানে মেলে। পালরাজ্য ও পালশাসন নিয়ে বাঙালীর গৌরব-গর্ব করার কোনো কারণ নেই। কারণ পালেরা বাঙালী ছিলেন না। সেকালের 'পুন্ড্র' ছিল পাটলীপুত্রেরই তথা একালের বিহারেরই অন্তর্ভুক্ত। এখনো বরেন্দ্র অঞ্চলের গণ ভাষায় সংস্কৃতিতে রাজমহল-মিথিলার প্রভাব লক্ষণীয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪.

ব্রিটিশ আমলেও ১৯৪৭ সন অবধি গোটা ব্রিটিশ ভারত প্রত্যক্ষভাবে শাসিত হতো সাড়ে সাতশ/আটশ সামন্ত/করদরাজার ও ছোট বড় মাঝারি জমিদার ও তাদের ইজারাদার শিকদার-তালুকদার-তরফদার প্রভৃতির প্রত্যক্ষ জোর-জুলুমে ও হুকুম-হুমকিতে। আমজনতা ছিল ভূমিদাস—ক্রীতদাসের চেয়ে উন্নত ছিল না তাদের মান-মর্যাদা ভৌমিকদের কাছে। 'বাস্তুতে গাছ লাগাইতে পারিবে, কাটিতে পারিবে না' ভূম্যধিকারীর অনুমতি না নিয়ে। জমিদার বাড়ির বা জমিদারের কাছারির সম্মুখ দিয়ে জুতো পায়ে-পালকী চড়ে, বৃষ্টির সময়েও ছাতা মাথায় নব দম্পতির পথ অতিক্রম করা ছিল নিষিদ্ধ। এ প্রথা ১৯৫০ সন অবধি আমাদের রাষ্ট্রে লঘু-গুরুভাবে চালু ছিল। অতএব ভারতবর্ষের মানুষের মুক্তি এল দেশীয় রাজ্যের ও জমিদারী প্রথার বিলোপে। এ প্রথম আমাদের বাঙলাদেশে মনুষ্য সত্তার মূল্য-মর্যাদা স্বীকৃতি পেল। অর্থে-সম্পদে শোষণমুক্তি না ঘটলেও গেহে-প্রাণে-মনে-মগজে-মননে ব্যক্তিমানুষের মর্ত্যজীবন স্বাধীন ছিল। এখন সমকক্ষ হয়ে দরকষাকষির মাধ্যমে শ্রম ও সময় বিক্রির অধিকার পেয়েছে ব্যক্তি মানুষ নির্বিশেষে। কার্যত না হোক, আইনগত কোনো ধনেমানে প্রবলই জোরে জুলুমে হুকুমে হুমকিতে কিংবা হামলাযোগে কাউকেই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার বলার জন্যে বাধ্য করতে পারে না। রাজ্য রাষ্ট্র হয়েছে বলেই নয়, কিংবা ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে বলেই নয়, বিজ্ঞানের প্রসাদে এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে যন্ত্র-প্রযুক্তি-প্রকৌশলে, যানবাহনে, তারবেতারে সংহত ও ক্ষুদ্র জনপদরূপ বিশ্বে একালের ফোন-ফ্যাক্স-কম্প্যুটার-রেডিও-টিভি-ভিসিআর, ক্যাসেট, স্যাটেলাইট, ডিস অ্যান্টেনা প্রভৃতি মানুষকে জ্ঞানচক্ষু উন্মিলনে বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ করে তুলেছে এবং সাহস, প্রেরণা প্রণোদনা-প্ররোচনা দিচ্ছে। বাধ্যও করেছে, করছে শাস্ত্রিক-সামাজিক বিধিনিষেধ, নীতিনিয়ম, রীতিরেওয়াজ প্রথাপদ্ধতি উপেক্ষায় ও লঙ্ঘনে মানুষকে কেবল ব্যবহারিক জীবন যাপনে নয়। মানব জীবনও সুপ্রাচীন বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণামুক্ত হয়ে সমকালীন জীবনচেতনা ও প্রয়োজনবুদ্ধি-অনুগ জীবন যাপনে আগ্রহী হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। মর্ত্যজীবনচেতনা প্রাধান্য পেয়ে পেয়ে একমাত্র হয়ে উঠবে, পারত্রিক জীবনলগ্নতা ক্রমে বিলুপ্ত হবে। রাষ্ট্রিক মানুষ যৌক্তিক-বৌদ্ধিক-বিবেকী জীবন যাপনে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক চাপে হবে বাধ্য।

মুক্তচিন্তা বা ফ্রিথিঙ্কিং মানুষকে যৌক্তিক, বৌদ্ধিক, মানবিক গুণঋদ্ধ বিবেকানুগত জীবনমুখী করে তুলবে। কারণ শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতা দেশ-কাল-জীবনের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বিকাশ-বিস্তার পেলে মানুষ আত্মসত্তার মূল্য-মর্যাদা সচেতন থেকেই স্বাধিকারের সীমায় মানস ও ব্যবহারিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ, সীমিত রাখার সতর্ক-সযত্ন প্রয়াসী হবে আত্মসম্মান বজায় রাখার আন্তর গরজে। আমরা রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা পেয়েছি বটে, কিন্তু আদি ও আদিম কালের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণায় আশৈশব লালিত-হওয়ার কারণে এবং জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই-বাছাই-ঝাড়াই না করেই গতানুগতিকভাবে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের অভ্যস্তরীতিতে মেনে চলার ফলেই আমরা মানস জীবনে সমকালীনতা অর্জন করতে পারিনি। বেঁচে আছি ১৯৯৬ সনের শেষ দিকে কায়িকভাবে, আর আমাদের ব্যক্তিক জীবনে মানস বিচরণ চলছে চার/সাড়ে তিন/চার/আড়াই/দুই/দেড় হাজার বা পাঁচ/সাতশ' বছর আগের পৃথিবীর নানা অঞ্চলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীতি-নিয়ম-শ্রেয়সবোধের পুঁজি-পাথেয় যোগে। আমাদের নিত্যকার জীবনের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ তাই স্ববিরোধিতায়-বৈপরীত্যে, অযৌক্তিক অবৌদ্ধিক, অসঙ্গত ও অসমঞ্জস।

এ কারণেই আমাদের 'গণতন্ত্র' ভোটতন্ত্র মাত্র। আমাদের গণপ্রতিনিধি গণসেবক নয়, গণপ্রভু ও স্বৈর-স্বেচ্ছাচারী লুটেরা শাসক-শোষক আর বিত্ত-বেসাত, মান-যশ, খ্যাতি-ক্ষমতা, দর্প-দাপট, প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনে ও প্রদর্শনে সদানিরত। আমাদের শিক্ষিত-অশিক্ষিত স্বল্পশিক্ষিত নির্বিশেষে ধূর্তরা কালোজগতের ও কালোবাজারের ধারক-বাহক ও চালক। সাদা ও সৎ থাকতে চাইলেও থাকা সম্ভব হচ্ছে না। আগেকার নীতি ও আদর্শ, শরম-সঙ্কোচ বর্জিত হয়েছে। কিন্তু দেশ-কাল-জীবনের ন্যায্য চাহিদা অনুগ করে কিছুই অর্জনের চেষ্টা হয়নি, হয় না স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে-আদালতে দফতরে দোকানে-বাজারে সমাজ-সংস্কৃতিতে। এ জন্যেই আমরা নৈরাজ্যের মধ্যে জোর-জুলুমের মধ্যে বিপন্ন ও ত্রস্ত জীবন যাপন করছি অহর্নিশ। হৃত উপযোগ পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা বর্জন করে যন্ত্রনির্ভর যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত মর্ত্যজীবনের প্রয়োজনানুগ জীবনধারা চালু করার জন্যে চাই মুক্ত চিন্তক ও যৌক্তিক-বৌদ্ধিক বিবেকী জীবন যাপনে নিষ্ঠ মানুষের বাহুল্য। সে বাঞ্ছিত অবস্থায় আমাদের দেশ-সমাজও উন্নীত হবে, তবে তা সময়সাপেক্ষ। ততদিন আমাদের সর্বপ্রকার আকালিক অমানবিক দুর্ভোগ ভুগতেই হবে। মার্কসবাদের বাস্তবায়নেই সম্ভব আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। কারণ মার্কসবাদের বিকল্প নেই আজো। বলেছি, ১৭৭৮ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বিশ্বে প্রথম জনগণ আন্দোলনে-সংগ্রামে স্বাধীন হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই আমজনতা আন্দোলনে সংগ্রামে পরজাতির শাসন-শোষণমুক্ত হয়েছে। আর রাশিয়া-চীনে গণবিপ্লবে রাজতন্ত্রের অবসানে গণমুক্তি ঘটেছে সমাজবাদের বাস্তবায়নে। ভাতে-কাপড়ে ঘটেছে গণমুক্তি।

সংযম ও সহিষ্ণুতাই বাঞ্ছিত জীবনের পুঁজি ও পাথেয়

মর্ত্যজীবনের মানুষ নয় কেবল, প্রাণীমাত্রই দেহ-প্রাণ-মনের চাহিদা পূর্তি লক্ষ্যেই ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ নিয়োজিত রাখে। জীবনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্যে অন্নজলের মতোই বিনোদন ব্যবস্থাও আবশ্যিক ও জরুরি। পুরোনো শাস্ত্রিক-নৈতিক-সামাজিক নীতিনিয়মের ধরাবাঁধা বিধি-নিষেধ নিরপেক্ষভাবেও জীবন সম্বন্ধে, জীবনের ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগবাঞ্ছা সম্বন্ধে খোলা মনে মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিপ্রয়োগে আলোচনা করা নিশ্চয়ই অবাঞ্ছিত– অন্যায্য কিছু নয়।

জীবনে আত্মরক্ষার, আত্মপ্রসারের আত্মোৎকর্ষের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চেতনা প্রাণীর সহজাত বৃত্তিপ্রবৃত্তির অংশ তথা জন্মগত স্বভাব। এককথায় ক্ষুধা, ক্রোধ, ভয় ও যৌন চেতন – জীবন এই চতুরাঙ্গিক। এগুলো প্রাণী জীবনে অপরিহার্য বটে, কিন্তু এগুলোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংযম ও পরিমিত প্রয়োগই, পরিমিত অনুভব ও ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগই সমাজবদ্ধ মানব জীবনে কাম্য।

ভোগবিমুখতা, বৈরাগ্য জীবনবিরোধী এক প্রকার চৈত্তিক বিকৃতি বা আধিমাত্র, স্বাভাবিক প্রাণী হিসেবে মানুষ ক্ষুধায় খাদ্য, কামে চরিতার্থতা, ক্রোধে অভিব্যক্তির তৃপ্তি, ভয় থেকে মুক্তি কামনা করে। গভীর তাৎপর্যে জীবন হচ্ছে কাঙ্ক্ষার পূর্তি-অপূর্তির সামগ্রিক, সামষ্টিক, সামূহিক তৃপ্তির-অতৃপ্তির আনন্দের, বেদনার, ক্ষোভের, হতাশার অনুভব-উপলব্ধির সমষ্টিমাত্র। জীবনে বিপদ-বিঘ্ন-হতাশা-অসাফল্য কমানোর উপায় হচ্ছে সাধ্যমতো ভেবে-চিন্তে-ধীরগতিতে ও স্থীর প্রত্যয়ে প্রাপ্তির অর্জনের-সাফল্যের জন্যে সযত্ন সতর্ক প্রয়াস ও আয়াস চালানো। দেহ-প্রাণ-মন-মগজ-মনন মনীষা প্রায়োগ করা। কারণ জীবনে প্রেরণার ও প্রণোদনার উৎস ও ভিত্তি হচ্ছে ভোগবাঞ্ছা, কাঙ্ক্ষাপূর্তি, চাওয়া ও পাওয়া। এই জীবন লাভ-লোভ-স্বার্থ, ভোগ-উপভোগ ও সম্ভোগ বাঞ্ছা চালিত। লাভের পিছু ধাওয়া করা, কিছু পেতে লুব্ধ হওয়া, নিজের প্রাপ্য আদায় করা কিংবা প্রাপ্ত সম্পদ রক্ষা করা দোষের নয়, বরং জীবন-সচেতনতারূপ গুণ। কিন্তু নিজের সাধ্য-সামর্থ্য চেতনা কিংবা যোগ্যতা দক্ষতা প্রয়োজন চেতনা রহিত হয়ে লুব্ধ হওয়া, মুগ্ধ হওয়া, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে লাফিয়ে কিংবা ঝাঁপিয়ে পড়া জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অবশ্যই দোষের। অবিমৃষ্যকারী মাত্রই ঠকে, হারে।

আকাঙ্ক্ষাকে, অভাবচেতনাকে, জীবনের চাহিদাকে নিজের শক্তি-সামর্থ্যের উদ্যম-উদ্যোগ-আয়োজনের ও প্রয়োজনের মাপে কেটে ছেঁটে বর্জন করে, অপরিহার্যতা বিচার করে, লঘু-গুরুমাত্রাভেদ মনে রেখে জীবনের ভোগ্য-উপভোগ্য সম্ভোগসামগ্রী জোগাড় করতে হয়। ভোগের আয়োজন করতে হয়। ভোগ করাও একটি সংস্কৃতি ও শিল্পকর্ম বা কলাচর্চা। আগেই বলেছি জীবন বিনোদন চায়। কিন্তু কোনো কিছুই পরিমিতিরিক্ত বা মাত্রাতিরিক্ত হবে না। আমরা নাচ দেখব, গান শুনব, বাদ্য বাজাব, আমরা নাচব, গাইব, পানে-ভোজনে উল্লাস প্রকাশ করব, অভিনয় করব, সে সঙ্গে এও মনে রাখব যে নাচ-গান-বাজনা-সিনেমা-নাটক-অভিনয় কিংবা চিত্রাঙ্কনেই অথবা এসব শ্রবণে-দর্শনেই জীবনের আদর্শ-উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, দায়িত্ব, কর্তব্য ও সার্থকতা সীমিত নয়। দেহ-প্রাণ-মন-মগজ-মনন-মনীষার সুপ্তশক্তির, গুপ্ত সৌন্দর্যের বিকাশ বিস্তার উৎকর্ষ সাধনই হচ্ছে মর্ত্যজীবনস্বপ্ন সাধ্যমতো ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ করার প্রকৃত পন্থা। জীবন যদি হয় জমিন, তাহলে এ মানবজমিন সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ সফল প্রাপ্তি লক্ষ্যে আবাদ করতে হয়, কর্ষণে বর্ষণে মাটি সরস করতে হয়, ভালো বীজ বপন করে প্রয়োজনীয় খাদ্যে তাকে পুষ্ট দেহে অঙ্কুরিত ও বিকশিত করে তুলতে হয়, তাতেই মেলে কাঙ্ক্ষিত গুণের, মানের, ও মাত্রার ফুল-ফল ও ফসল। সর্বক্ষণ সর্বত্র জয় লক্ষ্যেই খেলা শুরু করব, নাচ-গান-বাজনা-অভিনয়-আরম্ভ করব, কাজ করব, কাজ শুরু করব সুষ্ঠু সুন্দর কেজো করে সমাপ্ত করার জন্যে। রূপ কাম্য হবে, কিন্তু মোহ এমনকি অবৌদ্ধিক অযৌক্তিক কোনো চিন্তা-চেতনাতে, কাজের-রূপের গুণের শক্তির ব্যক্তিত্বের মোহে মুগ্ধ বা নেশারুর মতো নেশাগ্রস্ত হব না। সর্বত্র পরিমিতি মানব, সংযম সাধন করব, সহিষ্ণু হব। বিবাদে-বিরোধে ও ক্রোধে প্রতিহিংসায় হিংস্র হয়ে আত্মসম্বিৎ হারাব না। তেমনি গুণবানের বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপবর্তীর গুণে রূপে মোহগ্রস্ত হয়ে মনুষ্যত্ব, আত্মসত্তার মূল্য-মর্যাদা বোধশূন্য হয়ে আত্মহারা হয়ে আত্মবিনাশ ঘটাব না।

অতএব, কৈশোরে-যৌবনেই স্থিরলক্ষ্যে জীবন চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। এ জীবনে কি চাই, তা পেতে কিরূপ যোগ্যতা, দক্ষতা, উদ্যম উদ্যোগ আয়োজন অঙ্গীকার আবশ্যিক ও জরুরি, তা জানা, বোঝা এবং সেভাবেই বিবেকীসম্বিৎ চালিত হয়ে গা-পা-মন-মগজ-মনন-মনীষা জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি- কৌশল-প্রযুক্তি সর্বাত্মক ও সর্বার্থকভাবে পুঁজি ও পাথেয় রূপে লগ্নি করা। এভাবেই সুখবহুল সুন্দর তৃপ্তি, তুষ্ট, হৃষ্টিঋদ্ধ পরিমিত ভোগে-উপভোগে-সম্ভোগে সার্থক জীবন যাপন সম্ভব ও স্বাভাবিক। কারণ বিবেকী সম্বিৎ চালিত যৌক্তিক-বৌদ্ধিক ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ কখনো সংযমের, সহিষ্ণুতার, ঔচিত্যের ও পরিমিতির সীমা লঙ্ঘন করে না। এ মানুষ কখনো ষড়রিপুর কবলিত হয়ে আত্মসম্বিৎ হারায় না, তার কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য সব থাকে, কিন্তু সীমা অতিক্রম করে না। তাকে রিপুর অনুরাগ, আনুগামিতা ও আনুগত্য মনুষ্যত্বগুণরিক্ত করে না।

AMARBOI.COM

সর্বদা সর্বত্র প্রবলমাত্রই পীড়নপ্রবণ

প্রবলমাত্রই আত্মপ্রসারে সর্বশক্তি প্রয়োগে আগ্রহী হয়। প্রবলমাত্রই দুর্বলকে নিজের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত রাখতে চায়। শাসনপাত্রপাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধিতেই আপন ক্ষমতার অনুভব সুখ এবং শাসক হওয়ার সম্মান লাভ হয়। এটি ব্যক্তিক, পারিবারিক, গৌষ্ঠীক, গৌত্রিক, জাতিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে সর্বত্র সমভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হয়ে নজরদারির, খবরদারির, তদারকির অধিকার পাওয়াতেই মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা, দর্প-দাপট, প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থ-বিত্ত-বেসাত প্রভৃতি সর্বপ্রকার মর্ত্যমানবকাম্য পদ-পদবী সম্মান প্রতিপত্তি প্রাপ্তি সম্ভব– এ তত্ত্ব তথ্য ও সত্য সবাই জানে। এ জন্যেই দেহে-প্রাণে-মনে-মগজে-মননে-মনীষায় আর শক্তিতে ও সাহসে আত্মপ্রত্যয়ী মাত্রই নানাভাবে প্রতিনিয়ত আত্মপ্রসারের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বাঞ্ছাতাড়িত হয়ে জীবন জীবিকা ক্ষেত্রে বিচরণ করে। এ জন্যে মানবিক গুণের পুঁজি যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন ছল-চাতুরি-ধূর্ততা প্রভৃতি অপকৌশল। লাভের-লোভের-স্বার্থের–সাফল্যের বল-ভরসা জুগিয়ে কিংবা ধন-প্রাণের ক্ষতির ভয় জাগিয়ে মানুষকে বশ্য-অনুগত রাখতে হয়।

শক্তিমান সাহসী আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তি, গোষ্ঠী, গোত্র, জাতি নিজেরা স্বাধীন থাকতে চায়। কিন্তু অন্য কারো স্বাধীনতার অধিকারই স্বীকার করে না। কেবলই আয়ত্তে রেখে আনুগত্য দাবি করে এতেই খোঁজে তারা স্ব স্ব আত্মপ্রতিষ্ঠার আর জীবনের সাফল্য ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সার্থকতা। তাই কেবল নির্বাচনের ফল না-মানা মায়ানমার-আলজেরিয়া নয়, আফ্রো-এশিয়া-লাতিন আমেরিকা প্রভৃতি সর্বত্র জঙ্গীনায়ক কিংবা স্বৈরাচারী রাজারাও, আমাদের দেশী কাথায় তালগাছ তাদের ভাগে না থাকলে তাদের চলে না বলে তারা কোনো নৈতিক-আদর্শিক নীতি-নিয়ম মানেন না। সর্বদা সর্বত্র আমরা দেখি প্রবলের পীড়ন। প্রবল দুর্জন হয় এবং দুর্বলকে হানে।

এ জন্যেই কানাডা কুইবেক ছাড়ে না, ইংল্যান্ড ছাড়ে না উত্তর আয়ারল্যান্ড কিংবা স্কটল্যান্ড এবং পৃথিবীর ভিন্নস্থানে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু অঞ্চল, ইরান-ইরাক-তুরস্ক প্রভৃতি স্বাধীনতা দেয় না কুর্দীদের, ফিলিপাইন দেয় না মোরোদের স্বাধীনতা, ইন্দোনেশিয়া দখলে রাখে টিমুর, ভারত দখলে রাখে লাক্ষ দ্বীপ, কাশ্মীর, আন্দামান-নিকোবর, আর মঙ্গোলগোত্র অধ্যুষিত উত্তর-পূর্বের সাতটি গৌত্রিক অঞ্চল। বাঙলাদেশে অবহেলিত সব প্রান্তিক উপজাতি, জনজাতি ও আদিবাসী, রাশিয়া ছাড়ে না চেচনিয়া, বাইলোরাশিয়া।

শ্রীলংকার তামিলদের এবং মায়ানমার কারেনদের কিংবা কম্বোডিয়ার খেমাররুজদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। স্মর্তব্য সাইপ্রাস নিয়ন্ত্রণে রাখে তুর্কিরা, গ্রীকরা, জাতিত্বের যুক্তিতে তিব্বতের তাইওয়ানের স্বাতন্ত্র্য-স্বাধীনতা স্বীকার করতে চায় না চীন সরকার, বন্দরশহর হংকংও যাচ্ছে তাই চীনের অধিকারে । পররাজ্যগ্রাস নিয়ে বিরোধ-বিবাদ রয়েছে পৃথিবীর নানাদিকে ছোটো বড়ো মাঝারি বহু বহু রাষ্ট্রের মধ্যে, এসব সীমান্ত বিরোধ মাঝেমধ্যে যুদ্ধের রূপ নেয়। চলে বেশ কিছুকাল। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের মেসিডোনিয়া এখন যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীসের সীমান্ত অঞ্চল বিশেষ।

প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হয়েছিল রক্তাক্ত বিচ্ছিন্নতা যুদ্ধের অবসানে, ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে স্বাধীন হয়েছিল রক্তস্নানের মাধ্যমে। তবু একালেই একটি দেশ আপোসে দু'রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে সহবাস করছে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুররূপে। মধ্যযুগে ভারতবর্ষের ইতিহাসেও প্রায় আপোসে একান্নবর্তী পরিবারের পৃথক হওয়ার মতো করেই পাঁচভাগে বিভক্ত হয়েছিল বাহমনী রাজ্য। আহমদনগর, বিজাপুর, গোলকুন্ডা, বেরার ও বিদর রাজ্যের উদ্ভব ঘটে এভাবেই, তেমনি পুনায় পেশোয়া, বরোদায় গাইকোয়াড়, নাগপুরে ভোঁসলা এবং অন্য দুই রাজ্যে সিন্ধিয়া ও হোলকার মারাঠা রাজ্য বিখণ্ডিত করে শাসক হয়ে বসেন।

কামে-প্রেমে-লাভে-লোভে-স্বার্থে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষায় ভিন্নতা বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। এসব ক্ষেত্রে প্রলুব্ধ ব্যক্তিদের কিংবা প্রলোভন মানুষের মিলন ঘটায়, আবার বিরোধ-বিবাদ-বিচ্ছেদ এবং কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানিও ঘটায়।

কামে-প্রেমে-লাভে-লোভে-স্বার্থে কেবল যে ব্যক্তিমানুষ সুবিধাবাদী, সুযোগ সন্ধানী, নগদজীবী বেপরোয়া বেহায়া বেদানাই হয় তা নয়, এ কালের রাজ্য-রাষ্ট্র এবং রাজনীতিক দলগুলো অযৌক্তিক, অবৌদ্ধিক, নিন্দিত, ধিকৃত সহিংস হিংস্র কর্মে-আচরণে নিযুক্ত থাকে ভয়-লজ্জা-বিবেক বর্জন করে।

তাই আমরা রাজনীতিক দলগুলোতেও মাছ-মোরগ হত্যার মতো নরহত্যা দেখতে পাই প্রতিদিন। রাষ্ট্রিক স্বার্থে নরহত্যা চলে গোটা পৃথিবীর সর্বত্র। এ সব কখনো অন্যায়-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমানবিক বলে বিবেচিত হয় না সভ্যতা-সংস্কৃতি-শাস্ত্র-সুরুচি-মানবতা প্রভৃতির ধারক, বাহক ও প্রচারকদের সমাজেও। প্রবলমাত্রই নিজ স্বার্থে প্রাণীর মতো অসংযত প্রবৃত্তিচালিত থাকে সারাজীবন, তবে মনুষ্যত্ব থাকে কোথায়?

শাক্ত

কথায় বলে 'মানুষ শক্তের ভক্ত/নরমের যম'। সবাই শক্তির পুজো করে। যারই শক্তি আছে, সে-ই গণ্য, মান্য, পূজ্য এবং বাহ্যত ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র, ভয়-ভক্তি-ভরসার উৎস। এ তাৎপর্যে মানুষমাত্রই শাক্ত। স্তব-স্তুতি-প্রশস্তি, তোয়াজ-তোষামোদ পায় আসমানের অদৃশ্য-অরি-মিত্র অপদেবতা-উপদেবতা আর কেতাবোক্ত দেবতাদি নানা সুরাসুর। যে প্রবল সেই পায় স্তব স্তুতি-প্রশস্তি, প্রবলই ক্ষতি করতে পারে, কাজেই সে-অরি হলেও, দুষ্ট-দুর্জন-দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতি হলেও তাকেও ভয়মুক্ত থাকার গরজে, ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে পুজো-সিন্নি দিতে হয়। এক্ষেত্রে অরিশক্তিই মিত্রশক্তির চেয়ে বেশি আদর-কদর তোয়াজ-তোষামোদ পায়। যেমন– মনসা, ষষ্ঠী, ওলা-শীতলা-গণেশ-বাঘের কর্মীদের দেবতা আতঙ্কিত জনের পুজো পায়, কিন্তু ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা পান না।

সন্ত-সন্ন্যাসী-ফকির-দরবেশ-ব্রহ্মচারী-শ্রমণ-গুরু-পীর অধ্যাত্মশক্তিধর বলে পরিচিত ও স্বীকৃত। তাই তাঁদের পদধূলিও শিরোধার্য, তাঁদের পদসেবায় অভাজনের জীবন হয় ধন্য। মানুষ একাধারে, যুগপৎ শক্তির বশ ও সাধক। যেখানে শক্তি, সেখানেই মানুষের আকর্ষণ, মানুষ শক্তির অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত। তাই শুধু শক্তিমান মানুষ নয়, শক্তিকল্প অদৃশ্য লৌকিক, অলৌকিক, স্থানিক, শাস্ত্রিক, কাল্পনিক দেবতা, উপদেবতা, অপদেবতাও নয়, বাণীর ও বস্তুর শক্তিতেও মানুষ আস্থাবান ও আকৃষ্ট। তাই জাদুটোনা, তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, বাণ-উচ্চাটন, তাবিজ-কবচ, মন্ত্র-মাদুলী, মন্ত্রপূত পানি-ধূলি-তাগা-ধাতু-পাথর প্রভৃতি নানাপ্রকার শক্তিধর ও সিদ্ধপুরুষ-নারীর মুখের থুথুর আর মুখ নিঃসৃত হাওয়ার মূল্য-মর্যাদা-গুরুত্ব ও প্রতিষেধক-প্রতিরোধক শক্তি অপরিসীম বলে আজো পৃথিবীর অধিকাংশ নারী-পুরুষের বলতে গেলে শাস্ত্রে বিশ্বাসী আস্তিক মাত্রেরই দৃঢ়বিশ্বাস। এখানেই শেষ নয় সকালের বিকালের দিন-ক্ষণের দিবা-রাত্রির তিথি-লগ্নের, শনি-মঙ্গলবারের চাঁদ-সূর্য-নক্ষত্রের এবং রাশির সংস্থিতির প্রভাব যে মনুষ্য কর্মে ও জীবনে সার্বক্ষণিক সে-বিশ্বাসও হালকা নয়, গভীর ও ব্যাপক। খ্রীস্টানদের কাছে যিশু যেমন অর্ধেক নর অর্ধেক ঈশ্বর, বৌদ্ধদের কাছেও তেমনি গৌতমবুদ্ধ তথাগত রূপে একাধারে ও যুগপৎ লৌকিক ও অলৌকিক, ঐহিক ও অদৃশ্য অপার্থিব শক্তি। অন্যান্য নবী-অবতারও মর্ত্যের হয়েও অলৌকিক শক্তিধর আসমানী। ভারতে হিন্দুদের যেমন নানা তীর্থক্ষেত্র তথা দেবস্থান রয়েছে, মুসলিমদেরও তেমনি রয়েছে পীর-দরবেশের দরগাহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাছাড়া মানুষের জীবন বারো বা তেরো রাশি নিয়ন্ত্রিত, হস্তরেখা, কপালের রেখা প্রভৃতি তার জীবন-কর্ম-আচরণ-সাফল্য-ব্যর্থতা নির্দেশক। আত্মপ্রত্যয়ী নয় বলে এখানেই তার বিশ্বাস সংস্কার-ধারণার শেষ নয়। সে কথায় কথায় অদৃশ্য শক্তির নিয়ন্ত্রণানুভূতির অভিব্যক্তি দেয়। অদৃশ্য জীবন ও কর্ম নিয়ন্তা শক্তি যদি বাঁচায়, যদি সুস্থ রাখে, যদি ইচ্ছা করে, যদি প্রকৃতি বিরূপ হয়ে বিপর্যয় না ঘটায়, তাহলে কাল যাব, পরশু করব, আগামী মাসে পরীক্ষা দেব, কিছুদিনের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দেব ইত্যাদি। কখনো স্বনির্ভর হয়ে, নিজের ইচ্ছাতে, শক্তিতে, স্বাধীনতায় আস্থা রেখে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে কোনো আস্তিক মানুষই ইচ্ছা, সংকল্প, অভিপ্রায় বাস্তবায়নের রূপরেখা রূপায়ণের, কার্যকর করার কথা ভাবতেও পারে না । গাছ, বড় দীঘি, নদী, সমুদ্র, রাত্রি প্রভৃতিও অদৃশ্য শক্তির স্থিতির ও বিচরণের স্থল। ভূত, প্রেত, পিশাচ, দৈত্য, দানব, জীন-পরী প্রভৃতি অপ ও উপশক্তিধর প্রমূর্ত হয়ে দেখা দেয় রাত্রে– পেচক, বাদুড়, মশার, ছুঁচোর মতোই। এসব শক্তি আলোকে, সূর্যকে, অগ্নিকে এমনকি লৌহকেও ভয় পায়, তাই একালের শহরে এদরে ঠাঁই হয় না– বড় বৃক্ষে, দীঘিতে, কামানে, ভাঙা মন্দিরে, শ্মশানে, কবরস্থানে, কিন্তু গাঁয়ে এরা এখনো অবিলুপ্ত। অবশ্য বিদ্যুতের, বিজলি বাতির প্রসারে সেখানেও হয়তো এদের স্থিতিকাল শিগগির ফুরাবে। নিয়তি-নির্ভর আত্মপ্রত্যয়হীন মানুষের বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার ও আচার-আচরণের যা কিছু বয়ান করলাম, তাঁর একটিও নতুন নয়, অতি পুরাতন কথার বয়ান বা পুনর্বয়ান মাত্র।

কিন্তু মানুষ আজো নিরীশ্বর-নাস্তিক-আস্তিক-নিয়তিবাদী, পূর্বজীবনের কর্মফলবাদী নির্বিশেষে শাক্ত। শুধু যে অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির স্তব-স্তুতি-প্রশস্তি-পূজায় যে তারা পাকা তা নয়, শক্তিমান মানুষের তোয়াজে-তোষামোদে-চাটুকারিতায়-পদলেহিতায় তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা-প্রতিযোগিতা সযত্ন-সতর্ক প্রয়াস, পদ-পদবী লাভের জন্যে ছুটোছুটি, ঘৃণা-লজ্জা-হায়া-শরম-সংকোচ পরিহারে, গৃধ্নু কাঙাল মনের নগ্ন প্রকাশে, এমনকি ন্যূনতম মানবিকগুণ বর্জনে তারা অতুল্য। তাদের কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য প্রাপ্তির আকুলতা দেখে আত্মসত্তার মূল-মর্যাদা সচেতন কিছু আত্মসম্মানপ্রিয় লোক নিজেকে ওদেরই প্রজাতির একজন বলে ভাবতে লজ্জাবোধ করে। নিঃস্ব যেমন অন্ন-বস্ত্র চায়, দরিদ্রও তেমনি ধন কামনা করে। ধন পেলে সেও মান চায়। মান পেতে হলে ক্ষমতা থাকা চাই, ক্ষমতা পেতে হলে পদ-পদবী পাওয়া দরকার। আর এ সবকিছুর জন্যে পুঁজি-পাথেয় হচ্ছে বিদ্যা-বিত্ত-বেসাত-যোগ্যতা-দক্ষতা-উচ্চাশা স্তব-স্তুতি-প্রশস্তি-চাটুকারিতা, পদলেহিতা, তোয়াজ-তোষামোদ। মনগলিয়ে কৃপা করুণা দয়া-দাক্ষিণ্য পাওয়া সহজ শক্তিমান অদৃশ্য আসমানী কিংবা মর্ত্যমানব শক্তির।

আজ চোখের সামনে দেখছি, মানুষের নৈতিক চেতনা বিলুপ্ত হচ্ছে, কিংবা এ চেতনার উন্মেষই ঘটছে না, আদর্শিক চেতনা, আদর্শনিষ্ঠা প্রভৃতিও অকেজো বলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। দৌড় প্রতিযোগিতা চলছে জনবহুল বেকারবহুল অর্থে-সম্পদে কাঙাল মানুষের মধ্যে বাঁচার ও স্বজনকে বাঁচাবার গরজে এবং স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে জীবন-জীবিকায় নিশ্চিত প্রাপ্তি লক্ষ্যে। তাই আজ শিক্ষিত শহুরে মানুষমাত্রই পরস্পরের প্রতিযোগী ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিদ্বন্দ্বী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ করেছিল এদের ভেজালদার, চোরা আড়তদার, মৌজুতদার, চোরাচালানদার, আর করেছিল তাদের প্রবঞ্চক প্রতারক অনৃত ও চৌর্যপ্রবণ, পাপ-পুণ্য, নীতি-আদর্শচেতনারিক্ত। ভারতবর্ষ বিভক্তিযোগে স্বাধীনতা করেছিল তাদের হিংস্র নররক্ত পিপাসু এবং সম্পদলিপ্সু প্রতারক ও লুটেরা। আর্থিক স্বাধীনতার মুক্তিযুদ্ধ তাদের করেছিল হননে-দহনে-ভাঙনে-লুণ্ঠনে জোরে ও জুলুমে জবর দখলে দক্ষ ও অভ্যস্ত। ফলে আজ শহরে-বন্দরে গাঁয়ে-গঞ্জে মহল্লায়-পাড়ায় আমরা মস্তান-গুণ্ডা-খুনী শাসিত-শোষিত-পীড়িত-নির্যাতিত ত্রস্ত মানুষ। এর মধ্যেই দেখি উচ্চাশীরা সুযোগ-সুবিধে সন্ধানে প্রাপ্তির উদ্যম উদ্যোগে প্রয়োজনে আয়োজনে অঙ্গীকারে বেহায়া বেশরম, বেলেহাজ বেদরদ বেদানাই বেআদব বেআক্কেল বেরহম বেদিল বেল্লিক হয়ে গোটা সমাজের চেহারা-সুরত বদলে দিয়েছে। পূর্বেকার নীতি-আদর্শের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এতে মর্মাহত, মনুষ্যত্বের, মানবিকতার, মানবতার পরিহারে, প্রত্যাখ্যানে, অবমাননায় এঁরা ক্ষুব্ধ, হতাশ ও লজ্জিত।

১৯৭১ সনের মার্চ মাসের মতোই ১৯৯৬ সনের মার্চ মাসে বিদ্রোহী বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীর আহবানে সরকারের পতন আসন্ন ও আপন্ন দেখে সুযোগসন্ধানী, সুবিধেবাদী নগদপ্রাপ্তিজীবী নানা পেশার উচ্চাশী শিক্ষিতমাত্রই যেভাবে নীতিনীয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথাপদ্ধতি লঙ্ঘন ও উপেক্ষা করে বিজয়ীদের তথা হবু সরকারের কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য-নেকনজর পাওয়ার জন্যে হায়া-শরম-সংকোচ পরিহার করে জনতার মঞ্চে আস্ফালন করতে, জনতার মিছিলে ভিড়তে দেখা গেল, তাতে মনে হল সামান্য মানবিক গুণ- গৌরব-গর্বও তাদের মধ্যে কখনো উন্মেষিত হয়নি। বিগত দু'বছর তারা ছিল নীরব-নিষ্ক্রিয়-অবিচল নিরীহ দর্শক মাত্র। হঠাৎ বিরোধী দলকে প্রবল ও সরকারকে দুর্বল বলে প্রতিভাত হতে দেখেই বকেরা নিরীহতা, কমঠের মুখগুপ্তি, শেয়ালের নীরবতা প্রত্যাখ্যাত হল। শিক্ষিত শহুরে মানুষের মুখোশ স্খলিত হল, ধূর্ততা ও গৃধ্নুতা নগ্নরূপ ধারণ করল। বিবর থেকে বের হয়ে এল নানা পেশার ও বিভিন্ন বয়সের নামী-দামী লোকেরা। তাদের আত্মসম্মানে বাধল না, অথচ তারা সুনাগরিক হলে দেশের গণমানবের স্বার্থে ও হিতার্থে দু'বছর আগেই সরকারি বা বিরোধী দলে নিজেদের বিবেকী দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে সমর্থক হিসেবে জুটে যেতে পারত, অথবা উভয় দলের নগ্ন ক্ষমতার লড়াইয়ের প্রতি বিরক্তি বশে প্রতিকার লক্ষ্যে প্রতিবাদী ও প্রতিরোধী তৃতীয় শক্তিরূপে রাস্তায় নামতে পারত, পারত আমজনতার সমর্থনে নতুন দল গড়ে তুলতে। তাদের এ সারমেয় ও ফেরু স্বভাবের ও আচরণের সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়ে আমরা জাতির অদূরভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ ও নিরাশ। সব মানুষ এমন শাক্ত হলে সে-জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়। দেশে স্বভাবে বাউল-বৈরাগী-সন্ত-সন্ন্যাসী না থাকলে সমাজ ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুবিধাবাদীর, সুযোগ সন্ধানীর ও নগদজীবীর দেশ বাঙলাদেশ

রামকৃষ্ণ পরমহংস আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে অধ্যাত্মসিদ্ধির জন্যে যে-কোনো সাধকের ঘৃণা-লজ্জা-ভয় পরিহার করা আবশ্যিক ও জরুরি বলে দেশনা দিতেন। কেননা তাঁর মতে এগুলো হচ্ছে গৃহী মানুষের জীবনযাত্রার আবশ্যিক ও জরুরি পুঁজি-পাথেয়। হালকা রসিকতায় অনেকেই বলে থাকে যে, হিন্দুরা যা করে মুসলিমেরা তার উল্টোটা করলেই সে হবে নিষ্ঠাবান মুমিন। কারণ কাফের ও মুমিন দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা নৈতিক ও আদর্শিক জীবনচেতনায়।

সাধক রামকৃষ্ণ অধ্যাত্মসাধনায় সিদ্ধির পন্থা নির্দেশ করেছিলেন মুখ্যত হিন্দুদের। কাজেই হিন্দুর বিপরীত আচরণই যেহেতু মুসলিমের পক্ষে শ্রেয় বলে মুসলিমরা মানে, সেজন্যেই সম্ভবত রামকৃষ্ণের বাণী বাঙলাদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে অর্থাৎ মর্ত্যজীবন জীবিকা ক্ষেত্রে ফায়দা লোটার জন্যেই বাঙালি মুসলিমরা প্রকাশ্যে হায়া-শরম-সংকোচ পরিহার করে লোকনিন্দা ও ঘৃণা উপেক্ষা করে নৈতিক ও আদর্শিক চেতনা বর্জন করে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে, কাগজে ছবি ছাপিয়ে দলছুট হয়ে কিংবা চিরকেলে বিবরবাস ছেড়ে ঢাকা শহরে রাজনীতিক দলের হেড অফিসে হাজির হয়েছেন, এখনো হচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন।

এঁদের মধ্যে সব শ্রেণীর ও পেশার লোক রয়েছেন, এঁদের সাধারণ লাক্ষণিক রূপ হচ্ছে এঁরা ধনী, আর্থবান, বিত্তবান ব্যক্তি এবং মান ও ক্ষমতালিপ্সু। তাই সামরিক বেসামরিক দফতরে বড় চাকুরে হয়েও ব্যবসায় বাণিজ্যে, কারখানায় পণ্য উৎপাদনে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েও, মর্ত্যজীবনে সর্বপ্রকারের ও সর্ব অঞ্চলের বা দেশের ভোগ্য, উপভোগ্য ও সম্ভোগ্য সবকিছু আয়ত্তে পেয়েও, সর্ব কিসিমের সুখ-আনন্দ, আরাম-আয়েশ, বিনোদন-বিলাস, ভোগ-উপভোগ করেও এঁরা সাংসদ পদপ্রার্থী হচ্ছেন লাখ লাখ, কোটি কোটি টাকা অপচিত হবে জেনেও। আমরা জানি ধন হলে মানুষ মানলোভী হন। আবার 'সুনাম' পেতে হলে দানে ও দাক্ষিণ্যে কৃপায়-করুণায় কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয়, নানা প্রতিষ্ঠানে চাঁদা দিতে হয়, মসজিদ-মন্দির, দীঘি-রাস্তা, বিদ্যালয়-পাঠাগার প্রভৃতিও নির্মাণ করতে হয়। এতে সুনাম হয়, সালামও হয়তো মেলে, কিন্তু ক্ষমতাবানের 'মান' মেলে না, অর্জিত হয় না দর্প-দাপট, প্রভাব-প্রতিপত্তি। তার জন্যে চাই ক্ষমতার আসন, পদ ও পদবী। কাজেই নিখুঁত-নির্বিঘ্ন ও অভিলষিত মান পেতে হলে একাধারে ও যুগপৎ মান-যশ, খ্যাতি-ক্ষমতা, অর্থ-বিত্ত-বেসাত, দর্প-দাপট, প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করতে হলে সাংসদ হওয়া চাই-ই, মন্ত্রী না-ই বা হওয়া গেল। নইলে সৎ উপায়ে অর্জিত এতো ধনদৌলত অসার্থক হয়ে যায় য়ে! পদ-পদবীহীন কতো দরিদ্র বানানো-কথার স্রষ্টা কবি-গাল্পিক-ঔপন্যাসিক লোকস্মৃতিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অমর হয়ে থাকে, আর শাসনের, শোষণের, পীড়নের, অর্থ-বিত্ত- বেসাতের মালিক ও নিয়ন্তা হয়েও জীবৎকালে খ্যাতি-ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত থেকে এ দুর্লভ মানব জীবন বৃথা ও ব্যর্থ করে দেবে এমনটা এদের সম্বন্ধে ভাবা আমজনতার পক্ষে এক প্রকারের চরম অসৌজন্যের ও অকৃতজ্ঞতারই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শামিল। আমরা এ-ও জানি বিত্তবানেরা ক্বচিৎ চিত্তবান হন। কারণ লাভের ব্যবসায়ী মাত্রই ক্ষতির আশঙ্কাকাতর। সেনানীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ভেতরের বাইরের দ্রোহী শত্রুর দলন-দমন ও হনন। সওদাগরের লক্ষ্য লাভকরণ ও লোকসান এড়ানো। আমলার কাজ জনগণকে শাসনে প্রশাসনে, নিয়ন্ত্রণে শায়েস্তা রাখা । রাজনীতিক মাত্রেরই লক্ষ্য প্রচারে-প্রচারণায়, কাগজে, বিবৃতিতে, মেঠো ভাষণে ও সড়কী মিছিলে জনগণের সেবায় দেহ-প্রাণ-মন উৎসর্গ করার ও মন-মগজ-মনন-মনীষা তাদের কল্যাণচিন্তায় নিযুক্ত রাখার অঙ্গীকার ও সংকল্প পরিব্যক্ত করা।

নির্বাচনী মৌসুমে যারা দলছুট হয়ে কিংবা অর্থেবিত্তে ঋদ্ধ হয়ে অবসেনানী-সওদাগর ও আমলা প্রভৃতি এ দলে ও দলে যোগ দিচ্ছেন তারা কোন নৈতিক চেতনায় ও আদর্শিক প্রেরণায় 'দল' পছন্দ করছেন তা বলেন না সাধারণত, কেবল দলের ও নেতৃত্বের তারিফ করেন। এই যে সুবিধাবাদী, সুযোগসন্ধানী, নগদজীবী নতুন পুরোনো রাজনীতিকেরা তৃতীয় বিশ্বের সব রাষ্ট্রেই নেতৃত্বের কর্তৃত্বের রাষ্ট্র শাসনের সুযোগ সুবিধে পান বিদেশী আর্থ-বাণিজ্যিক মহাজন রাষ্ট্রের অদৃশ্য ইঙ্গিত চালিত মুৎসুদ্দিরূপে, তাদের দিয়ে কি রাষ্ট্রের গণমানবের, আমজনতার কোনো সত্যিকার কল্যাণ হয়, হয়েছে কখনো, হতে পারে কি কখনো? কেন না তারা ঋণে-দানে-অনুদানে ত্রাণসামগ্রীতে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে সেভেন গ্যাটের কৃপা-করুণা-দান-দয়া-দাক্ষিণ্যজীবী এবং তৃতীয় বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সর্বাত্মক ও সর্বার্থক নিয়ন্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আজ্ঞাবহ।

অর্থ-বিত্ত-বেসাতের, মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতার, দর্প-দাপটের, প্রভাব-প্রতিপত্তির লিপ্সু মানুষের কোনো নীতি-আদর্শ থাকে না, যখন যেমন হওয়া দরকার, যখন যা করা প্রয়োজন, তা-ই করতে যারা ঘৃণা-লজ্জা-ভয় পরিহার করে, লোকনিন্দা, উপেক্ষা করে তাদের কোনো চরিত্র থাকে না, তারা নিবর্ণ। তারা লোভী, ধূর্ত বা চতুর চালবাজ কিন্তু এও সত্য যে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র নীতি-আদর্শে, ন্যায়নিষ্ঠা, অন্যায়, ভীতিতে অবক্ষয়গ্রস্ত না হলে হাটে-বাজারে, মাঠে-বাটে, শিক্ষালয়ে, দফতরে, জীবিকাক্ষেত্রে ও রাজনীতিক অঙ্গনে নৈতিক আদর্শিক চেতনারিক্ত মতলববাজ, দুর্নীতিবাজ সুবিধেবাদী, সুযোগসন্ধানী ও নগদজীবী বেহায়া, বেশরম, বেদানাই লোকের এতো আধিক্য ঘটে না।

আমাদের অন্যায়ের প্রতি, অন্যায়কারীর প্রতি, অপরাধের প্রতি, অপরাধীর প্রতি, পাপের প্রতি কোনো ঘৃণা নেই। আমাদের নিন্দাভীরুতা নেই, আমাদের বিবেকানুগত্য নেই। হয়তো বিবেক বা চিত্তবৃত্তিই হারিয়েছে তাই দুষ্ট, দুর্জন, দুর্বৃত্ত, দুষ্কৃতি বলে কুখ্যাত ও উপহসিত দুর্জনদের ঠাঁই নয় কেবল, পরম সমাদরে তারা সংবর্ধিত হচ্ছে এক একটা রাজনীতিক দলে। এদের অনেকেই রাজাকার, দুর্নীতিবাজ, দুশ্চরিত্র বলে কুখ্যাত। তবু সমাজে আমজনতার মধ্যে রাজনীতিক দলে এদের আদর-কদর, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ভোট প্রাপ্তি কমে না, এদের প্রতি কারো কোনো ঘৃণা আছে বলেও মনে হয় না। রূপকথায় আছে, যে রাজ্যে তেলের ও ঘিয়ের দাম সমান সেদেশে সুবিচার সুশাসন নেই, কাজেই সেদেশে বাস করতে নেই– কারণ সেদেশে জীবন যে কোনো সময়ে বিপন্ন হতে পারে। আমাদের দেশেও গাধা-ঘোড়া সমমর্যাদা পায়, কাজেই আমাদের দেশেও সরল শিষ্ট-সুজন নিঃস্ব নিরন্ন-দুস্থ-দরিদ্ররা গাঁয়ে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, পাড়ায়-মহল্লায়, সরকারি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেসরকারি, মস্তান-গুণ্ডা-খুনী এবং শাসক-প্রশাসকের হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলার নিত্য শিকার। দেশ ক্রমে বাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে। সাক্ষ্য প্রমাণও প্রকট : শিক্ষার্থীরা পালাচ্ছে ভরতে, জীবিকার সন্ধানে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে চলে যাচ্ছে বিদেশে। ধনীরা সন্তানদের স্থায়ীভাবে অভিবাসিত করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ব্রিটেনে, কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যান্ডে, জার্মানিতে। দেশে পড়ে থাকছে কে বা কারা? যারা শাসক-শোষক-প্রশাসক-সামরিক-অসামরিক চাকুরেরা আর অর্থ-বাণিজ্যপণ্য নিয়ন্ত্রক সওদাগর ও চোরাকারবারী বা কালোজগতের বাসিন্দারা। আর অসহায় অসমর্থ আমজনতা।

ত্রাস থেকে ত্রাণ চাই

একক কারণে কিছুই ঘটে না তা আমরা জানি। লঘু-গুরু অনেক কারণ পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে একটা ঘটনা ঘটায়, একটা রোগ সৃষ্টি করে। এ হচ্ছে বিজ্ঞানের ও আয়ুর্বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য। জৈন মতও অনেকান্তবাদ ভিত্তিক। কাজেই আমরা যে বহু বছর ধরে গাঁয়ে, গঞ্জে, বন্দরে, শহরে, পাড়ায়, মহল্লায়, পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে, স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনকি স্বঘরেও দিবারাত্র জান-মাল নিয়ে সপরিবারে নানা ত্রাসের মধ্যে, হামলার-হুমকি আসন্ন ও আপন্ন শঙ্কার মধ্যে অস্বস্তির, অনিরাপত্তার মধ্যে বাস করছি, তা সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে কাউকে জানানো-শোনানো-বোঝানোর প্রয়োজন নেই। কেননা তা ঘরে ঘরে অনুভূত ও উপলব্ধ বাস্তবে জানে-মালে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে। আমরা কারণ, কার্য, তত্ত্বের, তথ্যের ও সত্যের অমোঘতায় দৃঢ়প্রত্যয়ী। কিন্তু আমরা নিতান্ত অজ্ঞ, অসহায় নিম্নস্তরের আমজনতা বা গণমানব বলেই আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে তথ্য জ্ঞানের অভাবে কারণ-কার্য নিরূপণ সম্ভব নয়। এ কারণেই কারণনির্দেশ করে চিকিৎসকের মতো প্রতিকারের পথ নির্দিষ্ট করে দেয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। বলতে গেলে এ আমাদের সাধ্যাতীত। কিন্তু অনুমানে বুঝি এ ত্রাসের উদ্ভবের মূলে ও সঙ্গে জড়িত রয়েছে গণমানবের অজ্ঞতা, অনক্ষরতা, নিরন্নতা, নিঃস্বতা, দুস্থতা, দরিদ্রতা, অসহায়তা, উদাসীনতা, বেকারত্ব, আয়ের উপায়হীনতা, জনসংখ্যার সঙ্গে সমতা রেখে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার ও রাখার সরকারি ও ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক অসামর্থ্য এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবন-প্রকৌশল-প্রযুক্তির বিস্তার, যন্ত্রের নির্মাণ ও উৎকর্ষ, সৃষ্ট ও নির্মিত সামগ্রীর বৈচিত্র্য ও বাহুল্য প্রভৃতি নানা কারণে মধ্যযুগীয় গতানুগতিক আবর্তিত ধারার জীবন-যাপন পদ্ধতির বিবর্তন-পরিবর্তন স্রোতের গতি হয়েছে দ্রুততর। বন্ধ্য মনের মগজের মননের মনীষার মানুষের নিয়ন্ত্রিত শাসনে প্রশাসনে অর্থ-বাণিজ্য, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতির অনুৎকর্ষ ও গতানুগতিক সমকালীন চেতনার বিস্তারের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না। তাই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের মানসিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজন-চাহিদা পূরণের অসামর্থ্যজাত অসমঞ্জস, অসঙ্গত, অযৌক্তিক, অবৌদ্ধিক স্ববিরোধী চিন্তা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেতনা চালিত বিচ্ছিন্ন অসমন্বিত, বিপরীতমুখী কর্ম-আচরণ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বদা ও সর্বথা সর্বাত্মক ও নীতি নিয়মের, রীতিরেওয়াজের, প্রথাপদ্ধতির বাঁধন যুক্ত। মনে হয় বিজ্ঞানের ও দর্শনের চর্চা সমতালে ও সমগতিতে হওয়া দরকার এ সমস্যা মুক্তির লক্ষ্যে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার-উদ্ভাবন, নির্মাণ ও যন্ত্র সৃষ্টিজাত বাহ্য ও আন্তর জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে সমাজবিজ্ঞানীর ও দার্শনিকের সামাজিক নীতি-নিয়ম পালনের পরামর্শ দেয়া উচিত। যেমন দিতে চেয়েছিলেন প্লেটো বা উনিশ শতকের নিটশে। ব্যক্তিজীবনে শাস্ত্রিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক বন্ধনচেতনা হয় বিলুপ্ত নতুবা শিথিল। আজ তাই আমরা সর্বপ্রকার দুর্নীতির, কাপট্যের, চরিত্রহীনতার, মতলববাজির, বঞ্চনার, প্রতারণার এবং কালোবাজারীর ও দুনম্বরী নীতির শিকার। প্রতিটি দ্বিতীয় ব্যক্তি এখন আমরা বঞ্চক-প্রতারক ও শত্রুরূপে সন্দেহের অনাস্থার পাত্র। অথচ দলীয় বা সামাজিক জীবনে পারস্পরিক বিশ্বাস-ভরসা-নির্ভরতাই হচ্ছে জীবন যাপনের পুঁজি ও পাথেয়, উৎস ও ভিত্তি।

আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে নয় কেবল, গ্রামীণ জীবনেও দেখেছি যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে গ্রামীণ সমাজেও ব্যক্তিক উচ্ছৃঙ্খলতায় বিপর্যয় ঘটে। সামাজ যোগ্য সর্দারের অভাবে জনগণের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায়। প্রবল পরিবার, উচ্চাশী, দুষ্ট, দুর্জন, দুর্বৃত্ত, দুষ্কৃতি, স্বৈরস্বেচ্ছাচারী হয়ে অন্যের অধিকারে হামলা করে। নির্যাতিত, হৃতসম্পদ হয় দুর্বল অসহায় ব্যক্তি বা পরিবার। এখন 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।' আবার কিছুকাল পরে পরপ্রজন্মের লোকের হাতে সর্দারির ভার পড়লে বুড়ো সর্দারের মৃত্যুতে এবং উপসর্দারদের মগজী পরামর্শে ও সমর্থনে গ্রামীণ সমাজে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। তখন গ্রামের জনগণের শাস্ত্রিক নৈতিক আদর্শিক চেতনা ও নিষ্ঠা প্রবল হয়। রাষ্ট্রিক জীবনও যোগ্য নেতৃত্ব ও দক্ষ প্রশাসক নির্ভর। নৈতিক-আদর্শিক চেতনাপ্রসূত পরার্থপরতা বা পরহিত প্রয়াস নেতাদের ও প্রশাসকদের মধ্যে না থাকলে, রাজনীতিক দলগুলো আন্তরিকভাবে গণহিতবাদী না হলে, রাষ্ট্রে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে না। আমাদের রাষ্ট্রে এ মুহূর্তেও ত্রাসের রাজত্ব চলছে সর্বত্র। সরকারের পুরস্কৃত করার প্রলোভনেও, ক্ষমতা প্রদর্শনেও, কঠোর শাস্তি দানের হুমকিতেও স্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং দেশের গাঁয়ে, গঞ্জে, শহরে, বন্দরে, পাড়ায়, মহল্লায়, হাটে-বাজারে, শহরের রাস্তায় অস্ত্রধারী মস্তান-গুণ্ডা-খুনী-চাঁদাবাজেরা ছিনতাই ও নরহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে বেপরওয়াভাবে। এ ত্রাস থেকে বাঙলাদেশী গণমানব আমজনতা ত্রাণ চায় সরকারের ও রাজনীতিক দলগুলোর কাছে। কারণ তাদের আশ্রয় থেকে, প্রশ্রয় পেয়ে এবং অনেক সময়ে নাকি তাদের স্বার্থে, ইঙ্গিতে ও নির্দেশে, তাদেরই দেয়া অর্থে উৎসাহী, তাদেরই দেয়া অস্ত্র নিয়ে ছাত্র-যুবক-নামধারীরা এবং তাদেরই দেখাদেখি বেকারগুণ্ডারা এবং সন্ত্রাসী লুটেরা এবং সহিংস বিপ্লবে আস্থাবান সংগ্রামীরা অস্ত্রসমর্পণে এগিয়ে আসছে না। জনগণের মধ্যে বুদ্ধিমানদের কিছু মগজী শিক্ষিত লোকের ধারণা রাজনীতিক দলগুলোর প্রকাশ্যে ও গোপনে অঙ্গদল তথা ছাত্র-যুবদল বিলুপ্তিতেই কেবল দেশবাসীকে নিরস্ত্র করা যাবে সহজেই। রাজনীতিক দলগুলো অঙ্গদল বিলুপ্ত করতে রাজি আছে কি? স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে, হলে-হোস্টেলে ছাত্র পরিষদ বিলুপ্ত করা কঠিন কাজ কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়ুন, প্রতিযোগিতা করুন

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতিযোগিতায় স্থূল ও সূক্ষ্ম বাহ্য ও আন্তর পার্থক্য রয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঈর্ষা-অসূয়া জাগায়, হার জিতের পরে বিজিত সংযমের সহিষ্ণুতার বিবেকী বিবেচনাশক্তির স্বল্পতার দরুন মারামারি-হানাহানিপ্রবণ হয়। ফলে তা সংঘর্ষ-সংঘাত-লড়াই অনিবার্য করে তোলে। আর প্রতিযোগিতা মানুষকে আত্মপ্রত্যয়ী হতে, আত্মোন্নয়নের অনুশীলনে ব্যক্তিকে, সমাজকে, গোত্রকে, গোষ্ঠীকে, দেশকে, রাষ্ট্রকে উদ্বুদ্ধ ও প্রবুদ্ধ রাখে। প্রতিযোগী মাত্রই আত্মবিকাশে, আত্মোন্নয়নে, আত্মপ্রতিষ্ঠায় আগ্রহী, সে জন্যেই সে দেহ-প্রাণ-মন-মগজ-মনন-মনীষার পরিচর্যার মানিবকগুণের উৎকর্ষ সাধনে নিরত থাকে-ব্যবহারিক ও চৈত্তিক ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে প্রতিদ্বন্দ্বী দেহে-প্রাণে-মনে-মগজে মননে-মনীষায় যত ক্ষীণ ও দীন থাকে, অনুশীলনের অভাবে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনার ক্ষেত্রে হীন, অদক্ষ, অনিপুণ, আত্মপ্রত্যয়হীন থাকে, ততো বেশি হয় ক্ষোভ, ক্রোধ, ঈর্ষা-অসূয়া ও হীনতার শিকার। ফলে অসংযত অহিষ্ণু অবিবেচক অস্থির উন্মত্তচিত্তচালিত হয়ে সে বিজয়ীর উপর হামলা চালানোর উত্তেজনা-প্ররোচনাকে ন্যায্য বলে মনে করে।

আমরা তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রবাসীরা অনুকৃত রাজনীতিতে অভ্যস্ত। আমাদের রাজনীতিক গণতন্ত্র, রাজনীতিক সংস্কৃতিচর্চা, দেশপ্রেম, মানবপ্রীতি, জনসেবা, পরার্থপরতা, রাষ্ট্রবাসীর সামষ্টিক, সামূহিক ও সামগ্রিক হিতচেতনা ও উপচিকীর্ষা এখনো প্রাথমিক স্তরে রয়ে গেছে অন্তরে-বাইরে, বুকে-মুখে, আচারে-আচরণে। তাই আমাদের ভাব-চিন্তা-আচরণে অযৌক্তিক অবৌদ্ধিক, অসঙ্গত, অসমঞ্জস, স্ববিরোধী বিপরীত লক্ষণ প্রকাশিত ও প্রকটিত হয়। আমরা তা টেরও পাই না, আর টের পেলেও রাজনীতিক চিন্তা-চেতনার, সংস্কৃতির, সুবিবেচনার ও আত্মসম্মানবোধের রিক্ততার দরুন তা লজ্জার, নিন্দার ও পরিহারের বিষয় বলে মনেই করি না।

এ জন্যেই আমাদের গণতন্ত্র হচ্ছে জঙ্গী শাসনের ফাঁকে ফাঁকে শ্রাবণের মেঘভাঙা রোদের মতো ক্ষণজীবী। এবং এ গণতন্ত্র হয় স্বরূপে ভোটতন্ত্র। কেনা বা জোরে জুলুমে প্রাপ্ত ভোটে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি তখন দায়িত্বশীল জনসেবক, জনহিতকামী থাকে না, হয়ে যায় আত্মসেবী মান-যশ-খ্যাতি-ক্ষমতা-প্রভাব-প্রতিপত্তি-দর্পদাপট-লোভী-বিত্ত-বেসাতঋদ্ধ-ধনিক-বণিক। এক কথায় তৃতীয় বিশ্বে রাজনীতিকরা দলগতভাবে সাধারণত স্বৈরাচারী লুটেরা সরকার রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। উপরে তত্ত্ব ও তথ্যরূপে যা বিবৃত হলো, তার আলোকে স্বদেশের দিকে তাকালে যে কেউ স্বদেশী রাজনীতিক অঙ্গনে, সামাজিক অবস্থায় এবং নাগরিকদের একাংশের স্বভাবে-চরিত্রে কর্মে আচরণে তা রূপে-স্বরূপে আক্ষরিকভাবে প্রত্যক্ষ করবে।

যেমন আমাদের রাজনীতি দলগুলোর মধ্যে চরিত্রে আদর্শে নীতিতে কর্মসূচিতে হিতৈষণায়, ত্যাগে, সেবায় সহিষ্ণুতায় শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় হওয়ার কোনো প্রতিযোগিতা বা প্রয়াস দেখা যায় না। বরং তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেদের পেশীশক্তিতে, অর্থবলে অতুল্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রমাণে হয় আগ্রহী। তাই সবদলই সশস্ত্র ছাত্রযুবা অঙ্গদল পোষণ করে এবং অঙ্গদলের প্রধানদের সত্য-মিথ্যা যাচাই না করেই আমজনতা মস্তান-গুণ্ডা-খুনী বলেই জানে এবং ভয় করে। এরাই এখন গাঁয়ে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, পাড়ায়-মহল্লায়, স্কুলে, কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্নদল ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে বলে রটিয়ে বেড়ায়। মেঠো জনসভায়, সড়কী মিছিলে, কাগুজে খবরের প্রতিবাদে ওরা হামলা চালায় হননে দহনে ধর্ষণে লুণ্ঠনে ভাঙনে জানের, মালের, শান্তির, নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটায় দেশের সর্বত্র। মানুষ বিপন্ন, উপদ্রুত ত্রস্ত জীবন যাপন করে ঘরে-বাইরে সপরিবার ও সসম্পদ। এ যে কেবল শিক্ষিতদের দারিদ্র্য ও বেকারত্ববৃদ্ধি জাত নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অনিয়ন্ত্রিত বেপরওয়া ডাকাতি, ব্যাংক লুট, ছিনতাই, মারামারি, কাড়াকাড়ি, হানাহানি, রেষারেষি, গুপ্তহত্যা, চাঁদাবাজি, নকলবাজি, চোরাকারবারী, ঘুষখোরী, জালিয়াতি, জোচ্চুরি, বঞ্চনা, প্রতারণা, মিথ্যাচার প্রভৃতি পুলিশের ও সরকারের তথা সমাজের ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, এ মুহূর্তে তৃতীয় বিশ্বের ব্যক্তির নীতি-আদর্শহীনতা, চরিত্রভ্রষ্টতা, ব্যভিচারিতা, অসততা, মিথ্যাবাদিতা, প্রকাশ্যে যৌনাচার প্রভৃতি নীতি-নীয়ম-আদর্শচ্যুত সমাজে ঘৃণ্য, ধিকৃত, নিন্দনীয়, অবজ্ঞেয় ও পরিহার্য বলে বিবেচিত নয়। তাই কুখ্যাত খুনী, সর্বজনবিদিত জালিয়াত, জেলখাটা অপরাধী, পরিচিত প্রতারক, কালোবাজারী বলে জ্ঞাত দলছুট দুষ্ট-সুবিধেবাদী, সুযোগ সন্ধানী নগদজীবী লোকেরাও এবং রাজনীতিক অঙ্গনে নবাগত অবসেনানী অবআমলা, নয়াধনিক ও নয়াবণিক ভোটের মৌসুমে রাজনীতিক হয়ে ভোট কিনে বা পেয়ে জনপ্রতিনিধি রূপে সাংসদ পার্ষদ পরিষদ হন। আর ভোটের সময়ে চলে জোর-জুলুম, ভোট কেনা-বেচা, মারামারি-হানাহানি, হতাহত হয় অনেকেই এবং ভোট সংগ্রহে চলে কারচুপি। তৃতীয় বিশ্বের সর্বত্র চালচিত্র প্রায় অভিন্ন। খেলার মতোই রাজনীতিতেও হার-জিত আছেই, থাকেই, থাকবেই। খেলোয়াড়ের মতোই সংযম ও সহিষ্ণুতা নিয়ে খেলায় অংশ নিতে হয়। এক কথায় খেলা যেমন হারে-জিতে হয় অবসিত, রাজনীতিক ভোটও কোনো না কোনো পক্ষের সংখ্যাধিক্যই নিরূপণ করে মাত্র। কিন্তু আমাদের রাজনীতিকসংস্কৃতি প্রত্যাশিত মাত্রায় উন্নীত না হওয়ায় নতুন জায়গা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপ পায় আমাদের রাজনীতিক কর্মকাণ্ড। তাই এ মুহূর্তে বাঙলাদেশে আমাদের নির্বাচনপূর্ব ও নির্বাচনউত্তরকালে একই রূপ রেষারেষি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রসূত মারামারি, হানাহানি, গালাগালি, কাদা ছোড়াছুড়ি এবং স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিক সংঘর্ষ সংঘাত চালু রয়েছে। এটি দেশ, কাল, সমাজ, ব্যক্তি, সরকার, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র প্রভৃতি সবকিছুর পক্ষেই অপরিমেয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর থেকে উদ্ধার বা মুক্ত হতে না পারলে আমাদের মানবিক গুণের, চিন্তা-চেতনার, আর্থিক, নৈতিক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিকাশ, বিস্তার, উৎকর্ষ সম্ভব হবে না কখনো। আমরা সর্ব প্রকারে, সর্বার্থক ও সর্বাত্মকভাবে বিপন্ন, ত্রস্ত, অবক্ষয়গ্রস্ত, কোন্দলদীর্ণ। নির্লক্ষ্য হয়ে আমরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, রাজনীতিক, শৈক্ষিক ও রাষ্ট্রিক জীবন অপচিত করছি প্রতি মুহূর্তে। আমাদের ইতিহাস অপচিত শ্রমের, সময়ের, আয়ুর ও জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিবৃত্তান্ত হয়েই থাকছে। আত্মোন্নয়নে আত্মোৎকর্ষে আত্মনিয়োগের সময় বয়ে যাচ্ছে, আমাদের গুণী-জ্ঞানী সুজন সজ্জন দেশহিতৈষী-মানবসেবীদের সম্বিৎ নিয়োজিত হওয়া আবশ্যিক ও জরুরি মানবতার সঙ্কটমুক্তির লক্ষ্যে।

মরুতে মরূদ্যান

জাতির সর্বাত্মক ও সর্বার্থক অবক্ষয় নিয়ে বয়োধর্মে সর্বক্ষণ দুঃখিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকি। কে না জানে বোঝে ও মানে যে, আমাদের এ মুহূর্তের ঘরেবাইরে, পরিবারে, সমাজে, রাজনীতিতে, সংস্কৃতিতে, আদালতে, দফতরে, বাজারে, দোকানে, ব্যবসায়, সীমান্তে, সর্বত্র নৈতিক, আদর্শিক, চারিত্রিক, ব্যবহারিক, বৈষয়িক, বিশুদ্ধি, অবিকৃতি, অকৃত্রিমতা, সততা, সৌজন্য, আস্থা, নির্ভরতা প্রভৃতি যাবতীয় মানবিক গুণের অভাব-অনুপস্থিতি প্রকট হয়ে উঠেছে।

আমাদের জীবনচেতনা জগৎভাবনা নিতান্ত সংকীর্ণ পরিসরে গতানুগতিক আবর্তিত ধারায় প্রবহমান। আমাদের মন-মগজ-মনন-মনীষা বন্ধ্যা। আমরা মানসিকভাবে মরুময় ও মরীচিকা মুগ্ধ। নতুন চেতনার ও চিন্তার বীজ মনে-মগজে-মননে-মনীষায় বুনেই দেশ-জাতি-সমাজ-রাষ্ট্র-সংস্কৃতি-সভ্যতা আবিষ্কার -উদ্ভাবন-নির্মাণ-সৃষ্টি এগিয়ে চলে, বিকশিত হয়, উৎকর্ষ লাভ করে। সেসব চেতনার ও চিন্তার চাষই যদি না হয়, বীজই বা বুনবে কে এবং কোথায়। সোভিয়েত রাশিয়ার বিলুপ্তির পর থেকে আমাদের কম্যুনিস্ট দলগুলো মৌসুমী ঔষধি তরুলতার মতো উদ্যম-উদ্যোগরিক্ত হয়ে বিলুপ্তির দিন গুনছে। কোথাও কোনো আশার আলো নেই, বরং আত্মসত্তার মূল্য-মর্যাদা-চেতনাহীন বেহায়া-বেশরম-বেলেহাজ-বেদানাই-বেদরদ-বেবুঝ-বেল্লিক-বেতমিজ লোকের বৃদ্ধিতে আমরা শঙ্কিত ও ত্রস্ত জীবনই যাপন করি অহোরাত্র। এমনি নৈরাশ্যগ্রস্ত হয়ে যখন মনমরা জীবন যাপন করছি, তখন হঠাৎ চোখে পড়ল তিনটে পত্রিকা। টবের তরু জলাভাবে মিইয়ে ঝিমিয়ে পড়লে সংকুচিত পত্রে জল ঢালার কয়েক মিনিটের মধ্যেই যেন নতুন প্রাণ পেয়ে চাঙা হয়ে ওঠে, আমি পত্রিকাগুলোর সুপরিকল্পিত আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে পরিব্যক্ত কথাগুলো দেখে চমকে উঠলাম, যেন চাঙা হয়ে উঠলাম নতুন আশায় ও আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে। যেন মরুতে আসন্ন মৃত্যুকবলিত ব্যক্তি মরূদ্যান খুঁজে পেলাম। প্রথম পত্রিকাটি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক সম্পাদিত 'লোকায়ত'। এতে লেখা আছেঃ

"যাদের বয়স আঠারো থেকে আটাশ, যারা জানতে চায়, বুঝতে চায়, তর্ক করতে চায়, নিকৃষ্ট উপলব্ধি ত্যাগ করে উৎকৃষ্ট উপলব্ধি অর্জন করতে চায় এবং অতীতের গর্ভ থেকে বর্তমানকে মুক্ত করে অন্যায়মুক্ত অভাবমুক্ত সমৃদ্ধ আনন্দময় নতুন স্বদেশ ও নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবী গড়ে তুলতে চায় 'লোকায়ত' অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঙাদেশের সেই তরুণদেরই পত্রিকা।

'লোকায়ত' তাদেরই পত্রিকা যারা জীবন-জগতের রহস্যে বিস্ময় ও কৌতূহল অনুভব করে, আনন্দিত, পুলকিত, বিচলিত ও উৎকণ্ঠিত হওয়ার সামর্থ্য রাখে, সৃষ্টির বেদনায় আকুল চঞ্চল অস্থির হয় এবং 'অপরীক্ষিত জীবন যাপনযোগ্য নয়'– এই বোধে তাড়িত হয়ে সবকিছু সম্পর্কে সন্দিহান হয় ও সংশয় নিরসনে কর্মচঞ্চল থাকে।

'লোকায়ত' তাদেরই পত্রিকা যারা নৈতিক সুখপদকে জীবনের কর্মনীতি রূপে উপলব্ধি করে। মুৎসুদ্দী বুদ্ধিজীবী, ফরমালি গবেষক, রাজনীতির ঠিকাদার, ডিগ্রিসর্বস্ব পণ্ডিত, ধূর্ত অধ্যাপক, চতুর সাংবাদিক, জ্ঞানপাপী ও মুখোশধারী প্রতারক, গতানুগতির দাস আর সংশয়হীন জিজ্ঞাসাবিমুখ সন্ধিসারিক্ত ধর্মান্ধ কাঠমোল্লা এই পত্রিকায় অনাহূত।" [চতুর্দশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই ১৯৯৬]

অপর পত্রিকাটি 'বিজ্ঞানচেতনা'। সম্পাদক আইয়ুব হোসেন, ত্রৈমাসিক। এ পত্রিকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য : "আমরা একটি জরুরী কাজে হাত লাগিয়েছি..... এই ভূখণ্ডের পশ্চাৎপদ একটি শ্রেণী বিভাজিত সমাজের অন্ধ আবেগ, সংস্কার ও বিশ্বাসে আচ্ছন্ন মানুষের চেতনায় নাড়া দিয়ে অগ্রসর করার গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বর্তে নিয়েছি। মানুষ ন্যূনপক্ষে প্রশ্ন করতে শিখুক। জিজ্ঞাসায় জর্জর করে তুলতে শিখুক প্রতিটি বিষয়কে। যুক্তিপ্রবণ হবার পূর্বশর্ত তো অই জিজ্ঞাসা প্রবণতা। এভাবে মানুষ পর্যায়ক্রমে জ্ঞানে, চিন্তায় আলোকিত হয়। আলোকিত বহুল মানুষ সমাজের সকল বন্ধ্যাত্ব অপসারণ করবে। সমাজের লঘু কর্তৃত্ব ভেঙে বহুর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় তথা সর্বজনীন সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে। সুষম সমাজের ভিত রচিত হবে।" [এপ্রিল-জুন ১৯৯৬]

"বলেন অনেকে– নষ্টসময়ে, ঘুণে-ক্ষয়ে বিধ্বস্ত সমাজ, আশান্বিত হবার নেই কিছু। চোখ মেলে দেখা যায় যতদূর, কেবলই হতাশার পাঁকে পূর্ণ। আমরা বলি না। চোখজোড়া আলতো ভঙ্গিতে বুলিয়ে গেলে তো ভেতরটা দেখা হয় না। অন্তর্দর্শনের জন্য অন্তর্চক্ষু মেলে ধরা চাই। তবেই অসংখ্য ইতিবাচক সুপ্ত উপাদানও দৃষ্টিসীমায় গ্রাহ্য হবে। নিজেকে সাধারণ্যে স্থাপিত করতে পারলে সাধারণের মাঝে যে অসাধারণ উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তা গোচরীভূত হবে।... সামজের গরিষ্ঠ সাধারণদের মাঝে মিলেমিশে যাবার মধ্যদিয়ে মহৎ আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে উঠবে বলে আমাদের ধারণা। সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা আয়ত্ত করতে হবে আমাদের। আয়ত্ত করতেও চাই আমরা। ঢালাও মত প্রকাশের যান্ত্রিক নিগড় থেকে চাই বেরোতে।" [জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৬]

অন্য পত্রিকাটির নাম "সমাজচেতনা"। এটি বিবর্তন গোষ্ঠীর মুখপত্র। এঁরা বিবর্তনবাদে ও সমাজ পরিবর্তনে আস্থাবান এবং এঁরা ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে-অঙ্গীকারে, উদ্যমে, উদ্যোগে, আয়োজনে সক্রিয়। এঁরাই আমাদের বল-ভরসার অবলম্বন। অতএব, মাভৈঃ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মমর্যাদায় উন্নতশির হতে হলে

মুসলমানমাত্রই মৌলবীর ওয়াজে আশৈশব শুনে থাকে যে 'মুসলিমরা আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করে না।' আর সবার কাছেই তার শির থাকে উন্নত। শাস্ত্রের অন্য সব বিধিনিষেধের প্রয়োজনে ও প্রলোভনে তর্ক করলেও পৃথিবীর মুসলিম শাসিত রাজ্য ও রাষ্ট্রগুলোর হাল-চাল হককিত দেখে মনে হয়, মুমিনেরা সত্য সত্যই কেবল আল্লাহর অনুরাগী; অনুগামী ও অনুগত থাকে রাজ্য-রাষ্ট্র-সরকার দখলে ও পরিচালনায়। তাই মুসলিম রাষ্ট্র-রাজ্যগুলোর মধ্যে একমাত্র মালয়েশিয়া ব্যতীত আর সর্বত্র জঙ্গী-নায়কের কিংবা স্বৈরাচারী-স্বেচ্ছাচারী আমীর-বাদশাহ-রাষ্ট্রপতি-রাষ্ট্রনায়ক শাসিত। এবং সবদেশেই ঘন ঘন ক্যু বা দ্রোহ লেগেই থাকে– বিশেষ করে কালো আফ্রিকার মুসলিম-খ্রীস্টান রাষ্ট্রগুলোতে। যেহেতু আল্লাহ ছাড়া কাউকে মানতে নেই, সেহেতু সম্ভবত শত বছর ধরে কুর্দীরা, বিশ বছর ধরে আফগানরা কেবলই বিরোধে-বিবাদে-দ্রোহে- লড়াইয়ে নিরত। কোনো রকমেই মীমাংসা হয় না। চুক্তি-সন্ধি কেবলই ভাঙে, সিদ্ধান্ত কেবলই পাল্টে যায়, মত কেবল পরিবর্তিত হয়।

এক কথায় মুসলিমরা এককালের মুসলিম রাজ্যে-রাষ্ট্রে কোনো নায়ক রাজা, শাসক, বস্ প্রভু মানতে চায় না। সুবিধে-সুযোগ পেলে উচ্চাশী শক্তিমান সাহসী মাত্রই নীতি-নিয়ম উপেক্ষা ও লঙ্ঘন করে কখনো কোনো নৈতিক, আদর্শিক, শাস্ত্রিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রশক্তির বাধাই মানে না। তখন অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা থাকে না, চক্ষুলজ্জা বর্জিত হয়, পাপের ভয়, লোকনিন্দার ভয়, আদালতী শাস্তির ভয় তাদের কাবু করতে পারে না, তখন তারা বেহায়া, বেশরম, বেদানাই, বেদরদ, বেআদব, বেলেহাজ, বেআক্কেল, বেইজ্জত, বেল্লিক হয়ে যায়। এক কথায় তখন তারা সম্মানবোধহীন ভালো-মন্দ চেতনারিক্ত মানবিকগুণ বর্জিত প্রলুব্ধ কিংবা লিপ্সু হিংস্র প্রাণী হয়ে যায়। উচ্চাশী শক্তিমান-সাহসীরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সুযোগ পায় এবং সফলও হয় তখনই সবচেয়ে বেশি, যখন দেশে বা রাষ্ট্রে নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ, দরিদ্র, অজ্ঞ. অনক্ষর লোকের সংখ্যা বেশি থাকে এবং বেকারের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। মানুষের জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে কর্মের ও অর্থের অনিশ্চিত ও অপ্রাচুর্য ঘটে। তখন এ অবস্থার ও অবস্থানের ফলে সমাজে আমজনতার মধ্যে সুযোগসন্ধানী, সুবিধেবাদী নগদজীবী চাটুকার পদলেহী, কৃপা-করুণা-দান-দয়া-দাক্ষিণ্যকামী আত্মসত্তার মূল্য-মর্যাদাবোধ বর্জিত মানবিক গুণরহিত মানব প্রজাতির প্রাণীর সংখ্যা বাড়ে ঘরে-বাইরে সর্বত্র। সমাজে তখন তেলের দাম ও ঘিয়ের দাম সমান হয়ে যায়, গাধা-ঘোড়া একইরূপ আদর-কদর পায়। গুণের মানুষ পায় অবহেলা, মানের মানুষ হয় প্রবল, পদ-পদবীই হয় খ্যাতি-ক্ষমতা ও আনুগত্য প্রাপ্তির পুঁজি। এ জন্যেই তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত রাজ্যে-রাষ্ট্রে পর্ষদ, পরিষদ-সমিতি সংস্থা-সঙ্ঘ-সংসদ সদস্য হওয়ার জন্যে অর্থ বিত্ত-বেসাতের মালিক অবসেনানী, অবআমলা, সওদাগর, শিল্পপতি ও ঠিকেদার প্রভৃতিই রাজনীতিক প্রশিক্ষণ, পরিচিতি, রাজনীতি বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণসেবা মনস্কতা না থাকা সত্ত্বেও দলীয় সমর্থনে ও অর্থের জোরে প্রভাব প্রতিপত্তি এবং তার সঙ্গে অর্থ-বিত্ত-বেসাত অর্জন করে ধন্য হয় নিজে, ধন্য করে পরিবারকে ও আত্মীয়-স্বজনকে স্থায়ী করে প্রাজন্মক্রমিক সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সম্মান প্রাপ্তি।

দেড় হাজার বছর ধরে মুসলিম রাজ্যে উত্তরাধিকার কোরআন-নির্দিষ্ট নয় বলেই উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ছিল স্বাভাবিক, আবশ্যিক ও জরুরি, উত্তরাধিকারীরা হতো সেয়ানা, সতর্ক লড়াকু। ফলে তখ্‌ত নিয়ে কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি এড়ানো যেত না। পেশীবলে, অর্থবলে কিংবা ধূর্ততা, চালবাজির চালাকিতে প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যার হতো জয়, সেই পেত রাজ্য। শাহ-সামন্ত যুগ অবসিত হয়ে তথাকথিত 'গণতন্ত্র' অঙ্গীকৃত মুসলিম রাষ্ট্রে আজো ভোটতন্ত্র চলে, এবং তাতে প্রবলের কারচুপি কৌশলেই হয় জয়। আত্মোন্নয়নের জন্যে আত্মত্রুটি সন্ধান আবশ্যিক বরং এ বুদ্ধি জাগলেই আমরা সহজে আত্মসংশোধনে আগ্রহী হব। প্রগতির পথ চিনে নিতে পারব।

আমরা যে লোভী, অসহিষ্ণু ও ঝগড়াটে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ মেলে ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালতে মামলার সংখ্যাধিক্যে, সমাজে নিঃস্বতা, দুস্থতাজাত, নিরুপায় মানুষেরা বাঁচার গরজে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে, অবলম্বন করে চুরি-ডাকাতির পেশা। তাই জেলখানায়ও সাহসী মুসলিমের সংখ্যাই অধিক।

আমাদের নৈতিক-আদর্শিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ-প্রবুদ্ধ হতে হবে। আমাদের আত্মসত্তার মূল্য-মর্যাদা সচেতন হতে হবে।

অন্যায়ের প্রতি, অপরাধের প্রতি, চাটুকারিতার প্রতি, পদলেহিতার প্রতি, কৃপা-করুণা, দান-দয়া, দাক্ষিণ্য লিপ্সার প্রতি অন্তরে ঘৃণার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটাতে হবে। পাপ ভয়ে, লোকনিন্দা ভয়ে ও আদালতী শাস্তির ভয়ে আমাদের ভীত হতে হবে। হায়া-শরম ও সংকোচ সচেতনভাবে অন্তরে লালন করে আমাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হবে, নইলে আমাদের ব্যক্তিচরিত্র উন্নত হবে না, ফলে জাতীয় চরিত্র থাকবে নিন্দিত এবং সর্ব প্রকার উন্নয়ন-উন্নতির বাধা হয়ে। কাজেই মানবিকগুণের বিকাশ-সাধন আবশ্যিক ও জরুরি। অ-আনুগত্যে, ঔদ্ধত্যে, অবাধ্যতায় উন্নত শির হওয়া যায় না, নৈতিক-আদর্শিক চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে ব্যক্তিক চরিত্র বলে উন্নতশির হওয়া সম্ভব।

আমাদের ইতিহাসের স্রষ্টাও হতে হবে

প্রত্যেক গোষ্ঠী, গোত্র, সম্প্রদায়, জাতি একাধারে ও যুগপৎ ইতিহাসের সৃষ্টি ও স্রষ্টা। অতীত ও ঐতিহ্য আমাদের নাগালের বাইরে, আমরা ইচ্ছে করলেই তা ফিরে পেতে পারি না। তাদের বর্তমান করে তুলতে পারি না। আমরা অতীতের ও ইতিহাসের সৃষ্টি বটে,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু আমরা সমকালীন ইতিহাসের স্রষ্টা ও ভবিষ্যতের দ্রষ্টা। এজন্যেই সমকালের চাহিদা পূরণের জন্যে নতুন চেতনার, চিন্তার পুঁজি নিয়ে নতুন কিছু আবিষ্কার, উদ্ভাবন, নির্মাণ ও সৃষ্টি করার দায়িত্ব ও কর্তব্য আমাদেরই। আমরা দেহ-প্রাণ-মগজ-মনন-মনীষা অব্যবহৃত, অননুশীলিত ও নিষ্ক্রিয় রেখে অতীতকে ও ঐতিহ্যকে পুঁজি-পাথেয় করে চললে আমরা সমকালীনতা হারাই এবং অবক্ষয়গ্রস্ত হই মনে-মননে আর গতানুগতিকতায়। কথায় বলে 'বসে খেলে রাজার ধনও ফুরায়'। কাজেই যে অলস-অকর্মণ্যের পুঁজি কেবল পিতৃধন, তার ক্ষয় আছে, বৃদ্ধি নেই। তার অস্তিত্ব থাকলেও তা সমাজে উপেক্ষিত ও অননুভূত বলেই সে-অস্তিত্ব তার সম্পদ নয়, দায়, তাতে ম্লানিমা আছে, গ্লানি আছে, ঔজ্জ্বল্য নেই, জৌলুস নেই। তার পৈত্রিক গুণ-গৌরব-গর্ব এখন গণতাচ্ছিল্যের ও উপহাসের বিষয় হয়ে তাকে মনে ও মর্মে আঘাত হানে, আহত করে।

বৃক্ষের মতোই ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের প্রত্যহ বৃদ্ধি ঘটাতে হয়। ব্যক্তির বা সমাজের কিংবা রাষ্ট্রের জীবনে নবকিশলয়ের উদ্ভব ঘটাতে হয়। কলির উন্মেষ ঘটাতে হয়। ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়, নইলে অপরিবর্তিত স্থিতিতে বৃক্ষও বাঁচে না। আবর্তিত ও অপরিবর্তিত অবস্থামাত্রই জরা-জড়তা-জীর্ণতার শিকার, নিশ্চিত মৃত্যুর পথিক। তাই প্রাজ্ঞ-ঋষির উচ্চারিত দেশনা— 'চরৈবেতি'— এগিয়ে চল। কেননা গতিতেই জীবন, স্থিতিতে মৃত্যু।

বুনো-বর্বর-ভব্য-সভ্য উন্নত, অনুন্নত, অগ্রসর-প্রাগ্রসর নির্বিশেষে যতই তুচ্ছ ও স্বল্প হোক সবারই অতীত ও ঐতিহ্য আছে। অর্থাৎ তারাও কালপ্রবাহে ইতিহাসের সৃষ্টি ও স্রষ্টা। এ ধারাবাহিকতা যতই মন্থরগতিতে হোক, বজায় না রাখলে ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে, সাংস্কৃতিক জীবনে, শাস্ত্রিক ও আর্থিক জীবনে নৈতিক ও আদর্শিক জীবনে, অবক্ষয় অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে– ইতিহাসে এর সাক্ষ্য-প্রমাণ অসংখ্য।

উদ্যম ও উচ্চাশা না থাকলে, অভাবে বা আকাঙ্ক্ষাপূর্তির জন্যে উদ্যম, উদ্যোগ-আয়োজন প্রযুক্ত না হলে, সর্বোপরি পরিকল্পনায়, সুষ্ঠুতায়, সংকল্পে ও অঙ্গীকারে দার্ঢ্য না থাকলে, জ্ঞান-বুদ্ধি স্বল্প হলে, শক্তিতে ও সাহসে আত্মপ্রত্যয়ী না হলে কারো পক্ষেই ব্যক্তি হিসেবে, সমাজে-সম্প্রদায়-জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে স্ব ও সুপ্রতিষ্ঠ হওয়া ও থাকা সম্ভব হয় না।

আজকের এ মুহূর্তের আগেও মানুষ কিছুটা বেশি অজ্ঞ ছিল, প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর মানুষ বিজ্ঞতর ও অবিজ্ঞতর, অধিক জ্ঞানবান, প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিমান যুক্তিনিষ্ঠ ও বিবেকবান হচ্ছে কোথাও না-কোথাও কোনো-না কোনো ক্ষেত্রে। এ তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য অবিসম্বাদিতভাবে স্বীকৃত হলে অতীত ও ঐতিহ্য, পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা অপ্রমাণিত বলে, অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক, অবৌদ্ধিক বলে পরিহার করা জ্ঞান-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগে, আগ্রহী মগজী মানুষের পক্ষে সহজই হতো। কিন্তু মানুষ সন্দেহ, প্রশ্ন, সংশয়, জিজ্ঞাসা, কৌতূহল নিয়ে প্রচলিত ও স্বীকৃত আদি ও আদিম কালের অজ্ঞ-অসহায় প্রাণীস্তরের মানব প্রজাতির অদৃশ্য লৌকিক, স্থানিক, অলৌকিক, কাল্পনিক, অলীক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা জ্ঞান-প্রজ্ঞা-যুক্তি-বুদ্ধি অভিজ্ঞতার তৌলে যাচাই-বাছাই-ঝাড়াই করতে কোনো রকমেই রাজি নয়। তাই, আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে না ইষ্টদেবতা নর-পশু-পাখি-বলি-চায় কেন? ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রাণী হত্যায়ও পুণ্য হয়? তিনি জীবহত্যায় প্রসন্ন হন কেন? শক্তিমান ও সাহসী বীর নামে খ্যাত ব্যক্তিদেরই নির্বিচার নিষ্পাপ ভোগ্য কেন বসুন্ধরা, নারী, রাজ্য-সাম্রাজ্য এবং নরহত্যায় ও পরসম্পদ দখলে শাহ-সামন্তের পাপ হয় না কেন? কৌশলে, জনবলে, ধনবলে, জোরে জুলুমে পরধন, পররাজ্য, পরসম্পদ লুণ্ঠনে, পরনারী ধর্ষণে, পরপুরুষ হননে, পরের গৃহদহনে, পরের গাড়ি ভাঙনে রাজ্য-রাষ্ট্র স্তরে কোনো নায়কের বা ভূপতির পাপ হয় না কেন? রাজা সশস্ত্র সৈন্য পোষে নরহত্যার জন্যে, ধনী ও জোতদার লেঠেল পোষে আত্মপ্রসারের জন্যে আর রাজত্ব রক্ষার জন্যে, স্বাধিকার আদায় করার জন্যে, রাজনীতিকরা গুণ্ডা-মস্তান-খুনী পোষে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যে। সংগ্রামে যুদ্ধে, লড়াইয়ে, গোপন হত্যাকাণ্ডে গেরিলাযুদ্ধে আত্মোৎসর্গ করলে তাকে সন্ত্রাসী, দ্রোহী, দুষ্কৃতি নামে চিহ্নিত করে গণশত্রু নামে অভিহিত করা হয় কেন? কিংবা নিঃস্ব নিরন্ন দুস্থ দরিদ্র বাঁচার তাগিদে ক্ষুধা নিবারণের জন্যে পরস্বহরণ করলে, কোনো ব্যক্তিকে ক্রোধের বশে হত্যা করলে, কিংবা জাল-জোচ্চুরিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলে সমাজে ঘৃণ্য, ধিক্কৃত এবং রাষ্ট্রে শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং শাস্ত্রে পাপ বিবেচিত হয় কেন? এমনি হাজারো জিজ্ঞাসার উত্তর অন্বেষায় গুরুত্ব দিয়ে জ্ঞান-প্রজ্ঞা, মগজী যুক্তিবুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও বিবেক-বিবেচনা প্রয়োগে যাচাই-বাছাই-ঝাড়াই করে ব্যক্তিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রিক ভাব-চিন্তা-কর্ম আচরণকে সমকালীন জীবনের চাহিদা অনুগত করা কি শিক্ষিত-বিদ্বানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নয়?

বিজ্ঞানের ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিকাশের এ যুগে, যন্ত্রের, প্রকৌশলের প্রযুক্তির উৎকর্ষের এ কালে, সমাজবিজ্ঞানের-রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অর্থবিজ্ঞানের উন্নতির এ সময়েও কি আমরা সমাজে অধিকাংশ মানুষকে নানা নামের ভিখিরী, নিঃস্ব, নিরন্ন, দুস্থ, দরিদ্র রাখব, আজো কি শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা-প্রতারণাকে ন্যায়সঙ্গত, শাস্ত্রসম্মত এবং সুরুচি-সংস্কৃতি অনুগ বিবেক সমর্থিত বলে মানব? আজো কি কৃপা-করুণা দান-দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের ব্যক্তিকে স্বর্গসুখ ভোখ করার ব্যবস্থা স্বীকার করে নেব? আজো কি পাগল পঙ্গুর সঙ্গে সমাজে কাঙাল শ্রেণী রাখা পূণ্যার্জন পন্থারূপে আবশ্যিক ও জরুরি মনে করব? আজো মানুষমাত্রকেই জাত জন্ম বর্ণ ধর্ম ভাষা নিবাস যোগ্যতা অবিশেষে বণ্টনে ও পারস্পরিক সহযোগিতায়-সহাবস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণে অনীহ থাকব? আমরা তা না হলে কিভাবে মানবিক গুণ-গৌরবের, মানবিকতার, মানবতার, স্বাজাত্যের ও মনুষ্যত্বের তথা বিবেকী প্রাণীর গর্ব করব? অতএব আমাদের চিরকাল প্রজন্মক্রমে কেবল ইতিহাসের সৃষ্টি হয়ে থাকলেই চলবে না, আত্মোৎকর্ষের ও আত্মপ্রসারের জন্যে আমাদের ইতিহাসের স্রষ্টাও হতে হবে। কারণই ক্রিয়া ঘটায়। সাধারণত একক নয়, একাধিক কারণই ক্রিয়া ঘটায়। আমরা এক্ষেত্রে ব্যক্তির উচ্চাশা, সংকল্প, অঙ্গীকার, উদ্যম, উদ্যোগ, আয়োজন এবং মগজ-মনন-মনীষা-দক্ষতা প্রভৃতির মিশ্রিত বা সমন্বিত প্রয়োগের ক্রিয়ার, পরিণতির ও পরিণামেরই নামান্তর রূপেই ইতিহাসের স্রষ্টা অভিধায় চিহ্নিত করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌরাণিক দৈবশক্তির মহিমা প্রচারের পরিণাম

এ বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক চেতনার ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের যুগেও আমাদের প্রথমে ঘরের কথা এবং পরে পরের ভাবনা ভাবতে হয়। উপমহাদেশের প্রচারমাধ্যগুলোতে সরকার সমর্থনেই যেন মৌলবাদ-এর বিস্তৃতি ঘটেছে এবং ঘটানো হচ্ছে, যদিও সাধারণভাবে রাজনীতিক দলগুলো দৈশিক-রাষ্ট্রিক জাতীয় ও নাগরিক মাত্রেরই সমঅধিকারের কথা স্বীকার ও প্রচার করে থাকে এবং নিন্দা করে থাকে ধর্মধ্বজী সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সচেতন রাজনীতিক দলগুলের। এবং অন্যসব রাজনীতিক দলই 'মৌলবাদী' দল জামাতে ইসলামীর, বিজেপি'র শিবসেনার, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের, বজরঙদলের, বিশ্ব হিন্দুপরিষদের প্রভাবের কুফল সম্বন্ধে অভিন্ন মত পোষণ করে।

গোটা পৃথিবীতেই আপতত কম্যুনিস্টরা আত্মপ্রত্যয়ভ্রষ্ট হয়ে হীনবল হয়ে পড়েছে, তবু মনে হয় কম্যুনিস্ট অভ্যুত্থান প্রতিরোধ প্রয়াসেই যে ভরতে উদার আধুনিক গণতন্ত্রপ্রিয় শাসক-প্রশাসক-সরকার রেডিও-দূরদর্শন মাধ্যমে কেবল রামায়ণ মহাভারত নয়, শীতলা, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, গণেশ, বালী, সুগ্রীব, বামন, বলিরাজ, হনুমান, নানা মুনি-ঋষি এমনকি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ নিয়েও লৌকিক, অলৌকিক, অলীক, স্থানিক নানা লোকসংস্কার-বিশ্বাস-ধারণাকে গুরুত্ব দিয়ে নতুন করে কল্পনার বিশ্বাসের জগতে জনগণকে ফিরিয়ে নেয়ার সচেতন সযত্ন ও সতর্ক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। সংখ্যালঘুদের জন্যেও আলেফ লায়লা-আকবর-টিপু নিয়ে ফিল্ম করা হয়েছে। টিপু, আকবর, আলেফ লায়লা, হনুমান, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, দেবতার জীবন্তরূপে মূর্তিতে প্রকট রামায়ণ মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে ফিল্ম করার উদ্দেশ্য কি? এ বিজ্ঞান-বাণিজ্যের বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক প্রসারে যন্ত্রনির্ভর নিত্যকার জীবনে, জগতে ও জীবিকায় সুপ্রাচীন অদৃশ্য অরি-মিত্র শক্তির আসমানী দৈব নিয়ন্ত্রণের ঠাঁই বাস্তবে যৌক্তিক-বৌদ্ধিক বিচারে খুঁজে পাওয়া যায় কি, যাবে কি? মুনি-ঋষির, পীর-দরবেশের, সন্ত-সন্ন্যাসীর-শ্রমণের অভিশাপে কি একালে কারো সর্বনাশ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব, কিংবা আশীর্বাদে বা যাদুটোনা-বাণ-উচ্চাটনে, তাবিজে-কবচে-মন্ত্রে-মাদুলিতে, পানি-ধূলি-তেল-তাগা দিয়ে কি রোগ সারে? রাশিক প্রভাব মুক্তির লক্ষ্যে ধাতব-পাথুরে অঙ্গুরীতে কি ভাগ্য ফেরে, বিপদ কাটে? আজকের পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানে-যুক্তিতে বুদ্ধিতে ঋদ্ধ সমাজ যেখানে স্রষ্টায় বিশ্বাস দৃঢ় রেখেও শাস্ত্রের হৃত উপযোগ বিধি-নিষধের সংস্কারে, পরিমার্জনায় ও বর্জনে আগ্রহী হয়েছে, সেই সময়ে এ উপমহাদেশে নতুন করে অলৌকিক শক্তিধর সিদ্ধ পীর-দরবেশ-সন্ত-সন্ন্যাসীর প্রভাব প্রবলতর হচ্ছে, একি দারিদ্র্যকবলিত বেকারবহুল সমাজের স্বাভাবিক অসহায়তা-প্রসৃত অদৃষ্টখণ্ডন প্রয়াসপ্রসূন? কাল্পনিক অরি-মিত্র শক্তিতে ভয়-ভক্তি-বিশ্বাস-ভরসায় কি জীবনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাবে? অজ্ঞতার যুগের মত-পথ-পদ্ধতি-সিদ্ধান্ত কি জ্ঞান-বুদ্ধি যুক্তির প্রভাবে প্রসৃত মন-মগজে-মনন-মনীষাঋদ্ধ এবং বিজ্ঞান-বাণিজ্য প্রভাবিত বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যন্ত্রনির্ভর প্রাত্যহিক জীবনে কোনো কল্যাণ সাধন করতে পারে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে হাজার হাজার বছর আগেকার অজ্ঞতার অনভিজ্ঞতার, অসহায়তার, অদৃশ্য শক্তির কৃপা-করুণা-দয়া-দাক্ষিণ্য নির্ভরতার ও রোষ-পীড়ন ভীরুতার ধারণার-সংস্কারের-বিশ্বাসের পুনঃপ্রচার চলছে গণমনে পুনঃ সংক্রমণের লক্ষ্যে? একি ধনিক বণিক শ্রেণীর শাসনে-প্রশাসনে-শোষণে-পীড়নে প্রভুত্ব ও কায়েমী স্বার্থ রক্ষার গরজেই নতুন ষড়যন্ত্র? যদি তা-ই হয়, তাহলে কেবল নিতান্ত স্থূল এবং অকেজো পুরোনো চালমাত্র। বরং প্রতীচ্যজগৎ কায়রো সম্মেলনে, কোপেনহেগেন সম্মেলনে এবং বেজিং সম্মেলনে আমজনতার আপাত ও বাহ্য কল্যাণকামিতার ছদ্ম অভিপ্রায় কায়েমী স্বার্থ রক্ষার যে সাম্রাজ্যবাদী চাল শুরু করেছে তা অনেক সূক্ষ্ম এবং কেজো হবে। ভারত ব্রাহ্মণ্যবুদ্ধির ঐতিহ্যঋদ্ধ বলেই বাহ্যত সেক্যুলারিজমের স্বাধীন চিন্তা-চেতনার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষক, ধারক, প্রচারক হয়েই হিন্দুয়ানীর পৌরাণিক দৈব বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার লৌহকঠিন খাঁচায় আবদ্ধ রাখার প্রয়াসী। যেন সমাজের রুচি-অভিরুচির অভিব্যক্তিই অবাধে প্রচারের সুযোগ দিচ্ছে। কিন্তু বাঙলাদেশে ও পাকিস্তানে সরাসরি ইসলামকে এবং ইসলামী নীতি-রীতিকে প্রাধান্য দেয়ার বিঘোষিত সাংবিধানিক সরকারি নীতি সরকারকেই সাম্প্রদায়িক করে রেখেছে– এ কারণে তার চিন্তা-কর্ম-আচরণে মুসলমানদের কেবল মুসলিম রাখতে চায়, মানুষ হতে দেয় না, এবং অমুসলিমদের অস্তিত্বই যেন স্বীকার করে না। পাকিস্তানী বাঙলাদেশী সরকার নিন্দিত, আর সব অপকর্মের সহায়ক হয়েও ভারত সেক্যুলার বলে নন্দিত। ক্ষতি হচ্ছে দেশের, রাষ্ট্রের এবং উপমহাদেশের আমজনতার মানস-স্বাস্থ্যের ঘটছে অবনতি। প্রভা ও প্রভাবহীন সব দৈব-আসমানী অদৃশ্য শক্তি ঘরে ঘরে মনে-মগজে-মননে পুনরাবির্ভূত হচ্ছে। পরিণামে রুদ্ধ হচ্ছে বিজ্ঞানের ও যন্ত্রের প্রসাদপুষ্ট যৌক্তিক-বৌদ্ধিক জীবনধারার প্রসার। এভাবেই বিজেপির, শিবসেনার এবং জামাতে ইসলামীর ভোটার সংখ্যা বাড়তেই থাকবে।

নিরুদ্যম কম্যুনিস্ট বনাম 'তৃণমূল সংগঠন'

এখন বোধ হয় কেউ অস্বীকার করবে না যে আমাদের কম্যুনিস্ট দলগুলো কখনো মাটি-লগ্ন দৃষ্টিতে দেশ-মানুষ, সঙ্কট-সমস্যা প্রভৃতিকে দেখবার নিষ্ঠ চেষ্টা করেনি। তাঁরা ছিলেন গুরুবাদী আকাশচারী, বিদেশমুখী তত্ত্ব-দেশনা প্রত্যাশী। এবং গুরুমুখী বাণীর ও ব্যাখ্যার অনুরাগ, অনুগামিতা ও আনুগত্য তাঁদের কোনো শ্রেয়সেরও সাফল্যের সন্ধান দেয়নি। আজ অবধি তাঁরা মরতে ও মারতে রাজি, তাঁরা অভীক, তাঁরা জীবনের ভোগ-উপভোগ-সম্ভোগ-স্পৃহা পরিহারে সদা অঙ্গীকারবদ্ধ। সমাজ পরিবর্তনে গণমানবকে শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনা মুক্ত করে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ মানব জীবন যাপনের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করতে তাঁরা প্রাণপণ সংগ্রামের সংকল্পে অটল-অনড়, অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁদের শক্তি আছে, সাহস আছে, অঙ্গীকার আছে, অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সংকল্প আছে, আছে কোনো কোনো দলের সঙ্ঘশক্তিও, আছে প্রয়োজনীয় হাতিয়ারও হয়তো। তবু বাঞ্ছিত ফল মেলেনি। প্রভাবিত হয়নি গণমানব, উদ্বুদ্ধ, প্রবুদ্ধ হয়নি আত্মকল্যাণ ও আত্মশক্তি প্রত্যাশায় ও পন্থাপ্রাপ্তিতে কিংবা মুক্তি সংগ্রামীর সংস্পর্শে এসেও। কম্যুনিস্টদের উপর ব্যক্তিগতভাবে হয়তো জনগণ আস্থা রাখে কিন্তু তাঁদের পরিব্যক্ত সংকল্পের ও সংগ্রামের সাফল্যে ভরসা পায় না। তাই তাঁদের আহ্বানে সাড়া মেলে না, তাঁদের প্রকাশ্য সভায়ও বক্তৃতা শোনার লোক মেলে না।

তাঁদের গুরুবাদী তাত্ত্বিক মনের পরিবর্তন হয়নি আজো, তাঁরা স্বদেশের স্বঅঞ্চলের, স্বসম্প্রদায়ের আস্তিক মানুষের মন-মানসিকতা বোঝার চেষ্টা করেন না। আজো তাঁরা স্বদেশের স্বসমাজের মাটিলগ্ন জীবনের অব্যক্ত কামনা-বাসনা-আশা-আশ্বাস, ভয়-ভক্তি-ভরসার চৈত্তিক ও বাহ্য লাক্ষণিক রূপ-স্বরূপে অনুভব-উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন না, গণমানবের স্তরে নেমে তাঁদের একজন হয়ে হার্দিক সম্পর্ক সম্বন্ধ পেতে। গণমানবের মন জোগানোর জন্যে দুর্বলচিত্ত কম্যুনিস্ট আস্তিক্যের ভান করেন, তবু ওদের আস্থা কিম্বা ভরসা অর্জন করতে পারলেন না। ইতোমধ্যে কম্যুনিস্ট দল ভেঙ্গে ভেঙ্গে বিখণ্ডিত হয়ে হয়েছে স্বাস্থ্যহীন, উদ্যমহীন, শক্তিহীন, আত্মপ্রত্যয়হীন, অলস ও নির্লক্ষ্য। বিভক্তি বিচ্ছেদ কোথাও কোথাও বিরোধে বিবাদে বৈনাশিক রূপও নেয়, অতীতে নিয়েছেও এবং ভবিষ্যতেও নেবে।

AMARBOI.COM

গুরুবাদ-নির্ভর বলেই হয়তো সোভিয়েত রাশিয়ার বিপর্যয়ে ও চীনের আদর্শ বিকৃতি দেখে আমাদের কম্যুনিস্টরা এখন কেবল দিশেহারা নন, হতাশাগ্রস্তও, এমনকি যাঁরা বিদ্যা-বুদ্ধি, যুক্তি-প্রজ্ঞা যোগে মার্কসবাদ অঙ্গীকার করেননি তাঁরা প্রত্যাহীন হয়ে ছেড়েছেন এ পন্থা, সহজেই হয়েছেন পুঁজিবাদের স্তাবক, ধারক ও বাহক শরম সংকোচ পরিহার করেই। আর যাঁরা বেহায়া-বেচশম হয়ে আদর্শভ্রষ্ট হতে পারছেন না, তাঁরা তথাকথিত অনির্দেশ নির্লক্ষ্য নিরুদ্যম প্রায় নিষ্কর্মা 'বামপন্থী' এ সাধারণ নামে পরিচিত ও অভিহিত হয়ে আত্মসম্মান বজায় রেখে চলেছেন। এঁদেরই কোনো কোনো দল বুর্জোয়াদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শরিক হতে চান ও চেয়েছেন।

চলার পথে উর্ধ্বমুখী হয়ে চললে হোঁচট খাওয়ার আশঙ্কা থাকে সার্বক্ষণিক। আমাদের কম্যুনিস্টরা তথা বামপন্থীরা তাঁদের অজ্ঞাতেই তাঁরা এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের এখনো সে চিন্তা-চেতনা জেগেছে বলে মনে হয় না। এটা অনেকটা সেই প্রাবচনিক বা প্রাবাদিক অজ্ঞেয়তারই প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে 'তোমাকে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে'।

আমাদের এনজিও (NGO)-রা আমাদের আপাত সেবা সহায়তার ছলে আমাদের অলস, পরান্নজীবী, পরনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়হীন, আত্মসম্মানরিক্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্যম শূন্য প্রাণীতে পরিণত করছে। আর্থ-বাণিজ্যিক-মহাজনী সাম্রাজ্যবাদীদের অ্যাজেন্ট এসব দেশী-বিদেশী এনজিও আমাদের অনাহারে মরতেও দেবে না, স্বয়ম্ভর হয়ে বাঁচতেও দেবে না মাথা উঁচু করে। এবং কম্যুনিস্টদের উচ্ছেদ ও উৎখাত করবার মানসেই অর্থাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এনজিওরা নিঃস্ব-নিরন্ন-দুস্থ-দরিদ্র নিভূমদের নিয়ে গঠন করেছে 'তৃণমূল সংগঠন' নামে সঙ্ঘ। এ হচ্ছে গণমানবকে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রাম থেকে বিচ্যুত করে বিপথে বিভ্রান্তভাবে চালিত রাখার লক্ষ্যে ছদ্ম গণ সংগ্রামের ভুয়া আয়োজন বা ব্যবস্থা। কয়েক মাস আগে ঢাকার মানিক মিয়া অ্যাভিন্যুতে লক্ষ নিঃস্ব লোকের এক সমিছিল সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল এনজিও-র অর্থে উদ্যোগে আয়োজনে ও পরিচালনায়। এ 'তৃণমূল সংগঠন' তৈরি হয়েছে কম্যুনিস্টদের প্রতিরোধ ও উচ্ছেদ করার লক্ষ্যেই।

মৌলবাদীর শরিয়া শাসন

তেরো শতক থেকে ইউরোপীয় বিভিন্ন সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে কোনো কোনো গুণী-জ্ঞানীর মধ্যে নতুন চেতনা-চিন্তার উন্মেষ ও প্রকাশ ঘটতে থাকে। তাকেই পরবর্তী সময়ে 'রেনেসাঁস' নামে অভিহিত করা হয়, ব্যক্তিক মন-মগজ-মনন-মনীষার প্রসূন চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রকৌশল প্রযুক্তি হিসেবে বাস্তবরূপ লাভ করে। এর সবটা না হলেও অনেকটাই ছিল পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণার বন্ধনমুক্তির ও মুক্তচিন্তার তথা ফ্রিথিঙ্কিঙের সাক্ষ্য ও প্রমাণ। যে ব্যক্তিক মনীষাকে আমরা 'রেনেসাঁস' রূপে চিহ্নিত করছি, তার প্রভাব কিন্তু ইউরোপের গির্জায়, রাজ্যে, বাজারে, জনপদে, প্রজাকুলে তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাছাড়া রেনেসাঁস বলতে কোনো বিশেষ শতকের অবদান বোঝায় না। তার সৃষ্টিশীল স্বাধীন চেতনার, চিন্তার, কালপরিসর ছিল বলতে গেলে চারশ' বছরব্যাপী। এ কালপরিসরে অবশ্য রেনেসাঁস প্রভাবে খ্রীস্টধর্ম সংস্কারক, নিরীশ্বর নাস্তিক দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, নতুন তথ্য ও পাথুরে সত্য আবিষ্কারক জ্যোতির্বিজ্ঞানী, শোষিত-পীড়িত-বঞ্চিত কৃষকদের দ্রোহও আঞ্চলিকভাবে দেখা দেয়।

ইউরোপের এ মধ্যযুগ ছিল রাজারাজ্য জনপদ-প্রজা প্রভৃতি সবার পক্ষে জীবন জীবিকা ও মানসক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর দুর্দিন। কেননা গোটা ইউরোপ ছিল তখন ক্যাথলিক গির্জার ধর্মধ্বজী প্রাতিভাসিকভাবে ভোগবিমুখ বিরাগী যাজক কবলিত। তাদের শাসনে-শোষণে-পীড়নে, হুকুমে-হুমকিতে, হুঙ্কারে, হামলায় রাজা-প্রজা সবাই ছিল শঙ্কিত, ত্রস্ত। কারণ গির্জা কর্তৃপক্ষই ছিল খ্রীস্টান ইউরোপের রাজা-রাজ্য প্রজা ও জনপদ নির্বিশেষে সবারই দণ্ড-মুণ্ডের-জান-মাল গর্দানের মালিক। ধর্মধ্বজ পাদরিরা ছিল ক্ষমতাপ্রিয় ও সম্পদলিপ্সু, তারা ছিল একালের সংজ্ঞায় ও সংজ্ঞার্থে অর্থোডকস ও মৌলবাদী। ধর্মীয় তথা শাস্ত্রীয় আচারে-আচরণে-অনুষ্ঠানে পান থেকে চুন খসলে কিংবা ভাবে চিন্তায় কথায় কাজে শাস্ত্র নিষ্ঠার, শাস্ত্রে আস্থার অভাব আভাসিত হলেই ওরা নারীদের হত্যা করত ডাইনি বলে আর পুরুষদের মারতো শাস্ত্র লঙ্ঘনের ও উপেক্ষার দায়ে। শিক্ষার প্রসারে মুক্ত চেতনা-চিন্তার বিকাশের ও উৎকর্ষের আর সংস্কারকদের দ্রোহের, দার্শনিকদের নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন তত্ত্ব প্রচারের, বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার-উদ্ভাবনের এবং শিল্পী-সাহিত্যিকদের নানা কলার অনুশীলনের অবদানের প্রভাবে গির্জা হৃতশক্তি, হৃতপ্রভাব হয়ে এক সময়ে জনগণের ও রাজার রাজ্যের অনুগ্রহজীবী হয়ে পড়ে। ইউরোপে আধুনিক যুগের প্রতিষ্ঠা এভাবে পূর্ণতা পায়। আজ ইউরোপে দেশ-কাল-জীবনের চাহিদানুগ জীবন যাপন অবাধ-অবিঘ্ন, আজ প্রতীচ্য জগতে নিরীশ্বর নাস্তিক, মানববাদী, মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী প্রত্যক্ষবাদী, ঐহিকজীবনবাদী, সমকামিতাবাদী, বিবাহ প্রথাবিরোধী মানুষও স্বাধীন ও স্বাতন্ত্র্য নিরুপদ্রব রেখে জীবন যাপন করে।

ইউরোপে যখন আঁধার যুগ চলছে, রোম সাম্রাজ্য বিখণ্ডিত, ক্যাথলিক গির্জা শাস্ত্রানুগত্যের নামে মনুষ্যত্বের অবমাননা করে চলেছে; তখন মুসলিম রাজ্যশক্তি, সেকালের আফ্রো-এশিয়া-ইউরোপে জ্ঞানের-বিজ্ঞানের মানব সাম্যের বাণী নিয়ে প্রগতিশীল সংস্কৃতি-সভ্যতার আলো ছড়িয়ে অপ্রতিরোধ্য দিগ্বিজয়ী শক্তিরূপে স্বপ্রতিষ্ঠ হচ্ছিল। তুর্কি-মুঘল সাম্রাজ্য তখন বাস্তবে তিন মহাদেশ শাসন করছে। সেদিনও কুরআন-সন্না ছিল, শাসকরা ছিল মুসলিম কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে, ধর্মাচারে স্বধর্মী-বিধর্মী কারো উপর জোর-জুলুমের কিংবা খবরদারির নজরদারির তদারকির এমন প্রয়োজন কেউ কোনো শাসক-প্রশাসক অনুভব-উপলব্ধি করেনি— যা পীড়নের বা মানসিক নির্যাতনের পর্যায়ে পড়ে। অবশ্য শরাবিরুদ্ধ চিন্তা-কর্ম-আচরণের অপরাধে তারাও নরহত্যা করেছে, ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।

আজ কিন্তু দেখতে পাচ্ছি মধ্যযুগের ইউরোপের ক্যাথলিক গির্জাশাসন নামান্তরে, কালান্তরে ও ধর্মান্তরে মুসলিম-মোল্লা শাসনে-পীড়নে-নির্যাতনে-জোরে-জুলুমে, হুকুমে-হুমকিতে-হুঙ্কারে-হামলায় পরিণতি পেয়েছে বাস্তবে আক্ষরিকভাবে। আজকের অর্থোডকস ও মৌলবাদী মুসলিমরা দেশের কালের প্রতিবেশীর জীবনের দাবির অস্তিত্বই স্বীকার করে না, তারা বিজ্ঞানের ও যন্ত্রের প্রসাদ প্রভাবহীন সেকালের বিচ্ছিন্নতার স্বাতন্ত্র্যে সম্ভব জীবন যাপন একালের বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে সম্পৃক্ত যন্ত্রনির্ভর যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জীবনেও কাম্য, আবশ্যিক ও জরুরি বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, তারা বিশ্বের-সংস্কারের ধারণার হাওয়াই জগতে মানসিকভাবে বাস করাই চিরন্তন কল্যাণকর বলে জানে, বোঝে ও মানে। আবর্তিত জীবনই তাদের কাম্য। তাই আজ মুসলিমদের সাতচল্লিশ খানা রাজ্যে-রাষ্ট্রেই অর্থোডকসদের ও মৌলবাদীদের হামলা শাস্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সরকারি ও রাষ্ট্রিক জীবনে লঘু-গুরুভাবে চালু হয়ে গেছে। চরম অবস্থায় গেছে আলজেরিয়ায়, তিউনিসিয়ায়, ইরানে, সৌদী আরবে, কোনো কোনো আমীরাতে, আফগানিস্তানে। পাকিস্তানে, বাঙলাদেশে এ আন্দোলন লঘু নয়, গুরু। ইন্দোনেশিয়া অবধি সব মুসলিম রাষ্ট্রেই অর্থোডক্সির ও মৌলবাদের বীজ ইতিমধ্যে উপ্ত হয়ে গেছে। যাকে আমরা মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় ধর্মের নামে ক্যাথলিক বর্বরতা ও দানবিকতা রূপে নিন্দিত করি, তা-ই আজকের মুসলিম জগতে ন্যায়-সত্য ও শাস্ত্রনিষ্ঠ এবং চিরন্তন কল্যাণ চেতনা বলে নন্দিত হচ্ছে। বিড়ম্বনা আর কাকে বলে! আফগানিস্তানে সব ইসলামপছন্দ মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ করে তালেবানদের কাণ্ডকারখানা নীতি আদর্শ বুদ্ধি দেখে একে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্বরতা না দানবিকতা বলব বুঝে উঠতে পারছি না। তবে এ যে দেশকাল-জীবনবিরুদ্ধ সংস্কৃতি সভ্যতা বিনাশী চিন্তা-কর্ম-আচরণ, তাতে সন্দেহ নেই। চিন্তার-চেতনার অবাধ প্রকাশ, বিনোদনের অধিকার, সৃষ্টি স্বাধীনতা, মন-মগজ-মনন-মনীষার প্রয়োগে গবেষণার সুযোগ, আত্মবিকাশের পরিবেশ, সমকালীন বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার স্বাধিকার শরিয়া শাসনে মেলে না। মন মরে যায়।

প্রবল প্রতিবেশী রাষ্ট্রভীতি

ঈর্ষা-অসূয়াদুষ্ট মানুষ ধীরে ও স্থিরভাবে কোনো বিষয় যুক্তি-বুদ্ধিযোগে বিচার-বিবেচনা করতে পারেই না। তাতে পারিবারিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক এমন কি আর্থিক জীবনেও নানা বিপর্যয় ঘটে। ফলে জীবনযাত্রার স্বাভাবিক গতিধারা বিঘ্নিত হয়, উন্নতি-অগ্রগতি-প্রগতি প্রতিহত, ব্যাহত ও প্রতিরুদ্ধ হয়। বাঙলাদেশের উপর দিয়ে স্থলপথে ভারতীয় পণ্য পূর্ব ভারতে কোলকাতায় আনা-নেওয়ার জন্যে ভারত সরকারের প্রস্তাব গ্রহণ করলে নাকি বাঙলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব পরিণামে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা প্রতাপে প্রবল বৃহৎ বিশাল রাষ্ট্র ভারত তার লাভে লোভে ও স্বার্থে চুক্তিভঙ্গ করে, চুক্তির শর্ত উপেক্ষা ও লঙ্ঘন করে যখন যেমন প্রয়োজন সে অনুসারে স্বেচ্ছাচারী হবে, জোরে-জুলুমে, হুকুমে-হুমকিতে, হুঙ্কারে-হামলায় কিংবা সর্বপ্রকারের ক্ষুদ্র ও দুর্বল বাঙলাদেশ সরকারের কোনো আপত্তিতে, অনুরোধে কর্ণপাত না করেই ভারত বাঙলাদেশকে তার আর্থ-বাণিজ্যিক-মহাজনী সাম্রাজ্যাংশ করে নেবে ক্রমে। এ অনুমিত সম্ভাব্য ভারতীয় কর্ম-আচরণের সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে ভারতভীরুরা বলে যে চুক্তি থাকা সত্ত্বেও ভারত ফারাক্কার পানি বন্ধ করেছে, বেরুবাড়ি নিয়ে নিল কিন্তু আঙ্গুরপোতাদির জন্যে তিন বিঘা ছাড়ল না, তালপট্টি, জবরদখল করল— এগুলো প্রবলের দৌরাত্ম্যেরই পাথুরে প্রমাণ। আমরা জানি ঘরে-বাইরে পাড়ায়-মহল্লায় গাঁয়ে-গঞ্জে নগরে-বন্দরে রাজ্যে-রাষ্ট্রে, মার্কিন রাষ্ট্রের বিশ্বরাষ্ট্রে ঘোষিত নেতৃত্বে গোটা দুনিয়ার কেউ প্রবলের শাসনের-শোষণের-পীড়নের দলনের-দমনের হুমকির-হুকুমের, হামলার কবল থেকে মুক্ত থাকতে পারে না, দুর্বলের উপর চালু আইনে প্রবলমাত্রই প্রবৃত্তিচালিত হয়েই দুর্বলকে আয়ত্তে অধীনে কবলিত রাখতে চায়। প্রবলের প্রভাব-পীড়ন থেকে দুর্বলের আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই। পালিয়ে বাঁচাও সম্ভব নয়, সহজ নয় আত্মহত্যা করে আত্মবিলোপ। অতএব, আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি নিয়েই প্রবলের সঙ্গে ও সহ সমস্বার্থে সংযমে সহিষ্ণুতায় শ্রমের ও পণ্যের বিনিময়ে সহযোগিতায় সহাবস্থান করতে হয়। পিঁপড়েও পর্বত প্রমাণ মানুষকে শেষ কামড় দিয়ে মরে। মশা-জোঁক, ছারপোকাও নররক্তেই বাঁচে। মানুষকেও আত্মরক্ষায় ও স্বার্থরক্ষায় সদা সতর্ক সযত্ন থেকেই জীবন যাপন করতে হয়। আত্মরক্ষায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঙ্গীকারবদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তি, সমাজ, সরকার, রাষ্ট্র বা দল অজেয় শক্তির অধিকারী হয়। প্রমাণ দানবিক শক্তির অধিকারী মার্কিন সরকার সর্বশক্তি ও কৌশল প্রয়োগে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালিয়েও দেশপ্রেমী ও মানবসেবী উত্তর ভিয়েতনামীদের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়েছিল। অসুরের শক্তি নিয়ে আফগানিস্তানে ঝাঁপিয়ে পড়েও নয় বছর পরে পালিয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়াও। দায়বদ্ধ স্বাধীনতাপ্রিয় দেশপ্রেমী জনসেবী যোদ্ধার কাছে কোনো বৃহৎ শক্তিও টেকে না প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। কিউবা এখনো টিকে রয়েছে, রয়েছে ইরাক-তাইওয়ানও। সেকালে রাজার রাজ্য ছিল বলে, জনগণ রাজার করদাতা প্রজা মাত্র ছিল বলে, অর্থাৎ জাতীয়তাবোধ, মাটির মালিকানা চেতনা তখনো জাগেনি বলেই দেশবাসী স্বভূমে স্বভিটায় স্বঘরে নিজেদের রাজার করদাতা ভাড়াটে বলেই জানত, মাটিলগ্নতা বা মাটির অধিকার নিজেদের আয়ত্তে ছিল না বলে রাজায় রাজায় যুদ্ধকে তারা একালের ভাড়াটের চোখে বাড়ির মালিকদের ঘরোয়া বিরোধের বিবাদের বিষয়ের মতোই জানত, বুঝত ও মানত। এর ফলেই ষোল শতক থেকে আসা ইউরোপীয় বেণেরা গোয়া, দমন, দিউ, পণ্ডীচেরী, চন্দন নগর, কোলকাতা, মদ্রাজ-বোম্বে বিদেশীর দখলে গেলেও দেশের রাজন্য কিংবা প্রজারা তাতে উদ্বিগ্ন বা বিচলিত হয়নি। প্রবলের পরভূম কিংবা উচ্চাশীযোদ্ধার পররাজ্য দখলের স্বাভাবিক ও চিরাচরিত নিয়মের প্রয়োগ বলেই তারা বিদেশীর স্বদেশ গ্রাসকে জেনেছে। তাই আঠারো-উনিশ শতক অবধি ভারতে ব্রিটিশের রাজ্যবিস্তারে কোনো গণপ্রতিরোধ সৃষ্টি হয় নি, ওহাবী-সিপাহী বিপ্লবের কারণও ভিন্ন ভিন্ন। দেশের রাজন্যও ফরাসী-ইংরেজ-পর্তুগীজকে নিজেদের মতো পরধন-পররাজ্যলিপ্সু লুটেরা বলেই জেনেছে, স্বদেশের স্বজাতির শত্রু বলে বোঝেনি। তাই দেশী-বিদেশী রাজা-বেণে শক্তির মধ্যে ঘনঘন আঁতাত-বিরোধ দেখা গেছে লাভ-লোভ-স্বার্থসম্পৃক্ত।

একালীন গণতন্ত্রমনস্ক মানুষের কাছে স্বদেশের মাটির মালিক এবং স্বরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ও সার্বভৌমশক্তির মালিক, অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক হচ্ছে দেশের স্থায়ী নিবাসী জনগণ। কাজেই স্বাধীনতাপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধজাত দায়বদ্ধতা বশে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্ব ও কর্তব্য কেবল সরকারের বা রাষ্ট্রের নয়– রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকেরও। একালে স্বরাষ্ট্রে বিদেশীর বাণিজ্য-পুঁজি, লগ্নিপুঁজি বিনিয়োগেও স্বদেশের সরকারের রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা নানা কারণে ক্ষুণ্ন হয়– বিনিয়োগকারীরা দেশের অর্থ-সম্পদ ও বাণিজ্য পণ্য নিয়ন্ত্রণ করে বলেই। তাহলে গরিব রাষ্ট্র স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বে হানি হবে জেনেও কেন বিদেশীর শিল্পপুঁজি-বাণিজ্যপুঁজি-স্বরাষ্ট্রে নিয়োগ বা লগ্নি করার জন্যে সাধাসাধি করে বিদেশী বেণেদের- কারখানাদারদের। বনজ, জলজ, কৃষিজ-কলজ উৎপাদিত ও নির্মিত পণ্যের উপর দরিদ্র রাষ্ট্রের সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকেই না- নিয়ন্ত্রণ করে বিদেশী সওদাগরেরাই। আওয়ামী সরকার আমলে ইতোমধ্যেই দুমাসের মধ্যে তিনবার টাকার মূল্য হ্রাস করা হয়েছে। এটি ব্যক্তির আয় কমায়, ব্যয় বৃদ্ধি করে, কারণ টাকার ক্রয়মূল্য কমে। একালে দুর্বল দরিদ্র ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্র টিকে থাকবে, কারণ মাটি দখল-রাজ্য-রাষ্ট্র বিজয় একালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে নীতি-রীতি হিসেবেই বিলুপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে গেছে। একালে শুরু হয়েছে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি। একালে-বাণিজ্যিক-মহাজনী সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ উপযাচক হয়েই ঋণে-দানে-অনুদানে-ত্রাণে এগিয়ে আসে, পাঠায় NGO নামের সেবাগোষ্ঠী, নানা বেসরকারী সেবা-উপচিকীর্ষা সংস্থা-সঙ্ঘ-সমিতি-প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্য বা বৃত্তি মেলে দেদার-অঢেল-অজস্র, কিছু চাকরিও মেলে উচ্চপদ-পদবীর ও বেতনের আন্তর্জাতিক সংস্থা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে। এভাবেই একালে মুৎসুদ্দী সরকার ও তাঁবেদার রাষ্ট্র বানানোর ও শোষণের নীতিরীতি চালু রাখা হয়েছে।

কাজেই ভারত কখনো সরাসরি বাঙলাদেশ দখলের চেষ্টাই করবে না, এদেশের মুসলিমদের ভারত তার নিয়ন্ত্রণেও রাখতে পারবে না পারস্পরিক প্রাজন্মক্রমিক সন্দেহ-অবিশ্বাস-অপ্রীতির ও দ্বেষণার স্থায়ী কারণেই। কাজেই দখল করার লক্ষ্যে স্থলপথে 'ট্রানজিট' চাইছে ভারত- এতে কোনো তথ্যের সত্য নেই। তাছাড়া এখনো জলপথে ও আকাশপথে ভারতের জলযান ও বায়ুযান নির্বিঘ্নে যাতায়াত করে। তাতে চোরাচালানও বৃদ্ধি পায়নি। সমুদ্র-পর্বতের বাধা-ব্যবধান না থাকলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে পাচারের ও চোরাচালানের কালোবাজারের ব্যবসা বন্ধ করা যায় না, পৃথিবীর কোথাও যায়নি। লঘু-গুরুভাবে চলেই। কাজেই স্থলপথে পণ্যচালানের অনুমতি দিলেই বাঙলাদেশের নতুন কোনো ক্ষতির আশঙ্কা আছে বলে মনে করার কোনো সঙ্গত যৌক্তিক বৌদ্ধিক কারণ দেখি না। সুপ্রাচীন কাল থেকেই এক রাজ্যের স্থলপথে ও জলপথে অন্যরাজ্যের লোকের যাতায়াতের ও পণ্য চলাচলের রীতি চালু ছিল পৃথিবীর সর্বত্র। পণ্যের শুল্ক আদায়ের রীতিও সুপ্রাচীন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর বহু বহু রাষ্ট্র আফ্রো-এশিয়া, ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকায় রয়েছে যেগুলো স্থলবেষ্টিত এবং অন্য রাষ্ট্রের উপর দিয়েই সমুদ্রবন্দরে জলপথে পণ্য বিনিময় করে। তাতেই তারা অন্যরাজ্যের, রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল বলে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব হারায় না কিংবা স্থলবেষ্টিত প্রবল রাষ্ট্র নদী সমুদ্রবন্দরের মালিক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হরণ করেনি, করে না।

এমনকি ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের বিরোধ-বিবাদ-লড়াই এ অর্ধ শতক ধরে চললেও যুদ্ধকালে ছাড়া অন্য সময়ে স্থলপথে ও আকাশপথে যথাক্রমে রেল-বাস-ট্রাক প্রতি যানযোগে এবং বায়ুযান বিমান চলাচল অক্ষুণ্ন রয়েছে। এতে ভারত-পাকিস্তান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করে না। বাঙলাদেশ কেন অকারণে রেলপথ বিলুপ্ত করল, বাস-কোচ ট্রাক চলাচল বন্ধ করে জনগণের অর্থের ও সময়ের ক্ষতির কারণ ঘটাল, তা আমরা জানি না, যদিও বা ভারতের জলযান-বায়ুযান জলে-আকাশে নিষিদ্ধ হল না। ভারত-বাঙলাদেশ চুক্তি অনুসারে যুদ্ধকালে ভারত বাঙলাদেশের সহযোগিতার দাবিদার। তবে সে-চুক্তির মেয়াদ ১৯৯৭ সনের মার্চ মাসেই শেষ হয়েছে। সে কারণেই ভারত হয়তো ট্রানজিট মাধ্যম পূর্বভারতের দ্রোহের দমনের সহজাত কথা ভাবছে। মানুষের স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক ও আর্থিক আচরণ বোঝা সহজ। পণ্যের দাম ও গুণই ক্রয়ে বিক্রয়ে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটায়। কম দামে ভালো পণ্য কেনাই হচ্ছে ক্রেতার লক্ষ্য। ভারতে যদি বাঙলাদেশের পণ্য গুণে শ্রেষ্ঠ এবং দাম কম বিবেচিত হয়, তাহলে ভারতীয় মাত্রই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতীয় পণ্য না কিনে কিনবে বিদেশী বাঙলাদেশী পণ্যই, তেমনি গুণে-মানে-মাপে মাত্রায় ভালো এবং দামে সস্তা জেনেই বাঙলাদেশীরা স্বদেশের উৎপাদিত নির্মিত পণ্য ক্রয় না করে ক্রয় করছে চোরাচালানে প্রাপ্ত আমদানি করা ভারতীয় মাছ–মোরগ-গরু-সবজি থেকে সর্বপ্রকারের সামগ্রী। বাঙলাদেশের লক্ষ শিক্ষার্থী ভারতে পড়ে, লক্ষ লক্ষ ধনিক-বণিক পরিবার কোলকাতায় যায় বিয়ের বাজার করার জন্যে, বিলাস সামগ্রী কেনা-কাটার জন্যে সর্বোপরি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাঙলাদেশী অর্থ সম্পদশালী রোগী মাত্রই চিকিৎসার জন্যে ভারতের নানা স্থানে, ব্যাংককে, সিঙ্গাপুরে, মালয়েশিয়ায়, ইউরোপে, আমেরিকায় যায়। দেশে চিকিৎসার সব যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও এবং ইউরোপের আমেরিকার শিক্ষিত ডাক্তার ঢাকায় থাকা সত্ত্বেও। এসব ক্ষেত্রে আত্মরতি ও আত্মশ্রেয়স বুদ্ধিই কাজ করে দেশপ্রেম কিংবা বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষী দ্বেষণা অকেজো হয়ে। যায় অবশ্য ভারত বেরুবাড়ি দখল করে একুশ বছর তিন বিঘার উপর দিয়ে বাঙলাদেশীর চলাচল নিষিদ্ধ রেখেছিল, আজ অবধি অধিকার দিতে রাজি নয়, ফারাক্কার পানিও আটক রেখেছে, তালপট্টিও জবর দখল করেছে, আরো যেসব বিরোধ-বিবাদ রয়েছে সেগুলোতে ভারতভীতির কারণ ঘটিয়েছে।

দেখে, শুনে ও জেনেই বলছি রাজনীতিক্ষেত্রে যারা ভারতভীতি ও ভারতদ্বেষণা প্রচারে-প্রচারণায় মুখর, তাঁদের অনেকের সন্তানও ভারতেই পড়ছে, পড়ে ও পড়বে। তাঁরাও যথাকালে যথাপ্রয়োজনে ভারতে গিয়েই চিকিৎসা করান নিজেদের ও পরিজনের। এমনকি চোরাচালানে ও কালোবাজারেই যাদের অর্জন তারাও ভারত-বিদ্বেষী হয় মতে-মন্তব্যে। আমাদের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শিক্ষিতরা, সাংবাদিকেরা, উকিল-ডাক্তারেরা প্রকৌশলীরা আমলারা সাধারণভাবে ভারতভীতিতে নামান্তরে হিন্দু বিদ্বেষে ভোগেন। কিন্তু ব্যক্তি কিংবা পারিবারিক প্রয়োজনে ভারতই যেন তাদের ভরসা। রোগের চিকিৎসাকালে, স্বল্প ব্যয়ে সন্তানের সুশিক্ষা দানে, বিলাস সামগ্রী ক্রয়কালে, বিনোদনে জীবনোপভোগকালে, ভ্রমণে বিনোদনে চিত্তরঞ্জনকালে, রাজনীতিক বুদ্ধিজীবী তথা বাঙলাদেশী মাঝারী ও স্বল্প আয়ের শিক্ষিত মাত্রেরই প্রয়োজনে অভয়শরণ হচ্ছে ভারত।

এ অবস্থায় মাছ-মোরগ-গরু-কয়লা প্রভৃতি ভারত থেকে ক্রয়ে আমদানি করায় আপত্তি না থাকলে বিদ্যুৎ ক্রয়ে আপত্তি থাকবে কেন? ট্রানজিট দানে ভীত হব কেন? এবং চট্টগ্রাম বন্দর, মংলা বন্দর ভারতকে ব্যবহার করতে দিলে আমরা বিনা আয়াসে ও বিনা প্রয়াসে শুল্ক হিসেবে হাজার হাজার কোটি টাকা অর্জন করব। তাতে রাষ্ট্র সচ্ছল হয়ে উঠবে। চুক্তির সময়ে ফারাক্কা, তালপট্টি, বেরুবাড়ি, তিন বিঘা সম্বন্ধেও নানা শর্ত আরোপ করার ন্যায্য দাবি আদায়ের সুযোগ মিলবে।

এ মুহূর্তে আমাদের অভ্যন্তরীণ শাসন-প্রশাসন ব্যবস্থা, পণ্য উৎপাদন-নির্মাণনীতিও ঋণদাতা বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শক্রমে নামান্তরে হুকুম চলছে। রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং NGO-র অর্থ-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ সদাগরের এবং সরকারের সমন্বিত সহযোগিতায় দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনের নীতি উচ্চারণ করেছেন প্রকাশ্যে। NGO-কে এমনি গুরুত্ব দিলে তাদের দেশ উন্নয়নের ও জনসেবার ইজারাদার রূপে পরোক্ষে নয়, প্রত্যক্ষেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বীকার করা হয়। বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগে দেশের উৎপাদিত-নির্মিত বাণিজ্যপণ্য দেশে-বিদেশে বিপণন করার ব্যবস্থার মধ্যে সরকারের স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কাও থাকে। আমরা জানি রাজার পরেই সওদাগরের স্থান। অস্ত্রের পরেই অর্থের শক্তি। একটি অপরটির পরিপূরক। একে অপরের সহযোগীও। ষোল-আঠারো শতকের মতো বাণিজ্যপুঁজি শিল্পপুঁজি নিয়োগকারীরা দেশ দখল না করুক, দেশের অর্থ-সম্পদ সরকার অবশ্য নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো বাঙলাদেশীকে প্রতিবাদে প্রতিরোধে মুখর হতে দেখা যায় না। কেবল ভারতচেতনাই আমাদের প্রবল। এ ভারতভীতি হিন্দুদ্বেষণারই নামান্তর। অবশ্য এর কারণ প্রাজন্মক্রমিক, ঐতিহাসিক এবং মনে মগজে দৃঢ়মূল। তাই হিন্দুমাত্রই ব্যক্তিগত বন্ধু ব্যতীত মুসলিম মাত্রকেই মন্দ বলে জানে, মুসলিমমাত্রই তেমনি বন্ধু ব্যতীত হিন্দুমাত্রকেই সম্ভাব্য শত্রু বলেই মানে। আর আমরা জানি কামে প্রেমে সংঘবদ্ধ অপকর্মের সহযোগিতায় কেবল জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-নিবাসের বাধা-ব্যবধান মানা হয় না। অবশ্য নিরীশ্বর নাস্তিকের মধ্যেও হিন্দু-মুসলিম ভেদচেতনা সুপ্ত বা গুপ্ত, লুপ্ত বা নিষ্ক্রিয় হয়।

AMARBOI.COM

কালে-কালান্তরে মূল্যায়নে হেরফের

কালিক গুণ-গৌরব-গর্ব কালান্তরে লজ্জার, নিন্দার ও অবজ্ঞার কারণ হতে পারে। যেমন ব্রিটিশ আমলে যাঁরা রাজ-সরকার থেকে রাজা-নওয়াব-স্যার-রায় বা খান সাহেব বা বাহাদুর হয়েছিলেন, স্বাধীনতা-উত্তরকালে তাঁদের ব্রিটিশের পদলেহী বা পা-চাটা চাটুকার বলে নিন্দা করা হয় স্বাধীনতাবিরোধী ও ওয়াহাবি-সিপাহি বিপ্লব বিরোধী বিদেশী বিজাতি বিধর্মী-বিভাষী প্রভু ব্রিটিশ কৃপা-করুণাজীবী বলে। আবার সেকালের রাজা-মহারাজা-নওয়াব-স্যার, খান-রায়বাহাদুরদের বংশধরেরা আত্মপক্ষ সমর্থনে বলে যে, তাদের পরিবারেই সেকালে ধনে-মানে-গুণে-গৌরবে কৃতিতে কীর্তিতে, ক্ষমতায় খ্যাতিতে প্রভাবে প্রতিপত্তিতে দর্পে দাপটে শাসনে-প্রশাসনে দেশবাসী মাত্রেরই ছিলেন প্রভু, নমস্য, প্রণম্য সর্বার্থে শ্রেষ্ঠ যোগ্য, দক্ষ-মগজ-মনন মনীষার লোক, কাজেই ঐতিহ্য-গৌরবে আভিজাত্যে গর্বে আজো সমাজে তারা শির উঁচু করে স্বপ্রতিষ্ঠিত থাকার অধিকার রাখে, তারা আজো শ্রেষ্ঠ, ঐতিহ্যঋদ্ধ পরিবার হিসেবে স্বীকৃতি ও সম্মান পাওয়ার যোগ্য।

আবার এ-ও দেখা যায় এককালে যে পরিবার রাজানুগ্রহে রাজ সরকারের উঁচুপদ-পদবী পেয়ে ধন্য হয়েছিল, এককালে সে-কারণে রাজবংশের বা শাসকগোষ্ঠীর কৃপা-করুণা পেয়ে কৃতজ্ঞ ও কৃতার্থ হয়েছিল, কালান্তরে পরিবর্তিত পরিবেশে সে-পরিবারের অবতংশদের পূর্বপুরুষের সদয় প্রভুদের নিন্দায় মুখর হতেও দেখা যায়। যেমন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক শ্রুতকৃতি-কৃতী ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের দেহে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল মাতৃকুল সূত্রে রাজা রাজবল্লভের এবং পিতৃকুল সূত্রে রাজস্ব বিভাগের উঁচু পদের মাজমাদার-এর রক্তধারা। তবু তিনি তাঁর গ্রন্থে তুর্কী মুঘলের তাঁর ভাষায় মুসলিম শাসনের ও জাতির নিন্দাই করেছেন বেশি।

যেসব বিষয় আলোচিত হল, সেগুলো মূলত দৈশিক, রাষ্ট্রিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক চেতনাসঞ্জাত প্রভাবিত মত, মন্তব্য, ধারণা ও সিদ্ধান্তমূলক। কিন্তু নিছক দৈশিক, কালিক প্রাগ্রসর মগজী নতুন চেতনার চিন্তার ও প্রয়াসের আর কর্ম-আচরণের কালে কালে জনে জনে নন্দিত কিংবা নিন্দিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হতে পারে। হচ্ছেও তাই। এ জন্যেই ইউরোপীয় রেনেসাঁস নিয়ে বিগত শতকগুলোতে নিন্দা-তারিফ দুই-ই মিলছে অঢেল-অজস্র। কোনো কোনো নিন্দা-তারিফে থাকে দুই মেরুর ব্যবধান। কেউ কেউ নিন্দায় ও তাচ্ছিল্যে উন্নাসিক। যেমন উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ ফরাসী সাহিত্যিক ও মনীষী চরম তাচ্ছিল্যে মন্তব্য করেছিলেন রেনেসাঁস ছিল কার্যত :"The setting sun all Europe mistook for dawn." সূর্যাস্ত কালকেই সূর্যোদয় কাল ভেবে ভুল করেছিল। অর্থাৎ তাঁর মতে রেনেসাঁস বাস্তবে ছিল মধ্যযুগেরই অবক্ষয় কাল মাত্র। কম্যুনিস্ট মনীষারা রেনেসাঁসকে ইতালির বুর্জোয়া জাগরণ বলেই জানতেন। অনেকেই রেনেসাঁসকে গ্রীক মনীষার পুনর্জাগরণ বলেই মানতেন। অর্থাৎ রেনেসাঁস বলতে যে-নতুন চেতনার, চিন্তার, মুক্তবুদ্ধির ও অভিনব সৃষ্টির উৎস বোঝায়, এ তা নয়, এ হচ্ছে রোমানদের অতীতের ও ঐতিহ্যের অনুশীলন ও পুনঃপ্রবর্তন যার নাম 'রিভাইবেলিজম'। এ-ও সত্য যে 'রেনেসাঁস' নামের 'রিথিঙ্কিং'-এ গ্রীক-লাতিন সাহিত্য-দর্শন-ভাস্কর্য-স্থাপত্য প্রীতির সঙ্গে মিশেছিল ক্যাথলিক ধর্মপ্রীতি। কাজেই রেনেসাঁসকে রক্ষণশীলের সংস্কারে-মেরামতে পুরোনোকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াসরূপে নিন্দা করার অধিকারও রয়েছে ঐতিহাসিকের ও সমাজবিজ্ঞানীর। তবে এ-ও স্মর্তব্য যে প্রতি সূর্যের উদয়ে আসে নতুন দিন, ঘটে নতুন নতুন ঘটনা, ফলে মানুষমাত্রেরই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ বৃদ্ধি পায় বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা। এ তাৎপর্যে রেনেসাঁসও নতুন চেতনার, চিন্তার সাহিত্য-শিল্প-দর্শন সৃষ্টির, মুক্তবুদ্ধির রুচির সৌন্দর্য চেতনার, মানবিক গুণের বিকাশ ঘটিয়েছিল গুণী-জ্ঞানীদের মধ্যে। এবং তাঁদের প্রভাব অতি মন্থর গতিতেই পড়েছিল অজ্ঞ-অনক্ষর-নিঃস্ব-দুস্থ-দরিদ্র পেশাজীবী ও শ্রমজীবীর মনে-মননে। কেননা, তারা যে শুধু গির্জা শাসনে ছিল তা নয়, অজ্ঞ ও অনক্ষর জনগণের সঙ্গে রেনেসাঁস স্রষ্টাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক সংযোগ-সম্পর্ক ছিলই না।

আমাদের একালে রেনেসাঁস ও 'রিভাইবেল' দুটো ভিন্ন তাৎপর্যে বিবেচ্য। রিভাইবেলিজম, রক্ষণশীলতার, অতীত ও ঐতিহ্যপ্রীতির, গতানুগতিকতার আকর্ষণের প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ । আর রেনেসাঁস মানে পুরোনো কাল্পনিক, স্থানিক, লৌকিক অলৌকিক-অলীক-অদৃশ্য-অরি-মিত্র শক্তিতে-অস্তিত্বে আস্থা হারিয়ে দেহে-প্রাণে-মনে-মগজে-মননে-মনীষায় সর্বপ্রকার পূর্বতন ও চিরন্তন বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা বর্জন করে, মুক্তমন-মগজ-মনন-মনীষা নিয়ে নতুন চেতনায়-চিন্তায় উজ্জীবিত হয়ে স্বাধীনভাবে তাদের ভাব চিন্তা-কর্ম-আচরণে অভিব্যক্তি দান করে। রেনেসাঁস সম্বন্ধে বিদ্বানদের মত-মন্তব্য ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিদ্ধান্ত এখন বিভিন্ন। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বের বিদ্বানেরা রেনেসাঁসকে সবিস্ময় নিঃসংশয় গুরুত্ব দিতে চান না, একে মধ্যযুগেই ক্ষণপ্রভা মনে করেন, মধ্যযুগের অবসান সূচক আশ্বাস বলেই তাঁরা মানেন। আর অন্যরা আগের মতোই একে আধুনিক যুগের, সংস্কৃতির ও সভ্যতার অরুণোদয় বলেই জানেন। একে মানবসভ্যতার বসন্তকাল বলেও অনেকে দাবি করেন। কেউ কেউ যথার্থই একে ব্যক্তিক চেতনা-চিন্তার স্ফুরণ বলেই বোঝেন, কারণ তাতে আমজনতা গির্জার বন্ধন-পীড়ন কবলমুক্ত হয়নি। তবু যে-কোনো নতুন উপকারেই আসে পরিণামে এবং নতুন সাধারণত কাউকে ঠকায় না। রেনেসাঁসও শাস্ত্র শাসিত ও গির্জা কবলিত বন্ধ্য সমাজের মধ্যে সমাজের অলক্ষ্যেই মানবিক গুণের, মানবতার, মনুষ্যত্বের বীজ ছিটিয়ে ছড়িয়ে চলেছিল মন্থরগতিতে, পাখিরা যেমন তরুলতার বীজ ছড়ায় ছিটায় না জেনেই।

এভাবেই ইতালিতে উন্মেষিত চৌদ্দশতকের রেনেসাঁস ষোল শতকের ইউরোপের একাংশে চিন্তা-চেতনার, আবিষ্কারের-উদ্ভাবনের সৃষ্টির নির্মাণের, দ্রোহের ও সংস্কারের আকারে এক বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে। ভূকম্পের মতোই ষোল শতকের ইউরোপের অর্ধাংশের সমজমানসকে ও সমাজকে ভাঙা-গড়ার আবর্তে ফেলে দেয়। পুরোনো উপযোগরিক্ত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা বর্জনে এবং নতুনত্বে তথ্যে ও সত্যে আস্থা যোজনের চৈত্তিক ও মগজী শক্তি এবং সাহস জোগায় ওই রেনেসাঁসই। এ ষোল শতকেই জনসংখ্যাবহুল ইউরোপীয়রা নতুন দেশ আবিষ্কারে বিপদসঙ্কুল সমুদ্রে পাড়ি জমায়। আবিষ্কৃত দেশ দখলে, লুণ্ঠনে, নিষ্ঠুর শোষণে-পীড়নে আর শ্বাপদের হিংস্রতায় নরহত্যায় তারা দানবিক চরিত্রেরই স্বাক্ষর রেখেছে বিশ শতক অবধি পৃথিবীর সর্বত্র। কিন্তু স্বদেশে অষ্টম হেনরীর মতো ব্যক্তিকে গরজে ও মতলবে রাষ্ট্রিক চার্চকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ঘোষণা করে মার্টিন লুথার খ্রীস্ট শাস্ত্রের ও আচারের গ্রহণে-বর্জনে মেরামত করে, দেকার্তে-হিউম প্রমুখ দর্শনে নতুন তত্ত্ব প্রচার করে ফরাসী এনলাইনমেন্টের উন্মেষ ঘটিয়ে, বিজ্ঞানীরা নতুন সত্য আবিষ্কার করে, জনগণের ভয়-ভক্তি-ভরসার উৎস ধর্মধ্বজী ক্ষমতালিপ্সু, যাজকগোষ্ঠীকে হৃতশক্তি করে, জনগণকে, রাজাকে, চিন্তা-চেতনাকে, সৃষ্টিকে, নির্মাণকে গির্জার কবলমুক্ত করে ত্রাসমুক্ত স্বাধীন স্বস্থ, সুস্থ ও নিরাপদ জীবন যাপনের সুযোগ করে দিয়েছিল সবাইকে ওই রেনেসাঁস প্রভাবিত দ্রোহীরাই। এমনকি হয়তো কৃষক বিদ্রোহেরও সাহস জুগিয়েছিল পরোক্ষে ওই রেনেসাঁসের প্রভাব। গির্জার যাজকরা হৃতশক্তি হয়ে, অর্থ-সম্পদের মালিকানাচ্যুত হয়ে জনগণেরই কৃপা-করুণানির্ভর হল জীবিকাক্ষেত্রে। যাজকশক্তির ও ভক্তির বিলুপ্তিই রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ অবদান এবং ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের বিশেষ করে দর্শনের ও বিজ্ঞানের বিকাশের উৎকর্ষের ও বিস্তৃতির কারণ। আজ ইউরোপীয় অধিকাংশ মানুষ স্ব স্ব চিন্তা-চেতনা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে, মুদ্রিত আকারে প্রচার করতে এবং ব্যক্তিগত জীবনে নিরীশ্বর নাস্তিক হয়ে স্বাতন্ত্র্যে জীবন যাপন করতে পারে। উপেক্ষা করতে পারে ধর্মবিশ্বাসকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~